

শুভকৃত্ত ৩সমান
উপন্যাস
সমগ্র



বণী আদম
জননী
ক্ৰীতদাসের হাসি
চৌরসন্ধি





শওকত ওসমান এটি লেখকের ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান। পিতা: শেখ মোহম্মদ এহিয়া, মাতা: গুল আর্জান বেগম। জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯১৭, পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার খনাকুল থানার সবলসিংহপুর গ্রামে। পাড়ার নাম মেহেদি-মহল্লা।

গ্রামের মাদ্রাসার লেখা-পড়া শেষে ১৯২৯-এ ভর্তি হন কলকাতার মাদ্রাস-এ-আলিয়ায়। ১৯৩৩ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৪-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি এবং ১৯৩৬ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ. পাস করেন। এখান থেকেই বি.এ পাস ১৯৩৯ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বাংলায় এম. এ. ১৯৪১ সালে।

ছাত্র জীবনেই বিয়ে করেন হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামের শেখ কওসর আলী ও গোলাপজান বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা সালেহা খাতুনকে ১৯৩৮ সালের ৬ই মে।

১৯৪১ সালে কলকাতা কমার্স কলেজে বাংলার প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। দেশ-বিভাগের পর অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের মত করে অপশান দিয়ে চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে দুই বাংলায় বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটায় তাঁর পুরো পরিবার চট্টগ্রামে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। তখন থেকে চট্টগ্রামে ৩৪বি চন্দনপুরায় বসবাস করেছেন। ১৯৫৮ ঢাকা কলেজে বদলি হয়ে আসেন এবং পূর্বে মোমেনবাগে কেনা জায়গায় বাড়ি করেন এবং আমৃত্যু ৭এ মোমেনবাগে কাটিয়ে গেছেন।

১৯৭০ সালে সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময় কাটান কলকাতায়।

১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল চাকরি শেষ হবার আগেই অবসর গ্রহণ করেন, লেখায় পুরো সময় দেবেন বলে।

১৯৭৫-এ ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে ভীষণ মনোকষ্টে ভোগেন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় আশ্রয় নেন। ফিরে আসেন ১৯৮১ সালে।

ভ্রমণ করেছেন নানা দেশ : পাকিস্তান, ভারত, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক ও ইরান।

১৯৯৮-এ ২৯-এ মার্চ হঠাৎ সেরিব্রাল এ্যাটাকে আক্রান্ত হন। ১৪ই মে সকাল ৭-৪০ মিনিটে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। প্রথম কিছু দিন লেখেন কবিতা। পরে আসেন গদ্যে। নিরন্তর লিখে গেছেন, নাটক, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, রস-রচনা, রাজনৈতিক লেখা, শিশুতোষ রচনা, এমন কি কাব্য রচনাও করেছেন ব্যঙ্গ আকারে। অনুবাদও করেছেন প্রচুর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন। বাংলা একাডেমী, স্বাধীনতা ও একুশে পদকসহ পেয়েছেন দেশের সব পুরস্কার ও পদক। তাঁর 'জননী', 'ক্ৰীতাদাসের হাসি', 'রাজসাক্ষী' ও জলাংগীসহ বেশ কিছু ছোটগল্পের সংকলন ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

তাঁর পরিবারের সব সদস্যই শিল্পী। জ্যেষ্ঠ পুত্র বুলবন ওসমান সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরুকলা ইন্সটিটিউটের শিল্পকলার ইতিহাসের প্রফেসর। মধ্যম পুত্র আসফাক ওসমান মৃৎশিল্প-শিল্পী। তৃতীয় সন্তান ইয়াফেস্ ওসমান স্থপতি। কনিষ্ঠ পুত্র জাঁনেসার ওসমান চলচ্চিত্র নির্মাতা।

ISBN 984-458-228-8





১

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই—

উপন্যাস

জননী

ক্রীতদাসের হাসি

হাজারক

মুক্তিযুদ্ধ/আত্মকথা

কালরাত্রি খণ্ডচিত্র

রাহনামা ১ ও ২

উত্তরপর্ব মুজিবনগর

স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর

সমগ্র

উপন্যাসসমগ্র ১-৩

গল্পসমগ্র

কিশোরসমগ্র ১-২

শাওকত ওসমান

উপন্যাস

সমগ্র

১

সময় প্রকাশন

উপন্যাসসমগ্র ১

শওকত ওসমান

চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১০

তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ২০০১

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০০



সময়

সংখ্যা ২২৮

প্রকাশক

ফরিদ আহমেদ

সময় প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ

ওয়াটার ফ্রাওয়ার

২৮/এ কাকরাইল, ঢাকা

মুদ্রণ

সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

UPANASSAMAGARA-I by Shawkat Osman. First Published : April 2000, 2nd Print : September 2010 by Farid Ahmed. Somoy Prakashan. 38/2ka Banglabazar. Dhaka.

Web : www.somoy.com

E-mail : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 500.00 Only

ISBN 984-458-228-8

Code : 228

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : 'সময় . . .' প্লাজা এ. আর (৪র্থ তলা), সডক ১৪ (নতুন)
ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন: ৯১১ ৬৮৮৫



সূ চি প ত্র

বণী আদম ১৫

জননী ১১৯

ক্রীতদাসের হাসি ৩১৭

চৌরসন্ধি ৩৮৭

শওকত ওসমান : সংক্ষিপ্ত জীবনী ৪৫৯

ভূমিকা

বাবার উপন্যাসসমগ্র প্রকাশের প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে আসে ‘সময় প্রকাশন’। ইতোমধ্যে এই প্রকাশনী ‘মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমগ্র’ শিরোনামে পাঁচটি উপন্যাসের সংকলন বিগত বইমেলা ২০০০-এ প্রকাশ করেছে। শোভন ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদে। উক্ত সংকলনের প্রকাশিত চারটি উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধের পরের রচনা। একটি রচনা মুক্তিযুদ্ধের পরের হলেও বিষয়টি ২১-এ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন নিয়ে। সংকলনে এটি এই যুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা গেছে যে ভাষা-আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা। যার ক্রম ধরে আসে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশ হিসেবে প্রকাশ পায়।

এবারের উপন্যাস সংকলনটি সমগ্র উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। এতে থাকছে মোট চারটি উপন্যাস। বণী আদম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি ও চৌরসন্ধি।

বণী আদম উপন্যাসটি লেখকের প্রথম রচনা।

বইটি মুদ্রণের আগে লেখক লিখেছেন “পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে-প্রায় দুই প্রজন্মের কাল— এই উপন্যাসের কিয়দংশ বেরিয়েছিল অবিভক্ত বঙ্গে “আজাদ” পত্রিকার ঈদ-সংখ্যায়। তারপর নানা কারণে “বণী আদম” আর পুস্তকাকারে বের হয়নি। পাণ্ডুলিপি পাওয়াই দায় ছিল। সৌভাগ্যক্রমে পাণ্ডুলিপি আবার হাতে আসায় বইটি শেষ করতে পারলাম।...”

আরো লিখেছেন, “নতুন প্রজন্মের পাঠকদের কাছে এই উপন্যাস ভালো লাগলেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব। তবে এক যুগের দলীল হিসাবে বইটির কিছু মূল্য থাকবে— আমি সেই বিশ্বাস রাখি।”

এই উপন্যাস বৃহৎ বাংলার বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ত্রিশের দশকের পটভূমিতে লেখা। যখন এটি রচনা করেছেন তখন লেখকের বয়স বড় জোর ছাব্বিশ-সাতাশ। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি যথেষ্ট পরিপক্ব। এই বয়সে যেখানে সাধারণত: লেখকগণ রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করেন, সেখানে শওকত ওসমান বেছে নিয়েছেন সমাজের সবচেয়ে নিম্নবিত্ত এবং একটি প্রান্তিক মানুষকে। এই মানুষটির নাম হারেস। হারেস বালক থেকে যুবকে পরিণত হয়েছে গ্রামের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে। হারেসের জন্য এক তাঁতি পরিবারে। বাবা মারা যাবার পর মা সলিম মুনশীর বাড়িতে দাসির কাজ নেয় এবং তার মৃত্যু হলে হারেস ঐ বাড়িতে ভৃত্যের ভূমিকা পালন করে চলে।

দেখতে দেখতে হারেস বড় হয়। কিন্তু মানসিকভাবে খুব একটা বাড়ে নি, কিছুটা হাবা টাইপের। এ-ধরনের লোকদের মালিক পক্ষ খুবই পছন্দ করে। হারেসের জন্যে শুধু খাওয়া আর

বছরে দুটো লুঙ্গি-গামছা বরাদ্দ। গুদামঘরে শোয়া একটা ছেঁড়া মাদুর ও কাঁথা। এদের মতো আদর্শ নফর আর কোথায় মিলবে। কাজের এদিক-ওদিক হলে গাধার মতো পিটুনি দিলেও কোনো উচ্চ-বাচ্য নেই... সব দিক দিয়ে সুবিধে এমন লোক হলে।

এই হারেস একদিন অবিশ্বাস্য এক ঘটনা ঘটিয়ে বসে। এই যন্ত্র-মানবটি একদিন সলিম মুনশীকে বলে বসে, “পনর বছর আপনার গোলাম— তার কি কোনো দাম নেই, বেতন নেই?”

লেখক তারপর লিখছেন, “এমন উচ্চারণ মনিবের কানে অবিশ্বাস্য। জন্মহাবা কি করে এমন উচ্চারণ করতে পারে?”

যতই হাবা হোক হারেস জানে এই উচ্চারণের ফলাফল কি হবে, তাই “তার নিজের ঘরে এসে খাচার বন্দী পাখিকে ছেড়ে দিয়ে নিজেও রাত্রির অন্ধকারে গায়েব হয়ে গিয়েছিল।”

তারপর স্বাভাবিকভাবেই তার জায়গা হয় শহরের বস্তিতে। একসঙ্গে অনেকের সঙ্গে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। গ্রামের জীবনের কথা আহরহ মনে পড়লেও সেখানে আর ফিরে যাওয়া যায় না।

কাজ সে একটা সহজে পেয়ে যায় শরীরের শক্ত বাঁধনের জোরে। রাজমিস্ত্রির জোগাড় হিসেবে কাজ করে চলে। অন্যান্য জোগাড়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয় আরিফের সঙ্গে। তাদের গ্রামে যাতায়াত শুরু করে। এক সময় আরিফের সহায়তায় বিয়েও করে হারেস। আরিফের ঘরের লাগোয়া বসবাস শুরু করে।

একদিন বন্যা ঠেকান বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় তাদের সমস্ত বাড়ি ঘরদোর বানে ভেসে যায়।

অনেক কষ্টে আবার জীবন গড়ে তোলে আরিফ আর হারেস।

এই সময় আরো এক বিপদ এসে পড়ে তাদের ওপর, মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো আন্দোলন তখন তুঙ্গে। গ্রামেও পুলিশী অত্যাচার চলছে থাকে।

লেখক লিখছেন “১৯৩১ সাল। ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপক বিস্তার লাভ করছে সারা দেশে।...”

হারেস-আরিফদের সামগড় গ্রামেও পুলিশ হানা দেয়।

একটি সমাজের বৃহত্তর গণ-আন্দোলন ব্যক্তিগত যে সংকটের সৃষ্টি করে লেখক সেদিকটিও সামগড়ের এক বিধবা বৃদ্ধা মারফত তুলে ধরেছেন। বৃদ্ধার ছেলে নবীন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গ্রাম ছেড়ে গেছে, তাই বৃদ্ধা চিৎকার করে শাপান্ত করছে... “ঐ তে পোড়ার-মুখো গান্ধী আমার ছেলেটাকে শুদ্ধ নিয়ে গেল,... আরে ব্যাটাখেকোর দল গরীবের ওতে কি হবে?”

লেখক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন,

“অখ্যাত পল্লীর বৃদ্ধা।

জগতের কোন খবর রাখে না। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের উপর ভিত্তি করে সে পৃথিবীকে রচনা করে।”

এই সামগড়ে এসে হারেস পাড়ার কাউকে পায় না। পুরো গাঁ খালি। পুলিশের অত্যাচারে সবাই পালিয়ে গেছে।

হারেস যখন পলাতক পরিবারের সদস্যদের খোঁজ করছে তখন কখনো কখনো তার নিজের পুরাতন জীবনের কথা ভাবে। এই ভাবনার এক ফাঁকে পাঠক জানতে পারে যে হারেস শুধু সলিম মুনশীকে মাইনের কথাই বলেনি, হাত মুচড়েও ধরেছিল এবং একটা লাথিও মেরেছিল পেছনে... ফলে তাকে গ্রাম ছাড়তে হয় আত্মরক্ষার জন্যে।

সামগড় থেকে বেশ দূরে নদীর ওপারে গঞ্জে বাঁধের ওপর লোকজন আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে হারেস স্ত্রী সোহাগ ও তিন বছরের পুত্র কিবরিয়াকে পায়। সাথে বন্ধু আরিফ ও তার পরিবারকেও।

দুই বন্ধু তর্ক করে শহরে যাবে না গ্রামে। হারেস গ্রামের পথ ধরে। আরিফ বলে, “শেষে আমাদের সবাইকে শহরেই যেতে হবে রাজাসাবের তালাসে। দেখো আমার কথা ফলে কিনা।” সবাই গ্রামের পথ ধরে। কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি।

জননী এর পরের রচনা। এটিও বিভাগ-পূর্ব বাংলার পটভূমিতে লেখা।

বই হয়ে বেরোয় অনেক পরে। সম্ভবত : ১৯৫৮ সালে।

কাহিনী শুরু হচ্ছে এভাবে :

আলী আজহার খাঁ মহেশডাক্সার মামুলী চাষী।

এক কথায় লেখক সরাসরি চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

আজহার খাঁ মামুলী চাষী হলেও তার বংশধররা ছিল খানদানি খাঁ পরিবার। এই পরিবারের চতুর্থ পূর্বপুরুষ আলী মজহার খাঁ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উত্তর ভারত হতে এসেছিল। এই ভদ্রলোক পার্শি ভাষায় ছিল পারদর্শী।

উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়টি এই পূর্ব-পুরুষদের ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের চিত্র দিয়ে শুরু। এই সময় ওহাবি আন্দোলন চলছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে।

লেখক লিখছেন,

“এদেশে তখন ইংরেজের প্রতাপ ও আক্রমণ নানাদিকে প্রচণ্ডতর হইতেছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় সুদূর কাবুল হইতে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ওহাবী আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই সময়কার কাহিনী।”

এই গ্রামে ব্রিটিশ বাহিনীর ক্যাপ্টেন অ্যারিংটনের সঙ্গে মজহার খাঁর বাহিনীর যুদ্ধ হয় এবং ওহাবি যোদ্ধাগণ শাহাদত বরণ করেন।

উপন্যাসের এই প্রথম অধ্যায়টি আজহার খাঁর বংশ ও মানসিকতা বোঝার জন্যে সাহায্য করে। কিন্তু আসল কাহিনী শুরু হয় এই উপক্রমণিকাটি পার হয়ে।

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা পাচ্ছি চাষী বউ দরিয়াবিবিকে। লেখক তার রান্নাঘরের বর্ণনা দিয়ে কাহিনী এগিয়ে নিয়েছেন। এই পৃষ্ঠাতেই আমরা পাচ্ছি তার কিশোর সন্তান আমজাদকে যে মার পাশে বসে আছে। সারা কাহিনী জুড়ে যার অবস্থান এবং তার চোখে লেখক অনেক কিছুই দেখান।

জননী উপন্যাসও বাংলার ত্রিশের দশকের উপাখ্যান। এর মধ্যে আমরা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা কীভাবে গ্রামেও সংঘটিত হয় এবং কীভাবে ধনী হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার্থে গরীবদের মধ্যে দাঙ্গা লাগায় তা দিনের মত পরিষ্কার করেছেন লেখক।

এই উপন্যাসেও আমরা পাচ্ছি বাংলার সেই প্রান্তিক মানুষ আজহার ও দরিয়াবিবিকে। এ-ছাড়া তাদের সঙ্গে যাদের ওঠা-বসা সেই চন্দ্রকোটাল, সাকের, আমীরণ এরা সবাই প্রান্তিক মানুষ।

জননী উপন্যাসে অনেকে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালির ছায়া দেখতে পেয়েছেন— যেমন হরিহর-সর্বজয়ার সমান্তরাল আজহার-দরিয়া, অপূর সমান্তরাল আমজাদ, আসেকজান যেন অপূর পিসির প্রতিচ্ছবি।

এখানে একটা কথা মানতেই হবে যে বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবন ধারায় মাইক্রো স্তরে প্রচুর পার্থক্য আছে।

তা-ছাড়া ১৮৬০ সালে ভারতবর্ষে প্রথম যে আদমশুমারি হয় তাতে দেখা যায় বাংলায় মুসলমানের অনুপাত হিন্দুদের তুলনায় বেশি। তখন এটা ছিল ৪৫% ও ৫৫% যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলিম। সুতরাং এটা স্বীকার করতেই হবে যে জননী উপন্যাসে সেই বৃহত্তর সম্প্রদায়ের জীবন-চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্য যে-জীবন-চিত্র থেকে বঞ্চিত ছিল।

পথের পাঁচালিতে অপু হল নায়ক, জননীতে দরিয়াবিবি প্রধান চরিত্র। পথের পাঁচালিতে হরিহর-সর্বজায়া অপুকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। জননীতে আজহার-দরিয়া দু'জনই মৃত্যুবরণ করছে। দরিয়াবিবি আত্মহত্যা করে এবং কাহিনীরও সেই সঙ্গ সমাপ্তি।

জননী উপন্যাসে অনবদ্য চরিত্র হল চন্দ্র কোটাল। এই লোকটি যাত্রা দলে গান-অভিনয়-ভাঁড়ের ভূমিকায় নামত।

তার কাছে হিন্দু-মুসলমানের কোনো পার্থক্য ছিল না। ভাগ্যহত হলেও জীবনকে সব সময় হেসে খেলে গ্রহণ করে।

তাড়ি খেয়ে, গান গেয়ে জীবনকে সব সময় তুড়ি মেরে বিশ্বাস কাটিয়ে হাস্যরসে ভরে রাখে। মুখে অনেক পালা-গানের কলি লেগেই আছে। তার মধ্যে একটি হল:

ভগবান তোমার মাথায় ঝাঁটা,
ও তোমার মাথায় ঝাঁটা
যে চেয়েছে, তোমার দিকে
তারই চোখে লজ্জা-বাটা।
ও হড়িয়ে দিলে, ছড়িয়ে দিলে
মারলে ভারে তিলে তিলে
ও আমার বৃথাকসল কাটা।
ও তোমার মাথায় ঝাঁটা।

এই চন্দ্র কোটাল আজহার খাঁ-র পরিবারের একজন অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী। বালক আমজাদ এই কাকাকে খুব ভালবাসে। আজহার খাঁ রাজমিস্ত্রির কাজে ঘরের বাইরে গেলে তার বর্গার জমি রক্ষা করে এই চন্দ্র কোটাল। নানা রকম খাবার দিয়ে সাহায্য করে।

দরিয়াবিবি চরিত্রটি এক আত্ম-সম্মান বোধ সম্পন্ন মহিলার চরিত্র। হাজার দারিদ্রের মধ্যেও যে নিজেকে অন্যের সাহায্যের হাত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে চলে, কিন্তু আজহার খাঁ-র মৃত্যুর পর, আজহারের দূর সম্পর্কের ব্যবসায়ী ফুপাতভাই এর লোভ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। এবং যার ঔরসের সন্তানকে জন্মদানের পর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

দরিয়াবিবির মৃত্যুর পর তার পূর্ব-স্বামীর ঘরের সন্তান মোনাদির, আমজাদ ও চন্দ্রকোটাল জীবিকার জন্যে শহরে যাবে স্থির করে। কাহিনীর শেষাংশে আমরা দেখি, “দরিয়াবিবির কবরের পাশে তিনটি ছায়া মূর্তি দণ্ডায়মান ইহাদের চেনা যায়। মোনাদির, আমজাদ ও কোটাল।

মোনাদির হঠাৎ ডুকরাইয়া উঠিল।

কোটাল আগাইয়া আসিয়া বলিল, “চাচা বেটাছেলে, মার জন্যে কি এত কাঁদে?” ...অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে সে নিজেও বলিয়া ফেলিল, “দরিয়াবিবি, সেলাম... সেলাম...”

এই দুটি উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী-হাওড়ার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় বর্তমান বাংলাদেশের পাঠকদের কিছু অসুবিধা হতে পারে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার পর লেখক পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে আসেন পূর্ববঙ্গে। ফলে গ্রাম-জীবনের সঙ্গে তাঁর যে-বিচ্ছেদ ঘটে সেটা আর জোড়া লাগে নি। ফলে বাংলাদেশের গ্রাম ভিত্তিক কোনো উপন্যাস আর তাঁর হাত থেকে বেরোয় নি। তাঁর রচিত অনেক ছোটগল্পে পূর্ববঙ্গের জীবন বাস্তববাদি ভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু জীবন-ঘনিষ্ঠ বাস্তববাদি কোনো উপন্যাস আর আমরা পাই নি।

পাকিস্তান পর্বের সামরিক শাসনের ফলে সরাসরি অনেক কথা বলা যাবে না বলে শওকত ওসমানে রূপকধর্মী উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। তার মধ্যে ক্রীতদাসের হাসি অন্যতম। শুধু রূপকধর্মী উপন্যাসগুলোর মধ্যে নয় অনেকে এটি লেখকের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মনে করেন।

এই উপন্যাসটি ১৯৬২ সনের রচনা।

প্রথমে এই উপন্যাসটির উপক্রমণিকাটি ছিল প্রায় উনত্রিশ পৃষ্ঠা। পরে এটিকে লেখক চার পৃষ্ঠার নিয়ে আসেন।

কিন্তু এই ব্যাপারটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে একটি গল্প ফেঁদেছেন যে এক বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তার পিতামহ ফরিদউদ্দীন জৌনপুরীর সহযোগিতায় একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। এটা আসলে একটা হেয়ালি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু একটা ঐতিহাসিক গন্ধ ছড়িয়ে ব্যাপারটাকে পুরাতাত্ত্বিক লেবাস পরিয়ে দেয়া যায় ফলে সত্য-মিথ্যা জড়া জড়ি করে পাঠকের মাথায় বেড়ে ওঠে। ফলে একটা রহস্য তৈরি হয় এবং অনেকে একে সত্যি ঘটনা বলেও মনে করবেন। আর সত্যি বলতে কি ব্যাপার ওপর একটি স্মারক-গ্রন্থ তৈরি করতে গিয়ে এ-রকম একটি প্রবন্ধও পেয়েছিলাম। যার মূল বক্তব্য হল শওকত ওসমান এ-যুগে একটা বিরাট আবিষ্কার করেছেন— অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি— এই আবিষ্কারের জন্যে তিনি বাংলা সাহিত্যে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

লেখাটি না পড়েই কম্পোজ করতে দিয়েছিলাম। পরে প্রফ সংশোধনী করতে গিয়ে আমার আক্কেল শুড়ুম।

লেখাটি কোথায় যে রাখলাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এ-থেকে একটা কথা প্রমাণ হয় যে শওকত ওসমান মানুষের কাছ থেকে তাঁর এই রচনার সত্যতার স্বীকৃতি আদায় করে ছেড়েছেন।

আমরা জানি আরব্য উপন্যাস হল এক হাজার এক রজনীর গল্প। কিন্তু ফরিদউদ্দীন জৌনপুরী জানান আসলে তাঁর কাছে যে পাণ্ডুলিপিটি আছে তাতে জানা যাচ্ছে গল্প আরো একটি আছে।

এই উপক্রমণিকাটি প্রথম পুরুষে লেখা।

“এই আবিষ্কার আমাকে পাগল করে তুলেছিল।...

শহরে ফিরেই মৌলানা জালালের সহায়তায় ‘আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে’র শেষ কাহিনীটা বাংলায় তরজমা করে ফেললাম।

বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের মমতার জন্যেই ত পৃথিবীতে বাঁচা।”

সাহিত্যিক শওকত ওসমান সব সময় বিনয়ের সঙ্গে বলতেন যে বাংলা ভাষার তিনি একজন নগন্য সেবকমাত্র।

উপক্রমণিকা শেষেই আমরা পাচ্ছি একটি পৃষ্ঠা— পুরো পৃষ্ঠার মধ্য ভাগে লেখা:

যদিও আমরা উপক্রমণিকাতে পাচ্ছি, মৌলানা জালাল পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে জবাব দিলেন, “জাহাঙ্গুল আব্দ অর্থাৎ গোলামের হাসি।”

লেখক কেন গোলামের হাসি উপন্যাসের নাম দিলেন না, এই প্রশ্নটি কারো কারো মনে উদয় হতে পারে।

সম্ভবত: গোলাম শব্দের মধ্যে তেমন জোর পান নি। ক্রীতদাস শব্দের মধ্যে একটা ব্যঙ্গনা আছে। গোলাম একটি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকর শব্দ, এদিক থেকে ক্রীতদাস শব্দের মধ্যে একটা অভিজাত্য আছে। বস্ত্রগত না হলেও শব্দের গাষ্ট্রীয়তার দিক থেকে। আর আমরা এই উপন্যাসের ক্রীতদাস তাতারীকে তেমনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবেই পাই।

এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে যে দ্বন্দ্বটি তা হল একদিকে খলিফা হারুনর রশীদের মনের অশান্তি, অন্যদিকে ক্রীতদাস তাতারী ও তার প্রেমিকা ক্রীতদাসী মেহেরজানের প্রাণ খোলা হাসি। একদিক বিশাল সম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য, আর একদিকে বিত্তহীন, পদহীন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। খুবই অসম দ্বন্দ্ব, কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষ আসলে যে একই জায়গায় অবস্থান করে সেটাই আমাদের মনে করিয়ে দেন লেখক। যেমন বাংলার আর এক কবি বলেন, সবার উপরে মানুষ সত্য...

ক্রীতদাসের হাসিকে উপন্যাস না নাটক বলা হতো এ-নিয়ে একটা তর্ক হতে পারে। উপক্রমণিকাটুকু বাদ দিলে এটি দৃশ্য-কাব্যে বিভক্ত। পুরো নাট্য গুণে ভরপুর। ক্রাইসিস্ ক্রমশ: এগিয়ে চলেছে এবং একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। খলিফা হারুনর রশীদ ধন-দৌলত পদ-মর্যাদা সব দিয়েও তাতারীকে হাসিতে পারে নি, প্রেমিকের হৃদয় ভরা ভালবাসার বন্যামাখা হাসি।

অভিসারে বেরিয়ে ক্রীতদাসী মেহেরজান গোলামখানায় প্রবেশ করে— তারা হাসা-হাসিতে লিপ্ত হয় তা কানে যায় খলিফার। খলিফা তখন তার বুদ্ধিমান জল্লাদ মশরুরের সঙ্গে নৈশ বিহারে। খলিফা বলে, কারা হাসছে?

মশরুর, গোলামের হাসি জাঁহাপনা?

হারুন, গোলামেরা এমন হাসি হাসতে পারে?

মশরুর, পারে, আমিরুল মুমেনীন। ওরা সুখ পায় না, কিন্তু সুখের মর্ম বোঝে। মনুষ্যত্বহীন, কিন্তু মনুষ্যত্বের আশ্বাদ পায়। ওরা হাসে।

হারুন, ওরা হাসবে, আমি হাসতে পারব না? না, তা হয় না।...

তারপর এক সময় বলে, ...আমি এমনই হাসি হাসতে চাই...

হাসির নেপথ্যের পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় উন্মোচিত হয়। মেহেরজান ও তাতারীর প্রেমের ব্যাপারটা খলিফা জানতে পারে এবং তাতারীকে গোলামের জীবন থেকে মুক্তি দেয়। দেয় প্রচুর দাসী, দৌলত, শর্ত একটাই খলিফাকে হাসি শোনাতে হবে। সব কিছু পেয়েও তাতারী তার হাসি ভুলে গেল।

খলিফার জিদ তাকে হাসতেই হবে। তাতারীরও জিদ সে হাসবে না।

খলিফা বাগদাদের দুই বিখ্যাত কবি আতাহিয়া ও নওয়াসকে দাওয়াত দিয়েছে তাতারীর হাসি শোনাতে বলে।

হারুন, হ্যা, তাতারী তোমার হাসি শুনিয়ে দাও...

তাতারী, হাসতে পারছি না, আমিরুল মুমেনীন।

বারবার নির্দেশ দেবার পরও গোলাম রাজী না হলে হারুন ক্ষিপ্ত হয়ে জল্পাদকে তাতারীর গর্দান নিতে বলে। তখন কবি আতাহিয়া বলে, ...সব সময় হাসি আসে না। কবি নওয়াস বলে, আমি ত আপনাকে, নুরুল্লাহ আগেই বলেছি, উপাদান লাগে।

অর্থাৎ হাসির উপাদান।

এরপর হারুন তাতারীকে সময় দেয় অন্য সময় হাসার।

কিন্তু তার পরদিন থেকে তাতারী নিজের মধ্যে আরো গুটিয়ে যায়।

খলিফা বাগদাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তকীকে পাঠাল তাতারীর মনোরঞ্জননের জন্যে, কিন্তু তাতেও কিছু হল না, বরং নর্তকী বুসায়না তাতারীর সং-আত্মার সংস্পর্শে এসে আত্মহত্যা করল।

শেষে হারুনের রশীদ তাতারীর প্রেমিকা মেহেরজানকে নিয়ে যায় কয়েদখানায়, তবুও তাতারী নিরুন্তর। হাসি ত দূরের কথা কোন কথাই বলে না সে। মেহেরজানকে যখন প্রহরীরা কয়েদখানা থেকে নিয়ে যাচ্ছে তখন তাতারী— মেহেরজান, মেহেরজান বলে ডাক দেয়, তারপর বলে, শোন্ হারুন রশীদ— খলিফা বলে, বেতমীজ, জাঁহাপনা বল। তাতারী বলে, শোন্ হারুনের রশীদ, দীরহাম, দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব—! কিন্তু— কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি— না... না... না... না... পতন ও মৃত্যু।

এই সময় বেগে কবি আবু নওয়াসের প্রবেশ, বলে, আমিরুল মুমেনীন, হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।

স্বাধীনতা যে কত বড় জিনিস তা বুঝতে শিশু কষ্ট হবার কথা নয়। এই বার্তাটিই লেখক এই রূপক উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাভাষী পাঠককে জানিয়ে গেছেন।

এই উপন্যাসে আর্বি-পারশি শব্দের সুার্থ ব্যবহার লক্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্যে ক্রীতদাসের হাসি একটি অপূর্ব সংযোজন।

১৯৬২ সালে এটি আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খান নিজ হাতে পুরস্কার তুলে দেন লেখকের হাতে। পরে সরকার বুঝতে পারে যে এটির মাধ্যমে আসলে সামরিক শাসকদেরই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তারা যে-রকম আর্বি-পারশি যুক্ত বাংলা চায়, মক্কা-বাগদাদের কাহিনী শুনতে চায় তাদের মত করেই শওকত ওসমান প্রতিশোধ নিয়েছেন।

সবাই বুঝতে পারে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য... দুঃখিনী পূর্ব-বাংলার মুখে কেন হাসি নেই।

এর আট বছর পর বাংলার তাতারীরা পাকিস্তানের খলিফা ইয়াহিয়া খানকে ইতিহাসের আন্তার্কুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

চৌরসন্ধি উপন্যাসটি ১৯৬৬ সালে লেখা। তখন পাকিস্তান আমল। দুটি পাকিস্তান—পূর্ব ও পশ্চিম। কেন্দ্রে সামরিক অধিকর্তা আয়ুব খাঁ বসে। পূর্ব-প্রান্তে মোনেম খাঁ। দুই খাঁ দু'জায়গায় রাজত্ব করছে। বড় হজুর পশ্চিমে, পুবেরটি অবশ্য তার গোলাম, কিন্তু নিজ অঞ্চলে মালিক।

উপন্যাসটি চোরদের নিয়ে লেখা। একজন তাগড়া মূর্থ রিকসাওয়ালা কিভাবে মিল মালিকের ধর্মঘট ভাঙ্গার সাহায্যে এসে কালু সর্দারে পরিণত হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে যা আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। কাহিনীর বিস্তারটিতে বেশ জট পাকান হয়েছে। শহরে দুই চোররা দ্বন্দ্ব

পড়ে যাচ্ছে। ব্যবসায় দুই দলেরই মন্দা।

এই উপন্যাসে একটি ধারণা বা কনসেপ্টকে রূপ দেয়া হয়েছে। পাঠক বুঝতে পারে উচ্চবিত্তের মূল্যবোধ মধ্যবিত্ত বা সাধারণ জনগণের মত নয়, এর মধ্যে আছে বিপুল পার্থক্য। কাহিনীর বড় তাৎপর্য পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সমান্তরালভাবে টানা যায়। একদিকে পশ্চিম আর একদিকে পূর্ব যেন দুই চোরের সন্ধি। কাহিনীর বিস্তার এই পর্যন্ত।

কিন্তু আমরা জানি পৃথিবীতে সব সংঘাতই স্বার্থের সংঘাত। পূর্ব ও পশ্চিমের সন্ধিটি কার্যকর হয় মাত্র পঁচিশ বছর। পরবর্তীতে আবার সংঘাত এবং ১৯৭১ সালে পূর্ব-পশ্চিম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সন্ধিটি গেল ভেঙে।

এই উপন্যাসে শওকত ওসমানের সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়ে গেছে একাত্ম।

চারুকলা ইন্সটিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

বুলবন ওসমান
৩.৪.২০০০

বগী আদম



প্রকৃতি তাকে বঞ্চনা করেছিল।

প্রকৃতি তাকে কোলে ঠাই দিয়েছিল।

এমন পরিহাস মানুষের জন্যে আজও ধাঁধা বৈকি।

বঞ্চনা এবং আশীর্বাদ দুই কি করে এক খোঁটে মেলে?

হারেসের জীবন আখ্যায়িকা তাই বিস্তারিত কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। সে জন্মেছিল মুসলমান তন্তবায় সম্প্রদায়ে। তাদের অধিকাংশই দরিদ্র। শুধু তা-ই নয়, সমাজেও তারা ব্রাহ্মণ-সমীপে শূদ্রের মত, যদিও মুসলমান সমাজে জাতিভেদ অনুপস্থিত। কার্যতঃ ইতিহাসের রায় অন্য রকম।

হারেসকে প্রকৃতি বঞ্চনা করেছিল। আক্বেলের পর্যায় যদি অতি নিম্নে থাকে গ্রামে তাদের ‘হাবা’ ‘গোবা’ ‘মগা’ নানারকম নামে ভূষিত করে। এমন অবস্থায় বাঁচার পরীক্ষা দিতে হয় নানা কাঠিন্যের ভেতর দিয়ে।

প্রকৃতির আশীর্বাদও পেয়েছিল বৈকি হারেস। শরীর পেয়েছিল যেন লোহার মুণ্ডর। অনাচার, অনিয়ম সেখানে সাধারণ স্বাস্থ্য-বিধির তোয়াক্কা রাখে খোড়াই। ভরা-রোট, মরা-রোট যে-কোন অবস্থায় দিন চলুক, শরীর ঠিক আছে। অসুখ-বিসুখ, তা-ও খুব ছোটখাট, কোথায় দাঁত বসাতে পারে না।

এইভাবেই হারেস বেড়ে উঠেছিল মীর গুট নামক গ্রামে সলিম মুনশীর আশ্রয়ে। বিরাট জোতদার তিনি। প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় শরীফ। বাপ হারিয়ে হারেস এসেছিল এই বাড়িতে। একা নয়। মা ছিল সঙ্গে। হারেস সন্তানের প্রতি তার মমতা ছিল অপরিসীম। নিজেই পরমুখাপেক্ষী। তার আত্মীয়সীমানা ত খুব ছোট। তবু তারই ভেতর বুঝা যেত এক রমণীর স্নেহের পরিচয়। মা বাড়ির খাদেমা বা পরিচারিকা, সন্তান ফাই-ফরমাস খাটার চাকর সেই আট বছর বয়স থেকে। সন্তানের পদোন্নতি হয়। চাষবাসের কাজেও হারেসকে লাগিয়ে দেওয়া হোত পরে। মা তা দেখে যেতে পারেনি। সামান্য অসুখেই সে পৃথিবী ত্যাগ করে। হারেস মার মনিবের বাড়ী ছেড়ে যেতে পারেনি। কারণ, উপায়হীন। যাবে কোথায়? তাঁতের পেশা বাপের আগেই উঠে গিয়েছিল। পরে জমিজিরাতহীন চাষী। তাদের অনেকের নিজস্ব ভিটাও থাকে না। হারেসদেরও ছিল না। নিরাশ্রয় হারেস মায়ের আশ্রয়-বঞ্চিত হলেও জোতদারের আশ্রয়চ্যুত হয় না। মেহনতের ব্যাপারে হারেসের কোন দ্বিধা ছিল না। প্রায় বিনা বেতনে, কিছু খোরপোষের বিনিময়ে কাজের এমন যন্ত্র পেলে, কে তা হাতছাড়া করবে? সলিম মুনশীর যে সম্পত্তির তায়দাদ এত বেশি তা হিসাবের ফল। হারেসের ক্ষেত্রে তিনি হিসেব করতেন না, এমন রায় দেওয়া কঠিন।

আর এক দিকে হারেস প্রকৃতির আশীর্বাদ পেয়েছিল, মনে করা যেতে পারে, যদি এমন প্রাপ্তির অমন কদর কেউ দেয়। হারেস পশু-পক্ষী ভয়ানক ভালবাসত। পাখি-পোষা

ত তার বাতিকে দাঁড়িয়ে যায়। পোষ্য থাকলে কিছু করণীয় লাজেমী বা বাধ্যতামূলক। হারেস তা অনুভব করত নিশ্চয়। কারণ, সে একজনের পোষ্য। তবু যতই কাজ থাক তার, এক ফাঁকে নিজের পোষ্যের খবরদারী সে নেবেই। অনেক সময় দেখা গেছে সারাদিন মাঠে খাটুণীর পর সে আবার মাঠে গেছে রাত্রে ফড়িং ধরতে। সামান্য একটা দেশালাইয়ের কাঠি জ্বালালেও ফড়িং এসে জোটে। তারপর অন্ধকারে টপাটপ শিকার। সাপের ছোবলে মরতে পারত হারেস। শুধু পাখী নয় পশুর প্রতি মমতাও ছিল প্রচণ্ড। সলিম মুনশী নিজের গাই গরুগুলো হারেসের হাতে ছেড়ে নিশ্চিত থাকতেন। বাছুর হোলে কোলে করে ধরত হারেস এবং দাইয়ের মত পরিচর্যা শুরু করত। অথচ দুধের কি স্বাদ সে জানে না। কারণ, গোয়ালী দুধ দু'য়ে মালিকদের হাতে তুলে দিত। তাদের কেউ কোনদিন এক বাটি খাওয়ার জন্যে হারেসকে অনুরোধ করেনি। একটি দুধেল গরু অসুখে মরে যায়। পাড়াগাঁয়ে চিকিৎসার পদ্ধতি ত মাস্কাতা আমলের। বলা যায়, রোগের চিকিৎসা করা গেল না। হারেস খুব কঁদেছিল, একদিন অনাহারে রইল। অথচ, কাজের কেতায় অনেক সময় তার হা-পা কেটে যায় বা কোন ছোটখাট জখম হয় শরীরে, হারেস আঃ উঃ শব্দও করে না। জ্বালা-পোড়া যেন কোন ব্যাপারই নয়। গাঁয়ের অনেকে বলত, হাবা হলে অনেক লাভ আছে। মাঠের কাজে পায়ে তিন-চারটে কাঁটা ফুটলে একদিন সেগুলোর মোকাবিলায় বসত হারেস। অপরিসীম তার সহনক্ষমতা। তা না হলে এইসব অস্বাভাবিকতার মুখোমুখি হতো কীভাবে?

গাঁয়ের কিছু লোক ওকে নিয়ে তামাশা করতেন। সাধাসিধা মানুষ। তা-কে কোন অনুরোধ করলে সে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা পাবে না। গ্রামের পাশে বিশাল মাঠ। সেখানেও আরো আকর্ষণীয় একটি দিঘী আছে প্রাচীন কালের। এখন মজে গেছে। অনেকখানি দামঘাসে ভরা। মাঝখানে পদ্মফুল এখনও ফোটে। হারেস সাঁতার জানে। কিন্তু দামঘাসে বোঝাই থাকলে হাত-পা চালানো সুবিধা হয় না। সহজেই পেশী আর কার্যক্ষম থাকে না। ঠিক এই কাণ্ড ঘটেছিল হারেসকে নিয়ে। কিন্তু হারেস বলেই বুঝি সে ডুবে মরেনি। পদ্মফুল সে তুলেছিল ঠিকই। ফেরার পথে পায়ের পেশী আর তেমন সাহায্য করছিল না। পাড়ের কাছাকাছি এক হাঁটু জলের উপর মূর্ছাহত হারেসকে পরে অনুরোধকারীরাই তুলে এনেছিল। মুনশীর কানে গেলে তামাসার বাজিকরদের বেশ শাস্তি হতো। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ ছড়ায়নি। হারেস ত বলবে সাঁতার দিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তার বেশি অভিযোগের আর কী আছে? মানুষ অনুরোধ করবে কোন কাজের, সেই কাজ অসমাপ্ত থাকার কথা হারেস বুঝতে অক্ষম। অবিশ্যি হারেসের মত লোক দিয়ে খুন করলে তা প্রকাশ হতে দেবী হবে না, তাই সলিম মুনশী তাকে অমন পরিকল্পনার ভেতর রাখেনি। জমি জায়গা সম্পত্তি রাখতে গেলে প্রয়োজনে খুনও বাঞ্ছনীয়, জোতদার মুনশী তা খোলাখুলি বলতেন। অবশ্যি তার তেমন কোন অপবাদ দিতে পারবে না কেউ। তবে এই এলাকার লোক সবাই জানে, মুনশী সাহেব ধড়ি বাজ জিন্দী এবং দাদ-লেনে-ওয়ালা বান্দা। জমি জায়গা নিয়ে মামলায় তার মত ঝানু দ্বিতীয় একটি লোক খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। চাকরবাকর কি, তার নিজের ছেলে-মেয়েরাই তটস্থ থাকত জন্মদাতার কাছ থেকে বহুদূরে। আর জন্মদাত্রী তো দুজন থাকতোই মুনশীর পরিবারে। ভাল নতুন ফসল পাওয়ার পর নতুন বৌ না এলে মানায় না। যৌবনকালের খসলং অবিশ্যি আর নেই শ্রৌট মুনশীর। তবে দুই স্ত্রীর ডালপালা

আছে ত। সেখানে যৌথ পরিবারের সংগতি— সুখমা রক্ষা বেজায় দায়। ফলে, জ্যেতদারের মেজাজ ইদানীং বেশ চড়া হয়ে থাকত। তার চোটপাট যেত চাকরবাকরদের উপর দিয়ে। গালাগাল খেত জনমুনিশেরা। গাঁয়ের সালিশে তিনি প্রধান। তার রায় অনড়। সেখানে “দশ জুতা লাগাও, বিশ জুতা লাগাও” —এমন আপীলহীন ফল বেরুত।

হারেসের কথা না বললেও চলে। মুনশী কর্তৃক নাম উচ্চরিত হওয়া মাত্র তার পিলে কাঁপত। ভেতরে এমন হাওয়া যে সে অনেক সময় সঠিক জবাব দিতে ভুলে যেত। এক জিজ্ঞাসা, জবাব অন্য প্রশ্নের। এমন ঘাবড়ে গেলে নিতান্ত বিচক্ষণ মানুষও ত উট্টোপাল্টার ফেরে পড়বে। হারেস এই জন্যে মার খেত এবং প্রচণ্ড মার। মুনশী সাহেবের লাঠির বা ছড়ির দাগ পিঠে বহু আছে। তার মা আর দেখার জন্যে জগতে নেই। সূতরাং হারেসের জন্যে সহানুভূতি প্রকাশের প্রশ্ন অবাস্তব। জ্যেতদারের ছড়ি কেড়ে নেবে বা অনুরোধ করবে, “আর না, মিয়া-সাহেব” —এমন বলার কেউ ছিল না। পড়ে পড়ে খুবই মার খেত হারেস। কিন্তু তার জন্যে সে চিংকার প্রকাশের মত দুর্বলতা দেখাবে, তেমন বান্দা হারেস নয়। তখন তার চোখ মুখের পেশী নানা আকার ধারণ করবে, হাত বার বার পিটুনির জায়গায় পৌছবে, কিন্তু হারেসের গলায় তার প্রকাশ নেই। এক রকম শব্দ তার গলায় তখন খুব মনোযোগ দিলে শোনা যেত। কার অত গরজ? অনেক সময় শাস্তিদাতাই হাল্লাক হয়ে পড়ত। মার শেষ হলে হারেস ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিত, তখন চোখের জল কিনারায় উকিবুকি দিত, উছলে পড়ত না। মুনশী সাহেব নিজে অবাক হয়ে যেতেন কিনা আল্লাকে মালুম। মন মনে ভাবতেন, মার বোধ হয় ওর শান্তির নয়।

প্রচণ্ড মার খেলে হারেস সেদিন আর স্নাতের আহার করত না। বড় বাড়ি, কে কার খোঁজ রাখে? কেউ টেরও পेत না, হারেসের কী হলো। তার ঘরে আর কারো শোয়ার জায়গা ছিল না। হিসেব সামান্য বিস্মিত দিতে হয়।

গোয়াল ঘরের পাশেই একটি বড় ছিটে- বেড়ার ঘর তৈরি করেছিলেন সলিম মুনশী। বাঁশের খুঁটি আর বাখারির ফ্রেম, ফাঁকগুলো বাঁশের কঞ্চি বা গাছের সরু ডালপালা দিয়ে ছেয়ে পরে এক দেড় ইঞ্চি পুরু মাটির প্রলেপের সাহায্যে তৈরি ঘরকে এলাকায় বলা হয়: ছিটে বেড়ার ঘর। মুনশী সাহেব এটি গুদাম হিসেবে ব্যবহার করতেন। ধান-চাল নয়— পাট, কুমড়া বা ওই জাতীয় কোন ফসল রাখা হোত এই ঘরে। সেখানে বুঝা যায়, অন্য লোককে বিশ্বাস করা দায়। হারেস যতই অবাধ্য হোক, মনিবের আমানত খেয়ানত করবে, তা মুনশীর হিসেবে ছিল না। এই গুদাম-ঘরে জানালা ছিল বেশ উপরে, তাও সংখ্যায় একটি। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় তার ভেতর হারেস ঘুমাত। কোন অভিযোগ ছিল না তার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনেও। কারণ, কারো কাছে মনের কথা খুলে বলার লোক ত সে নয়। জীবনকে যারা এমন সহজভাবে গ্রহণ করে, তাদের মনের হৃদিস, কে বলতে পারে? এক একটি মানুষ চির-বন্ধদুয়ার জানালাহীন দুর্গ বিশেষ। যারা জানালা খোলে তাদেরও কি সব হৃদিস অপর লোকে টের পায়? সন্দেহের প্রচুর অবকাশ আছে। বিশেষতঃ হারেসের মত বোধশক্তির অধিকারী মানুষের কাছ থেকে। সেখানে সবই অনুমানের ব্যাপার।

তবে ভীতি-জাত কিছু চেতনা, বোধ হয়, হারেসের প্রখর ছিল। পাখি-পোষা মনিব

ভাল চোখে দেখবে না। এই অনুমান সে কীভাবে করত? তার খাঁচা পাখি সবই গুদামঘরে লুকানো থাকত। একটা ডিপা তাকে দেয়া হয়েছিল। রাত-বিরেত যদি দরকার হয়। হারেসের তা দরকার ছিল না। অন্ধকারে সে পেশাব পায়খানার জায়গায় ঠিক পৌছে যেত। পরবর্তী কাজ সারতে বাড়ির পেছনে পুকুর নয় ডোবা পর্যন্ত যেতে হয়, তা একদম মুখস্থ এবং অন্ধকারে মুখস্থ হারেসের। তার আলো প্রয়োজন পাখিকে খাওয়াতে অথবা রাত্রে ফড়িং ধরতে। সংসারে যাদের চাহিদা ন্যূনতম তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীও ত কম লাগে।

কাপড়-চোপড়ের ব্যাপারে হারেসকে কিছু বলতে হোত না। লুঙ্গি গামছা বাৎসরিক বরাদ্দ আছে। হারেস ত অপচয়কারী নয়। সে হেফাজতের ব্যাপারে নিজের দিকে খেয়াল নাই করুক, মনিবের জিনিস সে নষ্ট হতে দিতে অক্ষম। তা দেখা গেছে, যখন রবি-ফসলের মৌসুম শুরু হয়। তখন হারেসের ডিউটি বদলে যায়। সে তখন রাত্রে মাঠের অধিবাসী। কুঁড়েঘরের ভেতর আরো পাহারাদার থাকত। অনেকেই ঘুমাত। হারেস ঘুমাত অবিশ্যি, কিন্তু তা একটানা ঘুম নয়। ঘুম আর বিশ্রাম সে মিলিয়ে নিত। মনিবের কিছু বলার থাকত না। তরমুজ, বাগী প্রভৃতি এমন ফসল চুরি হয় নানা কারণে। গঞ্জে ত খুচরো বিক্রী হয় না। শতে শতে দর। এক চাষির নব্বইটা হয়েছে, কি দু'শ নব্বই হয়েছে। সে একশ' করতে চায়। তখন বহু রক্ষক ভক্ষক সাজে। দশটা তরমুজ গাপ করে দিলো। হারেসকে এমন অনুরোধ বৃথা। বেশী পীড়াপীড়ি করলে হারেস জবাব দেবে, “আমি ত পারব না। মুনশী সাবকে জিগাই নাই?” অমন জিজ্ঞাসার অপেক্ষায় থাকবে এই তল্লাটে কোন বাপের ব্যাটা? সলিম মুনশী তাকে চিবিয়ে রাখে না?

এই হারেস, এই শান্ত ব্রীযমান সর্বসহ হারেস যেন সর্বসহা বসুন্ধরা একদিন এক কাণ্ড করে বসল। সে কী তার অজানিতে অথবা আওনের পাহাড় স্তব্ধ ছিল মাত্র। বন্দরে তার চুল্লি জ্বলছিল যার বাষ্প-তাপ অগ্নি-নিজ-সীমানায় বন্দী থাকতে নারাজ। বছরের পর বছর তবে কী নানা উপাদান সক্রিয় ছিল, শুধু কোন এক অনুঘটকের অপেক্ষার্থী— যেটুকু সময়মত আবির্ভাবের ফলে আতস-বাজি শুরু হয়ে গেল? তার ঝলকে চোখ আর দেখার পথ পায় না। আশপাশে যারা থাকে তাদের রুটিনে ব্যতিক্রম ঘটনা সব ওলটপালট এত দ্রুত সম্পন্ন করে যে হিসাব থেমে যায়, অনুমান কূল হারিয়ে ফেলে।

সামান্য ঘটনা। কিন্তু সামান্য নয়। পেছনে প্রস্তুতি ছিল বৈকি। নচেৎ এমন কাণ্ড কখনই ঘটতে পারে না। যন্ত্রমানব— যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি মানব, ইঠাং রক্তমাংস নির্মিত মানবে পরিণিত হবে— এ কি বিশ্বাসযোগ্য, না বিশ্বাস করা যায়? হারেস সলিম মুনশীকে বেইজ্ঞত করেছিল। “পনর বছর আপনার গোলাম— গোলামের মত মেহনত করেছি— তার কি কোন দাম নেই, বেতন নেই?” হারেসের মুখ থেকে এই উচ্চারণই ত মনিবের পক্ষে চরম অপমান, তার আভিজাত্য ও আত্মসম্মানের পরম অবমাননা। এমন উচ্চারণ মনিবের কানে অবিশ্বাস্য। জন্মহাবা কি করে এমন উচ্চারণ করতে পারে?

কিন্তু কার্যতঃ ঘটেছিল আরো প্রচণ্ড ধরনের বেইজ্ঞতি। তা যথাস্থানে বর্ণিতব্য। শুধু এইটুকু স্মরণ রাখলেই চলবে, কথাগুলো উচ্চারণের পর হারেস আর দেবী করেনি। সে এক দৌড়ে তার নিজের ঘরে এসে খাঁচায় বন্দী পাখিকে ছেড়ে দিয়ে নিজেও রাত্রির অন্ধকারে গায়েব হয়ে গিয়েছিল।

এলাকা ছেড়ে পালানোই তখন মুক্তি এবং যত দূরে দূরে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। সেই পথের হৃদিস অবিশ্যি বিচিত্র। মুক্ত আকাশে তলায় স্বয়ং নিজের প্রভু সাজা রাতারাতি ত সহজ নয়। খেয়াঘাট, জনপদ তিনদিনে বহু দূরে ছিটকে পড়েছিল হারেস। শেষে এক নগর-অভিমুখী পথিকের দলে সে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। তার গুদামঘরে কিছু পয়সা ছিল। খোঁয়াড়ে গরু ধরে দিলে, ইজারাদার ধরাট বাবদ পয়সা দেয়। পনের বছরে সঞ্চয় মাত্র কয়েক টাকা। তা নিতে ভুল করেনি হারেস। পয়সার কদর তার কাছে স্বাভাবিক আর দশ জনের মত প্রতিভাত হয়েছিল। বিচিত্র ব্যাপার অবিশ্যি।

তার ত গন্তব্য ছিল না। কথাবার্তায় আলাপ। একদল লোক। তারা এক সভায় যাচ্ছে। কৃষক সমিতির সভা। কৌতূহলী হারেস আর বেশি কথা বাড়ায়নি। সে-ও সভার সামিল হয়েছিল। দলে পথে একটি মানুষ তার প্রতি কেন জানি আকৃষ্ট হয়েছিল। তার নাম ঠিকানা জেনে যায় হারেস। হারেসের ঠিকানা অপর পক্ষ জানতে চায়নি। জিজ্ঞেস করলে, কি জবাব দিত, বহুদিন হারেসকে এই প্রশ্ন বেশ অস্বোয়াস্তির মধ্যে চুবিয়ে রেখেছিল। দশ জনের দলে থেকে বক্তৃতা শোনা একদম নতুন নয়। কয়েক বছর আগে সে এক জনসভায় হাজির ছিল। এইটুকু তার বেশ মনে আছে।

আনমনা হারেস।

হঠাৎ অজানিত আনন্দে তার বুক ভরে উঠে, অথচ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎই তখনকার সঙ্গী। শোনিতির কল্লোল-ধ্বনি-শিলীভূত পথচারী গুহম্মানবের কোন না-মেটা আকাক্ষার অস্পষ্ট প্রতীক-মূর্ছনা-তরঙ্গে হিল্লোলিত করে ইতিহাসের যাত্রা-পথ অ্যাকুলতা-দীর্ন আত্নাদ মানে না; কোমল ঝিল্লী-বেষ্টিতে হৃদয়কে জানেনা; গভীর সম্মোহনে তার ত্রুসর্পিলা রেখা পরিচয় তবু হৃদয়ের বিগ্রহ-ই ছড়িয়ে যায় কাল নির্জন বিজন পথ-প্রান্তে যুগ-সন্ধি মন্ডলের মারী-কৃষ্ণ কান্তারে কান্তারো। হে হজরত আদম, আমরাও শুনেছি প্রপিতামহের মুখ থেকে-মানবের আদি পিতা তুমি। শ্বনিচ্যন্ত ধরিত্রীর রক্ষ শক্ত ভূমির উপর উলঙ্গ নিষ্কিণ্ড। সেদিন বেহস্তের তরুলতা সঙ্কোচে পলায়মান তোমাকে সামান্য কঙ্ককের ঋণ দিতেও তীব্র ঘৃণা। আল্লার লানতে ভৈরব রুদ্ররূপে নিকটে তুমি লাঞ্ছনা-পর্যদুস্ত। প্রপিতামহের প্রবাদেই মুখর, আল্লার রহমত করেছিল। তোমার ত্রন্দন-জিৎ বন্দেগীর বিনিময়ে। আবশ্বামীর জিজ্ঞাসু নয়নের দিকে চোখ মেলে চাও হে পিতা, আদম। পেয়েছিলে তুমি আল্লার রহমত? তোমার লানৎ-অভিশাপের হলাহল-সংক্রমণ নেই, তোমার গোলাম বংশধরের রক্তে নেই? তবে কেন জোয়ারীর এক দানা জোটেনা আমাদের জঠরে। কেন আমাদের কটী-তট পায়না বঙ্কল পরিমাণ চীন বসনশোভা। তোমার অভিশপ্ত বিবস্ত্র দিনের স্বাক্ষর আমাদের শান্তি-ক্ষত শরীর। রোগ-ক্রিন পাড়ুর বেলায় পৃথিবীর রঙিন মেওয়া— আমাদের লুদ্ধ ঠোট থেকে সরে যায়। তোমার অতীত-লাঞ্ছনার স্বাক্ষর-আমাদের অসহায় তৃষিত নয়ন। হে আদি পিতা, চোখ খুলে তাকাও, জবাব দাও তোমার অবিশ্বাসী বিদ্রোহী সন্তানদের। জবাব দাও।

সভা ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ঝড় উঠলো। বার শহরের পল্লী। একটা মাঠে মণ্ডপ বাঁধা হয়েছিল। ঝড়ের ধাক্কা এসে লাগে হোগলার চালের উপর। সভাস্থলে হটগোল শুরু হয়। চারিদিকে ইতঃক্ষিণ্ড নরমিছিল।

এই জনসমুদ্রে হারেসও ছিটকে পড়ে এক কিনারায়। তার সঙ্গে ছিল পথে চেনা এক কৃষক বন্ধু আরিফ। তাকে আর চোখে পড়ে না।

হারেস জোর গলায় ডাকল, আরিফ মিয়া। আরিফ মিয়া।

কলরব চারিদিকে। হারেসের কণ্ঠস্বর এখানে হারিয়ে যায় অরণ্য রোদনের মতো। আরো কয়েকবার জোর কণ্ঠে ডাকল হারেস।

ঝড়ের তাণ্ডব আর থামে না। বেশিক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। উপস্থিত জন-মণ্ডলী যে-যার গন্তব্যের স্রোতে বহমান।

হারেস হঠাৎ দৌড় আরম্ভ করল। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক আসে। হয়ত বৃষ্টি নামবে এখনি। স্থানুর মত আর অচলতা আঁকড়ে থাকা চলে না।

একটু এগিয়ে হারেস একটা কাটাখালের পাড়ে এসে পড়ল।

ভালরূপে চোখ মেলান যায় না। উন্মত্ত বেগে ধূলিকণা বাতাসের সঙ্গ-অভিলাষী। এক এক জায়গায় ঘূর্ণিবাতাসে নাকমুখ বন্ধ হয়ে আসে। তবু হারেস পথের রেখাটুকু একবার চিনে নিতে চায়। কাটা খালই বটে। দু-পাশে ব্যবসাকেন্দ্রের আভাস। পাটের গুদাম, কল-কারখানা। জনপল্লী নয় জায়গাটা হারেসের বুঝতে বিলম্ব হয় না।

হঠাৎ গন্ধ পায় হারেস। বমি চাড়া দিয়ে উঠে গলার ওপাশে। কাটা খালের পচা পানির গন্ধ। হারেস তা জানে না, তাই আরো জোরে দৌড়ায়। খালের নৌকার মাঝি-মাল্লারা হৈ চৈ শব্দ করে। হারেসের কানে আর কিছু পৌছায় না। চোখের কোণে বন্দী পথের অস্পষ্ট রেখাই শুধু তার কাছে একমাত্র সত্য তখন।

ঘড়ঘড় শব্দ শুনে হারেস একবার থামল। কয়েকটা গোরুর গাড়ি জোরে হেঁকিয়ে আসছে। পাশ কাটিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া উঠবে নেই। এখানে পথ খুব সংকীর্ণ। এক পাশে ঘেরাও দেওয়া একটা বটের চারা রাস্তাসে মাথা কুটছে চারিদিকে। তারই পাশে হারেস দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার দমকা বাতাস। কচি বটের ডালের ঝাপটা এসে লাগল মুখে। চোখের পাতায় ধূলার জ্বালা অনুভব করে হারেস। পেছনের দিকে তাকাল সে একবার। কালো আকাশ ভেঙ্গে মেঘের দল বন্য মহিষের মত ক্ষিপ্ত বেগে এগিয়ে আসছে। ধূসর ঈষৎ কালো, ঘন কালো আর কাজলা রঙের ফেনা সমগ্র আকাশ চত্বর ছেয়ে ফেলে। ঝঞ্ঝা-বৃষ্টির ভূমিকা শেষ হোতে আর বেশি বাকি নেই। গো-শকটের ঢাকার দ্রুত ফ্রেস্কার মিলিয়ে যাচ্ছে অতিক্রান্ত পথের ওপারে। ঝঞ্ঝার দমক পায়ের পেশী ধরে নাড়া দেয়। স্থির হোয়ে চলা বিপজ্জনক, বাম হাতের কনুই চোখের উপরে রেখে হারেস দৌড় দিল।

কয়েক মিনিট পরে অনুভব করে হারেস এই পথে সে শুধু একা। আর কোন সঙ্গী নেই তার। নেই থাক। বেপরোয়া হারেস দৌড় দিতে থাকে। বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি ঝরল ধূসর পথের উপর। হারেস কনুইয়ের উপর অনুভব করে পানির ছোঁয়াচ। চোখের জল তার ক্লান্ত নয়নের কন্দর থেকে বেরিয়ে এলো নাকি?

আরো জোরে বৃষ্টির দামাল প্রহরী হেঁকে উঠে। একটা আশ্রয় এখনই খুঁজে নিতে হয়। দু-পাশে তাকাল হারেস। একদিকে খালের ঢালু কিনারা। তার উপর বেপারীদের নৌকার মাঝি-মাল্লা কুটীরী ভেতর ঢুকে পড়েছে। মাঝি হালের উপরকার মাচান থেকে সৈঁধিয়ে পড়ছে নীচে। খালের পাড়ের উপর সওদাগরের গদি নেই আর। বিরাট কারখানার

ফটক। নেপালী দারওয়ান চোরা ফটক খুলে গুমটির ভেতর বসে আছে। বৃষ্টি পড়ছে। আর বাহুবিচার চলে না। হারেস এই জগতে অনভ্যস্ত মুসাফির। দ্বিধাগ্রস্ত ভয় লাগে তার। ফটকের গহ্বরে সে এগিয়ে যেতে সাহস পায় না। উত্তুঙ্গ চিমণীর সারি গম্ভীর অবয়ব আকাশের চড়াইয়ে আরোহণরত। সারা দিনের ধোঁয়াজাল যেন মেঘের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে আবার পিঞ্জর বন্দী হওয়ার লোভে ভ্রাম্যমাণ চারিদিকে। একটা চিমণীর দিকে হারেস একবার চেয়ে দেখল। কয়েকটা লোহার তার তীর্যক মাটির দিকে নেমে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। যেন বিদ্যুৎ অভিনব কালো রঙ পরে এই মাত্র ঝিলিক দিয়ে গেল। গোধূলী সন্ধ্যায় বিলীন হয়ে গেছে এতক্ষণ। নিরুদ্দিষ্ট সূর্যের অনুপস্থিতির আক্রোশে বর্ণ দরিদ্র ধূসর মেঘের দল সন্ধ্যার মুখ চেপে ধরে। তারই আর্তনাদের গোঙানি কি বাতাসে? হাত-পা আছড়ানোর আওয়াজ লৌহ ফটকের ওদিকে ভেঙ্গে পড়ে। না, এখনও কাজ চলছে। নাইট শিফটের কর্মব্যস্ততা ঝড়ের বিরাট সিফনীর বেসুরো অন্তরারূপে আচমকা স্তব্ধ পটভূমির উপর ব্যঙ্গধ্বনি ছড়িয়ে যায়। খট-খটাং-খট। পথের রেখা মিশে গেছে অন্ধকারে। চমকানো বিদ্যুতের বিবস্ত্র দীর্ঘ একটা অশথ গাছের ছায়া দেখা গেল নিমেষের জন্য। হঠাৎ সঁ সঁ শব্দ হয় হারেসের চারপাশে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সে, পত্রপূর্ণ একটা উড়ন্ত ডাল এসে লাগল আঙুলের ডোগায়।

বার শহর।

প্রতিবেশীদের গৃহদীপও জ্বলে না আর। শেষ হলো কী মহানগরের দরিদ্র আত্মীয়ের ঠিকানা?

অপরিচিত পথে হারেস থামে না। মাথা গুঁজার কোন আশ্রয় নেই এইখানে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি এল একবার। দমকা বাতাসে পাতলা বৃষ্টির কুয়াশা আবার সরে গেলো। হিম-শৈত্য ঝঞ্ঝা স্রোতে ভেসেছে জোয়ার-জলোয়ার মত। ক্লান্ত হারেস জুর আবেষ্টনীর গারদখানায় বাইরের নীল আকাশের ইশারা দেখল এই মাত্র। তবু চলা থামে না। এইবার ঝড়ের দোলা ঈষৎ মন্দীভূত; কিন্তু প্রপাত-ধারায় নামল বৃষ্টি।

হারেসের পরণে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। হাতে একটা লাল গামছা। প্রথম ঝাপটায় তার কাপড়-চোপড় বেশ ভিজ়ে গেছে। আর এক মিনিট বাইরে থাকা সম্ভব নয়। ভিজ়ে কাপড়ে রাত কোথায় কাটবে কে জানে? চমকানো বিদ্যুতের আলোয় হারেস দেখল, একটা কাঠের বেড়ার পাশ দিয়ে সে হাঁটছে। বেড়ার ওপারে কতগুলো ত্রুশ চিহ্ন, তার পরেই ছোট গীর্জার গম্ভীর পটভূমি। আর বিলম্ব করল না হারেস। একলাফে বেড়া পার হয়ে, কবরস্থানের ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভের উপর দিয়ে গীর্জার প্রাঙ্গণে পৌঁছল সে। বড় ক্লান্ত, হাঁফিয়ে উঠেছে হারেস।

বহু পুরাতন গীর্জা। ক্যাথলিক পাদ্রীরা বহুদিন আগে বার-শহরের পল্লীর পাশে এই আরাধনার আস্তানা গড়েছিল। গ্রামের ভেতর নমস্কৃত আর গরীব মুসলমানদের বাস। রুটির সঙ্গে ধর্মেরও একদিন যোগ ছিল। ধর্মযাজকেরা মানবপ্রেমিকের খোলস পরে বহু পূর্বে ধীরে ধীরে জয় করেছিল অধিবাসীদের হৃদয়। ধর্মের বীজ বুভুক্ষার উর্বর মাটিতে ফলবন্ত হবে, সে ভবিষ্য-দৃষ্টি শ্রমণদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের কথা। তারপর সৌর জগতের বহু নক্ষত্র খসে গেছে। জ্ঞানকারী যীশুর সঙ্গে আর

রুটির কোন যোগাযোগ নেই। অধিবাসীরাও ধর্মে মতিহীন। বছর দশেক আগে গীর্জা পরিত্যক্ত হয়েছে। আশপাশে গ্রামের লোক ত্রাণের আলো আর চায় না। স্থানীয় খ্রিস্টানেরা জীবিকার স্রোতে কোথায় যে ভেসে গেছে। গীর্জার পাশেই খাল। তার ওপারে লোহার কারখানা ব্ল্যাস্ট ফার্নেস, চিমনির উন্নত মস্তকের কাছে গীর্জার ক্রেস্ট লজ্জায় নুয়ে পড়ে। কারখানার মালিক নাগরমল ভাদুরিয়ার বিরাট সৌধের পাশে গথিক স্থাপত্যশিল্প নিতান্ত প্রাচীনতার দুর্গন্ধ ছড়ায়। নিরুদ্দিষ্ট জেসুট পাদ্রী আর তার মুরীদগণের অন্তর্ধান কী তারই প্রমাণ বহন করে না?

গীর্জার দরজা বন্ধ। 'এইলের' সম্মুখটা খুব প্রশস্ত নয়। একদিকে কতগুলো চড়ুই আর কবুতরের ডানা ঝাড়ার আওয়াজ অন্ধকারে আলোড়ন তোলে। হারেস বসে পড়ল ভাঙা চতুরের উপর। তার আগে আরো এখানে বিহঙ্গ-পলাতক এসে জুটেছে তা'হলে? হাসি পায় হারেসের। লুঙ্গি আর ফতুয়া ভিজে গেছে। অন্তত: সারারাত গায়ে দেয়া চলে না। হারেস কাপড় ছাড়ার কথা ভাবল। আর একটু দেরী করা দরকার।

আরিফের সঙ্গে আসার সময় সে তাকে দু-আনা পয়সা দিয়েছিল। বিকালে ছ'পয়সার মুড়ি কিনেছিল সে। আর খাওয়া হয়নি। বন্ধু কাছ-ছাড়া হোয়ে গেছে।

ক্ষুধার্ত হারেস মুড়ি খাওয়া আরম্ভ করল। গামছার উপর তার সতর্ক চোখ ছিল। তবু দু'একফোঁটা বৃষ্টি মুড়ির ভেতর সঁধিয়েছে। ঠাণ্ডা মুড়ির আশ্বাদ ভাল নয়। তার অভাব পূর্ণ করে ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়না।

বৃষ্টি ঝরছে ঝরঝর। গীর্জার ক্রেস্ট শিখর থেকে বৃষ্টি স্রোতে নেমে আসে। হারেস আনমনে মুড়ি খায়। ঠাণ্ডা লাগছে তার ভিজ্রু কাপড়ে। তাই তাড়াতাড়ি হাত চালায় সে। খাওয়ার শেষে সে গামছা পরল। লুঙ্গি ফতুয়া নিঙড়ে গীর্জার সম্মুখে ছোট দেয়ালের উপর মেলে দিল। বৃষ্টি শীকর এখানেও থামে না। নিরুপায় হারেস আবার এসে বসে পড়ল চতুরের উপর। ক্ষুধা মিটেছে, পানির পিপাসা এখনও মেটেনি। হারেস আবার উঠে পড়ল।

বৃষ্টি জল ক্রেস্টের উপর থেকে উত্তরের এক কোণে সশব্দে মাটির উপর আছড়ে পড়ে। আঁজলা পাতল হারেস। হিম আকাশের পানি পিপাসা মেটায় না শুধু, শৈত্যের বানও আনে হারেসের উলঙ্গ শরীরে। গীর্জার দরজার সোজাসুজি থামের এক কোণে হাত-পা গুটিয়ে হারেস যেন এবাদতে বসল। এখানে ঠাণ্ডা হাওয়ার কোন জলুম নেই।

মাঝে মাঝে শুধু বিদ্যুতের আলো হানা দিয়ে যায়। গীর্জার সম্মুখে কত ক্রুশের আবছা-মূর্তি। হারেস আর কোন দিন গীর্জা দেখেনি। গোরস্থানে কোন কথা-ই তার মনে উঠল না। ভাঙাচোরা কোন বড়লোকের বাগান বোধ হয়। হারেসের মনে হোলো গীর্জা নয়, পোড়োবাড়ি। চারিদিকে অন্ধকার। আশ্বস্ত হয় হারেস। রাত্রি-যাপনের কোন হাস্যামা নেই। পোড়োবাড়ির বাসিন্দা শুধু ভূত। হারেস প্রেতিনীর ভয় করে না।

সঁাতসেঁতে মেঝে। ঠাণ্ডা লাগে হারেসের। ঘুম ধরে না। আর্তস্বরা বৃষ্টির রাগিনী কেঁদে যায়। উপরে দুরন্ত কবুতরগুলো পাখা ঝাড়েছে। নীড় থেকে খড়কুটো, শুকনো বিষ্ঠা পড়ে। একবার পাখি-তাড়ানো শব্দ করল মুখে। গীর্জার ফটকের সোজাসুজি ছোট্ট আর একটা ফটকের মুখে অশথের ভাঙা ডাল ঝড়ে উড়ে এসেছিল। তারই পাতার সাহায্যে হারেস বিছানা রচনা করল। হাজার বৃষ্টি মাথা কুটলেও আর কোন অসুবিধা নেই তার।

প্রেতায়িত নির্জনতা। বাইরে বৃষ্টির মৃদু-নিনাদ। হারেসের ঘুম আসে না। অচেনা জায়গা। কাল কোথায় কাটবে তার? পথ-ঘাট চেনা নেই। হারেস কোন ভয় করে না। বুক তার হাল্কা মনে হয় না কোথাও। মুক্তির ঝঙ্কারে পাজরের হাহাকার ছিন্ন পত্রের মত উড়ে যাচ্ছে আজ। হোসেন জমাদারের দহলিজে গ্রামে এমনই রাত্রি কেটেছিল তার কয়েক বছর আগে। আজ কারো তোয়াক্কা রাখে না সে। হারেস অশথ পাতার উপর শুয়ে হাল্কা নিঃশ্বাস ফেলে। আকাশের অঙ্গন চুরমার করে আজ বৃষ্টি আসুক; হিমাদ্রির রুম্ম পাজর গুড়িয়ে আসুক হিমবাহ ছোঁওয়া আরণ্যক-প্রভঞ্জন। হারেস কারো কাছে বন্দী নয়। তার মাথার উপরে উঁচু শুধু নীল আকাশ। পাশ ফিরে চোখ বুজল হারেস।

বৃষ্টি এবার থেমে আসছে। টিপটিপ শব্দ গীর্জার প্রাঙ্গণে। ক্রুশতোলা অঙ্গনের তরুলতায়। নবজাত শিশুর হৃদস্পন্দনের মত টিপ টিপ ধ্বনি। সর্বসংস্হা ধরিত্রির প্রাণকন্দরের চঞ্চলতা যেন জেগে উঠেছে— টিপটিপ। স্বপ্নিল আবর্তে চোখ বোজা হারেস ঘুরে বেড়ায়। ঝিঁঝির একটানা ঐক্যতান নির্জন গোরস্থানের ভয়াবহতা আরো প্রসারিত করে। ঝুপ ঝুপ টিপটিপ। কয়েকটা ব্যাঙের ডাক, কয়েক মুহূর্ত পরে থেমে গেল। হারেসের চেতনায় কোন কিছু দাগ পড়ে না। আবার প্রকৃতির ষড়যন্ত্রের সবকিছু মন্ত্রণা সে যেন শুনতে পায়। তবে ঘুম আসে না কেন? পরিশ্রান্ত দুই চক্ষে ঘুম নামুক একবার। সারারাত্রি কী ঝিঁঝিরা জেগে থাকবে? বৃষ্টির করুণা ছাড়িয়ে দেবে অতন্দ্র আকাশ?

গন্ধ-বিস্মল মাতাল-রাত্রি স্বাপদের মত পা ফেলে ফেলে আসে।

চোখ মেলে অন্ধকারের পট-আবর্তনে হারেস দেখতে পায় : কষিত ভূখন্ডের উপর দিয়ে সে হাঁটছে, ফসলের বন্যায় শ্যামল মাঠ দিকচক্রবালের অভিসারে উন্মাদিনী। চেয়ে আছে সে। হারেস বুঝতে পারে না, তার চোখে ঘুম নামছে। ঝড়ের পর অরণ্যের সীমানা জুড়ে লীলা-গতি বাতাসের প্রবাহন। ঘুম, ঘুম।...

বৃষ্টিমাত আকাশ ছিঁড়ে লাল সূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে খালের উপর।

হারেসের ঘুম ভেঙেছিল খুব সকালে। এই জায়গার নির্জনতা তার কাছে অস্বাভাবিক। তাড়াতাড়ি সে বেড়া ডিঙিয়ে আবার খালের কিনারায় এসে দাঁড়াল।

জীবনে হারেস আর কোনদিন শহর দেখেনি। অবাক-বিস্ময়ে সে চোখ মুছে। গ্রামে লোকের মুখে মহানগরের বহু কাহিনী তার শোনা ছিল। কৃষক-পল্লীর বহু চেনা মুখ গাঁয়ের ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে চলে যায়; সে ত ছিল তার কাছে কাহিনী মাত্র। আজ সে নিজেই রূপকথার রাজকুমার। অবাক-বিস্ময়ে হারেস দৃষ্টির আকুলতা মেটায় মাত্র। না, দেখার তৃষ্ণা তার মেটে না। চিমণীর ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে, রেল গাড়ীর হুশ হুশ শব্দ আসে নিকট থেকে। একটা পোল দেখা যায় কয়েক শ' গজ দূরে। ট্রেনের ইঞ্জিন হুইসেল দিয়ে পার হয়ে গেল। মাল-গাড়ির একটানা বগীগুলোর চাকা খটখট শব্দ করে। নানারূপ শব্দ, শুধু শব্দ চারিদিকে। বহুরূপী কথকের কথকতা চলছে দিকে দিকে। এই কী মহানগর? শ্যামলিমার সঙ্গীতে অভ্যস্ত হারেসের কানেও কিছু কটু লাগে না। আলফ-লায়লার জীবনের বাদশার দেশ। হজরত সোলেমানের তাঁবেদার কোন দৈত্যপুত্রী তোরণের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হারেস। পেছনে গীর্জার গম্বীর মৌন মূর্তি। পটভূমির গুহ্রমেঘ স্তরে স্তরে বাতাসে এলিয়ে দিচ্ছে শরীর। প্রিয়তমার কাছে দেহ-মনে বাঁধা পড়ার ছলে কোন ষোড়শী সুকুমারী

যেন এলানো অবয়বের সঙ্গে বসনের শাসন-শৈথিল্যরত। চার্চ-ইয়ার্ডে শ্বেত পাথরের ক্রুশ নেই। বর্ষার বিবর্ণ ভাঙাচোরা কাঠের ক্রুশ। এগুলো কবর, হারেসের বুখতে দেবী হয় না। আজ তা গা শিউরে উঠে না। কৌতূহলী দৃষ্টি তনুতনু করে কবরস্থান। মাটির উঁচু টিবির পাশে পাশে কোথাও দু-একটা নিঃসঙ্গ ফুলের গাছ ঝড়ে নুয়ে পড়েছে। পাতাপুতি উড়ে এসেছে কাল রাত্রে। দারিদ্র্যের ব্যঙ্গ এখানেও শাণিত। হারেসের হঠাৎ মনে পড়ে, এখানেও দীন-জন আছে নাকি। গ্রামের জমিদার আসকার হোসেনের কবর শ্বেত পাথরে মোড়াই করা কত সুন্দর। শহরেও আছে তাদের মত বিত্তহীন মানুষ। চাল-চুলো ছিল না এদের বোধহয়, তাই নির্জন বার-শহরের একটের জীবনের শেষ-বেলায় খড়-কুটোর মত আটকে গেছে। শহরের শোনা এতদিনের কাহিনী কী তবে স্রেফ বুটের জৌলুস। এই কী মহানগর?

কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে হারেস। লাল রঙের ব্রিজ এবার স্পষ্ট দেখা যায়। হারেস কৌতূহল মেটাবার জন্য এগিয়ে গেলো।

খালপাড়ের পথ সংকীর্ণ। কাঁচা মাটির সীমানা শুরু হয়েছে। কয়েক পা গেলে পথের বাঁক গিয়ে মিশেছে একটা উঁচু-টিলা চারা খেজুরের জঙ্গলে। একটা উদ্ভত শিরীষের গাছে প্রভাত-বায়ুর আলোড়ন বাজে। হারেস এগিয়ে গেলো। হোক সরু পথ, বেশ পরিষ্কার ধবধবে। এমন বালি মাটির পথ, ইঁট-পাথরের রাজ্যে : উঁচু-টিবির পরে আবার সমতল পথের রেখা। শিরীষ গাছের সম্মুখে ক্ষুদ্র জলাশয়। নীল আকাশ স্নান করে স্বচ্ছ পানিতে। সবুজ দাম-ঘাসে ভরা পানির কিনারা। পাতিহাঁস একটু দিগুণ হয়ে ভাসছে। কাছে গেরস্থর ঘর আছে কোথাও। হারেসের দৃষ্টি-চঞ্চল। জলাশয়ের পরে পানভরা জলা-ভূমি, তারপর মাঠ, দূরে নারিকেলগাছের মাথা ছাড়িয়ে চিম্চিমি ধোঁয়া উঠছে। শুধু এইখানে বার-শহর থেমে যায়নি। জলাশয় থেকে বামদিকে কয়েক বিঘা জমি দূরে খড়ো চালের ঘর। একদল শূ্যর এইমুখে ছুটে আসছে। ডোম-চিমারের পল্লী বোধ হয়। শূকরের ভয়ে হারেস আর দাঁড়িয়ে থাকে না।

টেলিগ্রাফের তারে বসে দাঁড়াকাক কোলাহল করে। নামহীন লম্বা-লেজ একটা পাখী একাকিনী ডাকছে। হারেসের চঞ্চল দৃষ্টি হঠাৎ লাল ব্রীজের উপর থামে।

দূরে সিগন্যাল পড়েছে। গাড়ি থামার প্রতীক্ষা করে হারেস। হুশ-হুশ শব্দ নিকটতর হয়। ব্রীজের উপর ইঞ্জিন ছুটে এলো এক মুহূর্তে। স্তম্ভিত হারেস চেয়ে আছে। তার অচেতন মন মানুষের কারিগরি আর পৌরুষকে সালাম জানায়। বাতাসে আজ অচেনা স্পর্শ। পোড়া পেট্রলের গন্ধ এলো একঝলক। হারেস জোরে নিঃশ্বাস টানে। অস্থিরতায় স্নায়ুদল ক্ষেপে উঠে। এই মাত্র ইস্রাফিলের সিঙ্গা যেন বাজল, হারেসের ধরিদ্রী চুরমার হোতে থাকে সম্মুখে।

একটা লঞ্চ এলো ঘড়ঘড় শব্দ করে। হারেস অত কৌতূহলী নয়। গঞ্জের দিনে সে বড় স্টীমার দেখেছে নিজের চোখে। প্যাসেঞ্জারদের দিকে তাকিয়ে থাকে হারেস। কত দেশের না লোক এই নগর তীর্থে এসে জমছে। রেলিঙের ধারে একটা গৌরবর্ণ ছেলে বসেছিল। যাত্রার দলের গ্রামের ছেলে চন্দনার কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

লঞ্চের পেছনে ধোঁয়া ওড়ে।

হারেসের হাই ওঠে। এতক্ষণ মুখে পানি দেয়নি সে। খালের উঁচু-নীচু পাড় থেকে সে

নীচে নামল।

কোন রকমে হাত-মুখ ধোয়া সারে হারেস। লোনা পানি মুখে রাখা যায় না।

চোখের পাতা বুজে উপরে পানি ছিটিয়ে নিল সে। তন্দ্রাহীন মহানগর জেগে উঠেছে সর্বচক্ষু মেলে। ফ্যাক্টরীর হুইশেল বাজছে দিকে দিকে। সূর্যের বিসর্পিল রশ্মি ক্লাস্তিহীন উত্তাপ ছড়ায় রাত্রিজাগা গৃহস্থী মজুরের চোখের উপর। ব্রীজের উপরে রাস্তার পথিক অনেক। পুলের তলা দিয়ে খাল পাড় এগিয়ে গেছে। নিঃসঙ্গতা হারেসের আর ভাল লাগে না। ক্ষিধে লাগছে। গ্রাম থেকে যে মানুষেরা মহানগরে আসে, তাদের সঙ্গে পরিচয়ের লোভ পদে পদে। হারেস রেলের বাঁধ ধরে উপরে আরোহণ করতে লাগল। বহু আরোহীর পায়ের দাগ রয়েছে চারপাশে।

পুলের উপরকার জগত হারেসের কাছে আরো বিচিত্র লাগে। এতক্ষণ সুড়ঙ্গপথে সে যেন হাঁটছিল। উপত্যকার কোন সংবাদ তার জানা ছিল না। যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু কলকারখানার চিহ্ন। চিমনির গায়ে যেন দিকচক্রবাল হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে। উত্তর পার্শ্বে রেলওয়ে ইয়ার্ড। বগী টানাটানি আর ইঞ্জিনের দৌড় দেদার দেখা যায়। কোথাও হঠাৎ স্টিম ছাড়ার ভাঙ-শ শব্দ হয়। হারেস চংমং করে।

একটা রেলিং-এর উপর সে কিছুক্ষণ বসে রইল। উন্মুক্ত দৃষ্টি শুধু অহেতুক চলে, দিক পরিবর্তন করে আবার বিস্ময়ের তীব্র মাত্রায় বোবা হয়ে যায়। এই কী মহা-নগর?

পুলটা কচ্ছপের পিঠের মত, দুই দিকে ঈষৎ ঢুঁ। ইঞ্জিন আরোহণের দৃশ্যটা তাই মনোরম মনে হয়। প্রথমে হেড লাইটের দুই চক্কু যেন একটি করে, তারপর ইঞ্জিনের অন্যান্য অবয়ব ভেসে উঠে পুলের সমতলে। এককয়েকটা ইঞ্জিন গমনাগমনের ছবি হারেস দুই চোখে ঐঁকে নিল।

অকস্মাৎ চমকে উঠে হারেস। পুলের ওপর থেকে হল্লা শোনা যাচ্ছে। কালো মানুষের মূর্তি একসঙ্গে অনেকগুলো দেখা যায়। শোরগোল আরো বাড়ে। হল্লার মাঝখানে আবার জুড়ি-গান শোনা গেল। কৌতূহলী হারেস চেয়ে থাকে।

একদল লোক আসছে। তার সম্মুখ দিয়েই তাদের পথ। পরনে নীল প্যান্ট, গায়ে হাফ-শার্ট। পায়ে কারো জুতা নেই। হারেস চেয়ে আছে। মানুষ এত কালো। একজন হাসছিল। মনে হবে মুখপোড়া হনুমান দু'পায়ে হাটতে শিখে এইমাত্র দাঁত বের করেছে। সারবন্দী দল আরো নিকটতর হয়।

হারেস অবাক। বোধহয় কাজ থেকে ফিরছে এরা। এত কালিঝুলি সর্বাত্মে! তবু শোরগোল কমে না। একটা পোড়া বিড়ি হারেসের সম্মুখে এসে পড়ল। দলের ভেতর থেকে কে একজন ছুঁড়ে আর কী। হারেসের ভাল লাগে না এই হল্লোড়। এমন ইতর মানুষ এরা। হাবার মত সে চেয়ে থাকে কেবল।

দলের একজন চলার সময় বলে, সকালে গামছা কাঁধে বসে আছ যে।

হারেস জবাব দিতে চায়। সে ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। পেছন থেকে একজন গান ধরে:

রাত বারোটা বসে বসে

পোড়ারমুখো এলো শেষে....

দলের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত গানের কলির দোহার আর থামে না। হারেসের কানে এসে বেঁধে, রাত বারোটো বসে বসে... ..

এমন ইতর মানুষ সব। যেন্নি চেহরা, তেন্নি ব্যবহার। মনে মনে হারেস বিরক্ত হয় খুব। গায়ের লোকেরা এর চেয়ে ঢের ভালো। তাবে গাঁ-ছেড়ে আসে কেন কিষাণেরা? এক বছরে কত চেনা লোক যে তার গ্রাম ছেড়েছে। মুনশীদের মামুদ, মাঝপাড়ার কিরণ, চৌধুরীদের সাজেদ, হাসীব আরো বহু চেনা মুখ। এই বুঝি শহরের মানুষ! আজই গ্রামে ফিরে যাবে সে। কি লোভে মীরগাঁয়ের লোক শহরে পড়ে আছে?

হারেস উঠে পড়ল।

ব্রীজের সম্মুখে পথ স্টেশনের দিকে হারিয়ে গেছে। জন-সমাগম এই দিকে আরো বেশি। হারেস গ্রামের পথ চায়। তাই আবার থমকে দাঁড়ায়।

কিন্তু কোন্ গ্রামের তার গন্তব্য থামবে?

তার প্রতিপালক সলিম মুনশীর আশ্রয় ত সে নিজেই পায়ের ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে। আরো গ্রাম আছে, তার নিজের জন্মভূমি গ্রাম। হারেসের কাছে ঝাপসা ঠেকে অতীত শৈশবের কথা। গ্রামে জীবিকার কি উপায়ই-বা খোলা আছে?

হারেসের মন মুষড়ে যায়। পথঘাট সে আদৌ চেনে না। আরিফের সঙ্গে দু'দিন হেঁটে এসেছিল সে। আরিফকেও আজ খুঁজে পাওয়া দায়। তার ঠিকানা মনে আছে। কিন্তু একদিনের পরিচয়ে বন্ধুত্বের দাবী করতে পারে সে? চিন্তার বুদ্ধি খেলে যায়।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশের নীল উবে গেছে। সোতাসের আলোড়ন থেমে গেলে এক-একবার নীল আকাশের ইশারা পৃথিবীর মানুষের চোখে ধরা পড়ে। হারেসের ভাল লাগে না কিছুই। ক্ষুধা আরো বাড়ছে। মাত্র ছুট্টা পয়সা আছে পকেটে। বিনা আহারে হেঁটে হেঁটে গ্রামে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

হারেসের মনে হলো সে ভিক্ষা করবে শহরে। পরমুহূর্তে আত্মধিকারে তার মন ভরে ওঠে। হাত পাতবে সে এমন পাট্টা জোয়ানের চেহারা নিয়ে।

নেই ভিক্ষা করুক সে, তবু গ্রামে তাকে একদিন ফিরে যেতে হবে।

হারেসের সামনে একদল মজুর পথিক। এরাও দল বেঁধে চলেছে, কিন্তু এই মজুরদের অবয়ব শান্ত। কোন দামালপনার চিহ্ন নেই মুখে।

হারেসের নিকটবর্তী হওয়া-মাত্র সে একজনকে জিজ্ঞাসা করে, এখানে কোন কাজ পাওয়া যাবে?

—কি কাজ চাও তুমি। ঘরামির কাজ জানো?

—খুব।

মাঝবয়সী লোকটা। একটা কাটারী হাতে। ছোটকরে দাড়ি ছাঁটা তার। পরনে দোতা-করা ধুতির তহবন। হারেসের দিকে সে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ!

—তোমার বুঝি কাজ নেই?

—আমাদের সঙ্গে চলো। আজ লোক কম আছে। মিস্ত্রীকে বলব। কাজ হবে। হারেসকে ঘিরে আরো কয়েকজন জটলা পাকায়।

—এ কে, মিস্ত্রী? জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নাম আলি।

—বেকার। কাজ নেই। তাই কাজের খোঁজে এসেছে।

আলি বলে, ভালো কাজ হবে কয়েকদিন। তোমাদের বাড়ি কোন জেলা।

—মেদিনীপুর। হারেসের সলজ্জ জবাব।

—তোমরা কা'দের?

—মমিন। আমার নাম হারেস।

আলি একটা বিড়ি ধরিয়ে দু-টান মেরে হারেসের হাতে দিল। খাও ভাই।

—আমাদের বাড়িও মেদিনীপুর।

হারেস আত্মীয়তায় গলে পড়ে। বিড়ি টানতে থাকে সে।

—আর দেরী করো না। চলো। মেট-মিস্ত্রী (বড় মিস্ত্রী) আজ শিগগীর আসবে।

পিপাসা ক্ষুধা দুই এক সঙ্গে হানা দেয়।

পথ চলার সময় সে বলে: আলি মিয়া, রাস্তায় মুড়ি খেতে পাব? সকাল থেকে কিছু খাইনি।

—আহা খেয়ে আসো নি। চলো। রাস্তায় মুড়ি পাওয়া যায়।

আবার লাল ব্রীজ পার হয়ে এলো তারা। গ্রীষ্মের সূর্য আপন মহিমা বিস্তার করে। হারেস মাথায় গামছা বাঁধে। বড় চড়া রোদ্দুর। পূর্বের দিগঙ্গন ঝলমল করে।

—আচ্ছা মীর গাঁ শহর থেকে কতদূর?

বাসেদ বলে, সেখানে তোমার বাড়ি নাকি?

হারেস ইতস্তত করে, পরে বলে, না এম্মি জিজ্ঞাসা করছিলাম।

ষোল-সতের ক্রোশ।

হারেস আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না। মুন্শীকে হয়ত এরা চেনে। মুন্শীকে সে কম অপমান করেনি, প্রতিশোধের দাঁড়িয়ে থাকবে সে। চুরি করে পালিয়ে এসেছি এমন বদনাম দিতে পারে। পুলিশের কাছে সংবাদ পৌঁছবে। যেমে উঠে হারেস।

আর কোন কথা বলে না।

আবার উত্তরাইয়ের পথ। বাঁধের ঢালু-পথে তারা নামতে থাকে।

হারেস মিস্ত্রীদের অনুসরণ করে।

বাঁধের কোলে পথ। তার পাশে একটা মুড়ির দোকান।

হারেস মিয়া, আলী ডাকে।

—কি ভাই।

ওই, বলিয়া আলী মুড়ির দোকানের দিকে আঙুল বাড়ায়।

—একটু দাঁড়াও, ভাই।

বাসেদের মুখে খই ফুটে: দাঁড়ালে চলবে না। তুমি মুড়ি কিনে নাও। গামছায় বাঁধো, তারপর খেতে-খেতে একদম কারখানা। সেখানে ভাল পানি পাবে। নাও, দেরী করো না।

হারেসের তীব্র উদ্যম দেখা যায় হঠাৎ। মুড়ির দোকানে বেশি বিলম্ব হয় না তার।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে সে ভাবে কত রোজ দেবে তা ঠিক করা হোল না। দেখা যাক।

বাসেদ, আলি ও অন্যান্য ঘরামিরা দ্রুতপদে চলে।

দেশলাইয়ের ছোট কারখানা। তারই কলেবর-বর্ধনের আয়োজন। কলের মালিক আপাততঃ খোলার চালের একটা 'শেড' তৈরি আরম্ভ করেছেন।

প্রায় পনর-জন ঘরামি। জন-পাঁচেক রাজমিস্ত্রী সারাদিন কাজ করে। খোলার ঘর হালেও কোণগুলো ইটের পিলার। তাই রাজমিস্ত্রীও এই যজ্ঞে বাদ পড়েনি।

চড়া রোদ্দুর উঠে আকাশ জুড়ে। চালে হারেস কর্মব্যস্ত। পুরাতন খোলা সাজানো হয় চালের উপর। সারা গায়ে সেই জন্য বেশি ময়লা লাগে। লুঙ্গির উপর বাঁধা লাল গামছায় ঝুল হোয়ে যায়। ঘামেও কম কষ্ট হয় না। হারেস আগেও ঘর ছেয়েছে মনিবের। আজ নতুন লাগে এই কাজ। খড় আর খোলার ভেতর কত ব্যবধান। গ্রামে খড়ের চাল-ছাওয়া অন্য রকম বিধি তার। মেটে গন্ধ ছড়ানো থাকে সেখানে। এক-একটা আঁটি ঝুলে বাখারীর নীচে পরিপাটি খড় বিছানো আর মাঝে মাঝে দড়ির গেরো দেওয়া— সে কাজ আজকের থেকে স্বতন্ত্র। এখানে পোড়া-মাটির নিয়ে কারবার। দাগ ধরা লালচে খোলার দিকে চেয়ে হারেস আরো শ্রান্ত হয়।

লম্বা-চওড়া শরীরের অনুরূপ কতটুকু খোরাক পেয়েছে সে আজ। গাঁয়ে অন্ততঃ দু'মুঠো ভাতের কষ্ট ছিল না। সাদা বরফের কুঁচির মত রাতের স্বপ্ন একবার হানা দিয়ে গেল হারেসের মনে।

খোলা বসানো কাজ হারেস জানে না। তাই প্রথমে সে জোগাড়ের কাজের ভার নিয়েছিল। বাখারী বয়ে আনা, মিস্ত্রীদের বুড়ি-মাথায় খোলা পৌছে দেওয়া, টাকিটুকি ফরমাশ শোনাই হারেসের কর্তব্য।

আলি বলে তুমি খোলা বসাতে জানো? হারেস আজকাল বাঁকা জবাব দিতে শিখেছে : অনেকদিন আগের অভ্যাস। দু-একদিন দেখলেই ঠিক হোয়ে যাবে।

হারেস সেই জন্য মিস্ত্রীদের কাজের দিকে চেয়ে থাকে। আনমনা হয় না সে।

মই বয়ে বারবার চালে ওঠার জন্য তার ক্লান্তি আরো বাড়ে।

বাসেদ মিস্ত্রী তামাকখোর। কলকে আর তামাক তার সঙ্গেই থাকে। হঠাৎ হাঁকে সে: হারেস, একটু তামাক সাজো ভাই, নিচে কলকে আছে।

চালের উপর হারেস এক বাঁকা খোলা নিয়ে বসেছিল। মিস্ত্রীদের হুকুম মারফি পৌছে দেওয়া। বাসেদ মিস্ত্রীর হাঁকে সে সন্তুষ্ট হয়। তবু খানিকক্ষণ নিচে বিশ্রাম পাওয়ার সুযোগ এলো।

বুড়ো আঁশফলের গাছ। গোড়াটায় পোকা ধরেছে। বর্ষার জল পোকা খাওয়া গর্ত ক্রমশঃ বাড়ছে। গাছের দুদিকের মোটা ছাল ঝুলে পড়েছে ঝালরের মত।

বাসেদ মিস্ত্রী তারই ভেতর তার ধূমপানের মাল মশলা লুকিয়ে রাখে। পূর্বদিকের চালেও কয়েকজন ঘরামি কাজে লেগেছে। নেশাখোরের সে-দলেও অভাব নেই। বাসেদ ইশিয়ার লোক।

আঁশফল গাছের ছায়ায় সে তামাক সাজে। একটা সাদা ঠোঙ্গায় একমুঠো কয়লা রয়েছে মাত্র। উপর থেকে বাসেদ মিস্ত্রী আবার হাঁকে, দু-তিনটে কয়লা দিস মাত্র, বাপ।

প্রৌঢ় লোক। এই সামান্য ইতর সম্বোধন হারেস গায়ে মেখে নিল। তুই শব্দ তার কাছে বড় তেতো লাগে।

কয়লা ধরে উঠে। হারেস গাছের ছায়ায় আনমনা বসে থাকে। ঝাঁঝী করছে বাইরে গ্রীষ্মের দুপুর। শিল্পজগতের আকাশ-ছোঁয়া, ক্রিন্ন। ট্রেনের হুইশেল, লোহা-পেটানোর আওয়াজ, সড়কে গরুর গাড়ির চালকদের হাঁকাহাঁকি। একটু শান্তি নেই। দশ মিনিট পরে যদি মিস্ত্রী একবার ডাক দিত!

কারখানার পাশে ঘন কলা-ঝোপ। পোড়ো জাঙালের মত বন্য আবহাওয়া। পাশ দিয়ে সরু সুরকীর রাস্তার দাগ চোখে পড়ে। তার ওদিকে বোধ হয় নির্জন পল্লীর সীমানা শুরু হয়েছে। কান পেতে হারেস শোনে। না, এই দিক থেকে ইতর কোলাহলের ঢেউ ভেসে আসে না। আঁশফল গাছের গুড়ি বয়ে এক-রাশ কালো পিঁপড়ে দল-বেঁধে নিচে নামছে। সকলের মুখে সাদা সাদা কোন আহর্ষের কণা। গাছের উপরে হারেস দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলো। কয়েক হাত দূরে আরো কয়েক লক্ষ পিঁপিলিকার বিরাট ছাউনি নিশ্চল বসে আছে। বিশ্রামের জন্য এরাও তাম্বু পাতে নাকি! ঈষৎ মোটা কয়েকটি পিঁপড়ে তার ভিতর স্থির উপবিষ্ট। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে হারেস। সেনাবাহিনীর বিশ্রাম দেখে সে। দু'মিনিট পরে আবার আলোড়ন সৃষ্টি হয়। গাছের বাকল এতক্ষণ চোখে পড়তো না, কালো দাগ ছাড়া। এখন গাছের ছাইরঙ সমতলের উপর কালো কালো সঞ্চরিত ফুটকী নেচে বেড়ায়। কালো পাথরের একটা চাং যেন পাহাড়ের গা-বয়ে ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে, ধসে পড়ছে।

হারেস, নিয়ে আয় বাবা কলকেটা।

চোখ ফিরিয়ে নিতে হয় হারেসকে। হঠাৎ চমকে উঠে সে। সলিম মুনশী তার আগেকার মনিব যেন এই মাত্র ডাকল। তারপরে শব্দ হোয়ে দাঁড়ায় হারেস। না, এখানে কোন মুনশীর চৌদ্দপুরুষ নেই। তবু চমকায় কেন সে? আত্মদিকার প্রশস্তি সে নিজেই রচনা করে।

স্বেচ্ছায় হারেস মইয়ের উপর ধীরে ধীরে উঠে। চালের উপর সে বাসেদ মিস্ত্রীকে কোন প্রশ্নের আগেই তার মুখ বন্ধ করে দেয়: আপনার কয়লা সামান্য ভিজে গেছে। গাছের গর্তে বৃষ্টির পানি জমে সঁয়াতসঁয়াতে হয়ে রয়েছে।

দাও বাবা, শিগগীর।

ধোঁয়া ছাড়ে বাসেদ মিস্ত্রী।

আর একবার নিচে যাও। বাখারিগুলো মুছে ফেলো। হা, তোমার কাটারী নেই। কিনে ফেলো একটা। মাতালের বোতল, ঘরামীর কাটারী। আমার কাটারী নিয়ে যাও, দেখো চটা না উঠে।

বাসেদ মিস্ত্রীর কাটারী সত্যি ধারাল আর চকচকে।

গাড়ি-গাড়ি পচানো বাঁশের স্তূপ পড়েছিল কারখানার প্রান্তরে। কয়েকজন ঘরামি এখানে বাখারী তৈরি করে। দীর্ঘ বাঁশের ফটফট শব্দ বেরোয়।

হারেস আর একজনের সাহায্যে একটা বাঁশের কাটারী বসিয়েছে মাত্র, চালের উপর থেকে আলিও নেমে এলো।

—এই দোস্ত।

হারেস হাসে পেছনে ফেরে।

—কি খবর ভাই।

—একটা বিড়ি খেতে এলাম। উপরে মিস্ত্রী রয়েছে।

আলি বিড়ি ফোঁকে, হারেস কাজে ব্যস্ত। দরদর ঘাম বইছে তার শরীরে।

—মা গাঁটওয়ালা বাঁশ বাবা।

হারেস একটা বাঁশের বাখারী তুলতে পারল না। কয়েক জায়গায় ভেঙ্গে গেলো তারপর সে মন্তব্য করে।

—একটান ফুঁকে নাও, ভায়া।

আলি আবার ডাকে। একটু বসো ভাই। মিস্ত্রীর এমন জব্বর কাটারী পর্যন্ত হার মেনে গেলো।

ইঠাৎ হারেসের মাথা ঘোরে! দুর্দান্ত পরিশ্রমের ভোগ সে সহ্য করতে পারে। আজ সহিষ্ণুতার সীমানা ক্রমশ : সংকীর্ণ হোয়ে আসছে।

আলির পাশে বসে সে বিড়ি ফোঁকতে লাগল। চোখ ধোঁয়া হোয়ে আসে তার। বাপ্পা দৃষ্টি পৃথিবীর সবকিছু অবিকল স্পর্শ করতে পারে না। খন্ড খন্ড প্রতিভাস চকিতে মিলিয়ে যায়।

নিজের দুর্বলতার কাছে হারেস হার মানে।*

—আলি-ভাই, আজ সকাল-সকাল একটু ছুটি দেবে না মিস্ত্রী। কাল থেকে পেটে দানাও পড়েনি।

বড় লজ্জা পায় হারেস। বাসেদ বিজ্ঞের মত মাথা দোলায়।

—ছুটি চেয়ো না। তুমি আমার সঙ্গে যোগাড়ে দাও। চুপচাপ বসে থাকবে।

হারেস কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি বিনিময় করে।

চলো, উঠে পড়ো। তাড়া দিল আলি।

তিন-গাছা বাখারী হাতে হারেস চালের উপর উঠে এলো।

—বাসেদ চাচা, হারেস আমার এদিকে থাক। তুমি কাসিমকে ডাকো। জোয়ান লোক দরকার আমার।

হারেস কোমরের গামছা বেঁধে এগিয়ে গেল। দুপুর ঢলে পড়ছে, এবার বিশ্রামের ছুটি।

হারেস একবোঝা বাখারীর উপর সটান লম্বা শুয়ে পড়ল। অন্যান্য মিস্ত্রীরা মুড়ি খায় আর গল্প করে। হারেসের ঘুম আসে না। শ্রান্ত দেহ শুধু এলিয়ে পড়ুক। ক্ষধার্ত পেশী-নিচয় শীতের সাপের মত বিশ্রাম পাক ক্ষণিক।

একটা রূপার চকচকে টাকা হাতে আঁশফল গাছের নিচে হারেস বিম্ময়ে চেয়ে থাকে। এতো অভাবনীয়। এক টাকা রোজ তার! তার নিজস্ব একটা টাকা রূপে রৌপ্য চাকতি সে এই জীবনে প্রথম দেখল। গাঁয়ে সারাদিন মুনিশ খেটেও ছ-আনার বেশি কেউ রোজগার করতে পারে না।

শহরকে নতুন চোখে দেখে হারেস। সকাল থেকে কত অভিযোগ ঘৃণা জমে উঠেছিল তার বুকে, সব নিমিষে মুছে যায়। হারেস ক্লান্ত মজুরদের অনুসরণ করে।

লেভেল ট্রসিং পার হয়ে একটা ট্রেন চলে গেল, ইঞ্জিনের ফিনকি আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। চিম্নীর ওপারে জমেছে বর্ণ-বিচিত্র মেঘ। গোখুলির আধো অন্ধকার পটে ঝাকড়া

শিরীষ গাছের অবয়ব কালো-রেখা-সমবিত। কোন ফুল নেই, পাতা নেই, এই গাছে যেন। শুড়ি থেকে দশ গজ দূরে মোটা দুটো ডালের খাড়াই, তার উপর বসে আছে একটা সঙ্গীহীন কাক। এই নীরহ বায়সও শুধু অবয়বে নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলে না। আবছায়ার ফাঁক দিয়ে স্তব্ধ আকাশ মৌন। নিচে মানুষের পৃথিবীর কোলাহলে-ঝিল্লীশ্বরে রাত্রির অভিনন্দন জানায়।

একে একে ফুটে উঠছে গ্যাসের আলো পথের প্রান্তে প্রান্তে। শিল্পকেন্দ্রের সায়াং-সঙ্গীত শ্রান্ত হারেসের কানে সম্মোহনীর মদিরা ঢালে। শান্তি, শান্তি। রূপার চাকতিটা সে ফতুয়ার ময়লা পকেটে বার বার আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে। গ্রামে আর সে ফিরতে পারে না। আশ্রয়দাতা সলিম মুনশীকে বেইজ্ঞত করে এসেছে সে। আর কোন আশ্রয় নেই। গ্রামের এত মায়াই বা কেন? জন্মভূমি। জন্মভূমি তার কাপড় যোগাতে পারে না, পারে না উদরপূর্তি দুমুঠো অনু দিতে। ভিখারিনী মা স্বামীর ভিটের মায়া কাটিয়েছিল। গোলামীর মমতা পরিত্যাগ তার পক্ষে আরো সহজ, আরো সহজ।

খাওয়ার সময় চলে গেছে। ক্ষুধাপাসা পর্যন্ত এখন বিশ্রামরত। শুধু শরীরটা মাটিমাটি লাগছে। আর কোন কষ্ট নেই হারেসের। নিমাস্তিনের পকেট কটি-তটে এক ভরি রূপাসহ দুলছে। তার ভেতর হাত পুরে দিল হারেস। যদি পথে সারাদিনের রোজগার খোয়া যায় কল্লিত আশঙ্কায় তার মুখে কাল দাগ পড়ে।

আলি, বাসেদ, শুকুর আরো ঘরামীর কেউ হারেসের সম্মুখে, কেউ পেছনে। সকলেই নানা কথায় ব্যস্ত। হারেস শুধু নিস্তব্ধ। সে আজ অস্থিতকেন্দ্রিক উর্গায়। জাল বুনে চলেছে সীমানাহীন। অথৈ জলে ঘূর্ণায়মান নৌকার মত পাকনা-খাওয়া স্রোত স্রোতান্তরে সে শুধু দিক সামলায়।

আবার লাল ব্রিজের বাঁধ। সন্ধ্যাটেকে গেছে ব্রিজের রঙ। মাথার উপর দুটো লাল নক্ষত্রের মত ছোট আরো সংকেতের নিশান খাড়া করে রাখে।

ব্রিজ পার হয়েছে আরও অনেক দূর আনমনা এগিয়ে এসেছে হারেস ঘরামিদের সঙ্গে। কিন্তু কোথায় চলেছে সে? নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মত প্রশ্নটা তার মেরুদণ্ডে একবার নাড়া দিল।

আলি হঠাৎ উদ্ধার করল তাকে।

—তোমার বাসা কোন্ দিকে, হারেস খুব পরিচিত হৃদয়তার সুর। বহুদিন-কার চেনা যেন হারেস।

আমার বাসা।— হারেসের মুখে আর কথা ফোটে না। সলিম মুনশীর সামনে যেন সে দাঁড়িয়ে আছে।

— তোমার বুঝি বাসা নেই। রাত্রে বাসা ঠিক করে নাও।

আলি দুইহাতের হাসি হাসে। হারেস এই রসিকতার কিছুই উপলব্ধি করে না।

—না ভাই। আমি মোটে কাল দেশ থেকে এসেছি কি না। চূপ করল হারেস। আলি চলার সময় একটা বিড়ি ধরায়। বাসেদ মিস্ত্রী সকলের আগে আগে।

—তোমার বাসা নেই। বেশ লোক ত। এসেছ শহরে। এখানে মাঠ ঘাট নেই যে পড়ে থাকবে। পুলিশে ধরবে।

পুলিশের নামে হারেস আতঙ্কিত হয়। বোবা শিশুর মত সে আবার নিজেকে অসহায় মনে করে। বাইরে ঘুমানোর জন্য লাল-পাগড়ীর সুনজর উপভোগ করতে হয় শহরে।

রেলওয়ে ইয়ার্ডে হাজার পাওয়ারের ফ্লাড-লাইট জ্বলছে। শান্টিং-এ যাচ্ছে গাড়িগুলো। দিনের আলোর মত কাজ চলছে চারিদিকে। বিশ্রাম ভুলে গেছে মহানগরের মানুষ। সমগ্র শহর এখনই হারেসকে গিলে ফেলবে বোধ হয়। না, আর এই দানব-পুরীর কুভানলে এক মুহূর্ত নয়। নিমাস্তিনের পকেট কটি-তটে জানান দেয়। টাকার উপর আঙুল চালায়, খানিক পরে পরে মুখ খোলে হারেস।

—পুলিশে ধরে, সত্যি?

—সত্যি নয় ত ঝুট। রাতে যদি চুরি করতে বেরোও।

—তৌবা!

আলি উচ্চাস্বরে হাসে, তৌবা! একদম সত্য পীর। তোমার মত যদি চোরও তৌবা বলে।

—তা হোলে আজ ইস্টিশনে রাত কাটাব।

—সেটা মন্দ যুক্তি নয়।

আলি সহজে দমে না। ইস্টিশনে পুলিশও আছে। গাঁট-কাটাও আছে। সে ত আরো জ্বালা। গ্যাসের আলো পড়ে হারেসের মুখে। আলি সেদিকে তাকায়। কালো কুয়াশা লেপা মাঠের মত হারেসের মুখাবয়ব।

—শোনো। শহরে কোথাও সহজে রাত কাটানো চলে না। তবে একটা জায়গা আছে

নিজের বাক্য অসমাণ রাখে আলি। উৎসুক হারেস জিজ্ঞেস করে, কোন জায়গা?

—সে তোমার দ্বারা হবে না। আমি নেহায়েৎ গের্ইয়া।

হারেস কথাটা গায়ে মেখে নিল। অবিশ্যি রাগ হয় তার। তার অজ্ঞতার সুযোগ নিতে আলি কসুর করে না।

—তবে এক কাজ করো, আজ আমাদের ওখানেই চলো।

আলিকে বোঝা মুশকিল। হারেসের চোখে সে একটা গোলক-ধাঁধা বিস্ময়। অথচ দিলখোলা মনে হয় তাকে। তার প্রমাণ সে নিজেই দিতে বিলম্ব করে না।

—তোমাকে নিয়ে রগড় করা যাবে। আর কখনও শহরে আসনি। বেশ লোকত। অথচ মেদিনীপুরে বাড়ি।

হারেস বলে, গরীব মানুষের ছেলে। আমাদের অত সখ কিসের?

—রাখো বাজে কথা। আমি মিস্ত্রীকে বলছি।

আলি এগিয়ে গেল দ্রুতপদে। দুমিনিট পরে সে আবার হারেসের সামিল হয়।

—দোস্ত। কেব্লাফতে। মিস্ত্রী বলে, ভাল-ই হল। বাসার ভাড়া কমে যাবে।

বাসেদ এই দলে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। ঘরামির কাজেও নিপুণ। এই জন্য সকলে মিস্ত্রী বলে ডাকে।

—বাসাটা মিস্ত্রীর। তাই একবার জিজ্ঞেস করে নিলাম।

ভারী উপকার করলে।

কৃতজ্ঞ হারেস আলির দিকে চোখ ফেলে না। আনমনা তারা শহরের অভ্যন্তরে এসে পড়েছে কখন, সারি সারি গ্যাসপোস্টের আলোকমালায় আলি হঠাৎ অনুভব করে।

—হারেস, আর বাসা ফিরতে দেবী নাই। তোমার কটা জিনিষ কেনা দরকার। একটা মাটির বাসন আর পেয়ালা।

—কি হবে?

—ভাত খাবে না? না, চোরের ভয়ে তুমি মাটিতে ভাত তরকারী ঢেলে খাবে।

হারেস লজ্জিত হয়।

—তোমার আরো দুটো জিনিস দরকার। গামছা। ঘরামির কাজে হরদম লুঙ্গি পরে চলে না। যা ময়লা উঠে।

হারেস সম্মতি দিল। গামছার দাম দেওয়ার সময় হারেসের কষ্ট হয়। ছ'আনা ছ'গণ্ডা কড়কড়ে পয়সা দোকানদার কেটে নিল। ক্যাশ-বাক্সের দিকে হারেস চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তামার পয়সায় পকেট আরো ভারী হতে থাকে। সেইটুকুই সান্ত্বনা।

দোকান থেকে বেরিয়ে আলি বলে, এক পয়সার বিড়ি খাওয়াও, দোস্ত।

হারেস একটা তামার পয়সা বের করে দিল। হঠাৎ দরাজ হয়ে উঠে না তার মন। আলির পাল্লায় পড়ে তার রোজগরের আনন্দ মাটি হয়ে যাচ্ছে।

কুমোরের দোকানে আর দু'আনা গেল।

গলির মুখে এসেছে তারা, আজও বৃষ্টি নামল না বরষার শব্দে। হারেস আলির দ্রুত পদক্ষেপের উপদেশ পালন করে। দৌড়ে কোন্সি লাভ এই। দু-ঝলক বৃষ্টির ছোঁয়াতে দু'জনেই বেশ ভিজ়ে গেল।

—গোসল হোয়ে যাক। দুপুরে বাড়ি ফিরেছি।

আলি বলে।

হারেসের কোন আপত্তি নেই। তার বাড়তি কাপড় কোথায়, সেজনেই একটু অশ্বোয়াস্তি।

কোন পথই চেনে না হারেস। গোলক-ধাঁধার মত অন্ধকার পথে তারা চলে।

আবার দেখা যায় ইলেকট্রিক আলো। হারেস চেয়ে দেখে সম্মুখে একটা মসজিদ। খুব জরাজীর্ণ হোলেও ভেতরে চুনকামের জৌলস রয়েছে। কয়েকটা ঝাড়বাতি ঝুলছে। ইলেকট্রিক বাব্ব জ্বলছে মসজিদের দরওয়াজায়। ইমাম সাহেব কোরান তেলাওয়াত করছেন। আল্লাহো আলা কুল্লে সাইয়িন কাদীর... হারেসের কানে স্পষ্ট তার প্রবাহ-নিদাদ।

এইখানে কী তাদের গন্তব্য শেষ?

আলি হারেসকে নিয়ে মসজিদের পাশে আর একটা আন্ধা-গলির ভেতর ঢুকলো।

মহানগরীর অট্টালিকা শ্রেণী বিদ্যুতের আলোয়-আলোয় সমুজ্জ্বল। চাঁদের আলো এখানে থমকে দাঁড়ায়। বিধি-নিষেধের বেড়ি ভীত প্রকৃতি। মানুষের দম্ভ ইটে-ইস্পাতে মূর্ত হচ্ছে দিবারাত্রি। সকলের জন্য এই দম্ভ নয়।

বাসার ভেতর ঢুকে হারেসের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এইখানে আদমের সন্তানেরা

বাস করে? আটফুট বাই ছয়ফুট ছিটে বেড়ার কামরা। তারই ভেতর সাতজন প্রাণীর মাথা-গোঁজার ঠাই!

বাসেদ মিস্ত্রী আগেই পৌঁছেছিল। সে হারেসকে প্রথম অভিনন্দন জানাল: এসো। কাপড় খেঁড়ে ফেল। একদম ভিজে গেছ যে। ভাল, তোর একটা হেঁড়া লুঙ্গি দে, বাবা।

কাপড় ছাড়তে লাগল হারেস। চোখ তার খোলা থাকে। ছোট খোলার ঘর। নিচে শ্যাওলা লাগে। এইজন্য কয়েকটা দরমা বিছানো মেঝের উপর। একদিক খালি পড়ে রয়েছে।

বাসেদ মিস্ত্রী বলে, হারেস তোমার মাথার উপর দুটো দরমা রয়েছে। বিছিয়ে নাও। বোঝা যায়, সারাদিন দরমা বিছানো থাকে না। স্নাতকস্নাতক মেঝেয় কদিন বা দরমা টিকবে। ঘরামিরা কাজে যাওয়ার সময় আবার দরমা উপরে কড়ি-বাঁশে তুলে রাখে। এ-ঘরে কড়িকাঠ নেই। সেইজন্য কড়ি-বাঁশ!

টানা দড়ির উপর আরো অনেকের কাপড় শুকাচ্ছে। হারেস নিজে আর্দ্র বসন হাতে ইতস্ততঃ করে, নিংড়ানোর জায়গা খুঁজছে সে।

বাসেদ মিস্ত্রী হুঁশিয়ার লোক। বলে: যাও বাইরে কাপড় নিংড়ে এসো।

উপদেশ অনুযায়ী হারেস বাইরে দাঁড়িয়ে জরিপ করে চারিদিক। এই বাসার পাশে আরো দুটো খোলার ঘর। কিন্তু এক চৌহদ্দি ঘেরা। একটা সদর দরজাও আছে। চট বুলছে। আলির সঙ্গে আসার সময় অন্ধকারে এই পথেই সে এসেছিল। উঠোন নেই এতটুকু। দেড়হাত চওড়া হবে না বাড়ির ভেতরকার পথ। সম্ভবতঃ উঠানের অভাব এই সংকীর্ণতার ভেতর মেটানো হয়। একটা বুড়ো পৈয়ারা গাছ দেওয়ালের পাশ দিয়ে উপরে বিরল ডালপালা মেলে দিয়েছে। তার গুঁড়ায় কয়েকটা ভাঙ্গা কলস উপড়-করা।

বৃষ্টি তখনও থামেনি। প্রতিবেশীদের ঘরে আলো জ্বলছে। তাদের দাওয়া আছে ঘরের। বাসেদ মিস্ত্রীর বাসায় সে সন্দের বালাই নেই। চরম দীনতার এইদিক হারেসকে পীড়িত করে। গরমের সময় সে ঘুমোবে কোথায়? ঐ ঘরে জানলা নেই, দাওয়া থাকলে চলত, তা থেকেও আত্মার মরজী তারা বঞ্চিত। প্রতিবেশীদের হিংসা হয় হারেসের। সৌভাগ্যবান বটে ওরা!

ঘরের এক কিনারায় উঠান-চুলায় রান্না চলে। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া বহুক্ষণ ঘিরে আছে আনাচে-কানাচে। নিঃশ্বাস-গ্রহণে হারেস বুঝতে পারে। ক্ষুধায় অবশ শরীর। হাঁড়ির দিকে চেয়ে স্বোয়ান্তি পায় হারেস। অপরিচিত পরিবেশে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। ল্যাম্পের আলোয় একদিকে আলি মিস্ত্রীর সঙ্গে পঁচিশের কড়ি চালছে। শুকুর মাঝে মাঝে হাঁড়ির আধেয় পরীক্ষা করে যায়। হারেসকে কেউ ফাই-ফরমাশ করে না। মেহমানের মর্যাদা তার অক্ষুণ্ণ। বৃষ্টির জন্য ঘরটা ঠাণ্ডা। হারেস খুব অস্বোয়ান্তি বোধ করে না তাই।

খাওয়া-দাওয়ায় অনেক রাত্রি হয়ে যায়। হারেসের বালিশ নেই, আলি তার ছোট বালিশের অংশীদাররূপে তাকে আমন্ত্রণ জানাল।

আবার কৃতজ্ঞতায় নুয়ে আসে হারেসের মাথা। কিন্তু ঘুম আসে না তার। আকাশের নিচে যারা দিন গুজরান করে, পেটরা বন্দী হওয়া তাদের কাছে লোভনীয় নয়।

আজ খোরাকি পড়েছে মাথাপিছু চার আনা। হারেসের পয়সা মিস্ত্রী নিজে দিয়েছে।

আপত্তি করেছিল হারেস। মিস্ত্রী বলেছিল এক বেলার জন্য আর কি খোরাকি দেবো?

সহানুভূতির আর্দ্রতায় হারেস অনেকটা আরাম পায়। তবু এই আবেষ্টনীর ভেতর সে বেশীদিন থাকবে না। কিছু সঞ্চয় তার প্রয়োজন। শুধু সে কয়দিনের জন্য প্রতীক্ষা। গ্রাম, গ্রামের ফসল আর মাটির আহ্বান সে কী করে ভুলবে?

নর্দমা-পচা ভ্যাপসা গন্ধ আসে থেকে থেকে। হারেসের মাথা ধরে। তন্দ্রাক্লিষ্ট দুই চক্ষু, তবু ঘুম নামে না।

আলির নাক ডাকে, সে আর এক বিপদ। বড় সঙ্কুচিত হারেস ভাল করে পাশ ফিরে শুতে পারে না। পাছে কাউকে লাগি লাগে। দরমার উপর খেজুর পাতায় তেলাই-পাটি বিছানো, তবু সঁাতাসঁাত করে পিঠ। মেরুদণ্ডে কে যেন বরফের কুচি বসিয়েছে।

অনভ্যস্ত জীবনের নতুন অধ্যায়। হারেসের বিদ্রোহী মন তারস্বরে হয়ত চীৎকার করে উঠবে :হে আল্লা, আমাকে প্রাণ ফিরে দাও। এক ফালি জমি, দুটো বলদ একটা কুঁড়ে। আর কিছু নয়, হে-রহমানের রহীম। সারা দুনিয়া তোমার। তোমার গুণাগার বান্দাকে এতটুকু নেয়ামত তুমি দিতে পারো না? তোমার ভান্ডার কী শূন্য হয়ে যাবে? এতদিন যে আলো-বাতাস তুমি দিয়েছিলে তাও আজ বন্ধ করে দিলে?...

বৃষ্টির আওয়াজের পিঠে এতরাত্রে হারমোনিয়ামের স্বর ভেসে আসে। বস্তীর কোন মাতাল গান করছেঃ পিলে, পিলে, মোরি রাজা।

হারেসের হাসি পায়। পিলের বেদনায় এতরাতে কে আবার গান জুড়ে দিল? তার জন্য রাজার কাছে আবেদন!

দুতিন মাসের ভেতর পাড়া আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে হারেসের উত্তম পরিচয় ঘটে। অভ্যাসের অনুশঙ্গ এক রকমের আশ্বাদও পায় হারেস এই জীবনে। পলাতক হওয়ার কোন পথ নেই। আসামের চা-বাগানের কুলীর মত শুধু প্রাচীর-প্রবেশের সময় বা বাইরের জগতের জন্য মমতা উচ্ছলিত হয়ে উঠে। তারপর প্রভুদের দূর্গের ভেতর সৈঁধোলে ধীরে ধীরে বাহির-পৃথিবীর মৃত্যু ঘটে। হারেস জানে, সঞ্চয় দরকার, নচেৎ শহর-ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই তার। আরিফের গাঁয়ে যেতেও এক টাকা ভাড়া লাগে। এই পরিচ্ছদে সে বন্ধুর বাড়ি যেতে পারে না। তার আতিথেয়তার জন্য প্রস্তুতিও দরকার। বন্ধুর স্ত্রী আছে। ছোট ছেলে আছে। তাদের কাছে খালিহাতে যাওয়া দৃষ্টিকটু। প্রথম যেদিন দেশলাইয়ের কারখানার কাজ শেষ হয়ে গেলো, হারেস আরো অনুভব করে, খোদার দরবারে রোজগারের পথ রোজ খোলা থাকে না। শহরে বেকার বসে-বসে খাওয়া নিজের মাংসে উদরপূর্তির সমান। পুঁজি ভাঙতে হয় দিন-দিন। তিন দিন বেকার বসেছিল সে। যন্ত্রণাদায়ক তার চেয়ে আর কিছু নেই হারেসের কাছে। বাসেদ মিস্ত্রী নতুন কাজের সন্ধান এনে মৃত ধড়ে প্রাণ সঞ্চার করে। ঘরামিদের ভেতর তার খাতির অহেতুক নয়, হারেস-বোঝে। অবশ্য বাসেদ মিস্ত্রী তার জন্য এক আনা দু-আনা কমিশনী পায়।

প্রথম প্রথম মিস্ত্রীর এই উপরি-রোজগার সে সমীহর চোখেই দেখেছিল। আজকাল দু-আনা পয়সা দিতে তার কষ্ট হয়। কৃতজ্ঞতা আর চক্ষুলাজার জন্য সে চূপ করে থাকে।

আলির মত বেপরোয়া জওয়ান পর্যন্ত টু শব্দ করে না।

যন্ত্রায়িত জীবন এখনও দূরে।

হারেস কৃপণের মত কিছু সঞ্চয় করে, যদিও খুব সামান্য। ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতা চোখে মরীচিকা টেনে আনে। মাঝে মাঝে আসে জগন্দলের মত দিন, খরা গ্রীষ্মের রাত্রি। দরমার উপর ছটফট করতে হয়। হারেস এই জন্য বাইরে রোয়াকে শোয়। অবিশ্যি এই বাড়ির সীমানায় রোয়াকের কোন চিহ্ন নেই। কলা-বিবির বস্তীর মাঝখানে একটা পুকুর আছে। পাড়ার রান্না, স্নান, কাপড়-ধোওয়ার জন্য এই পানি ছাড়া কোন উপায় নেই। কলের জলে শুধু পিপাসা মেটে। বস্তী অঞ্চলে সবাই হারেসের বাড়িওয়ালার মত নয়। আরো বাড়িওয়ালা আছে যাদের ভাড়াটে ঘর যাই হোক, নিজেদের বসত বাড়ির রঙ আলাদা। পুকুরের পূর্বকোণে এমনই বাড়িওয়ালার এক রোয়াকে সে শুয়ে থাকে। রাতে ভয় কম নয়। পাড়ার বেলেল্লার দল হুলা হবে; যখন তার পাশ দিয়ে মাতলামির অভিনয় চলে, হারেস ঘুমের ভানে পড়ে থাকে নিজীবের মত। স্বাস্থ্যের জন্য, এমনি ভয় লাগে এই সব ছোকরাদের। পরনে সিলকের লুঙ্গি আর গেঞ্জি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পানের পিকে দাঁত-রাঙা শহরের বিপজ্জনক মনে হয়। হারেসের নিঃসঙ্গ গ্রাম্য-মন এই সব মানুষদের ঠিকানা জানে না। পাহারাওয়ালা দাগী আসামীর সন্ধানে কোন কোন রাতে ঘুপটি মেরে আসে। হারেসকে একদিন রুলের গুঁতোয় পাহারাওয়ালা জাগিয়েছিল। ভয় পেয়েছিল বৈকি হারেস। আজকাল আর সে-ভয় নেই তার। খুঁচু-মুচু করে। আলি পশ্চিম কোণে কোথায় পড়ে থাকে। অবশ্য সে ঘুমু ছেলে। পাড়ার এমন বহু ছোঁড়ার সঙ্গে তার মাঝামাঝি বেশি। পশ্চিম-উত্তর কোণে একটা 'কেলা' আছে তাদের। আলি সেখানে প্রায় যায়। হারেসও একদিন গিয়েছিল। সেই একদিন মাত্র। দেওয়ালে বহু উলঙ্গ নারী-মূর্তির ছবি আর ক্লাবের সভ্যদের রসিকতা স্মরণ করতে পারে না। এইখানে থেকেই সেদিন রাজার কাছে আবেদন গড়িয়েছিল। আলিও ঢালাই-পিলাইয়ে গুস্তাদ। তার প্রতি এক রকমের সহানুভূতি-মাখা ঘৃণা পোষণ করে হারেস। অথচ আলি খুব খারাপ লোক নয়। এই বাসায় আসার পরদিন রাস্তার পাকা পায়খানাটা পীরের আস্তানা বলে হারেসকে সালাম করতে বলেছিল। বেচারী সে, আলির ধূর্তামির কাছে। বাসেদ মিস্ত্রী-ও সেদিন হেসেছিল, নতুন লোক পেয়ে তোরা যা-তা শুরু করেছিল। দু-মাস যাক, হারেস তোদের এক হাটে কিনে এক হাটে বেচবে। মিস্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী ষোল আনা পূর্ণ হয়নি। শহরে জীবনের আট-ঘাট তার অচেনা নয়, অবশ্য আলীর কাছে সে এখনও ছেলে-মানুষ। পারবে সে ইতর গুস্তাদের সঙ্গে মিশতে? পাড়ার এক পকেট-মার আলির বন্ধু। হারেস লোকের সঙ্গে এখনও ভাল করে হিন্দী-জবান চালাতে শেখেনি। তার বাড়িওয়ালারা বাংলা, হিন্দী, উর্দু জবানের খিচুড়ী দিয়ে বেশ কথা বলে। হারেস তত কায়দা-দোরস্ত নয়। বাড়িওয়ালা মেহেরালি খাঁটি শহুরে বাসিন্দা নয়। গ্রামের সঙ্গে পঁচিশ বছর আগেও যোগ ছিল, আজ তা নাম-মাত্র। বাড়িওয়ালার ছেলে তাদের পুরাতন গায়ের এক মেয়ে বিয়ে করে এনেছে। গায়ের সঙ্গে নতুন করে মিতালি পাতানোর চেষ্টা। বাড়ি ভাড়া দেয়, ওরা-ও কিন্তু বড়-লোক নয়। বাড়িওয়ালার আব্বাজান চল্লিশ বছর আগে শহরে এসেছিলেন। গায়ে তার স্ত্রী ছিল। এখানে ছিল রক্ষিতা। এই সম্পত্তি সে-ই বিমাতার। নিঃসন্তান বলে

সে সতীনের ছেলেদের লিখে দিয়ে গিয়েছিল। পিতার পাপের পশ্চাতে এমন লুক্কায়িত আশীর্বাদ ছিল, বাড়িওয়ালা আজ তোয়াজের সঙ্গে তার গল্প করে। ইম্পাতের কারখানার মিস্ত্রী, ছাঁটাইয়ে পড়ে চাকরি গেছে, তাই বাড়ির আত্র মাটি করেও মেহের আলি বাসেদকে একটা কামরা ভাড়া দিয়েছিল সাত টাকায়। এক ঘরে পিতা, অন্য ঘরে থাকে পুত্র। বয়্যাটে ছেলের সঙ্গে মেহের আলির প্রায় দাঙ্গা বাধে। আলির বন্ধু সে। মাঝে মাঝে তার বিবিজানের রান্না তরকারী পাঠায় নাসিম আলির জন্য। হারেসের এমন হৃদয়তা নৈপুণ্য কোথায়? সঞ্চয়ের মরীয়াপণ তার জগতের সীমানা আরো সংকীর্ণ করে ফেলে। ছোট কাঠের বাস্র, তালা-চাবি পর্যন্ত হারেস কিন্তে ভুলেনি।

যেদিন অবেলায় বাসা ফেরে হারেস প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ করে। পাশের খোলার ঘরে থাকে ফরিদপুরের একদল ছাতাওয়ালা। তার পাশে কয়েকজন ফেরিওয়ালা। তাদের ব্যবসা ঋতু অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। আমের মৌসুমে আমফেরী, নচেৎ পেঁয়াজ অথবা আলুর ব্যবসা। একজন সন্ধ্যাবেলা গোস্তু ফেরী করতে বের হয়। কসাইদের অবিক্রীত গোস্তু রাত্রে বস্ত্রী অঞ্চলের বাসিন্দারা সস্তায় কেনে। এই লোকটার নাম কাসেম। মাথায় চালী, তার উপর বসান একটা ল্যাম্প, কাসেম হেঁকে যায়: হাওড়া, চায় হাওড়া। গোরুর গোস্তু হাওড়া। শিয়ালদহ খাসী বা ধাড়ীছাগলের গোস্তু। এই অঞ্চলের যারা খবর রাখে না, এমন বাসিন্দারা কাসেমের হাঁক শুনে তাকে পাগল ঠাওরাবে সহজে। ছেঁড়া লুঙ্গি পরা একটা লোক হাওড়া নিলামে বিক্রী করতে চায়! উদ্ভাস ত বটেই। ছাঁটের গোস্তু মাঝে মাঝে বাসেদের বাসায় ওঠে। নচেৎ তারা সকলেই নিরামিষ-ভোজী। আদা-রসুনের পয়সা খরচ হারেস পছন্দ করে না।

ছাতাওয়ালাদের বাসা হারেসের জন্য আকর্ষণ, কারণ এখানে পুঁথি পড়া হয়! বর্ষার দিনে ওদের চুলায় রান্না চলে; আর পুঁথি সুর করে পড়ে কেউ। সোনাভানের পুঁথি, জৈগুন বিবির পুঁথি, বীর হানিফার লড়াই। যেদিন গুলে বাকাউলী পড়া হয় সেদিন আরো লোক জমা হয়। রজব মোহাম্মদের গলা সানাইয়ের মত, সবাই মন্তব্য করে। সকালে বাঁটের বাঙিল, ছাতার কাপড়, শিকের বোঝা কাঁধে সে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যার আগেই ফেরে, তারপর পুঁথি নিয়ে বসে। বাসার অন্যান্য কাজ থেকে সে রেহাই পায়। বৃষ্টির দিনে বাসায় রান্নার পালা পড়ে এই জন্য হারেস হয়ত বের হতে পারে না, কিন্তু তার কান খাড়া থাকে। গাঁয়ে বহুবার সে পুঁথি শুনেছে। মহরমের সময় সলিম মুনশী পর্যন্ত দশ দিন শহীদে কারবালা পড়তেন। শহীদ ইমাম ও তার পরিবারবর্গের দুঃখ-কাহিনী হারেসের চোখেও আনত অশ্রুধারা। পাঠক স্বয়ং কাঁদতেন। আলিও পুঁথি পড়তে পারে, তবে রজবের সমান নয়। হারেস লেখা-পড়া জানে না। তার কম দুঃখ নয় সেই জন্য। আলির গুণের সীমা নেই। রজবের সঙ্গেও আলির হামেহাল মেশামেশি।

আলি বড় রাগায় রজব মহাম্মদকে।

—ও ছাতি হারাবে, ভাই। কটা ছাতি হারালে?

রজব কোন কোন দিন রাগে জবাব দেয় না।

—তোমার ছাতি ত একখানা। রোজ একবার করে হারাও নাকি? মনজুও ছাতি একবার হারিয়েছিল।

—খামাখা ফাইজলামি, বালা না।

আলি নাছোড়বান্দা।— এই দেখ আমার ছাতি। তারপর সে ছত্রিশ ছাতি ফুলিয়ে আটত্রিশ ইঞ্চি করে।

হারেস বলে, তুমি খামাখা রাগাও। রজব ভাই, আজ শাহ এমরানের পুঁথিটা পড়ো।

আলি আবার বলে, তোমার হালার বোনের খবর কী? রজব তখন বাঁশের মাচা থেকে পুঁথির দণ্ডুর পাড়ে।

—চটে গেলে দোস্ত। আচ্ছা, শীতের দিনে তোমরা হাল গায়ে দাও, না শাল গায়ে দাও?

মেদিনীপুরের আরো ঘরামি থাকে অন্যান্য বাসায়। পুঁথি শোনার জন্য তারাও জমা হয়। সকলে হো হো শব্দে হেসে ওঠে।

রজব খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে। তারপর মিষ্টি গলায় শুরু হয় তার পুঁথি-পাঠ। তখন আলিও চুপ করতে বাধ্য হয়। নুরুল্লাহর বিরি করুণ কাহিনী তিনশ' কত বছর আগেকার গ্রাম্য কবির লেখনী আঁকা :

তুফান হৈলা সে বছর খোদার গজব।
সাগরের জলোচ্ছ্বাসে ভাসি গেল সব।।
জলস্থল একাকার করল মওলাজি।
ঢলের পানিতে ডুবি মৈল যত নাথাক মাঝি
শতে শতে মরল মানুষ, কারে কেবা চায়।
ঘরের চাল ভাসি কেহ পুড়ল দরিয়ায়।।
গরু মরল, মহিষ মরল, তুফান হৈল ভারী।
ধানের দর চড়িয়া উইল টাকায় পাঁচ আড়ি।
কেহো বেচে ক্রী-পুত্র, কেহো বেচে মেয়ে।
পেট ফুলিয়া মরে কেহ সিদ্ধ পাতা খেয়ে।

বড় মিষ্টি রজবের কণ্ঠস্বর। ক্লান্ত দিনের শেষে শান্তি-হর আনন্দের সম্ভবত মাধুর্য তার কণ্ঠে প্রকাশ পায়।

রজব হয়ত নাক পরিস্কারের জন্য পড়া বন্ধ করে। তখন আলি হাঁকে : ছাতি হারানোর কাজ কে করিবে রদ। তার সাক্ষী আছে ভাই রজব মহম্মদ।

আবার হাসির হররা চলে। আলি রজবের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, রাগ করছো, দোস্ত, মাথার কিরা?

দু-জনে দৃষ্টি বিনিময় হয়। রজব হাসে আর পড়া শুরু কলে।

ফেরিওয়ালাদের বাসায় ছোটখাট ব্যাপারে মাঝে মাঝে বড় 'কাইজ্যা' বাধে। সেদিন পাড়ার অনেকের বিশ্রামস্থল থাকে না। নচেৎ পরিশ্রান্ত দিনের দুঃখ-লাঘবের এমন জায়গা আর নেই। বাসেদ মিস্ত্রী পর্যন্ত আসরে জমা হয়।

হারেসের খুব ভাল লাগে পদ্মা-অঞ্চলের এই মানুষদের। শহুরে ছোঁড়াদের চেয়ে তার মন বেশি টানে ছাতাওয়ালা নিরীহ জনেরা। আলি এখানে আসে, এইটুকু হারেস পছন্দ করে না। এই একটা মাত্র জায়গায় সে প্রাণ খুলে হাসতে পায়।

মুক্তির নিঃশ্বাস এসে লাগে চারিদিক থেকে। হারেস অনুভব করে, কারো তোয়াক্কা নেই আর। তার টাকা সে ইচ্ছামত খরচ করতে পারে। সখ-মেটানোর ভার তার নিজের উপর। শরীর আর সামর্থ যদি থাকে, উজ্জ্বল দিনের আলো লাগবে বৈকি ভবিষ্যতের উপর। সলিম মুনশী নেই এখানে। দৈনন্দিনতার নির্মূল নিষ্পেষণ স্বতঃই অন্তর্হিত। পিঞ্জরবদ্ধ জীবনের শেষ আর্তনাদ দিগন্তের মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু গঠনের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে ব্যক্তিত্বের সৌধ-রাজি।

মহানগরে বর্বর সংকীর্ণতার মধ্যেও আগামী দিন ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়নি। কি দিত তাকে আশ্রয়-দাতা সলিম মুনশী? পুরাতন পরিশ্রমের কোন মূল্য ছিল না। দাসত্বের হাটে কানা-কড়ি বিনিময় চলত না তা দিয়ে। শ্রমের প্রতি বিন্দুর সঙ্গে আজ সওদা-সম্ভার জড়িত। হাতছানি দিয়ে যায় আকাশ আর পৃথিবী। অদম্য স্পন্দনে হারেস আজকাল কথা বলে। কথা বলে না ত সে, তার ইচ্ছার বাঙময় রূপ ঝরে পড়ে মুখ থেকে। হাসির উচ্ছ্বসিত স্রোত উদ্যমের নতুন বীজ-সংগ্রহে ভেসে চলে বাক্য-বাক্যান্তরে। মহা-নগর যদি দিত বাতাসের এক ফোঁটা বল্কা নিঃশ্বাস, দিত যদি এক ফালি সূর্যের কিরণ উত্তাপ, ঘামের ফেটায় সে সোনার ফসল বুনত। শুধু এই সামান্য রক্ষ অনটন। নগরের মরীচিকা গ্রামের প্রতিভাস বোনে। চার পাঁচ মাসে নতুন করে সে শহরকে চিনেছে। ঝিমিয়ে যায় কখন কখন-ও হারেস। ক্যানেলের উপর খুলনা-চট্টগ্রাম বরিশালের নৌকা আসে। মাল্লাদের সঙ্গে গল্প করার ফুসরত পায় তখন সে। বাসার ক্ষুদ্র গৃহের তাকে আটকাতে পারে না।

খান বাহাদুর এরফান চৌধুরীর বাগানবাড়ী সম্পত্তি চৌধুরী সাহেব নিজেই এখানে বসবাস করছেন।

বাগানবাড়ির ভেতর হারেসের কাজ চলছে। একটা টিনের আটচালা তৈরী হবে। হাজারীবাগ থেকে তিনটে বুনো ভল্লুক আনিয়েছেন তার জন্যই আটচালা।

এমন জায়গায় কাজ করতে হারেসের খুব ভাল লাগে। বিরাট বাগান-বাড়ি মাঝখানে পুষ্কারিণী আছে। চারিদিকে কলা-গাছের বাগান। তারই ছায়ায় ঘরামিদের কাজ চলছে। কয়েকজন ছুতোর মিস্ত্রী তাদের সামিল হয়েছে।

সারাদিন গায়ে রোদ লাগে না বিশ্রামের সময়। হারেস চারিদিক তদারক করে এলো, গাঁয়ের চিহ্ন ফুটকী-রূপে লুকিয়ে রয়েছে এখানে। কলা গাছে কলা পেকে রয়েছে। নীল সবুজ কলা-পাতার দিকে চোখ ফেরালে হারেসের মনে পড়ে সলিম মুনশীর পুকুর পাড়ের কলা। চাষীদের জমির সীমানানির্দেশক কলা-গাছ শহরে আমদানী করেছে যেন। কেয়ারীর ভেতর ফুল ফুটে রয়েছে। পুকুর ছাড়া একটা ঝিল আছে। জাওলা মাছ ভেসে বেড়ায়, গুকনো এক চাং ঢেলা ফেলে দিয়েছিল হারেস। বৃদ্ধদের সঙ্গে অনেকগুলো সিঙ্গি মাছ উঠলো। লোভ হয় হারেসের, বাগানের মালি নিষেধ করে, ঢেলা ছুঁড়ো না, মাছ মরে যাবে। গিস্-গিস্ করছে কইয়ের দল। মালি বললে, বর্ষার সময় পানির সোঁত ধরে এখানেও মাছ ওঠে। টেনিস-কোটে একবার আধ-ডজন কই-মাছ উঠে গিয়েছিল। খান বাহাদুর সাহেবের পুত্রবধূ একজন শ্বেতাঙ্গিনী খুব হেসেছিল টেনিস-কোটের দুর্দশা দেখে। বর্ষার

সময় টেনিসের মৌসুম চালায় এই কৈ মাছের দল! Too black like the natives
খান বাহাদুরের পুত্র স্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল: নেটিভদের মতই মীন-বন্ধুরা
ডেঞ্জারাস, ছোঁয়া যায় না, কাঁটা আটে-পুটে। মেম সাহেবের সঙ্গে মালীর ভাব আছে,
নেটিভ-জবানে সে পরে বুঝিয়ে দিয়েছিল মালীকে রসিকতার মর্মার্থ

শালগমের নীল পাতার নিচে মাটি কি পরিপাটি করে সাজানো : এরাই জানে চাষ।
হারেস ভাবে। নটে শাকের এত রকম সে আর কোনদিন দেখেনি। লাল-নটের গাছগুলো
মানুষ-উঁচু। ডাটার রক্তিমতা লোভের তৃষ্ণা আনে জিভে। বাড়ির বারান্দার নিচে লতা-ফুল
বাখারীর বেড়া জড়িয়ে ফটক রচনা করেছে। মালিদের ঘরগুলোও বেশ ভালো। বাইরে
পা বাড়ালেই কলাগাছের নীল আমন্ত্রণ। সিংহদ্বার দিয়ে মটোরের যাতায়াত হারেসকে
চকিত করে। সুশোভন পরিচ্ছদ আক্রান্ত নরনারী বের হয়। সুশ্রাব্যদের দর্শন মেলে।
একবার গান শোনা গেল। মাতালের উল্লসিত চীৎকার নেই এই দ্বীপের ভেতর। চারিদিকে
কোন লোকালয় নেই। উঁচু গাছের ডালপালা শুধু দেখা যায়। বর্ষাক্ত তাজা পাতা, পুষ্প
জমাট মেঘের মত।

হারেসের সঙ্গী মালী বহু কাহিনী বলে। ঝিলের এক পাশে একটা কবর। খান বাহাদুরের
মিরাটী বাঈজীর শেষ আশ্রয়। রাত্রে এইদিকে কেউ আসে না। বদ-রুহ বাইজী রাত্রে ঘুরে
বেড়ায়। মালি বলে, নাপাকে লেবাসে মরলে এই দুর্দশা-ই ঘটে। নৃত্য-সম্বলিত মদ্যপানের
সময় বাইজী মারা গিয়েছিল। খান বাহাদুরও হৃদযন্ত্রণে ভুগছেন। দিন-রাত্রি কোরান
তেলাওয়াৎ করেন। হাদিস ছাড়া তিনি কথা বলেন না। এক বড় পীরের মুরীদ হয়েছেন
সম্প্রতি। মালীরা কেউ বৌ নিয়ে বাগানে থাকতে পারে না। খান বাহাদুর জীবনে বহু ভুল
করেছেন, আজ তা শোধরাতে ব্যস্ত। নিজে পরীক্ষায় ফেল করেছেন, তাই ছেলেদের
উপর পরীক্ষার জন্য বড় কড়া কড়ি। তাঁরাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। সাহেব
বহুদিন দেশান্তরে ছিলেন, আকাজকের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটেছিল। শ্বেতাঙ্গিনী পার্শ্বে তিনি
ফিরে এসেছেন। মালীর কাছে জানা গেল, পুত্রেরা পিতার উপদেশ মানে না, এই জন্য
মালী চাকর-বাকরদের উপর তিনি তাঁর নসীহৎ ফুরমান। পরহেজগারীর শত প্রশংসাকীর্তন
রোজ শোনা যায়। খান বাহাদুর সাহেব নিজে সপ্তাহে একবার তার পীর সাহেবের দীদার-
লাভে যান। সেইদিন বাগান-বাড়ির ভৃত্যদের ছুটি। মালী তাই হাসি-মুখে বলে, হজুরের
ধর্মে মতি হোক আরো। হারেস বোকার মত দৃষ্টি ফেলে। ঐশ্বর্য নিয়ে মানুষ কী করে?
গ্রাম কত তুচ্ছ।

বিশ্রামের সময় হারেস ঘুরে বেড়ায়। একটা ছাতিম গাছের তলায় সে তিনটে ভল্লুক
দেখতে লাগল। শিকলে খুব মজবুত করে বাঁধা মালী আশ্বাস দেয়, হারেস তবু কাছে যায়
না। এই ভল্লুকদের দৌলতে তাদের রুজী চলছে। লোমশ কালো প্রাণীর দিকে মালী
কয়েকটা শালগম ছুড়ে দিল। হুড়োহুড়ি পড়ে যায় জন্তুদের ভেতর।

খান বাহাদুর সাহেব নাকি একটা চিড়িয়াখানা তৈরী করবেন বাগানে। মহুয়া গাছের
চারা এসেছে ছোট নাগপুর থেকে। আল্লার চরেন্দাদের বেশি তক্লিফ দেওয়া অনায়াস।
মহুয়ার বন্দোবস্ত চলছে তাই। আরো একটা ভল্লুকের অর্ডার দিয়েছেন খান বাহাদুর। নর
আর মাদী জোড়া তৈরী করছেন, আল্লার কুদরৎ। একটা ভল্লুকের জোড়া নেই। এই জুলুম

গোনাহ! চতুর্থ ভল্লুক সামনে সপ্তাহে আসবে। বিপত্নীক চৌধুরী সাহেব সঙ্গিনীহীনতার দুঃখ ভাল-রূপেই বোঝেন!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে খান বাহাদুর ইরফান চৌধুরী ভল্লুক দেখছিলেন। মালীর চোখ পড়ে তাঁর উপর। হারেসও সেই সঙ্গে চেখ ফিরিয়েছিল। সফেদ লেবাস, কলিদার পিরহান-লুঙ্গি, গুত্র শ্যাম্‌রাজিসহ খান বাহাদুর দাঁড়িয়ে স্মিত হাসি হাসছেন। হারেস আড়চোখে চায় শুধু। সলিম মুন্‌শীর উন্নত সংস্করণ জীবনের প্রথম চোখে পড়ল তার। গৌর তনুর মহিমা বারান্দা আলো করে রেখেছে। দর্শন দেওয়ার মত পলক মাত্র, আবার খান বাহাদুর আড়াল হয়ে গেলেন। মালি সাহেবের পরিচয় দিল।

প্রকৃতির মায়া তুচ্ছ হয়ে যায় হারেসের কাছে। পশ্চাতে পড়ে থাকে নীল দুর্বা বনের উপর সূর্য্যমুখীর ইঙ্গিত, শস্য ক্ষেতের সর্পিল আহ্বান, বাউল বাতাস-ছোঁওয়া ঝাউয়ের মর্মর, খান বাহাদুরের কেয়ারীর অসংখ্য নামহীন কুসুমের ডাক। চোখ খুলবে না হারেস, চোখ ফেরাবে না সে কোন দিকে। বাগান-বাড়ির ইমারতের ইটে বরং স্নেহ-মমতার প্রস্রবণ অন্তঃশীলা। বিশ্রামের সময় প্রায় শেষ। হারেস আট চালায় দিকে ফিরে যায়।

টিনের চালের উপর শুয়ে-শুয়ে লিচু গাছের ছায়ায় বাসেদ মিস্ত্রী বিড়ি ফুঁকছে। ঘন পাতার আবরণে রোদ্দুর লাগে না। টিনও এখানে শীতল।

নিচে ছোকরা ঘরামি আর ছুতোর মিস্ত্রীদের ভেতর তখন হাসির বন্যা নেমেছে। হি-হি শব্দে আটচালা মাৎ। হারেসেরও কৌতূহল জাগে।

ছুটে এলো আলি।

—এই হারেস।

যে ছোকরা ছুতোর মিস্ত্রী আবদুলকে ঘিরে হাসির জটলা চলছিল, সেও এলো হারেসের কাছে। আলি তার মুখ চেপে ধরে। আরে ওকে ওসব বলিস্নি, ওর 'জান' উড়ে যাবে।

এত লোকের ভেতর মনের গুমোট কেটে যার হারেসের। হাসে সে।— কি হোলো বলই না ছাই।

আবদুল জবাব দেয় : আমি বলতে পারবোনা, জিজ্ঞেস কর আলিকে।

—কি হোলো, আলি-ভাই।

মুখ ঝামটা দেয় আলি : আমি জানিনে। জিজ্ঞেস কর ওই আবদুল ছুতোরকে।

আরো তরুণ মিস্ত্রীরা এসে জমে।

আবদুল বলে, ওসব শুনতে নেই। কাঁধের ফেরেস্টা সরে যায়।

আলি হারেসের মুখের কাছে হাত নাড়ে, গাছ দেখেছো?

—কি গাছ?

—কি গাছ আবার। আবদুল গাছ দেখে হাসছে।

হারেস আর অনুরোধ করে না, থাক আমি শুনতে চাই নি কিছু।

আবদুল তখন সবিস্তারে বর্ণনা করে। খান বাহাদুরের জানালার পালিশ সামান্য চটে গিয়েছিল। সেইজন্য ডাক পড়েছিল আবদুল মিস্ত্রীর। সেখানে চৌধুরী সাহেবের পালঙের উপর একটা বই দেখে এসেছে সে।

—কি বই।

—ইংরেজী বই।

হারেস বোকার মত বলে, তাতে হাসবার কী আছে?

—বইতে নয়। খালি ন্যাংটা ছবি ভরা।

—পাড়ার ক্লাবে ত বহু ছবি রয়েছে। কি বল, আলি?

—আরে সে ছবি হোলে ত ভাল হোত। এই ছবির ব্যাপার আলাদা।

তারপর সে মুখ টিপে-টিপে হাসে।

আবদুল বলে : দুই কাঁধের দুই ফেরেস্টা সরে যাবে সে ছবি দেখলে। তোঁবা!

তারপর আবদুল বর্ণনা করে, রাধিকা কৃষ্ণ আর তমাল তরুণ একত্বীভূত কেমন রূপ সে দেখে এসেছে।

—আরো কত রকমের তেলসমাং যে রয়েছে রে ভাই, যদি ইংরেজী পড়তে জানতুম!

হারেসের চিন্তার গতি এইদিকে শ্রুত। সে বিশ্বাস করে না। বলে, কোরান-হাদিস পড়ে খান বাহাদুর সাহেব। তুমি ভুল দেখেছ।

—আজ ওসবের ধারে পা দেয়নি, হলফ করে বলতে পারি। আলি হঠাৎ হারেসের দলভুক্ত : একটা ছবি ছিঁড়ে আন্‌লিনে কেন?

—এতদূর বুকের পাটা আমার নেই।

—কাল যদি কোন কাজের জন্য ডাকে, আমাকে নিয়ে যাস। আবদুল আফসোস করে।

—আরে তোমরা বিশ্বাস করবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি, খান বাহাদুর খুব মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখছে। জোহরের নামাজের সময় আল্‌মারিত বই বন্ধ করে উঠে গেল।

এক ছোকরা মিস্ত্রী ফুট কাটে। এই ত আসল পরহেজগার লোক। ভাল মন্দ দুই নেড়ে-চেড়ে দেখে কিন্তু নিজে খারাপ হয় না।

হাসির ঐক্যতান চলল পাঁচ মিনিট ব্যাপী।

বাসেদ মিস্ত্রী নেমে এলো, সব স্তব্ধ।

—আজ যে খুব জমেছ সবাই। চালাও, বাবা, এবার যাও। কাজে না লোকসান দিতে হয়।

ফুরোনে কাজ নিয়েছে এবার মিস্ত্রী বেশি মুনাফার আশায়।

আবার শুরু হয় কর্ম-ব্যস্ততার কোলাহল। কোন কোন ছুতোর মিস্ত্রী তার কাটে। লোহার গরাদ কাটে দু-জন! ঘরামিরা বাখারী ছেলে। সবাই কাজে মনোযোগী।

খান বাহাদুরের রুচির বাহবা দিতে হয়। ভল্লকের জানালার পাশে ইট পড়ে রয়েছে অনেক। ওখানে উঠবে নকল পাহাড়। তার উপর বুনো গাছপালা। ভল্লকের বন্দী-জীবন বিস্তৃত হওয়ার নানা উপায় তিনি উদ্ভাবন করেছেন। গাছের গুড়ি কয়েকটা বাগানে পড়ে রয়েছে, পত্তর আবাস-ভূমির মধ্যে পুতে দিতে হবে। বন-বিহার যেন না থামে।

এলাহি কারখানা!

ভল্লকের দোলনার জন্য পাহাড়ীদের কাছ থেকে মোটা বুনো লতা আমদানী করেছেন খান বাহাদুর। পিঞ্জরা তৈরীর পর একজন ভালুক-পোষার শিকারীকে বেতন দিয়ে নিয়োগ

করবেন তিনি।

মালী বলে, এলাহি কারখানা। পূর্ব বাংলায় বিরাট জামদারী, টাকার সুমার নেই।
খেয়ালও তেমনি।

আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। বাসেদ মিস্ত্রীর হুকুম, হাত চালু করো। ভাল কাজ
উঠছে না।

হারেস ফাঁকি দেয় না আদৌ। মিস্ত্রীর কাছে দুর্নামের ভাগী হোতে চায় না। এমন
জায়গায় মন দিয়ে কাজ করা চলে। দূরে কোথায় বৃষ্টি নেমেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার দমকে
গাছপালা কাঁপে। হারেস প্রান্তরের আশ্বাদ উপভোগ করে। সারা বছর কাজ চলত এইখানে।
একটু ঠাই পাওয়া যেত মালীদের সঙ্গে অথবা ভল্লুকরক্ষী রূপে।

ওপারের আকাশ ঘন-নীলের বিস্তারে মুড়ি দিয়ে অজ্ঞাতবাসে চলেছে। লিচুর পাতা রং
হারিয়ে ফেরে নিমেষে নিমেষে। মেঘগর্জন প্রতিধ্বনি দিয়ে আকাশ আর পৃথিবীর ফাঁক ভরে
দিয়ে যায়। দুই বিপরীত-মুখী ভিন্ন রং স্রোতের মধ্যবর্তী রেখার উপর হারেসের মন ভারসাম্য
ঠিক রাখে। দারুণ হাত চলে তার। বাসেদ মিস্ত্রীর শাগিত চোখ এদিকে রেহাই পায়।

চুলা ধরিয়ে হারেস বসেছিল।

উঠানের ভেতর হঠাৎ দাপাদাপির আওয়াজ শোনা যায়। বেরিয়ে এলো হারেস।
একি! বাড়ীওয়ালা আর তার ছেলে হাতাহাতি করছে। মুখে কথা নেই কারো।

হারেসের আগমন-মাত্র একটি বর্ষিয়সী রমণী আলরে ঢুকে গেল। তরুণীর কণ্ঠের
চাপা কান্না শোনা যায় অন্য ঘরে।

এইবার হাঁকাহাকি শুরু হয়।

মেহেরালি চীৎকার করে : শুয়োরের জোচ্চা, কমিনা তুমি টাকা ওড়াবে বেফজুল।

—আমি আমার পয়সা খরচ করছি। ফের কথা বলবে ও বুড়ো হাড় চুর করে দেব।
বাপ বলে রেয়াৎ রাখব না।

হাতাহাতি আবার শুরু হয়। ঘৃষি আর কিল।

হারেস প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তারপর সে মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে :
বাড়ীওয়ালা সাহেব, করছেন কী।

নাসিমকে একদিকে ঠেলে দিল সে। মেহেরালির রোখ থামে না।

—দাঁড়া, হারামজাদা।...

পেয়ারা গাছের গুড়ির কাছে নাসিম একটু বেকায়দায় পড়েছিল, এই সুযোগে মেহেরালি
এক ঘৃষি ঝাড়ে পুত্রের মুখের উপর।

—বাপ না আমার ইয়ে! নাসিম একটা ভাঙা কলসী নিয়ে ছুঁড়ে মারল বৃদ্ধের মাথার
উপর। গুড়িয়ে গেল কলস মেহেরালির পায়ে লেগে। আর একটা কলস তুলেছে নাসিম,
হারেস হাত থেকে কেড়ে নিল।

নাসিম পাট-সিল্কের লুঙ্গি পরেছিল। কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কলসীর কান্না
লেগে মেহেরালির পা দিয়ে রক্ত ঝরছিল। হাউমাউ শব্দে কান্না শুরু করে বাড়ীওয়ালা।
বৃদ্ধবয়সে পুত্রের হাতের মারও তার কপালে ছিল! খেদ-কীর্তন করে সে।

চটের আকর ওপারে পাড়ার লোক জড়ো হয়েছিল। কৌতূহলী চোখ হেঁড়া ফাঁকে

খুব নেঘাবান। গালিগালাজ দিল মনের সাথে মেহেরালি।

হারেস নাসিমের দুই হাত ধরে হিড়িহিড়ি শব্দে টেনে নিয়ে গেল চট্টের ওপারে। পাড়ার একজন চেনা লোক-কে সে অনুরোধ করে, এ-কে একটু ফাঁকে নিয়ে যাও, ভাই। মেহেরালির বৃদ্ধা পর্দানশীনা স্ত্রী-ও শেষে বাইরে এসেছে। স্বামীর হাতের উপর সাদা ন্যাকড়া জড়ায় সে।

—আপনি রাখুন চাচি, আমি বেঁধে দিচ্ছি।

কথা বলে মেহেরালির স্ত্রী : দাও, বাবা। যেমন কপালে সেধেছিলাম।

আধ-ঘোমটা তবু ছাড়ে না বৃদ্ধা।

হারেস ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লাগল। হঠাৎ ক্ষেপে উঠে মেহেরালি। অসমাপ্ত ব্যাণ্ডেজত্বক্কে সে ছেলের ঘরে ছুটে গেল। বউ ভেতরে হাউমাউ জুড়ে দেয়। হারেস অন্দরে প্রবেশের সাহস পায় না।

—আছড়ে ভেঙে ফেলব। একটা ছোট গ্রামোফোন দু-হাতে, বেরিয়ে এলো মেহেরালি। হারেস তা-কে সুযোগ দিল না। বৃদ্ধের হাত থেকে গ্রামোফোন ছিনিয়ে নিয়ে হারেস বলে, ভেঙে কী হবে, কিনেছেন ত জিনিসটা টাকা দিয়ে!

এই গ্রামোফোন কেনার জন্যই পিতা-পুত্রে দ্বন্দ্ব। তার ভূমিকা হারেস জানে না। কলের গানের বাস্কটী সে নিজের ঘরে রেখে এলো।

—ছেলেমানুষ একটা কাজ করে ফেলেছে, ভাব্যজন্য আর কেন? হারেস হৃদ্যতার পথ রচনা করে, চাচা, একটু শরবৎ খাও।

বাইরে পাটের চট ঝুলছে। ভেতরের অন্ধকার আর থাকে না। মেহেরালির স্ত্রী বউ-কে শাপান্ত আরম্ভ করে। হারামজাদী কুটনীতির বেটাই ত সংসারে আগুন লাগায়। সখের আর কামাই নেই। আজ এ্যা কাল তা। কী আর একটা ভাতারের বায়না ধরবে!

হারেস কানে আস্তুল দিতে বাকী রাখে। ঝগড়াটা এক-তরফা। নাসিমের বউ কোন জবাব নিক্ষেপ করে না।

চাচি, এক গ্লাস শরবৎ করে দাও। হারেস বৃদ্ধাকে সম্বোধন করে।

চাচি শরবৎ নিয়ে এলো। বৃদ্ধ গলা ভেজার পর নিজের দুঃখকীর্তন করে। ঢালাইয়ের কারখানার মিস্ত্রী, আজকাল রোজ কমে গেছে, ছেলে বেফজুল পয়সা খরচ করে। সারাদিনের খাটুনির পর এই বেল্লিকপনা সে সহ্য করতে পারে না।

চাচি মিষ্ট-পানি বিতরণের পর আবার কটুকাটব্য পরিবেশন করে। বৌর গুণ গ্রামের শ্রাদ্ধ চলে।

মেহেরালি তিরস্কার করে : খামাখা গলাবুজি করো না। বউ আমার লক্ষ্মী। নিজের বংশের গুঁড়ো এনেছি, ছেলের গুণগেরাম দেখো।

—বউ-মা, কেঁদো না।

শান্ত মানুষের মত মেহেরালি বলে। চাপা ফুপানি আর থামা জানে না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দাওয়ার উপর হারেস বসে থাকে। বেগানা মরদ নয় সে আর। তার পরিচয় দু-দিন পরেও পেয়েছিল সে। চাচি পর্দার আইন অনেকটা শ্লথ করেছেন। বৃদ্ধা স্বাভাবিক গলায় বলে, বউ-মা, কাল থেকে তোমরা আলাদা খাও। ওর মুখ

দেখব না আমি।

হারেস বাধা দিল।— চাচা, আর কেন। লেবু কচলে তেতো করছেন।

—না, বাবা, আমার রাগ বড় খারাপ।

হারেস কোন সুযোগ গ্রহণ করল না। রান্নার কতদূর, সে উঠে এলো অজুহাতে।

চুলো নিভে গেছে। আবার কাঁচা কয়লা নিয়ে বোঝা-পড়া। হারেসের মেজাজ বিগড়ে যায়। কোন হাস্যামা সে পছন্দ করে না। নির্বিবাদ জীবনের জন্য ঠাই খুঁজে নিতে হবে তা-কে।

বসার কোন অবসর মেলে না। রান্নার পালা ছাড়া আরো কাজ আছে। মিস্ত্রীর কাপড়-কাটারী ধোও, পরিষ্কার করো। আজকাল কেউ খাতিরও করে না। আলির সঙ্গ পর্যন্ত বিশ্বাদময়। মিস্ত্রী যাকে কমিশনী ছেড়ে দেয়, বাসার সকলের হিংসার পাত্র সে। অথচ তার মেহনতের দিকে কেউ তাকায় না। আলি ঠাট্টা করে, মিস্ত্রীর জামাই। অন্তরে হৃদয়তা হারালেও সদরে সে সহানুভূতির লোক পায়। ফরিদপুরের ছাতাওয়ালা, তা-ছাড়া মেহেরালি। রান্না তরকারী আজকাল তার জন্যই ও-ঘরে পৌঁছায়। মেহেরালি দাওয়ায় বসে গল্প করে। নাসিমও তার সমর্থক। ওদের জীবনের সঙ্গে সে মিশে যেতে পারে না। দায়িত্বহীন দিন-যাপনের বহুদিনকার অভ্যাস হারেস নিশ্চিহ্ন মুছে-ফেলার আশ্রয় চেষ্টা করে।

রজব একদিন তার ভুল ভেঙে দিয়ে গেল।

আচ্ছালামো আলায়কুম।

টিপ্টিপ্ বৃষ্টি মাথায় রজব এসেছে তাদের ডেরার পুঁথি-পড়া ছেড়ে। সকলে অবাক হয়।

দরমার উপর বসে রজব বলে, দ্যাশে যামু বাই।

আলি হাসে : ছাতি হারাবে না।

রজবও হাসি বিনিময় করে শহুরে সংলাপ জুড়ে দেয়, সত্যি বলছি।

হারেস দুঃখিত হয়। এমন পুঁথি-পড়া আর শোনা হবে না!

—আবার আসব।

আলি বলে, দ্যাশে যাবে কেন?

—আমাদের কী শহরে থাকা পোষায়, গাঁয়ের লোক। বর্ষার সময় আবাদ সেরে আসি। দু'মাস সেরেই আবার চলে যাই। গরীবের জন্য এই শহর নয়। কেঁচোর মত গর্তে বাসা বানানো।

রজব চলে গেল। হারেসের কানে তার সমস্ত কথা বাজে। এখানেও বন্ধন। গ্রামের বেড়ি সে কেটে ফেলেছে, নতুন রকমের জিঞ্জীর বুলছে এখন-তা বেড়ি নয় সত্যি, তবু বন্ধন।

পরদিন সকালে হারেস রজবের বাসায় গেল। সত্যিই সে দেশে পাড়ি দিয়েছে।

দু-সপ্তাহের মধ্যে বাগান-বাড়ির কাজ সমাপ্ত। চতুর্থ ভল্লকের দর্শন হারেস পেয়েছিল। দু-দিন আবার বেকার। নতুন কাজ যোগাড় হয়নি। হারেসের কাছে অসহ্য।

সেও ট্রেন চড়ে বসল। আরিফকে পত্র দিয়েছিল হারেস। বন্ধু তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছে। পথের আলাপ সে অবহেলায় নিঃশেষ করতে চায় না।

লোকাল ট্রেন বার-শহরের পল্লী ছেড়ে প্রান্তরে এসে পড়ল। হারেসের উন্মুক্ত দৃষ্টি অবলেহন করে দিগন্ত আর গ্রামের চিত্রপট সদৃশ কুটির। জলা-জাঙালের খন্ড-ছবি ট্রেনের গাড়ির সঙ্গে পলক দেখা যায় মাত্র। একটি মুহূর্ত তবু অবিদ্যমানতার ছাপ দিয়ে যায় তারা মনে। মুহূর্ত দিয়েই ত নিরবচ্ছিন্ন মহাকালের মাল্য রচিত।

সকালের হাওয়া খোলা জানালায় ঢোকে।

হারেস তার পুঁটলীর দিকে আনমনা দৃষ্টি জগত রাখে। গৃহীর মত সেও আজ অতি-বিচারী। কী আছে তার পুঁটলীতে? দোস্তানীর জন্য তাঁতের শাড়ি, বন্ধুর জন্য লুঙ্গী আর ছেলেদের খাবার। এই সামান্য উপঢৌকনে মন সরে না। সঙ্কীর্ণ পঁচিশ টাকার দশ টাকা খরচ করে ফেলেছে সে। আজকাল হারেস ধৃতি পরে। গায়ে সাদা হাফ-শাট। পকেটমার শহরে বিপজ্জনক। টাকা কয়টা সে ধৃতির খোঁটে বেঁধে কোমরে গুঁজে রেখেছে। যাবাবর জীবন কী তার শেষ হোলো?

অতীতে এক চাষীর কুঁড়ে ঘর আর লাউয়ের মাচাং তার চোখে ঝাঁকছিল নীড়ের স্বপ্ন। সফলতা আরো কত দূরে কে জানে, তবু গৃহীর মতই সে ট্রেনের কামরায় বসেছিল। আরিফের বাড়ির ছবি আঁকছে সে। পথে কুড়ানো হৃদয়তা, তার মত অবহেলিত মানুষের কাছে অমূল্য। আনন্দের নিঃসাড় যাতায়াত ধমনীর মধ্যে সে অনুভব করে। বিবাহী চোখের কোণ আধআধ বুজে আসে।

প্রভাত সূর্যের নবাবরূপ দশ-দিশে বিচ্ছিন্ন। বর্ষাধৌত নীলিমার চকিত স্পর্শ আলোয় আলোয় আরো মদিরা-সিক্ত হোয়ে উঠে।

দূরে কয়েকটা ঝাঁকড়া অশথের মাথায় জমে রয়েছে লাল মেঘ। শরাবের গেলাস চুরমার করে শাকী খনের পানশালা খুলেছে। বসুন্ধরার সাজসজ্জা নেপথ্যে প্রলুব্ধ করে মুসাফিরদের। রেল-লাইনের দুই পাশে কাকচক্ষু জলাশয়ে মাছরাঙা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। সাদা শালুকের বনে জলপিপি চঞ্চু দিয়ে ডানা মোছে। পূব আকাশের সূর্য জলাশয়ের হিল্লোলে কাঁপে। লাজল কাঁধে বেরিয়েছে গাঁয়ের কিষাণ। বলদ আর গো-পালের ছায়া পড়ে জলের উপর। একটা কালো গাই তৃষ্ণা মেটাল এইমাত্র। মুখ তুলে নিঃশ্বাস ছেড়ে সে-ও দলবর্তী হয়। বিমিত পানির আয়নায় পশুর মুখ এখনও কে যেন ধরে রেখেছে।

ছবির পর ছবির শোভাযাত্রা। শেষ দৃশ্যটি হারেস-কে প্রলুব্ধ করে। চলন্ত ট্রেনে সরে গেছে দূরে। হারেস তবু চোখ বাড়াল জানালা থেকে। অন্য মুখে বাঁক নিয়েছে ইঞ্জিন। আর কিছু দেখা যায় না। ছবি দেখার আকুলতা হারেসের মনে গুমরে উঠে। বিবর্ণ শহরকে অনেক দূরে ফেলে এসেছে সে।

অচেনা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। ফেরীওয়ালারা হাঁকে। ভিখারীরা মাছির মত জানালা ছেপে ধরে। হারেস একটা ভিখারিণী দেখল, তার কোলে ছেলে। সম্মুখে একজন বালক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বহুদিন আগে মার সাথে সে-ও হয়ত এমি বেশে সলিম মুনশীর দহলিজে দাঁড়িয়েছিল। বহুদিন পরে মার ঝান্সা স্মৃতি ভেসে এলো। করুণার এতটুকু দাগ নেই তাতে। হারেস একটা পয়সা ছুড়ে দিল। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, সে অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

গন্তব্য স্থানে ট্রেন পৌছল। প্রায় কাঁচা-দুপুর। এখান থেকে তিন মাইল পথ সামগড়।
গাঁয়ের নাম বেশ মনে আছে হারেসের। জিজ্ঞাসাবাদের ক্রটি রাখল না সে।
প্ল্যাটফর্মের সাদা বেড়ার ফটক পার হয়ে পুঁটলী কাঁধে হারেস ধীর পদক্ষেপে
এগিয়ে যায়।

তিন-গাঁ। অচেনা ভূঁই। তবু পরিচয়ের অনাস্বাদিত মিষ্টতা চারিদিকে। কতদিন পরে
খোলা মাঠের বৃকে অবাধ বিচরণের নেশা আবার ফিরে এসেছে। রৌদ্র আর ঘামের
উৎপীড়ন হার মানে সহজে।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা সড়ক আধ মাইল কয়েক মিনিটে শেষ হয়ে গেল। তারপর
গাঁয়ের আল আর সংকীর্ণ সড়কের পথ। বর্ষার সজীবতায় লুটোপুটি খায় তরুলতা।
ছোঁয়ার প্রবল তৃষ্ণা জাগায় নয়নে। প্রবাসী-পুত্রের জন্য সব কিছু জননীর মত অপেক্ষা
করছে। সমতল বাংলাদেশের গ্রাম পরস্পর বিভিন্ন নয়। তবু নতুন মনে হয় এ-ই দেশের
পরিবেশ। হারেসের কৌতুহলের সীমা থাকে না। অবোধ শিশুর মত সে পার্শ্ববর্তী খাদে
কালো পানকৌড়ীর জল-বিহার দেখতে থাকল একবার।

উঁচু ভিটের পাশে পথ। সারগাদায় ভরা বাস্তুর ঢালু জমি। পুঁই শাকের লম্বা সবুজ
ডগা পাতায় পাতায় পূর্ণ। উঠানের প্রান্তে একটা পাঁচ বছরের উলঙ্গ মেয়ে আঙ্গুল মুখে
দাঁড়িয়ে আছে। কতগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এলো। নিচে কেউ নামে না।
জোরে পা চালায় হারেস। এই জনপদ ঘন-বসতি। দু-প্রাশে ব্যস্ততার চিহ্ন। ডোবা থেকে
কারো ঘোমটা পরা পুত্রবধূ ধুচনী করে চাল ধুয়ে নিয়ে গেল। হেলানো তাল-গাছের উপর
বসে দু-জন ছেলে ছিপ ফেলছে। একজন একটা পুঁটি তুলল। হারেস চেয়ে চেয়ে দেখে,
পায়ের কামাই নেই তার।

এক ফাঁলি ফাঁকা মাঠের পাশে কয়েকটা পান-বুরুজ। খুব ছোট অবিশ্যি। পাটকাঠির
বেড়ার ধারে একজন লোক পানের লতা বেড়ার উপর তুলে দিতে ব্যস্ত। হারেস থামল।

— সামগড় এখান থেকে কতদূর, মশাই?

— আর কোশ-টাক পথ।

হারেসের ক্লান্তি নেই। আর এক ক্রোশ পথ বেশীক্ষণ লাগবে না।

বুরুজের ভেতরে কয়েকজন পান তুলছে। হারেস আবার ডাকল : কিছু যদি মনে না
করেন, শ' খানেক পান দেবেন। কত দাম?

— একটু দাঁড়ান।

পানের বুরুজের ভেতর থেকে কয়েক মিনিট পরে লোকটা বেরিয়ে এলো।

— দিন দু-আনা পয়সা। পঞ্চাশটা পান আপনাকে খেতে দিলাম।

হারেস বড় আপ্যায়িত হয়। অক্লেশে দু-আনা পয়সা বের করে দিল সে।

গাঁটরীর ভেতর পান রাখার সময় আনন্দে তার দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে।
লৌকিকতার ষোল-কলা এইমাত্র যেন পূর্ণ হোল।

জনপথ শেষে আবার মেঠো পথের অভিসার।

সামান্য ক্লান্তি অনুভব করে হারেস। মেঘ-ছেঁড়া রৌদ্রের উত্তাপ চড়া। বাতাস থেকে
গেছে কিছুক্ষণ। পাট আর ইক্ষু ক্ষেতের আওতায় সামান্য বাসাও সঁধোতে পারে না।

ধানের গাছ জেগে রয়েছে শান্ত প্রহরীর মত। মাঠ সবুজ আর নীল। ভাঙা কাঁচা-পথে বর্ষার পানি জমে রয়েছে। কাদায় নামতে হোলো হারেস-কে। ধারে ল্যাঠা বা টাকী মাছ বসেছিল, লাফিয়ে পানিতে মিশে গেল। আধহাঁটু পানি কিন্তু কাদা বেশী। কোন রকমে পা ধুয়ে ওপারের আলে উঠে পড়ল হারেস।

পান শুকিয়ে যেতে পারে, গাঁঠুরী নামিয়ে ভাল করে কাপড় চাপা দিল সে। তাজা পানের আশ্বাদ কেমন কে জানে, হারেস পান ছোঁয় না। পানে রাঙা ঠোট মাকে অদ্ভুত দেখাত।

ধানবনের মাঝখানে মাঠে পানি এসে জমেছে! তিওরের মেয়েরা হাঁকনী জাল নিয়ে ডানকিনে মাছ ধরছে। চিল উড়ছে মাথার উপর। এক-জোড়া দাঁড়কাক মাছের লোভে ক-ক শব্দ ডেকে গেল। সামান্য আগে মাঠের ভেতর ছিপছিপে পানি বাঁধ দিয়ে সেচনে লেগেছে তিনটি উলঙ্গ ছেলে। সবাই উলঙ্গ, মাথায় কাপড় বেঁধেছে। সর্বাস্থে লাল পলি মাটির কাদা। কালো ছেলেটা সেজেছে যেন।

— খোকা, মাছ আছে ত? হারেস জিজ্ঞেস করে।

— বেশি নেই। জবাব এলো।

— সামগড় কতদূর থেকে।

— সামগড়? আর পুয়োটাক রাস্তা। ঐ যে একটা বাঁকা তালগাছ ওর পাশ দিয়ে সোজা চলে যাও। তারপর কয়েকটা পাড়া পার হোলেই সামগড়।

ছেলেদের বাঁধের ওপারে ধান গাছের গোড়ায় পানি। একটা মাছ লাফিয়ে পড়ল। বড় সন্না পুঁটি। ছেলেটা রেগে উঠে, দূর মুশুই তোমার সঙ্গে কথা বলতে একটা মাছ পালালো। সোজা যাও।

চ্যাংড়ার বেয়াদপী হজম করল কীটস, এখনও পথ পড়ে রয়েছে। বাক্যব্যয়ের সময় নেই তার।

মাঝ-গগনে আশ্বিনের সূর্য। দু-পাশে মেঘ। সঙ্কীর্ণ তির্যক রেখায় আলোক ঝরে সাঁওতালের নীল-পালক গোঁজা তীরের মতো। মুখের উপর তপ্ত ছোঁয়াচে অনুভব করে হারেস। গামছা বের করে মাথায় দিল সে। আলপথ ঘাসে ভরা। পচা শামুকের খোলা ঠোঁকরায় দাঁড়-কাক। তার কটু গন্ধে পথ-চলা দায়। জমির সরস মাটির গুগলীর দল চরে বেড়ায় ঠোঁটে ভর দিয়ে। চরাট পথে আঁকাবাঁকা দাগ লেগে রয়েছে।

বাঁকা তালগাছের পর জন-বসতি। গাছের ছায়ায় পথ অপেক্ষাকৃত শীতল। গামছা গাঁঠরীর ভেতর রাখল হারেস। এক জায়গায় তেঁতুল গাছের ছায়া এত ঘন আজ সূর্য উঠেছে কিনা সন্দেহ হয়। পচা ডোবার উপর বর্ষার ছাপ সামান্য বিবর্ণ মাত্র। পাকা পানা-পাতা দেখা গেল দু-একটা।

সঙ্গতিপন্ন পল্লী বোধ হয়। হারেসের চোখে পড়ে, দু-একটা ভদ্রাসন, ইমারত, টিনের আটচালা, ইটের প্রাচীর— যার গাঁ-ঘেঁষে ফণী-মনসার বন ভীত-জনক আবছায়া ফেরে পথের উপর। পাকা সিঁড়ি মনসা-ঝাড় ভেদ করে উপরে উঠে গেছে কারো সদরে। দু-একজন পথচারীর সঙ্গে হারেসের দেখা হয়। আর কারো সঙ্গে কথা বলে না সে।

সরু নালার তলা দিয়ে ঝিরিঝিরি মৃদু স্রোত বাতাসে কাঁপছে। উপরে তাল গাছ

ছত্রাধারী। বিশ্রামের জন্য হারেস একটু দাঁড়াল। মরা গাছ ফেলা রয়েছে নালার উপর। সহজেই তা পার হয়ে গেল হারেস। বড় তেষ্ঠা পেয়েছে তার। জমি-সংলগ্ন একটা পুকুর। পদ্মপাতার থালা শুধু উপরে সাজানো। একদিকে ছোট ঘাট। হারেস নেমে গেল। পদ্মের নাল স্বচ্ছ-জলে দেখা যায়। শ্যাওলার সঙ্গে চুনো মাছ ঘুরছে নালের গায়ে গায়ে। কুলকুচি করে ঠাণ্ডা জলে পা ডোবায় হারেস।

পথ আর শেষ হোতে চায় না কি? আলের উপর তার সম্মুখে আরিফ-কে দেখে হারেস উৎফুল্ল হয়ে উঠে। হাঁটুর উপর লুঙ্গী তোলা। পায়ে একরাশ কাদা।

— আরিফ তাই!

আরিফ পেছনে ফিরে তাকায়। হারেসের বেশ-ভূষা স্বতন্ত্র। বাবুয়ানীর ছোঁয়াচ লেগেছে খানিকটা। তাড়াতাড়ি চিন্তে পারে না সে। শার্ট গায়ে হারেস-কে সে প্রথম দেখেনি। একটু বিলম্ব, চোখের ধাঁধা। তারপর ছুটে এসে সে দুই হাতে হারেস-কে জড়িয়ে ধরে। পত্র লিখেছিল বন্ধু। এত তাড়াতাড়ি তার প্রতীক্ষা সফল হলো!

পুঁতলী ছিনিয়ে নিল যেন আরিফ। হারেসের কম পরিশ্রম হয়নি। পথিক দুই বন্ধু। আরিফ নিজের ‘হালতের’ সাফাই দিল : জমির এক-কোণে কিছু পানি আছে। কড়াই বুনব। রোজ তদারকে বেরুতে হয়। না হলে রন্ধে আছে? ছেলেরা মাছের লোভে হিচে ফেলবে। ধান নষ্ট করবে। হারেস বলে, একটু আগে পদ্মপুকুর ধুয়ে নিলে ভাল হোত।

— না, একদম নিজের ডোবায় গিয়ে সাফ-সুস্থ হব।

দু-পাশে ধান-জমি, রোদে পা যেমে রয়েছে ধানের ঈষৎ-ধারাল পাতা এসে লাগে, কুটকুট করে শরীর। আর সামান্য পথ।

— এত দূরে জমি তোমার, হারেস বলে।

গায়ে জমি পাওয়া দুষ্কর। এ-পাড়ার নাম শতিপুর। আমাদের সীমানায়।

হারেস অভিযোগ করে : অত দূরে লাঙল-বলদ ঠেলে-আসা, বাজে মেহনৎ করতে হয়।

— তা ছাড়া উপায় নেই। এক বিঘে দুই জমির জন্যে কাচারীতে কী হাঁটাহাঁটি না করেছি। নায়েব-কে ঘুষ দিয়ে তবে উদ্ধার।

হারেসের দিকে তাকাতেই আরিফ বলে, বড় যেমেছ ভাই তুমি। ঐ যে খেজুর গাছ-ওয়ালা ভিটে—।

মালেকা শাড়ি পরে হাসে। আরিফ বন্ধুর দেওয়া লুঙ্গীর রং বার-বার দেখে। মালেকার হাসি আরো সেইজন্য।

— বন্ধুকে ও দাওয়াৎ দিলে। ভাল খাবার যোগাড় করো। ডোবায় সকালে মাছের ‘ফুট’ দেখেছি। বিকালে জাল নিয়ে যাও।

স্ত্রীর কথা আরিফ আনমনা শোনে। মুখে তার কালো ছায়া পড়ে। আতিথেয়তার চরমে কল্পনা তার মনেই আঁকা আছে শুধু, বন্ধুর জন্যে কিছু দৈ যোগাড় জরুরী। জাল ফেলে গয়লা-পাড়া যাওয়াই যুক্তি-যুক্ত।

— তুমি রান্না ভালো করো আজ ।

মালেকা বলে, একদিনে ত আর বাবুচিনী হয়ে যাবো না । যথাসাধ্য চেষ্টা করব ।

— তুমি ত বাবুর চিনি ।

— কি করে ।

আরিফ মুখ গম্ভীর করে ।— মিষ্টি গন্ধ না পেলে নায়েব-বাবু পাড়ায় এত ঘুরঘুর করে । বাবুর চিনি বৈকি তুমি ।

কথা শেষ হয় না । হঠাৎ হেসে ফেলে আরিফ ।

— যাও , ও সব ইয়ার্কি আমি পছন্দ করিনে ।

— আজ আবার নীল শাড়ী পরেছ ।

নুনের ছিটা দেয় আরিফ কাটা ঘায়ের উপর ।

— তোমার চোখ কী ফুটে গেছে!

নিজের চোখের উপর আরিফ দুই হাত চাপা দিল ।

— আহা শুধু আমার পোড়া চোখের জন্যে এত বাহার ।

হাত চাপা খোলে না আরিফ । সামান্য আঙ্গুল ফাঁক করে সে বলে, এইবার বলো তোমার জন্যে নয় । আমি ত অন্ধ-লাচার ।

দাঁত চেপে জোরে হাসে মালেকা । চোখে দুটু মি ভরা ।

— এমন করে দিন কাটলে চলবে । মেহমান ধরে এনেছ, খবর আছে?

মালেকার রং শ্যাম, চোখ দুটি ডাগর । দেহাবয়ব ঈষৎ স্থূল । স্নান ছাপ থাকলেও চেহারার ভেতর উজ্জ্বলতা আছে যা মনেরই সৌন্দর্যবিকাশ বলা চলে ।

— যো হকুম, জালটা এনে দাও ।

মালেকা রান্না ঘর থেকে জাল এনে রাখে । দুটি মাত্র ঘর । বাইরে খড়ো দহলিজ আছে, হারেসের আস্তানা সেইখানে ।

— ইঁদুরে কেটে গেছে ক'জায়গা দেখো । থিয়ে-জালটা যা-তা করে রাখবে । মালেকা জাল খুলে দেখে ।

— অত ঝাল ঝাড়তে হবে না । সুতো আনো । দু-জনে হাতাহাতি সেরে ফেলি ।

মাত্র দু-ঘর পড়শী । আরিফের মা-বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছে । জ্ঞাতি প্রতিবেশী একজন আছেন । বড় ঝগড়াটে । আরিফের সঙ্গে তাদের বনিবনা কম । নির্জন দ্বীপের স্বাধীনতা দু-জনে উপভোগ করে । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগীতার ভাবই তাই বেশী । পুত্র রসুল, তাদের পাঁচ বছরের ছেলে । কিছুটা বেপরোয়া স্বাধীনতা সেই খর্ব করেছে শুধু ।

বিঘে দুই জমির পর অন্যান্য প্রতিবেশীদের ঘর । রসুল দেখতে যায় সেদিকে । স্বামী-স্ত্রীকে তাই ছেলের সামনে কিছুটা স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয় ।

জাল সেলাই প্রায় শেষ, এলো রাসুল ।

— বাপ, তোমাকে চাচা ডাকছে ।

চাচা অর্থাৎ হারেস ।

আরিফ জবাব দিল : তুই তার কাছে ছিলি ত বাবা । কেমন শহরের মিঠাই এনেছিল তোর জন্যে ।

— আমি ত তার সঙ্গেই গল্প করছি।

রসুল বলে, জাল সেলাই করছ মাছ ধরবে?

— তোর চাচা খাবে কী রাঙে? তা বলে তাকে বলিস্নি এ-কথা।

— না, বাবাজী।

রান্নাশালের মাচাং থেকে একটা মুগী ফরফর শব্দে উড়ে এলো, তারপর কর্ণবিদায়ী ডাক কটকট শব্দ।

মুগীর পালকে সূতা বেঁধে চলছে জাল সেলাই। ডাক শুনে মালেকা বিরক্ত হয় : খালি ডাকনি আছে। আগার সাথে দেখা নেই। এমন হারামী মুগী কার গাদায়, কার চালে আগা পেড়ে আসবে।

— ওটার গলায় ছুরি চালাও। আরিফ উত্তরের অপেক্ষা করে।

— বেশি ধাড়ী রাখবে না একটা। বন্ধুর জন্য দুপুরে একটা করেছ, কাল অন্য একটা ধরো। তবে ধাড়ী নয়।

কথা ধরে আরিফ : হাত চালাও। আমার এদিক ত শেষ।

— আমি ত মদ্য নই, রাগ হোল বুঝি। আসলে বন্ধুর নামে নিজের ‘নোলা’ সড়সড় করছে। জিভটা দেখি হজুরের!

রসুল উঠানের উপর খোলামকুচি কুড়ায়। ডোবার ধারে ব্যাঙছিরি খেলাবে সে।

আরিফ ডাকে, রসুল।

— কেন বাপজী।

— তোমার মার সঙ্গে একটু জাল ধর তু সেলাই করুক। আমি তোমার চাচার সঙ্গে কথা বলে আসি।

খড়ো দহলিজ। তবু বেশ ধবধব লাল-মাটির লেপনে চকচক করছে ছিটে বেড়ার দেওয়াল। হারেসের আদর-আপ্যায়নের কোন ঝুটি হয়নি। মাদুরের উপর রঙীন কাঁথা মেলা। মালেকা বালিশের ঢাকনী তৈরী করেছিল অবসর সময়ে। হারেসের জন্য তাও দহলিজে বেরিয়েছে। বেনু সিপটীর ভাল পাখা হয়। মালেকা তার ধারে ধারে ন্যাকড়া রাঙিয়ে ঝালর তৈরি করেছিল। হারেসের হাতে সেই পাখা। কম কৃতজ্ঞ নয় সে। ঘুমানোর পূর্বে দুই চোখ আনন্দে অনিচ্ছায় বুঁজে এসেছিল।

আরিফ ও কম লৌকিকতা বজায় রাখে না। দহলিজে পা দিয়েই সে বলে, কোন কষ্ট হয় নি, হারেস ভাই।

— এত আদর আমার জীবনে বোধ হয় এই পয়লা-বার পাওয়া। আমার সব কাহিনী ত তুমি শোননি।

অতীত-কে কবর দিতে চায় হারেস। সাধু ইচ্ছা হঠাৎ বেরিয়েছে মুখ থেকে।

— ঘুম হয়েছে ভাল। পথ হেঁটে যা কষ্ট পেয়েছ।

হারেস হাসে।— দেড় ক্রোশ পথ আবার পথ-হাঁটা।

— আর একটু ঘুমোও।

আরিফের উদ্দেশ্য, সেই অবসরে আমি মাছ ধরে আসি।

হারেস অনুনয়-সুরে বলে, না আর ঘুমোব না। রসুলের সঙ্গে কত কথা হলো!

— না, তবে ঘুমোও ! শুয়ে জিরোও । আমি পান পাঠিয়ে দিচ্ছি ।

— পান ত আমি খাই না ।

— খেতে দোষ কী । আর দোস্তানীর হাতের পান ।

লজ্জা পায় হারেস । দুই জওয়ান চোখের হাসি বিনিময় করে ।

— এত পান কেনার কী দরকার ছিল?

মাথা দোলায় হারেস ।— এ ভাল বিপদ, আমি খাই না বলে আর কেউ খাবে না ।

আবার হাসে হারেস ।

— আমার একটু কাজ আছে । এক ঘন্টার ভেতর আসব । সন্ধ্যা-বেলা বেড়ানো যাবে ।

আরিফ চলে গেল ।

দহলিজের কামরায় বসে হারেস হাই তোলে । আরো খানিক ঘুমোবে নাকি সে । বহুদিন পর এসেছে অখণ্ড বিশ্রামের আমন্ত্রণ । সম্মুখে ফাঁকা মাঠ । দক্ষিণের হাওয়া আসে ধান ক্ষেতের মর্মর বৃকে । খোলা খটখটে প্রাঙ্গন । দহলিজের পূর্ব টেরে শুধু কয়েকটা বসতি । তার কোন কোলাহল পৌছায় না । এমন জায়গায় ঘুম আসারই কথা ।

বালিশের চাকনী দেখতে লাগল হারেস । সংসার-নিপুণ নারীর স্পর্শ খোঁজে না সে । কারিগরির প্রশংসা-উন্মুখ মন তার । হারেস পুনরায় শুয়ে পড়ে ।

ক্লিষ্টমুখ শহরের বৈকাল এখানে নামে না । বিশ্রাম, বিশ্রামই ত সে চায় ।

নৈশ ভোজনের সময় আরিফ বন্ধুকে নিজে ঘরে নিয়ে এলো । দুপুরের আতিথেয়তা সে বাইরে সম্পন্ন করেছিল । বেগানা পুরুষ গোড়ার পর্দানশীনরা পাছে কিছু বলে ।

হারেস ঘরে ঢুকে দমে যায় । দারিদ্র্যের চিহ্ন চারিদিকে প্রকট । ভাড়ার ঘর আর শোয়ার ঘর একসঙ্গে মিশে আছে । আলিনায় ময়লা কাঁথা ঝুলছে । একদিকে মাচাও কাঠের রং-চটা সিন্দুক, অন্যান্য তৈজসপত্র । মেঝের বিছানা বেশ তক্তকে । এই জৌলুষ অন্য দিকেও পরিষ্কৃত । মামুলী হলেও নিজস্ব শালীনতা আছে তার । বাতাস খেলে, পুবের জানালাটি বড়, রৌদ্রের উঁকি সকালেই পাওয়া যায় । তবু ভাল লাগে না হারেসের । আরো প্রাচুর্য চেয়েছিল সে বন্ধুর কাছে । এরা কী তবে তারই মতো গৃহসুখী ভাগ্যহত?

চুড়ির আওয়াজ আসে আনাচ-কানাচ থেকে । হারেস বোঝে উঁকি-ঝুঁকি মারছে কেউ । নতুন লোক-দেখার কৌতূহল গাঁয়ের মেয়েদের সহজে নিবৃত্ত হয় না । সঙ্কোচ লাগে হারেসের । স্বাভাবিক হোতে পারছে না সে ।

পিদিম জ্বলছিল ঘরে । জানালার ওপরেও আলো ঠিকরে পড়ে । ভিটের পার্শ্ববর্তী গাছের ছায়া ঘিরে জমাট অন্ধকার । কুঁচ বকের প্রেতায়িত কণ্ঠস্বর ডোবার ভেতর প্রতিধ্বনি তোলে । বাইরের খম্খমে পৃথিবী ।

ঘরে খাওয়ার আয়োজন চলছে । আরিফ ছুটাছুটি করছে । দরজার সম্মুখে সে দাঁড়িয়ে থাকে, এগিয়ে যায় । মালেকা ভাত ব্যঞ্জনের থালা নিয়ে আসে ।

হারেস রাজভোগের দিকে চেয়ে লজ্জিত হয়, মনে মনে হাসে । মুগীর গোস্ত, মাগুর মাছ, দই, শাক, ডাল আর আলু ভাজা । তার মত ঘরামীর জন্য রাজভোগ ছাড়া কী ।

পিতলের চক্চকে থালা । মালেকা নিজে তেঁতুল দিয়ে পরিষ্কার করেছে ।

থালো দুই বন্ধুর জন্য আলাদা।

খাওয়ার সময় এক কাণ্ড ঘটে গেল। হারেসের থালার উপর বড় বাটি উপুড় করা। হাসিমুখে বাটি তোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা মুগ্গীর ছানা চিকচিক করে দরজার উপর গিয়ে পড়ল।

বাইরে চৌকাঠের ধারে চাপা হাসির স্বরধ্বনি বাজতে থাকে। আবার নতুন থালা এলো। আগেকার থালার উপরে সামান্য ভাত ছিল মাত্র।

আরিফ হাসে : দোস্তানীর কাছে ঠকে গেলে, ভাই!

— তা ঠকলামই ত। কাঁচা মুগ্গী যদি খাওয়ানোর ইচ্ছা ছিল আগে বললেই চলত। হারেস হাসে। শুধু হাসি নয়। প্রাণদেবতার জন্য অঙ্গুলি।

ডাল কম পড়েছিল, আরিফ বাইরে গেল একবার। মালেকা ডাল নিয়ে অন্ধকারে প্রতীক্ষা করছে।

ফিস্‌ফিস আওয়াজ ওঠে, এমন বোকা বন্ধু তোমার।

হারেসও শোনে আর মুখ টিপে-টিপে হাসে।

— তোমার দোস্তানী বলছে বড় বোকা বন্ধু আমার।

হারেস জবাব দিল না। খানিক পরে সে বলে, দোস্তানীর কাছে বোকা হতে দোষ নেই।

রসূল ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার অভাব হঠাৎ অনুভূত হয়। হারেস জিজ্ঞেস করে, রসূল কোথায়?

— সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

— আহা! ছেলের মাও ঘুমিয়ে পড়েছে।

হারেস সহজ হয় নিমিষে। মূর্খতা থেকে বহু কাল আর স্থানের দূরত্ব পার হয়ে এসেছে সে। খাওয়ার সঙ্গে শত প্রকার আনন্দ বন্যার ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়েছে।

আরিফ হাতছানির ইশারা বোঝে। থালা ছেড়ে বাইরে এলো, চৌকাঠ থেকে সে বলে, দোস্তানীর জবাব : ছেলের মা ঘুমোলে ছেলের বাপ-চাচা পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে এতক্ষণ বাধ্য হোত।

সঙ্কোচ কেটে যায়। প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যে জোর-গলায় হারেস বলে, এ-ভয় দেখাবেন না, আমিও রান্না জানি।

মধ্যস্থতার পদ আরিফের। প্রশ্নকারীর মুখের কথা অপরের নিকট গোচরীভূত করে।

— তবে হাতে চুড়ি দেখছি না কেন?

— ওটা মেয়েদের একচেটে ব্যবসা নয় যে হাতে চুড়ি দরকার হবে। কাল খুন্টি দিয়ে দেখবেন।

— মকতবের মৌলানা নই যে আবার পরীক্ষা নেবে। বাধা দিল আরিফ।

— কথা বলেই পেট ভরাতে চাও, দোস্ত। সেও আবার থালায় এসে বসল।

হারেস দেখে, ঘরে একটা ভাঙা তক্তপোশও নেই। মাটির শিশুরা মাটির সঙ্গ ছাড়তে চায় না যেন!

রাত্রি হয়েছিল অনেক। দহলিজে এলো তারা। আরিফ বলে, আমি এখানে ঘুমোব।

- কি দরকার! ভয়টয় নেই আমার।
- তবু নতুন জায়গা। আরিফ সন্তুষ্ট হয় না।
- না, তুমি ঘরে যাও।

নৈশ বাতাসের আনাগোনা শুরু হয়েছে। মেঘহীন মধ্য-গগন। নীলের উপর তারার চুম্বকুড়ি বাঈজীর চকিত, বাঁকা চোখ-ইশারার মত।

গভীর পরিতৃপ্তি হারেসের বুকে। বানভাসি খড়কুটো হঠাৎ নীড়-রচয়িতা বিহঙ্গিনীর গলার পালকের স্পর্শ পায়। বিস্মিত হারেস। নিষ্ঠুর পরিবেশের ভেতর প্রাণসত্তার এত উদ্দাম কল্লোল।

জুলুম-অন্যায়ের শত ক্রুর-চক্র-নিষ্পেষণ এদের ধ্বংস করতে পারে না, শত মন্বন্তরে মরে না ওরা। ওদের প্রাণতরু বিদীর্ণ পাষাণেও মূল মেলে।

আরিফের বলদ-জোড়া আথালে খড় চিবায়। দহলিজের বাম পাশে কয়েকটা খুঁটা। একটায় ছাগল বাঁধা রয়েছে।

হারেস চেয়ে চেয়ে দেখে। লাঙলও আছে তার বন্ধুর। তার সঙ্গে যদি মেহনতের শরীর থাকে, আর কী চাই একজন জওয়ানের? যিজি শহরের চেয়ে এই জীবনের মাদকতা ঢের বেশী।

আরিফ বলে, আমার বলদ-জোড়া জয়ীফ এ-গুলো দিয়ে চাষ চলে না।

— একটা দামড়া কিনে দু-বছর টানলেই বলদ। জবাব দিল হারেস।

— তা-ও কিনেছিলাম পাঁচ টাকায়। মড়কে শেষ হয়েছে গেল। এই দুটো টিকে আছে কোন রকমে। বাবার আমলের বলদ। আমি কিছু করতে পারিনি ত ভাই!

হারেসের গোপন কামনা বগ্নাহীন ঘোড়ার মত ছুটে চলে। তারই দ্যোতনায় সে আবার জিজ্ঞেস করে : এক জোড়া বলদের দাম কত?

— চল্লিশ-পঞ্চাশ।

একটু নিরাশ হয় হারেস। সহজে নিজে আসে না তার উৎসাহ।

— আচ্ছা, এক কাজ করা যায়। দুটো দামড়া কেনা যেতে পারে দশ-বারো টাকায়। দেড় বছর সেই ত লাঙলের জুগিগি হবে।

আরিফ বন্ধুর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে। — তা হয়, বন্ধু। তোমার কাছে লুকোব না। কিন্তু এক সঙ্গে অতগুলো টাকা। আবার যদি মড়ক লাগে।

— সব কাজে কপাল-টোকা। কিছুটা ঝুঁকি ত নিতে হয়।

আরিফ সায় দিল : তা নিশ্চয়। তবে ছাগলে বেশি লাভ।

— তোমার ছাগল দেখছি মোটে একটা।

— সে আর এক দুঃখের কথা, দোস্তু। দুটো ধাড়ী ছিল। একটা দেখছ তো। সেটাকে পালতে দিলাম। আমার ঘরে মোটেই বিয়োল না। হরি নাপিতের ঘরে গিয়ে চার বাচ্চা। দুটো খাসী দুটো পাঁঠী। আমাকে ধাড়ী একটা খাসী। আর পাঁঠী বাচ্চা দিয়ে গেল। মড়কে সব খতম।

— যত ঝড় গরীবের উপর।

হারেস বিজ্ঞের মত বলে।

প্রভাতের সূর্য বাঁশ-বনের মাথায় ঝলমল করে। হিমেল আশ্বিনের সকাল উত্তপ্ত হোতে থাকে।

— একা-লোক ক'দিক দেখি। রসুল যদি একটু বড় হোত!

নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গতা কাটানো এত শক্ত। হারেসের মনে দোলা লাগে।

— জমির দিকে মন দিলে এ-সব কাজ হয় না। ছাগল রাখলে খোঁয়াড়ের পয়সা দিলে চলে না। এত তদারকী একার দ্বারা হয় না।

আরিফের খেদ বড় করুণ শোনায়।

— তোমার জমি-জায়গা গাঁয়ের ভেতর সব নয়?

আমার জমি? আরিফ হাসে। — বাবার আমলে জমি-জায়গা যা ছিল তখন-ই 'বেচারাম' লাগে। এখন ফতুর। সব 'বেচারাম'-এর পেটে। ভাগে চাষ করছি। নিজের জমি থাকলে, এমন দূরবস্থা! যেগুলো খাজনায় তার হার বিঘে- পিছু তিন-চার টাকা।

হারেস দুঃখিত হয়। বন্ধুরও নিজস্ব জমি নেই!

— কিছু জমিয়ে জমি কেনার চেষ্টা করো না?

আরিফের হতাশা মুখের চুক-শব্দে বেরিয়ে পড়ে।

— কি করে জম্বে। ভাগচাষীর আবার জমে। তোমার দোস্তানী সংসার বোঝে, তাই বেঁচে আছি। দিন-আনা, দিন-খাওয়া। বর্ষকালে একবার ঘরের খোরাক ছিল, তাই কোন কষ্ট হয় নি। এবার কায়ক্রেমে চেষ্টা করব কিছু জমাতে।

— নিজের ভবিষ্যৎ একটু দেখা দরকার।

— তা কি আর ভাবি না। অসুখবিসুখ রোগদেড়ী ঝড়-ঝাপটার পেছনে ত মাঝে মাঝে ফতুর হোতে হয়। ভাল আছে। হওয়া অসুখ। কবরেজ কম পয়সা নিয়েছে।

জীবন-সংগ্রামের কাহিনী হারেস শোনে। গৃহসুখ তবু তাকে প্রলুব্ধ করে। আরিফ বলেছিল, সে নিঃসঙ্গ। সেই কথার বৃদ্ধবৃদ্ধে তার মন ভরে যায়।

একবার দহলিজের ভেতর গেল সে। তার শার্ট ঝুলছে। পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট-সহ বাইরে এলো সে।

— দোস্ত, এই পাঁচ টাকা দিয়ে একটা ছোট দাম্‌ড়া কিনো।

আরিফ ইতস্ততঃ করে। বন্ধুর অযাচিত করুণা লজ্জা ঢেকে দেয় তার সর্বাস্তে।

— না, তা হয় না। তুমি মেহমান, দুদিনের জন্য এসেছ। এ ভাল দেখায় না।

হারেস জোর করে নোট তার হাতে গুঁজে দিল। ঘুম দিচ্ছে নাকি হারেস? নিঃশ্বাস ফেলার জায়গাটা স্থির করে ফেলেছে সে। শ্বাসরোধী জীবিকা-সংগ্রামের বোঝা তার ভাল লাগে না।

অন্দরে মালেকা ভারী অসন্তুষ্ট হয়।

— একি তোমার ব্যাভার শুনি। চিরকাল হাভাতে। মেহমানের কাছে ঘরকন্নার কথা! আবার টাকা নিয়েছ হাত পেতে!

— আমার বন্ধু। বলতে দোষ কী!

মালেকা আরো ক্রুদ্ধ হয় : বন্ধুর কাছেই লোক গোপন করে। কাল সন্ধ্যায় কেরোসিন ছিল না। তাই বোতল দিয়ে বললাম, সদর দিয়ে যেও না। মেহমান কী ভাববে। কাল বলেছিলাম, খিড়কী দিয়ে যেতে!

রাগান্বিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে মালেকা আরিফের উপর।

— আমিও খিড়কী দিয়ে গেছিলাম।

— সব কথা ভেঙে না বললে তুমি বোঝ না। যাও, টাকা ফেরৎ দাও।

— মনে কষ্ট করবে।

মালেকার আর কথা চলে না। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। সেও মনের হৃদিস রাখে।

বিকালে হারেস বাজারে আরো দু-তিন টাকা খরচ করল। অরিফের ছেলেকে কিনে দিল একটা জাপানী খেলনা মোটর। মিষ্টি আর শাক-সজী বাড়ির জন্য।

কিসের নেশায় খরচ করে হারেস? তবু সে আনন্দ পায়। সঞ্চয়ের প্রতিজ্ঞা হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়।

মালেকা রাতে স্বামীর উপর আগুন হয়ে উঠে।

— তোমার বন্ধুকে নিয়ে থাকো। আমি চললাম। পয়পয় করে বলছি মেহমানের উপর এত জুলুম করবে তুমি। হা-ঘরে, হা-ভাতে!

— আস্তে কথা বলো। তার কানে পড়বে।

আরিফ মালেকার ক্রোধ উপলব্ধি করে।

— সত্যি বড় অন্যায় হয়েছে।

— শুধু অন্যায়। ঘাট।

মালেকার মুখ ক্ষোভে অপরূপ শ্রী ধারণ করে। আরিফ সে-দিকে চোখ ফেলতে সাহস করে না।

আনুমান সে বন্ধুর কাছেই সন্দের উপস্থিত হয়। দহলিজের কোণে পিদিম জ্বলছিল। হারেস বাইরে অন্ধকারে একা।

রসুল সব ফাঁস করে দিয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর কলহ হারেসের কানে যায়। মালেকার প্রতি তার শ্রদ্ধা জাগে। রাতে খাওয়ার সময় আবহাওয়া আরো সহজ করে ফেলে হারেস।

রসুলের মধ্যস্থতায় সে বলে, দোস্তানী সাহেবা, মাফ করবেন। আমাকে পর মনে করবেন না। আরেফ আমার ভাইয়েরই সমান।

মালেকা অনুমান করে সব-কিছু। রসুলের মারফৎ জবাব আসে : মা, আপনাকে সালাম জানালে। আপনার ব্যাভারে তা বুঝতে বাকী থাকে না।

অরিফ নিস্তক। বন্ধুর খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় তার থামল। এই কয়েকদিন তার অন্য কোন কাজ নেই। কৃষক সমিতির জবর সদস্য সে, আজ কয়েক দিন অনুপস্থিত।

হারেসকে এ-সব ঝগড়াটে ফেলতে চায় না সে। বারো মাস দুঃখ ত লেগেই আছে। বিদেশী বন্ধু একটু নিশ্চিত হোক।

চাষবাস জনমনিশ ছাড়া খাটে আরিফ। নচেৎ সংসার চলে না। তারও খোঁজ রাখে না

সে। অজানিতেই সে নিজের আহওয়ালের কথা বলে ফেলেছিল সেদিন। ইশিয়ার খুব আরিফ তারপর।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হারেস পছন্দ করে না। এত দূরে দূরে থাকা তার পক্ষে কষ্টকর। আত্মীয়তার সান্নিধ্য চায় সে। অথচ নিজে সে কিছুই বলে না। অযাচিত সামগ্রী মূল্যচ্যুত হয়, সে জানে।

দশ-বারো দিন পরে মালেকা আরিফের হাতে নিজের দু'ছড়া পৈঁচি দিয়ে বলে, বন্ধক রেখে এসো। বন্ধুর পয়সায় এতদিন খাতিরদারী করলে, নিজে কিছু করো, মুনিশ পর্যন্ত খাটলে না ক'দিন।

মাথা নিচু করে আরিফ।

— যাও, আমি রাগ করছি নাকি।

— আর ছাড়িয়ে দিতে পারব? হতাশাব্যাঞ্জক ছায়া আরিফের চোখে।

— যাক না পৈঁচি। আমার কপাল ত আর যাবে না তার সঙ্গে।

গমনোন্মুখ আরিফকে মালেকা আরো বলে, কিপটেপনা করো না, ভাল মাছ তরকারী এনো।

হারেসও আরিফের সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার অভিপ্রায় জানায়। রাজী হয়নি আরিফ। শেষে এক শর্তে সে মত দিল : বন্ধু হাটে এক পয়সাও খরচ করবে না।

গঞ্জে বেনেদের দোকান প্রথম গন্তব্যস্থল। টাকার ভান্ডার ত সেখানে। আরিফ তাই বিব্রত হয়। হারেসের সম্মুখে বন্ধকী ব্যাপার তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অজুহাতের আশ্রয় খোঁজে সে। গঞ্জের এক-টেরে বকুলতলায় হাটবার, হাটবার বৈরাগীরা গান করে। আজ খুব আসর জমিয়েছিল। এক বুড়ো বৈরাগীর সঙ্গে বৈরাগিনী এসেছে। তা নিতানৈমিত্তিক ব্যাপার, কিন্তু এই বৈরাগিনীর রূপ হাটে ফেটে পড়ছে। বয়সে নিতান্ত কাঁচা। একতারা জুড়ে কীর্তন চলছে। ছেলেছোকরা হাটের লোক ভেঙ্গে পড়ছে এই আস্তানায়।

আরিফ হারেস দু'জনেই গান শোনে। অবশ্য আরিফ অন্যমনস্ক।

মনোহর শাহী কীর্তনের দুটো পদমাত্র দোহার চলছে। আরিফ বলে, দোস্ত তুমি গান শোন আমি এখনই আসছি।

— আমি সঙ্গে যাব।

— না।

হারেস আনন্দ পায়। বঙ্গনী একতারা বাজছে। রূপসী বৈরাগিনী মন্তব্যের আকর্ষণও বটে। রসিক হাটুরের মুখে কোন কথা আটকায় না। বনবন পয়সা পড়ছে বকুলতলার রোয়াকে।

এই সময় হাট জমাট বাঁধে। ভিড় পাতলা করে দিয়েছে বৈরাগিনী। 'ঢলঢল অঙ্গ নবনী বহিয়া যায়' ভিড়ের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তি করে গানের সুরে। দর্শকদের মধ্যে দাঁত চাপা থাকে না কারো।

হারেসেরও হাসি পায় আজ। দূরে আরিফ চোখে পড়ে তার, বেনের দোকানের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। বেনের দোকানে আরিফ! মীরগাঁ ছেড়েছে হারেস এক বছর। গাঁয়ের মানুষ

বেনের দোকানে কত দুঃখে উঠে, সে জানে। হয়ত দোস্তানীর গহনা খরিদে গেছে আরিফ।
গানের মউজ উঠেছে। তারি মধ্যে ফিরে এলো আরিফ।
—ভাই, আমি বাজার করি। তুমি গান শোনো।
বৈরাগিনীর কণ্ঠস্বর চলন-সই মিষ্টি। অঙ্গভঙ্গী আর বয়স সে-অভাব পূর্ণ করে। হারেস
আরিফকে সম্মতি দিল।

ননদিনী, বলগে নগরে।

মরেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।

তপস্বী-তপস্বিনীর সরু-মোটা দুই গলা মিশে অপূর্ব ঝঙ্কার তোলে।

এখানে সকলেই ডুবতে বসে।

কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে হারেস পেছনে তাকায়, আরিফ।

—তুমিও ডুবতে বসেছ নাকি, বন্ধু। চলো বাড়ি ফিরি।

হারেস হেসে বন্ধুর অনুসরণ করে। একটু দূরে এসে সে বলে, বেনের দোকানে
গিয়েছিলে কেন?

বেমালুম বুটের বেসাতি গুরু হয় : দোস্তানীর গহনা দরকার।

—কিন্লে না?

—না দরে পড়ল না।

—চলো, বেনের দোকানে গহনা দেখে আসি।

—তা হয় না। বাধা আসে আরিফের কাছ থেকে।

—আমি কিছু খরচ করব না।

হারেসের জিদ এড়াতে পারে না আরিফ।

রূপার বিছার দর জিজ্ঞাসা করে সে দোকানে।

—দশ আনা ভরি রূপা। ছ-ভরি হয় এখন, ওজন করব?

—দশ আনার কম হয় না?

দোকানদার জবাব দিল, ওই ত তোমার সঙ্গে এইমাত্র নতুন পৈঁচি বন্ধক দিয়ে গেল,
কত করে দর ধরলাম জিজ্ঞেস করো।

আরিফ মাটির সঙ্গে মিশে যায়। হারেস তার দিকে তাকায় না।

—ক'টাকায় বন্ধক রাখলে, দোকানী?

—পনের টাকা।

—যাক পরে আসব।

দুইজনে বেনের দোকান থেকে নেমে পড়ল। আরিফ মুখ-নীচু করে হাঁটে। হারেসের
কষ্ট হয়। না-ধরাছোঁয়া সান্নিধ্যের মধ্যে তার আসন টল্ছে। এত দূরে দূরে মানুষের
হৃদয়ের সীমানা।

আশ্বিনের খন্ড মেঘ উড়ে যায়।

হারেসের দুই চোখ সজল হয়ে উঠে।

দু-দিন পরে হারেসকে এগিয়ে দিতে এলো আরিফ। দুই বন্ধুর মন হাল্কা নয়, অজানিত
আশ্বাদের স্মৃতি হারেসের বুকে। মাঝে মাঝে অদৃশ্য আঘাতে সব বিশ্বাস হয়ে যায়।

রসূল বলেছিল— মা বললেন, আবার কবে আসবেন। তারপর কলাপাতায় বাঁধা এক ঠোঙা খাবার দিয়েছিল সে হারেসের হাতে।— মা তৈরী করেছে, নাস্তা করবেন।

—আসব বৈকি বাবা। এ-ত আমার আপনার ঘর। মাকে দোয়া বলো।

বালকের আধ-ভাষ, অদৃশ্য নারীর মমতা সে ছিঁড়বে কি করে। রসূল আবার ছুটে এসেছিল। হারেস হাতে একটা সিকি গুঁজে দিতে ভুলেনি।

পাড়া ছাড়িয়ে একবার পেছনে তাকিয়েছিল হারেস। ভিটার উপর এক নারী গাছের আড়ালে চেয়ে আছে। বালকের চোখ তারই দিকে নিবদ্ধ। তরুলতার ভেতর অজানা আকর্ষণ।

মাঠে দুইজনের সংলাপ চলে।

—আবার এসো ভাই, শিগগীর। একটা চিঠি দিও।

—নিশ্চয়। বড় ভারাক্রান্ত হারেসের মন। আপন করে নিতে মানুষকে এত দেবী হয়। সলিম মুন্শী বিশ বছরেও দূরে রয়ে গেল। আরিফ কী তাদের স্বগোত্র! ব্যবধানের পাহাড় শুধু পদে পদে।

হঠাৎ হারেস বলে ফেলে, তুমি জান ত ভাই আমি মমীন।

আরিফের মন তার ক্ষত উপলব্ধি করে না। লৌকিকতা রক্ষার জন্য বলে, তাতে কী হয়েছে, আমি কোন্ সৈয়দের বাচ্চা?

—তুমি ত শেখ।

—ও কথা আমি মনেও জায়গা দিই না। সমিতির ভেতর চুকে দু-বছরে বহুত কথা শিখেছি। ও-সব ফাঁকা কথা। এই জন্যে বৃষ্টি তুমি কষ্ট পেয়েছ!

—না।

—আমারও কষ্ট হবে তা-হলেও সব খোদার শান। দু-জনে বিপদে এক জায়গায় হয়েছিলাম। না-হলে কে কা, কে চিন্ত।

কথার মোড় ফিরে যায় তখনই : আবার আসবে বলো। গরীব আমরা তুমি ত জান।

পথের উপর দাঁড়ায় হারেস : নিশ্চয় আসব। হয়তো এক হপ্তা পরে দেখবে রূপ করে এসে পড়েছি।

হাঙ্কা মনে হাসে হারেস।

দিগন্তের শুভ মেঘের পটভূমি হেলান দিয়ে তাল-গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সবুজে নীলে প্রান্তর একাকার।

বারণ শোনে না, স্টেশন পর্যন্ত হারেসের সঙ্গে এলো আরিফ।

ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পড়েছে। ট্রেনের হুইশেল শোনা গেল।

ফ্যান ফেলতে আলি বাইরে এসেছিল। চটের পর্দার উপর হারেসের ছায়া দেখে সে লাফিয়ে উঠে। সোজাসুজি হারেসের হাত ধরে সে হাঁকে, এসো-এসো অমাবস্যার চাঁদ, ডুমুরের ফুল। একদম বারো দিন গায়েব!

—দোস্তের বাড়িতে দেবী হয়ে গেল।

—না ডুব মেরেছিলে। চোখ মটকায় আলি।

—বারো দিন কেটে গেল। আশ্চর্য্যো। হারেসের চোখেও বিস্ময়।

—চলো বাসার ভেতর। আলির অভিনন্দন।

সঙ্গে সঙ্গেই হারেস বলে, মিস্ত্রি এখন-ও আসে নি?

—না, আজ ক'দিন কাজ পড়েছে। তাগাদায় গেছে।

শার্ট খুলতে খুলতে হারেস জিজ্ঞাসা করে, কোথায় কাজ হচ্ছে?

—আরে বাজে কথা রাখো। বলছি তোমার ভাত চাপাতে হবে। ছোট হাঁড়িটা ধুয়ে আনি।

—আমি হোটেলে খেয়ে আসব।

—তা হয় না।

এতক্ষণ ভুলেছিল হারেস, হঠাৎ মনে পড়ে তার বন্ধুর বাড়ির পাথের কথা।

—আমার সঙ্গে খাবার আছে।

হিসেবী হারেস খোরাকী খরচ আজ দিতে চায় না।

দেখি খোলা যাক।

তোফা। একজনের জন্য যথেষ্ট। এক ডজন পুর-পিঠে। দুটো বড় চিংড়ি আর আলু ভাজা।

—ভাগভাগি করে খেলেই চলে যাবে।

আলি ভাজা-আলুর টুকরো মুখে পুরে বলে, ঠিক হয়।

দরমার উপর বসল হারেস। কাজ হচ্ছে কোথায়?

—ঘরামির কাজ নেই। রাজমিস্ত্রীদের যোগাড়। দুই জনে এক সঙ্গে মুখ বাঁকায়।

আলির হিংসা হয় যেন : তুমি যাওয়ার পর চারিদিন কাজ ছিল না, শহরে বসে খোরাকী খেতে হোলো। তোমার বন্ধুত্ব ভাল!

সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হারেস। বন্ধুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা বাড়ে। হাতে মুখ ধোয়ার পর ঘেমে উঠে সে। কড়িকাঠের মাথায় ছোট জানালা বাতাস সেঁধোবার পথ-ও নেই। আলি চুলের পাশে ঘামে স্নান করছে। এমন সময় আবার গ্রামোফোন বাজায় কে? তাদেরই পাশের ঘরে গ্রামোফোন বাজছে। বাড়িওয়ালার ছেলে নাসিমের এত দুঃসাহস! হারেস কৌতূহল জানায় : নাসিমের গ্রামোফোন নাকি।

—হ্যাঁ।

তরকারী কুটছে আলি। হারেসের দিকে না-চেয়েই সে জবাব দিল।

—বাপ-ব্যাটায়া ঝগড়া মিটে গেছে?

—কুকুরের ঝগড়া। খ্যাক। তারপর লেজগুড়িয়ে মুখ সোভাসোভি।

খুথু ফেলতে বাইরে গেল আলি।

তা-হলে বারো দিনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অবাক হোল সে, বাড়িউলী চাচীর মুখের পর্দা খসে গেছে। হারেসকে সামগড়ের কথা জিজ্ঞাসা করল। নাসিম আব্বাজানের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে গেল।

একে একে সবাই আস্তানায় জুটে। মিস্ত্রী চটে গেল হারেসের উপর। কাজ পড়েছে। বেশি লোক নেই তার। এমন ডুব দিয়ে বসে থাকা অনায়া। শুকুর দেশে চলে গেছে।

বাসার একজন লোক কমেছে হারেসের কাছে তা সুসংবাদ। হাত-পা ছাড়িয়ে শোয়ার জায়গা হবে। খোরাকী মাথা পিছু বেশি পড়বে, তা জেনেও সে আনন্দিত হয়।

মেহেরালি গাঁয়ের কথা জিজ্ঞেস করে, ছ-বছর বয়স পর্যন্ত সে গাঁয়ে ছিল। গাঁয়ে মানুষ। আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আজকাল যাতায়াত বন্ধ হোয়ে গেছে। ছেলের বিয়ের সময় বৃদ্ধ একবার গ্রামে গিয়েছিল। সেও সাত বছরের কথা।

মেহেরালির রোয়াকে বাতাস বেশ আসে এই আকর্ষণ। নচেৎ গল্প তার সঙ্গে জমে না। বয়সের ব্যবধান সব ফাঁক স্থির রাখে।

হারেস খেই টানে, গাঁয়ে কে আছে আপনার?

—চাচার ভায়েরা আছে।

—তারা চাম্বাস করে না?

—কেউ-কেউ চাম্ব-বাস করে। গরু ব্যাপারী আছে দু-জন। এই সব কাজ আর কী! বৃদ্ধ থামে। হাই উঠে হারেসের। বেশি রাত-জাগা তার পক্ষে ভাল নয়। বাসায় ঘুমোনো দুস্কর। একবার ভাবল, রোয়াকে যায়। কার্তিকের হিম ঝরছে। মাথা ধরেছিল হারেসের। তাই সাহস হয় না তার।

আলিও ঘুমায় না। বাসায় বসে বিড়ি ফুঁকছিল। মিস্ত্রী ঘুমিয়েছে। এই সুযোগ।

—হারেস, চলা বাইরে একটু ঠান্ডা হোয়ে আসি। আপত্তি দেখা দিল না তার।

পুকুরের পাশে রোয়াক। পানীর শীতলতা অস্তিত্ব আছে। দু-জনে এক সঙ্গে বসে।

হারেস নিতান্ত স্তব্ধ। হঠাৎ বেহেশত থেকে ছিটকে পড়েছে সে। রুক্ষ পৃথিবীর সঙ্গে তার আদাওতি চলছে। আরিফের সঙ্গে সারাজীবন কাটানো সহজ। পোষ মান্ত বন্য জঠর উটের মত। তার-ও পানির দরকার হয়, হারেস ভুলে গিয়েছিল।

—এত ভাবো কেন? আলি খটকা তোলে।

—না, এমি চুপচাপ।

আলি বিশ্বাস করে না : ভেবে কোন লাভ আছে। যে ক’দিন বাঁচবে খালি ফুঁর্তি করো। বাঁচবে না ত বেশি দিন।

—কেন! উদ্ভিগ্ন হারেস।

—বাঁচবার আছে কি। খেটে পেট ভরবে না। বাড়ির লোককে খাওয়াতে পারবে না দু-মুঠো।

হারেসের এই চিন্তার প্রতি অবজ্ঞা ঘোর। পরিশ্রমের মূল্য আছে বৈকি।

—তার চেয়ে ফুঁর্তি করো। মন যা চায় তাই কারো। মরবার পথ পরিষ্কার করে রাখো।

ঈষৎ অবজ্ঞার সুরে হারেস জবাব দিল : তুমিও পরিষ্কার করছ নাকি?

—আলবৎ।

আলির চেহারা যেমন মজবুত তেমন ধারালো। এই বয়সে সে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ। ভবিষ্যৎ যখন রুদ্ধ, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলা সহজ ও স্বাভাবিক।

—‘বারো বছর শহরে এসেছি। তুমি আমাকে নতুন কী শেখাবে? ও সব দূরের কথা। বাসেদ মিস্ত্রী হোতেই তোমার তিন-জন্ম লাগবে।

কথাটা বড় চড়া ঠেকে হারেসের কাছে। ঘুমের অজুহাত দেখায় সে।

—বারো দিন ত ঘুমিয়ে এলে, চাঁদ।

জবাব দিল হারেস : কাল ত আমাকে চাঁদ হোয়ে ঘুমোতে দেবে না। ইট মাথায় ভারায় উঠতে হবে।

পুকুরের ওপারে হার্মোনিয়ম ডুগী একসঙ্গে বেজে উঠল। রাজার নিকট আবেদনের গান নয় আজ। উল্লসিত চীৎকার।

আলি উঠে পড়ল।

—যাও। আমি একটু ঘুরে আসি।

হারেসের মাথা ধরেছে বিশ্রী। বাড়িওয়ালা বেশি রাত সদর-দরজা খোলা রাখা পছন্দ করে না। আলি তবু রোজ দেরী করে।

ডিবা কে নিভিয়ে দিয়েছে। অন্ধকারে অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে হারেস বিছানায় গুয়ে পড়ল।

ঘুমোতে দেবে না ত আলি। আমার পাশে জায়গা তার। আঁধারে থেৎলে ছাড়বে আজ। নচ্ছার!

পিয়নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অবাক হয় রসুল। আরিফের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। রসুলের নামে টাকা এসেছে!

—কে টাকা পাঠিয়েছে, পিয়ন-মশাই

—হারেস আলি, কলা-বিবির বস্ত্রী কলকাতা থেকে। রসুলের নামে মানি-অর্ডার।

পিয়ন বলে, একটা পিদিম আরো। খানিকটা ভূষো-কালির দরকার।

আরিফ বোকার মত জিজ্ঞেস করে কি হবে?

—ওর টিপ-সই দরকার।

এত কারিগরি, আরিফের জানা ছিল না। ভূষো-কালির জন্য পিদিম আনার দরকার নেই। ধান-সিদ্ধ-করা হাঁড়ির তলায় কালি পুরু জমে থাকে। সে একটা হাঁড়ি আনল।

পিয়ন বলে, খোকা, তোমার বুড়ো আঙ্গুলটা দেখি। একটা কাগজও সে বের করে।

রসুল পুতুলের মত কাজ করে। টিপ দিল সে ফার্মের উপর। কচি আঙ্গুলের সরু রেখা পিতা-পুত্র বোবা-চোখে দেখে।

তিন-ইঞ্চি কাগজ ছিঁড়ে দিল পিয়ন। আরিফ যথা-সামান্য লেখা-পড়া জানে। পড়তে লাগল সে। হারেস লিখেছে, মাসখানেক দেরী হবে তার সামগড় আস্তে। দোস্তানী আর রসুলকে দোয়া।

পনর টাকা!

রসুল আগেই মার কাছে ছুটে যায়। টাকা হাতে পেছনে পেছনে আসে আরিফ।

মালেকা রান্না ছেড়ে বেরিয়ে এল উঠানের উপর।

—এই নাও, বন্ধু পাঠিয়েছে।

দুটো করকরে নতুন কারেসী নোট। মালেকার মুখে কথা সরে না। সে শুধু আঙ্গুল

বুলায় নোট দুটির উপর।

বজ্রাহতের মত তিন জন স্তব্ধ।

মালেকা বলে, পৈঁচি বুঝি তার সম্মুখে বন্ধক দিয়েছিলে?

—না।

—না! ঝুট কথা বলবে তবু।

আরিফ নিজের কথায় অনড়।

—আমার পৈঁচি ছাড়িয়ে আনো।

নিজের উলঙ্গ হাতের দিকে তাকায় মালেকা।

—বন্ধুকে আর একবার আসার কথা লিখে দাও। পিয়নের কাছ থেকে টিকেট নিলে না!

মনি-অর্ডার ফর্মের শেষাংশ পড়ে শোনাল আরিফ।

হাঁড়ি এঁচে যাচ্ছে, মালেকার সেদিকে খেয়াল নেই। পোড়া গন্ধ নাকে গেলেও আরিফ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রসুলে নামে মনি-অর্ডার এসেছে, সে বিজয়ীর মত আর দুই প্রাণীর গতি-বিধি অবলোকন করে।

পাঁচ-ছয়টি পাতিহাঁস কুঁড়োর প্রাতরাশের জন্য কাঁক-কাঁক শব্দ তোলে, মালেকার আশে পাশে থপথপ হলুদ পা ফেলে ঘোরে। তাদের অস্তিত্ব সকলে বিস্মৃত। উঠানে মাটির বাসনে পানি ছিল, হাঁসগুলো তাই শোষে। চুরুর, শব্দে উঠান ঝালা-পালা!

রৌদ্রলাগা রাঙচিটা বেড়ার উপর একটা গিরগিটি মাথার করাত তুলে বসেছিল। মালেকার শূন্য দৃষ্টি তার দিকে কী পৌঁছায়? তবু সেই প্রথমে নিঃস্তুকতা ভাঙে।

—তুমি বলেছিলে, আগে জমিদার বাড়িতে কাজ করত। মা-বাপ কেউ নেই। একটা খিত করে দাও। ছন্নছাড়া হোয়ে কতদিন ঘুরবে?

—এবার আসুক। বলব।

—আগেই বলা উচিত ছিল।

মালেকা আজ তার স্বাভাবিক আত্মা নয়। অন্য সময় হোলে সে বলত : কিগো বন্ধুর একা-একা কড়িকাঠ গুণে আর কদ্দিন কাটবে। একটা গোছগাছ করো, নিজে ত—।

তারপর হাসত মালেকা। বাইশ বছর বয়সের চাপল্যের কাছে কিশোরীও হার মানত।

আজ স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলে : খুনের সম্বন্ধটাই কী আসল। পরই আপন হয়। আমার কুটুমেরা আমাকে দেখে? দুটো ভাই আছে খোঁজও নেয় না!

—বাড়তি ঘরদোর থাকত।

আরিফের চোখে হতাশা।

—ঘর নেই, কেন? রান্নাঘরটার দক্ষিণে একটা জানালা কেটে দিলেই হয়। উঠানে তালপাতা দিয়ে একটা চাল বানাও, সেখানে রান্না করব।

ঝলমল করে মালেকা উৎসাহে।

—পাড়ার দু-ঘর কত আপত্তি তুলবে। বলবে, বেগানা লোক চাল নেই চুলো নেই।

—তার জন্য ভাবতে হয় না। আমি বলছি নাকি সে একা আসুক। না আমি রাজীই হব। লোক নিন্দেহমন্দ করবে। বিয়ে দিয়ে কনে আনো বন্ধুর জন্যে। দুষমনের মুখে ছাই

পড়বে।

আরিফ এবার কোণঠাসা। তারও মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়েছে উঠে। মালেকা একা বলে রাতবিরেত কোন কাজে যেতে পারে না সে। চোর-ছাঁচড়ের অভাব নেই দেশে। হারেস এলে সে নিশ্চিত। গিরিসুড়ঙ্গে নতুন পথের সন্ধান পায় আরিফ।

—যেরকম ধাতের লোক, তার সঙ্গে ঝগড়া হবে না কোনদিন।

বেপরোয়া এবার আরিফ। —সে পরের কথা। হয় হবে।

আত্মস্থ মালেকা। আর একটু রং চড়ায় সে : পরসব্বেদনার ভয়ে মা ছেলে চায় না! তারপর মুখে আঁচল চাপা দিল সে।

—আবার ফাজলেমি শুরু করেছে।

—তরকারীর হাঁড়ি ধরে গেছে। দুড়দাড় শব্দে ছুটে পালায় মালেকা।

একপাল পাতিহাঁস রংবেরং ডানা ছড়িয়ে ছুটে গেল তার সঙ্গে।

রাজমিস্ত্রীর যোগাড়ের কাজে মেহনৎ বেশি। ইঁটের ঝুড়ি মাথায় ভারার উপর সাবধানে প্যাফেলা; সতর্কতার জন্য পরিশ্রম আরো বিরজিকর। দুপুরে ঝাঁঝ করে রোদ, চারিদিকে ইমারত তেতে উঠে, হারেস গরমে হাঁপায়। আজকাল খরচ খুব কমিয়ে ফেলেছে সে।

শরীর তার ধর্ম বজায় রাখে। কাঁপ দিয়ে জুর এলো একদিন দুপুর বেলা।

ইঁট-ভেজাবার চৌবাচ্চার পাশে অনেকক্ষণ বসেছিল সে। কামিন মেয়েরা ইঁট মাথায় ভারার উপর উঠছে। নারিকেল ডাঙার বস্তী থেকে আসে জইরন, খাতুন আরো অনেকে। বাউরী মেয়েরা এসেছে ছাদ পিটতে। সুবকী ভাঙে বেলেঘাটার মিয়ার বস্তীর জবেদা। সে শুধু একা আসে না। সঙ্গে আসে বারো বছর বয়সের ছেলে খলিল। সেও যোগাড়ে। আধ রোজ তার। একটা ছোট ছেলেকে ছাতার নিচে ঘুম পাড়িয়ে রাখে বিধবা জবেদা। এক বছর হোলো সে বেওয়া হয়েছে।

এই বেইজ্ঞতির ভেতর জঠর-সংস্থান। হারেসের কাছে নতুন এই দৃশ্য। আলির মতো আরো যোগাড়ে আছে। চোখঠারা ছাড়া যারা কথা বলে না। সব কামিনদের গায়ে কুর্ভা থাকে না, ইতর ইশারার সুবিধা ঘটে। বাসেদ মিস্ত্রীর কথা কানাঘুসা চলে। চালচলন বদলে গেছে তার। দু-ভাগ করে মাথায় সিঁথি কেটে সে পান চিবোয় আর মজুরনীদের ভেতর গল্প করে। আলির কথা সত্য নাকি, সেও চার ফেল্ছে আজ-কাল।

জবেদার ছোট ছেলেটার হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। মাথা দুই হাতে চেপে বসে ছিল হারেস। তার বাসা যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ছুটে এলো জবেদা।

ভেইয়া, একটু ছেলেটাকে কোলে নাও। মিস্ত্রী বকবে। আর দুটো ইঁট ভেঙে আসি।

আমার জুর। হারেস কাথরে উঠল।

নিরুপায় জবেদা। মাই দিতে বসল সে। বজ্জাত ছেলের কান্না থামে না। রৌদ্রের ভেতর দু'থাপ্পড় দিল সে।

হাঁ-হাঁ করে উঠে হারেস। —বহেন, দুধের বাচ্চার উপর রাগ ফলাচ্ছ!

—রাগবো না? সে ত সরে পড়লো। দায়টা কী আমার একলার!

খলিল যোগাড়ের চেয়ে মিস্ত্রীর ফাইফরমাস বেশি শোনে। এরা সকলে ইসুফ মিস্ত্রীর লোক। ভারী রগচটা সে।

চারতলা বাড়ি। দোতলা শেষ হয়েছে গেছে। জানালা চুনকামের কাজ প্রায় সমাপ্ত।

গরাদে মুখ বাড়িয়ে ইসুফ মিস্ত্রী হাঁকে : জবেদা, এটা আশনাইয়ের জায়গা নয়, কাজের জায়গা।

হারেসের মুখে কে যেন কালি লেপে দেয়।

জবেদা স্তব্ধ থেকে আবার এলোপাখাড়ি দু-ঘা দিয়ে উঠে পড়ল। দশ মাসের ছেলে তাতানো রোদে পড়ে চোঁচায় শুধু।

হারেস কোলে তুলে নিল তাকে।

মিস্ত্রীর শ্যান চোখে বজ্রাঘাত পড়ে : হারেস, তুমি-ও-। বদখেয়াল ছাড়ো বলছি, তোমার মিস্ত্রী-কে?

কয়েকটা বাউরী মেয়ে চৌবাচ্চার ইঁট ফেলছিল। তারা হাসে।

—ই বাবু তর লড়কা?

জবেদা নিজের জায়গায় সুরকী ভাঙছিলো। হাতুড়ী হাতে ছুটে এলো সে। বাউরী মেয়েদের লক্ষ্য করে সে বলে, ছিনাল-রা, দাঁড়া!

বাউরী মেয়েরা তেড়ে এলো। অশ্লীল গালাগালি শুরু করে তারা। হট্টগোলার অরাজকতা।

বাসেদ মিস্ত্রী ঘটনাস্থল তদারক করে বাউরী মেয়েদের দিকে কড়ে আঙ্গুল তুলে বলে, ভাগ, যে যার কাজে যা।

হারেসের ফরিয়াদ সকলের অঙ্গিই ওঠে : জ্বর হয়েছে মিস্ত্রী। আমি বাসায় চলে যাই।

—তা যাও। তবে ছেলে কোলে বসে কেন?

মিস্ত্রীর এমন ক্রুরদৃষ্টি হারেস কোন দিন দেখেনি।

জবেদা এক হাতে আঁচলে চোখ মোছে, অন্য হাতে হাতুড়ী চালায়। ঘুমিয়ে পড়ছে তার দুধের বাচ্চা। মজুরনীর কড়াপড়া আঙ্গুল পিঠে লাল হয়ে বসে গেছে। ছেঁড়া ছাতার তলায় শুইয়ে দিল তাকে ধীরে ধীরে হারেস।

সূর্যের চোখ শিবনব্রের মত জ্বলছে, তদুপরি জ্বর-গায়ে বাসা-ফেরা। বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠে তার। বিতৃষ্ণার বস্ত্র সে খুঁজে পায় না। বমি এলো এক ঝলক।

—ভেইয়া।

ইমারতের প্রাঙ্গণে নামল হারেস। আবার কে ডাকে, ভেইয়া।

—মেরা খলিল কো জরা বোলা দেনা। জবেদার কণ্ঠস্বর। হারেস পেছনে চোখ ফেরায় না। গ্রামে ফিরে যায় না কেন এরা? এমন বেইজ্জত আর ইতর চোখের নিচে কামায়ীর প্রয়োজন আছে কিছু! তার মত গ্রাম থেকেই কী এসেছে তারা? অদৃশ্য বর্বর হস্ত ঠেলে দিয়েছে তাদের মহানগরের দিকে। গাঁয়ে খুদকুড়ো জুটে না?

বাড়িউলী-চাচি এই দুর্দিনে যথেষ্ট হামদর্দী, সহানুভূতি দেখিয়েছিল। বিকালে সাঙ

রৈধে দিল। আজির গাছ থেকে কষা আজির পেড়ে দিয়ে বলেছিল, মুখ খারাপ হোয়ে গেছে তোমার চিবোও বাবা। ছিলকা খেয়ো না।

মেহেরালি অনেকক্ষণ বসেছিল কাছে। জুরের তখন উপশম-সময়। একদম অবশ্য ছাড়ল না।

আলি সকলের আগে এলো। তার রান্নার পাল। মিস্ত্রী আগেই ছুটি দেয়।

অবাক হয় হারেস। আলির সহানুভূতি আরো অপ্রত্যাশিত। উঠান-চুলা আজ বাসার ভেতর ধরাল না সে। ধোঁয়ায় হারেসের কষ্ট হবে। পুকুরের ধারে এই কাজ নিতান্ত দুঃসাহস। পথিক আর পড়শীরা ধোঁয়ার চোটে শুধু মুখ নয়, হা-শুদ্ধ তেড়ে আনবে। হয়ত গালিগালাজ খেয়েই চুলাসহ আলি বাসায় ফিরছিল। হারেস তার খোঁজ রাখেনি।

ডালে খোসা বেশি। আলি কুলায় খোসা চয়ন করে। সন্ধ্যায় শোয়া ভাল নয়। দু-তিন জনের বালিশ দরমার উপর পেতে উঁচু করে দিয়েছে আলি। হারেস ঠেস দিয়ে বসে আছে।

আলি হাসে : প্রথম দিনেই জ্বর।

হারেস অত ক্ষিপ্রবুদ্ধি নয়। —কি ভাই?

—পয়লা দিনে জ্বর পড়লে। জবেদার কপাল!

হারেস বলে, তৌবা, ও-কথা মুখে আনলে তুমিও! জ্বর হোয়ে ধুকছিলাম তখন। আমার চেয়ে বয়সে কত বড়!

বয়সে বড় হোলেই ত জমে। কাঁচা লোককে গড়ে পিটে শিখিয়ে নেয়।

অন্য সময় হোলে হারেস গালাগাল দিয়ে বসত। আজ চুপ করে গেল, সে, গায়ে মাখল না কিছুই।

—এত বেইজ্জতির ভেতর কাজ করছে; তুমি এমন কথা মুখে আনো!

—কষ্ট হয় এ-সব দেখে? আলি চোখ মটকায় আর বলে, আপনার জনের দুঃখ দেখলে কষ্ট হয় বৈকি।

হারেস চোখ বুঁজে বসে রইল। আলি তার অবস্থা উপলব্ধি করে।

—ও হারেস, ভাই!

—বলো।

—অত সহজে রেগে যাও। কষ্ট করবে কী করে। এমন হাজার হাজার শহরে। ইসুফ মিস্ত্রীর কামীনদের খবর রাখো? আর জবেদার কাছে এগিয়ো না, ও একটা আঙুন। আমি ত আগে থেকে চিনি ওদের। আর এক বাড়িতে কাজ করেছিল আমাদের সঙ্গে। স্বামীটা পিলে ফেটে মরল। তার এক-বছর আগে বিছানায় পড়ে, জবেদা গুরকী ভাঙছে। সংসার চালিয়েছে। এমন জাঁহাবাজ মেয়ে। আমি চিনি না জবেদাকে? ছুঁয়েছ কী মরেছ। হাতুড়ি দিয়ে মাথার ঘিলু বের করে দেবে।

হারেসের রোগাক্রান্ত শরীরে অপূর্ব অনুভূতি বয়ে যায়। তার আদর্শের বিগ্রহ আলীর কাছেও মহিমার আরো ছড়ায়।

আলি সাণ্ড কিনে আনল। ভাতের পর চড়াবে হারেসের সাণ্ড।

—কার জন্য সাণ্ড আনলে? হারেস জিজ্ঞেস করে।

—আশুর্নাই করতে গিয়ে দুপুর থেকে জুরে ভুগছি। আমি খাব! আল্লা রে।

হতাশ-ব্যঞ্জক দুই চোখ উল্টয় উপরের দিকে আলি। হেসে ফেলে হারেস।

—বেশ। পয়সা নিয়ে গেলে না।

—পয়সা কি তুমি দেবে না পরে। আমি হোটেল খুলেছি নাকি বিন্-পয়সার? তোমার বহু আগে শহরে এসেছি। দেখে-দেখে সব সয়ে যাবে। গভারের চামড়া না হোলে রোজ মরতে ইচ্ছে করবে। খাও, দাও, পিয়ো।

কল্লিত গ্রাসখান দুই হাতে আলি ঠোঁটের উপর তুলল। হারেসের মাথা ধরে আছে। নচ্ছারটা আজ নিতান্ত ভাল মানুষ। হারেসের হাঙ্কা মন বিশ্রামের আনন্দ পায়।

মেহেরালি রাতে হারেস-কে দেখে গেল। নাসিমের সঙ্গে কোন সোরোখা (সম্পর্ক) নেই।

উত্তেজনার সঙ্গে বুদ্ধ বলে : আলাদা করে দিয়েছিলাম, বউমার কষ্ট হবে বলে এক সঙ্গেই খাই।

বাসেদ মিস্ত্রী ছিল বাসায়, সে নাসিমের আরও নিন্দা করে।

হারেস চুপচাপ থাকে। দুপুরের মত জ্বর নেই তার। শান্ত আবহাওয়ার ব্যাকুলতায় তার মন ছটফট করে। বিদেশেই যদি মরেই যায় সে। কোন নাম নিশানা থাকবে না তার। সাও খেয়ে চোখ-বুঁজে শুয়ে পড়তে চায় সে। দুর্বল পেশী ভয়ের খনি। ভয় পায় হারেস।

আলি উপর-উপরি দুটো দরমা মেলে দিল নিচের থেকে না ঠান্ডা উঠে।

হারেস বলে, তুমি শুবে কিসে?

—আমি আজ বাইরে শোব।

কার্তিকের হিমেল রাত্রি। আলি কারো বাঁধা মানে না। এই সব ব্যাপারে মিস্ত্রী চুপচাপ থাকে। শুকুর ঘরামি গো-বেচারার মানুষ। কারো পাঁচে-সাতে কোন উৎসাহ দেখা যায় না। বড় হিসেবী, বড় সংকীর্ণ তার জগত, মিস্ত্রীর খয়ের খাঁ আলি শুকুরকে মোটে পছন্দ করে না। চল্লিশ পার বয়স, চুরুক দাড়ী এক কাঁচা মুখে। আলির বাড়াবাড়ি দেখে সে মুখ খোলে।

—ঠান্ডায় কোথায় শোবে?

—আমার শোয়ার জায়গার অভাব নেই হুজুর!

সহজ কণ্ঠেই বলে আলি। হুজুর শব্দট সম্মানার্থক নয়, শুকুর তা বোঝে না। বাইরে চলে গেলো আলি।

এত রাতে দুধ নিয়ে এলো বাড়িউলী চাচি। ফিরিয়ে দিতে হারেসের সাহস হয় না। অথচ এই দুধ তার ঠোঁটে স্বাদবাহী নয়। ছাগল পুষেছে তিনটে বাড়িউলী। আজির গাছের গোড়ায় দিনরাত্রি বাঁধা থাকে। ছাগলের মুতের গন্ধে বাসায় টেকা দায়। দুধের প্রতি অভক্তি জন্মে গেছে হারেসের। আজ ঘুম আসবে না সহজে। গরু মেরে জুতো দান আর কী! বুদ্ধা রমণীর মমতাকে শ্রদ্ধা জানাল হারেস তবু। একবার বলবার ইচ্ছা হোয়েছিল তার : চাচি বক্রীর নাদাড়ীগুলো পরিষ্কার করে রেখো রোজ, পচে যা গন্ধ উঠে!

পয়সা চিন্লে কি নাক-কান চোখ বুঁজে যায়? বাসেদ মিস্ত্রীর কোন অভিযোগ নেই বাসা নিয়ে। ঘুমিয়ে পড়েছে সে নির্বিবাদে।

গায়ে শাট, তার উপর কাঁথা ছিল হারেসের। নিচে লুঙ্গি পাতা ছিল, তবু শীত-শীত লাগে। কাঁপ দিয়ে জ্বর আসছে বোধ হয়। হারেস আঁধারে একটা ধূতি কাঁথার সঙ্গে জুড়ে দিল।

সকালে হারেসের জ্বর ছিল সামান্য। গা-হাতে ব্যথা খুব। আলি ভয় পায়, পাছে বসন্ত না উঠে। হারেস-কে সে কিছু বলে না।

শুকুর হারেসের উপর চটে উঠে। অন্ধকারে সে শুকুরের ধূতি গায়ে দিয়েছিল।

—ধূতিটা ধুয়ে রাখলাম, কাজে যাব পরে। তুমি গায়ে দিয়ে বসে আছ!

বাসেদ মিস্ত্রী বাসায় ছিল না, সে সকালে রোজ বাজারে যায়। মাস গেলে হিসাবও তার কাছে। আলি শুকুরের দিকে তাকায় একবার, প্রথমে কোন কথা বলে না সে।

—তুমি রুগী মানুষ যার-তার কাপড় গায়ে দেবে?

আলি ধমক মারে : কি হয়েছে, হাদিছ অশুদ্ধ হয়েছে গেল!

—তুমি আবার গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে কেন?

—ঝগড়া! অসুখ লোক ভুলে নিয়েছে। কি হয়েছে ধূতিটার?

—ময়লা দেখতে পাও না!

বড় সাহেবের কেরানী-বাবু কিনা, যাবে যোগাড় দিতে ওর আবার ফর্সা ময়লা।

—আসুক মিস্ত্রী। শুকুর শাসায়। —আসুক নৌ তোর বাবা।

আলির মেজাজ আগুন হয়ে উঠছে। কিছু পুরাতন-জমা ঝাল ঝাড়ছে সে।

হারেস অনুনয়-বিনয় করে, ঝগড়া কমাতে না। আমি নিজে ধুয়ে দেব।

—বাপের বয়সী তুমি না-হলে এমন লোক বাসা থেকে দূর করে দিতাম দু' ঘুসিতে, বাস।

টিট হয়েছে যেন শুকুর। আর কোন কথা নেই মুখে তার। গজগজ করে সে বাইরে গেল।

—আলি, ঝগড়া করো না, ভাই।

—ঝগড়া! আলবৎ করব। হয় ওর অসুখ। মুখে মুতে দেব! ব্যাটা জাত-পাজি। মিস্ত্রী-কে যদি লাগায় আমি ওর দাঁত ভেঙে ছাড়ব।

হারেস কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে। ঘাম দিচ্ছে শরীরে তার। জ্বর ছাড়ছে। আলিকে আরো ভাল লাগে তার। কি বলবে সে আলিকে।

বাজার থেকে ফিরে এল বাসেদ মিস্ত্রী।

ভিজ়ে বেড়ালের মত শুকুরও তার অনুসরণ করে। চুপচাপ থাকে হারেস, আলি রান্নার কাজ করছে নিঃশব্দে।

সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য হারেস হাত বাড়িয়ে দিল মিস্ত্রীর দিকে : একবার হাতটা দেখো ত মিস্ত্রী, জ্বর বোধ হয় ছাড়ছে।

হারেসের শরীরের উত্তাপ পরীক্ষার পর নাড়ী দেখল বাসেদ। —জ্বর নেই এখন। নিপুণ ভিষগের মুখ থেকে যেন জবাব এলো।

—আল্লা আল্লা করে কালকের দিনটা এমি যায়, পরশু থেকে তা'হলে কাজে যেতে পারব।

—গাঁয়ে গিয়েছিলে। দু-জায়গায় আলাদা পানি। ম্যালেরিয়ায় না ধরে।

আশঙ্কা উত্থাপন করে বাসেদ।

সহানুভূতি জানায় শুকুর : না, সেরে যাবে।

আলি ট্যাংরা মাছ কুটছিল। চোখ তুলে আবার সে নামিয়ে নিল তখনই।

বুড়ো মেহেরালি এলো খবর নিতে। খুব সকালে বকরী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। বাঁধা খরিদার আছে। দুধ বিক্রী করে আটটার ভেতর ফিরতে হয়, ঢালাইয়ের কারখানার আয় ছাড়া তার সংসার চলে না। সেখানে হাজিরি বেলা ন'টায়।

সদর-দরজার চটের ওপারে চাচি বা তার বৌ কোনদিন পা-বাড়ায় না। আত্মীয় আছে কয়েকজন নারিকেল ডাঙায়। তাদের সঙ্গে মোলাকাতের বেলা আসে রিকশা, তারও চট পুরু করে ঘেরা থাকে। মরদ্রা কেউ ঘরে না থাকলে হারেস বালতি ভরে পুকুরের পানি এনে দেয়। গোসল-রান্না তারই সাহায্যে চলে। মেহেরালি তা জানে। এই জন্যে হারেসের দাম এখানে বেশি।

—বড় নেক্কার ছেলে মিস্ত্রী। জ্বর ছেড়েছে দু'পিল 'কুইলেন' দিলে হয়। ঘরে 'কুইলেন' আছে।

মিস্ত্রী আপত্তি জানায়। শরীর স্বভাবের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। বৃদ্ধের গলার রগ পর্যন্ত উপরে ভেসে উঠেছে। সাদা দাড়ী ভাঙা চোয়ালের উপর। বহু রেখাঙ্কিত চোখের তারা। তার দয়র্দ্র স্বর মার স্পর্শের মত বৃদ্ধের কিনারা ছুঁয়ে যায়।

বেশি দেরী করতে পারে না মেহেরালি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হয় তাকে।

মিস্ত্রী খেই টানে ধীরে ধীরে : স্বাস্থ্য খেয়ে থাকো কালকের দিনটা।

মাথা নেড়ে সায় দিল হারেস। আরো দু'দিন এইভাবে কালক্ষেপ, দু'দিনের রোজগার পর্যন্ত নষ্ট! হারেসের মাথা ঘোরে।

সুদূর ভবিষ্যৎ সম্মুখে মরীচিকার মত নেচে বেড়ায়। এখনই চলা থেমে যাবে তার। ওয়েসীসের শ্যামলিমা লাগবে না চোখে?

দুর্বল শরীর। হারেস মিস্ত্রীর কাছ থেকে তাই দোতলায় কাজ নিয়েছিল। নিচের থেকে কোন মজুর ইঁট দোতলায় বইয়ে দেবে। বাকী উপর তলায় যোগানের ভার হারেসের উপর। এখানেও কষ্ট কম নয়। ঘন্টা দুই কাজের পর গা বমিবমি করে তার। আবার মিস্ত্রীর আশ্রয়। বাসেদ মিস্ত্রী এই সহানুভূতি দেখায়।

—আচ্ছা নিচে যাও, ঝুড়িতে ইঁট বোঝাই করে মজুর কী কামিনদের মাথায় তুলে দেবে।

হাঁপ ফেলে বাঁচল হারেস। চৌবাচ্চা থেকে ভিজ়ে ইঁট বোঝাই করে সে। বাউরী কামিনেরা মস্করা করে, হারেস কোন জবাবই দেয় না।

প্রায় আদুল-গায়ে মেয়ের দল তার কাছে দাঁড়ায়। ঝুড়ি তুলে দেওয়ার সময় বেপর্দা আরো বাড়ে। কেউ কুর্তা পরেনি এরা।

আলি বিড়ি চাইতে এলো। নেশায় গলা জ্বলছে তার।

—বেশ জায়গায় দিয়েছে তোমাকে । চৌবাচ্চা নয়, পুকুরের ধার । টোপ ফেলো আর শিকার তোলো ।

ধমক দিল হারেস : আবার বেফাঁস কথা বোলছ ।

—তুমি এ-দিকে একদম খাজা । দাও বিড়ি ।

একটা বাউরী মেয়ে এলো ঝুড়ি হাতে ।

—এই জস্নী আমার সঙ্গে স্যাঙা করবি? স্যাঙা মানে নিকা ।

কি নির্লজ্জ আলি । হারেসের গায়ে কাঁটার মত বেঁধে ।

নির্বিকার হারেস ইট বোঝাই ঝুড়ি তার মাথায় তুলে দিল ।

যাওয়ার সময় হাসে মেয়েটা, বলে : তুর বাবার সঙ্গে স্যাঙা করিছি ।

হারেস খুব খুশী । বদমাস আলিটার মুখের মত জুতো দিয়েছে ।

আলি একটা অশ্লীল গালি দিল । আরো অশ্লীলতর দেমাক দেখাল মেয়েটা ।

—তুমি যাও, আলি ।

—হারেস ভায়া, তুমিই একা রাজত্ব করো ।

বিড়ি ফুঁকে জোরসে আলি । উঠে পড়ল সে ।

কার্তিকের শেষ-প্রান্ত । রৌদ্রের তেজ কমেনি । ঝাঁঝ করে চারিদিকে ।

জবেদা আরো কামিনদের সাথে সুরকী ভাঙছে । তার ছোট ছেলেটা ছাতার নিচে ঘুমাচ্ছে । পেট ভরা আছে নিশ্চয় ।

জবেদার মুখে হাসিখুশীর ভাব । ঘামে নৈরাজ্য সে কাজ করছে । হারেস একবার তাকালো তার দিকে ।

খলিল এইমাত্র এসে দাঁড়াল মায়ের কাছে ।

ইঠাৎ চোখাচোখি হয় দুজনের । জবেদা ডাকে, ভেইয়া ।

কামিনরা উপরে গেছে । আস্তে দেরী হবে । হারেস জাবেদার কাছে প্রায় ছুট মেরে গেল ।

—ভেইয়া ।

পান খায় জবেদা । দাঁতে লাল দাগ ভরা । হাসে সে ।

—ভেইয়া, খলিল কা নৌকরী হয় ।

—কোথায়?

—উ বালিগঞ্জ মে । সাব কা খানসামা কা ‘বয়’ ।

খুশী হয় হারেস ।

জবেদাই বলে, খানাপিনা বাদ চার রূপেয়া দেগা । কাম শিখ জানেসে আওর ।

উৎফুল্ল জবেদা পুত্রের ভবিষ্যৎ যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ।

পায়জামা আর হাফ-শার্ট পরে খলিল দাঁড়িয়েছিল ।

জবেদা আদেশ করে : মামা কো সালাম করো ।

বিস্মিত হারেস । খলিল তার কদমবুসী করছে । দোয়ার জন্য কি বলতে হয় সে জানে না । —বেঁচে থাক, বাবা । বেঁচে থাক বাবা ।

জবেদা পান পুরল মুখে । কাপড়ের খোঁটে চুন বাঁধা ছিল, আঙুলের ডগা দিয়ে জিভে

লাগায় সে।

পান খাওয়ার চেয়ে কথা-বলার উৎসাহ তার বেশি : মাহিনা দো-রোজ ছুটি।

প্রকৃতিস্থ হোয়ে কথা বলে না জবেদা। পুত্রের বিচ্ছেদ-ব্যথা তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠে।

হারেস নিজের জায়গায় ফিরে এল। কামিনরা গোলমাল শুরু করেছে। ঝটপট বিদায় করে দিল তাদের।

জাবেদার ছোট খোকা হঠাৎ কঁকিয়ে কাঁদে। নিজেই ছুটে গেল হারেস।

কোলে তুলে কয়েকবার দোলানো মাত্র আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে। বেশ হুস্টপুস্ট বাঁধন শিশুর। কৃশ তনুর উপরেও তা বোঝা যায়। একটা কাঁথা আর ছেঁড়া কাপড়ের উপর শুয়ে থাকে সে। নিচের ভাঙা ইট পেরেকের মত বেঁধে না কি?

ধীরে ধীরে শিশুকে নামিয়ে রাখল হারেস। একবার চারিদিকে তাকাল সে। না, জবেদা কাজ করছে মুখ নীচু করে। হারেস একটা আধুলি বের করল পকেট থেকে, তারপর কাঁথার উপকার কাপড়ের খোঁটে গিঠ দিয়ে বাঁধল সে, কাঁথার একপাশ তুলে হারেস শিশুর পিঠের নিচে রাখল খোঁটখানা।

—তুর লাড়কা-সে খুব মহব্বৎ।

একটা বাউরী কামিন বুড়ি হাতে ঠাট্টা করে। হারেস নিঃশব্দে ইট তুলে দিল। ক্ষমতা থাকলে সে ইট ছুঁড়ে মারত মাগীর মাথায়।

হারেসের মুখাবয়ব দেখে কামিন দ্রুত পদে আড়াল হোয়ে গেল।

জবেদা পথের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। খলিল চলে গেল বোধ হয়। হারেস ভাবে।

পড়ন্ত বেলা। রক্তহীন কার্তিক কোন হিমবাহের স্বপ্ন টেনে আনে।

ঘাবড়ে যায় বাসেদ মিস্ত্রী স্বয়ং। কোন কাজ নেই হাতে। বাসার তিনচার-জন দু-দিনপরে দেশে চলে গেছে। আলি অপেক্ষা করতে জানে। হারেস আরিফের পত্র পেয়েছিল, কোন জবাব দিল না। কাজের সুরাহা না করে সে আর আত্মীয়তা চায় না।

অখন্ড অবসর। হারেস ফেরীওয়ালাদের সঙ্গে যুক্তি করে। আলুপটলের ব্যবসা মন্দা। কোন উৎসাহ পায় না সে।

আলি সকালে রান্না করে, দুপুরে ঘুমায়, তারপর বিকাল থেকে রাত-দুপুর পর্যন্ত সে লাপান্তা। ভাবনার কোন লক্ষণ দেখা যায় না শরীরে। গাঁটে কড়ি খসছে প্রতিদিন, তবু বেহঁস। হারেসের সহিষ্ণুতা সীমার শেষ প্রান্তে।

খাওয়ার পর দুপুরে সেও ঘুমায়। পরিশ্রান্ত শরীরে ঘুম সহজে নামে। অবসর জীবনে নিদ্রার তোষামুদি দরকার হয়।

আলি বলে : তোমার চিন্তা ছাড়া কথা নেই। এই আমার দিকে তাকাও। আমি ভেবেছি একদিনও? ছোট ভাইগুলোর পড়াশুনা হবে না নিশ্চিত। আমি আর কী করতে পারি। তার চেয়ে এখন থেকেই খুঁটে খেতে শিখুক। এক পয়সা দিই না বাড়িতে।

হারেস সায় দিল না : তুমি পারো।

—দু' বছর পরে তুমিও পারবে, দোস্ত। চক্চকে খিলানওয়ালা শহরের দালান দেখে প্রথমে আমিও তোমার মত কত কী মনে করতাম। আস্তে আস্তে সব বিলকুল ঠান্ডা। পাতা-চাপা কপাল দু'এক জনের হয়ত আছে, লক্ষ-লক্ষ কপাল তা হয় না। একদম জগদদল পাথর।

হারেস বিরক্ত হয়।

—কথাই বলো ছাই। এক-আধজনের পাতা-চাপা বরাত দেখে নিজের বরাতটা-কে যদি তাই মনে করো, খুব ভুল করবে।

আলির লম্বা বুলি হারেস গুনতে চায় না। শুয়েছিল সে ঘুমোনের ভান করে। পিঠের উপর আঙ্গুলের টোকা দিল আলি : তোমাকে আজ ঘুমোতে দিচ্ছি।

—একটু ঘুমোই।

শিশুর মত হারেসের বগলে কাতুকুতু দিতে শুরু করে আলি।

নাছোড়বান্দা সে। উঠে পড়ল হারেস। শীতের বেলা। কুয়াশায় মত ধোঁয়ার শহরে প্রায় সন্ধ্যা নেমেছে।

হারেস শেষ ভণ-খন্ড অঁকড়ে ধরে : রান্না করবে না আজ?

—রান্না। না। মিস্ত্রী খাবে না। বাইরে গেছে কাজ ধরতে। আজ আসবে না। চুল্লা ধরানো ঝঞ্জাট কেন আর। দু-জনে হোটেলে খেয়ে শেষ।

হারেসের শেষ বাণ আলি দক্ষ ওঝার মত কটকটিয়ে দিল।

—চলো বেরিয়ে পড়ি।

হারেস আমাশা-রোগীর মত জবাব দিল, না।

—আমার সঙ্গে যেতে এত মন খাটা (টক) কেন?

—চলো।

আলি কৃত্রিম কোপন-কণ্ঠে বলে, উঠ ছুঁড়ি তোর বে। ধুচনী মাথায় দে। —তাই করলে তুমি। একটু সাজোগোজো।

—আবার সাজবার দরকার আছে?

—তুমি জংলী রয়ে গেছ। আজ কী ইঁট বইতে যাবে নাকি? এখন যাচ্ছে বোড়াতে। ফিটফাট বাবু। তোমার ধোওয়া সাঁট ধুতি বের করো।

আলি নিজের বাস্তব থেকে পরিচ্ছদ বাইরে রাখে। হারেসের প্রসাধনে বেশি বিলম্ব হয় না।

আলি তবু হাসে।

—হাসছ কেন?

—মাথাটা আঁচড়াও।

আয়না চিরুণী দেওয়ালে লটকানো। মিস্ত্রীর দৌলতে এটা যৌথ সামগ্রী।

আলি নিজের কাপড় পরে হাততালি দিল। বেশ মানিয়েছে তোমাকে। বৈকালিক ভ্রমণের জন্য এত প্রসাধন আর বেশ-ভূষার অভাব হারেস কোনদিন উপলব্ধি করেনি। আলির দৈনন্দিনতা অনেকখানি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নতুন ঠেকে তার নিজেকে।

আলির পায়ে জুতা। সে পাদুকাহীন। পার্থক্যটা আজ বড়ো হয়ে দেখা দিল তার কাছে।

গলি মুখে বিড়ির দোকানে পান কিনল আলি।

— ঠোট রাঙা করে নাও, দোস্ত।

হারেসের হাতে সে পান দিল এক খিলি।

দু'জনে গায়ে চাদর জাড়িয়েছে। সন্ধ্যার উলঙ্গ বাতাস হি হি করে এলো একবার। ঘোর সন্ধ্যা। ধোঁয়া জমে রয়েছে চালের উপর, অন্ধকার আরো গাঢ় মনে হয়।

স্তিমিত গ্যাস-পোষ্ট জ্বলছে। ড্রেনের উপর কুয়াশার অবলেপন। আর এক বস্তীর মুখে এসে পড়ল তারা।

—হারেস বলে, একঘন্টা খুব ঘোরালে। এই বস্তীর ভেতর আবার কি দরকার?

—এসো।

আলি হারেসের হাত ধরে। আধ-অন্ধকার চারিদিকে। বিড়ির আগুন দেখা চারপাশে মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। গঞ্জে মেলার সময় এমনি ধরনের মেয়েরাই ভিড় করে।

হারেস হাত-ছাড়ানোর চেষ্টা করে।

—কোথায় নিয়ে এলে আলি।

—এসো না ছাই।

জোরে টান পড়ে হারেসের হাতে। পিদিমের আলো দেখা যায় এবার। ঘুপটি মেরে পণ্যঙ্গনারা বসে আছে গলির মুখে। তাদের মাঝ দিয়েই আলি অগ্রসর হয়। মাকড়সার জালের টানে মাঝির মত অনুসরণ করে হারেস।

একটা উঠান। মাঝখানে কল রয়েছে। চারপাশে কুঠরী-কুঠরী খোলার ঘর। কোন ঘরে পিদিম জ্বলছে, কোন ঘর অন্ধকার।

উত্তর কোণ থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এলো, একা পারনি আজ আবার বন্ধুকে এনেছ। থামল না আলি।

দক্ষিণ কোণে দাঁড়িয়ে সে ডাকে : করিমন।

একটা মেয়ে পিদিম হাতে বেরিয়ে এলো। এমন উলঙ্গ পরিচ্ছদে নারী তার দেহ ঢাকতে পারে? শুধু কাচুলী পরে রয়েছে সে। শাড়ীর আঁচল কাঁধের উপর বুকের এক কোণে ঘেঁষে উঠেছে।

—এসো।

নেশা-গ্রস্তের মত হারেস তক্তপোষের উপর গিয়ে বসল। জীর্ণ আসবাব ঘরের দারিদ্র্য চাপা দিতে পারেনি।

আলি হাঁকে — করিমন বিবি, হাতে ভাল খন্দের আছে? বন্ধু এসেছে।

—খন্দের। কেন আমি কি পচে গেছি।

—বন্ধুর সামনে এসব বেয়াদবী।

একটা চড় তুলল আলি। সরে গেলো না করিমন। গাল পেতে দিল।

—মারো।

বিরশি সিক্কার চড় গালে এক সিক্কাই শেষ হলো। খিলখিল হাসে করিমন। হারেস ঘেমে উঠে। সলিম মুনশীর মেয়ে কামরুনের সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখা হলো নাকি?

—বন্ধুকে একটু আদর-টাঁদর করো।

—তোমার বোবা বন্ধু ত কথাই বলে না।

নধর-যোবনা করিমন। মুখের শ্রী নেই। সম্মুখে উঁচু দাঁত হাসির সময় বীভৎস মনে হয়। হারেস একবার তাকিয়ে দেখল।

দরদর ঘাম ছুটছে হারেসের শরীরে। হঠাৎ উঠে পড়ল সে। এক দৌড় মেরে এলো উঠানের উপর।

পেছনে পেছনে ধাবমান আলি হাসে : হারেস, তোর মত বোকার দ্বারা কিছু হবে না জানি। গিয়ে সামনের পচা পার্কের উত্তরে বসে থাকিস, ঘন্টা খানেকের ভেতর ফিরব।

দুরুদুরু বুকে পা ফেলে হারেস। আলির শেষ কথার রেশ তার কানে অস্পষ্ট।

দু-ছাঁচের মাছখানে গলি। মেয়েরা খরিদারের আশায় বসে থাকে। তার মাঝামাঝি আসা-মাত্র একটা মেয়ে তার পাশ কাটিয়ে বলে, কুকুর কি ঘি-ভাতের গন্ধ পেল নাকি লো! ছুটে পালাচ্ছে। পাশে তার সঙ্গিনী রয়েছে বোঝা যায়।

—দ্যাখ খুন করে পালাচ্ছে নাকি?

নেপথ্যে অন্য কর্ণস্বর। হারেসের ভয় পায়। দ্রুত পদে গলি পার হোয়ে সে দৌড় আরম্ভ করে। শীতের দিনেও শার্ট ভিজে গেছে তার টোঁচদর খুলে ফেলতে সে বাধ্য হল। ঐ ত পার্ক। পার্কের পাশে এসে পড়েছে সে। হারেস চুপচাপ গিয়ে বসে পড়ল ঘাসের উপর। সুড়ঙ্গ পথে অজগর সাপ ধাওয়া করেছিল তার পেছনে— এইমাত্র রেহাই পেয়েছে সে।

এক ঘন্টা পরে সত্যিই এলো আলি। মুখে তার হাসি উপচে উঠছে।

—মাফ করো, ভাই হারেস। তোমাকে নিয়ে গিয়ে অন্যায় করেছি। তুমি চুপচাপ বসে থাকলেই পারতে।

হারেস তবু কথা বলে না।

—বাজে কথা রাখো, বাসা চলো।

আলি সামান্য উদ্ভিগ্ন : মিস্ত্রীকে এসব কথা বলো না কিছুই। এক গাঁয়ের লোক।

—আমার দায় কেঁদে গেছে।

—এত যখন রাগ করছ, তুমি যাও বাসায়। আমি নর্দমায় শুয়ে থাকব।

হারেস একটু নরম হয়। কথা বলে না। আলি তার অভিমান ভাঙানোর ক্রটি করে না।

—এমন করে কদিন বাঁচবে? অসুখ-বিসুখ হোলে।

ক্ষুণ্ণ হারেস মুখ খুলেছে।

—বাঁচবার জন্য এইখানে কেউ আসে না।

মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা করে হারেসের। কি হোয়েছে আলির? এমন জোয়ান, দুরন্ত ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে, জীবনের উপর তার কোন মায়া নেই? আলিটা পাগল!

—আরো কিছু দিন শহরে থাক। তারপর বুঝবে।

শান্ত কণ্ঠে বলে আলি। ক্ষোভে তার গলা বুজে আসছে যেন।

হারেস পথ হাঁটে। আর কথা বলা তার পক্ষে নিশ্চয়োজন। গ্যাসের আলোয় আলির মুখ দেখল হারেস। চপলতাহীন স্তিমিত চোখের পাতার নিচে কাজল ছায়া পড়েছে। সেও শূন্য দৃষ্টি হাঁটছে। জনবহুল মহানগরের পথবর্তী আর কিছু নিশ্চিহ্ন মুখে গেছে। পৃথিবীর প্রথম প্রভাতে উলঙ্গ আদম হাঁটছে মাটির উপর।

হোটেল নৈশ-ভোজন সমাপ্ত। বেষ্টিত উপর বসে দুইজনে হারেস-আলি নিশ্চিন্তে বিড়ি ফোঁকে।

হোটেলওয়ালার ছেলেকে পয়সা মিটিয়ে দিল আলি। দু'জনের পয়সা পাঁচ আনা সে একাই দিয়েছে।

—আমার পয়সা তুমি দিবে কেন?

—রাখো। আলি হারেসের হাত তার পকেটের ভেতর ডুবিয়ে দিতে বাধ্য করল।

বিড়ি পুড়ছে। কারো ওঠার শক্তি নেই যেন। দু-জনেই স্তব্ধ। ধোঁয়ার দিকে আলি শান্ত দৃষ্টি মেলে।

হারেস জিজ্ঞাসা করে, করিমন মুসলমান?

—তা কি করে জানব হিন্দু না মুসলমান।

—এর নাম যে করিমন।

আলি সোজাসুজি হারেসের দিকে তাকায় : এ অজিদা দুনিয়া। এখানে হিন্দুর মেয়ে মুসলমান সাজে। মুসলমান সাজে হিন্দু। বামুনের মেয়ে এলে বলে দাসী। আর দাসী এলে হয় দেবী। জাত খোয়ানোর জন্য এখানে কাড়কাড়ি চলে। কে কত তাড়াতাড়ি জাত দিতে পারে। আবার বেমালুম।

আধ-পোড়া বিড়ি ছুঁড়ে দিয়ে উঠে পড়ল আলি।

—চলো। বসে লাভ নেই।

হারেস স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। এত খবর আলি রাখে দুনিয়ার।

গলির মুখে মহরমের ঢোল বাজছে। প্রথম জাগরণের দিন আজ। খুনেরা চাঁদ পলাসীর আকাশে অন্তিমিত। গলির মোড়ে একবার আলি দাঁড়ায়।

পান খাওয়া তার নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস, আজ পান খেতে ভুলে গেল সে।

এত রাতেও হাগলদের ঘাস খাওয়াচ্ছে মেহেরালি।

হরিৎ প্রান্তরের হ্রদ ঝলকায়, দীপের মত ভাসে গ্রাম আর কিশাণদের কুটীর। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক, জনপদের অলি-গলি হারেসকে নিশির মত ডাকে। ক্রিন্ন মহানগরীর জীবন সংগ্রামের ফাঁকে অবসর-পিপাসু মন সামগড়ের দিকে ছোটে। বন্ধুর পরিবারবর্গের জন্য ছোট-খাট টাকিটুকি জিসিন কেনায় মেলে মাদকতার আশ্বাদ। দুদিন-একদিন। আবার ফিরে আসে হারেস শহরের চত্বরে। আতিথেয়তার জৌলুষ কমে গেছে, তা যাক। প্রাণের বিনিময়ে হারেস উৎফুল্ল।

আরিফের অনুরোধ বহুবার সে প্রত্যাখান করে।

—আমি তোমার সংসারের সব ঠিক করে ফেলেছি। দু-হাত এবার এক করে নাও।
বলে আরিফ।

হারেস রাজী হয় না : কত খরচ জানো। আরো দু-মাস যাক। আর বলদ নেই,
চাম্বাস চলবে কী করে?

—অত ভাবনা কিসের। এখনও দু-টো জয়ীফ বলদ আমার আছে। পালা করে চাম্বাস
চলবে।

—অনেক ঝঞ্ঝাট তার।

কিছুই ঝঞ্ঝাট নেই। আগে জরু করো। দেখবে আপসে এসে গেছে গরু।

আরিফ প্রাণ খুলে হাসে।

তবু আপত্তি তোলে হারেস : বিয়ের খরচ বাদ দিলে তুমি।

—তার জন্যে কিছু ভাবনা নেই। খোদার দিন চলে যাবে। তোমার মতের জন্য যা
দেবী। দোস্তানী ত 'জান' খেয়ে মারলে। একটা জান কতবার খেতে দিই।

—তবু ভেবে-চিন্তে কাজ করা ভাল।

—না আর ভাববার কিছু নেই।

হারেস জানে, সংসার ছাড়া তার চলবে না। আলির মত বাউন্ডেলে জীবন তার জন্য
নয়।

—আর দুটো মাস। মাঘ-ফাগুনে আর কিছুই বাকিতে হবে না।

—এত মাথা খরচ করলে সংসার হয় না। আমরা কি সুখে আছি? বারো মাস কষ্ট
লেগেই আছে, তবু সংসার না করে উপায় নেই। মৌলবী সাহেব ত বলেন, শত বিয়ে করা
'ফরজ'।

—দু-মাস তর সইবে না?

আরিফ মুখ ভার করে। —না সইলে লাঠি-ঠ্যাঙা ত করতে পারি না। আমার নিজের
কম সুবিধা হয় না, একদিকে আমার উপকারই করলে। একা ঘরে থাকতে পারে না। দু-
জন হলে আমিও শহর-বাজারে রোজগারের পথ দেখি। ধান-রোয়ার পর চার মাস ত
বেকার বসে থাকি।

এই অনুরোধ দোলা দেয় হারেসের মনে।

—দু-মাস, বন্ধু। দু-মাস। কিছু টাকা পয়সার দরকার।

আরিফ সেদিন আশ্বস্ত হয়েছিল। হারেসের মত মানুষ ঝুট কথা বলে না, অন্ততঃ
বন্ধুর নিকট।

—খাকার ঘর নেই। হারেসের আতঙ্কিত মনের আর এক আবিষ্কার।

হারেসের পিঠে হাতের তালু ফেলে আরিফ সশব্দে।

—বলছি তো সব ঠিক আছে।

—সব ঠিক। তোমার একদিনের মেহনৎ।

আরিফের কথা মত পরদিন হারেস নিজেই সাহায্য করেছিল বন্ধুকে। কোন লজ্জা
নেই তার। পাড়া-পড়শীর এখন সকলেই হারেসকে চেনে। শহরের রোজগারী, তার
খাতিরও তাই বেশি। একটা নতুন তাল-পাতার চালা তুলে ফেললে দু-জনে। কঞ্চির

বেড়া আর কাদা-ধরানো কাজ আরিফ স্ত্রীর সাহায্যে পরে সম্পন্ন করেছিল। রান্না ঘরের জানালা ছিল না। হারেস নিজের হাতে বাকি রাখল না কিছুই। আলো বাতাস খেলে এই যা রন্ধে। ছোট ঘরে তার কোন আপত্তি নেই। নতুন মাচাঙের জন্য বাঁশ কেটেছিল আরিফ। এক সপ্তাহে রান্না ঘরের চেহারা ফিরে গেল। কিষাণের বাসর-শয্যা পাতা চলে এখন স্বচ্ছন্দে। সবচেয়ে বেশি উৎসুক মালেকা। নারীসঙ্গিনীর অভাব মিটেবে তার। নতুন চাচির স্বপ্ন দেখে রসুল।

শহরে আরো রোজগারের পথ হারেস নিজেই আবিষ্কার করেছে। বাসায় খরচ লাগে না তার। আলির কাছে সে কৃতজ্ঞ। ফিসারীর বাবুরা বর্ষার সময় কলা-বিবির বস্তীর পুকুরে পোনা ফেলে যায়। ফাগুন-চৈত্রে মাছ তুলে বিক্রী করে অথবা অন্য পুকুরে চালাচালি করা হয়। একদিন রাত্রে আলি হারেসকে নিয়ে গেল পুকুর ধারে। গ্যাস নিভিয়ে দিল আলি নিজে। তারপর গামছা দিয়ে দুজনের মাছ ধরা শুরু করে। গিস্গিস করছে আধ-পোয়া তিন-ছটাক ওজনের পোনা। বেশি দেবী হয় না দু-বেলার খোরাকির মত মাছ-শিকারে। বাসেদ মিস্ত্রী সবই জানে। পয়সার ব্যাপার তাই সে চুপ করে যায়। দেখেও দেখে না। শুকুর ঘরামি দেশে গেছে। আলি কুটনামির ভয় পায় না। তাছাড়া পাড়ায় এমন চুরি কেউ গায়ে মাখে না।

বাসায় চাউল যোগায় হারেস। যথেষ্ট লাভ থাকে তার। আরো উপরি পাওনা হয়।

হারেস চাউল আনে ক্যানেলের নৌকা থেকে। বরিশাল নোয়াখালীর মাঝিমাঝা খালে জমায়েত হয়। গুমোট বাসায় হারেসের মন টিক্ত না। এইখানে সে হাঁফ ফেলে বাঁচত। মাঝি-মাঝাদের সঙ্গে তার পরিচয় সেই সূত্রে। চাল, মুগী, ডিম, পাট নৌকায় আমদানীর প্রকার বহু। মহাজনের মাল মাঝারা উনিশ-বিশ করে বৈকি।

হারেসের কাছে তার কোন সন্ধান জানা ছিল না। এক মাস আগে অবেলায় সে খালের ধারে পায়চারী করছিল। কাজেম মাল্লার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। বরিশালের লোক। সরু থুণীর উপর এক গোছা দাড়ি, পৌড়-বয়স্ক বেঁটে মানুষ। এক নৌকায় তার সঙ্গে গত বছর আলাপ হয়েছিল।

—কোথায় যাবে? আস্সালামো আলায়কুম।

কাজেম মাল্লা নাগরিক সংলাপ জুড়ে।

—এমি বেড়াতে বেরিয়েছি। আলায়কুম অআসসালাম।

—খালের ধারে এমি বেড়িয়ে লাভ কি!

—ঘোরা-ফেরা আর কি!

কাজেম মাল্লার অযাচিত প্রীতি রহস্যজনক।

—ব্যবসার জায়গা। এখানে লোক পায়চারী করে না, তা-হলে গড়ের মাঠে যাও।

থুণী-শুদ্ধ কাজেমের দাড়ি নড়ে।

—কি ব্যাপার। কাজেম সাহেব!

—ব্যবসা জানো না। বলি, বাসায় কি খাও?

—ভাত।

—ভাত! হাসে কাজেম মাল্লা। ভাত কি এম্মি আসে, না দরকার হয়।

—চাল দরকার হয় বৈকি।

কাজেম মাল্লা তারপর হারেসের কর্তব্য বাথলে দিয়েছিল। এশার নামাজের সময় মাঝি ব্যস্ত থাকে। সেই সুযোগে বহুং চাল বের করে দিতে সক্ষম সে। বাজারের চেয়ে এক আনা সস্তা।

কাজেমের কাছে হাতে খড়ি হারেসের। এখন বহু মাল্লা কাজেমের মত তার সমর্থক। বহুং চাল আনে হারেস। গাঁয়ের ঢেকি-ছাঁটাই সরু চাল, দামও সস্তা। বাড়িওয়ালা মেহেরালীর সঙ্গে হারেসের হৃদয়তা আরো প্রসারিত। অন্দরে ঢুকে মেহেরালীর সঙ্গে সে গল্প করে। চাচি এক পাশে বসে পান ভাঙে কী গল্প শোনে। মেহেরালীর বৌ কথা বলে না। কিন্তু ঘোমটা দিয়ে সম্মুখে আসতে তার কোন লজ্জা নেই।

হারেস ভাবে, তার অচেনা দুলালিন খুব পয়মস্ত। শহরে আরো কত রোজগারের পথ আছে কে জানে? তার গতিবিধি সম্বন্ধে আলি শ্রেফ অন্ধ। অজুহাতে পোক্ত হোয়ে উঠেছে হারেস।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে সে। আলির ইন্তফা-দেওয়া জীবন তার কল্পনার বাইরে। আরো দু-মাস। সঞ্চিত কড়ির পেছনে হারেস নির্বিবাদ গ্রাম-জীবনের ছবি আঁকে। শহর তার জন্য নয়। রজব ছাড়াওয়ালার কথাগুলো সে ভুলে যায় না সহজে। রজব দেশে গেছে আর ফেরেনি। এখন নাকি সে লস্কর। অতুলান্তিকের বুকে কোথাও ভাসছে তার জাহাজ। চাঁটগা থেকে সে লস্করে ভর্তি হয়েছিল।

রান্নার পালা ছিল, আলিকে মিস্ত্রী আগেই ছুটি দিয়েছে। খোয়াস্তি নেই এই অবসরে। চুলা ধরানোর যা হাঙ্গাম তার চেয়ে কম্বলে থাকাই ঢের ভার। ধোঁয়ায় ঘামছিল হারেস। কাঁচা কয়লা এত কাঁদায় মানুষকে।

বহুক্ষণ কসরতের পর চুলা চম্কে উঠে। তবু শান্তি নেই।

মিস্ত্রীর হাত পা ধোঁয়ার পানি এক বালতি আলাদা তোলা থাকে। শূন্য বালতি নিয়ে হারেস পুকুর থেকে ফিরছে, নাসিমের দাওয়ার এক কোণে দাঁড়িয়ে তার বৌ।

হঠাৎ হারেসের কানে যায়, একটু দাঁড়াও ভাই।

কৌতূহল হয় হারেসের। পাছে কেউ দেখে ফেলে, বদনাম দিতে কতক্ষণ। নাসিম হয়ত ছুরি মেরে বসবে। মেহেরালীর স্ত্রী যদি দেখে।

হারেস প্রথমই জিজ্ঞেস করে, চাচি কোথায়?

—সে ঘুমাচ্ছে।

বালতি চটপট মাটির উপর রেখে সে বলে, কি দরকার?

ফিস্‌ফিস শব্দে নাসিমের বৌ বলতে থাকে : তুমি সামগড় যাও তাই বলছি। ওখান থেকে দু-কোশ আমার বাপের বাড়ি নবীপুর। এদের দেশে আত্মীয় ছিল বলে আমার এখানে বিয়ে হয়। চাচাকে বলো, ছ-বছর হোলো। আর বেশি দিন হোলো আমি বাঁচব না। পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে এমন করে কি দিন কাটাতে পারি? একটা কথা বলার লোক নেই। এক বালতি পানিতে নাওয়া-খাওয়া!

টোক গিলে নাসিমের বৌ, কথা ফুটছে তার গলায়। হারেস তার মুখ দেখে কৌতূহলবশতঃ। ফর্সা রং। ডাগর দুই চোখ। চেহারায়ে জৌলুষ নেই। গলায় একরাশ ছুলীর দাগের মত রং ফ্যাকাসে হয়েছে।

—আজকাল শাউড়ী দেখতে পারে না। ও ত রাঙেও রোজ থাকে না। বাপ ব্যাটায় বনি-বনা নেই!

বড় দুঃখ হয় হারেসের। পর্দানশীনা এক মেয়ে সহিষ্ণুতার সীমাপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই জনপথের উপর।

“শ্বশুরের মমতার জন্যেই কোন রকমে বেঁচে আছি। আমার বাপকে বলে ভাই। বিয়ের পর একমাস ছিলাম বাপের বাড়ি। মা মরে গেছে, খবর পেয়েছিলাম। আর কতদিন এমন করে বাঁচব, আল্লা—।”

চলে গেলো নাসিমের বৌ। শেষের দিকে সে ত কথা বলছিল না, কান্না কথা হোয়ে মুখ দিয়ে ঝরছিল।

কর্তব্য ভুলে যায় হারেস। বালতির হ্যান্ডেলটা নিয়ে সে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে।

সদর দরজায় পায়ের শব্দ হঠাৎ কানে আসে হারেসের।

এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অশোভন। দ্রুতপদে ফিরে এলো হারেস নিজের বাসায়।

মাঝখানে একটা দেওয়ালের ব্যবধান। পাশের কামরায় থাকে নাসিম আর তার বৌ। কিছুই জানে না সে! ধিক্কার দেয় নিজেকে হারেস।

দেওয়ালে কান পাতল সে। রোরুদ্যমানা শরীর ডুকরে-ওঠা স্বর কি সে গুনতে পারে না?

তার মনের উপর বিভীষিকাময়ী বৃহস্পতির জাল বিস্তার করে মহানগর।

সামগড়ের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে আরিফ দুর্গহিনের খোঁজ পেয়েছিল। কনের মা-বাপ নেই। চাচির কাছে মানুষ। দশ টাকা খরচ। দুর্গহিনকে পালকি করে নিয়ে এলো আরিফ। তার ঘরেই শাদীর আগ্রাম।

পশ্চিম বঙ্গে এই প্রথাকে ‘তুলে দেওয়া’ বলা হয়। যে কনের বাপ-মা শাদীর খরচ বহনে অক্ষম, তারা দুলাল ঘরে কনে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই বিয়ে হয়। বড় করণ কনের পিতা-মাতার জন্য এই ব্যাপার। প্রথা কেউ ভাল চোখে দেখে না। দারিদ্র্য সমস্ত দুঃখ লজ্জার উপর জয়ী হয়।

সোহাগ খাতুনের পিতা-মাতা ছোট বেলায় মারা যায়। কেউ ছিল না এই কারুণ্যের অংশীদার হওয়ার মত। বৃদ্ধা চাচি হয়ত একবার চোখের পানি ফেলেছিল।

কনেকে মালেকা নিজের গহনা খুলে পরিয়ে দিল। সোহাগ খাতুনের জন্য হারেস গহনা গড়িয়েছিল। তা সামান্য। হাঁসুলী, তাবিজ আর দুটো পৈচি। বাকি টুকু পূর্ণ করল বন্ধু আরিফ।

শাদীর দিনে কোন হাঙ্গামা বিবাদ প্রতিবেশীদের সঙ্গে রাখা অশোভন, অমঙ্গল। বৃদ্ধ ময়েজউদ্দিন আর ফয়েজউদ্দিন দুই প্রতিবেশীর হাতে ধরল আরিফ। মালেকা তাদের স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়ের কাছে মাফ চাইল। অনাড়ম্বর বিবাহ। তবু কোন খুঁত রাখবে না আরিফ।

হারেসকে সে কোন কাজ করতে দেয় না। বলে : তুমি আজ কোন কাজ ছুঁতে পারবে না।

বারো তের জন অতিথির খাওয়াবার সরঞ্জাম মাত্র। বিয়ের লগ্ন রাতে। দু-খানা পাল্কি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। দুলা-দুলহীন একবার ঘুরে আসবে। ঘরেই বিয়ে, তা-বলে পাল্কি চড়বে না দুলা-দুলহীন! আরিফের যুক্তির পেছনে মালেকার সায় ছিল আরো বেশি।

গাঁ থেকে নওশার পোশাক নিজে গিয়ে আনল আরিফ। মালেকার দিয়ে গেল দুটো বেল ফুলের গড়ে-মালা।

ঘরের দুটো ছোট খাসী ছিল, গোস্তের জন্য আর কোন হাঙ্গামা নেই। পাকওয়ান, ক্ষীরের জন্য আটা চাল মালেকা বন্দোবস্ত করেছিল খোরাকির অংশ থেকে।

অল্পের ভেতর ভাল সরঞ্জাম।

রসুল লুঙ্গি আর সার্ট পরে মাথায় টুপি দিয়েছে। চাচার সঙ্গে সে মিত-বর রূপে পাল্কি চড়বে। তার হাঁকাহাকি বিয়ে বাড়ির আর এক সমারোহ।

ময়েজউদ্দীনের রান্না ভাল। পাড়ার শাদী উপলক্ষে বাবুর্চি রূপে তারই ডাক পড়ে। সেও খুব ব্যস্ত। খাশী জবাইয়ের পর গোস্ত থুরথার কাজে সে মুরুব্বিয়ানা করছে। আলু ছেলে তার ভাই। খাশীর গোস্ত আলুর তরকারী আর ভাত— অতিথি সৎকারের জন্য এই বন্দোবস্ত।

ফয়েজউদ্দীন দশ বারো খানা ইট দিয়ে চুল তৈরি করেছে।

গাঁয়ের ‘ষোল-আনা’র ডেগটা আছে। চন্দা করে পাল, বরের পোশাক এবং এই জাতীয় সামগ্রী কিনে রাখা হয়।

আজ ডেগটা পাওয়া গেল না। ষোল-আনার জিনিসের ভান্ডারী রিয়াসৎ কাজী ঘরে নেই। আরিফ-ময়েজউদ্দীন ভারী রাগ করে।

আরিফ বলে, আসলে চাচা ওসব চালাকি। আমরা কিষক সমিতি করি কিনা, তাই বেইজ্জতী করবার ফন্দী। কাউকে ত “দাওয়াৎ” করিনি। সে একটা কতা।

—আসুক, কাজী। ডেগটা গুঁড়ো করে পাড়ার হিস্যা নিয়ে নেব। আরিফ ক্ষোভে গুম হয়ে দাঁড়ায়। ভেবো না, চাচা, তোমার হাঁড়ি আমি বন্দোবস্ত করছি ওপাড়া থেকে। এই ত ক’জন লোক।

ফয়েজ কাজ ছেড়ে এলো তামাক খেতে। দুই সহোদর। সমীহ করতে হয়, পেছনে ফিরে সে তামাক খায়। লৌকিকতা বজায় রাখার ভাল ফন্দী।

সে মন্তব্য করে : আগে ‘ষোল-আনা’ কতজন হোত। বিয়ে শাদীর ব্যাপার না হয় ছাড়ো; খাল-কাটা, গাঁয়ের বিচার-আচার, —কথায় কথায় লোক আদালত ছুটত নাকি?— আজকাল! সে-দিন গেছে রে বাবা। এখন সবাই হাম-বড়া।

সায় দিল ময়েজ। কনিষ্ঠ সহোদর গুড়ক ফুঁকছে, তাই সে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে কথা বলে, পালটা ত হিঁড়েছে বহুত জায়গায়, আর নতুন পাল হবে? ধ্যৎ। মুরুব্বীরা কেমন জেন্দেগানী কাটিয়ে গেল মিলে-মিশে। এখন ও-সব চলবে না।

ফয়েজ বড় ভাইয়ের হাতে হুকো-কঙ্কে ফিরিয়ে দিল। ষোল আনার টাকা যা ওঠে,

সব ত রিয়াসৎ কাজীর কাছে জমা। হিসেব চাও আজ নয় কাল। আঠার মাসে বছর। আরিফ বড় তামার হাঁড়ির বন্দোবস্ত করে ফিরে এসেছিল। তারও তামাকের নেশা ধরে। ময়েজউদ্দীনের পাশে সে বসে পড়ল।

ফয়েজ ডাকে, আরিফ।

—কি চাচা।

—একটা কাজ করো দিকি বাবা। বিয়ে-দানী বাবদ তুমি ক'টাকা দিবে।

—গরীব মানুষ পাঁচ টাকা।

—বেশ তাই দাও। কিন্তু আর মোড়লদের হাতে দিও না। মকতবে দাও এক-টাকা। মৌলবীর চলে না। তুমি নিজে তার হাতে দিয়ে এসো। এক টাকা দাও রাস্তার জন্যে। দু-টাকা নাপিত ধোপাদের ভাগ করে দিও।

—আমিও তাই ভেবেছি, চাচা। মোড়লদের হাতে এক আধলা ছোঁয়াব না এবার। বেলা শেষ হয়েছে এলো। মগরেব হোতে আর আধ ঘন্টা বাকি নেই। হাতের কাজ চটপট সেরে ফেলো, চাচা।

আমারো বেশি দেরী নেই। রাঁধতে কতক্ষণ আর লাগবে। আজ আরিফের দৌড়ধাপের অন্ত নেই। একটু জিরোয় সে দক্ষিণের হাওয়ায় স্নান করে মালেকার অবস্থা কাহিল। ফয়েজের স্ত্রী শ্রীতা হাজেরা খুব সাহায্য করেছে।

সোহাগ-খাতুন হলুদ মাখা কাপড় পরে বসে আছে। হাতে যাঁতি। এ-টা সব সময় কাছে থাকে। 'আক্দ্' হওয়ার আগে পর্যন্ত যাঁতি কাছ-ছাড়া করতে নেই। দুপুরে কম হলুদ মাখানি তাকে। ঘরের এক কোণে থিয়মান হয়ে সে বসে থাকে। মালেকা তার খবরদারী করে। দু-দিন কিছু খায়নি সে। ভিন্ জায়গা। মন ভাল না-থাকাই স্বাভাবিক।

আটার গরম পাকওয়ান দিয়ে গেল মালেকা দু'খানা।—খেয়ে ফেলো বোন। তোমার কি ভুক্ লাগে না? সোহাগ খাতুন আঙুলের ডগায় তোলে ভাঙা পাকওয়ান।

হাজেরার-দেওর-বৌ আরো ও-পাড়ার দু-তিনটে নিমন্ত্রিত মেয়ের আগমনে খাওয়া বন্ধ করে দিল, হাত গুটিয়ে নিয়েছে সোহাগ খাতুন। ঘোমটা টানে সে। সোহাগের চেহারা মাঝামাঝি আড়লের। মুখে সারল্যের ছাপ ফুটে উঠছে। সুন্দরী নয় সে, তবু লাভণ্য আছে তার চেহারায়। দুলহিনের মুখ দেখে সকলে।

বড় বিব্রত হয় সোহাগ।

হাজেরা বলে : খাওনা, মা।

—জী না। অস্ফুট কণ্ঠস্বর সোহাগের।

আহা, কচি মেয়ে। চৌদ্দ বয়স হবে না। মা-বাবা-মরা অনাথ মেয়ে গো!

সহানুভূতির রেশ চলে মুখে মুখে।

ঘোমটা টানা আছে সোহাগের। চোখ দিয়ে তপ্ত অশ্রু পড়ে ফোঁটাফোঁটা। মৃত জননীর মুখ হয়ত ভেসে উঠছে অসহায়া সোহাগের সম্মুখে।

তার উদ্ধারে এলো মালেকা।— আরে পাকওয়ান পড়ে আছে।

তারপর সে দুলহিন বেটন-কারিগীদের উদ্দেশ্যে বলে : চাচি সকলকে নিয়ে উঠে পড়ো। কনে তো রোজ দেখবে। ওদিকে কাজ কত। কনে-বরের মুখে ক্ষীর দিতে হয়। তা তৈরি করে রেখেছি। তুমি খালায় ঢালবে, চাচি। মুরুব্বী মানুষ-তোমার হাতের 'সাইত' আল্লার দোওয়ায় ভাল হবে।

চেড়ী-বন্দ সরে গেল নিমেষে। হাঁফ ফেলে বাঁচে সোহাগ। মালেকা অভিমান করে : খেলে না ত দুটো পিঠে। বরের আনন্দে খাওয়াও আর মুখে রোচে না। না?

সোহাগ বোবার মত চুপচাপ।

—ঘোমটা খুলো না, আমি ত নতুন বর নই, এত লজ্জা। নিজেই ঘোমটা খুলে মালেকা। আরে, একি! বিয়ের দিনে লোক কাঁদে? চোখ মুছিয়ে দিল সে।

মান-ভাঙানোর সময় নেই মালেকার। জিনিস-পত্র এ-দিক ও-দিক হোতে পারে। মোক্ষম অস্ত্র ছোঁড়ে সে, আমার মাথা খাও, বোন, কেঁদো না। খেয়ে নাও—

মালেকা আবার কর্মক্ষেত্রে। বেহারার দল একটা হাঁস চায়। বিয়ের দিনে ডাল-ভাতে মন ওঠে না। মুগী হাঁসের খোন্দল ছুঁতে হোল রাত্রে।

খাওয়া-দাওয়ার ঝঞ্ঝাট চুকতে রাত এগারোটা বেজে গেল। মৌলবী সাহেব 'আকদ' পড়িয়ে গেলেন। দেন মোহর বাঁধা হল পঁচিশ। পঁচিশ টাকা বাদ জেয়োর।

দূর্দান্ত মেহনৎ করে আরিফ। হাঁড়ি-বাসন পরিষ্কার, মেহমানদের খাতিরদারী নওশা-দুলহিনের পাক্কী মাঠ থেকে ঘুরে এলো, তারপর বেইয়াদের দেনা-পাওনার ঝঞ্ঝাট—হাজার গন্ডা কাজ এসে জমে। আরিফ পশ্চাৎপদ হয়ে না।

দুঃখের কোন ছায়া নেই এই সংসারে। পানাপুকুরে স্নানার্থী ঢেউয়ে ঢেউয়ে পানার দল সরিয়ে যেন অবগাহন করছে। ফাঁকা পানির ওপাশে পানার বেটনীর কথা সে ভুলে যায় স্বচ্ছন্দে।

এত রাত পর্যন্ত জেগে রইল রসুল, সন্ধ্যায় যার ঘুম আসে। পাল্কি-চড়ার সাধ মিটে গেছে তার।

—বউ দেখতে এসো সকালে, চাচা। আরিফ ফয়েজ আর অন্যান্য চার-পাঁচজন আমন্ত্রিত বন্ধুদের অনুরোধ করল।

লৌকিকতার কোন ক্রটি করবে না আরিফ। হারেস আজ নওশাহ—নতুন সম্রাট। এই সব হাস্যমার উর্ধ্বে তার আসন। বন্ধুর দূরবস্থার কথা সে কল্পনায় জানে মাত্র।

তিনদিন পরে মালেকা বায়না ধরে। দুলহিন-কে সে নিজের বাড়ি আনবে। দুলার শ্বশুর নেই বলে দ্বিরাগমন হবে না বুঝি? আরিফ প্রস্তাব পছন্দ করে নি। আবার পাল্কি-খরচ খামাখা। তিরিশ টাকা দেনা হোয়ে গেছে।

দুলহিনে মুখ-দেখানি দুটি টাকা মালেকা সোহাগের আঁচলে বেঁধে দিয়েছিল।

—তোমার পাওনা রেখে দাও, বোন।

মেহদি-রাঙা দুলহিনের আঙুলের শীষে রূপার টাকা চকচক করে। -তুমি রেখে দাও, বড় বুঝ।

এত কথা জানে সোহাগ! মালেকা বুঝ-ডাকে আরো গলে পড়েছিল। কিন্তু টাকা সে ছোঁয়নি।

শেষ পর্যন্ত রাজী হলো আরিফ। দুলহিন পালকি চড়ে ঘুরে এলো কয়েক মাঠ। রসুল পাল্কির দরজা ফাঁক করে সন্ধ্যা-লাগা বাইরের দিকে শিশু-দৃষ্টি মেলে অবাক হয়েছিল খুব। নতুন খালার (মা বলেছে: চাচি নয়, তোর খালা-আম্মা) সোঁদা-গন্ধ শরীর আর কাপড় তাকে কম বিস্মিত করে নি।

হারেস বাড়াবাড়ি পছন্দ করে নি। দুই বন্ধু হার মানে গার্হস্থ্য ধর্মের কাছে। মালেকার উৎসাহের উপর নতুন শ্রদ্ধা জাগে হারেসের। শুধু কি তাই? আরিফ হারেসের ঘর দখল করবে আজ। তার ঘরে নতুন দুলা-দুলহিন। হারেস অবাক হয় সোহাগের দিকে চেয়ে। তিনদিন মুখ ফুটছিল না তার। আজ ঘোমটার আড়ালে সে দৃষ্টি বিনিময় করে। এক বাটি দুধ এনে তার হাতে দিল। দরজার ওপরে চুড়ির নিক্কন। হারেস উপলব্ধি করে, শিক্ষার্থিনীর ‘ওস্তানী’ আছে পেছনে। পানীয় পান করে সে।

দুধের বাটি নিয়ে ফিরে গেল সোহাগ। একটা নীল পাড় শাড়ি পরেছে সে। বেশ মানায়। নব-বধূর সন্ধ্যাচন্দ্রাস করে পাংলা পরিচ্ছদ। দরজার ওপারে ফিসফিস আওয়াজ থামে না। অনিচ্ছুক কোন মজ্জেলা-কে উকিল সলা-পর্যমর্শ দিতে ব্যস্ত যেন।

হঠাৎ ছিটকে পড়ে সোহাগ ঘরের ভেতর। কে যেন তা-কে ঠেলে দিয়েছে। বাইরে চাপা হাস্য ধ্বনি। টাল সামলে সোহাগ হাসে।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে সোহাগ হারেসের পাশে। খোলা জানালা দিয়ে বাতাস আসে সন্তর্পণে। সোহাগের নিঃশ্বাস সঙ্কের স্পন্দন অনুভব করে হারেস। ঝড় উঠেছে যেন পৃথিবীর কোন সীমাপ্রান্তে। দমকা ঝাপটা ধ্বনি তার এগিয়ে আসছে বিদ্যুৎবেগে। তারি দোলা লাগল পাজরে। মুখে বুকে বাতাসের ক্ষিপ্তরোধ দ্রুত ধাক্কায় সমগ্র শরীরকে সঙ্গী করে নিতে চায় শূন্য...শূন্য মহাশূন্যতার দিগন্তরে। হারেস তাই সবলে আঁকড়ে ধরে সোহাগ-কে। মাটির মমতা ঘিরে আসে নিবিড়ে, কাল-স্থান-হীন অপরূপ স্বাপ্নিক ফেনিল আবর্তে, নতুন তৃণাকুরের ঘূমের মত হঠাৎ শব্দের জন্য-মৃত্যুর সমারোহে। মাটি আর পৃথিবী, স্বপ্ন আর জাগরণের শিহরণ। নিম্নলিত নেত্র পদ্মের কোরকে কোরকে ভ্রমর শিশুর আর্তনাদ আর দংশন।...যা আবৃত ছিল তা অনাবরণের মহিমা লাভ করে যা অনাবৃত ছিল, তা দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে। উন্মাদ চেতনারা ছুটে আসে নিঃশব্দ দ্রুত...কম্পমান সমুদ্র ফেনিল উচ্ছ্বাসে প্রতিধ্বনি করে বিরাট নৈঃশব্দের নিনাদগ্রাসী অধিত্যকা কন্দরে...

হারেস ভোরে জেগে উঠল। সোহাগ খাতুন তখন ঘুমে অচেতন। ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছে জানালার পাশে। চেয়ে থাকে হারেস। বড় কচি মুখ, দুই পক্ষ নীরবতায় বুঁজে রয়েছে। পাঁপড়ির দল কালো ছায়া ফেলেছে আলো-স্নাত গভদেগের উপর। অধ্যুষিত দ্বীপ আবার শ্যামলিমায় ভরে গেছে...কিরঘীজ-কুমার কি থিমা বাঁধন জনপদের বুকে? স্বপ্নাচ্ছন্ন

হারেসের মন। সোহাগের আরো বুকের পাশে মুখ লুকাই সে। ঘুম ভেঙে গেল সোহাগের। আলোর শিহরণ দ্বিধা-লজ্জা টেনে আনে। টাটির খিল খুলে সে বাইরে গেল।

আনন্দমুখর আলস্যে হারেস শুয়ে থাকে। বাধা দিল না সে সোহাগকে। অবসরের মৌমাছি গান করছে চারিদিকে। বাসেদ মিস্ত্রীর ভ্রুকুটি নেই, ধোঁয়ার সঙ্গে অশ্রুর নিগড় বাঁধার ঝঞ্ঝাট নেই; রক্ষ নগরী দূরে কোথায় সরে গেছে, কল্পনায় তার অস্তিত্ব আঁকাও দুঃসাধ্য। অবসর, সন্ধ্যার চুখন ছোঁওয়া প্রান্তরের ঘুমের মত অবসর...

বর্ষার পর আরিফ হারেসের সঙ্গে শহরে রোজগারের পথ দেখবে। এই ক'মাস বেকার বসে থেকে লাভ নেই। সংসারে নির্জনতা কেটে গেছে। মালেকাও এখন নিঃশব্দ।

হারেসের কল্পনা বিপরীত। গ্রামে থাকবে সে সারা জীবন। নীড়ের সফল স্বপ্ন তুষার সন্ধ্যার সম্মুখে আর মেলে ধরবে না। শুধু গতরের মেহনৎ অটুট থাকুক তার।

জমির জন্য আরিফকে সে অনুরোধ করে। হঠাৎ জমি পাওয়া মুশকিল। নায়েবের কাছে দুই জনেই ধর্ণা দিয়েছিল। খুব চড়া সালামী চায় সে। হারেস নিরাশ হয়, জমি চাষের জন্য তিরিশ-চল্লিশ টাকা সালামী দিলে আর ঘরে কি উঠবে। মধ্যবিত্ত যারা জমিদারের কাছ থেকে মৌরসী করে নেয় জমি, তাদের বাঁধা বন্দোবস্ত চাষী আছে। নতুন প্রজার কোন দরকার নেই। আশ্বাস দিল আরিফ : দু'এক মাস সবুর করো। আমি দাঁও পেলে নিয়ে নেব।

আরিফ মিথ্যা বলেনি। অনেক সময় পুরাতন চাষীর প্রতি জমিদার ও জমিওয়ালারা বিরক্ত হয়ে উঠে, নতুন চাষী প্রয়োজ্য হয় তাদের— সেই একটা সুযোগ। প্রজা সামান্য অবাধ্য হোলে, বশ্যতায় পড়লে হোলে ছুতা-নাতা করে জমিওয়ালারা উচ্ছেদের চেষ্টা করে। খবর রাখার দরকার যা। গাঁয়ে এমন ব্যাপার বহু ঘটছে। সুতরাং হারেসের দৃষ্টিভঙ্গির কোন কারণ নেই। আরিফ চেষ্টার কোন ক্রটি করবে না।

সোহাগ হারেসের প্রস্তাব পছন্দ করে না।

—তা হয় না। তুমি গাঁয়ে চাষ করবে। শহরে কত রোজগার। এই দেশের কতজনের অবস্থা ফিরে গেল।

সোহাগের কথা নিতান্ত অবহেলাযোগ্য নয়। দু'একজনের কপাল চমকে উঠে বৈকি। কিন্তু দু'হাজার জনের নয়। সোহাগের ভুল শুধু সেইখানে। একটা ব্যতিক্রমকে আইন বলে মেনে নিতে কোন বাধে না। মেয়েরা একটা ভাত টিপে অন্যান্যের সিদ্ধ হওয়ার খবর ঠিক করে।

—এখানে থেকে কি হাড়ে লক্ষী জোটে। লোকের অবস্থা দেখছ না?

হারেস চুপ করে। যুক্তি সে খুঁজে পায় না। সে সকলের ব্যতিক্রম, এইটুকু সহজে প্রমাণ করতে পারে— হারেস এই যুক্তির আশ্রয় খোঁজে কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

—এখন জমি ত পাওয়া গেল না। শহরে-ই যাব। তবে পরে।

সোহাগ খুশী হয়।— বেশ, পরে বেশি রোজগার হোলে নিজে জমি কিনে ফেলতে পারবে।

হারেস নতুন দৃষ্টি ফেলে মহানগরের উপর। সোহাগের বুদ্ধির মনে মনে প্রশংসা করে সে।

রাত্রির মদিরা-সৌরভে আরো বুক ভরে আসে।

পরস্পর জীবনে অনেকটা মিল আছে। তাই সহানুভূতি ও সাহচর্যে অদ্ভুত বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে দু-জনের মধ্যে।

পুরাতন স্মৃতির খেঁই টেনে আনে হারেস।

— চাচির কাছে মানুষ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিত খুব?

সোহাগ জবাব দিল : না, চাচি আমার খুব ভাল মানুষ। তারও কপাল ভাঙা। চাচা ধানের নৌকায় কাজ করত। ঝড়ে নৌকাডুবি হোয়ে মারা গেল। চাচির ভায়েদের মোটের উপর সচ্ছল অবস্থা। তারা-ই ত সংসার চালাত চাচির। আমি বাড়তি লোক সংসারে, তারা পছন্দ করত না আমাকে টানুক চাচি। এইজন্যে কুলোত না তাদের টাকায়। চাচি লুকিয়ে ধান ভানত। সেই মামুরা আরো রাগ করত তাই।

— চাচিকে এখানে আনলে হয় একদিন।

সোহাগ কোন সায় দিল না। আবেগ-স্রোতে সে বলে যায় : আসার দিন পাকী তুলে দেওয়ার আগে তার কি কান্না। আমারও খুব কান্না পেয়েছিল।

সোহাগের পিঠের উপর হারেস হাত বুলায় গভীর স্নেহে।

— বিয়ে ঠিক হওয়ার পর চাচির ভাই কি হুস্মান না বাধালে। সে বলে, তুমি এতদিন টেনেছ মেয়েটাকে, বরের কাছ থেকে টাকা চাও। দশ-বিশ যা হোক। চাচি সেদিন কড়া কথা শুনিয়েছিল, বেচে খাব মেয়েটাকে।

অকস্মাৎ নিভে যায় সোহাগ।

হারেস কি প্রশ্ন করবে ঠিক করতে পারে না। এমি ডাকে, সোহাগ।

— জী।

— আর কথা বলছ না।

চুপ থাকে সোহাগ খাতুন। ভিজ়ে চোখের পাতা মোছে সে অন্ধকারে, হারেস কিছু জানে না।

— আমার ঘুম পায় কি না।

— চাচিকে একদিন দাওয়াত দাও।

সোহাগ বলে, না। আগে সংসার গুছিয়ে নিই। তারপর। চাচি এসে যেন সুখী হয়।

হারেসও তাই ভাবে। সংসারের সবদিক গুছিয়ে ফেলতে হবে ধীরে ধীরে। পাঁজরের আরো নিকটে আসুক সোহাগ, আরো নিবিড়ে আসুক ঘুম।

আরিফের সংসারে নির্জনতা কেটে গেছে। তার কাম্যও ছিল তাই। নানা কাজে সে ব্যস্ত থাকে। শুধু মুনিশই সে খাটে না। কয়েকদিন মালের নৌকায় দাঁড়ীর কাজ করে সে। মালেকা আর অভিযোগ করবে না, ‘আমি একা এমন বুনা জায়গায় থাকব কি করে।’ রোজগারের পথ খোলে ধীরে ধীরে। কেবল গাঁয়ের কাজের উপর আর নির্ভর করতে হয়না। বর্ষার পর সেও হারেসের সঙ্গে নগরে জীবিকা সংগ্রহের আশা পোষণ করে।

এক মাস পলকে কেটে গেল। হারেস সঙ্গে যা টাকা এনেছিল শহর থেকে, -খরচ

করে। জমি পাওয়ার বহু চেষ্টা আপাততঃ ফলবতী হয় না। আরিফ মাত্র পাঁচ-ছয় বিঘে জমি চাষ করে। তার ভাগ সে দিতে চেয়েছিল। হারেস রাজী হয় না। এই জমিতে তোমার সংসার ঠিক মত চলবে না, ভাই।

মালেকা মনের সজীবতা রক্ষা করে নানা উপায়ে। হারেসের বিভাগের দেনা সে নিজেই জানে না। আরিফ খোলাখুলি দেনা বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বাকি ছিল শুধু মালেকার অনুমোদন। সেদিন ভয়ানক রেগেছিল মালেকা এই প্রস্তাবে।

— গরীব, তাই বলে মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে নাকি তুমি?

মিইয়ে গিয়েছিল আরিফ। শালীনতার এত বাঁধ-রক্ষা গরীবের পোষায় না।

মালেকা অবিশ্যি আরো সঙ্কটে পড়েছিল। একদিন সোহাগের হাত থেকে পৈঁচি খুলে নিল সে, কেবল পরিস্কার করার অজুহাতে, ক্ষুণ্ণ হয়েছিল সোহাগ। হারেসের সঙ্গে আলাপও হয়েছিল এই প্রসঙ্গে। তার মনে কোন বক্তৃতার ছাপ পড়ে না। নিজের জিনিস ফেরৎ নিয়েছে অধিকারী, তার জন্য আবার কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হয়?

দু'দিন পরে সোহাগ মত বদলাতে বাধ্য হয়েছিল। বেনের দোকানে বিক্রী হয়ে গেল হাতের পৈঁচি জোড়া। দেনার জের মিটেছিল বিয়ের তার দৌলতে। হারেস সোহাগের কাছে ব্যাপারটা শোনে শুধু। হাতের টাকা ফুরিয়ে এসেছে তার, বন্ধুর উপর বেশি জুলুম করছে সে জল্পাদের মত। সোহাগ গায়ে মুনিশ খাটা পর্যন্ত পছন্দ করে না। স্ত্রীর মন যুগিয়েছিল বৈকি সে, নচেৎ একমাসে একদিনও সে কুজির রুজির হিল্লায় বেরুল না কেন। রোজ না হোক, কাজের খুব অভাব ছিল না গাঁয়ে।

দু-মাস পরে ফিরে এলো হারেস মনঃক্ষুণ্ণে। দানা খুঁটে খাওয়ার পর এই দিকে কেবল খোলা।

অভ্যন্ত পরিবেশে তেমন বিরক্তিকর কিছু নেই। আলির বন্ধ্যাহীন জীবনে কোন পরিবর্তন হয় না। বাসেদ মিস্ত্রী রোজগারে ফেঁপে উঠেনি শুধু, খোল্‌তাই হয়েছে চেহারা তার। নিজের হাতে কাজ করে না সে। মিস্ত্রী ঘরামী যোগাড় করাই তার বর্তমান কাজ। মাঝ থেকে আসে মোটা দস্তরী। বুড়ো মেহেরালী ছাগল নিয়ে তেমি বেরিয়ে যায় সকালে, গভীর রাত্রেও ডিবা জ্বলে ঘাস খাওয়ায় গৃহপালিত জীবদের। নাসিম আরো বেয়াড়া হয়ে গেছে। ফরিদপুরের ছাড়াওয়ালারা উঠে গেছে অন্য কোথাও, নতুন ভাড়াটে এসেছে সেই ঘরে। ছোট্ট বিড়ির কারখানা। পাঁচ-ছয় জন কারিগর দিন-রাত কাজ করে। ঘরের চেহারা ফিরে গেছে। উপরে কাঠের মাচাঙ পাতা। খলি ভরা বিড়ির পাতা ও শুকোর গুদাম। নিচে কারখানা আর শোয়ার জায়গা। বহু সিনেমার প্রাকার্ড মাটির দেওয়ালে আঁটা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্মেলন। দু-টো ঘেরাটোপ চুলার ভেতর দিন-রাত আগুন জ্বলে, তারের ছাউনীর মাথায় চলে বিড়ি সেকা। হারেসের সঙ্গে সকলের পরিচয় জমে না। পুথি পাঠের আনন্দময়ী আস্তানার করুণ পরিণতি।

রাজ-মিস্ত্রীর যোগাড়ে। হারেস সকালে কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। বিকালে ক্যানালের দিকে বেড়াতে গেল। পরিচিত মান্না অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। কুজির পথ বন্ধ। মাঝিরা আজ-কাল ভাগ চায়। তেমন ঈমান বরবাদ করে লাভ নেই। হারেসের ভাল লাগে না ব্যাপারটা। সামান্য আয়ের পথও এমন আঁধা-গলিতে পরিণত হবে। ধোঁয়া ঠেকে

চারিদিকে তার। নৈরাশ্যের পাতলা কুয়াশা জাল মেলছে যোজন-যোজন। সৎ উপার্জনের উপায় বিস্মৃত হোতে শিখছে হারেস।

ফিশারীর বাবুরা মাছ হেঁকে নিয়ে গেছে। পুকুরের তলায় গুগলী আছে কিনা সন্দেহ।

শহরের সব অসুবিধা ভোলা যায়। সোহাগের আকর্ষণ হারেস মনকে কি দিয়ে ভোলাবে? শহর আর নগর। পেঙ্গুলামের মত দিক পরিবর্তন। মিস্ত্রী রাগ করে। যদি এত ঘরের-ই টান, শহরে আসার কি দরকার। বাসেদ মিস্ত্রীর কণ্ঠস্বরে দরদ উঠে গেছে। ছুটির নাম করে না এক আধ ঘণ্টা। তীক্ষ্ণতর তার দুই চোখ। ফাঁকির যো নেই। আলি নেহাৎ খাল্লা বাসেদের উপর। শুকুর সকলের মনোভাব মিস্ত্রীর কাছে পেশ করে। সেই একমাত্র মিস্ত্রীর প্রিয় মজুর। তোয়াজের গুণ জানা আছে শুকুরের। অযাচিত-ভাবেই সে মিস্ত্রীর গামছা ধোয়, ফাই-ফরমাস আবিষ্কারের পর তামিল করে।

এমন জায়গায় মন ভাল থাকে না হারেসের। আরিফের পাশাপাশি সকলের তুলনা করে সে কল্পনায়। ক্ষুদ্র রোষে তার শরীর রিরি করে। অথচ মুখোমুখি অভিযোগের কোন সাহস পায় না হারেস।

অবসরের ফাঁকে সে বেরিয়ে আসে মেহেরালির দাওয়ায়। পরম নিশ্চিন্তে এখানে কথা বলা যায়। স্নেহ-বৎসল বৃদ্ধ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে পটু। গলি-ঘোরা বাতাস এসে লাগে দাওয়ায়। ক্লান্ত শরীরে তা পরম উপাদেয়। স-উৎসাহে হুঁকার নলিচা টানে হারেস। বয়সের বিভেদটুকু মেহেরালি নিজেই মুছে দিয়েছিল।

প্রশ্ন করে মেহেরালি : শহরে তোমাদের পোষায় না। ছোটবেলা থেকে আমরা এসেছি কিনা। সব সয়ে যাচ্ছে। গাঁয়ে আমার মন টেকে না। বৌমাকে নিয়ে এসো না।

— না, তারা দু-দিন থাকতে পারবে না।

— ওসব বাজে কথা। এই যে আমার সোনার বৌমা, আজ ক'বছর রয়ে গেল।

মেহেরালির স্ত্রী সংলাপের শরীক নয়, পান সাজছিল সে চৌকাটের ওপারে। হঠাৎ ছুটে আসে তার মস্তব্যের বান : নিয়ে যাওয়ার মুরোদ থাকলে ত? পাঁচ সাত টাকা খরচ করে একবার মেয়েটাকে দেখতে এলো না।

— চুপ করো। মেহেরালি একটু রুঢ় হয়।

থামে না মেহেরালির স্ত্রী : মেয়ের বাড়ি এলে খরচ আছে, না-হয় না জুটলো, খালি হাতে এলে কি গর্দান যেতো।

— আল্লার ওয়াস্তে টুড় একটু থামাও।

নাসিমের বৌ অপর ঘরের ছাঁচার পাশে উঁকি মারে। হারেস কল্পনা করে তার অবস্থা। অবাক হয়, হারেস। এত কাছাকাছি থাকে, তবু কারো মনের হৃদিস কেউ জানে না। পাগলা গারদের অধিবাসী নাকি।

পান চিবোয় বোধ হয় মেহেরালির স্ত্রী। কণ্ঠস্বর তার খুব স্বাভাবিক নয় : সত্যি কথা বললেও তুমি চটে উঠো।

— চুপ করো। তুমি বৌর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছ। বৌর বাপের সঙ্গে দিলে তার চাল-চলনের অত হিসেব নিতে।

মেহেরালির স্ত্রী নামাজের পাটীতে বসল একটু পরে। ঝগড়া থেমে যায়। অন্য কথা

পাড়ে হারেস। মেহেরালি ধূমপানে অস্তিত্ব ভুবিয়া রাখে। আনমনা প্রশ্নের জবাব তার মুখে। দাওয়ার এক-কোণায় গিয়ে সে ডাকে : বৌমা। ফিস্‌ফিস অস্পষ্ট কণ্ঠের ডাক।

হারেস চেয়ে দেখে নাসিমের বৌ ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

— কিছু মনে করো না, মা। বুড়ো বয়সে ওর মাথার ঠিক নেই। কতগুলো ভাই তোমার। মরেছে ওর চোখের সম্মুখে। মাথার ঠিক থাকবে কেন?

— না বাবাজী, আমি কিছু ত মনে করিনি।

নারী-কণ্ঠের করুণ মিনতি ঝরতে থাকে।

হারেসের পাশে এসে বসল মেহেরালি।

— দুনিয়াটা বড় ঝঞ্ঝাটের জায়গা। আল্লা কি কপালে সুখ রেখেছে। হাস্যামা কাঁহাতক পোয়ানো সহ্য হয়।

হারেস কোন জবাব খুজে পায় না : সহ্য করা ছাড়া উপায় কি।

আবার এক চিলিম তামাক সাজল হারেস। বৃদ্ধ দম ভরে ফোঁকে। ধোঁয়া দিয়ে বুকের আগুন নিভানোর চেষ্টা চলে।

— সুখী হও, বাবাজী। আল্লা সুখে রাখুক। ঘর সংসার পেতেছ, আল্লার কাছে দোয়া মাগছি।

হাত তোলে আকাশের দিকে মেহেরালি।

তারায় ছেয়ে রয়েছে অগাধ আকাশ।

লাঙ্ঘিত বার্থ্য অপত্যম্নেহের ভীকু ধারা আধক্সি খোজে অন্ধকারে।

হারেসের দিকে চেয়ে থাকে মেহেরালি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর পান খেতে বেরোয় হারেস আলির সঙ্গে। সে হাসে, বুড়োর সঙ্গে খুব জমিয়েছিস। দোয়াক্সি খলি ঝেড়ে দিয়েছে আজ।

হারেস ঠোঁট চেপে হাসে।

আলির মুখের তোড় চলে : ও সব ফুস মস্তুর। আমার বাবাজী রোজ নামাজের পাটীতে দোয়া করে, তার ছেলে যেন গোটা কল্‌কাতা ট্যাকে গুঁজে ঘরে ফিরে। ভাবছি, গড়ের মাঠ-টা নিয়ে ফেরা যায় কি না।

এত হাসতে পারে আলি! মেহেরালির সাদা-শুশ্রুল মুখ বার বার ভেসে উঠে হারেসের সম্মুখে।

কলা-বিবির বস্তীর বিবিরা অনেকে পর্দানশীনা। স্বামীপুত্রের ইজ্জত তারা রক্ষা করে বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ না রেখে। হারেসের বাসার দু-তিন খানা বাড়ি ছাঁড়িয়ে কাঁচা নর্দমার সরু রেখা। পাশে তার চেয়ে সংকীর্ণ গলি। দু-পাশে আরো বাসিন্দাদের আবাস-ভূমি।

জবেদ ঘরামির সঙ্গে তার আলাপ হোয়েছিল এই গলির ভেতর। সকালে সে দোকানে ঠোঙা বিক্রি করতে যায়। খুব বেশী হাস্যামা নেই। বাঁধা দোকানদার আছে বহু তার। হারেসের লোভ জেগেছিল একদিন। সংসারে আর এক প্রাণী বাড়িয়েছে সে। রোজগার

বাড়ল কৈ?

ঠোঙা তৈরি করে জবেদের স্ত্রী। আরো ছোট ছেলেপুলের সাহায্য গ্রহণ করে সে। পর্দানশীনা সংসার গুছিয়ে রাখে দক্ষতার সঙ্গে। তার দশ বছর বয়সের ছেলে কাসেম এ-বিষয়ে খুব নিপুণ। পুরাতন খবরের কাগজ সে কাঁচির মুখে উড়িয়ে ছাড়ে। হারেস অবাধ হোয়েছিল তার নৈপুণ্যে। আধপোয়া, এক পোয়া অথবা পাঁচ-পো দেড়সেরী ঠোঙা সে মার আদেশ-মত চটপট কেটে যায়। একবার জিজ্ঞাসা করে শুধু। কাসেমের সঙ্গে খাতির জমিয়ে তার বিদ্যে উজাড় করে নিল হারেস। কয়েকদিন হোটেলে এক পয়সার সমচা-পিঠে আর সিঙল চা ব্যয় হয়েছিল মাত্র।

বস্তীর এক বিক্রীওয়ালার কাছ থেকে হারেস কাগজ কেনে। সকাল আর রাত্রির অবসরে সে-ও ঠোঙা তৈরি করে। লাভ মন্দ নয়। উপরি-রোজগারের আশ্বাদ টাটকা।

আলি হাসে, এবার ইমারত তুলবে দেখি। কিন্তু ভাই খেজুর পাতা দিয়ে শেষে ইমারত সেলাই না করতে হয়। তার ব্যঙ্গ হারেস গায়ে মাথেনি। নিজের কাজে হরদম মশগুল থাকে।

সোহাগের কথা সে ভুলতে পারে না। দায়িত্ব, দায়িত্বের বোঝা রয়েছে কাঁধে।

প্রথম মাসে কয়েকটা টাকা পাঠিয়েছিল হারেস সংসারে খরচ বাবদ।

তিন মাস পরে আবার সামগড় ফিরে এলো হারেস। হাতে নতুন সঞ্চয়ের কড়ি। এবার সঙ্গে সে এক বস্তা পুরাতন কাগজ বয়ে নিয়ে এলো। রসুল ছাড়া আর কারো জন্য কোন কিছু ঘুষ সে আনতে পারেনি শহর থেকে। সোহাগের জন্য অল্পদামী শাড়ী মাত্র।

সোহাগ বলে, কাগজ কি হবে?

হারেস বের করে কাঁচি। দু-বার অঙ্গুল নাচিয়ে সে বলে, নতুন বৌর কান কাটা যাবে। রক্ত যাতে মাটিতে পড়ে তার কাগজ।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর হারেস যখন ঠোঙা কাটতে বসল, সব হৈয়ালি তখন পরিষ্কার হোয়ে যায় সোহাগের।

— ঠোঙা কেটে কি হবে।

— কি হবে। কচি খুকির মত কথা বলো না।

গম্ভীর হোয়ে যায় হারেস। চোখ নীচু করে সে কাঁচি চালায় শুধু। কচকচ শব্দ উঠে নিঝুম দুপুরে।

— শহরে বিক্রি হয়। দোকানদার কেনে। তোমাদের খাবার আনি কিসে খবর রাখে।

চার চোখের দৃষ্টি মেশে। স্মিত হাস্যে কাজ করে হারেস। হঠাৎ গলা ঝাঁকারী দিয়ে ডাকে আরিফ। ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেল সোহাগ।

— আ রে। আসামাত্র আবার কাজ শুরু করেছে। এ-কি তুমি ঠোঙা তৈরি করতে জানো!

— বসো, মাদুরের ওপাশে। শিখতে হয় ভাই।

— এসেই এত ব্যস্ত। গল্পসল্প করো।

কাঁচি থামে না হারেসের।

— গল্পও করছিলাম।

— তবে উঠে যাই।

হাত বাড়িয়ে বাধা দিল হারেস।

— তোমার সঙ্গে বুঝি গল্প করা বারণ।

আরিফ একটা বিড়ি ধরায়।

— এত ব্যস্ত, সংসারে লোক বাড়ছে, রোজগার না বাড়লে চলবে কেন?

হঠাৎ থামল হারেস।

— লোক বাড়ছে মানে?

আরিফ মুখ টিপে-টিপে হাসে।

— এখন কিছু বলব না। ছ-মাস যাক। মিঠাই খাব।

কাঁচির শব্দ এবার বোবা, খসে পড়ছে যেন কাঁচি হাত থেকে। বিচিত্র অনুভূতির রেশ হারেসের মনে। সংসারে রেখে যাবে সে আদমের স্মৃতি? এত উজ্জ্বল স্বপ্ন-ঘেরা তার চারদিক!

— সত্যি? বিস্মিত হারেসের মুখ থেকে ছিটকে পড়ল যেন কথাগুলো।

— সত্যি।

আরিফের দুই চোখ উজ্জ্বল।

ঢলা দুপুর অপূর্ব রাগিনীর রেশ বাজিয়ে যায় খোঁড়া বাড়ির ঈষৎ অন্ধকার মেঝের ওপর।

সব কাজে ছেদ পড়ল হারেসের। একটু কাগজেও আর কাঁচি চলে না।

আরিফ চলে যাওয়ার পর এলো সোহাগ। ধীরে ধীরে মেঝের উপর পা ফেলে সে।

নব-মাতৃত্বের উল্লাস-বিজয়িনী স্ত্রীর দিকে যেন চোখ ফেলতে পারে না হারেস।

হঠাৎ উঠে পড়ে সে, সোহাগের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

— রসুলের বাপ যা বলে গেল সত্যি?

সোহাগ কোন কথা বলে না। শ্মিতঠোঁট, লজ্জায় আনন্দে সে হারেসের বুকে মুখ লুকানোর জন্য অগ্রসর হয়।

হাতে টাকা ছিল। হারেসের পীড়াপীড়িতে আরিফ একটা দামড়া বাছুর কিনে আনে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।

বাছুরটা খুব তেজী। হারেস চোখ ভরে দেখে।

— হ্যাঁ ভাই আরিফ, তোমার পছন্দ আছে।

আরিফ প্রশংসা হাসিমুখে গ্রহণ করে।

— দেখবে সামনে বছর, পাকা জিনিস।

— জমির চেষ্টা করো। আমি ত ঘোড়া না কিনে চাবুক কিনে বসে আছি।

আরিফ উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করে না : জমি নিশ্চয় পাবে তুমি। কপালের গড়বড়ি। দেবী হচ্ছে এই যা।

— মাস দুই পরে আর একটা। জোড়া হেল-গরু দরকার। আর তোমার ত দরকার আছে। বুড়ো গরু আর পচা লাঙলে ভাল চাষ হয়না।

বন্ধুর আন্তরিকতার সঙ্গে তার গরুর প্রতি ব্যঙ্গ সহজে গ্রহণ করতে পারে না সে।
ভাল-লাগে না আরিফের। নিশ্চয় চোখে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

— আচ্ছা আর একটা দাম্ভা দেখব। প্রাণ-হীন জবাব মাত্র।

দুপুরে দুইজনে ঠোঙার কাগজ কাটে। আরিফও শিখছে হৃদিস। হারেস বলে, আমি
শহর থেকে কাগজ আনব, তোমরা তৈরি করে রাখো সবাই মিলে, ফের নিয়ে গিয়ে বেচে
দেব। ভাল ব্যবসা চলে।

উৎসাহিত হয় আরিফ।

মালেকা নতুন বোনের সঙ্গে ব্যস্ত। বন্ধুদের খোঁজ আর সে রাখে না। ফাইফরমাস
শোনে রসূল।

রাত্রে সোহাগ বলে, আমার জন্যে কাপড় এনো না। বুঝি মনে করবে। শহরে তার
কেউ নেই বলে, একটা জিনিসও পায় না। তোমার কাপড় আমি লুকিয়ে রেখেছি। নতুন
কাপড় দিয়ে, তবে বের করব।

সৌজন্যের অন্যান্য দিক বিচার সব সময় হারেসের পক্ষে কুলায় না।

— ঠিক। আমার ভুল হয়েছে।

সোহাগের শরীর চার মাসে বেশ বদলেছে। ময়ূরের ছানার নীড়-কাল কেটে গেছে।
হারেস সংসারের প্রতিচ্ছবি দেখে তার ভেতর।

ক্ষুদ্র পরিবারটি ঘিরে নব-নব উত্তেজনা। পরম উৎসাহে কাগজে আঠা লাগায় আরিফ।
ময়দা গরম করে সোহাগ কি মালেকা। রসূল একটা ঘুড়ির জিদ ধরেছিল। তাও অপরূপ
রইল না। নিজের হাতে ঘুড়ির কাঠি তুলে হারেস।

শহরে ফেরার দিন ঠোঙার বস্তা স্টেশন পর্যন্ত মাথায় বয়ে আনল আরিফ।

হারেস সোহাগের চেয়ে বেশি ভাবে তার আগামী বংশধর মুকুলের কথা। প্রবাসের
বিচ্ছেদ-ব্যথায় ফিকে রং পথের সঙ্গীত রূপে ছড়িয়ে পড়ে, মাঠে মাঠে চলন্ত ট্রেনের
হুইশেলে, যাত্রীদের কলতানে। চরাচরে বিস্তারিত তার মূর্ত্তনা।

সাতদিন একটানা বেকার। হারেস চোখে অন্ধকার দেখে। বাসেদ মিস্ত্রী দেশে চলে
গেছে। সেও হাল ছেড়ে দিল নাকি? ঠোঙার কাজ হাতে আছে, তবু রক্ষা। কিন্তু তার
রোজগারে সংসার চলেনা। আলি কাজের সন্ধানে ছুটোছুটি করে। আল্লা হঠাৎ এমন-ভাবে
রুজি বন্ধ করে দেন গরীবের। হতাশা-ক্লিষ্ট দুই চোখে হারেস ভাবে।

আলি আর এক মিস্ত্রীর কাছে কাজ যোগাড় করল দু-দিন পরে। তার উপর হারেসের
কৃতজ্ঞতা আরো বাড়ে। অনিশ্চয়তার কষাঘাত হারেস জীবনে আর পূর্বে কোনদিন অনুভব
করে নি। চুপ করে থাকা তার অভ্যাস, তাই তার মনের ঠিকানা কেউ জানে না। নিখুঁত
দেখলে আলি হারেসকে তিরস্কার করে।

কয়েকদিন পরে ফিরে এলো বাসেদ মিস্ত্রী। বেকার দিনের অবসান ঘটে। স্বোয়াস্তির
নিঃশ্বাস ফেলে হারেস।

তবু মন তার মুষড়ে যায়। আবার হঠাৎ কোনদিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে কাজ।
আশঙ্কার বিভীষিকা বারবার মনে উঁকি মারে। ভাল লাগে না শহর, গায়ে এক-কাঠা ভুঁই
পাওয়ার যো নেই। নীড় রচনা করেছে সে। ঝড়ের দোলা দোলা বোধ হয় আর কোন

কালে থামবে না। তারই ত্রাস শুধু।

বস্তীর জীবন ঝিমিয়ে গেছে। ক্লাবে গান-বাজনা চীৎকার হুন্ডা বন্ধ। ফেরীওয়ালাদের কারবার লোপাট। খাঁ খাঁ করে ঘরখানা। চেনা মুখ অনেক সরে গেছে দূরে দূরে। মেহেরালী রাত্রে খকখক কাশে। হাঁপানি রোগ ধরেছে বুড়োর। তবু ছাগল সঙ্গে রাতারাতি সে বেরিয়ে পড়ে। গলার উপর মোটা শিরা মাংসের স্তূপ পেছনে ফেলে যেন আরো অগ্রসর হোতে চায়। তিন চার খানা মাদুলী ঝুলছে মেহেরালির গলায়। সেদিকে আর হারেস বেশি ঘেঁষে না। বড় কর্কশ কাশি মেহেরালির।

কাজ থেকে ফিরে আসার পথে একদিন হারেস দেখে বাসার সদর দরজায় একটা রিক্সাওয়ালা হুন্ডা করছে। আরো কয়েকজন বস্তীর বাসিন্দা ভিড় জমিয়েছে। একটু দ্রুতপদে এগিয়ে এলো হারেস।

পথেরই একজন লোক বলে, রিক্সাওয়ালার ভাড়া অন্ততঃ অর্ধেক দেওয়া উচিত। দু-ঘন্টা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

— দ্যাখো না বাবু। সওয়ারী না যায় এত দেবী করার কি দরকার ছিল।

ব্যাপারটা আঙিনার ভেতরে ঢুকে উপলব্ধি করে হারেস।

মেহেরালির সম্মুখে আর এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে সে নাসিমের শ্বশুর। মেয়েকে নিতে এসেছিল। নাসিমের বৌ বাপের সঙ্গে যেতে নারাজ। রিক্সায় উঠে সে নেমে গেছে।

— কি হোলো, চাচা। হারেস জিজ্ঞেস করে।

এই দ্যাখো না বাবা— আমার বিয়াই এসেছে অনেক দিনের পর। বৌ-মা যেতে চায় না। একবার দশদিন ঘুরে আসুক। তা বেয়াড় মেয়ে।

নাসিমের মা শাপান্ত করছে— এমন জীহাবাঁজ-ছুকরী, কারো কথা শুনবে না। বাঁটা দিয়ে কলাবিবির বস্তী থেকে বিদেয় করিতে ইচ্ছে করে।

হারেস-ই নবীপুরে আরিফের মারফৎ পাঠিয়েছিল। বিস্মিত সে। কি হোল নাসিমের বৌর? বিগত অবেলার কথা তার মনে পড়ে। নাসিমের বৌর মিনতি এখনও তার কানে স্পষ্ট নিনাদিত।

— একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখো চাচা। মুরুব্বীযানা করে হারেস।

খকখক করে কাশল মেহেরালি বুকে হাত চাপা দিয়ে খানিকক্ষণ। দম ফেলে সে।

— দু-ঘন্টা এই কিত্তি হচ্ছে। কাপড় পরে রিক্সায় এসে বসেছিল পর্যন্ত। তারপর যা নামল, আমরা দু'বিয়াই হেরে গেছি।

নাসিমের শ্বশুরের বয়স ষাটের কম নয়। কুশ চেহারা। বোবার মত সে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে রিক্সাওয়ালা হাঁকছে অন্ততঃ অর্ধেক ভাড়া তার চাই-ই।

নিরুপায় বৃদ্ধ ভাড়া চুকিয়ে এসে আবার মেহেরালির কাছে দাঁড়ায়।

— আজকের মত ঘরে যাও, বৌ-মার বোধ হয় মন খারাপ। পরে এসে নিয়ে যেয়ো।

— না, আর এ-মুখ করব না। মেয়ে হোয়ে বাপের ইজ্জত রাখল না।

ক্ষোভে চোখ ফেটে পানি আসছে তার। গাঁয়ের নিরীহ মানুষ। বড় মায়া হয় হারেসের। মেহেরালি হতবাক— ফ্যাল-ফ্যাল নেত্রে চেয়ে থাকে।

— চাচি, তোমার বৌ হঠাৎ বঁকে বসল কেন? জিজ্ঞেস করে হারেস।

মেহেরালির স্বী জবাব দিল না।

মেহেরালি বৈবাহিকের হাত ধরে হঠাৎ : মাফ করো ভাই আমাকে। তোমার মেয়ের কোন কষ্ট নেই। আমি যত্নিন বঁচে আছি মায়ের কোন কষ্ট হবে না। পরে এসে নিয়ে যোগো।

শিশুর মত চোখের পানি ফেলে বৃদ্ধ। চটের পর্দা সরিয়ে সদর দরজার আড়ালে হোয়ে গেল সে। বড় শ্রুথ চলার ভঙ্গী। বৃদ্ধের ভাঙা চিবুকে অশ্রু জমে রয়েছে।

স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল হারেস। এমন ছিনাল মেয়ে জীবনে আর দেখেনি সে। এত মিথ্যে ছলা-কলা এরা জানে। তার সঙ্গে প্রেম নিবেদনের জন্য কি সেদিন এত অছিলা করেছিল নাসিমের বৌ!

রাগে হারেসের দুই চোখ পুড়তে থাকে। ঘনঘন সে নাসিমের ঘরের দিকে তাকায়।

দু-দিন পরে অবেলার গা-ঢাকা অন্ধকার পথে হারেস বাসায় প্রবেশ করে। সদর দরজার পাশেই এক ছায়া-মূর্তি নড়ে উঠল হঠাৎ। হারেস চেনে এই মানবীকে। কোন কথা না বলে সে নিজের পথে এগিয়ে এলো।

চুলো নিয়ে আবার হাঙ্গামা। ধোঁয়ায় চোখ বুঁজে আসে। কাঁচা কয়লা আজ যেন জ্বলতে চায় না।

দরজার উপর নাসিমের বৌকে দেখে হারেস অসোয়াস্তি অনুভব করে। এমন ভর সন্ধ্যায় যদি নাসিম দেখে, খুন করে ফেলবে সে।

আর পা বাড়ায় না নাসিমের বৌ।

হারেস রুদ্ধকণ্ঠে বলে, এখানে কেন?
নাসিমের বৌর মুখে ঘোমটা প্রান্ত্রি সরে গেছে।

সে বলতে থাকে, তুমি আমার ঢের উপকার করেছিলে ভাই। আমার কপালপোড়া কি করব।

— এখন যাও শিগগির।

— সবাই ঘুমাচ্ছে ভাই ত এলাম। কোন ভয় নেই।

— তুমি যাবে কি না। বড় কর্কশ হারেসের গলার স্বর।

— এত রাগ করছেন কেন ভাই। আমি এখনি যাচ্ছি।

— তবে যাও।

— আমার কথাটা শেষ করে নিই।

— যাও।

নাসিমের বৌ আর সময় দেয়না নিঃশ্বাস ফেলার। বলতে থাকে সে : বাবাজীর সঙ্গে কি করে যাব। গেলে এখানে ঢোকার জায়গা থাকবে না। মা ছেলের নিকে দেবে, নতুন বৌ আসবে। আর আমার জায়গা থাকবে এখানে? সেখানে গরীব বাপ-ভাইদের গলার কাঁটা হোয়ে ঝুলে লাভ কি। তুমি সেদিন কি না ভেবেছ, ভাই। বাপ যদি গরীব না হোত—

আর দাঁড়ায় না নাসিমের বৌ। পলকে প্রান্ত্রণের ঘুপটি অন্ধকারে মিশে গেল সে।

হতবাক হারেস। চুলায় ফুঁ দিতে সে ভুলে যায়। বাইরে এলো সে। ছোট দাওয়ার এক কোণে নাসিমের বৌ দাঁড়িয়ে আছে। মাফ চাইবে হারেস একটি বারের জন্য। সদর দরজায় পাতালির শব্দ সব গুড়িয়ে দিল। হারেস পথ-চলার ভান করে। চটের পর্দা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আবার বিপরীত মুখে ফেরে সে। দাওয়ায় তখন কোন ছায়ামূর্তি নেই। নাসিমের বৌ চলে গেল। গৌর রং তার ফ্যাকাশে হয়েছে গেছে, নিশ্চয়ভাচোখ দু-টো কাতর মিনতি ভরা। ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায় না হারেস। এই জাহান্নামের ভেতর কেমন করে নসু-বৌর দিন কাটবে, হারেস ভাবে। হাঁপানি বেড়েছে মেহেরালির। তার মৃত্যুর পর একদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরবে নসু-বৌ নির্ধাৎ।

আরো এক বছর কয়েক মাস।

হারেস মাত্র দু-বিঘে জমি আদায় করেছে। তার উপর শুধু নির্ভর করা চলে না। আজকাল আলাদা দুই পরিবার। সোহাগের মর্যাদা মাতৃত্বে উন্নীত। বাপের মত-ই পাট্টা চেহারা হারেসের ছেলের। আরিফ পছন্দ করেছিল নাম, কিবরিয়া। সোহাগের নাকি নামটা পছন্দ হয়নি। বন্ধুর মনে কোন দাগ পড়ে হারেস তা চায়না। আকিকার সময় খামাখা ব্যয় করেছিল হারেস। তার জের সহজে মিটল না। একটা মাত্র হালের গরু। আরিফের বুড়ো গরু মাসে-মাসে ঋণ নিতে হয়। আর একটা দামড়া বাছুর কেনার পয়সা জুটছে না। নতুন বংশধরের জন্য ব্যয়-ভার আরো বেশি। সত্তাব মনোভায়ে আছে দুই পরিবারে। টানাটানির সংসারে পাছে ঝগড়া বাধে, আরিফ তাই নিজেই পৃথক হয়েছে গিয়েছিল।

দু-মাস শহর থেকে ফিরেছে হারেস। বীজধান ছড়িয়ে গিয়েছিল সে। নতুন অঙ্কুর হাত-উঁচু ধানগাছে পরিণত। চাষবাস সেরেই আবার কর্মস্থলে ফিরে যেতে চায় সে, টুংটাং কাজ হয়মাত্র। বাসেদ মিস্ত্রী অনেক লোক ছাঁটাই করে দিয়েছে। তার প্রিয় গুরুর পর্যন্ত অন্যত্র চলে গেছে।

এইবার বৃষ্টি নামল বিলম্বে। আষাঢ়ের শেষাশষ। বীজ বাড়ছে, অথচ বৃষ্টি নেই। আবাদের অসুবিধা।

বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে কর্মব্যস্ততা কোলাহল বেড়ে চলে। দিন নেই, রাত নেই, ধান-রোয়ার কাজ চলছে। বিদেশ থেকে কিষাণ এসেছে কত। যাদের জমি খুব বেশি, তারা একা কুলিয়ে উঠতে পারে না। বিদেশী মুনীশদের বলা হয় কিষাণ। কোন সজ্ঞাপন্ন চাষীর বাড়িতেই তারা অবস্থান করে। খাওয়া দাওয়াও সেইখানে। ভূমিহীন চাষীরা কিষাণেরা বর্ষার সময় কাজে গ্রামান্তরে বেরিয়ে পড়ে।

হারেসের জমি সামান্য। কয়েকদিনে তার আবাদ নিজেই শেষ করে ফেলে। তার পর সে-ও কিষাণদের সঙ্গে রোজগারের পছন্দ দেখে।

মাঠের আবাদ শেষ হোতে কয়েক সপ্তাহ লাগে। বৃষ্টি নামে মাঝে মাঝে। পনের দিনে সমস্ত মাঠ ঝলসে উঠে রঙে রঙে।

গত তিনদিন থেকে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। ‘নাবী’ অর্থাৎ বিলম্বিত রোয়া যাদের বাকি ছিল, তারা শেষ করতে পারে না। দহলিজে বৈঠকে কিষাণেরা গুঞ্জন করে। পাট-

শনের দড়ি কাটে কেউ । কোথাও পঁচিশে কি তাস চলে । দাবার নেশায় মাতে বুড়োর দল ।

হাবসী মেঘেরা আকাশের চারি প্রান্তরে ছাউনী ফেলে । বিদ্যুতের ঘন-ঘন চমকে জ্বলে তাদের শিবিরান্নি । বৃষ্টির আকাশ বসুধার কন্দরে কন্দরে অনুভূত হয় । তরুলতা আনন্দে কাঁপে ।

হারেস বসে থাকে ছোট ঘরে । কিবরিয়া হামাণ্ডি টানতে শিখেছে মাত্র । ওই ত হারেসের খেলার পুতুল । উঠানের চুলাশাল ভিজে গেছে । ঘরেরই এক কোণে দুটো ইঁটের উপর হাঁড়ি দিয়ে রান্না চড়ায় সোহাগ । মালেকা আজ অন্য বন্দোবস্ত করে না । সোহাগদের হাঁড়িতে চাল আর আলু দিয়ে গেল ।

আরিফ ঘরে নেই । নৌকায় গেছে সে তিনদিন । বৃষ্টির প্রকোপের সাথে সকলের উদ্বেগ বাড়ে । মালেকার পাশে রসুল বসে থাকে । হাত-পা সঁধিয়ে আসছে মালেকার বুকুর ভেতর । হারেস নদীর ঘাটের দিকে টোকা মাথায় এক বার ঘুরে এসেছিল সকালে । না, কোন নৌকা আসার সম্ভাবনা নেই আজ । বারগাঙের চড়ায় দু-টো নৌকা মারা গেছে, ঘাটে মাঝিদের কাছ থেকে সে শুনে এসেছিল । কাউকে কিছু বলে না সে । তারও মন উদ্ভিন্ন । কিবরিয়ার সঙ্গে আনুমনা খেলামাত্র, প্রাণের যোগ আসে না ।

ভর-সন্ধ্যায় ফিরে এলো আরিফ । একটা বড় ইলিশ মাছ তার সঙ্গে । সমস্ত শরীর ভেজা । আর কোন জিনিস আনার সুযোগ হয়নি আজ ।

সোহাগ ইলিশের চকচকে তনু দেখে । মালেকার মুখে পুনরায় হাসি ফোটে । আধঘন্টা পরে ইলিশ মাছের তাজা গন্ধ বাদল হাওয়ায় আরো মিষ্টি লাগে ।

বৃষ্টি ছাড়ার কোন লক্ষণ নেই । অন্ধকার মেঘের ছায়ায় আরো পুরু হয় । জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছিট আসে । সম্ভবিত বাতাসে শ্রমীদের শিখা অস্তোনুখ । একটা তালপাতার চটি ঘিরে দিল জানালার মুখে সোহাগ ।

মালেকার শরীর ইদানীং খারাপ । সংসারের অবস্থা তদ্রূপ । মুখে হাসি লেগে থাকে, তবু প্রাণ সেখানে অনুপস্থিত । বর্ষার দিনে ঘাটের কাজ । সব সময় কাদা ঘাঁটতে হয় । পায়ে হাজা ধরেছে । বেলাবেলি শুয়ে পড়ে সে । রান্নাঘরের চালের তালপাতা দু-খানা খসে গেছে । চুলোর মুখে বৃষ্টির পানি জমছে । নিজের চোখে দেখেও আজ গাফলতি ধরে তার । আরিফ কাঁথা গায়ে ঘুমিয়ে পড়েছে । বারগাঙ থেকে নৌকা তুলতে বার-জন দাঁড়িমাঝি অস্থির ছিল ।

দশ ঘন্টা অনবরত আকাশ-প্রপাত খোলা । সোহাগের ভয় লাগে পাছে ছিটে-বেড়া দেওয়াল না ভেঙে পড়ে । ছোট শিশুর বক্ষ-স্পন্দন তার মধ্যেও যেন সঞ্চারিত হয় । হারেস ঘুমিয়ে পড়েছে । ভয় আরো বাড়ে । বাঁশবনে টপটপ বৃষ্টির নিনাদ থেকে থেকে বাতাসে গোঙানির ভেতর হাত-পা দুমড়ানো কোন আততায়ীর শিকারের নিশ্ফল চেষ্টার মত শোনায । এত বৃষ্টি মিকাইল ফেরেশতার অনুচর-দল পৃথিবীর উপর ঢেলে দিল । সোহাগের ঘুম পাতলা । শিশুর গায়ে না ঠাণ্ডা লাগে তাই নিজের আঁচল তার বুকুর উপর জড়িয়ে রাখে । পীড়িত-মুঠির ভেতর কচি শিশুর হাত ।

মালেকা ভাবে ফসলের কথা । রসুলের ভবিষ্যৎ আঁকে সে । করুণ করে তোলে বৃষ্টির আওয়াজ মানুষের চিন্তাশ্রিত আবেষ্টনীকে । পূর্ববীর মুর্চ্ছনা বেহালার তার-নির্গত কান্নার

মত লুটিয়ে পড়ছে অন্ধকারের সমভূমির উপর; মানুষেরা চিন্তা যে-অন্ধকারের অবয়ব-
হীনতায় মুক্তি পায়। গায়ের কাপড় আদুল করে ফেলেছে রসুল ঘুমের ঘোরে। যথা-সম্মত
করে সব মালেকা। দম্কা বাতাস চালের কানাচে মাথা কুটে। হাজার প্রকারের লঘু
আওয়াজ মন পীড়িত করে। নিভে গেছে ঘরের কোণে রেড়ির তেলের মৃত প্রদীপ। ইঁদুর
খুট-খাট করছে মাচাঙের নিচে ছড়ানো ভাত খুঁটে খাওয়ার উদ্দেশ্যে। মুষিকের লোভে
সাপ বেরোয় বর্ষার রাত্রে। খোলা জানালা বন্ধ করে দিল মালেকা। আরিফ নাসিকা-
ধ্বনিরত। পরিশ্রান্ত চেতনা, বাহির জগতের খবর চায় না আর।

সোহাগের ঘুম ভেঙেছিল দুপুর রাত্রে। বৃষ্টি থেমে গেছে। আবার মেঘ-ছেঁড়া চাঁদ
লুটোপুটি খায় গ্রামের উপর। তালপাতার চটি জানালার মুখ থেকে সে সরিয়ে দিল।
ভ্যান্সা গরম ঘরের ভেতর।

হঠাৎ গোলমাল কানে ভেসে আসে তার। গোলমাল নয় ত, বহু মিলিত কণ্ঠের আর্তনাদ।
ডাকাত পড়ল কোথাও। এমন ঘন-ঘটা ডাকাতির অনুকূল। ভয় পায় সোহাগ। ধীরে
ধীরে সে হারেসের পিঠে ধাক্কা দিয়ে ডাকে; উঠে দেখে, বাইরে গোলমাল।
আরো বাড়ছে কোলাহল।

গুধু একা জাগল না। আরিফ, মালেকা দু-জনেই ঘর ছেড়ে বাইরে এলো। রসুল ঘুমে
অচেতন।

বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘ-ছেঁড়া ফুটফুটে জোছনা আকাশে।

আরো পাড়া-পড়শীরা জেগে উঠল।

দৌড়ে এলো আরিফ দহলিজে। বাইরে মাঠের দিকে সে চেয়ে দেখে। নৌকায়
আসার সময় বন্যারোধী বাঁধের দুর্দশা তক্ষি চোখ এড়িয়ে যায় নি। টুইটুঘুর ভাসছে বাঁধ।
মুখোমুখি পানি। স্টেচ বিভাগের কতকটা বাঁধ তদারকে বেরিয়েছিল। আশঙ্কা জাগে মনে।
হারেসকে সে খোলাখুলি বলে, বোধ হয় বাঁধ ভেঙেছে।

দু-মিনিটের ভেতর হতভম্ব হোয়ে দাঁড়ায় আরিফ। আঙ্গুল বাড়িয়ে একবার বলল সে:
ওই।

হারেস প্রশ্ন করে: কি।

জলের সরু রেখা দূরে মাঠে। ধীরে ধীরে বাড়ছে তার অবয়ব। পাঁচ মিনিটে বন্যার
জল ছুটে আসবে। দৈর্ঘ্য প্রস্থে তার স্রোত-শরীর বাড়ছে, বাড়ছে গুধু। জোছনায় দেখা
যায়, হাজার-লক্ষ বুনো ষাঁড় ছুটে আসছে। প্রতিযোগিতা-রত বলীবর্দ-দল। আগে জায়গা
পাওয়ার জন্য গুঁতোগুঁতি করছে, একে অপরের পিঠের উপর দু-পা তুলে হুঙ্কার রত। ধবল
জীবন্ত সমুদ্র ক্ষেপে উঠেছে। দ্রুত ধাবমান বন্য বলীবর্দ।

হতভম্ব আরিফ।

এমন সময় ফয়েজউদ্দিন ছুটে এলো। হাঁফ ফেলেছে সে। তার-ও মুখে কথা বেরোয়
না। বুড়ো মানুষ। হঠাৎ কান্নার সুরে সে বলে, আরিফ, আরে দাঁড়িয়ে কি দেখছ। বিশ
সালের বানের কথা মনে নেই? চলো। জিনিস পত্তর গুটোবে।

মুখ খুলে আরিফ, হারেস, চলো শিগ্গির। গিয়ে কি বা হবে। চলো চলো।

ফয়েজউদ্দীন ব্রহ্ম দৌড়াতে পারে না। কাঁপছে তার পা। একবার হোঁচট খেয়ে সে-

ও দৌড়ে চলে।

নৈশ সুপ্ত গ্রাম জেগে উঠেছে। মৌজার বাঁধ ভেঙে গেছে। ছুটে আসছে কালঘাণ। বরুণ দেবতার রাক্ষসেরা। খোয়াজ খেজের রুদ্র-সাজে বেরিয়েছেন নিজে। বসুকরা যেন কত তৃষ্ণার্ত, তাই তার এত করুণা। রসবন্ত হোক শুষ্ক ধরিত্রী। জল-কল্লোল ধ্বনি আর নৈশ মানব-মানবীর চিৎকার আর্তনাদ, অবলা গৃহপালিত জীবদের আতঙ্কিত ডাক— সব মিলে রচনা করছে খোয়াজ খেজেরের বিজয়যাত্রার আঞ্জাম। বুম-বুম শব্দ হয় দূরে দূরে। নিদ্রিত পল্লীর উপর তাতার দস্যুর তেগ্গ বেদেরেগ্গ নিমর্মাতায় খান-খান হয়ে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে মনুষ্য-দেহের সঙ্গে; গোঙানী উঠছে আবার পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে, শুধু উত্তপ্ত রক্তের তরঙ্গ ‘স্টেপির’ শ্যাম-তৃণ বর্ণলালিত্যে ভরে রাখে। এখানে রক্তের ফোঁটা নেই— ফিকে হয়ে গেছে তা জলতরঙ্গের আবরণে। তাতার-দস্যুর দ্রাগত অশক্ষুর-ধ্বনি শোনা যায়। বুম-বুম-স্-স্-স্।

শোকাক্ত জননীর মত মালেকা কাঁদে। গৃহস্থালীর মত টুকি-টাকি জিনিস-পত্র। নিরাপদ ভাঁড়ার-ঘর কোথায়? চালের হাঁড়ি, কাপড় ক-খানা একটা বাস্প উঠানের উপর ফেলল সে। সোহাগ নীরবে কাঁদে। বুকে তার কিবরিয়া ঘুমায়ে। মালেকাকে সাহায্য করার কোন উপায় নেই তার। ঘুম-ক্লান্ত চোখে রসুল খালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

শাবল আনল আরিফ। হারেসের সহায়তায় সে উঠানের একপাশে চালের পাশাপাশি গর্ত খোঁড়ে। বাঁশ ছিল বেড়ার কাছে। চারটে বাঁশের উপর ধান-ঝাড়া টাট্টি তুলে দিল হারেস। অসুরের মত তার শরীরের বিক্রম আজুড়ে।

তারপরই আরিফ দৌড়ে গেল দহলিজের। একটু দূরে জাম-তলা। বন্যার পানি জামতলার সীমারেখা ছাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। তিন মিনিট লাগবে না তাদের ভিটেয় পৌঁছতে। ফিরে এলো সে উঠানে। হারেস মই হেলিয়ে দিয়েছে মাচাঙের সঙ্গে। সোহাগ-মালেকা ধীরে ধীরে উঠছে উপরে। ধম্ ধম্ শব্দ হলো হঠাৎ। আরিফের ফুরসুৎ নেই। দহলিজের উঠানে তখন হাঁটু পানি। দহলিজ হুমড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। চন্চন পানি বাড়ছে। আর দেৱী করা উচিত নয়। গৃহস্থালীর আরো কিছু জিনিস যদি রক্ষা পায়।

চংচং শব্দ হয় পানির উপর। ফয়েজউদ্দীন আবার ছুটে এলো পানি ভেঙে।

— একি চাচা, শিগ্গির চলো। বুড়ো মানুষ। এখনি ডুবে যাবে।

হাউমাউ করে উঠে ফয়েজ। তার বক্তব্য, ময়েজ মাঠের কুঁড়েয় থাকে, গাইগোরুর ব্যবসা তার। আজ দু-দিন ফেরেনি।

— সে নিশ্চয় গাঁয়ের অন্যদিকে উঠেছে। তুমি চলো। শিগ্গির।

পানি হাঁটুর উপর আরিফের।

নড়তে চায় না ফয়েজউদ্দীন। কল্পনাশক্তি হঠাৎ তীব্রতম হয়ে উঠে তার। বৃদ্ধের বালা দৃষ্টির উপর ঝলক খেলে : দূরে পানির রেখা। ধড়মড়িয়ে জেগেছে ময়েজ। কাণ্ডে দিয়ে সে কচকচ কাটল গরুর গলার দড়ি। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে অবলা জানোয়ারের দল। পেছনে হাঁপ-শ্রুত জয়ীফ কদম ফেলেছে ময়েজউদ্দীন।...আর মাত্র বিশ গজ দূরে উত্তাল জল-রেখা, ক্রমশঃ উত্তালতর। ছুটেছে ময়েজউদ্দীন...মুখ থুবড়ে পড়ল একবার...আবার ছুটেছে...আবার...পিছনে ধাবমান পানির অউরব... আবার ঝলক এলে হাবুডুবু খাচ্ছে

ময়েজ...সামনে একটা গরুও নেই, লেজ ধরে কিশোর বয়সের মত সে সাঁতার কাটবে। গর্জমান জলস্রোত পৃথিবীর আলো-বাতাস কেড়ে নিল... কোন মানুষের ছায়া নেই দূরন্ত পানির উপর...একটু দূরে ভেসে ওঠল যেন ময়েজউদ্দিনি।...

আরিফ হিচড়ে টানে ফয়েজউদ্দীনকে। দুই জনে বাড়ীর দিকে এগিয়ে এলো। জোৎস্নায় বসুন্ধরা লুটোপুটি খায়। তবু অন্ধকার রাত্রি নয়। খোদার কাছে আরিফ শোকরিয়া জ্ঞাপন করে। ছেলেপুলে নিয়ে আরো খারাবীর অন্ত থাকতো না।

উঠানে হালের বলদ তিনটে বেঁধে আরিফ বলে, যা ব্যাটারা বাঁচিস ত ভালই। কার সঙ্গে আর ঝগড়া করব তা নিয়ে।

দুই চালের মাঝখানে ছাগল ক'টা তুলে নিল সে। থৈ থৈ করে পানি।

আধঘন্টার ভেতর প্রলয় চারিদিকে। ছিটে বেড়ার ঘর প্রথম ঝলকেই পড়ে গেল। ভাঙা চালের উপর ছাগল চীৎকার করে। উঠানে বলদেরা কেবল মুখ তুলে নিঃশ্বাস ফেলছে। মাচাঙের উপরে সোহাগ-মালেকা আর রসুল-কিবরিয়া। মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আরিফ ও হারেস।

বাইরে চীৎকার আর কোলাহল। মাঠ দেখা যায় উপর থেকে। আরো কী পানি বাড়বে, আতঙ্কিত হয় হারেস। গরু-বাছুর কিছুই স্থিতি থাকবে না। মাঠের বীজাঙ্কুর পচবে তিন চারদিন। আরিফ বোবা। কোন কথা নেই মুখে। মৃদু স্বরে কাঁদে মালেকা। রসুলের কৌতূহলের অন্ত নেই। সে এখনও জোঁগে আছে।

আরিফ হাঁকে, ফয়েজ চাচা।

বৃদ্ধ হেঁকে, উত্তর দিল, তারা চুল্লির কোনায় বসে আছে।

এই তুফানে ডাকাতির খুব সুবিধা। কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। জোৎস্নায় কয়েকটা নৌকা দেখা গেল মাঠে ডাকাতেরা সুযোগ পেয়েছে কী?

একটু পরে মাঠের ভেতর আবার হাঁকাহাঁকি শোনা যায়। হারেস-আরিফ চেয়ে দেখে, একটা ভাসমান চালের উপর কয়েকজন লোক বসে আছে। বাবা গো-মা-গো-চীৎকার তাদেরই। গাছপালার আড়াল হোয়ে গেলতারা পলকে। আতঁনাদ বাতাসেও পাখা মেলে। কান্না গুরু করেছে ময়েজ চাচার স্ত্রী।

ভস্মীভূত প্রাসাদের দিকে সম্রাট চেয়ে আছে। উন্মুক্ত-দৃষ্টি হারেসও চেয়ে আছে। সোহাগ বিশ্রাম-রত। কিবরিয়া হারেসের কোলে।

চালের একটা বাখারী ভেঙে আরিফ মাচাঙের উপর রাখল। — রসুলের মা, এটা ভাল করে রাখো। সাপের জুলুম বড় জুলুম। মাঠ থেকে সব ভিটের গাছপালায় চালে উঠবে। ঘুমিয়ো না কেউ। ছেলেরা ঘুমোক।

নৌকা বাওয়ার পারিশ্রান্তি ঘিরে আসে। আরিফের মাথা ঘোরে। একটু ঘুম-তারও উপায় নেই। মইয়ের উপর জোরে ভর দেওয়া চলে না। বহু দিনের পচা বাঁশ ভাঙতে কতক্ষণ। হারেস মাচাঙের উপর। শিশু-কোলে মইয়ে ভার দিয়ে কতক্ষণ দাঁড়ানো চলে। পর্দানশীন মেয়েরা অস্বোয়াস্তি অনুভব করে। পরিবেশের তাগিদে সব সহ্য করতে হয়।

ছাগলগুলো বলক্ষণ চীৎকারের পর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

শেষ রাতে বৃষ্টি এলো একবার জোরে। সোহাগ এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল। সেও এবার ডুক্রে কাঁদে, মালেকার কান্নার-শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে। তালপাতার টোকা মাথায় দিতে সে নারাজ। আরিফের ধমকে সকলে ঠাণ্ডা। কিবরিয়া মার বুকে মাংস পিণ্ডের মত জড়িয়ে রয়েছে। মাই খায় সে চুকচুক শব্দে। কয়েক মিনিটে বৃষ্টি ছেড়ে গেল। তবু রক্ষা। শীতে ঠকঠক কাঁপে আরিফ। সব নীরবে সহ্য করে সে। এত জ্বলুম শরীরে কি সহ্যবে? আত্মবিশ্বাসে ঘা লাগে তার।

উঠানের খুঁটির দিকে লক্ষ্য রাখছিল হারেস, বন্যার পানি বাড়ছে কি না। ভোর রাতে থমকে দাঁড়িয়েছে বন্যা। আরো যদি বাড়ত, হারেসের আতঙ্ক মনে আর কোন নালিশের হায়া পড়ে না।

ময়েজউদ্দীনের স্ত্রীর কান্না থামে না এখন-ও।

খোয়াজ খেজের, তোমার বন্যা কী পানির চুমক, এত চোখের পানি টেনে আনে?

সকালে চড়া রোদ উঠল আকাশ ছিঁড়ে। আরিফ ভিজ়ে কাপড়ে উঠানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঁতার কেটে সে দেখে আসুক অন্যান্য দিকের দুর্দশা। রান্নাঘরের চাল উপুড় হয়ে রয়েছে। পান্তা ভাতের হাঁড়ি ভাসছে। একটা স্ট্রোটা বাঁশে থ' দিয়ে আরিফ দেখে, সামান্য দু-একটা খড়-কুটো পড়েছে মাত্র ভাতের উপর। এত দুঃখেও হাসি আসে।

হাঁড়িটা ভাসিয়ে নিয়ে এলো সে, মইয়ের কাছে।

— হারেস, ভাত ঠিক আছে, সকালটা সকলের চলবে। নেমে এসো।

হারেস মাচাঙ থেকে ধীরে ধীরে নামে। সে বলে, আর পানিতে থেকো না। উঠে এসো। ক'দিন থেকে যা গেলো তোমার উপর দিয়ে।

মইয়ের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে কাপড় নিঙড়ায় আরিফ। একটা আধ-গুক্না গামছা পরল সে।

সরার উপর ভাত ঢেলে দুইজনে মুখে তোলে। সোহাগ কিছু খায় না। সঁাতসেঁতে কাপড় পরে এই সংকীর্ণ জায়গায় বসে-থাকা তার সহ্যের বাইরে। প্রায় মুচ্ছা-গ্রস্ত সারা শরীর। মালেকা শীতের রাত্রে কুকুরের মত হাত-পা বুকে ঢুকিয়ে শুয়ে আছে। সে-ও কিছু মুখে তোলে না।

রসূল অবাক হয়ে চারদিকে দেখে। তার চাঞ্চল্য বাপের ধমকে শান্ত। পানিতে পড়লে আর কি পাওয়া যাবে তাকে। আরিফের কথাগুলো তার কানে ভয়ের দাগ ফেলে।

কিবরিয়া-কে নিয়ে আরো মুশকিল। তার দুধের প্রয়োজন। চাল থেকে ছাগলটা নামানো কষ্টকর। তবে বন্যার পানি ক্রমশঃ কমছে। তিন চার ঘন্টা পরে উঠান শুকিয়ে যাবে; তখন একটা ব্যবস্থা হবে। আপাততঃ সে মাই-দুধ খেয়ে থাক।

এত বেলা হোলো, ময়েজ উদ্দীনের কোন পান্তা নেই। সমগ্র পরিবার এবার মাতাম গুরু করেছে। মেয়েদের মত উচ্চকণ্ঠে কাঁদে ফয়েজউদ্দিন।

আরিফ আবার ভিজ়ে কাপড় পরে বলে, আমি ওদের বাড়ি যাই। এই তুফানে কী

আর বেঁচে আছে বুড়ো মানুষ। যাওয়ার দরকার।

এক বুক পানি ভেঙে আরিফ চলে গেলো। ঘন্টা-খানেক পরে সে ফিরে আসে। বেল।
প্রায় দুপুর।

হাঁড়ি থেকে চাল ঢালে সে গামছায়।

হারেস জিজ্ঞাস করে, কী হবে।

— খাবে না, আজ?

— রান্না করবে কোথায়?

হাসে আরিফ, রান্না। রান্না খেতে চাও ওই মুখে।

তারপর সে পানিতে ডুবায় সমস্ত গামছাভরা চাল। মিনিট পনের পরে সে একটা চাল
টিপে দেখল। বেশ নরম হয়েছে এবার।

— এসো, ওদের দাও। রাত্রেও এই খেতে হবে। পানি ভিটে থেকে নামতে কাল-
সকাল।

এমন সময় সোহাগ মালেকা দুইজনে বিনিয়ে-বিনিয়ে কান্না শুরু করে। ধীর কণ্ঠেই
সে বলে, কেঁদে কোন ফল আছে? আপাততঃ দুটো চাল-ভিজে খেয়ে থাকো।

চোখের পানিতেই দ্বিপ্রহরে ভোজন আরম্ভ হয়। আরিফ আবার চাল ঢালে গামছায়।

হারেস প্রশ্ন করে, আবার কেন?

— চাচাদের ওখানে যাই। ওদের ত আজ রান্না চাপবে না।

অন্য প্রশ্ন তোলে হারেস : একটা লোক নৌকায় নিয়ে এলো না এ-দিকে খোঁজ নিতে।

— কে কার খোঁজ করে? সেবারকার যুক্তি হয়ত সরকারের লোক আসবে চাল ডাল
নিয়ে বানের পনের দিন পর। তুমিও চলো হাটু পানি মোটে নিচে। ওরা হাত-মুখ ধো'ক।
দুইজন ফয়েজউদ্দীনের বাড়ির দিকে চলে। ভিটের সংলগ্ন সড়ক রাস্তা। নিচে উদ্বাস্ত।
হারেস বলে, একটু থামো।

উদ্বাস্তর উপর একটা অশথ-গাছ জেগে আছে। গোড়ার দিকে পানি মাত্র। হারেস
সাঁতার কেটে গাছে চড়ে।

— কি হলো তোমার। আরিফ হাঁকে।

হারেস ডালপালা ভাঙছে তখন।

— গরুগুলো না খেয়ে মরবে খেয়াল আছে?

আরিফ অনুতপ্ত। ছুঁড়ে দিতে লাগল ডালপালা হারেস। নেমে এলো সে একটু পরে।
আবার ছোট্ট সাঁতারের প্রয়োজন।

ছাগলের দুটো ডাল চালে পৌছে দিল আরিফ। হেলে গরুর সম্মুখে হারেস। নিজের
হাতে ডাল ধরে থাকে সে। ক্ষুধার্ত জীব পরম-নিশ্চিন্তে বান-ডোবা গাছের পাতা চিবোয়।

আরিফ ও হারেস দু-জনের সোয়াস্তি থাকে না। ফয়েজউদ্দীনের দাওয়া উঁচু। অনেক
আগেই পানি সরে গেছে। তার উপর কাদা গায়ে হাউড়ীর মত বসে আছে ফয়েজউদ্দীনের
স্ত্রী। বাড়ির কেউ কিছু স্পর্শ করতে চায় না। দু'জনের পীড়াপীড়িতে শেষে সকলে এক
গাল চাল মুখে তোলে মাত্র।

আরিফ সান্ত্বনার কথা বলে, এখনও পানি সরে নি। কমুক পানি। গায়ে কোথাও না

কোথাও আছে, চাচা।

কিন্তু আরিফ জানে সেও মরীচিকার জাল বুনছে। তার চোখ শুষ্ক থাকে না।

যেন বিশ্রাম তাদের জন্য হারাম আজ। রসুলের কচি গলার হাঁক আবার শোনা গেল।
আশঙ্কিত দুই জনে বিধবার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে।

প্রায় অবেলা। আরিফ ভাবে, এই কাল-রাত্রি কী কাটবে, খোদা?

বন্যার পানি সরে গেল কয়েক দিনে। আবার নূতন করে সাংসারিকতায়, নূতন নীড়-
রচনায় ব্যস্ত আরিফ ও হারেস। মালেকা এবং সোহাগের গহনা পোদ্দারের দোকানে
মাটির দরে বাঁধা পড়ল। সারা মৌজার অলঙ্কার পিতল-কাঁসার তৈজস বেনের দোকানে
বন্দী। বন্যার পানি ফুরায়, চোখের পানি আর ফুরায় না। আরিফের জরীফ হালের গরু
মড়কের ঝড়ে ভাগাড়ে পৌঁছল। ঝঞ্ঝা-বিস্কুদ্ধ বিচিত্র জগতের সম্মুখে হারেস। সহজে
দম্ভার পাত্র সে নয়। এখনও মহানগর আছে, বন্যা যেখানে পৌঁছুতে পারে না।

আবার কলাবিবির বস্তী।

এখানেও যেন ঝড় বয়ে গেছে কয়েক মাসে। হারেস প্রথমেই অবাধ হলো নূতন বাসায়
উঠে গেছে বাসেদ মিস্ত্রী। হাঁপানী রোগে মেহেরালি ইন্তেকাল করেছেন। নাসিম এক সিঁদকাটা
মামলায় ফেরার আসামী। নূতন ভাড়াটিয়া এসেছে। তাদের দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছে মেহেরালির
স্ত্রী। একই ঘরে থাকে শান্তা আর পুত্রবধূ। দুই জনের মধ্যে সন্ধির অপূর্ব হৃদয়তা দেখে
হারেস। নাসিমের বৌ ফুঁপিয়ে কাঁদে হারেসের সম্মুখে। মেহেরালির স্ত্রী বড় নরম গলায়
সান্ত্বনা দিতে থাকে। মাথা-গোঁজার ঠাই আছে, কারো তোয়াক্কা করে না সে। নূতন বাসার
ঠিকানা দিল মেহেরালির স্ত্রী নিজে। বিস্মিত হওয়ারই কথা। নূতন বাসার ঘর অনেকটা
প্রশস্ত। দক্ষিণদিক খোলা। লোহার গরাদ রয়েছে জানালায়। অবশ্য পাল্লা নেই। তক্তপোষ
ফেলা পাশেই। এখানেই মিস্ত্রী ঘুমোয়। তার পাশে নীচে দরমা বিছিয়ে অন্যান্য মিস্ত্রীরা
দিনরাত গুজরান করে। অনেক টাকা করেছে মিস্ত্রী দস্তুরী খেয়ে। হারেস বোঝে, মিস্ত্রীও
সরে যাচ্ছে। উপরে উঠছে সে টাকার বেলুনে চেপে। অমোঘের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জেগেছিল
একদিন, আজ হারেসের কোন কিছু মেনে নিতে বাধে না।

বাসার আর একজন গর-হাজির। আলি। মিস্ত্রী নাকি স্বভাব চরিত্রের জন্য একদিন
জুতো-পেটা করেছিলো তা-কে বাসায়। এতদূর গড়িয়ে যেত না ব্যাপারটা। মিস্ত্রীর মুখের
উপর জসনী কামিনের খোঁটা দিয়েছিল আলি। তারপর হাতাহাতি। সেই রাত্রেই আলি
বাসা ছেড়ে চলে যায়। মিস্ত্রীর দশটা টাকা, এক সেট যন্ত্রপাতি সব তার সঙ্গে উধাও।
মুষড়ে যায় হারেস। এই সংবাদে। মায়া হয় আলির জন্য। মনের কথা বোঝে এমন
ক'জন পাওয়া যায় শহরে? নতুন মুখ বাসায়। কারো সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হয়নি পর্যন্ত।
তার চেয়ে আরো চ্যাংড়া ছোকরার দল। উত্তর দিকে কোন জানালা নেই। এক কোণে
ইটের চুলো। কাঠের আগুন গনগন জ্বলছে।

মিস্ত্রী তক্তপোষে বসে খবরের কাগজ পড়ে, হুঁকা টানে। তক্তপোষের এক কোণে
ম্রিয়মান একটা লোক বসেছিল। মাথা নেড়া, গায়ে মোটা চাদর লেপটানো। একটু পরে

চেনে হারেস। শুকুর ঘরামি। এমন বদহাল। বাসায় থাকে সে? বাসায় নতুন অধিবাসীরা চুপিচাপি বলে, ভিক্ষে করতে এসেছে মিস্ত্রীর কাছে। এই শরীরে কি কাজ করবে, জওয়াব দিয়েছে মিস্ত্রী। মাঝে মাঝে দু-চার পয়সা ভিক্ষে নিতে আসে। অথৈ-পানিতে হারেস। মিস্ত্রীর সর্দারীতে পনের বিশ জন ষাটে, একজন অকর্মণ্য লোককে তার সামিলে চালিয়ে নিতে পারে না মিস্ত্রী? বহুৎ দস্তরী মেরেছে ওর উপর দিয়ে। কোন বাক্যালাপের আগেই শুকুর অন্ধকারে মিশে গেছে। মিস্ত্রী হেঁট হয়ে কাগজে তন্ময়। ভালমন্দ জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেল না, তার জন্য অস্বাভাবিক লাগে হারেসের। মেহেরালিও নেই। হাঁফ-ফেলার সংকীর্ণ জগতটুকু রুদ্ধ হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

নৈশ-ঘুমের পর অবসাদ কেটে যায় হারেসের। দুমড়ানো পেশী ধমনীর ভেতর নতুন সূর্যের উত্তাপ জাগে। ঠোঙার কাগজের জন্য খুব সকালেই সে বিক্রীওয়ালার বাড়ি গিয়েছিল। অবসর রোজগারে ফলবস্ত করবে সে। দায়িত্ব সহিষ্ণুতার ভেতর প্রায় প্রাচুর্যের আশ্বাদ ঢালে।

কয়েকদিন পরে বাসেদ মিস্ত্রী কাছে আলির খোঁজে এলো তার বাবা কাসেম। পাশাপাশি গাঁয়ের লোক। পান তামাকে অতিথি-সংকার করে মিস্ত্রী। আজ কত মাস আলি লাপান্তা। ঘরে একটা পয়সা পর্যন্ত দেয়নি। বৃদ্ধ আলির কামাই চায় না, শারীরিক কুশলটুকু শুধু কাম্য তার। মিস্ত্রীর মুখে কিছুই আটক থাকে না। বৃদ্ধ হেঁট মাথায় শোনে। তবু আশ্বাস দিল মিস্ত্রী, দু-একদিন থাকো এখানে খোঁজ করে দেখা যাক। হারেস জানে, মিথ্যা আশ্বাস।

সেদিন সন্ধ্যায় ঠোঙাকাটা বন্ধ রেখে সে নির্জৈই অন্ধকারে অলিগলি পার হয়। বহুদিন আগে আলির সংগে এই জাহান্নামের পথে সে পা বাড়িয়েছিল। বৃদ্ধের করুণ অবয়বের তাগিদ হারেসের ব্যগ্রতার পেছনে কাজ করে।

তেমনি অন্ধকার গলি। গ্যাসের ফিকে আলো সভয়ে দূরে পিছলে পড়ে। খোলার চালের ছায়ায় এক-প্রহরের সাকীরা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তাদের পান-পাত্র নেই শুধু। বিড়ির বিরল আগুন মাঝে মাঝে ধিমিয়ে উঠে।

পথ ভুল হয়নি হারেসের। দুই চালের ছাঁচের নীচে আঁধাগুলি, তারপর ছোট কলতলার প্রাঙ্গণে। কোণে আলির আস্তানা।

অপ্রত্যাশিত আলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঘরের এক কোণে প্রদীপ জ্বলছিল। ম্লান-আভায়ে চারপাশ স্পষ্ট নয়।

— তুমি। বিস্মিত-চোখে আলির সম্বোধন।

— বেশ। বাসা ছাড়লে আর দেখা করলে না।

— তোমার দেশের গেরো এতদিনে কেটেছে বুঝি। চপল কণ্ঠ আলির।

— এই আস্তানা এখনও ছাড়োনি?

— এখানেই তা থাকি আজকাল। নির্লজ্জের মত আলি বলে।

সম্মতির প্রতীক্ষা না করেই ভাঙা তক্তাপোষের উপর বসল হারেস।

— এখানে থাক, ক্ষতি নেই। দেশে মা-বাপ আছে একটু খবর দিতে পারো।

তোমার বাপ এসেছে।

আলির মুখে যেন কালি লেপে দেয় কেউ।

— আছে কোথায়?

— মিস্ত্রীর বাসায়।

করিমন বাইরে ছিল। সেও এক পাশে এসে দাঁড়ায়। তার পূর্বের চেহারা ক্ষয়ে গেছে। ফ্যাকাশে রুগ্ন শরীরের দিকে একবার মাত্র সলজ্জ দৃষ্টি ফেলে হারেস।

— আর কোথাও বাসা পাওয়া গেল না? প্রশ্ন করে হারেস।

বাসা পেলেই ত যাওয়া চলে না। ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে হারামজাদী মেনী বেড়ালের মতো। কাঁটা গিলে বসে আছে। এখন ফেলে কোথা যাওয়া যায় বলো না? আর এক পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই ওর। মরবে কী শেষে। যাক ক'টা দিন।

জবাবের তোড়ে একলা ভাসে আলি : ফেলে যাই কোথা। মরবে কী। গায়ে মানুষের চামড়াটা এখনও আছে, হারেস।

অবনত-দৃষ্টি হারেসের। কোন জবাব নেই তার মুখে। করিমনের দিকে সে তাকাবার কোন চেষ্টা করে না। স্বীকৃতদরা এক শীর্ণদেহী নারী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাত্র।

— এখন কাজ হচ্ছে কোথায়। হারেস জিজ্ঞেস করে।

দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল আলি; আনুমানা জবাব দিল : চটকলে।

— রোজগার-পাতি কেমন?

— চলে যায় কোন-রকমে।

হাই তোলে আলি।

— তোমার বাপ এসেছে কাল। আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করে হারেস।

— এসেছে, আমার ঠিকানা বলো না। গোটা তিনেক টাকা দিচ্ছি; দেশে পাঠিয়ে দিও। আমার নাম করো না, খবরদার।

বাইরে কতগুলি নারী-কণ্ঠের ইতর গালি-গালাজ শোনা যায়। একটু পরে একটা পুরুষের হুঙ্কার শোনা গেল।

— শালার টিকতে দেবেনা দেখছি।

উঠে পড়ল আলি। দ্রুত বাইরে এলো সে। কৌতূহল মেটাতে হারেস-ও তার অনুসরণ করে।

তখনও ইতর ঝগড়া চলছে। করিমনের সামনে দুজন যুবতী মেয়ে। মেয়ে ত নয়, বাঘিনী। খনখনে গলায় হাঁকে, মরবি; শোধ-পোত রোগ হোক। আমার মানুষ ভাঙিয়ে নিলে বাপ-ভাতারী। ফের কথা বলবি ত পেটে লাথি মারব।

বাঘিনী পা তোলে সহকারে।

— তোর মত ভাইয়ের সামনে—

বাঘিনীদের পশ্চাতে রোগা তালপাতার সিপাইয়ের মনুষ্য-সংকর এক ব্যক্তি। তারও দরাজ গলা। এক পা নেই। কাঠের সাপোর্টার বগলে সে হাঁকছে, জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

আলি মাঝখানে পড়ে চীৎকার করে : এই হারামজাদীরা যে-যার ঘরে যা বলছি, না হোলে খারাবীর শেষ থাকবে না। মুণ্ডর দিয়ে ধুমসোবো।

বুড়ুদের মত মিলিয়ে গেল সব। পাশের কুঠরীতে ঢুকে পড়ল মেয়ে দুটি। তালপাতার

সিপাই কেসারর মত দাওয়ার দিকে লাফিয়ে আড়াল হয়ে গেল।

— ওই শরীর নিয়ে হারামজাদীদের সঙ্গে ফের ঝগড়া করতে এসেছিস। যা ঘরে—।

হারেসের উদ্দেশ্যে আলি বলে, থাক কটা দিন। তারপর মরুক আর বাঁচুক। এই কটা দিন হাঙ্গামা পোয়াতেই হবে। দেখছ ত কাণ্ড-কারখানা।

হারেসের সারা গায়ে যেন কয়েক শ' কেঁচো চরছে, এক মিনিট আর এখানে নয়। আলি তার হাত ধরে টানে : চলো, বাইরে যাই।

পুরাতন পার্কের রং বদলেছে, তবু চেনে হারেস। পুরাতন দিনের সেই পার্ক।

আলি পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করল।

— বাপকে দিও। খবরদার আমার কথা কিছু বলো না।

রহস্যময় আলি। কৌতূহলের নেশা যোগায় পদে পদে। হারেস জিজ্ঞেস করে, এই ঝগড়া মেটাতেই আছ তুমি?

— কি করি ভাই, এমন পাড়ায় থাকলে এসব গা-সওয়া হয়ে যায়।

— আজ কি নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল?

বড় কৌতূহলী হারেস।

— সে তোমার শুনে কাজ নেই।

— ঐ খোঁড়া লোকটা কে?

— ঐ শালা ত ঝগড়ার মূল। ঐ দুটো মেয়ের সঙ্গে ভাই। আগে কোন কারখানায় কাজ করত। মেসিনে পাটা সাফ হয়ে যায়। কোম্পানী ক্ষতিপূরণ সামান্য দিয়েছিল। তা উকীল-পেশকার আর মুহুরীতে খেলে। শত্রু বেকার। কী আর করে। দেশ থেকে ঐ দুটো বোন নিয়ে এলো। ওদের রোজগারেই ত চলে। নিজেও স্বপ্নের ধরে আনে।

— তৌবা। দুই কানে আঙ্গুল ছিল হারেস।

— এত লজ্জা কিসের, হারেস। আজকাল ওর ছোট একটা ভাই মাসে-মাসে এসে টাকা নিয়ে যায়। গায়ে তার সংসার চলে।

— তৌবাআস্তাগফের...

— আর একদিন এসো। হারামজাদীরা ফের ঝগড়া লাগাবে কী, ভাই।

উঠে পড়ল আলি।

— আর একবার এসো হারেস। আমি কী এখানে থাকব নাকি। দিন-মাস হারামজাদীর। এই কটা দিন যাক। তারপর মরুক আর বাঁচুক—।

১৯৩১ সাল। বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশঃ ব্যাপক বিস্তার লাভ করছে সারা দেশে। পঞ্জিকার পাতা উল্টে উল্টে চলে মাস। মাস বৎসরে কৃষ্ণগত। বহমান দিন-স্রোত রিক্ত স্থৈর্যের উপলব্ধি করে আনে। নিরাশা আবার উজ্জ্বল দিনের হাতছানি...চাকার মত একই গতি পথে বারবার প্রত্যাগমন। নিষ্ঠুর দৈনন্দিনতার পদক্ষেপ জগদ্বল: কোথাও ক্ষণ-শৈথিল্যে ভবিষ্যতের মরীচিকা রচনা করে।...

ধুমায়িত তন্দুরের চতুরের উপর জীবনের সড়ক মেলা।

হঠাৎ একদিন হারেস অনুভব করে রাজপথে বাতাস ফিরে গেছে। শোভাযাত্রা চলছে,

নর-মিছিল এগিয়ে যায়। রক্তপাগড়ীর মুখোস নরমুণ্ডের উপর ভাসে। পরাধীন দেশের শৃঙ্খল-উন্মোচনের আঞ্জাম চলছে।

পথে পার্কে বক্তৃতা শোনে সে। দেশজাগরণের বাণী। সেই দেশকে সে চেনে না। উন্মাদনায় প্রাণ জেগে ওঠে না, একদিন পুরাতন আশ্রয়-ত্যাগে যেমন উন্মাদনার আহ্বান পেয়েছিল সে। আরিফ তার কাছে উন্মাদ। জমির জন্য তার সংগ্রামের পদ্ধতি সে নিজেই দেখেছে, তার নিজেরও জমি দরকার, তবু নিষ্প্রাণতার ব্যঙ্গ চতুর্দিকে। বিংশ শতাব্দীর এই মহানগর ছেড়ে আরাধ্য আর কোথাও খোঁজে কেন মানুষ? হারেসের কাছে মানচিত্রে শুধু দেশ আঁকা থাকে।

শহরে সামগড়ে...সকলে হারেস নয়। তারা রুখে দাঁড়ায়, সঙ্গীনের সম্মুখে বুক পাতে। রক্তাক্ত পাঁজর চেপে পতাকা-ধারী বজ্রমুষ্টি খোলে না। গ্রামে প্রান্তরে পিচঢালা রাজপথে তাদের শৌর্যের কাহিনী মুখে মুখে ছড়ায়, দাবাগির মত কাসেদবাহী জ্বালাময়ী স্রোত আগুন লাগায়— ভারতের দহন-উনুখ প্রাণেশ্বরের স্তূপে...

বাসেদ মিস্ত্রী খবরের কাগজ পড়ে। কারো কোন কৌতূহল ছিল না এতদিন সংবাদপত্রে। এখন বাসার সকলেই উনুখ হয়ে শোনে। অনেকে নিরঙ্করতার জন্য অনুতাপ করে আর কান খোলা রাখে।

বোমা বিদারণের ঘটনা, পুলিশ-স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকের সংঘর্ষ... লোমহর্ষণ ঘটনার অন্ত থাকে না। তারি সঙ্গে একদিন ভেসে এলো সামগড় অন্যান্য মৌজার উপর জুলুমের কাহিনী। বন্য স্থাপদেরা রক্তের আশ্বাদ পেয়েছে মৌজায় মৌজায়...

সামগড়...

হারেসের মানসিক চাঞ্চল্য থামে না। সেদিন বিকালেই সে স্টেশনে পৌঁছায়। রাত্রি হবে বাড়ি পৌঁছতে, তবু পেছ-পা ছাড় না হারেস। সময়-মত স্টেশনে থামল না ট্রেন। তখন সন্ধ্যা উত্থরে গেছে।

আর কোন সঙ্গী ছিল না। একা একাই হেঁটে এলো হারেস। সারা-পথ। দু-পাশের গাঁ নির্জন। কচিৎ কোথাও আলো জ্বলছে। যেউ যেউ কুকুর ডাকে নৈশ গ্রামকে আছন্ন করে। কোন ভিটের দিকে তাকায়নি হারেস। সামগড়ের সীমানায় ঢুকে তার বুক দুরুদুরু করে। অজানা আশঙ্কা ছেয়ে আসে। নিয়তির কোন দন্ডদেশের যেন সে প্রতীক্ষা করছে।

দহলিজ অন্ধকার। এত-রাত্রে আলো জ্বলার কোন কথা নেই এখানে। ভিটের উপরেই ভয়াবহ নির্জনতা। পিদিমের এতটুকু আলো বাইরে সরে না। হাতে পুটলী, হারেস উঠানে দাঁড়াল। কয়েকবার নাম ধরে ডাকল, রসুল-রসুল। কোন সাড়া শব্দ নেই।

পুটলি নামিয়ে সে দেশলাই জ্বালে। দুই ঘরের টাটি খোলা। বহু তৈজস-পত্র মাটির হাঁড়ি উঠানে চুরমার ছড়ানো। একটাও প্রাণী নেই।

কোথায় গেল তারা? রসুল, আরিফ, সোহাগ। হারেসের মাথা দিয়ে আগুন ছোট্টে। ধোঁয়ার রাশ চোখের সামনে। তবু ভারসাম্য হারায় না সে সহজে। ফয়েজ চাচাদের বাড়ি হারেস ঘুরে এলো। তেমনি নিঃস্তুক। তেমনি অন্ধকার।

সম্পদ হারানো আশঙ্কায় কেঁপে-কেঁপে ওঠে হারেসের মন। দাম্পত্য-জীবনের শত খন্ডচিত্র দ্রুতগতি ভিড় জমায় চোখের সম্মুখে। আরিফের উপর বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে

যায়। খাল কেটে কুমীর আনার কী প্রয়োজন? রাজরোষের কাছে তাদের মত সামান্য গেরস্থ চাষীর কতটুকু ক্ষমতা। এই তার প্রায়শ্চিত্ত। ইতঃক্ষিণ্ড তৈজসের দিকে চেয়ে হারেস চোঁট দংশন করে শুধু।

কোথায় গেল তারা। ভাঁটির দিকে নদীপথে বারো মাইল আরিফের শ্বশুর বাড়ি। বৈমাত্র শালা আছে মাত্র। তার গন্তব্য কি এই ভাঁটির দিকে। পুটলীর ভেতর খাবার ছিল সামান্য ছেলেদের। কারো জন্য আর প্রতীক্ষা করে না হারেস। ক্ষুধা-পিপাশা-ক্লান্ত সে, বসে বসে নৈশভোজন সম্পন্ন করে।

ডোবায় এক আঁজলা পানি খেয়ে সদরে বসল খানিকক্ষণ হারেস। না, যত দূরই হোক, আরিফের আত্মীয় বাড়ি খোঁজ ছাড়া কোনো উপায় নেই।

হাঁটতে শিখেছে কিব্রিয়া। কচিহাতের স্পর্শ যেন লেগে রয়েছে তার হাতে। হোক অন্ধকার। এই পথেই সে হাঁটবে। দুঃখের মৌতাতও নেশা বৈকি। নিশিগ্রস্ত হারেস দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটে।

ভাঁটিপথে নদীর বাঁক এইখানে কয়েক মাইল চওড়া। কোলে কোলে অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রাম। সড়কের পথে হারেস আর হাঁটে না। লোকালয়ে প্রবেশের কৌতূহলই বেশি তার। কারো কাছে যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়। সে-ত একটি পরিবারের খোঁজ চায় মাত্র।

গ্রামের অভ্যন্তরে হারেস পথিকের দৃষ্টি মেলে। জনশূন্য। কোন লোকের সাক্ষাৎ ঘটে না। কলাবনের ধারে কতগুলো কিয়ান-পল্লী। একদল মুগী কোথা থেকে ছুটে এলো। সঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চা। কোন লোকের তাড়া পায়নি। স্বতঃই ছিটকে পড়ছে ছানাগুলো।

সরু সড়ক ছেড়ে পাড়ার ভেতর সেঁধেয় না হারেস। কয়েক কাঠা জমির পর আর একটা পাড়া। ছোট ভদ্রাসন চোখে পড়ে। সান-বাঁধানো জীর্ণ পুকুর সম্মুখে। এখানে সকালের নাস্তা শেষ করা মন্দ যুক্তি নয়।

হারেস এগিয়ে গেল। সদর-দরজা খোলা। ঘরগুলো পাকা নয়। খড় আর পরিপাটি ছিটে-বেড়ার দৌলতে তৈরি ভিন-গাঁয়ের অন্দর মহলা। গলা-খাকারী দিয়ে হারেস ঢুকে পড়ে। না, কোন জন-মানব নেই। পাশাপাশি কতগুলি ঘর। এরা ত দরিদ্র। হয়ত কোনকালে ইট-পোড়ানোর সৌভাগ্য ছিল। তৈজস-পত্র ছড়ানো রয়েছে উঠানে। চালের কোণায় লাঠি-ঠেঙা চালিয়েছে যেন কোন পাওনাদার কাবুলীওয়ালা।

এই ঘরগুলোর বাস্তব লোটারে একটা ছোট-বাগান। সেখানে খড়ো-ঘর দেখা যায়। হারেস-কে নেশা পায়। মানুষ, মানুষের সঙ্গ পাওয়া যাবে না এতটুকু।

উদ্বাস্তর পথে ফণী-মনসার বেড়া। গা বাঁচিয়ে চলে হারেস।

একটা বড় আটচালার মত খড়োঘর। জন-মানবহীন। হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ হারেসের কানে পড়ে। কিন্তু কোথায় মানুষ। দিনের ছায়া-অন্ধকারে কী ভূত নেমেছে?

সাহসী হারেস ঘরের চারি পাশ তন্নতন্ন করে দেখে। তৈজসের বালাই নেই। কাঠের সিঁদুক কয়েকটা চোখে পড়ল। বাঁশের মাচাঙে শুধু তুলোট পুঁথির স্তূপ।

দুটো উঁচু সিঁদুকের মাঝখানে মাদুরের উপর এক বৃদ্ধ শায়িত। সিঁদুকের উপরেও পুঁথির স্তূপ। তাই তার নিঃশ্বাস কানে আসে, মানুষটিকে চোখে পড়ে না।

পাশে এসে দাঁড়ায় হারেস। বৃদ্ধ চোখ বুঁজে নিঃশ্বাস ফেলছে। অদ্ভুত এক রকম

ঘড়ঘড় শব্দ হয় বুকে।

— আপনি কে? হারেস জোরেই বলে।

কোন সাড়া নেই। নিঃশ্বাস পতন আর ঘড়-ঘড় ধ্বনি সমতায় চলে।

অবলোক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। গলার উপবীতে তার পরিচয়। শুভ্র চুলে শিখা-বাঁধা। হারেস কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অস্তমিত জীবনের কোন কাজে লাগবে সে। কারো সাহায্যের প্রত্যাশা এখানে বাতুলতা।

বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে হারেস, একগুঁষ দৃষ্টি। নিঃশ্বাসের বেগ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসছে। ব্যাদানকৃত মুখ আর ঠোঁট নড়ে। হারেস বোঝে জাকানদানী শুরু হয়েছে। পানি, পানি দরকার। সে কি করে ব্রাহ্মণের মুখে পানি দেবে? বিচারের কোন সময় নেই। দৌড়ে অবসানের দিকে ছুটে এলো হারেস। কলা-পাতায় পানি নিয়ে সে ফিরে এলো। আর নিঃশেষিত নিঃশ্বাস ঘড়ঘড় বুকের আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে লঘু শব্দে।

হঠাৎ বৃদ্ধের পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে হারেসের। নলীভাঙ্গা ক্ষত-দাগে পূজ জমে রয়েছে। সেবার সুযোগ আর এক মিনিট পর কিছুই থাকবে না। বিন্দু বিন্দু পানি গড়িয়ে দিল হারেস। এক বার চোখ মেলে চাইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তার পর সব থেমে গেল। নিঃশ্বাস আর মুখের আওয়াজ।

অপরিচিত জায়গা। কর্তব্য শেষ করেছে হারেস। আর এখানে নয়। চেনে না হারেস বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন শিরোমণি মহাশয়কে। সারা জীবন যুদ্ধের মত আগলে বসেছিলেন এই জ্ঞান-ভাণ্ডার। একদিন স্বাধীনতার আলায়ে পঞ্জিতের নতুন করে যাচাই করবে অবহেলিত এই ঐশ্বর্য। তারই প্রতীক্ষায় শিরোমণি মহাশয় কোনদিন গ্রাম ত্যাগ করেননি। যোগ-প্রক্রিয়ায় সমগ্র দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল চুরমার করে ফেলবেন তিনি। আটচালার পাশে তার ধ্যানাসন আর উপচার পড়ে রয়েছে। দু-দিন আগে পাশের পাড়ায় আগুন লাগিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের রক্ষাকবচী বরকন্দাজেরা। পূজা-উপচার ফেলেই লাঠি কাঁধে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ এগিয়ে গিয়েছিলেন। সারা জীবনের বিশ্বাস কি ধূলিস্মাৎ হয়েছিল নিমেষে? লাঠি তার হাতে। সরকারের পীড়কের দল বৃদ্ধ দেখে বোধ হয় দয়া করেছিল। মাত্র এক ঘা পায়ের নলীর উপর। রক্তাক্ত পদ-যুগল টেনে টেনে বাগানের এই নির্জনতায় হঠাৎ নিজেকে আত্মস্থ করেছিলেন ন্যায়রত্ন শিরোমণি মহাশয়।

পুঁথির কফিনে সমাহিত বৃদ্ধের আত্মা শুভ্র নিষ্কলঙ্ক মহিমায় ঘুমায়...

জন-পদের এলাকা। সরু গলি-পথ বাঁশবন আর ছায়া সুনিবিড় সংকীর্ণ সড়ক। কুমোর পাড়ায় কোন জন চিহ্ন দেখা গেল না। চাকের পাশে অনেক চূর্ণ কাঁচা মাটির হাড়ি। হারেস কল্পনায় এই পল্লীর দুর্দশা স্মরণ করে।

নদীর বাঁকে জেলেপাড়া। কয়েকটা ছোট ছেলে-মেয়ে চোখে পড়ল হারেসের। বাঁশের উপর জাল মেলা। কোন জওয়ান ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে না।

সড়ক ছেড়ে হারেস তাই পাড়ার ভেতর ঢুকে পড়ল। ছোট ছোট কুটীর। নাতি প্রশস্ত দাওয়া। কোন ঘরের দাওয়াই নেই মোটে। ছোট ছেলেরা জিজ্ঞাসু-নয়নে শুধু উঁকি মারে।

হারেস কয়েক জনকে কাছে ডাকে, কেউ আর সাড়া দেয় না। চুপিচুপি ঘরের ভেতর সৈঁধিয়ে পড়ে। এই নাবালকের দল, এদের জিজ্ঞেস করার বা কী আছে?

একটু এগিয়ে হারেস কান্না শুনতে পায়। মরা-কান্না জুড়েছে যেন কে। কৌতূহল প্রশমিত হলো এক মিনিট পর। উঠানে দুটো চারা কলাগাছ, তার সোজাসুজি দাওয়ায় বসে একটা বুড়ি মেয়ে কাঁদছে। ধীবর-পল্লীর মেয়ে নিসন্দেহে। সম্মুখে তার একটা খোলা চাবি-জাল। বাঁশের খোলসটা একটু দূরে। কাঁদছে এই বৃদ্ধা খুব জোরে। হাত-পা মুচ্ছা-গ্রস্ত রোগীর মত থরথর করছে। পরনে তার বানজলে লাল-ময়লা কাপড়, সমগ্র শরীর ভালরূপে ঢাকা নয়। বৃদ্ধার আবরু পক্ষে হয়ত যথেষ্ট।

হারেসকে দেখে বৃদ্ধা কান্নার সুরেই বলে : হ্যাগা বাছা, আমার নবীনকে দেখেছে?

— কে নবীন?

তারপর বৃদ্ধা হাউমাউ করে কান্না জোড়ে। তার পুত্র নবীন আজ চার মাস ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এতটুকু খবর পর্যন্ত দেয়নি।

কল্লনার বেগ একটু থামলে হারেস জিজ্ঞেস করে, নবীন কোথা গেছে?

— তা কি আমি জানি। ঐ যে স্বদেশী স্বদেশী পেয়েছে, সেই বিটকেলেরা আমার ছেলেকে নিয়ে গেল। আমি বুড়ো মানুষ একা।

আবার বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে নবীনের মা।

— নবীন ক'দিন গেল।

— তিন মাস বাবা। ঐ যে পোড়ার মুখোরা কি টেউরী পেয়েছে।

তারপর বুড়ি গালাগালি জোড়ে : “ঐ যে পোড়ার-মুখো গান্ধী আমার ছেলটাকে শুদ্ধ নিয়ে গেল, কি যে হোলো। আরে ব্যাটা খোকার দল, গরীবের ওতে কী হবে? এই দ্যাখনা বাবা আমাদের জমিদারবাবুও ত “স্বাভিমন্য মাতরম” (বন্দে মাতরম) করে। গান্ধী টুপি মাথায় দেয়। তাদের সঙ্গে গিয়ে আমাদের কি হবে? এই দ্যাখো না বাবা, জমিদারের জন্যেই ত এই দশা। মাছ ধরবে নদীতে। তারও দাও জলকর। পেটে ভাত আছে দু'মুঠো? তুই নবীন, জেলের ছেলে, তোর ওসব সাজে?...হতচ্ছাড়া গান্ধী দেশটা জ্বালিয়ে ছাড়লে। ওসব জমিদার বাবুদের সাজে। তাদের ঘরে ভাত আছে। তাদের দলে গেলে গরীবের কী-হবে? জমিদার জলকর ছেড়ে দেবে...খাজনা ছেড়ে দেবে?”

বৃদ্ধা অতঃপর তার নবীনের উপর অজস্র অভিশাপ বর্ষণ করে : “বুড়ো মাকে দেখলি নে, তো ভাল হবে না। পোড়ার-মুখ ব্যাটা। তাকে খামখা পেটে ধরেছিলাম। সভা-সমিতি-মিটিং ওসব করবে জমিদার বাবুরা, বাঁদরের মত নাচবে গান্ধী-গান্ধী করে, তোর কী স্বার্থ আছে তাতে? দ্যাখ, পুলিশ কি করে গেল? হতভাগা পেটে ধরেছিলাম।”

বৃদ্ধা একাই যেন সব কথা বলবে, আর কাউকে মুখ খুলতে দেবে না। তার আদিখ্যেতা অব্যাহত থাকে : “জমিদার বাবু কত্তার (কর্তার) পেটে এমন ‘নাথি’ (লাথি) মারলে মরেই গেল দু'দিনের জুরে। তারাই ত স্বদেশী হয়েছে গান্ধী-গান্ধী রবে পাড়া মাথায় করে। বুকশূলে নবীন তুই কেন যাবি তাদের পেছনে? গাছে তুলে মই বেড়ে নিলে। তোর মা' বোন হেথা পড়ে রইল পুলিশের মার খেতে। জমিদারের গুপ্তি ত শহরে থাকে...”।

অখ্যাত পল্লীর বৃদ্ধা।

জগতের কোন খবর রাখে না। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের উপর ভিত্তি করে সে পৃথিবীকে রচনা করে।

হারেস বলে, “মাসী, নিজের ছেলেকে অমন গাল দিচ্ছ কেন? গান্ধীর রাজত্ব হলে দেশের সুখ হবে। ইংরেজ চলে যাবে।”

— “মড়ার কথা। সুখ হবে। জমিদার থাকবে ত থাকবে। তারপরে আবার সুখ? অমন সুখের মুখে বাঁটা।”

পদাঘাত-লাঞ্ছিত মৃত স্বামীর শোক উথলে উঠে যেন আবার বৃদ্ধার। আবার কান্না জুড়ে সে।

হঠাৎ এক সময় থামে এবং বলে, “বাবা, নবীনের সঙ্গে যদি দেখা হয়, বলিস বাবা, তার মা এখনও বেঁচে আছে। কাকপক্ষীকে জিগাই তার কথা।”

বৃদ্ধা হারেসের দুই হাত ধরে অনুনয় জোড়ে “বাবা, বলিস— বলিস। ভগবান তোদের মংগল করবে।”

— বলব, মাসী।

হারেস বৃদ্ধাকে স্তোক দেয়। জানে বৃদ্ধা স্তোক। কারণ, পুলিশের গুলিতে বহু লোক মারা গেছে। সে আর অপেক্ষা করে না।

দীঘল-পল্লীর শেষ প্রান্তেও বৃদ্ধার আহাজারী ভেসে আসে, “নবীন রে নবীন...”

আরো ক্রোশ দুই দূরে খেয়াঘাট পেরিয়ে হারেসের গন্তব্য।

পল্লীর জনবিরল পথে সে হাঁটে। শূন্য মন ঝাঁ ঝাঁ করে। আর এক দিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন সে সলিম মুনশীর বন্ধুশালা ছেড়ে পথে নেমেছিল। সেদিন ছিল মুক্তির নিঃশ্বাস বাতাসে। আজ তারাক্রান্ত আঁখিপল্লব পথের রেখা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করে না।

হারেস জানত, এই সব এলাকায় ঘন বসত। কিন্তু এখন তার চিহ্ন গায়েব। পথিক দু’একজন সামনে পড়ে। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে, দায়সারা জওয়াব মেলে। তখন তার সভার কথা মনে পড়ে। সেখানে বক্তা অগ্নিবর্ষী শব্দে বর্ণনা দিচ্ছিল, বৃটিশের পুলিশ গ্রামে গ্রামে কী রকম জুলুম চালিয়েছে। আতঙ্কে বহু গ্রামের মানুষ দূরে দূরে চলে গেছে যেখানে পুলিশের পথে পৌঁছানো খুব সহজ নয়। আরিফের কথা বার বার মনে পড়ে হারেসের। সলিম মুনশীর গোলামী থেকে মুক্তি পেয়েছিল সে ঠিকই। কিন্তু কাছের কয়েকটি টাকা ছাড়া আর ত কিছু ছিল না। সেখানে প্রথম সমস্যা, তার নিকটে কোথাও থাকা মানে বিপদ ডেকে আনা। সলিম মুনশী যে রকম উগ্র মেজাজের মানুষ, তার হাত মুচড়ে ধরেনি সে শুধু, একটা লাথিও মেরেছিল পেছনে। এমন বেইজ্ঞতির বদলা সলিম মুনশী কী ভাবে নেবে, তা ভাবতেও শিউরে ওঠে হারেস। তার গায়ের চামড়া অন্ততঃ আন্ত থাকবে না। হারেস তাই এলাকা-ত্যাগের জন্যে হেঁটেছিল। আহারের কথা প্রথম দিন ত মনেই হয়নি। কোন রকমে এক পয়সার মুড়ি আর পানি হলেই চলে গেছে। তৃতীয় দিনে আরিফের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। কথায় কথায় কোন আসল হৃদিস অবশিষ্ট সে আরিফকে জানায়নি। গাঁয়ের নাম জিজ্ঞেস করলে-অন্য গ্রামের নাম বলে দিয়েছে। কিন্তু আরিফের কাছ থেকেই সে শুনেছিল

যেখানে তাদের কৃষক কমিটির মিটিং হবে সেখানে থেকে তাদের এলাকা বিশ মাইল। তারা ট্রেনে এসেছে। তারপর পায়ে হাঁটা। হারেসও ত এইভাবে মজকুর এলাকায়। সেও ঝোঁকের মাথায় ট্রেনে চড়ে বসেছিল। টিকেট ছিল না এবং টিকেট করতে পয়সা লাগে তা-ও তখন হারেস মনে জায়গা দেয়নি। তার একমাত্র লক্ষ্য তখন দূরে-দূরে বহুদূরে পালিয়ে যাওয়া যেখানে সলিম মুনশীর নাম গন্ধ নেই। নেমে ত গিয়েছিল সে এক সময় ট্রেন থেকে। নসীবই বলতে হয়, নচেৎ স্টেশনে তার কাছ থেকে কেউ টিকেট চেয়ে বসল না কেন? এমন কোন দুর্বিপাকের সম্মুখীন হয়নি কেন সে? তখন রেলওয়ে পুলিশের কাছে কী জবাব দেওয়ার থাকত তার? হয়ত আসল ঠিকানাই বলে বসত সে। তার ফল, আবার সলিম মুনশীর কবলে। হয়ত থানায় ডায়েরী করে রেখেছে মুনশী বাড়ি থেকে গহনাপত্র কি-কি চুরি গেছে।

অতীতের ভাবনা হারেস'কে ঘিরে ধরে। নিকটস্থ এলাকা কেন জনবিরল সে ত সভায় শুনেছিল। আরিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ নসীবের ব্যাপার বৈ কি। সে কৃষক সমিতির সদস্য। সমিতির ডাকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আরো কৃষকেরা এখানে জমায়েত হয়। আরিফ ট্রেনে এলেও আবার পথ হেঁটেছিল পাঁচ মাইল। এই হাঁটা-পথে হারেসের ভবিষ্যৎ লুকিয়ে ছিল আজ হারেস দেখতে পায়। আরিফ তার জীবনের মোড় ফেরার আর এক নিমিষ। অবশ্যি আর এক মিটিং-এর কথা হারেসের মনে পড়ল। তা হয়েছিল মীরপুর বা মীর গাঁয়ের পাশেই। সেখানে মুনশী তাকে পাঠিয়েছিল এক আত্মীয়ের খোঁজ নিতে। সেখানেই হারেস প্রথম শুনেছিল, মানুষ মানুষের উপর জুলুম করে কেন? জীবনে সে প্রথম নাড়া খেয়েছিল। সে ত মনিবের গোলাম। মনিবের খেদমত করাই সওয়াব-পুণ্যের সামিল। সভার বক্তা এই ফাঁকিবাজির বিশদ বিবরণ দিয়েছিল, কিভাবে আরাম-আয়েশ-লুটনেওয়ালারা নিজেদের দৈহিক সুখ বজায়ে সমাজের আদব-কায়দা ধ্বংস করে। সেই কাহিনী শোনার পর ধোঁয়াতে শুরু করেছিল সে। দাউ দাউ জ্বলে উঠে আরো পাঁচ বছর লেগে যায়।

হারেস পথ হাঁটে আর ভাবে। নানা দৃষ্টান্তের উদয় ঘটে। গ্রাম ছেড়ে এত দূর পাড়ি দিতে হয়েছে সকলকে। কেমন আছে তার পা-পা-হাঁটি কিব্রিয়া? কেমন আছে রসূল? আরিফের কী দশা হয়েছে, কে জানে? জমি হয়ত কেউ সরিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম। কিন্তু অন্যান্য জিনিস? ঘরের তৈজসপত্র তেমন কিছু নয়। কিন্তু ছাগল, গরু? গরু গেলে ত চাষবাসের সুযোগ আবার মেলা দায় হবে।

চালু পায়ের সঙ্গে হারেসের মন পাল্লা দিতে থাকে। দূর-অতীতের হানা যেমন তাকে ব্যাকুল করে তোলে তেমনই নিকট-অতীতের ছোবল।

মাঝে মাঝে হাসি পেয়ে যায় হারেসের। নিজের অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে মেলানোর চেষ্টা করে সে। করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার সাথে সে তার কৈশোর এবং নবোদ্ভিন্ন যৌবনের দিনগুলো যাচাই করে। মানুষ অমন আহাম্মক হয় কী করে? কিন্তু হয়। সে ত সারাজীবন নির্বোধ ভারবাহী পশুর মতই থেকে যেতে পারত। আশ্চর্য কিছু নয়। বহু হাবা-গোবা আছে নিশ্চয় পৃথিবীতে। তারা যেমন জন্মায়, তেমনই থেকে যায়। তাদের কোন পরিবর্তন হয় না। সেও ত তেমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারত। আল্লার কাছে শোকর, সে নিজেকে চিনতে শিখেছে। আপন আত্মপরিচয়ে বিমোহিত হয় হারেস।

এক ঘটনায় তার আরো হাসি পেয়ে যায়। এখন অনেক জিনিস সে তলিয়ে দেখতে শিখেছে। ছেলে হোক মেয়ে হোক—প্রত্যেকেই বয়স অনুযায়ী নতুন নতুন চাহিদার সম্মুখীন হতে বাধ্য। সলিম মুনশীর চার মেয়ে। নিজে জোতদার হোলেও বিয়ের ব্যাপারে তার নজর নব্য কেরার অফিসার জামাই। তিন মেয়ের তেমন ভাল বিয়ে দিয়েছিলেন। বাকী ছিল ছোট মেয়ে কামরুন। যুগ্মত জামাই পাচ্ছিলেন না নিশ্চয় মুনশী। তাই মেয়ের বয়স সোমথ থেকে আরো উর্ধ্বে ধাইছিল। যৌবন-উগমগ কামরুন একদিন তাকে গোয়াল ঘরের পাশেই নির্জন তালবনের দিকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। হাবা নামেই হারেস মুনশী পরিবারে ছেলেবেলা থেকে পরিচিত। কি ফরমাস? কামরুন বলেছিল, তার বুক ঘামাচি হয়েছে, তা মেরে দিতে। হারেসের সামনে সে তার বুকের কাপড় সরিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কামরুনের বর্তুলাকার সুগঠিত দুই স্তনের দিকে বেশ নিরীক্ষণের পর হারেস জবাব দিয়েছিল, “না, বুবু, ঘামাচি একটাও নেই”। এক থাপ্পড় কসিয়ে কামরুন সন্তর্পিতে অকুস্থল ত্যাগ করেছিল। হাবা আরো হাবা হয়ে যায়। তার কি অপরাধ— সেদিন হারেস হৃদিস করতে পারেনি। আজ তার হাসি পায়। তখন তার বয়স কুড়ি ছুঁইছুঁই। অথচ পরিস্থিতি-বিচার তার সাধে কুলায়নি। সোহাগকে ঘটনাটা বহুবার বলার ইচ্ছা হয়েছে নিজের অতীতের পরিচয় দিতে। কিন্তু সে অত দূরে এগোতে পারেনি। পৌরুষসচেতন হারেস আত্মসংলাপে এমন দিনের কাহিনী শেষ করে।

আজ পথ হাঁটার সময় পুরাতন দৃশ্য বার বার মূর্ছে এলো। কোথায় আছে কামরুন আর তার জামাই। মেয়ের বিয়ে দিতে সলিম মুনশী দেৱী করেনি। অবিশ্যি শেষ জামাই আর এক জোতদারের ছেলে এবং কলেজ পর্যন্ত পড়া নয়। বহুকাল পরে হারেসের মনে এমন বিশ্লেষণের উদয় ঘটে।

সলিম মুনশীর বাড়ি ছাড়ার পর দুই মাসের মধ্যে হাঁটার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল হারেসের। তখন পেছনে ছিল প্রচণ্ড বিপদের আশংকা। আজ তেমন কিছু নেই তবু জোরেই হাঁটে মাঝে মাঝে হারেস। ভবিষ্যতের নানা কল্পিত ছবি তার সামনে ‘খাবি খায়’। কি ঘটেছে, কে জানে? জিনিসপত্র গেছে? যায়-যাক। কিন্তু প্রাণ? বাড়িছাড়া, অনিয়ম আহাৰ কেন-বহু রকমের অনিয়মের শিকার সবাই, গোটা এলাকা। শারীরিক অসুখ-বিসুখ ত খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। চোখের সামনে সকল-কে না দেখলে আর স্বেয়াস্তি নেই। হারেস তাই দ্রুত পদ। আবার হাঁফ ধরে ক্লান্তির চোটে। তখন হারেস নিজেই ঝিমিয়ে যায়। তবে বুক বেশ বাঁধা আছে। কারণ, সদ্য শহর-ফেরত। বেশি নয়, সঞ্চিত কিছু টাকা তার বিরাট ধনি। এখন ওদের সঙ্গে দেখা হলেই একটা সিদ্ধান্তে পৌছানো সহজ হবে।

খেয়াঘাট তখনও মাইল দুই দূরে। হারেস দেখে বেশ কিছু লোক সেদিক থেকে আসছে। স্বভাবতই সে এগিয়ে যায় খোঁজখবর জানতে। সঠিক খবর ত পথের পথিক দিতে পারে না তাকে। তবে একটা খবরে সে প্রচণ্ড স্বেয়াস্তি পায়। খেয়াঘাটের ওপারে বহু লোক জমায়েত হয়েছে নানা দিক থেকে। সকলেই নিজ নিজ গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল দুই হপ্তা। এদিক এখন শান্ত। তাই সকলে আবার নিজ নিজ নীড়-সন্ধানী। হারেস ভাবে, হয়ত আরিফও বাড়ি ফিরছে। কিন্তু তার সঙ্গে কী সকলে আছে? আতংকে দিশেহারা হয়ে যায়। পালানোর সময় সকলে এক সঙ্গে ছিল ত? হারেসের মেহনতে-পেটাই শরীর।

সহজে কাবু হয় না। বড় বড় দু-মনী ধানের বস্তা সে অক্রেসে সলিম মুনশীর গোলায় তুলত। আজও মেহনত তার ভীতি উৎপাদনে অক্ষম।

কিন্তু দৃষ্টিভ্রায় সে সহজে কাবু হয়ে যায়। আগত পথিকের মুখে আর এক সংবাদে হারেসের সোয়াস্তি আরো ধসে যায়। খেয়াঘাটে দু'তিন হাজার লোক জমেছে। নদী ছোট। তবু আধঘণ্টার বেশি লেগে যায় খেয়া পারাপারে। নৌকা মাত্র তিন-চারখানা। সেগুলো পনর-বিশজনের বেশি প্যাসেঞ্জার নিতে অক্ষম। জোয়ার আছে। তখন আরো সময় যায়। পূর্বে ত এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়নি। একটা নৌকাই যথেষ্ট ছিল। ঘাটের ইজারাদার নৌকা বাড়িয়েছে, কিন্তু সামাল দেয়া দায়। খেয়াঘাটে পৌছানোর জন্যে তবু উদগ্রীব হারেস। কল্লনার তরী সে ভাসিয়ে দেয় বৈকি। দু'হাজার লোক। ওইখানে যদি তাদের পাওয়া যায়, আর কোন কিছু প্রয়োজন নেই। চার-পাঁচ দিন দেরী হবে বাড়ি ফিরতে। তা হোক, খোলা আকাশের নীচে শোয়া ত তার কাছে নতুন নয়। সলিম মুনশীর ফসল তোলার সময় সে মাঠে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছে। খড়ের বিছানা। খড়ের আঁটি বালিশ। গামছা শুধু খড়ের উপর বিছানো। এখন ত অনেক আরাম সহজে পাওয়া যাবে। প্রিয়জনের সান্নিধ্য বোধ হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে আরামপ্রদ। বাসর-শয্যার চেয়েও লোভনীয়। আকাশের নীচে রান্না কষ্টকর নয় তেমন কিছু। গ্রামে বনভোজন করে হারেস দেখেছে। এবার নিজেই বনভোজনের শরীক। আগেও সে এমন অবসরের উৎসবে যোগ দিয়েছে। কিন্তু শ্রেফ যোগাড়ের বেশি তার মর্যাদার উপরে ওঠে নি। সে তত্ত্ববায় সম্প্রদায়ের লোক। মুসলমান ভাই-ভাই হলেও সে জোলা-শিরোনামে অবজ্ঞাত। তার সঙ্গে শরীফ মুসলমানেরা এক কাতারে খেতেই বসবে না। আজ কার তোয়াক্কা? শহরে গিয়ে তার কতটুকু প্রত্যয় বেড়েছে, নিজেকে রুজি নিজে উপভোগ করো। কারো ভ্রুকুটির জায়গা সেখানে নেই। গায়ে এমন হটকীরীতা অসম্ভব। হারেস তার হদিস করতে চায়। কিন্তু বুদ্ধিতে কুলায় না। পৃথিবীর বুকে যেমন নানা সম্পদ লুকিয়ে আছে, তেমনই সমাজের বুকে। খুঁড়ে বের করতে না জানলে মাথা-চোঁকাই সার। নানা দুর্ভোগ তখন জমে থাকে মানুষের জন্যে। অবশ্যি সব মানুষের জন্যে নয়। এক দলের যখন পৌষ মাষ এবং তারা ছোট দল-তখন বহু মানুষের সর্বনাশ পোয়াতে হয়। খেয়াঘাট আর কত দূরে? দ্রুত পা চালায় হারেস।

সূর্য তখন পাটে নামছে।

খেয়াঘাটের এক মাইল দূর থেকে কোলাহল শোনা যায়। অনেক মানুষের জমাট হাঁকডাক। আবছা হয়ে আসছে পৃথিবী। সম্মুখে রাত্রি। কিন্তু শুক্লপক্ষ। হারেস কালই তার হিসেব জেনেছিল। আবছা আলোয় কী এত মানুষের ভিড়ে তাদের খুঁজে বের করা যাবে? কেউ যদি শুধু তাদের সামান্য হদিস দিত সে এমন ব্যাকুল হতো না। আল্লার কাছে শোকর, আকাশ বেশ পরিষ্কার। উন্মুক্ত আকাশের তলায় রাত-গুজরান তেমন কষ্টকর হবে না।

খেয়াঘাট পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা নেমে গেল। হারেস তাই সামান্য নিশ্চিত। কিন্তু এখানেও সমস্যা কম নয়। ওপারে যাওয়ার পারার্থী সংখ্যায় খুব কম নয়। জনা পঞ্চাশ তখন ও বাকী। সকলের উদ্দেশ্য একই। খোঁজে বেরিয়েছে আপনজনের। হারেসের তর সয় না। কিন্তু আবছা অন্ধকারে নদী পার হওয়া খুব নিরাপদ নয়। মাঝি বোঝাই নৌকা

নিয়ে নোঙ্গর খুলতে রাজী না সহজে। সকলের তাড়া। সকলেই অগ্রাধিকার চায়। ফলে বচসা এবং দেরী হয়।

হারেসের ক্ষেপ আরো এক নৌকা পর। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ওপারের দিকে। কয়েক শ' বিঘা জুড়ে আস্তানা পড়েছে। প্রদীপ নেই। তার জায়গা নিয়েছে ইটের উপর তৈরি অস্থায়ী চুলো। তার আলোয় ওপারের কোন কোন জায়গা বেশ দেখা যায়। আসলে এলাকাটি বন্যারোধী বাঁধ। গাছপালা আছে মাঝে মাঝে। এইসব জায়গায় আশ্রয় পেতে বসে আছে গৃহভিক্ষুখী নিকটস্থ এবং দূর-দূরান্ত এলাকার লোক।

পার হওয়ার সময় হারেস হাতের পুঁটলি বেশ বাগিয়ে রাখে। দুতিনখানা কাপড় আছে। যদিও শীতের মৌসুম নয়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা সিরসির করতে পারে। তাছাড়াও আরিফ এবং আর সকলের সম্মল এখন কি কারো জানার কথা নয়।

ঘাটমাঝির পয়সা দিয়ে জমিনে পা রাখতেই হারেসের বুক টিপটিপ করে। কী আছে তার নসীবে কে বলবে? অন্ধকার হলেও সে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে হেঁকে যাবে— “এখানে সামগড়ের কেউ আছে নাকি, ভাই?” কিন্তু অত সহজে সে জমিনে দাঁড়াতে পারে না। ক্রান্তির চোট দু’দিন থেকে তার উপর রগড়ানি চলেছে সারা শরীরে। তাই হারেস বাঁধে উঠে এক জায়গায় দুর্বাঘাসের উপর বসে পড়ল। নদী বাঁধের কোলে। তবে সমতল জায়গা আছে। সেখানে অনেকেই বসে আছে যার যা আছে তাই নিয়ে আশ্রয় পেতে। হারেসের চোখে পড়ল এক বুড়ো লোক বেশ স্টান লম্বা শুয়ে আছে গাঁঠরীর উপর মাথা দিয়ে। দিবিয় ঘুমোচ্ছে ভদ্রলোক। এই বয়সে তার পক্ষে বাইরের জগৎ মিথ্যে হয়ে যায়, যদি শারীরিক বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন থাকে। হারেস ভাবলে, বয়স তাকে রেহাই দিয়েছে। এক আধ-বয়সী মহিলার চারপাশে তিন চারটি কুঁচো ছেলে রীতিমত খেলায় মগ্ন। ওদের বয়স পাঁচ থেকে দশের ভিতর। মেয়েটি নির্বিকার। কে জানে, নিজের কোন চিন্তা তার পরিবেশ সচেতনতা কেড়ে নিয়েছে। বসে-বসে চোখ যন্দুর যায়, সে দেখে। কিন্তু এই ভাবে তার চলবে না। সে ত বৃদ্ধ নয় অথবা রমণী নয়। তার কর্তব্য আছে এবং এই কর্তব্য কারো চাপানো কর্তব্য নয়, বরং নিজের গরজের তাগিদ।

আশ্রয়ের এলাকা মাইলখানেক জুড়ে। বাঁধের উপর গাছ। এই গাছতলা অনেকে অধিকার করেছে। দিনের বেলা রোদ্দুর থেকে ত বাঁচা যাবে। যারা তেমন জায়গা পায়নি, তারা নদীর কিনারার কাছে গেছে। পানিও ত সমস্যা। জলদি জলের অভাব মিটলে অবস্থান অনেকখানি আরামপ্রদ হয়। হারেস এসব ভাবছিল বৈকি। কিন্তু এই আবহা শুক্লপক্ষের রাত্রে কোন স্পষ্ট মুখ দেখতে পাওয়া ত দায়। দিনের বেলা হলে অনেক মেহনতে বেঁচে যেত। নদীর জল মিষ্টি। নামার আগে সে বেশ পিপাসা মিটিয়ে নিয়েছিল। গলার জোর অন্ততঃ সহজে মিইয়ে যাবে না। বিশেষতঃ তার মত গাট্টাগোট্টা জওয়ানের। কিন্তু বাধা, লোকে কী ভাববে? হঠাৎ পাগলের মত চীৎকার দিয়ে এগোনোর চেয়ে লোককে জিজ্ঞেস করে-করে এগোলেও ত বাঙ্গা পূরণ সম্ভব। এখানে পাশাপাশি বসে অনেকে গল্প করছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে জিজ্ঞাসা পড়লে ওদের তালভঙ্গ হবে। তখন কে কী বলে বসে কে জানে। তবে হারেসের মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা কথা জিজ্ঞেস করা খুব অশোভন নয়। সবাই ত আত্মীয়-স্বজনের খোঁজে এখানে জড়ো হয়েছে।

শেষে হারেস গ্রাম্য কায়দাই শুরু করল বাঁধের এক প্রান্ত থেকে। সে বেশ জোর-জোর হাঁক মারে, “সামগড়ের কেউ আছেন নাকি, ভাই?”

কয়েকবার হাঁক দিল হারেস। রাত্রির বিশ্রাম অনেককে নীরব করে দিয়েছে। অবিশ্যি রাত্রি বেশী হয় নি। হারেস ভাবে, তার গলার জোর কত দূর আর পৌঁছাবে? জায়গাটা ত কম নয়। আধক্রোশ ত হবে। নিজের মনেই উচ্চারণ করে হারেস।

প্রথমে কোন দিকে আর সাড়া না পেয়ে বড় নিস্তেজ হয়ে যায় হারেস। আরিফের আত্মীয় আছে এই এলাকায়। কিন্তু সে ত বৈমাত্রেয় ভাই মালেকার। তার সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ ছিল না। বিপদে পড়ে আরিফ যদি পুরাতন আত্মীয়তা আবার ঝালাই করতে আসে, সে কথা আলাদা। আর এখানে তারা এসেছে বাড়ির উদ্দেশ্যে, তার ত কোন নিশ্চয়তা নেই। এইসব ভাবনা-চিন্তায় হারেস খুব কাবু। এক সময় সে একটু ফাঁকা জায়গা বসে পড়ে। বেশির ভাগ লোক ক্রমশঃ গুয়ে পড়েছে যে-যার জায়গায়। পথিক ক্রমশঃ কমে আসে। নীরবতার মাত্রা বাড়ে। হারেস তাই বসে সোয়ান্তি পায় না। তারও ঘুম পায়। কিন্তু এই আস্কারা সে মনের জোরেই ঝেড়ে ফেলে দিলে, বরং নিজের অজানিতে হেঁকে উঠল, “সামগড়ের কেউ আছেন নাকি, ভাই?”

প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ হেনে ভেসে যায়। হারেস মুষড়ে পড়ে। তার ছিন্নমূল জীবনে শিকড় গজিয়েছিল, সব বোধ হয় আবার উৎপাটিত না হয়ে যায়। এমনই আশংকায় আন্দোলিত হারেস। ছেলেবেলার দারুণ কৃচ্ছতার দিনগুলো অকল্পিত হানা দিয়ে যায়। সলিম মুনশীর বাড়ির কাজকর্ম ত কখনও কম থাকত না। ভোরবেলা উঠে গরু-ছাগলের খবরদারী করতে শিখেছিল সে সেই আট বছর বয়স থেকে। সকাল হলেই মুনশীর ফরমাস, বিবিদের ফরমাস তাদের ছেলেমেয়েদের ফরমাস খাই ধাঁই শুরু হতো। ওই বয়সেই সে কিন্তু সামাল দিতে পারত। অনেক সময় এমন হতো যে প্রায় দুপুর কাছাকাছি এলেও কেউ জিজ্ঞেস করত না, তার নাস্তা হয়েছে কি না। নাস্তা মানে একটা ছোট বাটির এক বাটি মুড়ি, সেই পান্তা ভাত। কালেভদ্রে সলিম মুনশী সাহেব বা বিবি সাহেবদের ঝুটো কোন কিছু-সামান্য পিঠা বা ওই জাতীয় কিছু।

হারেস কয়েকবার হাঁক দিয়ে ক্লাস্ত হলেও সে পায়ের কামাই দেয়নি। হেঁটেই চলেছে সে। খেয়াঘাটের আশপাশ ত সে আগে দেখেছে এবং জরীপে কোন কসুর করেনি। কাফেলার শেষ প্রান্তে এসে পড়ল হারেস। তখনই তার চোখে পড়ল জনাকয়েকের এক জটলা।

সবাই কিন্তু ঘুমোচ্ছে অঘোর। বছর তিনেকের শিশুও আছে ওই দলে। ওরা গুনে দেখল হারেস, মোট পাঁচজন। শিশুর অস্তিত্ব তার কাছে বিরাট আকর্ষণ। হারেস আরো দেখল, দলে দুইজন মেয়ে। একটি মেয়ে তার শিশু নিয়ে একদিকে কাৎ হয়ে গুয়ে আছে। সামান্য ফাঁকে আর একটি মেয়ে, তার আট-ন’ বছরের সন্তান এবং একজন পুরুষ সন্তানের পাশে। চাঁদের আলো আছে ঠিকই। কিন্তু স্পষ্ট ত কিছু দেখা যায় না। আবরুর ব্যাপার আছে ঠিকই। খুব নিকটে যাওয়াও নিরাপদ নয়। তার মতলব সৎ এমন হয়ত অনেকেও নাও ধরতে পারে। তখন ত ফ্যাসাদ বেধে যেতে পারে। মেয়েছেলেদের ঝামেলা না থাকলে হারেস কাছে গিয়ে তদন্ত করে দেখত।

সাত-পাঁচ ভাবনার মধ্যে হারেসের মনে ফন্দী খেলে যায়। তার হাঁক ত দোষের কিছু

নয়। সকলেই হারানো আত্মীয়জনের খোঁজে এখানে জড়ো হয়েছে অথবা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। সেখানে একটা হাঁক কি খুব অশোভন? অবিশ্যি অনেকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। তা ঘটুক। সামাল দেওয়া সেখানে কঠিন হবে না।

তবু হারেস সামান্য তফাতে গেল এবং জোরে হাঁক দিয়ে উঠল, “সামগড়ের কেউ আছেন নাকি, ভাই”। একবার নয়। উপরপরি তিন-তিনবার। কণ্ঠ নয় শুধু, হারেসের চোখ বিশেষ সক্রিয়। চোখ তেড়েতেড়ে দেখা যা-কে বলে, সে তা-ই করছিল।

ফল ফলতে দেরী হয়নি। দংগলের পাঁচজনের মধ্যে যে-মেয়েটি তার ছোট সন্তান নিয়ে ঘুমোচ্ছিল সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। হারেস লক্ষ্য করে, ঘুম ভেঙ্গে শুধু বসা নয়, সে চংমং ইতিউতি তাকায়। হারেস তখন আবার হাঁক মারে। এবার তার দিশাহারা হবার দশা। সদ্য ঘুমভাংগা মেয়েটি লক্ষ্য করেই দৌড়ে এলো, পেছনে তিন বছরের শিশুটি তখন কান্না জুড়ে দিয়েছে, “মা-মা” রবে।

সবই দ্রুত ঘটে যায়। সোহাগ খাতুন কখন হারেসের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফোঁপাতে শুরু করেছে সে বুঝতেও পারেনি। জাগন্ত অবস্থায় স্বপ্নের মত দ্রুত ঘটনা একটার পর একটা ছায়া ফেলে যায়। অকুস্থলে কখন তারা ছ’জন একে অপরের সান্নিধ্যে বিচ্ছেদের ব্যবধান মুছে ফেলতে তৎপর-এসবই যেন নিমিষের খেলা। কিবরিয়া কাঁদছিল বাপের আলিঙ্গনের ভেতর-এক হাতের আলিঙ্গন। অন্য হাতে ত আরিফ বাঁধা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রসুল ফোঁপাতে শুরু করেছে।

নাটকীয় পর্ব সহজে কাটে না। আশপাশের অনেকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু কেউ বিরক্তি প্রকাশ করে না। পরিস্থিতি এক ধরনের স্বাভাবিক। তার স্পর্শ সকল গায়েই লাগে।

অকুস্থল ছেড়ে তারা একটু ফাঁকে গিয়ে আস্তানা পাতল যেন অপর কারো ঘুম বা অন্য কিছুর বিঘ্ন না ঘটে। কারণ, তাদের কথায় ত এই মাত্র শুরু হয়েছে। এখনও চার পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি আছে। এই সময়-সীমা তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। বিচ্ছেদ সব সময় চিন্তাভাবনার ভাঁড়ার ঘরে পরিণত হয়। তার ফটক-উন্মোচনের শুধু একটা সূত্র দরকার। তার মিছিল আরম্ভ কথার। চিন্তা ভাবনা প্রকাশের এই আদিম উপায় এমন ক্ষেত্রে আর বিরতি জানে না।

তবু এক সময় তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুখনিদ্রা সংখ্যায় হয়ত খুব বেশি হয় না মানুষের জীবনে। কিন্তু তার আচ্ছন্নতা কে না চায়?

আকাশ ফর্সা হওয়ার পূর্বেই বয়োজ্যেষ্ঠরা উঠে পড়েছিল বৈকি। বালক দুজনের ঘুম ভাঙতে হলো। কারণ, সকাল-সকাল নদী পার হয়ে গেলে সূর্যের খরা থেকে অনেকখানি রেহাই পাওয়া যাবে। ভাড়া বেড়ে গেছে। লোভে অন্যান্য এলাকার নৌকাও এসে জুটেছে। ঘাটে নেমে হারেস কাল শুনেছিল। তারপর হাঁটা পাঁচ ক্রোশ বাচ্চাদের নিয়ে। তার জন্যে আজ কেউ পিছপা নয়। এমন কী দুই রমণী পর্যন্ত।

নাস্তার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। মুড়ি কলার ব্যবসা চাহিদার ডাকে ত তিন চার দিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় আরিফ এক প্রস্তাব দিল। তা শুনে হারেস থ’। কারণ, বন্ধুর মুখে এমন কথা শুনে সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

আরিফ বললে, “ঘর-দোর সব ত গেছে। আবার নতুন পত্তন। হারেস, চলো না

শহরে যাই। সেখানেই নসীবের লড়াই শুরু করা যাক।”

“শহরে?” বিস্মিত হারেস একটু থেমে যোগ করেছিল, “আরিফ-ভাই, শহর সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। তাই এমন কথা বলছ।”

আরিফ জবাব দেয়, “এটা ঠিক আমি শহরে যাইনি। কিন্তু এটা বুঝি শহরে রোজগারের নানা ধান্দা করা যায়, গাঁয়ে তা সম্ভব নয়।”

হারেস হার-মানা সুরেই বলে, “তা ঠিক। কিন্তু হাঙ্গামা অনেক ভাই।”

“জীবনই ত হাঙ্গামা।” দার্শনিক-সুলভ জবাব আরিফের। পরে সে আরো বলে, “আমার মতে, নতুন যখন আবার ঘর-বাঁধা। শহরে চলে যাই না কেন?”

“অনেক হাঙ্গামা। আমরা ছ’জন তাদের থাকার জায়গা কোথা পাচ্ছ?”

“ঘর-ভাড়া নেব।”

“গায়ে আলো বাতাস পাও। সেখানে তাও কিনতে হয়। বেশি আলো-বাতাস চাইলে বেশি টাকা। নচেৎ কড়ায় আলু সেদ্ধ।”

এই ধারায় কথা কাটাকাটি চলে মুড়ি খেতে-খেতে। মেয়েরা শোনে। ছেলে দু’জন শোনে না। শেষে হারেস বলে, “ভাই আপাতত সামগড়ে ফিরে যাই। তারপর আমি শহরে গিয়ে চেষ্টা করব, কী করা সম্ভব। আমি ত গাঁয়ে থাকতে চাই।”

“তবে শহরে গেলে কেন?” আরিফের প্রশ্ন।

হারেস চট করে জবাব দিতে পারে না। শেষে বলে, “নসীব আমাকে নিয়ে গেছে।”

“আমার নসীবকেও তা-ই তুমি বলে দাও।” এইটুকু উচ্চারণের পর আরিফ হাসতে থাকে।

“সে ব্যবস্থা পরে হবে।”

“শহরে রোজগারের ধান্দা অনেক। নসীব খোলার পথও অনেক। আমি তা-ই মনে করি। তোমাকে দেখে আমার সেই কথা বার বার মনে হয়।”

“সে-দেখা যাবে। আপাততঃ নিজেদের ভিটায় ফিরে যাই চলো।”

হারেস জবাব দিয়ে উঠে পড়ল। আরিফও ওঠে এবং বলে, “শেষে আমাদের সবাইকে শহরেই যেতে হবে রোজগারের তালাসে। দেখো-আমার কথা ফলে কিনা।”

সামনে ক্রোশ ক্রোশ পথ।

খেয়াঘাট পার হয়ে তারা তৈরি হয়। শুধু তারা নয় আরো শত শত জন। দীর্ঘ কাফেলা। সকলের কিছু না কিছু বহনযোগ্য গাঁঠরী আছে। রসুলও ব্যতিক্রম নয়।

সূর্য তখনও আকাশে স্বর্ণ-খালি।

সকলে এগোয়।

কিবরিয়া বায়না ধরেছিল, সেও হাঁটবে। তার কথার অমান্য সম্ভব হয়নি কয়েক মিনিট। তারপর হারেস তাকে কাঁধে তুলে নিল।

জননী



আলী আজহার খাঁ মহেশডাঙার মামুলী চাষী।

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড এখানেই সরলরেখায় গ্রাম-গ্রামান্তরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই সরু গ্রামের পথ। কয়েক মিনিট হাঁটিলেই প্রথমে পড়ে আলী আজহার খাঁর বস্তি। সম্মুখে একটি বড় দহলিজ। বাম পাশে ছোট ডোবা। পূর্বদ্বারে প্রতিবেশীদের খড়োঘর। কয়েকখানা কলাগাছের সবুজাভ পাতা চালের ভিতর উঁকি মারিতেছে। উঠানে কেহ বোধহয় কলাগাছ রোপণ করিয়াছিল। আসন্ন বৈকালে এই অঞ্চল ভয়াবহ ঠেকে। জনবিরল গ্রাম। অরণ্যানীর ছায়াভাস আগাছার জঙ্গলে সর্বক্ষণ কালো দাগ আঁকিয়া রাখে। বর্ষাকালে পথঘাট দুর্গম। ঝড়ে পাতাপুতি, হেলানো বাঁশবনের কঞ্চি আর কাদায় রাস্তা চলা বিপজ্জনক। বেতবনের ঝোপ-নিজ্জান্ত বিষাক্ত সাপ দিনেও আশেপাশে বিচরণ করে।

আলী আজহার খাঁকেও এই পথে হাঁটিতে হয়। লাঙল কাঁধে হালের বলদ দু'টিকে ভর্সনার আহ্বান দিতে দিতে বহুদিন দেখা গিয়াছে সে আনমনে পথ হাঁটিতেছে।

আজ এই খাঁ-পরিবারের কোন ছেলেকে দেখিয়া বুঝা মুশকিল, একশ' বছর আগে তাহাদের পূর্বপুরুষেরা বাঙালি ছিলেন না। আলী আজহার খাঁর চেহারা পাট্টা জোয়ানের। রঙ ফর্সা। শুধু এই অবয়বে অন্যান্য প্রতিবেশীদের কাছে সে বৈশিষ্ট্য-পৃথক। নচেৎ কিশাণ-পল্লীর ভিতর তার অন্য কোন মাহাত্ম্য-গুণ নাই, আর জন্য শতজনের মধ্যে সে প্রথমে কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

আলী আজহার খাঁ জানে, তার পূর্বপুরুষেরা এই গাঁয়ের বাসিন্দা ছিলেন না।

দহলিজের ডোবার পাশ দিয়ে আর একটি সরু সড়ক কিছুদূর সোজাসুজি পশ্চিমে জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার মধ্যে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছে। ভিটার তিনদিকে ঘন ফণীমনসার কাঁটার ঝোপ। আর একপাশে বেউড় বাঁশ আর বেত এবং অন্যান্য আগাছার রাজত্ব। ভিটার আশেপাশেও বহু ঋণ আর চূর্ণ ইট পড়িয়া রহিয়াছে। অতীতে এখানে ইমারত ছিল তার প্রমাণ ইট ছাড়া আরো বহু উপাদান আছে, গ্রামের জনপ্রবাদ-ইতিহাসকে নানা রঙে যা সঞ্জীবিত রাখে। দুপুরে সাপের ভয়ে এইদিকে কেউ আসে না। খাঁ-পরিবারের লোকেরা অবশ্য ভয় করে না। জ্বালানির জন্য এই ভিটার ঝোপঝাড় শুধু তাহারাই সাহস করিয়া কাটে। ইহা আর কাহারো সহ্য হয় না। কোন না কোন বিপদ জড়াইয়া আসে এই রাজ্যের জ্বালানির সঙ্গে। মহেশডাঙার শেখেরা একবার একটি চারা অশখ গাছ তুলিয়া তাহাদের উঠানে রোপণ করিয়াছিল। চার বছর পর সেই বাড়ির মুকুব্বী নাকি বজ্রাঘাতে উঠানেই মারা যায়। আরো বহু দুর্ঘটনার জন্য খাঁ-পরিবার এই রাজ্যচ্যুতির আশঙ্কা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ভিটার চাতালের গাছপালা তাহারাই ভোগ করে।

ভিটা সংলগ্ন একটি বড় পুকুরিণী ছিল। বর্তমানে মজা পুকুর মাত্র। পাড়ে কাঁটাবন দুর্ভেদ্য। কয়েক বছর আগেও পদ্মপাতায় পুকুরের সামান্য পানিও দেখা যাইত না। বর্তমানে

জীবনের দ্বিতীয় নামও অন্তর্হিত হইয়াছে। খাঁর পুকুরে পীরের কুমির ছিল। সেই প্রবাদ এখনও মুখে মুখে ফেরে।

আলী আজহার খাঁ সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। তবে পাশীতে তাঁর দখলের যথেষ্ট সুনাম ছিল এই অঞ্চলে। আজহার খাঁ পিতার এই মহিমা-গুণ কিছুই পায় নাই। তার পিতামহ আলী আমজাদ খাঁ নাকি আরো পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। সওয়া শ' বছর আগে তাঁর প্রপিতামহ মজহার খাঁ এই গ্রামে অকস্মাৎ নাজেল হইয়াছিলেন। এই বংশের তিনিই আদি-পিতা। শান-শওকত দব্দবা তাঁর আমলেই ছিল। তারপর খাঁ পরিবারের অধঃপতনের যুগ। ইমারতের আকাশ হইতে আলী মজহার খাঁর বংশধরেরা আজ খড়োঘরের মাটিতে নামিয়াছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি সব নিকৃদিষ্ট। মাটির কাছাকাছি আসিয়া আলী আজহার খাঁও অতীতের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিগত ইতিহাসের স্বপ্ন তার কাছে ধূসর মরীচিকার মতো মাঝে মাঝে জীবন-সংগ্রামের নিরাশা-ক্লিষ্ট ক্ষুদ্র মুহূর্তে ভাসিয়া আসে বৈকি!

আলী আজহার খাঁর রক্তে পূর্ব পুরুষদের যাযাবর নেশা আছে যেন। আবাদের পর আর কোন কাজ থাকে না। ফসলের অনিশ্চয়তা নীড়ে কোন মোহ জাগায় না। আজহার তাই রাজমিস্ত্রীর কাজও শিখিয়াছিল। তখন সে দূরে ভিন্ন গাঁয়ের দিকে কন্নির আর সূতা হাতে চলিয়া যায়। এমনি আজহার খাঁ নিরীহ। প্রতিবেশীদের কাছে সে সাধু ও সজ্জন নামে খ্যাত। আলী মজহার খাঁর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষের একটি যুবক নিজীবতার জন্য নিরীহ এমন অপবাদ দেড়শ' বছর আগে কেহ মুখে উচ্চারণও সাহস করিত না। কর্মময় জীবনের ক্ষেত্রে, সাংসারিকতার নাগপাশ, দাসত্বের বেড়ি, পলিমাটির অদৃশ্য যোজনা শক্তি, কোথায় কিরূপ এখানে কাজ করিয়াছে, কেহ তার ইতিহাস জানে না।

আলী মজহার খাঁর রক্তেও কি এমন ধরা-দেওয়া নিজীবতার ধারা ছিল?

অতীতের সঙ্গীত-তরঙ্গ কলধ্বনিতুলে। সব সেখানে একাকার হইয়া যায়। বিরাট সমুদ্র-স্তনিত পৃথিবী, স্থাবর-জঙ্গমের গতিশীল যাত্রাধ্বনি, শত-মনস্তরের পদক্ষেপ, মানুষ আর মানবীর কীর্তন মিছিল, কালের প্রান্তর-মর্মর। তবুও ভবিষ্যৎ দিক্চক্রবালের মতো মানুষের নয়নপটের সম্মুখে আঁকা। তাইত এই পথ চলা—যে-পথের বার্তা অতীত-বর্তমান, অতীত আর ভবিষ্যৎ, ত্রিকালের সমাহারে অপূর্ব সমারোহ-ধ্বনি ভাঙা-গড়ার খঞ্জনীতে বাজায় বাজায়।

আলী আজহার খাঁর সাতবছর বয়সের পুত্র আলী আমজাদ খাঁও হারানো বাছুর খুঁজিতে আসিয়া স্তিমিত বৈকালে তারই হানা-রেশ পাঁজরের গলি-তটে বারবার যেন গুনিতে পায়।

গ্রান্ড ট্রান্স রোড। এই রাজপথ। শেরশার বিজয় বাহিনীর যাত্রাপথ। পাঠান সম্রাট আর নবাবদের ঐশ্বর্য-দ্রষ্টা ধূলি সড়ক। সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্রমশ আত্মগোপন করিতেছে। পত্রপুষ্পের আবরণে দিনের আলো বাধাপ্রাপ্ত। অন্ধকার অবোধ বালকের মুখেও ছায়া ফেলে। দূরে মলিন আকাশ আর দেখা যায় না। শীতের হিমচ্ছিন্ন রাত্রির আবাহনী শিরীষের ডালে বাজিয়ে থাকে।

এই রাজপথ বাহিয়া সওয়া-শ' বছর আগে আলী মজহার খাঁ পনের জন সহচর, আরো কয়েকটা ঘোড়া লইয়া মহেশভাঙার অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। চারিদিকে গাছপালার অরণ্য। ইংরেজ শাসকদের অন্ত-বর্ম-সজ্জিত কোন প্রহরী অন্তত কিছুদিন

তাহাদের সন্ধান পাইবে না। বিরাট কর্তব্যের অনুশাসন চতুর্দিকে, মজহার খাঁ বগ্‌ডোর শ্রুত করিয়াছিলেন ঘোড়ার। কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে অশ্বপৃষ্ঠে। শুষ্ক রুটি ও ছোট মশকের পানি মাত্র আহার। বিহারের কাছে কোম্পানীর একদল সিপাহী তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল। মজহার খাঁ ভীৰু নন। পাঠানের সন্তান বুজ্‌দীল হয় না কোনদিন। অনেক সময় আত্মগোপন নিজেকে বিরাটরূপে বিকাশেরই প্রাথমিক উপায় মাত্র। মজহার খাঁ তাই সেদিন পনের জন অনুচরসহ বহু জনপদ ও দুর্গম পথে পাড়ি দিয়াছিলেন। বাংলা মুল্লুকে হয়ত বহুদিন কাটাইতে হইবে। বাংলার মুসলমানের সঙ্গে তাঁর অনেক বুঝাপড়া আছে।

অন্ধকার রাত্রি, শীতের হিম-হাওয়া পথে পথে বাজিয়া যায়। ঘোড়াগুলিকে ঘাস খাইতে দিয়া মজহার খাঁ ও তাঁর সঙ্গীরা রুটি সৈঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রতি কার্যে অসম্ভব রকম ক্ষিপ্ততা। আহার সমাপনান্তে মজহার খাঁ একবার ঘোড়ার উপর উঠিয়াছিলেন, আবার অবতরণ করিয়াছিলেন তখনই।

মজহার খাঁ বলিয়াছিলেন, “ভাইয়ো, ঠৈরকে, মাই আতা,” হাঁটু অবধি নাতিদীর্ঘ পাজামা পরিধানে, কোমরে তলোয়ার, বাম বাজুর দিকে গাদা-বন্দুক। মজহার খাঁ মহেশডাঙার অন্ধকারে একাকী ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

সঙ্গী দু-একজন অনুগমন করিতে চাহিল, তিনি বাধা দিলেন। “আসহাব, মাই খোদ জানে-ওয়ালা।”

মহেশডাঙার এইসব অঞ্চল তখন জনবিরল। মুসলমান পরিবার নিতান্ত নগণ্য। আলী মজহার খাঁকে অনিশ্চয়তা বোধ হয়। সেদিন দৈব কিছু সাহায্য করিয়াছিল নচেৎ আকস্মিকভাবে তিনি আরিফউদ্দীন মুনশী বাড়িতে প্রথমে পৌছিয়াছিলেন কিরূপে?

গ্রামে পশ্চিম-দেশীয় ব্যক্তি মাঝে মাঝে আসে। অগাধ রাত্রে মুনশী আরিফউদ্দিন দহলিজে আসিয়া বিস্মিত হইলেন। জনবিরল অঞ্চলে দস্যুর প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক। মুনশী সাহেব নবাব দপ্তরে বহুদিন কাজ করিয়াছেন। পাশী জবানেই মজহার খাঁর পরিচয় গ্রহণ শুরু হইয়াছিল। এক প্রহরের মধ্যে দুই বিদেশী মুসলমানে অন্তরঙ্গতা আরম্ভ হইয়াছিল। একজন যুবক আর একজন বৃদ্ধ। মুনশী সাহেবের যুবক-পুত্র শরিফউদ্দিন পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাত্রির মধ্যে আয়োজন চলিতেছে। কিসের আয়োজন?

মুনশী সাহেব বলিলেন, মেরা এহি এক ল্যাডাকা। ওয়াস্তে দীন-কে। খোদাকে রাহ পর।

বহুৎ আচ্ছা, আব্বাজান।

মজহার খাঁ আরিফ সাহেবকে পিতার মর্যদা দিয়াছিলেন। তিনি পাশী জবানে বলিয়াছিলেন, দেশের সূর্য আজ অস্তমিত। কুফর ইংরেজ আমাদের শাসক। মুসলমান আজ ভিখ-মাণ্ড। আমাদের ঈমান, আমাদের খোদার বেইজ্জতির শুরু হইয়াছে মাত্র। আজ তাই চাই আপনার মতো পিতা-ওয়ালেদ। কওমের সেবায় যিনি একমাত্র নয়নের মণিও উৎপাটিত করিয়া দিতে পারেন।

মজহার একটি ঘোড়া লইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। গভীর শীতাত

তমিস্রাময়ী রাজি ।

মুনশী সাহেব, শরিফউদ্দীন আর মজহার খাঁ আল্লার আকাশের নীচে দণ্ডায়মান । শরিফউদ্দীন মজহার খাঁ প্রদত্ত হাঁটু-ঢাকা পাজামা আর পিরহান পরিয়াছিলেন । পিতার চোখের দিকে বিদায়-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “আব্বাজান, এজাজাত (আদেশ দিন) ।”

“যাও বেটা, কওম-কে রাহ্ পর ।”

দুই অশ্বারোহী অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছিল । মুনশী আরিফউদ্দীন চাহিয়াছিলেন গভীর তিমিরস্পৃষ্ট পথ আর বনানীর দিকে ।

অশ্বখুরধ্বনি দূরে দূরে মিলাইতে লাগিল । মুনশী সাহেবের কর্ণে ভাসিয়া আসিল বজ্রকণ্ঠের আওয়াজ :

ওয়াস্তে দিন-কে লড়না পায়ে তময়ে বেলাদ

শরয়মে কহঁতে হেঁ ইসকো জঙ্গে জেহাদ ।*

এদেশে তখন ইংরেজের প্রতাপ ও আক্রমণ নানাদিকে প্রচণ্ডতর হইতেছে । তারই প্রতিক্রিয়ায় সুদূর কাবুল হইতে বাংলার গ্রাম-অভ্যন্তরে ওহাবী-আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতেছিল । সেই সময়কার কাহিনী । ওহাবী নেতারা বাংলার গ্রামে প্রভাবশালী মুসলমানদের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিতেছিল । মুনশী আরিফউদ্দীন এই বিষয়ে গোপনে সাহায্যরত ছিলেন ।

কয়েকদিন পর গভীর রাত্রে আবার তাঁহার ঘুম ভাঙিয়াছিল । শরিফউদ্দীনের সঙ্গে আরো বহু বাঙালি ওহাবী দহলিজে উপস্থিত । এইখানে সংবাদ পাওয়া গেল, কোম্পানী তাঁহাদের গতিবিধির গন্ধ পাইয়াছে । মজহার খাঁ জানিতেন, ক্যাপ্টেন হ্যারিংটন একটি ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া অঞ্চলে বাহির হইয়াছে ।

রাত্রির অন্ধকারে অশ্বারোহী পদাতিক প্রায় চল্লিশজন মজহার খাঁর নেতৃত্বে আবার চলিয়া গেল ।

সেইদিন মহেশডাঙার তিন মাইল উত্তরে হ্যারিংটনের সেনাবাহিনীর সহিত মজহার খাঁর সাক্ষাৎ ঘটিল ।

থ্র্যাভ ট্রান্স রোড এখানে সঙ্কীর্ণ । দু’পাশে খাদ আর জঙ্গল । অশ্বখুরধ্বনি শোনামাত্র আলী মজহার খাঁ সঙ্কেত দিয়াছিলেন । ঘোড়া হইতে অবতরণের পর তাহারা সকলেই খাদ পার হইয়া জঙ্গলে আত্মগোপন করিল । ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল ।

মজহার খাঁ কোন আক্রমণ এখন পছন্দ করেন না । সঙ্গীদের তিনি বলিয়াছিলেন, ছোটখাটো দল পাইলে তাহারা আক্রমণ করিবে; কেবল একযোগে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে তাহারা আক্রমণ শুরু করিবে । তৎপূর্বে নয় । এখন আক্রমণ অযথা শক্তিক্ষয় ।

চল্লিশজন ওহাবী-সৈন্য ঝোপের ভিতর আত্মগোপন করিয়া রহিল । ঘোড়াগুলি শিক্ষিত । সব চুপচাপ শায়িত । এই ঝোপেঝাড়ে মশকের দংশনে অতিষ্ঠ হইলেও সকলে নিস্তব্ধ ।

* ওহাবী যোদ্ধাদের সঙ্গীত : ধর্মের জন্য এই সংগ্রাম-দেশ শাসনের জন্য নয় । ধর্মগ্রন্থে ইহাই জেহাদ নামে কীর্তিত ।

আরো অশ্বখুরধ্বনি শোনা গেল।

মজহার খাঁ অস্পষ্ট কণ্ঠে শরিফউদ্দীনকে বলিতেছিলেন, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ওহাবী প্রেরিত হইয়াছে। সেখানে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়াছে। তাহার ফিরিয়া আসিলে তখন আক্রমণমূলক পন্থা আরম্ভ করা সমীচীন হইবে। এইজন্য কতগুলি ভালো ঘোড়া-সওয়ার কাসেদ বা দূত প্রয়োজন। দলের মধ্যে যারা আর্বী-পার্শী জানেন তাহাদেরই এই ভার দিতে হইবে। নচেৎ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা মুশকিল।

আলী মজহার খাঁ আবার উৎকর্ণ হইলেন। খুরধ্বনি যেন আরো নিকটবর্তী। আবার মজহার খাঁ বলিলেন, দলে দলে কাল হইতেই শরিফউদ্দীন যেন উর্দু-পার্শীর শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। বাঙালি ওহাবী-বন্ধুরা উর্দু বা পার্শী জানে না। আলাপ-আলোচনায় বড় অসুবিধা ঘটে। আর ভাষার জন্য মৈত্রীর বন্ধনও ঠিকমতো গড়িয়া ওঠে না।

অশ্বখুরধ্বনি নিকটবর্তী হইল। ফিকে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। মাত্র বারোজন গোরা সিপাহী। সম্মুখে একজন সামরিক সজ্জায় সুশোভিত ইংরেজ। বোধ হয়, ক্যাপ্টেন হ্যারিংটন। আলী মজহার খাঁর শ্যেনচক্ষু এড়াইয়া কিছুই যায় নাই।

মাত্র বারো জন। প্রত্যেকের নিকট বন্দুক আছে। মজহার খাঁ শরিফউদ্দীনকে বলিলেন, আজ এই সুযোগ তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের বন্দুক হাল-আমলের নয়, সংখ্যায় কম। এই কয়েকজনকে পরাস্ত করা খুব সহজ। সেইজন্য প্রথম কর্তব্য, শরিফউদ্দীন অন্য কোন পথে মহেশডাঙা পৌছিতে পারে কিনা।

শরিফউদ্দীন সম্মতি-সূচক সাই দিয়াছিলেন।

মজহার খাঁ বলিলেন, আর একটি পন্থা দয়াকর। দলের কয়েকজন ইহাদের অনুসরণ করিবে। একদল পূর্ব হইতে মহেশডাঙার এক মাইল দক্ষিণে গাছ কাটিয়া গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড অবরোধ করিয়া রাখিবে। কেহ যেন কোনরূপ পালাইয়া না যায়। একটি প্রাণী জীবিত থাকিলেও তাহাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। পূর্বে এরূপ আক্রমণ খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শরিফউদ্দীনের সঙ্গে একদল সুশিক্ষিত বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার খাদ পার হইয়া গ্রামের মেঠো পথ ধরিয়াছিল। মজহার খাঁ মাত্র তিনজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ ক্যাপ্টেন হ্যারিংটনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

শরিফউদ্দীনকে তিনি আক্রমণের পূর্বে একটি বংশীনিনাদের সঙ্কেত করিতে বলিয়াছিলেন।

আলী মজহার খাঁ খুব ধীরে ধীরে সতর্কতার সহিত ঘোড়া পরিচালনা করিতেছেন। বিন্দুমাত্র খুরধ্বনি দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

অনুচরবর্গ প্রত্যেকে সুদক্ষ ঘোড়-সওয়ার। তারাও আজ আরো সাবধানী।

সেই গভীর রাতে মুনশী আরিফউদ্দীন পুত্রকে কয়েকজন লোক ও কুঠার সংগ্রহ করিয়া দিয়া ইমারতের ছাদে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনিও আজ অন্তর্মিত। বৃদ্ধ। দেশের সৌভাগ্য-সূর্য অন্তর্মিত হইয়াছে। এই বেইজ্জতি তার সম্মুখে অসহনীয় ব্যাপার। তিনিও আজ নওজওয়ানের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন। শরীর সামর্থ্যহীন। নচেৎ তিনিও আজ জেহাদের মল্লভূমে গিয়া দাঁড়াইতেন।

আরো দুই প্রহর পরে মহেশভাঙার সন্নিকট গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোডের সড়কের উপর শোনা গেল বন্দুকের দুমদুম আওয়াজ। নিশীথিনীর পিঞ্জর ভেদ করিয়া অস্ত্রের আওয়াজ, আহতের গোঙানি দূরে ভাসিয়া যাইতেছিল। আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি শূন্যে ফরিয়াদের মতো বিলীন হইয়া গেল।

মজহার খাঁ ভুল করিয়াছিলেন। শত্রুর অল্প সংখ্যা দেখিয়া তিনি প্রভারিত হইয়াছিলেন। মহেশভাঙার আশেপাশে বহু গোরা সিপাহী মোতায়েন ছিল, তিনি জানিতেন না। সেদিন প্রবল শত্রুর আক্রমণের মুখে কাহারো তিষ্ঠানো সম্ভব ছিল না। যুদ্ধে ওহাবীরা কেহই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই।

বন্দুকের আওয়াজ বহুবার মুনশী আরিফউদ্দীনের কানে গিয়াছিল। তিনি শুধু নিশ্চিন্ত বজ্রাহত ব্যক্তির মতো দাঁড়াইয়াছিলেন। তখনই সংবাদ আসিবে— হয়তো কোন অমোঘ সংবাদ আসিবে— বৃদ্ধ বয়সে যা তাঁর সহনশীলতার আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে।

দুই ঘণ্টার মধ্যে আবার বনভূমি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ক্যাপ্টেন হ্যারিংটন লঠনের আলোয় চারিদিক পরীক্ষা করিতে লাগিল। হিন্দুস্থানী রণ-নীতি তার কলা-কৌশলের কাছে পৰ্যুদন্ত! এই বিজয়-গর্বে প্রায় চারিশত গোরা সিপাহী পরিবৃত্ত হইয়া হ্যারিংটন বলিল, জখমীদের এখানে ফাঁসি দেওয়া হউক। First lesson for the blackies. Exemplary punishment. কালো চামড়াদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ক্যাপ্টেন চলিয়া গেল।

পরদিন গ্রামবাসীরা আসিয়া দেখিল, পাঁচজন ওহাবী শহীদ হইয়াছেন। পনের জন গাছে ফাঁসি লট্কানো অবস্থায় ঝুলিতেছে।

সকলের আগে এই পথে আসিয়াছিলেন মুনশী আরিফউদ্দীন। সড়কের মুখে পড়িয়াছিল তাঁর পুত্র। মুখের উপর দিয়া গুলি চলিয়া গিয়াছে। আজ তাঁর পুত্র বলিয়া কেহ শনাক্ত করিতে পারিবে না। তিনি শুধু চেনেন ওই হাত, ওই মুখ। শরিফউদ্দীনের মাতা পনের বছর আগে এতেকাল করিয়াছিলেন। নিজ হাতে এই নয়নের মণি তিনি লালন করিয়াছিলেন। বুকের উপর কালো দাগেই শরিফউদ্দীনকে চেনা যায়। বৃদ্ধ কোন আহাজারী করেন নাই। শুধু ভাবিয়াছিলেন সালেমার কথা। সালেমা তাঁর কন্যা। ষোড়শী, যুবতী, অবিবাহিতা। সে কিরূপে ভ্রাতার এই সংবাদ গ্রহণ করিবে।

সকালে গ্রামবাসীদের সাহায্যে ফাঁসি লট্কানো শহীদদের নীচে নামানো হইল। ইহারা সকলেই সামান্য আঘাত পাইয়াছিল মাত্র। কাহারো পায়ে বুলেটের দাগ। কাহারো হাতে। জীবনের সমস্ত আশাই ইহাদের ছিল। সামান্য চিকিৎসায় ফিরিয়া পাওয়া যাইত। ক্যাপ্টেন হ্যারিংটনের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই প্রণালীর কথা মুনশী আরিফউদ্দীন জানিতেন না।

একই কবরে পনের জন শহীদকে দাফন করা হইল। সালেমা ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিল না। আরিফউদ্দীন সাহেব কন্যাকে বলিয়াছিলেন, শরুফ কাবুলে চলিয়া গিয়াছে। সেইদিন রাতে তিনি আবার গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হইয়া শহীদগণের কবর-গাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অশ্রু তখন কোন বাধা মানে নাই। মূর্ছিত হইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়াছিলেন তিনি এই কবর-গাছে। চেতনা পাইয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সালেমা ভাই-জানের খবর জিজ্ঞাসা করিয়া সদুত্তরই পাইয়াছিল পরদিন।

আরো চারদিন পর আসিলেন মজহার খাঁ। তেমনই গভীর রাত্রি।

“আব্বাজান”, ডাক দিয়াছিলেন মজহার খাঁ।

মুনশী আরিফউদ্দীন দহলিজের দুয়ারে পা দেওয়া মাত্র মজহার খাঁ তার পা জড়াইয়া কাঁদিয়াছিলেন: “আব্বাজান, মাফি মাংতে হেই। আব্বাজান—।”

পাঠান-যুবকের চোখেও সেই রাত্রি অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল।

সিপাহী দল গ্রাম তোলপাড় করিয়া গিয়াছে। এই গাঁয়ের কোন লোক এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। মুনশী সাহেবের পুত্র কেবল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, কোথায়, কেহ জানে না।

আর দহলিজে নয়। মুনশী সাহেব আলী খাঁকে একদম লইয়া গেলেন অন্দর মহলে। যে-কোন সময় সিপাহী আসিতে পারে। মুনশী সাহেবের অশ্রু-প্লাবিত নেত্র। ধরা-কণ্ঠে মজহার খাঁ বলিয়াছিলেন, “আব্বা মাই আপক্যা ল্যাড়কা।”

বৃদ্ধ সেদিন চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন এই পাঠান-যুবকের মুখ। শরিফউদ্দীনকেই যেন চুম্বন করিতেছিলেন তিনি।

মজহার খাঁ এইখানে বহুদিন আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

আরিফউদ্দীন সহেব দু’মাস পরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “বেটা, খুনকা পেয়াস আওর নেহি।”

“মেরা আস্‌হাব, কওমকে ভাইয়ুঁকা খুনকা। বদলা মেরা ভাই শরিফউদ্দীন—”

“নেহি, বেটা। আওর খুনকা পেয়াস নেহি।”

আর রক্ত তৃষ্ণা নয়? রক্তের পিপাসা কি মিটিয়া গিয়াছে?

ছয় মাস পরে গভীর রাতে সালেমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। নওশা আলী মজহার খাঁ। কাজী স্বয়ং আরিফউদ্দীন সাহেব। প্রতিবেশীরা বহুদিন পরে এই বিবাহের সংবাদ পাইয়াছিল।

আলী মজহার খাঁর বুক ভরিয়াছিল দিগন্তের তৃষ্ণা। কুফর শাসক-পীড়িত হিন্দুস্থানের মজলুম ভাই আর বোনের মুখ ছিল তাঁহার চলা-পথের দীপালোক। একটি হৃদয়ের আত্মানে কি সেই তৃষ্ণা মিটিয়া গেল? একটি নারীর কাঁকনের কনকন ধ্বনির স্রোতে কি জিন্দানের সহস্র কোটি জিজ্ঞিরের আওয়াজ স্তব্ধ করিয়া দিল?

নীড়ের বন্ধন স্বীকার করলেও আলী মজহার খাঁর দিগন্তের পিপাসা কোনদিন নিবৃত্ত হয় নাই। সে অন্য কাহিনী। ইংরেজ সিপাহীর সঙ্গে আবার তাঁহার মোকাবিলা ঘটে। শহীদি কবর-গাহেই তাঁর শেষ সমাধি খোদিত হইয়াছিল।

আলী মজহার খাঁর অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ আলী আম্‌জাদ খাঁ বাছুর খুঁজিতে আসিয়া শহীদি কবর-গাহের সম্মুখে হঠাৎ দাঁড়াইল। আনমনা সে এই পথে চলিয়া আসিয়াছে।

চারদিকে আগাছা আর খেজুরের জঙ্গল। আলী মজহার খাঁ এইখানে শুইয়া আছেন। তারই পূর্বপুরুষ। রক্তে ছিল যার সিংহের বিক্রম, বুলেটের আঘাতে তাঁর শহীদ রুহ, এইখানে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। আলী আম্‌জাদ খাঁ তা জানে না। আলী মজহার খাঁর রুহ কোনদিন মাগফেরাত প্রার্থী নয়। গিধড় অধঃস্তন বংশধরদের ধিক্কার ও অভিশাপ দেওয়ার জন্য অন্তত তাঁর মাগফেরাতের কোন প্রয়োজন হইবে না।

প্রহর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ।

উঠানের উপরে রান্নাঘর। উপরে কোন খড়ের ছাউনি নাই। কয়েকটি বাঁশের খুঁটি ও কঞ্চির ছায়া-রেখা আগুনের বলকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। আরো একটি রান্নাঘর আছে উঠানের দক্ষিণে। গ্রীষ্মের দিনে কুঁড়েঘরের ভিতর রান্নার কাজ কষ্ট-কর। আজহার খা তাই দরিয়াবিবির জন্য উঠানের উপর চালহীন রান্নাঘর তৈরি করিয়াছিল। কয়েকদিন আগেকার ঝড়ে তালপাতা উড়িয়া গিয়াছে। শুধু চালার ফ্রেমটি এখন অবশিষ্ট।

দরিয়াবিবি চুলায় জ্বাল দিতেছিল। হাঁড়ির ভিতর চিড়চিড় শব্দ ওঠে। দমকা বাতাসে আগুনের হলুকা বাহির হইয়া আসে। দরিয়াবিবির মুখ দেখা যায়। কপালের চারিপাশ ঘামিয়া উঠিয়াছে।

আমজাদ মা'র পাশে বসিয়া রান্না দেখিতেছিল। অন্যদিকে ঝড় কুঁচকাইতেছিল আজহার খা।

আমজাদ।

কি আঝা?

এক আঁটি ঝড় বঁটির মুখে রাখিয়া আজহার একবার কপালের ঘাম মুছিবার চেষ্টা করিল।

অনেক দূর ঝুঁজেছি, আঝা। ভারী বজ্জাত, গাইও তেমনি। বাছুর হারায়।

কঞ্চির ঝড়ির ভিতর আজহার কুঁচকাইতে ঝড় রাখিতেছিল। প্রায় পূর্ণ ঝড়টি দমকা বাতাসে হঠাৎ আড় হইয়া গেল। কুঁচকাইতে হাওয়ায় উড়িতে থাকে। আজহার বঁটি ছাড়িয়া বলে, আমু, ধর বাবা ধর—।

আমজাদের কচি মুঠি নাগাল পায় না। দরিয়াবিবি স্বামীর সাহায্যে অগ্রসর হয়। তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। দোহারা বাঁধন শরীরের। গোলগাল মুখটি গাঙ্গীর্যে টাইটমুর।

আমজাদ কুঁচকাইতে পিছনে এদিক-ওদিক দৌড়ায়।

ঐ দ্যাখো আঝা, উড়ে যাচ্ছে।

ঝড়কুটো বাতাসের বেগে উপরে উঠতে থাকে।

দরিয়াবিবি ভারী শান্ত হইয়া বলে, কি ছিঁরি, তোমার কাজের।

দরিয়াবিবি স্বামীর দিকে তাকায়।

আজহার শান্তকণ্ঠে জবাব দিল : আচমকা হয়ে গেল। আর কোনদিন এমনটা হয়েছে? বাতাসে দরিয়াবিবির চুল এলোমেলো, হঠাৎ এক মুঠো ঝড় হাতে সে ডাকে, আমু, এদিকে আয় ত বাবা, আমার চোখে কি পড়েছে দ্যাখ।

দরিয়াবিবি ততক্ষণ বসিয়া পড়িয়াছে। আমজাদ মা'র কাছে ছুটিয়া যায়।

এই ঝড়গুলো ঝড়ির ভিতর রেখে আয়।

আমজাদ এক মিনিটে মা'র আদেশ পালন করিল।

ভারী কর্কর্ করছে চোখটা।

দরিয়াবিবি কাপড়ের খুঁটে মুখের ভাপ দিতে থাকে।

ভালো হলো, মা?

দাঁড়া, বাবা, খামোখা বকাস্নি।

আমজাদ ফালি লুঙি পরিয়াছিল। মা'র দেখাদেখি সে-ও লুঙির খোঁট মুখের ভিতর ঢুকায়।

তরকারিটা বুঝি পুড়ে গেল!

দরিয়াবিবি এবার লাফ দিয়া চুলার কাছে পৌঁছাইল।

আমু, একটু পানি দে, বাবা।

আমজাদের সাহায্য চাওয়া বাতুলতা।

দরিয়াবিবি দৌড়িয়া ঘরের দিকে ছোটে। কলস ত সেখানেই।

এক মালসা পানি হাঁড়ির মধ্যে ঢালিতে ঢালিতে বলে, বাপবেটায় এক হুজুগ নিয়ে এলো। চোখটা এখনও কর্কর্ করছে।

আজহার একটি খড়ের বিড়ার উপর বসিয়াছিল। হাতে নারকেলী হুঁকা।

দরিয়াবিবি, চুলোতে আগুন পড়েছে?

চুলোর মুখে বসিয়া দরিয়াবিবি এলোচুল বিন্যস্ত করিতেছিল।

আগুন পড়বে না? কত সিঁদরে কাঠ জ্বালাচ্ছি।

আজহার দরিয়াবিবির দিকে তাকায়। তার ফর্সা রং মুখে এখনও শান্তির ছায়া আঁকা। স্বামীর উৎসাহ নিভিয়া আসে। কল্কেটা আজহার খামোখা মাটির উপর ঘুরাইতে থাকে। তুমি জানো, পাতার আগুন। এতে আগুনের ভালো আগুন পড়ে? কাঠ-পোড়ানো নসীবে লিখেছে আদ্বা?

ঐ আগুন-ই দাও।

তা দিচ্ছি। পাতা ঝেঁটোনোরও হাঙ্গামা কত। ও-পাড়ার সাকেরের মা বলে, আমাদের গাছের পাতা আর ঝেঁটিয়ে না, খাঁয়ের বৌ। (পরে ঈষৎ থামিয়া) খড় সব বেঁচে দিলে?

আজহার ভারী তামাক খায়। তার নেশা চটার উপক্রম, আর ধৈর্য্য থাকে না, নিজেই কলকে হাতে দরিয়াবিবির সম্মুখে দাঁড়াইল।

খড় না বেচলে, খাজনা দেওয়া হলো কোথা থেকে?

বেশ, ভালোই করেছ। থাকলে গরু-বাহুর খেয়ে বাঁচত। পোয়ালটা পুড়ানো চলত। যা জ্বালানির কষ্ট।

স্বামীর দিকে চাহিয়া দরিয়াবিবি ঘোমটা টানে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। নিঃশব্দেই সে আজহারের হাত হইতে কলকে গ্রহণ করিল।

বাবা আমু, একটা খাপ্রা নিয়ে এসো।

আজহার জিজ্ঞাসা করে, খাপ্রা কি হবে?

ভারী মোলায়েম কণ্ঠ এবার দরিয়াবিবির। — বাতাসে ফিংকি ছুটলে আর রঞ্জে আছে! আগুন লেগে যাবে।

সাবধানে কলকের মুখে আগুন দেয়ার পর দরিয়াবিবি খাপ্রাটা উপরে চাপ দিয়া

বসাইল।

যা দমকা বাতাস, গাছের পাতাপুতি আর ওসুল হবে না। চুলোর হাস্যামা পোয়াতেই অস্থির।

ফুড়ুক-ফুড়ুক শব্দ হয়। চক্ষু বুজিয়া আজহার হুঁকা টানে।

দরিয়া-বৌ, পুকের-পাড়ে কটা গাছ আছে, কাটালে হয় না? কয়েক মাসের জ্বালানোর জন্যে আর ভাবতে হয় না।

না, ওসব কাটলে, তারপর? কোন কাজকর্ম নেই আর? ছেলেদের বিয়ে-শাদী নেই? আমজাদ মা'র পাশে বসিয়াছিল। সে বলে, কার বিয়ে হবে, মা?

আমার। বলিয়া দরিয়াবিবি মৃদু হাসে। গম্ভীর মুখাবয়বে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলিয়া যায়।

পরে সে আজহারের দিকে চাহিয়া বলে, ছেলেটা কোন কথা বলতে দেবে না। ঘরকন্নার কথার সময় কিছু ভালো লাগে না।

তোর আক্বার বিয়ে হবে, আমু।

আজহার নিঃশব্দে তামাক খায়। কয়েক বিঘা জমি। সে আজ নিজেই হাল করিয়াছে। দরিয়াবিবির কথা তার কাছে পৌছায় না। তন্দ্রায় নেশা জমিতেছিল তার তামাকের ধোঁয়ায়।

সুগোষ্ঠিতের মতো সে বলে, কার বিয়ে দিচ্ছ?

তোমার, আমার, গোটা গাঁয়ের।

দরিয়াবিবি হাসে। আজহার তার মুখের দিকে একবার তাকাইল মাত্র। আবার গুড়ুক টানার শব্দ হয় উঠানে। আজহার খাঁ স্বভাবতই নিরীহ। দৈনন্দিনতার সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু তাকে সহজে স্পর্শ করে না।

দরিয়াবিবি পার্শ্বে উপবিষ্ট পুত্রকে বলে, তোর বাবাকে ডাক। জেগে আছে ত? বাবাজী।

আজহার জবাব দেয়, কী আমু?

দরিয়াবিবি স্বামীকে অনুরোধ করে, এখনি রান্না শেষ হবে। আমুর সাথে গল্প করো।

মা!

কিরে!

দ্যাখ না গোয়াল ঘরে, বাছুরটা এসেছে ত!

ভারী মনে করি দিলি, বাপধন! ওগো বাছুরটা দেখো না।

আজহার খাঁ বাছুরের জন্য কোন সন্দেহ প্রকাশ করে না।

দেখো, কাল সকালে ঠিক আসবে।

আমজাদ দরিয়াবিবিকে চুপিচুপি বলে, এখন গোয়ালে দেখে আসতে বলো না।

এখন যাও না একবার গোয়াল-ডাঙায়।

থাক আজ।

সাদা বাছুর। আমজাদের ভারী প্রিয়। মার কাছে ফরিয়াদের আর অন্য কোন কারণ নাই।

মা, বাছুরটাকে যদি শেয়ালে ধরে।

অত বড় বাছুর আবার শেয়ালে ছুঁতে পারে? আজহার খাঁ আবার সন্দেহ প্রকাশ করে।
আজকালের শেয়াল।

আজকালের শেয়াল ত একবার যাও না। কৃত্রিম রাগান্বিত হয় দরিয়াবিবি।

আমু, বাছুর খুঁজতে তুমি কতদূর গিয়েছিলে?

মাঠের দিকে গিয়ে কত ডাকলুম। কবরস্থানের কাছে—

দরিয়াবিবি একটি হাঁড়ি নামাইয়া রান্নাঘরের দিকে গেল। উঠানের পশ্চিম দিকে দু'খানি খড়ো ঘর। ছিটে-বেড়ার তৈরি। শোয়া-বসা চলে দুই ঘরে। পাশে রান্নাঘর।

হাঁড়িকুড়ি তৈজসপত্র এইখানে থাকে।

রান্নাঘরে হাঁড়ি রাখিয়া দরিয়াবিবি ফিরিয়া আসিল।

তুই গিয়েছিলি পুরানো কবরস্থানের দিকে?

শহীদি কবর-গাহের নাম পুরাতন কবরস্থান। হাল-আমলের অন্য গোরস্থান আছে।

বারবার মানা করব, আমার কথা ত শুনবি নে।

আমার ভয় লাগেনি ত, মা।

নেই লাগুক। দাঁড়া, একটু বড়পীরের পানি-পড়া আনি। দরিয়াবিবি একটি বোতল ও মাটির পেয়ালা সঙ্গে আনল।

আজহার খাঁ অন্ধকারে বিমাইতেছিল। শরীর খুব ভালো নয় তার। এতক্ষণ সে মাতাপুত্রের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখে নাই।

কি আনলে, দরিয়া-বৌ। এসব কী?

বড়পীরের পানি-পড়া, একটু ছেলেটাকে খাওয়াব।

আজহার খাঁ তীরবেগে ছুটিয়া আসিল তাহাদের নিকট।

কর কী, দরিয়া-বৌ।

কেন কী হয়েছে?

এসব কী! পানি-পড়া খাওয়াচ্ছ? ওহাবীর ঘরে এসব বেদাৎ। লোকে কী বলবে?

দরিয়াবিবি বাজখাঁই গলায় বলে, বসো। তোমার বেদাৎ (শাস্ত্রনিষিদ্ধ) তোমার কাছে থাক্।

ভালো কথা নয়, দরিয়া-বৌ।

আজহার শাস্ত স্বরেই জবাব দিল।

এসব নিয়ে কেন গোলমাল বাধাও? ছেলেদের রোগ-দেড়ী আছে। আমি খাচ্ছি নাকি?

দরিয়াবিবির হাতের কামাই নাই। পেয়ালার পানিতে এতক্ষণ আমজাদের কণ্ঠ ভিজিয়া গেল।

আজহার খাঁ সাধারণত বেশি কথা বলে না। সে গুম হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

দরিয়াবিবির উপর কোন কথা চলে না।

আজহার আবার হুঁকা হাতে নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল।

দরিয়াবিবি অনুভব করে, স্বামী রাগান্বিত। পরিবেশ আবার স্বাভাবিক করা দরকার। আমজাদকে বলে, তোর আন্নার কাছে গিয়ে একটু গল্প কর। চুলোর আঁচটা দেখি।

আমজাদ ইতস্তত করে।

গুড়ক টানার আওয়াজ হইতেছিল। আজহার খাঁ নিস্তব্ধ। আমজাদ পিতার নিকট গিয়া ধুলার উপর বসিল।

আজহার খাঁ এইবার কথা বলে, ধুলোয় বসলি আমু? আয়, আমার কোলে বস।

দরিয়াবিবি চুলোর নিকট হইতে জবাব দেয় : আমিও যাব নাকি?

এসো না আম্মা।

আজহার খাঁ পুত্রকে কোলে বসাইয়া গুড়ক টানে।

থাক বাবা, আমার গিয়ে দরকার নেই।

আজহার খাঁ দেখিতে পাইল, দরিয়াবিবি তরকারির নুন চাখিবার জন্য হাতের তালু পাতিয়াছে। মুখে পুঞ্জ হাসি রেখায়িত।

চুলার আগুন নিভিয়া আসিতেছে। রান্না প্রায় শেষ। দরিয়াবিবির মুখ আর চোখে পড়ে না। কানে তার হাসি ভাসিয়া আসে।

সারাদিন খেটেপুটে সবাই। চুপচাপ সবাই। দুঃখ ত চিরকাল। ছেলেটাকে নিয়ে একটু গল্প করো না।

আজহার খাঁ মাঝে মাঝে অতীতের বংশ-কাহিনীর কথকতায় মগ্ন হয়। সব দিন নয়। আজ সে কোন জবাবই দিল না। নিঃশব্দে তামাক সেবন করিতেছিল, তার কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

সারা উঠানময় নিস্তব্ধতা। পুত্র পিতার কোলে আসীন। মা হাঁড়ি লইয়া ব্যস্ত।

চুলা প্রায় নিভিয়া গিয়াছিল। সামান্য কুজি বাকি আছে। দরিয়াবিবি আবার একরাশ পাতা আনিয়া চুলার মুখে জড়ো করিল।

অশথের কাঁচা পাতা সহজে ধরেনি। ধোঁয়ায় উঠান ভরিয়া গেল। বাঁশের চোঙা দিয়া দরিয়াবিবি ফুঁ দিতে থাকে। একটু পরে চুলা জ্বলিতে লাগিল। পাছে আবার নিভিয়া যায়, নিঃশব্দ হওয়ার জন্য দরিয়াবিবি আরো পাতাপুতি গুঁজিয়া দিল। দাউদাউ শিখা আবার উঠানের চারিদিকে তার আলো ছড়ায়।

প্রাঙ্গণের উপর একটা অতর্কিত ছায়া পড়িল। ছায়ার কায়া দেখা গেল কয়েক মুহূর্ত পর। একটা তিন বছরের উলঙ্গ মেয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চোখে পিঁচুটিভরা। সে ভালোরূপে চোখ মেলিতে পারিতেছে না। অভ্যাসের সাহায্যে চেনা উঠানের খবরদারী করিতে বাহির হইয়াছে যেন।

তার উপর প্রথম দৃষ্টি পড়িল আজহার খাঁর।

আয় মা, আয়। এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

সকলের নজর পড়ে মেয়েটির উপর।

আমজাদ চীৎকার করে : ঐ ভূত-বুড়ি এসেছে।

দরিয়াবিবি পিছন ফিরিয়া হাসিয়া উঠিল : বুড়ি, এতক্ষণে ঘুম ভাঙল?

আজহার খাঁ ডাকে, নঈমা এদিকে আয়।

দরিয়াবিবির ছোট মেয়ে নঈমা। সন্ধ্যার সময় কাজের ঝামেলা থাকে। বড় বিরক্ত করে তখন সে। কান্না জুড়িয়া দেয় রীতিমতো। আজ বিকালে তাকে ঘুম পাড়াইয়াছিল

দরিয়াবিবি নিজে ।

নঈমা আজহার খাঁর নিকট গেল না । সোজাসুজি মা'র নিকট আসিয়া দাঁড়াইল ।

একটু দাঁড়া, মা ।

দরিয়াবিবি একটি হাঁড়ি চুলার উপর হইতে নামাইয়া নঈমাকে কেলে বসাইল, আঁচলের খুঁট দিয়া চোখের পিঁচুটি মুছাইয়া দিল ।

কোন কথা বলে না নঈমা । হাই উঠে তার ঘুম যেন গা-মত হয় নাই ।

কি রে, আরো ঘুমোবি, মা?

নঈমা কথা বলে না । মা'র বৃকে মুখ গুঁজিয়া সে আরাম পায় ।

আর একটু সবুর কর, মা! তারপর তোর আব্বাকে ভাত দেব, তোর আমু-ভাই খাবে, তুই খাবি ।

ভাতের কথায় নঈমা উস্খুস্ করে মা'র কোলে ।

এশার নামাজ তবে পড়ে এসো । আর দেরী করে লাভ নেই, নঈমার চোখে এখনও নিদ রয়েছে ।

আজহার খাঁকে লক্ষ্য করিয়া দরিয়াবিবির উচ্চারণ ।

স্বামী জবাব দিল, এদিকে আমুরও ঘুম পেয়েছে । আমার কোলে শুয়ে বেশ নাক ডাকাচ্ছে ।

বিড়ার উপর বসিয়া আমু ঢুলিতে থাকে । দুই চোখ ভরিয়া গোটা রাজ্যের ঘুম আসিয়াছে ।

দরিয়াবিবি এক বদনা পানি আনিয়া দিল ।

এক কাজ করো না, ওজু করতে একটু ডান ধারে সরে যাও । কতগুলো ছাঁচি কদুর বীজ পুঁতেছিলাম, কড়ে আঙুলটাক-পাঁছ বেরিয়েছে । পানি ত রোজ দিই । আজ একটু ওজুর পানি পড়ুক । আর হজুরের কদম-ধোওয়া পানি ।

আজহার খাঁ কোন কথা না বলিয়া উঠানের দক্ষিণ দিকে ওজু করিতে বসিল । দরিয়াবিবির এত হাসি তার ভালো লাগে না ।

রান্না শেষ । চুলার ভিতর পাতার আগুন । দরিয়াবিবি একটা হাঁড়ি চুলার মুখে বসাইয়া দিল, পাছে বাতাস ঢোকে । রাত্রির মতো দরিয়াবিবির কাজ চুকিয়াছে ।

আর এক লোটা পানি আনিল সে । আমু খোঁয়ারে ঢুলিতেছিল । তার মুখে পানির ছিটা দিয়া দরিয়াবিবি বলিল, একটু হুঁস কর বাবা, আর দেরী নেই । আজ ত একটু পড়তেও বসলি নে ।

নঈমা তখনও খুঁতখুঁত করিতেছে ।

একটু সবুর কর মা । ঘাট থেকে মুখে-হাতে পানি দিয়ে আসি ।

আজহার খাঁর নামাজ-পড়া শেষ হইয়াছিল । নামাজের ছেঁড়া পাটি গুটাইতে লাগিল সে ।

অন্ধকারে নামাজ-পড়া ভালো দেখায় না । দরিয়াবিবি আগেই একটি টিনের ডিপা জুলিয়াছিল চুলার নিকট । নামাজের পাটির দুর্দশা আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় ।

দরিয়াবিবি বলে, নূতন নামাজের পাটি আর কেনা হল না? সব কাজেই খোদাকে

ফাঁকি।

হলো কই! মেলায় গেলাম। একটা পাটি দেড় টাকা চায়।

দরিয়াবিবির তর্ক শেষ হইয়া যায়। তবু সহজে সে দমে না।

হেঁড়া পাটি। সেজদায় যাওয়ার সময় মাথায় ধুলো লাগুক। কপাল ক্ষণে দেখলে লোকে বলবে, খুব পরহেজগার (ধার্মিক)!

পাটি গুটানো শেষ করিয়া আজহার খাঁ মুখ খোলে, আল্লাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে আজহার খাঁ নামাজ পড়ে না। আমার পর-দাদা আলী আসজাদ খাঁর নাম সবাই জানে। সেই বংশের ছেলে আমি।

পর-দাদা লেখা-পড়া জানা মৌলবী মানুষ। আমার আর লেখাপড়ার দরকার আছে? দরিয়াবিবি টিপ্পনী কাটিল।

আজহার খাঁ বংশের খোঁটা সহ্য করিতে পারে না। নিরীহ ভালো মানুষটি থাকে না তখন আজহার খাঁ। আপাতত চুপ করিয়া গেল সে।

তুমিও ত ঐ পাটিতে নামাজ পড়ো! তোমারও পরহেজগার হওয়ার সখ আছে।

তা আছে বৈকি! তোমাদের পায়ের তলায় আমাদের বেহেশত। তুমি যদি ঐ পাটি ব্যবহার করো, আমার জন্য বুঝি তা খুব দোষের ব্যাপার?

আজহার খাঁ এই মুহূর্তের জন্য অন্ততঃ উম্মা প্রকাশ করে।

আর কোন জিনিস চেয়ো না। পাটি একটা, যত্নসামাই হোক কিনে আনব।

অত রাগের কাজ নেই। নামাজের পাটিতে কপাল ক্ষয়ে গেল, একটা পাটি কেনার আওকাত (সঙ্গতি) আল্লা দিল কৈ?

আজহার খাঁ চুপ করিয়া থাকে। দরিয়াবিবির কথা তাহার বুকের ভিতর তোলপাড় তুলে। এমন নাফরমান (অবাধ্য) ব্যক্তি সাজিতেছে সে দিন-দিন। তৌবাতগুণের পড়িল আজহার খাঁ তিনবার। তারপর গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছেলেদের দিকে দেখো, আমি ঘাট থেকে আসি।

দরিয়াবিবি চলিয়া গেল। সারাদিনের পর অবকাশ মিলিয়াছে। চৈত্রের বাতাস বহিতেছিল ঝিরিঝিরি। বাস্তুর নীচে আগাছা-জঙ্গলে নামহীন কুসুম ফুটিয়াছে কোথাও।

খুব তাড়াতাড়ি দরিয়াবিবি পুকুরঘাট হইতে ফিরিয়া আসিল।

আজহার ছেলেদের লইয়া উঠানে বসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করে সে, এত তাড়াতাড়ি এলে?

দরিয়াবিবির অবয়বে ব্যস্ততার ছাপ।

বকরীটার বাচ্চা হবে বোধ হয়। ভারী ভ্যাবাচ্ছে, রাত বেশি হয় নি। ঘরে এনে— না, না দেবী আছে।

আশঙ্কিত দরিয়াবিবি বলে, না, থেকে-থেকে ভারী ভ্যাবাচ্ছে। রাত্রে যদি বাচ্চা হয়, যা দুঁদে বাছুর রয়েছে, লাথিয়ে মেরে ফেলবে কচি বাচ্চা।

বাড়ি-সংলগ্ন ছোট উদ্যান। তারপর পুকুর আর পুকুর-ঘাট। পশ্চিম-উত্তর কোণে গোয়াল-ঘর। গরু-বাছুর-ছাগল একই জায়গায় রাখা হয়। পাড়ের দু'পাশে বুনো ঘাস। সাপের আড্ডা। আজহার খাঁর তাই কাজের কোন চাড় ছিল না।

দরিয়াবিবি বাক্যালাপ না করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। ব্যাঞ্জনাদি পেয়ালায় পরিবেশনের সময় সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ছাগলের ডাক ঘন ঘন শোনা যাইতেছে।

এবার ছেলেদের নিয়ে এসো।

ডাক দিল দরিয়াবিবি। কণ্ঠস্বরে ক্রোধ চাপা রহিয়াছে।

নঈমা নিজের হাতে খায় না। দরিয়াবিবি সকলের খাবার দেওয়ার পর তাকে কোলে তুলিয়া লইল। তার ঘুম যেন সম্পূর্ণ ভাঙে নাই। মা'র আঙুলের অন্ন সে নিঃশব্দে খাইতে লাগিল।

দরিয়াবিবির কান সদা-সর্বদা খাড়া রহিয়াছে। ছাগলের চীৎকার মুহূর্তে শোনা যায়। অভাব-হোঁওয়া সংসারে এই মূক পশুরাই তাহাদের সম্বল। গত বছর গোয়াল-ঘরে ছাগলের বাচ্চা হইয়াছিল। দু'টিই গরুর গুঁতোয় মরিয়া যায়। তার পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। সেই ছানা দু'টি থাকিলে এই বছর চড়া দামে বিক্রি হইত। ব্যাপারীরা সেদিনও খোঁজ লইয়াছিল।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলেও দরিয়াবিবির অবসর অত সহজে আসে না। আকাশে মেঘ জমিয়াছে। ভোর রাত্রে যদি বৃষ্টি নামে! উঠানের পশ্চিম কোণে ঘুঁটে মেলা আছে। আজ ভিজিয়া গেলে কাল আর চুলা জুলিবে না! গাছের ঝরাপাতা লইয়া পাড়ায় মেয়েদের কোন্দল বাঁধে। দরিয়াবিবি ঝোড়ায় ঘুঁটেগুলি তুলিবার জন্য ছুটিয়া গেল। হাত-পা ধুইয়া আসিয়াছিল, আবার ঘুঁটে ছুঁইতে হইল। দরিয়াবিবি সহজে পরিশ্রান্ত হয় না। তবু আজ খারাপ লাগে তার।

আমজাদ মা'র কাছে শোয় না। তার আসন অন্য ঘরে। আজহার খাঁর দূর সম্পর্কীয় এক বুড়ি খালা আছে। আসেক্‌জান। সে মেয়ে ভালো দেখে না, শ্রবণ-শক্তিহীন। তার আর কোনো আশ্রয় নাই। এখানেই ক্রমশঃ মাথা গুঁজিয়া থাকে। ঈদ, মোহররম ও অন্যান্য পর্বের সময় গ্রামের অবস্থাপন্ন মুসলমানেরা খয়রাৎ করে, জাকাৎ দেয়— তারই আয়ে কোন রকমে দিন চলে। সন্ধ্যার পূর্বেই সে ঘরে ঢুকে আর বাহির হয় না। খাওয়ারও কোনো হাঙ্গামা নাই তার। আমজাদ তার পাশে ঘুপটি মরিয়া শুইয়া থাকে। বড় পাতলা ঘুম আসেক্‌জানের। দৃষ্টিশক্তি অল্প বলিয়া আমজাদের খবরদারি সে করিতে পারে না। দরিয়াবিবি তাই অনেক রাত্রে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসে। কামরার সংলগ্ন ছিটে-বেড়ার ঘর। মাঝখানে একটি বাঁশের চোরা-টাটি আছে। যাতায়াতের কোনো অসুবিধা নাই। আমজাদের শোয়া খারাপ। গড়াইতে গড়াইতে হয়ত ধূলোর উপর শুইয়া থাকে। ডিপা হাতে আজও দরিয়াবিবি আমজাদকে দেখিতে আসিল। না, সুবোধের মত সে ঘুমাইতেছে।

পা-তালির শব্দে আসেক্‌জানের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল।

কে, আজহার?

না, আমি দরিয়া, খালা।

এত রাত্রে কেন, বৌ!

এমনি এলাম।

সারাদিন কাজ। যা, ঘুমো গে, বাছা।

আচ্ছা, যাই।

আসেক্‌জান আবার সাড়া দেয় : বৌ, এলে যখন একটু পানি দাও না, মা। বুড়ো

মানুষ আধারে হাতড়ে মরব।

আসলে আসেকজানের খুব কষ্ট হয় না অন্ধকারে। দুই ঘরে ডিপা জ্বালানোর কেরোসিন-ব্যয় এই সংসারের পক্ষে দুঃসাধ্য। আসেকজান পীড়াপীড়ি করে না। সব তার অভ্যাসের কাছে পোষ মানিয়েছে। আধারে আধারে সে পুকুর-ঘাট পর্যন্ত যাইতে পারে।

দরিয়াবিবি কলসের পানি ঢালিয়া দিল।

বৌমা, কাল একটু ও-পাড়া যাব। কেউ যদি একটা কাপড় দেয়। সেই আর বছর ঈদে কখন মোস্লেম মুনশী একখানা দিয়েছিল। আল্লা তার ভাল করুক।

দরিয়াবিবি মাঝে মাঝে ভারী কঠিন হয় বুড়ির উপর। এত রাত্রে আর গল্পের সময় নাই। দরিয়াবিবির অন্তর্দানে আবার ঘরটি অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। শব্দের ভারসাম্য রাখিতে পারে না আসেকজান, নিজে বধির বলিয়া। সে চোচাইয়া বলিতে থাকে, মড়ার দিন-কাল কী হলো? একটা একটাকা পাঁচসিকের কাপড়ও লোকের সতোয় ওঠে না। আখেরী জামানা! দজ্জাল আসতে আর দেবী নেই। চৌদ্দ সিদির (শতাব্দী) আমল, কিতাবের কথা কি আর ঝুট্ হবে?

অনেকক্ষণ পরে আসেকজান বুঝিতে পারে, ঘরে কেহ নাই। তখন নিজেই স্তব্ধ হইয়া যায়। সাদা চুলের উকুন বাহিতে বাহিতে আসেকজান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

অখ্যাত পল্লীর নিভৃতে মানুষের আহাজারী-বুকে নৈশ বাতাস একটানা বহিয়া যায়।

দরিয়াবিবির আশঙ্কা অমূলক নয়। নিশ্চিতি রাত্রে আবার ছাগলের অবিশ্রান্ত চীৎকার শোনা গেল।

দরিয়াবিবির পক্ষে বিছানায় পড়িয়া থাকা মুশকিল। যদি সতাই ছাগলটির বাচ্চা হয়। সে একা সামাল দিতে অপারগ। স্বামীকে জাগাইতে হইল।

ঐ শোনো। ছাগলটা আকুলি-ঝিকুলি করছে।

আজহার খাঁ উঠিয়া পড়িল।

না, গিয়ে দেখাই যাক। ডিপাটা জ্বালো।

দরিয়াবিবি স্বামীর আদেশ পালন করিল।

টাঁটি খুলিয়া আজহার খাঁ দেখিল, আকাশে দ্রুত মেঘ জমিতেছে। দমকা বাতাস হ হ শব্দে বহিতেছে।

দরিয়া-বৌ, ডিপা নিয়ে যেতে পারবে? খুব বাতাস।

ঘরের কোণায় একটি ধুচনী ছিল। ডিপাটি তার মধ্যে রাখিয়া স্ত্রী জবাব দিল : চলো, আমি বাতাস কাটিয়ে যেতে পারব।

পুকুরের পাড়ের পথ তত সুবিধার নয়। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। সাবধানে পা ফেলিতে হয়। ধুচনীর ভিতর ভিজা আলো তাই স্পষ্টভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে না। ছাগলের চীৎকার আর যেন থামা জানে না।

জোর ঝড় উঠিতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। পুকুর পাড়ের গাছপালা ভাঙিয়া পড়িতেছে। নিশ্চিতি বনভূমির প্রেতাচ্ছা খলখল হাস্যে উন্মাদ নৃত্য-তাণ্ডবে মাতিয়াছে যেন। চারিদিকে গোঙানির শব্দ ওঠে।

দরিয়াবিবি ভয় পায় না। ডিপা হাতে সাবধানে পা ফেলে সে।

না, এবার থেকে গো'ল ঘর সরিয়ে আনব ভিটের কাছে।

আজহার খাঁ বলিল। কথার খেঁই সে আবার নিজেই অনুসরণ করে : জায়গা পাব কার? তবু রায়েদের ভালো-মানুষি যে, পুকুর-পাড়ে গো'ল করতে দিয়েছে।

দরিয়াবিবি ডিপা সামলাইতে ব্যস্ত। কোন কথা তার কানে যায় না। পাড়ের উপর শেয়াকুলের ঝোপ আড় হইয়া পড়িয়াছিল। আজহার ভাঙা পিঠুলির ডাল দিয়া কোনরূপে পথ পরিষ্কার করিল। অতি সন্তর্পণে পা-ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না। কাঁটাকুটিতে পথ বোঝাই হইয়া গিয়াছে।

আরো দমকা বাতাস আসে। গাছপালাগুলি যেন মাথার উপর ভাঙিয়া পড়ে আর কী।

এইখানে পথ বেশ পরিষ্কার। দরিয়াবিবি দ্রুত পা চালায়।

গোয়াল-ঘরের সম্মুখে আসিয়া তাহারা হাঁপ ছাড়ে। ছাগ-মাতার চীৎকারও আর শোনা যায় না।

গোয়ালের টাঁটি খোলা-মাত্র একটা সাদা বাছুর সম্মুখের তালবন হইতে ছুটিয়া আসিল।

হতভাগা, কোথা ছিলি সাজবেলা?

আজহারের গা ঘেঁষিয়া বাছুরটি লেজ দোলায়। মানুষের ভর্ৎসনা বোধ হয় আদরের পূর্বলক্ষণ। দরিয়াবিবি বাছুরের গলায় দড়ি পরাইয়া দিতে লাগিল। নচেৎ সব দুধ শেষ করিয়া ফেলিবে।

প্রথমে গরুর কুঠরী ছাগলের কুঠরী একটরে গুঁই দিকটা আরো অন্ধকার। গোয়ালের চালে ঝড় খুব কম লাগে। চারিদিকেই প্রায় ফুল-চারা তাল গাছের সারি। বাতাস এই দুর্গ সহজে ভেদ করিতে পারে না।

দরিয়াবিবি ডিপা লইয়া ছাগলের কুঠরীতে ঢুকিল। আনন্দে তাহার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অসহায় ছাগ-মাতা দণ্ডায়মান। সম্মুখে দুইটি কালো ছাগ-শিশু। পশু-মাতা গা লেহন করিতেছে শিশু দুইটির।

এখনও ফুল পড়ে নাই। দরিয়াবিবি তাই বলিল, এক কাজ করা যাক, ফুলটা আমি ফেলে দিই, না হলে বাচ্চাগুলোর কি দশা হবে যদি ফুল খেয়ে বসে থাকে? দুধ কিনে বাচ্চা বাঁচানোর পয়সা আছে আমাদের?

দরিয়াবিবি আর বিলম্ব করে না। ধাত্রীর কাজ সে নীরবেই সম্পন্ন করিল।

চলো, আরো ঝড় উঠতে পারে। তুমি ধাড়ীটাকে কোলে নাও। আমি বাচ্চা দুটো আর ডিপা নেই।

আজহার ইতস্তত করিতেছিল। সদ্যপ্রসূত ছাগীর সংস্পর্শ তার ভাল লাগে না।

অত বাবুয়ানী যদি করতে চাও করো। ছেলেদের মানুষ করবে, না নিজের মত গরুর লেজ-মলা শেখাবে?

যাক না রাত্রে মত। খালি বাচ্চা দু'টো নিয়ে যাই।

দরিয়াবিবির কণ্ঠস্বর ঝংকৃত হয় : নাও তুমি বাচ্চা দু'টো, আমি ধাড়ীটা কোলে নিচ্ছি।

দরিয়াবিবির অবয়বের বাঁধন ভাল। ছাগলটিকে সে সহজেই বহন করিতে সমর্থ

হইবে। আনন্দে তার কর্ম-ব্যস্ততা আরো বাড়িয়া যায়।

কয়েক কাঠা জমি অগ্রসর হওয়ার পর মুশকিল বাধিল ডিপা লইয়া। আজহার খাঁর বৃকে ছাগ-শিশু দুইটি। ডিপা আবার ধূচনীর ভিতর সাবধানে না রাখিলে চলে না। একটু হাত কাঁপিলে বাতাসে নিভিয়া যাইবে।

ভয়ানক রাগিয়া উঠিল দরিয়াবিবি। শেয়াকুলের ঝোপ পার হওয়ার পর দমকা বাতাসে ডিপা নিভিয়া গেল।

ঐ কাজ তোমাকে দিয়ে হয়! বাচ্চা দু'টো আমাকে দিতে কি হয়েছিল?

আজহার খাঁ আর জবাব দেয় না। অন্ধকারে কোন রকমে দুইজন অগ্রসর হয়।

কালো মেঘের পঙ্গপাল হুড়ুম-হুড়ুম গ্রামের উপর ভাঙিয়া পড়িতেছে। বৃষ্টি নামিলে দূরবস্তুর আর অন্ত থাকিবে না।

অন্ধকারে দরিয়াবিবি বারবার আল্লাহর নাম করে। নঈমা এক ঘরে শুইয়া রহিয়াছে। পচা ছিটে বেড়ার ঘর। দরিয়াবিবির সমস্ত রাগ আজহার খাঁর উপর। চোখে তার জল আসে। এমন অবোধ মানুষকে লইয়া তার সংসার!

দরিয়া-বৌ, আর বেশি দেবী নেই।

বিদ্যুতের আলোকে পথ দেখা গেল। পুকুর-পাড় শেষ হইয়াছে।

এইবার নামিল ঝুমঝুম বৃষ্টি। চেনা সরল পথ। আজহার খাঁ দৌড় দিল। ভারী ছাগ দরিয়াবিবির কোলে, সে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় সন্তর্পণে চলিতে লাগিল।

উঠানে আসিয়া দরিয়াবিবি দেখিল, টাটি বাঁজসে খুলিয়া গিয়াছে। ইন্তার পাতাপুতি চুকিতেছে ঘরে। নঈমা অন্ধকারে হাউমাউ জুড়িয়াছে। আসেক্‌জান চোঁচাইতেছে। তার কথার কোন হদিশ নাই।

ছাগলটিকে মাটির উপর রাখিয়া দরিয়াবিবি ধূলার উপর উপবেশন করিল। জায়গার বাছ-বিচার নাই তার। বড় শ্রান্ত সে।

আজহার খাঁ ডিপা জ্বলাইয়া মাদুরের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল। তেল-চিটা দাগ-লাগা বালিশের একপাশ হইতে কালো তুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া পড়িল আজহার খাঁ।

ক্লান্ত দরিয়াবিবি করুণ দৃষ্টিতে বারবার স্বামীর মুখ অবলোকন করিতে লাগিল।

২

এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল রাতে। আজহার সকালেই লাঙল কাঁধে মাঠে চলিয়া গিয়াছে। এক মাইল দূরে তার জমি। দুপুরের রৌদ্রে বাড়ি ফিরিয়া খাওয়া-দাওয়া করা যায়; কিন্তু আবার মাঠে ফিরিয়া আসা পণ্ডশ্রম। এই জন্যে আমজাদ দুপুরের ভাত মাঠে লইয়া যায়। দরিয়াবিবি তা পছন্দ করে না। আমজাদের মখতব যাওয়া হওয়া না। লেখা-পড়া নষ্ট। অন্য উপায়ও নাই। দরিয়াবিবি গৃহস্থালীর কাজ করিতে পারে। পর্দানশীনা মেয়েদের মাঠে যাওয়া সাজে না।

আমজাদের কিন্তু এই কাজ খুব ভাল লাগে। দহলিজের একমুঠে বসিয়া থাকা ভারী

কষ্টকর। মাধা ধরে, হাই ওঠে, তবু মৌলবী সাহেব ছুটির নাম করেন না। এখানে ইচ্ছামত দেদার মাঠে ঘুরিয়া বেড়ানো, তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে পৃথিবীতে!

ঠিক মাঝামাঝি দুপুরে আমজাদ নিজে খাইতে বসে। ছেলেমানুষের বিশ্রাম প্রয়োজন হয়। কোন কোন দিন দুপুর চলিয়া যায়।

আজহার অবশ্য তার জন্য রাগ করে না। আমজাদ মাঠে পৌছাইলে হাসিমুখেই সে বলে, আমু, এত দেরী কেন, ব্যাটা?

রাঁধতে দেরী। আর আমি জোরে হাঁটতে পারি না।

আজহার গামছায় ঘর্মাক্ত কচি মুখ মুছাইয়া বলে, থাক, তার জন্যে কি হয়েছে! আমার ভারী পিয়াস পেয়েছে, একটু পানি আনো তো নদী থেকে।

জমির পাশেই নদী। দরিয়াবিবি আমু-র হাতে একটা ছোট বদনা দিতে ভোলে না। অন্য সময় আজহার আঁজলা করিয়া পানি পায়। খাওয়ার সময় এই হাঙ্গামা পোষায় না।

আমজাদ পিতার আদেশ পালন করে। দুপুরের চড়া রোদ। সেও কম ক্লান্ত হয় না। মখতবের জেলখানা হইতে সে রেহাই পাইয়াছে, এই আনন্দে নিজের শান্তির কথা ভুলিয়া যায়।

কয়েত বেলের গাছের ছায়ায় আজহার খাইতে বসে।

বন্যার সময় দুইটি কয়েত চারা ভাসিয়া আসিয়াছিল পাঁচ বছর আগে। আজহার নিজের হাতেই বান-ভাসি চারা দুইটি রোপণ করিয়াছিল। ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় অন্যান্য বিশ্রান্ত কিষাণদের গুলজার মজলিস বসে। জমির আর এক কোণে কলার গাছ। ভাল কলার গাছ রোপণ বৃথা। রাত্রে চুরি যায়। এই জন্যে মাঠে কেউ ভাল কলার গাছ লাগায় না। পূর্বে কলাপাতার ছায়ায় আজহার মুখ্য ভোজন করিত। গাঁয়ের আরো কিষাণ মাঠে আসিয়া বাস করিতেছে। তারা সকলেই বাগদী, তিওর শ্রেণীর। আজহারও মাঠে বসবাস করিতে চায়। ফসলের খবরদারী ভাল হয়, ইচ্ছামত পরিশ্রম করা যায়। দরিয়াবিবি রাজী হয় না। বেপদা জায়গায় ইজ্জত রাখা যায়। তার উপর পুষ্করিণী নাই। নদীর তট এই দিকে উঁচু। গ্রীষ্মকালে পানি ঢালু তটের দিকে সরিয়া যায়। মুমিনের ঘরের মেয়ে এতটুকু বেপদা হইতে পারে না। বাগদী তিওরেরা কোন অসুবিধা ভোগ করে না। মা'র সঙ্গে উলঙ্গ কুঁচো ছেলের দল দুপুরের স্নান করিতে যায়। রসিক বাগদীর দুইটি ছেলে কয়েক বছর আগে বন্যার সময় ভিটার উপর হইতে স্রোতে পড়িয়া গিয়াছিল। তাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ভিটে-ত্যাগের কথা উঠিলে দরিয়াবিবি এই কাহিনী খুব ফলাও করিয়া বলে, আজহার খাঁর উৎসাহ থাকে না আর।

আমজাদ এক বদনা পানি পিতার সম্মুখে রাখিয়া বলে, পানি তেতে উঠেছে, কাল থেকে সকালে বদনা এনে রেখো।

আজহার খাঁ এক লুক্‌মা ভাত গালে তুলিয়াছে, চোয়াল নাড়িতে নাড়িতে জবাব দিল: হোক, ক্ষতি নেই বাপ। আজ ভুক লেগেছে জোর।

এক আঁটি খড়ের উপর বসিয়া আমজাদ বাবার আহার-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করে। তরকারি ভাল নয় আজ। সামান্য ভাল আর চুনো মাছের গুরুত্ব।

আমজাদ মাঠের চারিদিকে তাকায়। ধু ধু করিতেছে দূরের মাঠগুলি। নদীর দুই

পাশে সবুজ রবি-ফসলের ক্ষেত। সেখানেও রঙ বিবর্ণ। চৈত্রেবর বাতাস ঝামাল তোলে। বালু ধুলি-কণা অন্য গাঁয়ের দিকে উড়িয়া যায়। পাতলা এক খণ্ড রঙীন ধোঁয়া যেন পাড়ি জমাইতেছে গ্রামান্তরে।

এই বছর আজহারের লাউ ছাড়া অন্য রবি-ফসল নাই। কুমড়ার লম্বা ডগা সাপের মত জড়াজড়ি করিয়া রৌদ্রে ঝুমাইতেছে। মাটির ঢেলার উপর একটি কুমড়া দেখা যায়। সবেমাত্র পাক ধরিয়াছে। হলুদ-ধূসর এক রকমের রং চোখ-ঝলসানো আলোয় আরো স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমজাদের চোখ বারবার সেই দিকে আকৃষ্ট হয়।

আব্বা!

আজহার খাঁ মুখ তোলে। রৌদ্রে মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। তার উপর কালো এক গোছা দাড়ি! কয়েকটা ভাত লাগিয়া রহিয়াছে ঠোঁটের এক কোণে। সেদিকে চাহিয়া আমজাদের হাসি আসে।

ঐ কুমড়াটা পেকেছে।

খুব পাকে নি।

তুমি সেবার বললে, ঘরে তুলে রাখলে পেকে যায়।

আজহার খাঁ মুখে একগাল ভাত তুলিল। একটু থামিয়া সে বলে, পাকবে না কেন?

পুত্রের জিজ্ঞাসার হেতু আজহার খাঁ উপলব্ধি করে।

কুমড়াটা ঘরে নিয়ে যেতে চাও?

হ্যাঁ। খুব লজ্জিত হয় আমজাদ, যেন সে কৃত্ত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে।

না, এখন থাক, বাবা। সামনে হস্তায় একটা কুমড়া গঞ্জে দেওয়ার কথা আছে। কিছু বায়না নিয়েছি।

পুত্রের মুখের দিকে চায় এবার আজহার খাঁ। কচি শিশুর মুখের উজ্জ্বলতা নিভিয়া গিয়াছে।

আরো কয়েক মুঠি ভাত থালায় পড়িয়া রহিল। আজহার খাঁ বিষণ্ণ হইয়া যায়। এক শ' কুমড়া এই সপ্তাহে জমি হইতে উঠিবে কিনা সন্দেহ, হয়ত অন্য চাষীর নিকট হইতে কেনা ছাড়া উপায় থাকিবে না। ছেলেদের সামান্য আবদার রক্ষা করাও তার ক্ষমতার বাহিরে। পাইকের আসিয়াছিল গত সপ্তাহে। অগ্রিম বায়না লইয়াছে সে। ওয়াদা-খেলাফ খাঁ পছন্দ করে না। নচেৎ খুব ক্ষতি হইবে তার। অন্য সময় মাঠে কুমড়া পচিতে থাকিবে, পাইকের ছুইয়া দেখিবে না পর্যন্ত।

আজহার ছেলের মুখের দিকে তাকাইতে সাহস করে না। মুখ নীচু করিয়া বলে, ওদিকের মাঠে তরমুজ হয়েছে খুব। তরমুজ খাবে?

হাসিমুখে আমজাদ পিতার মুখের দিকে চায়। তরমুজের নামে তার ঠোঁটে-মুখে আনন্দ রেখায়িত হয়।

আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি নদী থেকে। বসো, বাবাজী।

নদীর পাড়ের নীচে আজহার ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। পিতার বলীয়ান ছায়া-মূর্তির দিকে আমজাদ চাহিয়াছিল, সেই দিকেই দৃষ্টি মেলিয়া দিল। মাঠে বাতাস আছে, তাই দারুণ গ্রীষ্মে কোন রকমে সহ্য করা যায়। গাভীদল নির্বিবাদে মাঠে চরিতেছে। দূরে

একটি কুঁড়ের পাশে পাকুড় গাছের তলায় কতগুলি ছেলে খেলা করিতেছিল। তাহাদের হাল্কা আমজাদের কানে গেল। আবার চোখ ফেরায় সে। একটু পরে সে গুনিতে পাইল, কে যেন শিস দিতেছে। কোন পাখির ডাক বোধ হয়। আমজাদের চেনা পাখি নয়। অদ্ভুত ধরনের শিস। আমজাদ এদিক-ওদিক ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

হঠাৎ শিস থামিয়া গেল।

কাঁদের ছেলে রে?

চমকিয়া ওঠে আমজাদ। কলা গাছের আড়াল হইতে হঠাৎ একটা লোক বাহির হইয়াছে। যাক্, ভয়ের কিছু নাই। লোকটির মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কালো কুচ্‌কুচে গা। হাতে একটি কাণ্ডে ও নিড়েন-দেওয়া দাউলী।

আবার শিসের জোয়ার ছোটে। এই লোকটি শিস দিতেছিল তা-হলে! ডাগর চোখ তার ঘন-কালো। লম্বা-চওড়া জোয়ান। ভয় করে আমজাদের।

তার দিকে চাহিয়া সে বলে, কাঁদের ছেলে? তরমুজ চুরি করতে বেরিয়েছ, না?

ভয়ে জড়সড় হইয়া যায় আমজাদ। আজহার কাছে নাই। নদীতে বৃথা বিলম্ব করিতেছে সে।

চুরি করতে বেরিয়েছ?

না। আমি ভাত এনেছি।

লোকটা অকারণ হাসিয়া উঠিল, আবার শিস দিতে দিতে সে গান গায় :

সর্ব্ব ক্ষেতের আড়াল হল চাঁদ

চোখে তার মানুষ-ধরা ফাঁদ

ও উদাসিনী লো—

মাথার বাবরী চুল গায়কের বাতাসে উড়িতেছিল। গান থামিল কয়েক কলি দোহারের পর।

ভাত এনেছো?

আমজাদ প্রিয়মাণ বালকের মত উত্তর দিল : আক্সা সব খেয়ে ফেলেছে।

তা হলে আমার জন্যে রাখোনি কিছু। বাহ্।

মুখ সামান্য নীচু করিয়া আমজাদের দিকে সে দুইমির হাসি হাসে আর তাকায়। ঠোঁট বাঁকাইয়া সে চোঁ চোঁ শব্দ করে।

একটুও ভাত রাখলে না বাপ-ব্যাটা মিলে! হি-হি।

সর্ব্ব ক্ষেতের আড়াল হল চাঁদ,

চোখে তার মানুষ-ধরা ফাঁদ

ও উদাসিনী লো —

আমজাদের ভাবাচ্যাকা লাগে। হয়তো লোকটা পাগল। এইবার সে কোমরের উপর বাম হাত রাখিয়া একটু বক্রভাবে দাঁড়াইল। তারপর ঠোঁটের একপাশে অন্য হাত চাপিয়া লোকটা জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল : এই তরমুজ ক্ষেতে কে?

আমজাদ নদীর আশে-পাশে জমির দিকে তাকায়। সেই ছেলেগুলি খেলা করিতেছে।

মাঠে জনপ্রাণীর অভাস নাই। গরুগুলি জাবর কাটিতে ছায়ার আশ্রয় সন্ধান করিতেছে। তবু লোকটা চীৎকার করে। অদৃশ্য উদাসিনীর উদ্দেশ্যে বোধ হয়। একটা চুম্বুড়ি দিয়া সে ছায়ায় বসিয়া পড়িল। একদম আমজাদের পাশে। তাড়ির গন্ধ উঠিতেছে মুখে। আমজাদ একটু সরিয়া বসে।

আরে লক্ষ্মী, সব ভাত খেলে, আর চাচার জন্যে— তারপর সে বৃদ্ধাস্তৃষ্ঠ উঁচু করিল। আজহারকে নদীর পাড়ের উপর দেখা গেল। হাত-মুখ, থালা ধোওয়া শেষ হইয়াছে। নূতন উৎসাহ পায় লোকটা। আরো জোরে গান ধরে সে। কুমড়া ক্ষেতের ওপাশে আজহারকে দেখিয়া সে জোরে ডাকে : ও ভাই খাঁ।

নিকটে আসিল আজহার : কে চন্দর?

লোকটা মহেশডাঙার চন্দ্র কোটাল। মাঠেই বসবাস করে সে। ভাঁড়-নাচের দল আছে তার। ভিন-গাঁ হইতে পর্যন্ত ডাক আসে পূজা-পার্বণের সময়। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক কম। জ্ঞাতীদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া কয়েক বছর আগে সে পল্লী পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রতিবেশীর নিঃশ্বাস তার ভাল লাগে না। কিন্তু মাঠে সকলের সঙ্গে তার সম্ভাব খুব। কয়েক বিঘা জমি দূরে তার কুঁড়ে। স্ত্রী এলোকেশী আর একটি মেয়ে সংসারের সম্বল। বহু ঝড়-আপদ গিয়াছে তার উপর দিয়া। বসন্তে একই মাসে দু'টি মেয়ে মারা গেল পাঁচ বছর পূর্বে। চন্দ্র কোটাল ক্ষুর্ত্তিবাজ দিলখোলা লোক। কুঁড়ের পাশে কয়েকটি তাল গাছ। আজহারের জমির প্রাঙ্গণ হইতেও তালসারি দেখা যায়। বাঁশ আর তাড়ির ভাঁড় সারা বছর এই গাছে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মের দিনে চন্দ্র কোটালের মরত্তম পড়ে।

ও খাঁ, শিগগির এসো।

চন্দ্র আমজাদের দিকে ফিরিয়া বলে, বুড়ো দাড়িওয়ালা কে?

আমার আঝা।

কি করে জানো?

চন্দ্র গোঁফে আঙুল চালায় আর মুচুকি হাসে।

আমার আঝা তো। আমি জানি নে!

দূর হইতে সংলাপ কানে যায় আজহার খাঁর। নিকটে আসিয়া বলে, চন্দর, আজ কষে হারাম গিলেছ। খুব-যে গান ধরেছিলে। তৌবা!

এই তো খাঁ — ভাই, তুমিও গাল দেবে?

আজহার খাঁকে চন্দ্র সমীহ করে। সজ্জন ব্যক্তি। তা-ছাড়া খাঁয়েদের প্রাচীন বংশ-মহিমার কাহিনী এই গাঁয়ের সকলের পরিচিত। তার দাম চন্দ্রও দিতে জানে।

মাছ কেমন ধরছ?

চন্দ্রের কুঁড়ের সম্মুখে দুইটি খালের মোহনা। বারো মাস পানি থাকে। বর্ষাকালে চন্দ্র চাষের দিকে ভাল মন দেয় না। মাছে খুব রোজগার হয় তখন। কাঠি-বাড় দিয়া খালের মোহনা ঘিরিয়া রাখে সে।

না ভাই, দিন-কাল ভাল নয়। একটু তামাক দাও।

আজহার খাঁ বাসন-লোটা নীচে রাখিল। কয়েত বেলের গাছে ঠেস দিয়া সে নারিকেলি হুঁকা রাখিয়াছিল। হাতে তুলিয়া লইল।

আচ্ছা, তামাক খাওয়াচ্ছি, ছেলেটাকে একটা তরমুজ দাও। এ বছর আমার ক্ষেতে
নাদারাৎ।

চন্দ্র কোটাল আমজাদের কচি খুঁথনি হাতের তালুর উপর রাখিয়া জবাব দিল : আরে
ব্যাটা, এতক্ষণ আমাকে বলিস্নি কেন?

উঠিয়া পড়িল চন্দ্র। বিধে দুই জমির পাড়ি। আবার শিস দিতে লাগিল সে। আনুষঙ্গিক
গানও রেহাই পায় না।

জমি বেচে দুয়োর বেচে

গড়িয়ে দেব গয়না।

ডুমুর তলার হলুদ পাড়

আমারে হায় চায় না।

আজহার খাঁ আমজাদকে বলে, পাগল চন্দর।

পুত্র পিতার মন্তব্যে হাসে।

আমাকে এতক্ষণ বলছিল, সব ভাত শেষ করলে, আমার জন্যে রাখলে না?

তুমি কী জবাব দিলে?

কিছু না। চুপচাপ বসেছিলাম। ভয়ে পেয়েছিল।

আজহার খাঁ হাসে।

পাগল চন্দরকে ভয়ের কিছু নেই। আচ্ছা আসুক।

ফিরিয়া আসিল চন্দ্র কোটাল। শিস দিতে দিতে দু'টি বড় তরমুজ মাটির উপর
রাখিল। আমজাদের দুই চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

আজহার খাঁ বলে, দু'টো বড় তরমুজ আনলে কেন?

তা'তে কী।

আজ বাদ কাল গঞ্জ। এবার চালান দেবে না?

চন্দ্র ঘাম মুহিতেছিল।

না, এবার চোরে চোরে শেষ। এই হাট ফাঁক গেল।

দুইটি তরমুজ বেশ বড়। একটির রং ঘন সবুজ। অপরটি সাদা। মাঝে মাঝে কালো
ডোর-টানা, যেন চিতা বাঘের গা।

চন্দ্র কোটাল আঙুলের টোকা দিয়া তরমুজ দু'টি পরীক্ষা করিল।

এই সব্জের রঙের তরমুজটা খুব পেকেছে। এখনই কাজ চলবে।

চন্দ্র কাস্তুর নখ তরমুজের উপর বসাইতে গিয়া থামিয়া গেল। তোমার নাম কী,
চাচা?

আমজাদ।

রাগ করো না। আর একটু দাঁড়াও, চাচা।

চন্দ্র আবার উঠিয়া পড়িল। নদী-পথের দিকে তার মুখ। বাধা দিল আজহার। সে
জিজ্ঞাসা করে, কি হলো চন্দর?

সারাদিন রোদ পেয়েছে, তরমুজ খুব গরম। ছেলেটার খেয়ে আবার শরীর খারাপ

করবে।

আজহার ঈষৎ বিরক্ত হয়।

এখন তবে কী করবে?

নদীর হাঁটু-জলে বালির তলায় পাঁচ মিনিট রাখলেই, ব্যস।

একদম বরফ। ব-র-ফ।

আজহার দ্বিরুক্তি করে না। চন্দ্র জমির আল ধরিয়া নদীর দিকে চলিয়া গেল।

আজহার পুত্রের দিকে তাকায়।

দেখলে? চন্দ্রটা পাগল।

এবার পিতার কথায় আমজাদ সায় দিতে পারে না। সে নদীর দিকে চাহিয়া থাকে।

বড় ভাল লাগে চন্দ্র কোটালকে তার। সাদা ডোর-টানা তরমুজের দিকে সে আর একবার লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

দুই বছর কয়েত বেল ধরে না। রোজগারের এই একটি পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আজহার খাঁ আফশোস করে।

মাঠে এলে, বাবা দু'টো বেলও গাছে হয়নি।

আমজাদ এই কথায় কোন সাড়া দেয় না। সে চন্দ্র কোটালের প্রতীক্ষা করিতেছে। সময় যেন আর শেষ হয় না।

সূর্যের কিরণে দহন-সম্ভার নাই। পড়ন্ত বেলায় সন্ধ্যা আরম্ভ হইয়াছে। ঈষৎশীতল বায়ু কয়েত বেলের বনে মর্মর তোলে। গাভীদল দোদুল কোকুদে আবার ঘাসের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।

এই, তরমুজ ক্ষেতে কে?

নদীর পাড়ে দণ্ডায়মান চন্দ্র। নদী-স্নাত তরমুজ। টপ্‌টপ্‌ পানি পড়িতেছে।

আমজাদ আশ্বস্ত হয়।

আজহার তামাক সাজিতেছিল। চন্দ্র নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

এইবার শুরু করা যাক। ফিকফিক হাসে চন্দ্র।

অমন হাঁকছিলে খামাখা। তোমার ক্ষেতে তো লোক নেই।

রাত্রেও মাঝে মাঝে হাঁকতে হয়। লোক নেই, চোর জুটতে কতক্ষণ।

হুঁকার মাথা হইতে কন্ধে লইয়া চন্দ্র এলোপাথাড়ি টান আরম্ভ করিল।

তুমি তরমুজটা কেটে দাও ছেলেকে।

আমজাদ বিছানো খড়ের উপর বসিয়াছিল। তার পাশে বসিল চন্দ্র। ভক্তভক্ত গন্ধ বাহির হয় মুখ হইতে। আমজাদ অসোয়াস্তি বোধ করে। একটু সরিয়া বসে।

চন্দ্র বলে, ভয় পেয়েছ বাবা?

না।

আজহার অভয় প্রদান করে।

ভয় কি। তোর চন্দ্র কাকা, আমু।

আমু চাচা, শুরু করো।

আজহার তরমুজ কাটিয়া দিল। লাল-দানা সাদা শাঁসের ভিতর দিয়ে উঁকি মারে।

তরমুজ খুব পাকা।

তুমি একটু নাও, চন্দর।

না, না। আমি একটু রসটস গিলেছি। আর না। চন্দ্র ধোঁয়া ছাড়ে।

আমু চাচা, খেতে পারবে সব?

পারবো, চন্দ্র কাকা।

বেশ কথা বলতে পারে তো।

চন্দ্র আমজাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বড় কষ্ট হয় আজের-ভাই। বড় মায়া দেয় মুখগুলো। কিন্তু খামখা।

আজহার কোটালের কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না। বলে, কি বলছ?

এই ছেলেপুলের কথা। বড় মায়া দেয়। কিন্তু সারা জীবন তো খেটে খেটে বিনি-আহার বিনি-কাপড়ে যাবে আমাদের মত। চাষীর ছেলে!

কেন?

এখনও বুঝলে না, আজর-ভাই! মানুষ করা সাধ্যিতে কুলাবে?

কথাটা আজহারের মনঃপূত হয় না। পুত্রের জীবন সম্বন্ধে সে এত নৈরাশ্য পোষণ করে না।

খোদা নসীবে লিখে থাকলে মানুষ হবে!

ফের কপালের কথা তুলেছে। এই দ্যাখো, আমার সঙ্গে পাঠশালে সেই যে হরি চক্কোস্তির ছেলেটা ছিল, একদম হাবা, কত কান মলে দিয়েছি, মানসাংক পারত না, সেটা হাকিম হয়েছে। গায়ে ত আর আসে না। সেটা হলো হাকিম! আর আমি? পাঠশালার সেরা ছেলে মজাই তাড়ি আর নেশা, মাঠে মাথার ঘাম পায়ে—।

শঙ্কর ছায়া জাগে আজহার খাঁর মনে। আমজাদের কানে এই সব কথা যায় না। সে আনন্দে তরমুজ খাইতে ব্যস্ত।

ওর বাবা শহরে ছেলেকে নিয়ে গেল। পেটানো গাধা একদম মানুষ। হাকিম!

চোখের তারা উপরে তুলিয়া কক্কে হাতে চন্দ্র ক্রভঙ্গী করে।

তুমি বলো নসীব— কপাল! ছো-ছো। হরি চক্কোস্তি বছর বছর জমির খাজনা সাধতে আসে। আমার বাবাকে না খাজনা দিতে হত, আমাকে না খাজনা দিতে হয়, আয়-উপায় বাড়ে, দেখি কোন্ দিকের জল কোন্ দিকে গড়ায়। কার কপাল কত চওড়া হয়, দেখা যাক।

আজহার চন্দ্রের কথা মন দিয়া শোনে। কোন উত্তর দিতে পারে না। এই ধরনের কথা বলে দরিয়াবিবি। কারো সঙ্গে আজহারের মিল নেই। এদিকে আমজাদের তরমুজ খাওয়া পুরোদমে চলিতেছে। পুত্রের ভবিষ্যৎ একবার মাত্র উঁকি দিয়া গেল আজহারের মনে। চকিত ছোঁয়াচ মাত্র। উল্টো-পাল্টা কথা তার ভাল লাগে না। উঠিয়া পড়িল আজহার।

চন্দর, এবার কক্কেটা দাও। এখনও বিঘে খানেক জমি মই দিতে বাকী।

দুই বার টান দিয়া কক্কে ফিরাইয়া দিল আজহার।

কয়েত বেলের গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা বলদ দুইটি চোখ বুজিয়া রোমন্থন করিতেছিল। আজহারের আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্তব্য সম্বন্ধে পশু দুটি যেন সর্বদা সচেতন।

মই জুড়িয়া আজহার জমির উপর নামিল। জমিতে শকরগঞ্জ আলু দিবে এইবার আজহার খা।

আমজাদের তরমুজ খাওয়া সমাপ্ত। সে হাত-মুখ গামছায় মুছিয়া ধন্যবাদ জানাইল, তোমার তরমুজ খুব ভাল, চন্দ্র কাকা।

ওই তরমুজটা নিয়ে যেয়ো তোমার মায়ের জন্য। ভাবী আজ কি রेंধেছিল।

আমজাদের বয়স সাত বছর। সাধারণ দীন ব্যঞ্জন। লোকের কাছে তা প্রকাশ করতে নাই। বালক-সে-বিষয়ে সচেতন। কোন জবাব দিল না সে।

বেশ, আমায় একদিন নেমস্তন্ন করো।

অস্ফুট 'আচ্ছা' শব্দে জবাব দিল আমজাদ।

আজের-ভাই, ছেলে আমার তরমুজ ক্ষেত দেখে আসুক, তোমার তো বাড়ি যেতে দেৱী আছে?

আচ্ছা, যাক। দেৱী করো না, আমু।

দেৱী করব না, বাবাজী।

চৈত্ৰের বৈকাল। আকাশে খণ্ড মেঘেরা মন্ত্ৰণারত। সমগ্র প্রান্তর আবার কর্মকলরবে জাগিয়া উঠিতেছে। ঝড় না উঠিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত রবি-ফসলের ক্ষেতে কাজের কামাই নাই। শুক্লা সপ্তমী। চাঁদের আলোয় খরা-ভীত কিষাণেরা বহুক্ষণ মাঠ গুল্জার করিয়া রাখিবে আজ।

অবাক হইয়া চারিদিকে তাকায় আমজাদ। ঘাটের নিবিড়ে সে কোনদিন প্রবেশ-পথ পায় নাই চেনাশোনা সড়ক ছাড়া। আজ চন্দ্র কাকার সঙ্গে জলা-জাঙালে পথ ভাঙিতে লাগিল সে।

পটল-বাড়ির মাঝখানে তামাকের গাছ উঠিয়াছে। হাত দুই দীর্ঘ। সাদা ফুল ফুটিয়াছে তামাক গাছে। আমজাদ সেদিক চায় না। পটল ক্ষেতের ধারে ধারে লঙ্কা গাছ অনেক। একটা গাছের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

এমন লঙ্কা সে আগে দেখে নাই। লাল রঙের লঙ্কা আকাশের দিকে পা তুলিয়া দাড়াইয়া রহিয়াছে। তারই মত ডিগবাজী দিতেছে যেন। চন্দ্র আগে-আগে ছিল। পেছনে তাকায় সে।

আরে আমু চাচা, দেখছ কি?

এগুলো কী লঙ্কা, চন্দ্র কাকা?

অবাক হয় কোটাল।

চাষীর ছেলে হয়ে এই লঙ্কা চেনে না? সুজজু-মুখী লঙ্কা। তুলে নাও কতগুলো। আমজাদ ইতস্ততঃ করে। পরের জমি।

চন্দ্র নিজেই কতগুলো লঙ্কা আমজাদের হাতে তুলিয়া দিল। নীল পাতা ভেদ করিয়া লাল রঙের ফুটকী সূর্যমুখী ছাড়া আর অমন কী গাছ আছে? অবাক হইবারই কথা। আমজাদ লঙ্কাগুলি লুড়ির একদিকে বাঁধিয়া রাখিল। কিন্তু ফসলের উপর হইতে চোখ সে সহজে ফিরাইতে পারে না। পরদিন মাঠে আসিলে সে এই ক্ষেতের কথা বিস্মৃত হইবে না।

ঝিঙে-বাড়ির চারপাশে চাষীরা বাবলা কাঁটা দিয়াছে। ইতঃক্ষিণ্ড কাঁটারও অভাব নাই। আমজাদ চন্দ্র কোটালের পেছনে সন্তর্পণে হাঁটিতেছিল। চন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল।
দাঁড়াও, আমু।

দুই জনের মধ্যে একফালি জমির ব্যবধান। এখানে তামাকের ক্ষেত খুব ঘন। আমজাদ চন্দ্র কাকার সমগ্র অবয়ব দেখিতে পায় না। কোটালের কথা মত সে থামিয়া দাঁড়াইল।

আমজাদের কানে যায়, চন্দ্র বলিতেছে : জমিটা হারান মাইতির, তাই এত কাঁটা, যেমনি প্যাঁচালের লোক। দূর করে দিতে ইচ্ছা করে।

এক মুহূর্তে চন্দ্রকে আমজাদের পাশে দেখা গেল।

বেশ করেছে। তোমাকে আর হাঁটিতে হবে না।

আমজাদকে আর কোন কথা বলিতে দিল না চন্দ্র, তাকে কাঁধে তুলিয়া লইল সটান।

আমজাদ প্রথমে অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিল, এখন ভাল লাগে তার। চন্দ্র কাকাকে ভয় নাই কিছু। কাঁধে চড়িয়া দূরের গ্রাম আর কিশাণ পল্লী অপরূপ দেখায়।

ক্ষেত পার হইবার পর বুনোঘাসের পথ। ফড়িং উড়িতেছে চারিদিকে। চন্দ্র আনমনে চলে। নির্বিকার, নিঃশব্দ। শিসের জোয়ার আসে আবার।

আমার মাথাটা আঁকড়ে ধরিস, বাবা। পড়বার ভয় করো না

ইহার পর কল্লিত একটা বাঁশি দুই হাতে ধরিয়া চন্দ্র শিস দিতে লাগিল। আমজাদের ভয় লাগে। টাল সামলানো দায় তার পক্ষে।

দম ভরিয়া শিস দেয় চন্দ্র। বোধ হয় গান মনে ছিল না, তাই মেঠো সঙ্গীতের রেশ ওঠে না কোথাও।

আমজাদ নীচের দিকে চাহিয়া দেখে বুনো ঘাসের সীমানা আর শেষ হয় না। তার প্রতি চন্দ্র কাকার অনুকম্পার কারণে এখন বুঝিতে পারে।

আমজাদ তাদের জমির দিকে চাহিয়া দেখিল, আব্বা আর চোখে পড়ে না। কতগুলি তাল গাছের আড়াল হইয়া গিয়াছে সব। ক্ষীয়মাণ সূর্যরশ্মি চিক্‌চিক্‌ করিতেছে তালের পাতায়।

চন্দ্রের শিস এই মাত্র থামে।

চাচা, কাঁধে চড়ে কষ্ট হচ্ছে না তো?

না।

সংক্ষিপ্ত জবাব আমজাদের।

চন্দ্র আবার কল্লিত বাঁশি ঠোঁটে রাখিয়া আঙুল নাচাইতে নাচাইতে হঠাৎ থামিল।

ঠিক চাচা, কাঁধে ভালই লাগে। দুনিয়ার রংই ফিরে যায়। জমিদার সেজে বসে থাকো, চাচা।

আমজাদ চন্দ্র কাকার হেঁয়ালি বুঝিতে পারে না। উঁচু-নীচু মাটির উপর গা ফেলিতেছে কোটাল। তাই তার ঝাঁকড়া চুল আরো কষিয়া ধরে আমজাদ।

ঐ যে আমার কুঁড়ে দেখা যায়।

চকিতে চোখ ফিরাইল আমজাদ। দুই ছোট নদীর মোহনা। নদী নয়, একটু বড় খাল। আরো কয়েকটা কুঁড়ে পাশাপাশি। সম্মুখে বড় বালির চাতাল। উঁচু টিবি উপর

ঘরগুলি। সম্মুখে যোজন-যোজন অভিসারযাত্রী প্রান্তর। ওয়েসিসের মত চোখে পড়ে মাটির সন্তানদের আবাস-ভূমি।

আমজাদের কৌতূহল বাড়ে। চাতালের উপর কতগুলি ছেলেমেয়ে ইল্লা করিতেছে, কয়েকজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে টিবির উপরে। চন্দ্র কাকা শিস দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছেলেদের ভেতর কলরব আরো বাড়িয়া যায়।

সাদা চতুরের নিকট আসিয়া চন্দ্র জোর গলায় ডাক দিল—এলোকেশী—এলোকেশী!! ছেলেদের মাঝখানে চন্দ্র কোটাল। ঝটকা স্তব্ধতা আসে একবার। চন্দ্র হাঁকে, এলোকেশী!

ভিড়ের ভেতর হইতে একটা ছেলে বলিল, চন্দ্র কাকা আজ আবার মাতাল হয়ে এসেছে।

টিবির উপর হইতে একটি মাঝ-বয়সী মেয়ে বাহির হইল। চাষী গেরস্থ ঘরের মেয়ে। ঈষৎ স্থূল-তনু। রোগ-শোক-দীর্ঘ মুখ। পরনে ময়লা ন' হাতি কাপড়।

চন্দ্র এইবার সঙ্গীত পরিবেশন করে। ক্রীড়া-রত শিশুদের মধ্যে স্তব্ধতা আরো বাড়িয়া যায়। কয়েকজন মুচকি হাসে।

এলোকেশী চন্দ্রের স্ত্রী। নীচে নামিয়া আসিল।

কাঁধে কার ছেলে গো?

আমার। যাও যাও শিগ্গির। মুড়ি-টুড়ি আছে।

আমজাদের পা ও ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়া ছোট শিশু দোলানোর মত চন্দ্র এক ভঙ্গী করিল। একটি শিস, 'সুইং' শব্দে থামার সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপর বসিয়া পড়িল আমজাদ। ভিড় জমে চারপাশে। নদীর ওপারের ছেলেরা এইখানে খেলা জমায় প্রতিদিন। জোয়ারে হাঁটুজল হয় না, তাই পারাপারের ফলে অসুবিধা নাই।

ঝোকা, এসো আমার কাছে।

এলোকেশী দুই হাত বাড়াইল।

৩

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল নবমীর।

আমজাদ পিতার অনুসরণ করে। বলদ দু'টি তার আগে। লাঙলের আবছায়া পড়ে মাটির উপর।

পৃথিবী ক্রমশ বিস্তীর্ণ হইতেছে। মাঠে গ্রাম-ছাড়া হতভাগ্য বহু মানুষ বাস করে; কিন্তু তারা এমন মানুষ, আমজাদ কোন দিন জানিত না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মা তাকে মিশিতে দেয় না। রাখাল ছেলেরা অনেক দূর মাঠে মাঠে গো-চারণে যায়। আমজাদের সে সৌভাগ্য হয় না। অবোধ শিশু-মনের অপূর্ব পুলকের সাড়া পড়ে। চাঁদের আলো আরো উজ্জ্বল হইতেছে। দিগন্তে ঝাপসা বনানীর রেখা, রবি-ফসলের প্রান্তর স্বপ্নের বার্তা বহিয়া আনে। কিসের স্বপ্ন? আমজাদ হৃদিস করিতে পারে না। মার উপর হঠাৎ বিস্ফোভ জাগে তার। পাড়ার ছেলেরা বদ, তাদের সহবৎ (সংসর্গ) ভাল

নয়, তাই দূরে-দূরে থাকিতে হয় তাকে। মখতবের পর মার কাছে হাজিরি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

আমজাদের মনে পড়িল এলোকেশীর কথা, চন্দ্র কাকার কথা। আর এক জগতের মানুষ তারা। তাদের ঘর-দোর, খাওয়া-পরা, চাল-চলন অনেকখানি সে দেখিয়া আসিয়াছে অল্প সময়ের মধ্যে।

এলোকেশী মুখ ভার করিয়া বলিয়াছিল, খোকা, এমন অদিনে এলে! ঘরে মুড়ি ছাড়া আর কি আছে, বাবা!

আমজাদ মুড়ি খাইতেছিল। চন্দ্র কাকার মেয়ে ধীরা সম্মুখে দাওয়ায় দাঁড়াইয়া তার খাওয়া দেখিতেছিল। ধীরার চোখে দুনিয়ার বিস্ময়।

গরীব চাচা, ঘরে কিছু নেই আমু। মার কাছে বদনাম করো না।

চন্দ্র কাকা হাসে আর কথা বলে। চোখ পিটপাট করিয়া পা নাচাইতেছিল সে। লাজুক আমজাদ মাথা নীচু করিয়া মুড়ি ঠোঁটে তুলিতেছিল।

খাঁয়েদের বাড়ির ছেলে না?

এলোকেশীর জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ। আমার বাড়িরই ছেলে বলতে দোষ কী?

দোষ আর কী!

এই বংশের কত গল্প যে শুনেছি ঠাকুরমার কাছে! কি হলো কলিকালে।

আমজাদ এলোকেশীর চোখের দিকে চায়। পুছে ধরা পড়ে, দৃষ্টি নামিয়া আসে সেই জন্য।

আর নুতন খাঁয়েদের কাহিনী শোন কি?

মহেশভাঙা বর্তমানে দুই জমিদারের অধীন। ছ'আনি আর দশ আনি জমিদার। ছয় আনার মালিক হাতেম বখশ খাঁ। দশ-আনির অধিকারী রোহিনী চৌধুরী। মালিকেরা সংখ্যায় তিন-চারিটি পরিবার। একটি নুতন পাড়ার পশ্তন করিয়াছে ইহারা। গ্রামের লোকের কাছে তারা নুতন-খাঁ নামে বিদিত।

আরে দূর ছাই। কিসে আর কিসে। রহিম খাঁয়ের বাবাকে কে না জানত? সুদখোর। সুদের পয়সায় জমিদার—।

চন্দ্র কোটাল বাধা দিয়াছিল এই সময় : তোমরা জান না, গরুর গায়ে ঘা হলে ন'টা সুদখোরের নাম লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিতে হয়। পোকা পড়ে যায়। আগে পেরতম নাম লিখত জায়েদ খাঁর— রহিমের বাবার। তোমাদের গরু ক'টা ঠিক আছে তো চাচা?

সংলাপের গুঞ্জন ওঠে আমজাদের চারপাশে। চন্দ্র কাকার হাসির মাদকতা বাতাসে ভাসিয়া আসে।

আজকের পথ-চলা বড় আনন্দদায়ক। থাক তরমুজের বোঝা। তবু। বড় তরমুজ আমজাদের পক্ষে বোঝা বিশেষ। বারবার ফেরী করিতেছিল সে। পিতার পদক্ষেপ দ্রুত নয়, এইটুকু যা সুবিধা।

আমজাদ শেষে মাথায় তুলিল তরমুজটি।

একফালি মেঘ পাতলা আবরণে হঠাৎ চাঁদের মুখ ঢাকিয়া দিল। প্রান্তরের উপর ঈষৎ

মানিমা। মাক্ড়া অন্ধকার জমিয়া ওঠে সড়কের উপর।

আজহার খাঁ আজ খুব ক্লান্ত। চন্দ্র কোটাল আমজাদকে সন্ধ্যার আগে পৌছাইয়া দেয় নাই। অপেক্ষা করিয়াছিল কিছুক্ষণ আজহার খাঁ। খামাখা বসিয়া থাকা আর তামাক ধ্বংস করা তার ধাতে পোষায় না। তাই সে আবার কাজে লাগিয়াছিল। জমির টুকিটাকি কাজে অনেকক্ষণ কাটিয়াছে। তারপর আসিল চন্দ্র আর আমজাদ। সুতরাং আরো বিলম্ব হইয়াছিল। চন্দ্র কোটাল কত কথাই না বলে। নেশা কাটিয়া গিয়াছে তার। সুখ-দুঃখের কথায় রাত্রি বাড়ে। জ্যোৎস্না রাত্রি, আজহার খাঁর কোন তাড়া ছিল না। চন্দ্র আজ আর বাড়ি ফিরিবে না। তরমুজ ক্ষেত পাহারায় তার রাত্রি কাবার হইয়া যাইবে।

ছেলেটাকে আবার মাঠে এনো, আজহার ভাই।

শিস্ দিতে দিতে মাঠে নামিয়াছিল চন্দ্র। তার অপরূপ চলার দুলকি ভঙ্গী আমজাদের সামনে স্পষ্ট। পিতার উপর আবদারের জোরটা এবার বিফলে যাইবে না, কোটাল কাকার মত মুরব্বী রহিয়াছে যখন।

আবার চাঁদের মুখ দেখা যায়। মেঘেদের নেকাব খুলিয়া গিয়াছে। সড়কের উপর উজ্জ্বল দিনের আলো ঝরে যেন। আমজাদ গ্রামের প্রবেশ-পথে একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। দিগন্তের মেঘলা আলো অন্ধকার প্রান্তরের বিবাগী সীমানা আঁকিয়া দিতেছে। রবিফসলের ক্ষেতের উপর বহু বাঁশ-ডগালির ছায়া উঁচানো। পেচকের দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার উপর বসিতেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় মেঠো ইঁদুর শিকার দেখা যাইত। আর একটা কৌতূহলের উঁকি আমজাদের মনে। দিনের আলোয় অন্ধ পেঁচা ইঁদুরের মত চতুর প্রাণী শিকার করিতে পারে, তার বিশ্বাস হয় না। চন্দ্র কাকার কাছে সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইবে।

অবোধ বালকের পশ্চাতে প্রান্তরের ইশারা মাথা কুটিতে থাকে। গ্রামের সরু সড়ক। আশেপাশে প্রতিবেশীদের ঘর। জন্মপদের জীবনে এখনও কোলাহল থামে নাই। প্রথমই পড়ে নুতন খাঁয়েদের পাকা দহলিজ। ছেলেরা হুলা করিয়া পড়িতেছে। জমিদারী সেরেস্তার কারখানায় নায়েব পাইকেরা কোন মন্ত্রণায় মাতিয়াছে। মহবুব মির্খার মুদিখানায় এখনও খরিদদার আছে। টিমটিম আলো জ্বলিতেছে। মহবুব বসিয়া আছে একটা চৌকির উপর দাঁড়ি-পাল্লা হাতে। সন্ধ্যার পর গ্রামের চাষী-মজুরদের সওদা আরম্ভ হয়। এক পয়সার তেল, আধ পয়সার লঙ্কা, সিকি পয়সার নুন। ছোট মুদিখানা, তার খরিদদারগণের চাহিদাও অল্প। দিনের বেলা ফুরসৎ থাকে না কারো। অবেলা সন্ধ্যায় সওদা শুরু হয়। মহবুবের মুদিখানায় এখনও আলো জ্বলিতেছে, তা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

আজহার খাঁ লাঙল মাটির উপর নামাইয়া রাখিল।

ঝিরঝির বাতাস দিতেছিল। সে মাটির উপর বসিয়া গামছা দোলাইতে লাগিল। আজহার খাঁ রীতিমত ঘামিতেছে।

হাউ।

বলদ দু'টি অগ্রসর হইতেছিল। আজহার খাঁর ডাকে থমকিয়া দাঁড়াইল।

বাবা আমু, তরমুজটা রাখ। একবার দোকানে যা।

আমজাদ পিতার আদেশমত তরমুজ সাবধানে মাটির উপর রাখিল, হাত ফসকাইলে

চৌচির হইয়া যাইবে।

এই নে বাবা, দুটো পয়সা। আমি একটু জিরোই। লাঙলটা দিন দিন ভারী হয়ে যাচ্ছে।

কি আনবো, আক্বা।

দুটো পয়সা। দেড়-পয়সার বিড়ি আর আধ পয়সার দেশলাই।

তারপর একটি খালি দেশলাইয়ের খোল আজহার লুঙির ট্যাক হইতে বাহির করিল।

এই নে খোলটা। গোটা কুড়ি কাঠি দেবে। গুণে নিস, বাবা। পয়সা হাতে লইয়া আমজাদ ইতস্তত করে।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আমি যাব না আক্বা।

কেন?

আধ পয়সার দেশলাই, লজ্জা লাগে।

হঠাৎ ক্লান্তি-জনিত বিরক্তি বোধ করে আজহার খাঁ।

এই জন্য মনে করি আর মথতবে পাঠাব না তোকে। গরীবের ছেলে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মিশে মেজাজ এমনি হয়ে যায়।

আমজাদ দোকানে এক পয়সার লজেঞ্জুস কি কড়ি-বিস্কুট কিনিতে আসে। গেরস্থালির সওদা কোন দিন করে না। প্রথম দিনের কর্তব্য ষোল্ল ঠেকে তার কাছে।

যা।

মোলায়েম নয় কঠস্বর আজহার খাঁর। যত্নে যেমন পয়সা তেমন কেনে, লজ্জা কিসের?

পিতার শেষ বাক্য আমজাদের কানে প্রবেশ-পথ পায় না, সে দোকানের দিকে অগ্রসর হইল।

বলদ দু'টি সম্মুখে। লেজ দেলাইয়া মশা তাড়াইতেছে। আজহার খাঁ আর একবার হাঁকিল, হাউ।

ফিরিয়া আসিল আমজাদ। কাঁচু-মাচু মুখ।

আক্বা, দেশলাই ফুরিয়ে গেছে। মোটে দশটা কাঠি আছে। আর সিকি পয়সার নুন দেবে, দোকানী বললে।

যা, তাই নিয়ে আয়।

এইখানে কাঠা-দুই ফাঁকা খামার। চারপাশে পাড়ার গাছপালা। বাতাস আসে না বেশি। আজহার খাঁ প্রতীক্ষা করে।

এই নাও, আক্বা।

আজহার খাঁ কাঠি গণিয়া দেখিল। নুনের প্যাকেট, দেশলাই, বিড়ি গামছার খুঁটে বাঁধিয়া বলিল, চল বাবা।

তরমুজ যেন ভারী হইয়াছে দশগুণ। আমজাদের মনে বিশ্বাস জমিয়া উঠে। মাঠে বিচরণের আনন্দ উবিয়া গিয়াছে তার। পিতার দিকে চাহিয়া তার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। দুটি বলদের সঙ্গে আর একটি পশু যেন হাঁটিতেছে লাঙল কাঁধে। ঘণার সর্পিণীরা ক্রুদ্ধশ্বাস ফেলিতেছে কচি বুকের ভেতরে।

মুখ ভার করিয়া পিতার পেছনে পেছনে চলে আমজাদ ।

খায়েদের সড়ক আরো সঙ্কীর্ণ । দু'পাশে বেত আর হেলধগ ঝোপ ঘন । চাঁদের আলো গাছের ফাঁক দিয়া সন্তর্পণে মাটির উপর নামে । ভালরূপে সড়ক দেখা যায় না । লাঙলের ফলক পাছে লতায় জড়াইয়া যায়, আজহার খাঁ পদক্ষেপ তাই আরো শ্রুথ করে ।

বাবা, আমু, আমার ঠিক পেছনে আয় ।

আমজাদ বাবার কণ্ঠস্বর চেনে । আশঙ্কা স্নেহ-বাৎসল্য রসের প্রস্রবণরূপে জ্যোৎস্নার মতই ঝরিতেছে যেন ।

আমজাদ ভয় পায় । পিতার নিকটে আসিয়া সে সোয়াস্তি অনুভব করে । বুক হাল্কা হইয়া যায় ।

আমু ।

আব্বা ।

রাগ করেছিস আমার উপর?

আমজাদ হঠাৎ জবাব দিতে পারে না । পিতা কী তার মনের গতিবিধি বোঝে?

না, আব্বা ।

লাঙলের ফলা হেলধগ-লতায় জড়াইয়া গিয়াছিল । আজহারকে দাঁড়াইতে হয় ।

এক হাতে লতাটা সরিয়ে দাও, বাবা ।

আমজাদ অতিকষ্টে লতা-মুক্ত করিল ফলাটি । আরো সাবধানে পা ফেলে আজহার ।

কুণ্ঠিত চাঁদের মুখ । বন-রাজ্য ভেদ করিয়া স্পষ্ট আলো এদিকে আসে না ।

আজহার খাঁ বলে, গরীব ব'লে, মন খারাপ করতে নেই । সব আল্লার ইচ্ছা । না হলে খোদা নারাজ হন ।

আমজাদ কোন জবাব দিল না । সে শুধু শোনে ।

ঝিল্লীস্বর বিজন গ্রাম-ভূমির উপর প্রহর-কীর্তন করিতেছে । বড় বকুল গাছে চাঁদের আলোয় হনুমান-দল এখনও জাগিয়া রহিয়াছে । ছানাগুলোর কিচকিচ্ শব্দ শোনা যায় । লাফালাফির হট্টরোল উঠে বকুল-ডালে ।

এই পথে একা-একা চলা আমজাদের সাহসে কুলায় না । পীরের মাজার রহিয়াছে বকুলতলায় । গাঁয়ের লোকেরা প্রতি জুম্মার রাতে মানৎ শোধ করিয়া যায় । আজদাহা সাপের পিঠে আরোহণ করিয়া দরবেশ সাহেব গভীর রাতে গ্রাম-ভ্রমণে বাহির হন । বড় মেহেরবান পরলোকগত এই দরবেশ, শাহ্ কেরমান খোরাসানী । সকলের দুঃখের পশরা তিনি একাকী বহিয়া বেড়ান । সামান্য অসুখ-বিসুখে পীরের মাজার একমাত্র আশ্রয় ।

কুড়িহাত বেড় মোটা বকুলের গুঁড়ির দিকে চোখ পলক মাত্র নিবদ্ধ করার সাহস হইল না আমজাদের ।

গুঁড়ির উপরে মোটা দু'টি ডাল । তার মাঝখানে একটি বিরাট গহ্বর । আজদাহা সাপ এইখানে বাস করে । মাঝে মাঝে দিনে বাহির হয় । কিন্তু কাউকে কিছু বলে না ।

কিংবদন্তীর অন্ত নাই । কত কাহিনী না দরিয়াবিরির কাছে আমজাদ শুনিয়াছে । গা ছমছম করে তার ।

জাগ্রত দরবেশ । গ্রামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই মানত করে এই মাজারে ।

টুপ্টাপ পাকা বকুল ফুল পড়িতেছে। আমজাদ এই শব্দ চেনে। কাল খুব ভোরে বকুল কুড়াইতে আসিবে সে।

পড়ে ভিটে সম্মুখে। বর্ষায়াত ঘরের দেওয়াল এখনও খাড়া রহিয়াছে। আলো-অন্ধকারে বিজন, বেত আর বনতুলসীর ঝোপে ভয়াবহ, প্রতিবেশীদের আভাসভূমি মহাকালের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আর সামান্য পথ। এই সড়কটুকু শেষ হইলে দহলিজে পৌছাইবার রাস্তা।

আমজাদের মন আনন্দে নাচিয়া উঠে। শাদা-কালো রেখাসম্বিত তরমুজের দিকে সে বারবার চায়। মা আজ খুব খুশি হইবেন। গুমোট মনের আবহাওয়া এতক্ষণে কাটিয়া যায়।

নবমীর চাঁদ পশ্চিম গগনের সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে দিক মেঘলার দিকে অবতরণ করিতেছে। আকাশের এই কোণটা শাদা মেঘের আলিঙ্গনে দিঘীর মত মনে হয়।

দহলিজের সড়কে আসিয়া আমজাদ আর পিতার পেছনে পড়িয়া থাকে না। পাশ কাটাইয়া অগ্রবর্তী হইল সে। এইসব জায়গা তার মুখস্থ। বন-জুয়ানের ছোট তরুলতা কোথায় ফুটিয়া আছে, তাও সে চোখ বুঝিয়া বলিতে পারে।

দহলিজের প্রাঙ্গণে আসিয়া আমজাদের ভয় লাগে। একটা ছায়ামূর্তি যেন সরিয়া গেল তার সম্মুখ হইতে।

বারার কাছে কোন আভাস দিল না সে। একবার মাত্র থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার পচাঘর্তী আমজাদ।

আজহার খাঁর দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। পুত্রের গতিবিধি সে লক্ষ্য করে নাই।

একটু দাঁড়া, আমু। লাঙল আর বলদ দুটো নিয়ে যা দেখি।

আমজাদ তরমুজ দহলিজের দৃষ্টিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাখিল। বাবাকে ভয় করে সে। নচেৎ ঘরে ঢুকিয়া মাকে অবাক করিয়া দেওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এমন সুন্দর বড় তরমুজ কে কবে আনিয়াছে এই সংসারে?

খড়ো দহলিজ। এক পাশে মাচাঙে বর্ষার সময় ঝড় তুলিয়া রাখা হয়। লাঙল, কোদাল, চাষের যন্ত্রপাতি থাকে এক কোণে। কোন মেহমান আসিলে বাকি দুই কোণ দখল করে।

আজহার খাঁ লাঙল কোণে দাঁড় করাইয়া ফিরিতেছে। তাহার মনে হইল কে যেন দহলিজের কোণ হইতে পূর্বদিকে চলিয়া গেল একদম দাওয়ার পাশে।

কে গো!

কোন জবাব আসে না, ছায়া-মূর্তি অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কে গো!

আমজাদ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিল, ভয় পায় সে। জীন্ আসিয়াছে দহলিজে! মার কাছে জীনের গল্প শুনিয়াছে সে। দহলিজে কোরান শরীফ আছে একখানি। রাত্রে তাহারা নাকি কোরান মজীদ পড়িতে আসে।

আজহার খাঁ ছেলেদের নিকট এই গল্প করিলে খুব চটিয়া যায়। তারও মনে খটকা লাগিয়াছিল।

জোরেই হাঁকিল সে, কে গো?

দাওয়া হইতে সে প্রাঙ্গণে লাফাইয়া পড়িল পাঁচন-বাড়ি হাতে ।

ছায়া-মূর্তি এবার ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে ।

আজহার আমজাদকে ডাকে : এখানে আয়, আমু ।

কে গো?

উলঙ্গ একটা ছোট মেয়ে । আবছা আলোয় আজহার চিনিল, তারই মেয়ে নঈমা ।

নমু, তুই এখানে?

কোন জবাব দিল না সে । তার ফোঁপানি কান্না বাড়িয়া যায় ।

এত রাত্রে তুই এখানে?

আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথা?

দহলিজে আজহার খাঁ সোরগোল তোলে । অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিল দরিয়াবাবি ।

এত গোলমাল কিসের?

আজহার খাঁ স্ত্রীর সম্মুখীন হইয়া বলে, দুধের মেয়েটা এই রাত্রে অন্ধকারে— কোন স্বোঁজ রাখা দরকার মনে করো না?

খুব দরকার । মনে করেছে ।

দরিয়াবাবি এবার নঈমার দিকে চড় তুলিয়া অগ্রসর হয় ।

দাঁড়া হারামজাদী ।

তিন বছরের মেয়ের মুখে 'রা' নেই । কলহেস্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইল আজহার খাঁ ।

কি হয়েছে, খুলেই বল না ।

এত বড় ধাড়ী মেয়ে, ফালি-কাপড়মি-হারিয়ে এল ।

আজহার জিজ্ঞাসা করে, কোন ফালি-কাপড়টা?

সেদিন যেটা গঞ্জ থেকে কিনে আনলে ।

ইশ্! আজহার অক্ষুট শব্দ করে ।

আর এমন হাবার ঘরের হাবা, কি করে হারাল বলতে পারে না ।

আজহার কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে ।

তার জন্যে খুব মার মেরেছ বুঝি?

দরিয়াবাবি ঝঙ্কার তোলে : আমি জানি, আমার হাত জানে আর জানে ওর পিঠ ।

আজহার নঈমাকে কাছে টানিয়া পিঠের উপর হাত বুলাইতে লাগিল ।

করেছ কি? এত দাগ!

মারবে না । সংসার নিয়ে আমি বুঝি অভাবের তাড়না । আর ওরা শুদ্ধ আমাকে জ্বালাবে ।

আজহার খাঁর রাগ বাড়ে প্রতিবেশীদের উপর ।

এমন চোরের পাড়া । হয়ত ছোট মেয়ে সব সময় কাপড় পরে না । কোথাও ফেলেছিল, ব্যস আর কী-চোর ত সব ।

দরিয়াবাবি যোগ দিল : সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি । কারো মুখে 'না' ছাড়া 'হা' শব্দ নেই ।

যাক, আর উপায় কি। নঈমাকে কোলে নাও।

আজহার বাথানে বাঁধিয়া বলদ দু'টিকে কয়েক আঁটি খড় দিল।

নঈমা পিতার সঙ্গ ছাড়ে না। দরিয়াবibi তাকে কোলে তুলিয়া লওয়া মাত্র সে ফোঁপাইয়া কান্না জুড়িল। মা মেয়ের মুখে চুম্বন করিয়া বলিল, কে ফালিটা নিল, মা?

নঈমা কাঁদে শুধু।

ঘরে চলো। আর দাঁড়িয়ে লাভ কি। আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি।

আমজাদ তরমুজ হাতে মা'র সঙ্গে চলে। এতক্ষণ সে কারো চোখে পড়ে নাই, বড় দুঃখ তার। গর্বের আনন্দ মাঝ মাঠে মারা গেল।

ঘরে ঢুকিয়া আমজাদ মা'র সম্মুখে তরমুজ রাখিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিল, মা তরমুজ।

দরিয়াবibির চোখেমুখে হাসির ঝিলিক খেলিয়া যায়।

আরে আমু-চাচা, কে দিল রে এত বড় তরমুজ?

উই মাঠের চন্দ্র কাকা।

বেশ পাকা তরমুজ ত। দরিয়াবibi আমজাদের দিকে চাহিয়া হাসে।

এতক্ষণে ভাল লাগে আমজাদের সব কিছু।

দরিয়াবibi নঈমাকে বলিল, ঐ দ্যাখ, কাল তরমুজ খাবি। কয়েকটি টোকা মারিল দরিয়াবibi তরমুজের উপর।

খুব খারাপ নয়, বাবা। দু'দিন ঘরে রাখতে হবে।

নঈমার মুখেও হাসি ফোটে।

মা, আমি খা-আ-বো।

হ্যাঁ, তুমিও খাবে।

পা মেলিয়া দরিয়াবibi মাদুরের উপর বসিয়া আমজাদকে সে তারই পাশে উপবেশন করিতে বলিল। আমজাদ মাঠের কাহিনী বর্ণনা করে মা'র নিকট।

কিন্তু মাঠে এত দেরী ভাল নয়। তোমার পড়া হলো না কিছুই। আজ একটু পড়ে নাও।

দরিয়াবibi মাটির ডিপা আর করঞ্জ তেল আনিল। কেরোসিন সব সময় কেনার পয়সা থাকে না। দরিয়াবibi খুব ভোরে উঠিয়া করঞ্জ ফল কুড়াইয়া আনে। তাই কলুর ঘানি হইতে তেল হইয়া ফেরে।

পড়ে নাও, বাবা। তোরা সকালে যাস্ খেজুর পাড়তে, বকুল কুড়াতে। চাট্টি করঞ্জা কুড়িয়া আনতে পারিস না?

নঈমা বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সে।

আজ মার খেয়ে পেট ভরল। আর রাতে খাবে, ওর যা ঘুম।

আমজাদের ভাল লাগে না এত রাতে পড়া। মা'র সামনে কোন অভিযোগ চলে না। টিম্‌টিম ডিপার আলোয় সে পড়িতে বসিল। দরিয়াবibi গৃহস্থালির কাজে উঠিয়া গেল।

পাড়ার আরো কয়েকজনের কাপড় চুরি গিয়াছিল। কেবল ছেলেদের কাপড় চুরি যায়। দরিয়াবibির বড় লাগিয়াছে আজ। মাত্র বার গণ্ডার পয়সার জিনিস। তার বহু

পরিশ্রমের ফল, উপলব্ধি করে সে।

দরিয়াবিবি সহজে দাগটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না।

নৈশ-ভোজনের পর আজহার গুড়ুক ফুঁকিতেছিল দাওয়ায় বসিয়া।

আমজাদ একপাশে নিজের কল্পনা লইয়া ব্যস্ত। শিমুল তুলার দানা বাছাই করে দরিয়াবিবি।

দ্যাখো, এমন সব চোর, খালি ছেলেদের কাপড় চুরি করবে।

আর কার কাপড় চুরি হয়েছে?

প্রশ্ন-কর্তা আজহার।

মতির ছেলের ধুতি, সাকেরের মেয়ের ছোট শাড়ি, আরো অনেকের।

এক রাশ ধোঁয়া ছাড়িল আজহার ঝাঁ।

একদম ছোটলোক ইতরের পাড়া হয়ে যাচ্ছে। ঝাঁয়েদের নাম-ইজ্জৎ আর থাকবে না।

দরিয়াবিবি ঈষৎ ঠোট বাঁকায়। আজহার তা লক্ষ্য করে না।

আজহার বলিতে থাকে, হাল-ফিল যারা পয়সাওয়ালা তাদের চাল-চলন আর বনেদী-বংশের চাল-চলন দ্যাখো।

দরিয়াবিবি স্বামীকে আজ চটাইতে রাজি নয়। সে পাজ করিয়া তুলা একটি কুলোর উপর রাখিতেছিল।

থাকবে কি করে বংশের ইজ্জত, গরীব যে ঈশাই।

দরিয়াবিবি হঠাৎ যেন কথটি হুঁড়িয়া ফেলিয়াছে এমন ভাব করে মুখের।

খালি পয়সা থাকলেই বংশের ইজ্জত থাকে না। মহেশডাঙার ঝাঁয়েদের নাম এখনও দশ-বিশ খানা গাঁয়ে পাওয়া যায়।

তা পাওয়া যায়।

দরিয়াবিবি সায় দিল।

কিন্তু পয়সা না থাকলে ইজ্জতও আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

এবার চুপ করে আজহার ঝাঁ।

স্বামীর আচমকা নীরবতা দরিয়াবিবি পছন্দ করে না। কথার সূত্র সে অন্য টানা-পোড়েনের মধ্যে রাখে।

কাপড়-চোর আমার হাতেই ধরা পড়বে, দেখো।

কত কষ্টে কাপড় কেনা, আর চোর শয়তানেরা এমন দাগাবাজি করবে!

দরিয়াবিবি ডাকিল, আমু।

কি মা?

দেখো কাপড়-চোপড় হারিয়ে না, বাবা।

না মা।

আমজাদ শিমুল-তুলার ছিন্ন অংশ বাতাসে ফুঁ দিয়া উড়াইতেছিল।

না মা, আমার কাপড় হারায় না।

আসেকজান বেলাবেলি ঘরে ঢোকে। আজ তার ব্যতিক্রম হয় নাই। কানে সে কম

শোনে। মাঝে মাঝে পরের কথা সে এমনভাবে বুঝিতে পারে, মনে হয় না সে বধির। অনেকের কাছে বুড়ি তাই সেয়ান-কালো নামে পরিচিত।

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন তার কানে গিয়াছিল। ভরা সাঁঝে বিছানায় আশ্রয় লইলেও বুড়ির ঘুম হয় না। চোখ বুজিয়া রোমছুনরত গাভীর মত অতীত-জীবনের জট খোলে সে। ভোর রাত্রির দিকে আসেক্জান কয়েক দণ্ড ঘুমায় মাত্র।

হঠাৎ আসেক্জান বাহিরে আসিল। দাওয়ার উপর খালাকে দেখিয়া আজহার জিজ্ঞাসা করিল, কি হলো, খালা?

বৃদ্ধা খালার উপর আজহারের মমতা বেশি। শুধু একটা ঘর দখল করিয়া আছে, নচেৎ কি আর এমন খবরদারী করে সে। তারই সংসার অচল হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে।

এই এলাম, বাবা। বলিয়া আসেক্জান দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল।

তারপর কথা পাড়ে আসেক্জান।

তোমাদের সংসার কি ছিল সাবেকী আমলে! না-হলে আমার এত কষ্ট! দরিয়া-বৌ ত সংসার চালাচ্ছে। লক্ষ্মী মেয়ে।

যার উদ্দেশ্যে প্রশংসা বর্ষিত হইতেছিল, সে একবার ক্ষেপেও করিল না।

তোমাদের কষ্ট আমি নিজের চোখে দেখছি।

দরিয়াবিবি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিল এইবার। স্বামী-স্ত্রী সংসার লইয়া হাজার মন্তব্য করে। কিন্তু অপর কেউ সংসারের বে-আক্রে এলাকা লইয়া আলোচনা করুক, দরিয়াবিবি তা আদৌ পছন্দ করে না।

আসেক্জানের বক্তব্য শেষ হয় নাই। সে পুনরায় বলে : আজকাল দীন-ঈমানও ঠিক নেই। দীন-দুঃখীদের দিকে কেউ চায় না।

বৌমা।

দরিয়াবিবির জবাব সংক্ষিপ্ত : কী।

তোমার কাপড়ের টানাটানি। দুটো কাপড় পেয়েছিলাম।

আসেক্জান তারপর আঁচল-ঢাকা দুটো কাপড় বাহির করিয়া বলিল, দুটো কাপড় তুমিই পর। আমার যা আছে চলে যাবে।

দরিয়াবিবির কণ্ঠস্বর চাঁচাছোলা : কোথা থেকে পেলেন শুনি?

ও পাড়ার ইজাদ চৌধুরীর মা ইন্তেকাল করেছিল, কাল মিশকীন খাওয়ালে আর কাপড় জাকাত দিলে।

জাকাত-জাকাত! দরিয়াবিবি হঠাৎ আগুন হইয়া উঠিয়াছে। দাঁত চাপিয়া সে আবার উচ্চারণ করিল, জাকাত!

জাকাত! আমি নেব জাকাতের কাপড়? আমার স্বামী বেঁচে নেই? ছেলে নেই? মুখে তোমার আটকালো না?

লাথি দিয়া এক জোড়া কাপড় দরিয়াবিবি দাওয়ার নীচে ফেলিয়া দিল।

আজহার হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করিতে পারে না। কাপড় দুটো দাওয়ার নীচে হইতে সে কুড়াইয়া আনিল।

খবরদার! এমন কথা মুখে আনবে না। বের করে দেব আমার ঘর থেকে। তোমার

জাকাতের মাথায় সাত পয়জার।

ধর্মভীরু আজহার খাঁ এমন কটুবাক্য পছন্দ করে না।

দরিয়া-বৌদি, ক্ষেপে গেলে নাকি! এসব কী বকছো?

চুপ করো। যারা জাকাত নেয় তারা আর মানুষ থাকে না। জানোয়ার হই নি এখনও।

আল্লা আমার হাত-পা দিয়েছে। মড়ার পেটের জন্যে হাত পাবে না কোনদিন।

নিরীহ আজহারও বেশ চটিয়া যায়।

কাল থেকে তা হলে লাঙল ধরো মাঠে।

দরকার হলে তাও ধরব।

আজহার খাঁ চুপ করিয়া গেল। দরিয়াবাবি সমস্ত সংসার ঠিক রাখিয়াছে। অনিপুণ গৃহিণী ঘরে থাকিলে সে সংসার ছাড়িয়া দরবেশ হইয়া যাইত এতদিন।

তোমাকে ভাল মুখে বলছি, খালা এসব কথা কোনদিন মুখে এনো না। আমরাও গরীব। দু'মুঠো যা-হোক করে চলে যাচ্ছে।

তোমার দরকার নেই? জানো না, তোমার জাকাতের চাল আমরা পয়সা দিয়ে কিনে নিই!

আসেকজান স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে পাষণ-মূর্তির মত। ধূলা-লাগা কাপড় দুটো বুকে করিয়া সে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

আমজাদের হাই উঠিতেছিল। সে ঘুমাইতে চায়।

হাতের তুলায় দ্রুত পাঁজ দিয়া দরিয়াবাবি বলিল, ও ঘরে শুতে হাস নি। আমার কাছে শো।

আমজাদ আর পা বাড়াইল না। আজহার খাঁ চুপচাপ বসিয়া রহিল। অকস্মাৎ দম্কা ঝড় বহিয়া গিয়াছে যেন দাওয়ার উপর।

মাঝরাতে দরিয়াবাবির ঘুম ভাঙিয়াছিল। তার পাশে আমজাদ নাই। শয্যা শূন্য। কোথায় গেল আমজাদ?

ডিপা জ্বালিয়া সে আসেকজানের ঘরে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিল। আমজাদ তার পরিচিত জায়গায় মাদুরের উপর অঘোরে ঘুমাইতেছে। আর আসেকজান উবু হইয়া বসিয়া গিয়াছে। হাঁটুর উপরে অবনত মুখ। শনের মত শাদা চুল সম্মুখে-পেছনে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ফোঁপানির শব্দ উঠিল। কাঁদিতেছে বৃদ্ধা আসেকজান? দরিয়াবাবি সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দারিদ্র্যের নারী-প্রতীক যেন ওই গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছে। আদ্যার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জীবন। এই তার পরিণতি! দরিয়াবাবি অসোয়াস্তি অনুভব করে। দারিদ্র্যের দাবানলে সংগ্রাম বিস্কন্ধ জীবনের সমগ্র ঐশ্বর্যসম্পদ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। লোল-চর্ম কোটারাগত চক্ষু ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে মানুষের আত্মার দিকে চাহিয়া আছে মাংস লোভী কুকুরের মত।

দারিদ্র্যের উলঙ্গ রূপ দরিয়াবাবির চোখে যেন এই প্রথম ধরা দিল। সে কেন এখানে আসিয়াছে স্বর্ণপুরী হইতে নিবাসিত রাজনন্দিনীর মত? সে কেন এখানে আসিয়াছে? পোড়া ক্ষতের জ্বালা অনুভব করে সে। তার চোখেও অশ্রুর প্লাবন নামে।

ফুৎকারে ডিপা নিভাইয়া দরিয়াবাবি অন্ধকারে আসেকজানের কাছাকাছি আসিয়া ডাকিল, খালা!

গোধূলি বেলা।

উঠানে নঈমা ছাগলছানা লইয়া খেলা করিতেছিল। আজ বেলাবেলি আজহার মাঠ হইতে ফিরিয়াছে। অবসর সময়টুকু এইখানে কাটে তার। বড় নিঃসঙ্গ আজহার। অন্যান্য প্রতিবেশীদের মত তাস-পাশা খেলিয়া সে সময় অপব্যয় করিতে জানে না। সাংসারিক কথাবার্তা হয় দরিয়াবিবির সঙ্গে। যখন কোন কাজ থাকে না, একমনে সে গুড়ুক ফোঁকে। আমজাদ দহলিজে থাকিলে কথা বলিবার কোন ছুতা পাওয়া যায় না। নঈমার সঙ্গে বাক্যালাপের কোন বিষয় নাই।

ফুটফুটে ছাগলছানা। কালো মিশমিশে গায়ের উপর অন্তমিত সূর্যের লালিমা পড়িতেছে। রঙের পিণ্ড যেন সঞ্চরণশীল। ধাড়ী ছাগলটি খড়ের উপর শুইয়া রহিয়াছে। নঈমা তাই ব্যস্ত।

আরো চঞ্চল ছানা দু'টি। একবার মা'র কাছে ছুটিয়া যায়। দুধের বাঁট টানে কিয়ৎক্ষণ, তারপর ম্যা-ম্যা শব্দে প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়ায়। পশ্চাতে ছোটো নঈমা। হয়ত সহজে ধরা দিল না। রাগে সে মা'র কাছে অভিযোগ করে। তখন কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। নঈমা আনমনা অন্যদিকে চাহিয়া একটি ছানার উপর জোরে হাত রাখে। ভীত চীৎকার ক্ষণিক। তারপর আদরে গলিয়া যায় ছাগশাবকরা। নঈমা ছানা বুকে করিয়া গায়ের উপর নরম হাত বুলাইতে থাকে। ছাগ-মাতা ছুটিয়া আসিলে নঈমা সরিয়া যায়।

আজহার খাঁ মেয়ের লীলা-চপল ভঙ্গী দেখে। গুড়ুকের ধোঁয়ায় চোখ ফ্যাকাশে। কোন মন্তব্য তার ঠোঁটে আসে না। দরিয়াবিবি গেরস্থালির অন্যান্য কাজে ব্যস্ত।

একটু পরে আসিল আমজাদ। বগলে একগাদা তালপাতা। মখ্তব হইতে এইমাত্র সে ছুটি পাইয়াছে। দিনের আলোক থাকা পর্যন্ত মৌলবী সাহেব ইলেম-দানে কার্পণ্য করেন না। চপল-মতি বালকেরা এই সময় খুব করিয়া নামতা পড়ে।

অনেকক্ষণ পূর্বে আসিত আমজাদ। ছুটির পর তালপাতা ধোয়া— আর এক কাজ। রোজ রোজ তালপাতা দপ্তর হারাইলে মা বড় বিরক্ত হয়। কালির দাগ সহজে ছাড়ে না। ডোবার পানি ভাল নয়। এমনি দেৱী হইয়া যায়। শুধু ভয়ে আমজাদ কোন প্রতিবাদ করে না। মখ্তবে যারা কাগজে লেখে তাদের সঙ্গে ইদানীং নিজের তুলনা করিতে শিখিয়াছে আমজাদ।

মন বিষণ্ণ। তাই উঠানে আসিয়া সে চুপিচুপি আজহার খাঁর পাশে বসিয়া পড়ে। মা'র সঙ্গে কোন বাক্যালাপ হইল না। কিন্তু নঈমার খেলা দেখিয়া সে সব ভুলিয়া যায়। নিজেও এই খেলায় সানন্দে যোগ দিল।

এইবার ছাগ-শিশুরা ভীত। আমজাদের সঙ্গে দৌড়পান্নায় তারা অক্ষম। ম্যা ম্যা শব্দ করে শুধু। ভাই-বোনে উঠান মাং করিয়া রাখে।

বোধ হয় ফুরসৎ পাইয়াছিল দরিয়াবিবি। সেও বাতাসে আসিয়া বসিল।

আমু !

কি মা? জবাব দিল আমজাদ।

বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করিস নি, ন্যাটা হয়ে যাবে বাচ্চা দুটো।

না মা, আমি ত বেশি ছুঁইনি।

নঈমা প্রতিবাদ করে : মা, আমি তো খেলা কচ্ছি।

হ্যাঁ, খেলা করো।

সন্ধ্যা নামিতেছে ধীরে ধীরে। উঠানে অন্ধকার ঘন হইয়া আসে। দরিয়াবিবি চুল মেলিয়া দিল বাতাসে। সারাদিনের ক্লান্তি ঘামে আর পরিশ্রমে। হাওয়া লাগুক একটু গায়ে।

উঠানে অন্ধকার। নঈমা ও আমজাদের মাহেন্দ্রক্ষণ। এখন ইচ্ছামত বকুরী ছানাকে আদর করা চলে। যতই জোরে পিঠে দমক দাও না কেন, মা'র চোখে পড়িবে না কিছুই। কিন্তু ছানাগুলি যা বজ্জাত! আদরের নামে একটু জোরে কোথাও টিপ দিলে বড় ম্যাঁ ম্যাঁ শব্দ করে। মা'র ধমক দিতে তখন বিলম্ব হয় না।

দরিয়াবিবি বলে, আরে বাবা চৌদ্দগুরুষ, একটু আস্তে ছুটোছুটি কর।

মা, ভারী ডরুক ছানা দুটো। কাছে গেলেই ম্যাঁ ম্যাঁ।

ছাগলের ডাক অনুসরণ করিতে লাগিল আমজাদ। অন্ধকারে আজহার খাঁ নীরবে হাসে। তার অস্তিত্ব সবাই বিস্মৃত হইয়াছে। ঘরের দাঁওয়ায় ডিপা জ্বলিতেছিল। অস্পষ্ট আলো উঠানে সামান্য পৌছায়। ছায়া-মূর্তির উপনিবেশ। কেউ কারো মুখ দেখিতে পায় না।

উঠানের নিচে আগাছার বন। খুব ঘন। প্রতিবেশীদের কলাগাছের ঝাড় তারপর কয়েক কাঠা জুড়িয়া। আজহার খাঁ সামান্য সরুপথ পৈঠার সাহায্যে অতিক্রম করে। এই দিকে বিশেষ কোন কাজ থাকে না। বর্ষার দিকে কতগুলি ডোবায় রাখে মাছ ধরিতে যাওয়ার খুব সুবিধা। সেই জন্য পথটুকু।

ছাগলছানারা শান্ত। যা দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। দরিয়াবিবি চুপচাপ বসিয়াছিল। আজহার খাঁ নিজেই ডিপা হইতে কয়লা ধরাইয়া আনিল। সে ফরমাশ-করা ভুলিয়া গিয়াছে নাকি? হাসে দরিয়াবিবি অন্ধকারে।

পরক্ষণে বড় বিরক্তি লাগে তার ছেলেদের হল্পা।

এই, চুপ কর তোরা।

আমজাদের কোলে একটা ছাগলছানা চীৎকার করিতেছিল। ভয়ে সে বাচ্চা মাটির উপর ফেলিয়া দিল। নূতন প্রাণ পায় ছাগশাবক, মা'র কাছে এক দৌড়ে ছুটিয়া যায়।

দরিয়াবিবির পাশে ভাই-বোন শান্ত হইয়া বসে। অন্ধকার থমথম করে।

মা কোন কথা বলে না, আমজাদ আরো ভয় পায়। ক্ষুণ্ণ স্বরে সে ডাকে, মা।

কি?

মা'র কোলে মাথা রাখিয়া সে উঠানে পা ছড়াইয়া দিল। প্রশ্ন করার কিছুই ছিল না, আমজাদ চুপ করিয়া থাকে।

উঠানে নিঃশব্দতা।

পাঁচ মিনিট পরে দরিয়াবাবি আমজাদকে প্রশ্ন করে, ঘুম পায় নি ত?

না, মা।

তোর আব্বাকে ডেকে দেখ ত, জেগে আছে?

ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠে কথা বলে সে।

আব্বা! আমজাদ হাঁকে।

কি আব্বা?

জেগে আছো তুমি?

হ্যাঁ।

দরিয়াবাবি পিতা-পুত্রের সংলাপ শোনে।

আর একবার জিজ্ঞেস কর, শিমুলে গিয়াছিল বিকেলে?

শিমুলিয়া গ্রামের নাম।

আব্বা, তুমি শিমুলে গিয়েছিলে বিকেল বেলা?

জবাব দিল আজহার খাঁ, না।

এইবার দরিয়াবাবি সোজাসুজি স্বামীর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল।

বাচ্চা দুটোর যা হয় করো। পাঁঠা না হয়ে যায়। খুনকারদের ডেকে এনো।

পাঁঠা হবে কেন, ভারী তেজী বাচ্চা।

খবরদার, বেচে ফেলো না যেন মাঠ থেকে। দু'জনে ব্যাপারী তোমার খোঁজ করছিল।
না।

আজহার খাঁ কণ্ঠস্বর উত্তাপহীন। তামাকের নেশায় ঝিমোয় সে। নঈমা ঘুমে ঢুলিতেছিল, দরিয়াবাবির লক্ষ্য পড়িল তার উপর। ছাগলছানা দু'টি উঠানে দৌড়াদৌড়ি করে। আমজাদের লোভ হয়, মা'র ভয়ে সে ছোঁচোরা-চাউনি ছোঁড়ে। আর একটু খেলতে পেতাম, মা, ভারী বজ্জাত। ঠোট বাঁকায় আমজাদ।

উঠানের কিনারায় ছানা দু'টি কয়েকবার থমকে দাঁড়ায়, কেউ লক্ষ্য করে না।

একটু পরে হঠাৎ একটি লাল জন্তুর ছায়া পড়ে। এই সময় ম্যাঁ শব্দে সকলে চমকিত হইয়া উঠিল।

হতভম্ব হইয়া আজহার চীৎকার দিতে থাকে, শেয়াল, শেয়াল। আ-তু, আ-তু।

কুকুর ডাকে সে প্রাণপণে। একটি ছানা ধাড়ীর কোলে ফিরিয়া আসিল।

পলকে কি ঘটিয়া গেল, দরিয়াবাবি সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। পাড়ার দু'টি কুকুর ছুটিয়া আসিল। কয়েকবার মাটি শৌকার পর তারাও উঠানের নিম্নবর্তী জঙ্গলে উধাও হইয়া গেল।

শেয়ালে নিয়ে গেল ছানাটা? দরিয়াবাবি জিজ্ঞাসা করে।

লাঠি দাও, আমি পুকুর পাড় দেখে আসি।

উঠানে বাঁশের টুকরা পড়িয়াছিল। আজহার অন্ধকারে আড়াল হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ মাত্র। ডিপা আলোয় দরিয়াবাবি বারবার দেখিতে লাগিল। নঈমা, আমজাদ তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বড় বিরক্ত হয় দরিয়াবাবি : সরে যা। হাঁ করে কি দেখছি'স সব?

তারপর মা খেদোক্তি আরম্ভ করে। শিয়ালের বংশ উদ্ধার হয় গালিগালাজে। ধাড়ীর পাশে যে ছানাটি ফিরিয়া গিয়াছে সেটা কৃশ। আরো আপশোস করে দরিয়াববি। ভাল খাসী ছানাটাই মড়ার শেয়ালের চোখে পড়ল।

আজহার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, পাতি পাতি করে খুঁজেছি। ছোট ছানা। মুখে করে দৌড় মেরেছে শেয়াল।

এত কষ্টই সার হলো। আর বছর চার-পাঁচ টাকার মাল হতো। খামখা গতরের মেহনত।

নঈমা কান্না জুড়িয়া দিল।

দরিয়াববি তার দিকে আদৌ ফিরিয়া চাহিল না।

ছেলেগুলোই বদ। রোজ বিকেল-বিকেল তুলে দিই। আজ ভাবলাম। ছেলেরা খেলা করছে, থাক এখন।

আরো কাল্পনিক সভাবনার কাহিনী আওড়ায় দরিয়াববি। শান্ত আজহার ধোঁয়া সেবনে বসিয়া পড়িল পুনরায়।

ছোট ছাগল-শিশু। তবু কারো মনে আনন্দ নাই এই পরিবারে। নৈশ-আহারে আরো বিলম্ব হইল। দরিয়াববির মেজাজ বড় কড়া। আমজাদ পর্যন্ত খাওয়ার কথা উত্থাপন করিতে ভয় পাইল। নঈমার কপালে রাত্রে ভাত জোটে না প্রায়ই। আজও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

ছাগ-মাতা উঠানে চীৎকার শুরু করিয়াছে।

দরিয়াববি খড় খাওয়াইতে লাগিল ছাগটিকে। অনেকক্ষণ আনমনা কাটিয়া যায়।

দরিয়াববির মুখ গম্ভীর। চোখের পড়িয়া ঢাকা অবনত চোখ দৃষ্টির অগোচরে।

আমজাদ মা'র কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। বক্তব্য মুখ হইতে বাহির হয় না। সে-সাহস নাই তার। হাই তুলিয়া সে করুণ চোখে মা'র দিকে চাহিয়া রহিল।

তোর ঘুম পেয়েছে? চল, ভাত দিই।

আজহার খাঁ এই সুযোগে সান্ত্বনা দিল : আল্লার কাছে শোকর, দুটো নিয়ে যায় নি।

দরিয়াববি ব্যঙ্গ স্বরে বলে, ওই মুখে ফুল-চন্দন দিতে ইচ্ছে করে! দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল আজহার খাঁ। কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করিল না।

অপর ছানাটির গায়ে দরিয়াববি হাত বুলাইতে লাগিল। কল্পনা রঙীন হইয়া উঠিল তার।

এমন আনমনা বসিয়া থাকা দুঃখ উপশমের ভাল পথ। শুধু আমজাদের জন্য দরিয়াববি ছাগল ও ছানা লইয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

রাত্রে ঘুম আসে না দরিয়াববির। সারাদিনের ক্লান্তি, তবু চোখে ঘুম নাই একফোঁটা। আজহার খুব অল্প সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

শৃগাল-ভুক্ত ছাগলছানার কথা দরিয়াববি সহজে ভুলিতে পারে না। হারাম হইয়া গেল তাহার এত মেহনতের ফল! একটা বকনা গরু দু'বছর টানা হইতেছে। তার বাছুরের সঙ্গে কোন দেখা নাই। কোনদিন মাঠ হইতে চুরি হইয়া গেলেই বা কি। কোন চারা আছে তার? আরও আশঙ্কার জাল দরিয়াববি নিজেই বোনে। লগভগ হইয়া যাইত সংসার, সে-

ও ভাল ছিল। দুঃখের অকূল পাথারে নিমজ্জনের আনন্দ দরিয়াবিবি এই মুহূর্তে অনুভব করে। ঘুমের ঘোরে নঈমা হাত-পা ছুড়িতেছে। বাম হাতের কনুই মায়ের বুকের উপর পড়ে। অন্যদিন হইলে সাদরে ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া দিত। আজ দরিয়াবিবি জোরে কচি কনুই ও-পাশ করিয়া দিল। কারো প্রতি কোন দয়া নাই তার। জানোয়ারের মত ঘুমাইতেছে আজহার। স্বামীর বিছানার আর এক প্রান্তে সরিয়া আসিয়াছে দরিয়াবিবি। আনমনা সে নঈমার কনুইয়ে আবার হাত বুলাইতে থাকে। মেয়ের ঘুম ভাঙে না।

আমজাদ আসেকজানের কাছে চলিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বড় হয় না কেন গরীবের ছেলেরা? সংসারের দুঃখ ঘুচিবে সত্বর। আমজাদের মখতবের পড়া কবে যে শেষ হইবে! শেষ হইলেও ভাবনার দায় হইতে রেহাই নাই। কাছে কোন স্কুল নাই। চার মাইল হাঁটিয়া এই দুধের বাচ্চারা ইলেম অর্জন করিবে? নঈমা বড় বাড়ন-সার। গরীবের মেয়ের পক্ষে যা' বিপজ্জনক। বিবাহের বয়সের আগেই আবার বিবাহের হাস্যাম। দরিয়াবিবি বিভীষিকার পুতুল ভাঙে আর গড়ে।

বাইরে আদিগন্ত অন্ধকারের নৈরাজ্য।

দরিয়াবিবি একবার বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। আমজাদ ঠিকমত ঘুমাইতেছে কী? আলস্য বশ্যতা মানে না। আবার শুইয়া পড়িল দরিয়াবিবি।

স্মৃতির রোমন্থন— আর কোন সান্ত্বনার প্রলাপ নাই অন্ধকারে।

ইঠাৎ প্রথম স্বামীর কথা মনে পড়িল দরিয়াবির। শুধু কী প্রথম স্বামীর কথা? মোনাদির— মোনাদিরকে সে ভুলিয়া গিয়াছে? মোনাদির হোসেন খাঁ। স্বামীপুত্রের বড় লম্বাচওড়া নাম রাখিয়াছিল। আকিকার সময় দরিয়াবিবি এই নাম পছন্দ করে নাই। তবুও শেষ পর্যন্ত নামটা বড় ভাল লাগিয়াছিল।

দরিয়াবির দীর্ঘ চোখে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু জমিতে থাকে। মোনাদির চাচার আশ্রয়ে এখনও কি সাদরে প্রতিপালিত হইতেছে? নিজের সন্তান, তবু এতটুকু অধিকার রহিল না তার।

সঙ্গতিপন্ন কৃষকের পুত্রবধূ। তিনখানা লাঙল চলে। লাখেরাজ জমি অল্প ছিল না। ভাতের অভাব পরিবারে উপলব্ধি করা কারো পক্ষে মুশকিল। একানুবর্তী সংসারে কাজ সব সময় লাগিয়া থাকিত। সারাদিন পরিশ্রমের পর তবু সেখানে বিশ্রামের আনন্দ ছিল। জোওয়ান স্বামীর মুখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে দরিয়াবির সম্মুখে। সংসার রচনার কত কল্পনাই না জমা হইয়াছিল বুকে। বর্তমানে ভবিষ্যৎ শুধু অন্ধকার ছাড়া কিছু চেনে না।

তোমার কোন কষ্ট নেই তো, দরিয়া?

না।

চাষিবাসীর সংসারের ঝঞ্ঝাট বেশি।

তা থাক।

খোকাটা বড় ঘুমায় ত, দরিয়া।

কাঁদে ভুক পেলে। ঘুমায় ত বাপের মত। মাথা কুটলেও সাড়া থাকে না।

অন্ধকারে হাসির ঝন্ঝনা বাজিয়াছিল সেদিন।

বড় হোক, ছেলেকে আমি শহরে পাঠাব লেখাপড়া শিখতে। মানুষ হোক, আর কিছু

চাই নে। আল্লার কাছে দিন-রাত দোয়া মাগি।

শহরে কত খরচা!

তা হোক। এখানে বাজে-খরচা সব কমিয়ে দেব।

তিন বছরের শিশুকে লইয়া এত কল্পনা।

ভাবীদের সঙ্গে তোমার বনে না, এই যা মুশকিল।

ওর বড় ছোট-মন। সারাদিন কত কাজ করি, তবু মা'র কাছে গিয়ে লাগাবে, তোমার বউ পটের বিবি হয়ে শুয়ে থাকে।

বলুক। তা নিয়ে ঝগড়া ভাল নয়।

স্বামীর কণ্ঠ অন্ধকারে এখনও বাজে। সে-ই শেষ রাত্রি। পরদিন সে গঞ্জে গিয়াছিল। পথে সর্প-দংশন। বাড়ি পৌছাইবার পূর্বেই গ্রামের হাটতলায় তার শেষ নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল। প্রাণবান স্বামীর মৃত্যু কোন বজ্রাঘাত সূচনা করে নাই। মোনাদির বক্ষে ছিল বলিয়া সব সহ্য করিতে শিখিয়াছিল দরিয়াবিবি। শ্বশুর তখনও জীবিত, তাঁর স্নেহ-মমতার আশিস ছিল সান্ত্বনার আর এক দিক। বৃদ্ধ জবেদ হোসেন মোনাদিরকে মাটিতে নামাইতে দিতেন না। মৃতপুত্রের শোকাগ্নি নিবারণের শেষ উপায়। কিন্তু তিনিও এক ভুল করিয়া গিয়াছিলেন জীবনে। তারই প্রায়শ্চিত্ত দরিয়াবিবি এখনও বহন করিতেছে। শাশুড়ী জীবিত থাকিলে কোন বিপত্তি দেখা দিত না। দুই মাসের মধ্যে শ্বশুরও জবেদ হোসেনের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন! এক বছর পরে রুক্ষ শক্ত ভূমিতে দাঁড়াইতে হইয়াছিল দরিয়াবিবিকে। যৌথ সম্পত্তি বণ্টন হইতেছে ভাইয়ে ভাইয়ে। কিন্তু এক কানাকড়িরও অধিকার নাই তার। স্বামী পিতার কোলে ইত্তেকাল করিয়াছেন। শরিয়ৎ মত শ্বশুরের সম্পত্তির উপর তার বা মোনাদিরের কোন অধিকার নাই। স্বামীর অন্যান্য ভাইদের নিকট দরিয়াবিবি শেষ আবেদন জানাইয়াছিল, মোনাদিরের ভরণপোষণ কিরূপে নির্বাহ হইবে। কর্ণপাত করে নাই তারা। দরিয়াবিবি মরহুম শ্বশুরের অজ্ঞতার উপর হাজার লানৎ বর্ষণ করিয়াছিল। তিনি জীবিত অবস্থায় এই বণ্টন-ব্যবস্থা করিয়া গেলে পথের ভিখারিণী হইত না সে।

তার কয়েক দিন পরেই দরিয়াবিবি স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়াছিল। দাসীবৃত্তির জীবন তার জন্য নয়। অন্যান্য ভাসুর এবং দেবরেরা তখন চণ্ডালের মত ব্যবহার করিয়াছিল। মোনাদিরকে তাহারা জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল। সেদিনের মর্মান্তিক দৃশ্য দরিয়াবিবির চোখে অগ্নিসহ বিদ্যুতের মত খেলিয়া বেড়ায়। সারা দুপুর তুমুল কলহের পর সে এক বস্ত্রেই পুত্রসহ স্বামীর ভিটা পরিত্যাগে প্রস্তুত ছিল। পালকীর কোন প্রয়োজন নাই তার। খাট যার ভাঙিয়াছে, ভূমিশ্যা ছাড়া তার আর কী গত্যন্তর আছে?

মোনাদিরকে কোলে করিয়া সে পথে নামিয়াছিল।

একজন দেবর এই সময় ছুটিয়া আসে, “ভাবী—ভালো হচ্ছে না। আমাদের বংশের ইজ্জত নষ্ট করছ তুমি।”

ইজ্জত? যাদের বিচার নেই, তাদের আবার ইজ্জত?

তুমি এখানে থাক, কে তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে!

এমন করে আমার থাকার দরকার? তোমাদের বিবিজানদের বাঁদী হয়ে থাকবার কোন দরকার নেই। না খেয়ে দিন কাটবে?

তোমার খাওয়ার অভাব হবে না।

পরের হাত-তোলা খাওয়ার দরকার নেই আমার। রাস্তা ছাড়ো। আমার সম্পত্তি আছে?

কোরান-কেতাবে যা লুকুম আছে, সেই মত কাজ করছি, আমাদের দোষ দাও কেন? বাপের কোলে বেটা মরলে তার ওয়ারিসানাদের কোন দাবী-দাওয়া থাকে না।

ওসব হাদিস কালাম আমার কাছে শোনাতে এসো না। মানুষকে পথের ভিখারী করতে আত্মা বলে দিয়েছে?

আরো কথা কাটাকাটি।

তবে, ছেলে দিয়ে যাও।

তোমাদের চাকরের অভাব আছে বোধ হয়।

বড় ভাবীর ছেলেপুলে নেই, সে মানুষ করবে।

অত ছোট ছেলে তো চাকরের কাজে অক্ষম। তা মানুষ করতে হবে বৈকি!

তারই চোখের সামনে মোনাদিরকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল। দরিয়াবিবি আর মুখ পশ্চাতে ফিরায়ে নাই। অতীতের সমস্ত সম্বন্ধ চুরমার হইয়া যাক। যেন কোন ক্ষোভ নাই তার।

বংশের ইজ্জত!

আগু রমণীর মত দরিয়াবিবি সেদিন গর্জন করিয়াছিল।

ইহাদের মুখে চুন-কালি দেওয়ার আর কোন পথ সে অনাবিষ্কৃত রাখিবে না। পাঁচ মাস পরে বিপ্লবীক আজহার খাকে নেকাহ করিল দরিয়াবিবি।

চোখ বুঁজিয়া নিস্তার নাই। দরিয়াবিবির সম্মুখে অতীতের বিষধর ফণা চক্র দোলাইয়া জুকুটি ছড়াইয়া যায়। কত মুখ ভাসিয়া আসে — জবেদ হোসেন-আহাদ হোসেন-মোনাদির।...মোনাদিরের কপালে একটা কালো দাগ ছিল জন্মাবধি। গৌর চেহারায় জর উপরে গোল দাগ... চুম্বনে চুম্বনে মুছিয়া গিয়াছে কী দাগ? এখনও শূশান পাহারায় রত চণ্ডালের অট্টহাসের মত অন্ধকারে ঝন্ঝনা বাজিয়া যায়।

নঈমার কচি মুখের উপর দরিয়াবিবি তার অশ্রুসিক্ত ঠোঁট চাপিয়া ধরিল। জ্বালা ধরে দুই চোখে। নিরবচ্ছিন্ন বিস্মরণ-পিপাসু পীড়িত হৃদয়— কোন যমতাময়ী শিয়রে জাগিয়া দাঁড়াক একবার। দরিয়াবিবি তারই প্রতীক্ষা করে!

৫

কয়েকদিন পরে দরিয়াবিবি আসেকজানের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল বুড়ি চূপচাপ বসিয়া আছে, জাকাতের পাওয়া কাপড় দু'টি নাড়াচাড়া করিতেছে। নিঃশব্দে আসিয়াছিল দরিয়াবিবি। বুড়ি কিছুই টের পাইল না।

‘খালা’ ডাক শুনিয়া সে নিজের আঁচলের ভেতর কাপড় দু'টি ব্রস্ত তুলিয়া লইল, যেন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে।

কোন জবাব দেওয়ার পূর্বেই দরিয়াবিবি বলিল, খালা, রাগ করো না। একটা কাপড়

আমাকে দাও। পরে দাম দিয়ে দেব।

বৃদ্ধাকে নিছক সন্তুষ্ট করিবার পন্থা মাত্র। দরিয়াবিবি নিজেও জানে, ছয় মাসের পূর্বে আর সে দাম চুকাইয়া দিতে সক্ষম হইবে না।

ফোগ্লা দাঁতে হাসি ফোটে। আসেক্জান শশব্যস্ত কাপড় দু'টি বাহির করিল।

যেটা ভাল, সেটা বেছে নাও, মা। দেখো দিকি, কোন্টার জমিন বেশ ভাল।

মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল দরিয়াবিবি।

খালা, তোমার শরীর ভাল তো?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আসেক্জান।

না, মা। দু'দিন থেকে বড় মাথা ধরেছে। চোখ ঘোঁয়া ঘোঁয়া।

অনুতপ্ত হয় দরিয়াবিবি। ইহা তারই নিষ্ঠুরতার পরিণতি, তা উপলব্ধি করিয়া বড় ব্যথিত হয়।

তুমি বাইরে চলো, ঠাণ্ডা পানিতে মাথাটা ধুইয়ে দিই। আজ আর কোথাও বেরিয়ে না।

ও পাড়ায় দাওয়াৎ ছিল। দুপুরে যাব কষ্ট করে।

কিসের দাওয়াৎ?

জলিল শেখের ওখানে। আজ ওর ছেলের চল্লিশে কিনা।

দরিয়াবিবি জানে, জলিল শেখের রোজগারী জওয়াসি ছেলে কিছুদিন আগে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ইন্তেকাল করিয়াছে। তার মুখটি মনে পড়িয়া গেল দরিয়াবিবির। বলিল, আহা!

অনেক লোক খাওয়াবে। আমজাদকে সঙ্গে নিয়ে যাব?

কে যেন কিছুটা চালায় দরিয়াবিবির সর্বাসঙ্গে।

আজ কিন্তু ক্রোধের কোন চিহ্ন নাই তার মুখে।

শান্ত কণ্ঠেই সে বলে, না খালা, তার গিয়ে কাজ নেই। তুমিও আজ কোথাও যেয়ো না। এখানেই খাবে।

আসেক্জান প্রায়ই গাঁ হইতে এইরূপ দাওয়াৎ পায়। ধনীদেব বাড়িতে চর্ব-চোষের বহু আয়োজন হয়। আসেক্জান শুধু নিজের উদরপূর্তি করিয়া আসে না। অনেক সময় নানা খাবার সঙ্গে আনে। অন্ধকার ঘরে তার অংশ গ্রহণ করে আমজাদ অথবা নঈমা। দরিয়াবিবির চোখে কয়েকবার ধরা পড়িয়াছে তারা। আসেক্জানও তার জন্য তিরস্কার ভোগ করে।

পরলোকগত ব্যক্তির চল্লিশার খাবার সঙ্গে করিয়া আনিতে আসেক্জানের কোন দ্বিধা নাই। দরিয়াবিবি ছেলেদের অমঙ্গল চারিদিকে যেন দেখিতে পায়। খুব সাবধানী সে। আজ ঝগড়ার কোন সূত্রপাত দেখা গেল না।

দরিয়াবিবি শুধু অনুরোধ করিল মাত্র। আজ কোথাও যেয়ো না, খালা।

জলিল শেখ পাটের ব্যাপারী। নৌকা আছে তিন চারখানা। বেশ অবস্থাপন্ন ঘর। সেখানকার আয়োজন কল্পনাই করা চলে। আসেক্জানের লোভ হয় খুব। কিন্তু দরিয়াকে সে ভয় করে। চুপ করিয়া গেল সহজে। তার কল্পনা-নেত্র কিন্তু তারপর তৃষিত হইয়া উঠিতেছিল।

কাপড় দু'টি দরিয়াবিবি আধ-অন্ধকারে বারবার তুলনা করিয়া বলিল, এই লাল সরু পাড়টা নিলাম, খালা।

বেশ, বেশ! আমার কি আর এসব মানায়, মা! শাদা কাফন পরে কবরে যেতে পারলেই ভাল।

বাজে কথা কেন, মুখে, খালা? এই সকালে আর কোন কথা মুখে আসে না বুঝি। চলো বাইরে। মাথাটা ধুইয়ে দিই।

দুইজনে দাওয়ায় আসিয়া পৌছিল।

দরিয়াবিবি এক বদনা পানি লইয়া বৃদ্ধার শনের মত শাদা চুলের উপর ঢালিতে লাগিল।

চুপচাপ বসো। আরো তিন-চার বদনা ঢালতে হবে।

বসছি মা। একটু তেল দিয়ে দিস বউ।

দরিয়াবিবি চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া বদনার নল দিয়া ধীরে ধীরে পানি চোঁয়াইতে ব্যস্ত।

আসেকজানের শরীর ভারমুক্ত হইতেছে। আহ! শব্দে তার আনন্দ ধরা পড়ে। নারিকেল তেল আনিল দরিয়াবিবি। চুলের গুছির ভেতর বেশ চুক্চুকে করিয়া দিতে লাগিল।

খালা, দশ ঝঞ্ঝাটে শরীরটা জুলে গেল। মেজাজ ঠিক থাকে? কখন যে কাকে কি বলি— হৃদিস থাকে না।

মা, জান্টা আসান হলো। আল্লার দোয়া লাগুক তোমার শরীরে।

তেল দেওয়ার অজুহাতে দরিয়াবিবি আসেকজানের মাথাও টিপিয়া দিল খানিকক্ষণ। কোরা কাপড়খানা একটি চটির উপর পুড়িয়াছিল, দরিয়াবিবির চোখ সেদিকে বারবার আকৃষ্ট হইতে ছিল।

রান্না চড়িয়েছ বউ?

সে আর বাকি আছে, মা? আমুর পেট খারাপ। আজ পান্তা খেতে দিইনি। মখতব থেকে এসে একবার ভাত খাবে।

এমন সময় আমজাদের গলা শোনা গেল। ভিটের নিচে হইতে সে চীৎকার করিতেছে মা— মা—।

দরিয়াবিবি উৎকর্ষ হয়। না, এক পা বাড়ানোর পূর্বেই স্বয়ং আমজাদকে উঠানে দেখা গেল।

মা।

এক হাত উঁচু করিয়া সে আরার চীৎকার করে, মা!

দরিয়াবিবির চোখে সূর্যের আলো পড়িয়াছিল। পুত্রের সর্বশরীর চোখে পড়ে না।

বাড়িটা যে মাথায় তুলে চেঁচাস। কি—

এই দেখো।

হাত তুলিয়া আমজাদ ধেই ধেই নৃত্য করে।

নিকটে পৌছান মাত্র দরিয়াবিবি দেখিতে পায়, আমজাদের হাতে দশ-বারোটি বড় চিংড়ি মাছ। দাঁড়াগুলি তার মুঠোর মধ্যে। লাল সরু গুঁড় রৌদ্রে চকচক করিতেছে।

দরিয়াবির চোটেও হাসি উপ্চিয়া পড়ে।

কোথা পেল, বাপ?

বলছি। বলিয়া আমজাদ এক লাফে দাওয়ার উপর উঠিল।

মাঠের চন্দ্র কাকা দিয়েছে। আমাদের মখতবে গিয়েছিল। মৌলবী সাহেব তাইতো ছুটি দিলে।

বেশ বড় চিংড়ি রে!

একটা ডাগর চিংড়ি বাহির করিয়া আমজাদ বলিল, এইটা আমার, যা লাল মগজ আছে ভেতরে!

দরিয়াবির আর আনন্দ ধরে না। কচি শিশুদের মুখে খুব কম দিনই ভাল ব্যঞ্জন জোটে।

খালা, আজ তোমারও ভালই হলো। ভাবছিলাম, খাওয়ার কষ্ট হবে।

আসেক্জান এতক্ষণ নির্বিকার ছিল।

কি বোমা?

আমু চিংড়ি এনেছে। দুপুরে খাওয়াটা ভালই হবে। মাঠের কোটালরা দিয়েছে।

আমজাদ মা'র হাতে মাছগুলি সোপর্দ করিয়া বলে, তাড়াতাড়ি পান আর চুন দাও, কাকা দহলিজে বসে আছে।

তবে এতক্ষণ বলসনি?

দরিয়াবিবি তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে ছোটে। অন্যদিকে আসেক্জান আমুর সঙ্গে তখন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করে।

নিয়ে যা, বাবা। তোর কাকা তামাক খায়?

আরে বাব্বা— তামাক খায় নাকি তামাক-স্কেত খেয়ে ফেলে।

দরিয়াবিবি আবার তামাক সংগ্রহে ছুট দিল।

দহলিজে একটি বিড়ার উপর চন্দ্র কোটাল বসিয়াছিল। হাতের কামাই নাই। গোটা পান, চুন, সুপারি দিয়াছিল দরিয়াবিবি, তাহাই সে সাজিয়া লইতেছিল।

চন্দ্র কোটাল একটি খাটো ধুতি পরিয়াছিল মাত্র। কোমরে কাস্তে গাঁজা রহিয়াছে। পান-সাজার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ খুলিল।

তোমার বাপ কোথা, চাচা?

আজ ত কোথাও যায় নি। গাঁয়েই আছে। বোধ হয় পাড়ার দিকে গেছে।

দেখা করতে এলাম। কথা ছিল।

একটু বসো না, কাকা।

চন্দ্র কোটাল চারিদিকে তাকাইল। আরো কয়েকবার সে খাঁ-পাড়ায় আসিয়াছে। বর্ষাকালে নদীর ধার হইতেই মাছ বিক্রয় হইয়া যায়। কালে-ভদ্রে পাড়ায় আসিতে হয়।

নূতন লোক দেখা মেয়েদের সাধারণ কৌতূহল। দহলিজের খিড়িকির দিকে ঘোমটার আবছায়া দেখিয়া চন্দ্র ঠিক অনুমান করিয়াছিল, আমজাদের মা আসিয়াছে।

মুখে পান গুঁজিয়া জোর গলায় বলে, চাচা, তোমার মা দুপুর বেলা খাওয়াবে?

আমজাদ বাড়ির ভিতর চলিয়া যাইতেছিল। দহলিজের পেছনেই দরিয়াবিবি

দাঁড়াইয়াছিল, হাত-ইশারায় পুত্রকে আহ্বান করিল।

আমজাদ মা'র কাছে দাঁড়াইয়া জোর গলায় বলে, গরীব মানুষ, ডাল-ভাত আছে।

চন্দ্র হাসে। আরো জোর গলায় বলিল, আমরা রোজ ঘোড়ার মাথা খাই। ডাল-ভাত হলে চলবে না। রোজ রোজ অশ্বমেদ জগুগি করে চন্দ্র কোটাল।

তারপর প্রাণ-মাতানো হাসি। মস্ত দহলিজ গুঞ্জরিত হয়।

চাচা, খাওয়ার আগে তোমার মাকে তামাক দিতে বলো। নেশা চটে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে কঙ্কে আনিয়া দিল আমজাদ কাঠকয়লায় বোঝাই। আমজাদের কচি হাতে উত্তাপ লাগে।

শিগুগির আমার হাতে দাও।

চন্দ্র দুই তালুর মাঝখানে কঙ্কে চাপিয়া তারপর দম দিতে থাকে। দুই চক্ষু বুজিয়া আসে নেশায়।

আমজাদ বিস্ময়ে এই লোকটির দিকে বারবার তাকায়। অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিতে হয়।

একটু পরে চক্ষু খুলিল কোটাল।

দহলিজের সম্মুখে দুইটি নিম গাছ বাতাসে দুলিতেছিল। একটি চারা তালগাছ কোটালের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ছোট ছোট কচি মোচা বাহির হইয়াছে গাছটির।

কঙ্কে দাওয়ার উপর রাখিয়া চন্দ্র কহিল, চাচা তুলগাছটা তোমাদের?

আমজাদ মাথা দোলায়।

আহ্ খাসা মোচা বেরিয়েছে। বাঁশগাছ গাছে তোমাদের?

কত আছে। দুটো ঝাড়ে পঞ্চশখা বাঁশ, সেদিন বাপ গুণছিল।

তা হলো বটে — তোমার বাপ বেরসিক। কি মিঠে তাড়ি হয় এই গাছের, চাচা। বাঁশ লাগিয়ে আগ ডালে উঠে ভাঁড় ঝাধতে যা মজা। কিন্তু তোমার বাপ...হতাশ হইয়া চন্দ্র মাথা দোলাইল।

আমাদের যে তাড়ি খেতে নেই।

গোপে তা দিয়া চন্দ্র ঠোটে 'হো' শব্দ করে।

বড় হলে খেতে আছে, বাবা। তোমার বাবা একটা আস্ত —।

আমজাদ প্রতিবাদ করিল না।

আর একবার কঙ্কে তুলিয়া লইল চন্দ্র। তারপর এলোপাথাড়ি টান। আমজাদের চোখে ধোঁয়া লাগে। বিরক্ত হইয়া সে চোখ বুজিল।

তোমার বাবা —

এইবার চোখ খুলিল আমজাদ।

তোমার বাবা, আজ আর আসবে না।

বিশ্বাস হয় না আমজাদের।

শিশুসুলভ কণ্ঠে সে বলিল, না, বাপ এবার কোথাও বিদেশে কাজে যাবে মা। গাঁয়ে গেছে, এখনই ফিরবে।

চন্দ্র কোটাল শিস দিতে দিতে গুনগুন শব্দ করে। এককালে ভাঁড়-নাচের দলে ছিল।

তার প্রহসন-লীলায় হাসির চোটে দর্শকদের নাকি দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইত।

চন্দ্র গান করে গুনগুন শব্দে।

আমজাদের কৌতূহলের অন্ত নাই। এই লোকটিকে তার ভয়ও লাগে। তবু সে নিঃশব্দে চন্দ্র কোটালের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

চাচা!

উচ্চকিত আমজাদ জবাব দিল, কি চাচা?

তোমার বাবা ঘরে আছে ত?

হ্যাঁ। ভিন গাঁয়ে যায় নি বলছি ত বারবার।

তবু একটু অপেক্ষা করি। আর এক কঙ্কে সেজে আনো।

আমজাদ দ্বিরুক্তি করিল না।

যথার্শীষ্য সে ফিরিয়া আসিল।

উল্লসিত হয় চন্দ্র। আবার পান-সুপারি আনিয়াছে আমজাদ।

দুইজনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আলাপের বিনিময়ে মশগুল।

এমন সময় আজহার আসিয়া উপস্থিত হইল।

চন্দ্র তামাক ফুঁকিতেছিল চোখ বুজিয়া। আজহারকে সে দেখিতে পায় নাই।

আমজাদ আনন্দিত হইয়া ডাকে, ঐ আব্বা এলো।

এসো, এসো, খাঁ সাহেব—

চন্দ্র আজ সম্মান দেখাইতে তৎপর। বিড়া ছাড়িয়া সে উঠিয়া পড়িয়াছে। আজহার খাঁ হাসে।

কি চন্দর, হঠাৎ কি মনে করে?

কখন থেকে বসে আছি। ডুমুর ফলের খোঁজ নেই।

আজহার চন্দ্রের নিকট হইতে কঙ্কে লইয়া টান দিতে লাগিল।

ঘরে বসে থাকলে চলে, ভাই? পেটের ধান্দায় সকাল থেকে ঘর-ছাড়া।

কোথা গিয়েছিলে, শুনি?

খাঁ সাহেব জমিদারদের বাড়ি। হাতেম বখ্শ খাঁ একটা কবর তৈরি করাবে নিজের।

কত ইট-চুন লাগবে— তাই ডেকেছিল।

ওটা কি মরবে নাকি শিগ্গিরি?

কোন জমিদারের পেছনে এমন অসম্মান-সূচক কথা আজহার পছন্দ করে না। একটু বিরক্ত হয় সে।

একটু খাতির রেখে কথা বলো। ‘ওটা’ কি বলছ?

যেন কত অনুতপ্ত, তারই ব্যঙ্গ-অনুসৃত কণ্ঠে চন্দ্র বলে, হ্যাঁ, মুরব্বী লোক, পঞ্চাশ-ষাট বয়স, খাতির করবো বৈকি। সত্যি মরবে?

রাখো তোমার মস্করা। সবাই মরবে। আমি কি মরব না?

তুমিও তবে আগে থেকে কবর খুঁড়ে রাখো।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আজহার। সে সৌভাগ্য তার নাই।

বহুত টাকা খরচ করবে, ভাই। তিন দিকে ইট, একদিকে সাদা মার্বেল পাথর।

তা ত করবেই। আমাদের বেঁচে খরচ করতে প্রাণ যায়, ওরা মরেও আমাদের জন্য খরচের রাস্তা তৈরি করে রাখে।

আজহার খাঁর মাথায় এত প্যাঁচওয়ালা কথা সৈঁধোয় না। নির্বোধের মত সে বলে, প্রায় দু'হাজার টাকা খরচ। তারপর আবার বাগান হবে চারিদিকে। সেও আর এক হাজার।

বিস্মিত হয় চন্দ্র। বিজ্ঞের মত জবাব দিল সে : আমার মণ খানেক কাষ্ঠ দরকার। ব্যস। আর নদীর ধারে একটা দেশলাইয়ের কাঠি খরচ। যদি অপঘাতে মরি— তাও খরচ নেই। স্বজনদের মেহনত খরচ হবে খানিকটা।

বাজে কথা রাখে। কেমন মাছ ধরছ জোয়ারে?

সেইজন্যে ত এলাম। মাছ ধরে কি হবে। এবার বর্ষায় দেখবে খুব মাছ পড়বে। কিন্তু সব ত নিয়ে যাবে পাইকের। ওদের অবস্থা দেখো। আমরা মাছ ধরি, পেটে ভাত জোটে না, ওরা পাকা দালান তোলে।

কি করতে চাও?

জিজ্ঞাসু নয়নে চন্দ্রের দিকে তাকায় আজহার।

কিছু পুঁজি দরকার, ভাই। তা হলে আমি নিজেই রেল ইস্টিশনে গিয়ে মাছ বেচে আসতাম। পাঁচ-সাত সের মাছ নিয়ে খরচ পোষায় না। আরো দশটা লোকের মাছ জড়ো করলে এক মণ দু'মণ মাছ নিয়ে বেশ লাভ পাওয়া যেত।

আজহারের মুখের উপর দিয়া কালো রেখা পড়ে।

পুঁজি— পুঁজির কথা বলছ? সেই ত মুশকিল।

বেশি টাকার দরকার নেই। পঞ্চাশ হোল্ডেই চলে। তুমিও কিছু দাও, খাঁ ভাই। ভাগে ব্যবসা করা যাক।

ভয়ানক উৎসাহিত চন্দ্র।

কয়েক মিনিট চুপচাপ বসিয়া রহিল আজহার। কোন জবাব নাই তার মুখে।

কি খাঁ ভাই, কিছু বলছ না যে—

একরূপ সন্দেহাৰ্ত দৃষ্টি ফেলে চন্দ্র।

কি আর বলব! পঁচিশ-তিরিশটা টাকা থাকলে কি চুপ করে যাই? আমাদের অবস্থা দেখছ না? হাত জানে ত মুখ জানে না।

এইবার চন্দ্রও চুপ হইয়া যায়।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে।

আমারও ত ঐ দশা।

আজহার কথার সূত্র সংক্ষিপ্ত করে হঠাৎ।

তোমার এই ষোঁক ধরল কেন? চাষ করে, ফুরসৎ পেলে মাছ ধরে বেশ ত দিন কাটছিল।

তা আর হবার জো নেই। চাঁদমণি ফিরি এসেছে।

চন্দ্রমণি কোটালের কনিষ্ঠ সহোদর।

তোমার এখানেই থাকবে নাকি?

আরে যা ভাবছ তা নয়। স্বামী মরে গেছে। তিনটি ছেলে কোলে।

আজহার ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিত না। সহানুভূতিপূর্ণ দুই চোখে কারুণ্য ফুটিয়া ওঠে।

কি হয়েছিল?

জ্বর ও বিকার।

ও। আজহার ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দ তুলিয়া চুপ করিল।

তাই ভাবছি। রোজগারের পথ ত দেখতে হবে। ঘরও একটা বেশি নেই যে, মাথা গুজে থাকব। আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখতে পার না? ক'টা টাকা হলে দু'জনেরই ভাগ্যপরীক্ষা হয়।

কে ধার দেবে, তাই ভাবছি। এত টাকা বিশ্বাস করবে কি?

দেখো চেষ্টা করে। আমরা মাছ ধরি, পাইকেররা তা শহরে বেচে পয়সাওয়ালা। যত টাকাপয়সা কি শহরে গিয়ে জমেছে?

তাই ত দেখছি!

চন্দ্র মাথা দোলাইল : আমার কাছে একটা ধাঁধা মনে হয়। আমরা ফসল করছি, গতর পুড়িয়ে মাছ ধরব, সব সেরা জিনিস শহরে ছুটছে। আমাদের পয়সাও হয় না ভাল খাবারও জোটে না।

এই প্রশ্নের জবাব হঠাৎ আজহার খাঁর মাথায় খেলে : শহর থেকে যে কাপড় আসে, আরো কত জিনিস আসে তা দেখছ না? গাঁয়ের ফসল মায়া শহরে। শহরের জিনিস আসে গাঁয়ে।

তা ত বুঝলাম। কিন্তু তারা সুখে থাকে আর আমাদের এই দশা কেন? আমরা কি মেহনত করি না? না গতর খাটাই না? আমরা যদি চাল না দিই, শহরের ব্যাটারা খাবে কী? আজহার উত্তেজিত চন্দ্রের দিকে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, তুমি তা হলে ন্যাংটা থেকে।

ন্যাংটা থাকবো কেন? গাঁয়ে তাঁতীরা কাপড় বুনবে।

সে দিন আর নেই ভায়া। ঐ ত ক'ঘর তাঁতী আছে, তাদের কাপড় কেউ ছোঁয়? অবস্থা দেখছ না তাদের? সব কপালের ফের!

চন্দ্র চুপ করিয়া গেল। তার মাথায় স্টেশনের পাইকার রূপে মাছ বিক্রেতা হওয়ার স্বপ্ন তখনও মুছিয়া যায় নাই।

শহরেই ত সব। গাঁয়ের জমিদারের চেয়ে ঐ ব্যবসাদারদেরই টাকা বেশি। তালের চৌধুরী লোহার কারখানা করে দেখছ ফেঁপে যাচ্ছে। হাতেম খাঁকে দশবার কিনতে পারে।

আজহার সায় দিল মাথা দোলাইয়া, কোন মন্তব্য করিল না।

দুইজনে নিস্তব্ধ। নীরবতার দুঃসহ শাসন কেউ যেন আর অবহেলা করে না।

আমজাদ এতক্ষণ দুই জনের কথোপকথন শুনতেছিল, সেও কোন কথা বলিতে সাহস করে না।

হঠাৎ উঠিয়া পড়িল চন্দ্র। সে বলে : আমার অনুরোধটা ভেবে দেখো, খাঁ ভাই। বেলা হয়ে গেল, যাই—।

নিরাশাস্কর কণ্ঠ চন্দ্র কোটালের। আজহার বহুদিন এমন দীনতা দেখে নাই তার।

কোন জবাব দিল না সে।

আজহার নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। চন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া টান দিল, একটু এগিয়ে দাও, চাচা।

গাঁয়ের সরু পথে ডোবার উপর বহু শাপলা ফুটিয়াছিল। চন্দ্র কয়েকটি আমজাদের হাতে তুলিয়া বলিল, এবার বাড়ি যাও, ভারী রোদ্দুর উঠেছে।

আমজাদ বাড়ির পথ ধরিল।

মাঠের সড়কে অগ্রসর হইতেছে চন্দ্র। তার শিসের শব্দে আমজাদ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, হেলিয়া-দুলিয়া মন্তর চালে চন্দ্র হাঁটিতেছে। বোধ হয় ফুর্তিতেই শিশু দিতেছে। পৃথিবীতে যেন কোন কিছু ঘটে নাই।

৬

সকালে আজহার প্রতিবেশী সাকেরের খোঁজ লইতে গেল।

পাশের পাড়া। ভিটা ছাড়িয়া সামান্য কলাবাগান পার হইতে বেশি সময় লাগে না। আজহার ভাবিতেছিল, সাকেরের কাছে টাকা আছে। সে পেশাদার লাঠিয়াল। খাঁ বংশের মহিমা বরং একমাত্র সে বজায় রাখিয়াছে। চোয়াড়ে প্রকৃতির চেহারা সাকেরের। লম্বা ঘন গোঁপের উপর ভাঁটার মত দুই চক্ষু শিশুর আতঙ্কের পক্ষে যথেষ্ট। এই সময় তার কাছে টাকা থাকা সম্ভব। মাত্র দুইদিন আগে রোহিণী চৌধুরীর কোন তালুকে প্রজা ঠাঙাইতে গিয়াছিল সে। জমিদারদের কল্যাণে তার অবস্থা অন্যান্য প্রতিবেশী অপেক্ষা ভাল। দাস্তার জন্য আরো ভিন গাঁয়ে তার ডাক পড়িত।

চোয়াড়ে হোক সাকের। কিন্তু আজহার খাঁর সম্মুখে সে ভারী বিনয়ী, খুব মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলে। আজহারের ধারণা সাকের তাকে শ্রদ্ধা করে। কোনদিন তার কাছে টাকা হাওলাত করিতে যায় নাই। মুখের কথা সে অবহেলা করিবে না সহজে। আর চন্দ্রও যেমন বেয়াড়া! তার সঙ্গে বন্ধুত্বের জুলুম সহ্য করিতে কোন কষ্ট হয় না।

সাকের ঘরে ছিল না। তার মা আজহারকে দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বলিল, আমার পেটে এমন ভিৎরে ছেলে জন্মাল, বাবা। আর পারি নে। লাঠিখেলা কেন যে শিখেছিল। এক দণ্ড শান্তি নেই। ও দাস্তা করতে যাবে, আর এদিকে আমাদের শান্তা-বৌয়ের পেটে ভাত সোঁপাবে না।

সাকের কোথা গেছে, চাচি?

কাল সন্ধ্যায় বেরিয়েছে আর দেখা নেই।

উদ্ভিগ্ন আজহার প্রশ্ন করে, দাস্তায় যায় নি ত?

না। লাঠিটা ঘরে রয়েছে। ঐ বাঁধানো লাঠি ছাড়া সে বেরোয় না। কিন্তু কোথা যে গেল!

আজহার নীরব। নিরাশার আঘাতে বারবার চন্দ্রের মুখ তার মনে পড়িতে থাকে। চন্দ্রটা এমন—

সাকেরের মা সংসারের কথা জুড়িল।

ছেলেমানুষ বৌটা তেমনি হয়েছে। ভয়েই মরে। চাষবাস করে খেতে বল, নিজের মানুষকে হাত কর। তা না। খালি দিনরাত ছেলের জন্য কান্না। কাঁচা বয়েস। ছেলে হওয়ার সময় কি পার হয়ে গেছে, বাবা?

হঠাৎ সুপ্তোখিতের মত আজহার জবাব দিল, না, আমাদের হাসুবৌর আর কত বা বয়েস। কুড়ি পেরোয় নি।

এখনই ছেলের জন্যে হাঁপাহাঁপি। দোয়া তাবিজ আমি কি কম করতে বাকী রেখেছি! তবে মাস দুই হলো নিস্তার। কপালে যদি থাকে—।

সব আল্লার মরজী, চাচী। তোমার আমার মত গোনাগার বান্দা আর কি করতে পারে?

না বাবা, আল্লা মুখ তুলে চেয়েছে। তারপর চাচি জোর গলায় হাসিল।

জানো বাবা, অভাগীর বেটি বলে কি—

আজহার জিজ্ঞাসু নয়নে চাচির মুখের দিকে তাকাইল।

বৌমা বলে, ছেলের মুখ না দেখলে ওসব লোক আর সংসারী হবে না। ও জোয়ান হওয়া অঙ্গি ভয়ে ভয়ে সারা জনমটা গেল। কি দিন কি রাত, বেঁচে সুখ নেই বাবা।

আজহার চুপ করিয়া শোনে, কোন মন্তব্য করে না। তার দৃষ্টি প্রাঙ্গণের উপর। হঠাৎ মুখ অন্যদিকে ফিরাইতে সে বাধ্য হইল। সাকেরের স্ত্রী ঘাট হতে কলস কাঁখে ফিরিতেছিল। ভাস্করকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠানের লাউগাছের ঈষৎ আড়ালে আড়ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিজকে বিব্রত মনে করে আজহার ঈষৎ সত্যই বড় কাঁচা বয়েস সাকেরের স্ত্রীর। মুখখানা ভারী করুণ মনে হয়। পূর্ণ যুবক, তবু মুখের আদলে সজীবতা নাই। যৌবনের শ্যামস্পর্শ যেন ক্ষণেক উঁকি দিয়া বিদায় লইয়াছে।

উঠানে লাউগাছের মাচাঙ। সূর্যের আলো সঁধোয় না, নিচে এমন ঘন লতার পরিবেশ। দুই-একটি লাউ ঝুলিতেছে মাথার উপর। গোড়ার দিকে দশ-বারোটি সর্পিল রেখার আলিঙ্গন মাটির বুকের সহিত। সাকেরের স্ত্রীর কাপড়ের কোন কোন অংশ দেখা যায়।

আজহার যেন কত বিপদে পড়িয়াছে। বেগানা আওরতের সম্মুখে এমনভাবে বসিয়া থাকা শোভন নয়। সে উঠি-উঠি করিতেছিল। কিন্তু সাকেরের মা'র কথা আর ফুরায় না।

দোয়া করো, বাবা। বৌমার নিয়ে পুরা করুক খোদা।

আল্লার দোয়া। বান্দার কথায় আর কি হয়? মাঠে কাজ আছে, চাচি। আজ আর বসতে পারব না।

উঠিয়া পড়িল আজহার।

আচ্ছা, এসো বাবা। দরিয়াবৌকে এদিকে আসতে বলা। বৌমার মাস দুই হলো, দরিয়াবৌর সাথে কতগুলো কথা আছে।

সাকের বাড়ি ফিরলে আমাকে একবার খবর দিও।

দুইপাশে কঙ্কির বেড়া। এই পথে কলাগাছের ছায়াঙ্ককার জমিয়া উঠিতেছে। সূর্য উঠিতেছে তেজে। চারিপাশের আলো প্রখরতায় অস্পষ্ট জায়গায় অঙ্ককার আরো ঘন মনে হয়। আজহার খাঁর মন নানা সন্দেহে দোলে। সকালটা কোন কাজে আসিল না।

হঠাৎ চাচির খন্থনে গলার আওয়াজ শোনা যায়। ঘুলি-পথের উপর উৎকর্ণ আজহার খমকিয়া দাঁড়াইল। হ্যাঁ, চাচিরই গলার আওয়াজ বটে, দূর হইতেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

হারামজাদি, ঘরে টাকা-পয়সা নেই, সে বাড়ি থাকতে বললি নে কেন? মুখের ছাঁদা বুজে গেছে বুঝি?

আরো গালিগালাজের অগ্ন্যুৎপাত। চাচি আদৌ বৌকে দেখিতে পারে না, আজহার জানে। কিন্তু আজ সেজন্য বিশেষ মাথাব্যথা নাই তার। সাকেরের ঘরেও টাকা নেই। বুকটা দমিয়া গেল আজহার খাঁর। চাচিকে শান্ত করিতে সে আর একবার ফিরিয়া আসিত, সে উৎসাহও ধীরে ধীরে নিভিয়া গেল।

গোয়ালঘরে সামান্য কাজ বাকী ছিল। আজহার খাঁ আজ যন্ত্রচালিতের মত তাহা সম্পন্ন করিল। চন্দ্র কোটালের কাছে একবার খবর দেওয়া দরকার। সে আশায় আশায় থাকিবে। পাড়ার আর কারো কাছে হাত পাতা নিরর্থক। গফুর খাঁর গঞ্জের দোকান দিনদিন ফাঁপিয়া উঠিতেছে। তার পুরাতন ঋণ দুই বছরে শোধ হয় নাই। সে পথও রুদ্ধ। আরো কয়েকজন সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিবেশীর কথা মনে পড়িল আজহার খাঁর। কিন্তু চারিদিকে খটকা।

দরিয়াবিবি পূর্বতন শ্বশুরবাড়ির দুইটি দুল আনিয়াছিল। গত বৎসর আমজাদ ও নঈমার অসুখে তা-ও পোদারের দোকানে বাঁধা পড়িয়াছে।

চন্দ্র হুঁশিয়ার লোক। ব্যবসায় কপাল-খোলা বিচিত্র নয়। কিন্তু রুদ্ধ অদৃষ্টের কপাট খুলিতে সামান্য কুঞ্জিকার কথা, আজহার ভাবিতে পারেন না।

মাঠের পথে চিন্তা-ভারাক্রান্ত মনে সে উপায়ের কল্পনা করিতে লাগিল। হঠাৎ আকাশে মেঘ জমিয়াছে। সূর্যের আলো পলাতক। বৃষ্টিকাল, যে-কোন সময় বৃষ্টি নামিতে পারে। এই মনে করিয়া আজ গরু মাঠে ছাড়িয়া দেয় নাই আজহার।

সে কোটালের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়াছে এমন সময় দম্কা বৃষ্টি নামিল। দূপুরে গোসল করিতে হইবে, তাই বৃষ্টির কোন তোয়াক্কা রাখে না আজহার। সোজাসুজি সে গাঙের ধারে আসিয়া থামিল। চতুর্দশীর জোয়ারের সময় চন্দ্র ঘরে থাকার বান্দা নয়। তা ছাড়া মাছ ধরা একটা নেশা কোটালের।

খালের দুই ধারে ঝাপসা গাছপালা। ঝম্ঝম্ বৃষ্টি ঝরিতেছে। কোন জনপ্রাণী চোখে পড়ে না। সকলেই বোধ হয় আশ্রয়ে ঢুকিয়াছে। বামে ডিঙি নড়ার ঠক্ঠক্ শব্দ শোনা গেল। উৎফুল্ল হইয়া ওঠে আজহার। চন্দ্র ছোট্ট পিনিসের উপর দাঁড়াইয়া জাল গুটাইতেছে। নৌকার গলুই একটি বাঁশের সঙ্গে বাঁধা। স্রোতের টানে বাঁশ ও কাঠের সমবায়ে একরূপ ঘর্ষণ-ধ্বনি বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপাইয়া উঠিতেছে।

আজহার হাঁকিল, চন্দর!

খালের দুই পাড়ে তার প্রতিধ্বনি ছড়াইয়া পড়ে।

সামান্য বৃষ্টির প্রকোপ মন্দীভূত। মেঘ হুডুম-হুডুম করিতেছে।

বোধ হয় হাঁক চন্দ্র শুনিতে পায় নাই। আজহার নিজেই তার কাছে আগাইয়া আসিল। লম্বা বেড়াজালে জোয়ারের পূর্বে খালের মুখ ঘিরিয়াছিল চন্দ্র। ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার জাল গুটাইতেছে। বড় শান্ত সে। দুই বাহুর পেশী স্পষ্ট ফুলিয়া উঠিয়াছে। তার দৃষ্টি শুধু জালের দিকে।

চন্দ্র চোখ না তুলিয়াই বলিল, খাঁ ভাই, একটু দাঁড়াও।

জাল গুটানো সমাগু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আফসোস করে, না ভাই, মজুরী পোষাল না। অনেকক্ষণ খাটছি।

মাত্র সের দুই মাছ পড়িয়াছে। দশ-বারোটি তপসে মাছ কেবল চন্দ্রের চোখে আনন্দের প্রলেপ টানিয়া যায়।

ভাবছিলাম, ‘খিয়ে’ জাল দিয়ে আর একটু চেষ্টা করা যাক। না, তুমি এসেছ ভালই হলো।

দুজনেই বাড়ি অভিমুখী। চন্দ্র শীতে কাঁপিতেছিল। অনেকক্ষণ সে বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়াছে। কোটাল-পুত্র তাই নির্বাক। মাছভরা খালুই হাতে দ্রুত হাঁটিতেছিল সে।

পা চালাও, খাঁ। একটান তামাক না টানলে আর নয়।

পিছল পথে সাবধানে পা ফেলে আজহার। বৃষ্টি এখনও সম্পূর্ণ থামে নাই। পাখির পাখনা-ঝাড়া ধোয়ার মত ইলশেণ্ডি আকাশ হইতে ঝরিতেছে।

উঠানে হাঁকাহাঁকি করে চন্দ্র : সাজো, সাজো।

হাসিমুখে এলোকেশী ও চন্দ্রমণি বাহির হইয়া আসে।

দাদা যেন যুদ্ধের হাঁক ছাড়ছে।

এলোকেশী বোঝে, কি সাজিবার হুকুম কোটাল রাজার। সে আর দাঁড়ায় না, দাওয়ায় চন্দ্রমণিকে একটি আসন আগাইয়া দেওয়ার হুকুম দিয়া সে চলিয়া গেল।

এই চন্দ্রমণি! আজহার অবাক হইয়া যায়। মাঠে আসিয়া সে বহুদিন চন্দ্রের এই সহোদরকে দেখিয়াছে। পাংলা চেহারার গহন, ফর্সা রং, বয়সে সে চন্দ্রের অনেক ছোট। অগ্রজই বহু চেষ্টা করিয়া তার বিবাহ দিয়াছে। কিন্তু এ কি ছিরি হইয়াছে তার। পাটকাঠি বা প্যাকাটির মানবিক সংস্করণ যেন গায়ে নাজেল হইয়াছে।

আমার কাপড়চোপড় ভিজে গেছে মণি, খড়ের বিড়োটা আর নষ্ট করব না। এমনি বসছি। কিন্তু তুই এমন হয়ে গেছিস কেন?

কপাল ভাঙলে আর কার গতর ভাল থাকে, দাদা।

আজহার চুপ করিয়া গেল। পঁচিশ পার হয় নাই, ওই কচি মেয়েটা আল্লার কাছে কি গোনাহ করিয়াছিল, যার শাস্তি এমন নির্মম : আজহার এদিকে ধর্মপ্রাণ বুদ্ধি দিয়া যার নাগাল পায় না, সেখানে আল্লার মক্করের সন্ধান সে সহজেই লাভ করে।

জ্বর হয় তোর, মণি?

আজহারও মুম্বড়াইয়া যায়। আল্লার বান্দার বেশির ভাগ এই একই দশায় উপনীত! গাঁয়ের দশটা ঘর খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল, অভাব-অনটন প্রসূত কোন ঝঞ্ঝাট যেখানে অনুপস্থিত।

ম্যালেরিয়া জ্বরে দু’মাস ভুগছি। তবে শরীর আগে থেকেই খারাপ।

দাওয়ার এককোণায় চন্দ্রমণি বসিয়া পড়িল। শাদা থান কাপড় পরনে। তার ফ্যাকাসে রক্তহীন শরীরের সঙ্গে রঙের ভাল সামঞ্জস্য হইয়াছে।

দুইটি উলঙ্গ কালো ছেলে চন্দ্রমণির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজহার ইহাদের আগে দেখে নাই।

পিতৃহীন অনাথদের পরিচয় তার অনুমানের কাছে অজানা নয়। তবু সে জিজ্ঞাসা করে : তোমার ছেলে না, মণি?

হ্যাঁ দাদা। বড় গোপালের বয়স মোটে পাঁচ। যোগীন তিন বছরের। ওদের নিয়েই ত আমি জ্বলেপুড়ে মরলুম। একটা কানাকড়ি যদি বিধবা হওয়ার সময় রেখে যেতো—

চন্দ্রমণির কোটাগত নিশ্প্রভ চক্ষু হইতে টস্ টস্ পানি পড়ে। গোপাল ও যোগীন মার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

চন্দ্রমণি আচ্ছন্ন চোখেই আবার বলিল, দাদা ছিল বলে মাথা গৌজার ঠাই আছে। কিন্তু দাদার অবস্থা ত দেখছ, ছেলেপুলে মরে গেল। তার ওপর আবার আমার বোঝা।

শুকনা গামছা পরিয়া কক্কেয় দম দিতে দিতে চন্দ্র বাহিরে আসিল। তার চোখ পড়ে মণির উপর।

এই আবার প্যানপ্যান শুরু করেছিস। এই মণি, অমন করবি ত যা নিজের জায়াগায়। দেখ না আজহার ভাই, ওর হয়েছে কি। আমি ত মরে যাই নি।

চন্দ্র ধমক দিল আবার : যা উঠে, কিছু হয় নি। খেটে খেটে আমাদের জন্য শরীরটা কি হচ্ছে!

ভাগ্- ভাগ্— আর মুখ খুলিস নি। কি হয়েছে আমার শরীরের?

আজহারের হাতে কঙ্কে দিয়া চন্দ্র হাতের পেশী ফুলায়া বলে, দ্যাখ, মণি দ্যাখ। ঘুমি মেরে কোন্ বাপের ব্যাটা এটা নোয়াক দেখি।

ম'লো যা-যা রান্নাশালে।

গোফে তা দিয়া চন্দ্র ঠোট বাঁকাইল।

এলোকেশী চন্দ্রমণির হাত ধরিয়া ঈষৎ দিল। সে বলিল, চলো না ঠাকুরঝি। ভাই বোনে আর সতীনের ঝগড়া দরকার নেই।

মৃদু হাসি এলোকেশীর ঠোটে।

যা-যা, নিয়ে যা শিগ্গির।

যোগীন মামার কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে থাকে।

তুমি হাসছ! দেখি পাঞ্জা ধরো ত।

তিন বছরের শিশু। ভয় পায় না সে। কচি পাঞ্জা বাড়াইয়া দিল যোগীন।

গোপাল বড় নীরিহ। সে ছোট ভাইয়ের খেলা দেখে। ভয়ে গোপাল মামার কাছে ঘেঁষে না।

এইরকম করে লড়তে শেখ, বেটা। বড় হলে ডাকাতি করবি।

আজহার ঠোট হইতে কঙ্কে নামায়।

বেশ তালিম দিচ্ছ ভাগ্নেকেরে।

চন্দ্র লম্বা গোঁপে তা দিল একবার।

সত্যি, ডাকাত করব ছেলেগুলোকে। লুটেপুটে খাবে, খেটে ত খেতে পাবে না। নিজেও ডাকাতির দলে ঢুকব।

আজহার ভাবে, চন্দ্রের মাথায় ছিট আছে। তবু চুপ করিয়া যায় না সে।

তুমিও ডাকাতি করবে?

করব না? এত মেহনত করে লাভ কী? ধন্ম-টন্ম-ভগবান ওসব মানি নে। খেটে খেতে না পাওয়ার চেয়ে চুরি করায় পাপ নেই।

আজহারের চোখ কপালে উঠিতেছে যেন।

কি সব বকছ, চন্দর!

সত্যি বলছি, মনমেজাজ বিগড়ে গেছে আমার। তুমি বিশ্বাস করো ভগবান আছে, আল্লা আছে?

তৌবা, তৌবা, তৌবাস্তাগফের।

আজহার মনে মনে দরুদ শরিফ পড়িতে লাগিল।

যোগীন মাতুলের সঙ্গে তখনও পাঞ্জা লড়িতেছে।

চন্দ্র কোটালের মুখ বন্ধ থাকে না : আমরা খেটে খেতে পাই না। ওরা বসে-বসে তামাক ফাঁকে, গদীতে শুয়ে খেতে পায়। বলে, ভগ্বানের ইচ্ছে, কপাল! তেমন অবিচারী ভগ্বানে আমার দরকার? লুট করেঙ্গা— খায়েঙ্গা।

গঞ্জে মেড়ো ব্যবসায়ীদের নিকট চন্দ্র হিন্দী জবান শোনে। আজ তার সুযোগ গ্রহণ করিল।

চন্দ্র যোগীনকে তাল দিতে শেখায়। গান করে সঙ্গে সঙ্গে : লুট করেঙ্গা-খায়েঙ্গা। লুট করেঙ্গা—

আজহার খাঁর মুখাবয়বের উপর চন্দ্রের দৃষ্টি পড়িয়া গান থামিয়া গেল।

গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিয়াছে আজহার খাঁ।

হাত বাড়াইয়া দিল চন্দ্র তার দিকে। বজিল, রাগ করছ? আচ্ছা, এখন আসল কথা পাড়া যাক।

জিজ্ঞাসা করে আজহার, কি কথা?

কি বলেছিলাম?

সে প্রশ্ন এতক্ষণ আজহার খাঁর মনে কোন চিহ্ন বজায় রাখে নাই। নিতান্ত নির্বোধের মতই সে উত্তর দিল।

কি বলেছিলে?

একচোট হাসিয়া লইল চন্দ্র।

তা আর মনে থাকবে কেন। মাছ-ব্যবসা তোমার সঙ্গে?

আরো অপ্রতিভ হয় আজহার খাঁ।

লজ্জায় সে অস্পষ্ট কণ্ঠেই জবাব দিল, জানো তো আমার অবস্থা। টাকাও ধার পাওয়া গেল না।

খামাখা এতক্ষণ আমার সঙ্গে তর্ক জুড়েছিলে। চোখে চেয়ে দ্যাখো না। পেট চলে না, ব্যবসা করব। তা একটা কানাকড়ি পুঁজি নেই।

তারপর চন্দ্র চুপ করিয় গেল। চন্দ্রমণি নিঃশব্দে আসিয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিতোছিল। সে-ই নীরবতা ভাঙ্গিল।

—দাদা, মাছের ব্যবসার জন্য যোগীনের বাবারও খুব ঝোক ছিল।

চন্দ্র ইঁ শব্দে সায় দিল মাত্র।

যোগীনের মামার সঙ্গে খেলা বন্ধ। সে অভিমানীর মত বসিয়া আছে। চন্দ্র তার দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া জোরে হাসিয়া উঠিল।

এই ছোটমামা, আমাদের যুক্তি আঁটাই রইল। না, আর ব্যবসা করব না। চাষবাস করব না।

আজহার মনে করে চন্দ্র তার উপর বিরক্ত। খটকা মুছিয়া ফেলিবার জন্য সে সরস কণ্ঠেই বলিল, আমার উপর রাগ করো না, চন্দ্র। গেল দু'বছর কি করে যে সংসার চালিয়ে নিয়ে আসছি, আমিই জানি।

চন্দ্র যোগীনের মাকে আর এক কণ্ঠে তামাক আনিবার জন্য আদেশ করিল।

তোমার উপর রাগের কি আছে। রাগ-সব ওই যে তুমি কী বলো—কপাল, কপালের উপর।

আজহার ভিজা কাপড়ে বসিয়াছিল। সে যেন কত অপরাধ করিয়াছে। সহজে চন্দ্রের দাওয়া হইতে উঠিতে পারিতেছিল না।

চন্দ্রমণি গনুগনে এক কণ্ঠে আগুন লইয়া হাজির হইল। আজহার নির্জীবের মত দু'এক টান দিয়া কণ্ঠে আবার প্রত্যাৰ্পণ করিল।

ঝাঁ, চলো, জমির ধানগুলো দেখে আসি। তুমিও বাড়ি যাবে।

দু'জনেই সড়ক ধরিয়া অগ্রসর হয়। চন্দ্রের হাতে দু'টি লালগোফ তপসে মাছ। আজহার আনমনা, কোন দিকে তার দৃষ্টি নাই। কোটালের কোন সাহায্য করিতে পারিল না, এই চিন্তা তার মনে কোথায় যেন বিধিতে থাকে।

চন্দ্র বেপরোয়া। সে তার স্বকীয় পদক্ষেপের ভঙ্গী বিস্মৃত হয় না।

বৃষ্টির পর দিগন্তের অবিলতা মুজিয়া গিয়াছে। শাদা বকের দল বিলের ধারে কোলাহলরত। খালের তীরে নল-খণ্ডার ঝোপের পাশে একটি মাছরাঙা বাসা হইতে গলা বাড়াইয়া আবার সন্তস্ত নীল আকাশে মিশিয়া গেল নিমেষে। চন্দ্র কোটালের চটুল চাহনি এক জায়গায় স্থির থাকে না।

আজহার পেছনে-পেছনে হাঁটিতেছিল। হঠাৎ চন্দ্র পাশ ফিরিয়া চাওয়ামাত্র আজহার ধরা গলায় বলে, চন্দ্র, মনে করিস নে কিছু, ভাই। আমারও বরাত। কপাল ত খুলল না। ব্যবসা করে একবার দেখা যেত।

চন্দ্র কোটাল অবাক।

নিশ্চয় রাগ করব। তপসে মাছদুটো যদি ছেলেপুলে নিয়ে ভেজে না খাও, রাগ করব না?

হাসিমুখে চন্দ্র আজহারের হাতে মাছদু'টি গুঁজিয়া দিল।

চন্দ্র কোটালের মনে চন্দ্রমণি, সংসার, যোগীন, গোপাল সকলে এক-একবার উঁকি দিয়া যায়। দুঃখের পশরা যেন হালকা হইয়া গিয়াছে। আজহারের সঙ্গ তার আরো ভাল লাগে।

আজহার ভাই, তোমার সঙ্গে একবার বিদেশে যাব। রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখিয়ে দাও সামান্য।

আজহারের নিকট হইতে কোন জবাব আসিল না। চন্দ্র তার বিষণ্ণ মুখের দিকে

একবার মাত্র চাহিয়া নীরবে হাঁটিতে লাগিল ।

একটা শাদা গাঙচিলের তীক্ষ্ণ স্বর প্রান্তরে মূর্ছাহত স্বপ্নিল আবেশের মত বিলীন হইয়া যায় ।

৭

কয়েক কাঠায় আউশ ধান দিয়াছিল আজহার ।

বর্ষার মাঝামাঝি পাকা রঙ ধরিয়াছে আউশের ধানে । হঠাৎ সে রাজমিস্ত্রীর কাজে কল্লিক ইত্যাদি লইয়া ভিনগাঁয়ে চলিয়া গেল । সমস্ত সংসার রহিল দরিয়াবির উপর । পূর্বে বিদেশে যাওয়ার আগে আজহার খাঁ শলাপরামর্শ করিত স্ত্রীর সহিত । এবার কোন কথা সে উচ্চারণ করে নাই । দরিয়াবির আজহারকে যন্ত্রপাতি লইতে দেখিয়াছিল । কোন ভিনগাঁয়ে যাইতেছে সে, এমন ধারণা দরিয়াবির মনে ঘুণাঙ্করে উদ্ভিত হয় নাই । পরে আমজাদ আসিয়া খবর দিয়াছিল । পিতার বিদেশযাত্রার সংবাদ শুধু সে-ই প্রথমে অবগত হয় ।

তুই বুট বলছিস, আমু ।

না মা । আঝা বললে, কোথায় নিয়ামতপুর আছে, সেখানে কাজে যাচ্ছে ।

অবেলা সঙ্গীদের সঙ্গে আমজাদ তেপান্তর-জরিপে বাহির হইয়াছিল । আকস্মিক সাক্ষাৎ পিতা-পুত্রে । নিতান্ত দৈবাতের যোগসাজশ মাত্র ।

দরিয়াবির কিছুক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল । এমনও লোক সংসারে আছে! বিদেশে যাইতেছে, তা-ও বাড়ির লোকদের একটু খবরমাত্র দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না ।

হুই ইন্সটিশনের দিকে গেল । মা, আঝাকে দেখলে একটা পাগল মনে হয় । মুখে কথা নেই । মাথা গুঁজে চলেছে ত চলেছেই । ইঁশগুস নেই ।

দরিয়াবির ঠোঁটে এতটুকু দাঁগ পড়িল না ।

মা, কী হাসি লাগে আঝার ছিঁরি দেখলে । লুঙ্গিটা পর্যন্ত ভাল করে পরতে জানে না । কোন রকমে কোমরে গুঁজলেই বুঝি কাপড় পরা হয়? তার উপর ছেঁড়া পিরহান ।

দপ করিয়া জুলিয়া উঠিল দরিয়াবির ।

যা, আর কথার খৈ ফোটাতে হবে না ।

আমজাদ কেঁচো বনিয়া গেল ।

দরিয়াবির লক্ষ্য করে, সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে । ঘন কৃষ্ণপক্ষ । আজ আর চাঁদ উঠবে না সড়কের উপর । ইন্সটিশনের পথ অনেক দূর ।

তোকে আর কিছু বলে নি, তোর আঝা?

আমজাদের দ্রুত-সঙ্কুচিত চিবুক ছুঁইয়া দরিয়াবির জিজ্ঞাসা করিল । পিতৃহীন কোন অনাথের চিবুক যেন স্পর্শ করিতেছে দরিয়াবির । কণ্ঠ তার নুইয়া পড়ে ভাবাবেগের আতিশয্যে । হঠাৎ এমন দীনতার প্রলেপ তার মনে ও শরীরে । অসোয়াস্তি অনুভব করে জননী । বালকপুত্রের জবাব আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশিয়া যায় ।

খলিল বলিল, আমু, কাজে যাচ্ছি নিয়ামতপুর ।

নিয়ামতপুর কোথা মা?

দরিয়াবিবি কোন উত্তর দিল না। আজ ক্ষোভ হয় তার। হিংসা-উদ্ভূত ক্ষোভ। সমস্ত সংসারকে এমনই নির্বিকার চিন্তে সে দেখিতে পারিত! রাত পোহাইলে শত কাজ, মনের চারিদিকে আরো সহস্র বেড়ির সর্পিলতা।

আমজাদ সম্মুখে না থাকিলে অবোধ বালিকার মত কাঁদিয়া ফেলিত দরিয়াবিবি। দৃষ্টি নেপথ্যে মিলাইয়া, বালকপুত্রের উপর ঈষৎ ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে স্থাণু প্রতিমার মত।

নঈমা পিতার ন্যাওটা। পাড়ার কোন বালকের মুখে সে বাবার বিদেশ-যাত্রার কথা শুনিয়াছিল। তার কান্না আর থামে না। রোদন-আতুর কন্যার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙিল দরিয়াবিবির।

মা, আমাকে আকা নিয়া গেল না। নঈমা চীৎকার করে।

চুপ। না হলে মার খাবি।

মার ধমকে নঈমা শান্ত হয়।

দরিয়াবিবি বলে, আমু, ও-কে তোমার মখতবের বইয়ের ছবি দেখাও।

তখনও সন্ধ্যা দেওয়া হয় নাই, দরিয়াবিবির খেয়াল ছিল না। তাই আবার বলিল, আমি ডিপে জ্বলে দিচ্ছি, একটু সবুর কর বাবা।

নাচ-দুয়ারে প্রদীপ দেখাইতে আসিয়া দরিয়াবিবি গরুগুলির চেহারাও একবার দেখিয়া লইল। যদি বৃষ্টি না হয়, কিছুক্ষণ চরাটের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আমু ছেলেমানুষ। অপরের ফসলে না পড়ে, সে ভয়ও আছে। ঝোঁড়াড়ের পয়সা যোগানের ক্ষমতা যাদের আছে তাদের গরু-বাছুর ছাড়া থাকে ফসলের দিনেও।

নিমগাছের নিচে পোয়াল-খড়ের গাদাটি বড় অদ্ভুত ঠেকিল আজ দরিয়াবিবির। নিঃসঙ্গ মনে হয় ভিটের আশ-পাশ। প্রদীপ দেখাইয়া তাই তাড়াতাড়ি সে পুত্র-কন্যার নিকট ফিরিয়া আসিল।

একজোড়া পেঁচা উড়িয়া গেল। অমঙ্গলের আশঙ্কায় দরিয়াবিবির বুক দুরুদুরু করে। ছেলেদের কাপড় চুরি গেল কয়েকটি। হাত-ছ্যাচড়ের উপদ্রবে রাত্রির ঘুম ব্যাহত হয়। পুরুষ মানুষ ছিল ঘরে, তবু ভরসা। নিঃসঙ্গতা আর একবার হানা দিয়া গেল। বেলাবেলি গেরস্থালির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। দরিয়াবিবি আমজাদের পাশে বসিয়া তার পড়া শোনে : একদা দিল্লী নগরীর পথে।

নঈমা হি হি শব্দে হাসে : দিল্লী-বিল্লী হি-হি।

চুপ করে শোন্। গোলমাল করিসনে, নঈমা। বড় সজাগ আজ দরিয়াবিবির কান।

আমু পড়াশোনা করিতেছে, তার গোলমাল নেহাৎ কম নয়। তবু বেড়ার ধারে কি পৈঠার কাছে সামান্য শব্দ হইলে দরিয়াবিবি উৎকর্ণ হইয়া পড়ে।

ধূসর ভবিষ্যৎ যোজন-বিসারী প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তার চারিদিকে শুধু রুদ্ধতা; সবুজ রঙের ফিকে আভাস পর্যন্ত নাই। দৃষ্টি মেলিয়া দিলে চাঁচর বালুর অকরণ হাসিই একমাত্র সত্যরূপে প্রতিভাত হয়।

দরিয়াবিবি কোনদিন বাস্তবের সম্মুখে ভাঙিয়া পড়িতে শিখে নাই। আজ সামান্য ব্যাপারটুকু কেন্দ্র করিয়া এতকিছু ঘটিয়া গেল।

সপ্তাহ কবে শেষ হইয়া যায়, আজহার খাঁর কোন খবর নাই। পিয়নকে আমজাদ অনর্থক বিরক্ত করে। দরিয়াবিবিও চিন্তিত হয়। অবশ্য আউশ ধান কাটা বাকী আছে। তার পূর্বে আজহার খাঁ নিশ্চয় বাড়ি ফিরিয়া আসিবে, দরিয়াবিবির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

ধীরে ধীরে আরো দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সাকেরকে ডাকিয়া দরিয়াবিবি বহু খেদোক্তি করিল। জওয়ান মরদ বিদেশে গিয়াছে, তার জন্য এত ভাবনা-চিন্তা ভাল নয়। এই উপদেশ দিয়া সে সরিয়া পড়িল।

দরিয়াবিবি চারিদিকে অন্ধকার দেখে। হাত-খরচ শেষ হইয়া গিয়াছে। ছোটছেলে আর মেয়ের মুখে দৈনন্দিন আহাৰ্যটুকু কি শেষে যোগাইতে পারিবে না, ধার-কৰ্জ করিয়া কতদিনই চলিবে?

দরিয়াবিবি উপায়ের খোঁজে অন্ধকারে হামাগুড়ি দিতে থাকে। ছাগলছানা দু'টি থাকিলে দুর্দিনে কাউকে বিক্রয় করা যাইত। সে পথেও আল্লা বাধ সাধিয়াছেন। পুরুষমানুষ ঘরে থাকলে কোন না কোন পথের হদিস মিলিত। বর্ষাকাল, পাড়া-প্রতিবেশীরা কোন রকমে দিন গুজরান করে। বীজধান থাইয়া অনেকে শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। এই সময় জন-মুনিশ লোকে কম খাটায়। চারিদিকে বিপদের বেড়া জাল। প্রত্যেকে আত্ম-বিব্রত। গরীব কৃষক-পল্লীর ভেতর সহানুভূতি বুক-ফাটা নিঃশ্বাসের রূপ ধরিয়া বাতাসে ধ্বনিত হয়। আর তিন-চার দিনের খোরাক আছে। তারপর?

পরদিন সাকেরের মা'র সঙ্গে দরিয়াবিবি দেখা করিতে গেল। বৃদ্ধার গণ্ডস্থল আনন্দে স্বেচ্ছ হইয়া উঠে। হাসু-বৌর নিয়ৎ আল্লা পুরা করিয়াছে এতদিনে। আনন্দে সাকেরের মা এই বয়সেও অস্থির হয়। দরিয়াবিবি ঠাট্টাচ্ছলে দাওয়াতের কথা পাড়িয়াছিল। বৃদ্ধা শুধু রাজি হইয়া গেল না, রীতিমত পীড়াপীড়ি শুরু করিল। দরিয়াবিবি আজ সরলচিন্তে নিমজ্ঞ গ্ৰহণ করিতে পারে না। কোথায় যেন মনে ব্যাপারটা বেঁধে। ঘরে ভাত নাই, এমনদিনে দাওয়াত স্বীকার করিলে পাড়া-পড়শীরা হীন চোখে দেখিবে। তবু রাজি হইয়াছিল দরিয়াবিবি। এক বেলার খোরাক অন্তত বাঁচিয়া গেল। আসেকজানও সেইসঙ্গে নিমজ্ঞিত হইয়াছিল।

এতদিন আসেকজানের প্রতি দরিয়াবিবির একরূপ করুণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব ছিল। ইদানীং অন্য চোখে দেখে এই বৃদ্ধাকে। সংসারে নিজেদের অসহায়তার সঙ্গে আসেকজানের দশা সমান পাল্লায় ওজন করা চলে, দরিয়াবিবি তা গভীরে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে। পূর্বে তার কোন খোঁজ-খবরই সে লইত না। কখন খায়, ঘুমোয় বা অভুক্ত থাকে তার হিসাবের প্রয়োজন ছিল না দরিয়াবিবির। বর্তমানে মনের এই বোঝাবাহী প্রবৃত্তির তাড়না সে নিজেই অনুভব করে।

বর্ষায় আসেকজান বাহির হইয়া যায়। দাপাদাপি বৃষ্টি তোড় চলিতেছে, সে কিন্তু থামে না। হয়ত তার দাওয়াত থাকে অথবা থাকে না—কিন্তু দাওয়াতের বাহানা সে ষোল আনা করে।

ঘরে চাল শেষ হইয়া আসিতেছে। আসেকজান সব খবরই রাখে। এই বিষয়ে আমজাদ তার সহায়। রাত্রিবেলা ঘুমাইতে গেলে আসেকজান খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া সব জিজ্ঞাসা করে। জালায় আর বেশি চাল নেই, দাদি। মা কত রাগ করছিলেন আন্ধার উপর।

আসেক্জান প্রশ্নের জবাবে চুপ করে কিছুক্ষণ, আবার বলে : আজ পেট-পুরে ভাত খেয়েছো?

হ্যাঁ, দাদি। মা কিন্তু ভাল করে খায় না।

আসেক্জান স্তব্ধ হইয়া গেল আবার।

এমন সংলাপের বিনিময় চলে।

পরদিন জালার ভেতর হঠাৎ বেশি চাউল দেখিয়া দরিয়াবিবি আমজাদকে ডাকাইল।

দরিয়াবিবি : জালায় চাল এলো কোথা থেকে?

আমজাদ : আমি কি জানি, মা।

দরিয়াবিবি ব্যাপারটা সহজে আন্দাজ করে। অন্যদিন হইলে এতক্ষণে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইত। সদকা-জাকাতের চালে তার শিশুদের জঠর-সেবা চলিতে পারে না। আজ দরিয়াবিবি নিজেই অন্যদিকে কথার স্রোত ফিরাইল।

তুই পিয়নকে জিজ্ঞেস করেছিলি, টাকা বা চিঠি কিছু নেই?

আমি রোজ জিজ্ঞেস করি, মা।

কাল আর একবার যাস।

মা'র কর্ণ এত মোলায়েম হইতে পারে, আমজাদের বিশ্বাস হয় না।

বড় মিষ্টি মনে হয় মা'র গলা : আমু, ধান পেকেছে নাকি দেখে আসবি কাল। মুনিশ করে কাটাতে হবে আর কী।

আমজাদ মাথা দোলাইয়া সায় দিল।

রান্নার জন্য মা চাউল মাপতে আসিয়াছিল। হঠাৎ আমজাদকে আদর করিতে আরম্ভ করিল দরিয়াবিবি। যেন কত কথা আছে আরো, তা আজ বলিয়া শেষ করা যায় না। তাই স্নেহের ছোঁয়াতে সমাপ্তি-রেখা টানা হইতেছে। মা'র চুম্বনে বিব্রত হয় আমজাদ।

বাইরে বাঁশবনে মিমির শব্দ শোনা যায়।

পরদিন দুপুরে আমজাদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। সামান্য অন্যায়ে মা এমন শাস্তি দিতে পারেন। মখতবের বেতন চাহিয়াছিল সে। হয়ত মা'র মেজাজ ভাল নয়, সেইজন্য চাওয়া উচিত হয় নাই; কিন্তু জননী এমন বেদেরেগ হাত চালাইতে পারে, তার জানা ছিল না।

মার খাইয়া দাওয়ায় বসিয়া সে নীরবে অশ্রুপাত করিল বহুক্ষণ। নইমা পাশে, দাঁড়াইয়াছিল। অনুভব জননীকে যদি একটিবার পাওয়া যায়। দরিয়াবিবি শত 'কাল্লাম' জুড়িয়াছিল। আজহার ও তার চৌদ্দপুরুষের চল্লিশার আয়োজন হইতেছিল দরিয়াবিবির ঠোটে। আমজাদ আনমনা অলক্ষিতে ভিটা হইতে সরিয়া পড়িল।

মাঠে আসিয়া সে শান্তি পায়। আজহারও এই প্রান্তরের বুকেই দীর্ঘশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারে। রক্তের শৃংখলে বোধ হয় আমজাদ বাঁধা পড়িয়াছিল।

সে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল মাঠে মাঠে। আকাশে মেঘ ছিল, বৃষ্টি ছিল না। ঘুরিয়া বেড়াইতে কোন বাধা নাই।

বেলা চলিয়া পড়িতে তার ভয়ানক ক্ষুধা লাগিল। বর্ষাকালে ধান ছাড়া অন্য চাষ নাই মাঠে। গ্রীষ্মের দিন হইলে তরমুজ-শশা খাইয়া আমজাদ মা'র উপর প্রতিশোধ গ্রহণ

করিত। অদৃশ্য হাতের টানেই সে চন্দ্র কোটালের কুঁড়ের দিকে অগ্রসর হইল।

নদীর মোহনার কাছে একটা পিঠুলী গাছের তলায় বসিয়া আমজাদ আবার আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। চন্দ্র কাকার বাড়ি সোজাসুজি যাইতে আজ বাধে। মনের আবহাওয়া অতটুকু ঝোকাও সহজে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। চন্দ্রমণি একবার কলস-কাঁখে খালের ধারে আসিয়াছিল। আমজাদকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, এখানে বসে আছ যে—?

আমজাদ জবাব দেয় না। তার মুখ শুষ্ক। চোখের পাতার নিচে কান্নার শুষ্ক ছাপ।

রাগ করে এসেছো বুঝি বাড়ি থেকে?

চন্দ্রমণি ঠিকই আন্দাজ করিয়াছিল।

চলো, তোমার কাকা ঘরে আছে। কি হয়েছে?

আমজাদ শুধু মাথা হেঁট করিয়া থাকে। চন্দ্রমণির অনুরোধ সে রক্ষা করে না।

এই সময় চন্দ্র কোটালও আসিয়া উপস্থিত হইল।

কি রে চাঁদমণি।

এই দ্যাখো না, দাদা। তোমার বন্ধুর ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে।

চন্দ্র আমজাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিল। সে নির্বাক নিশ্চল। তার কচি সুন্দর দুই চোখও দূরে উধাও।

হাসিয়া ফেলিল চন্দ্র।

আরে চাচা, গাছের তলায় শেষে তপ করিতে বসেছো নাকি? তোমার বাবা বড় নামাজী-মুসল্লী। তার ছেলে।

আমজাদ কারো দিকে চায় না।

কোটালরা দুই ভাইবোনে খুব ইতিহাসে থাকে।

শীস দিয়া চন্দ্র গান ধরিল—

কথা কয় না।

আমার ময়না।

তবু আমজাদের ঠোঁটে কোন আভাস নাই। চন্দ্র এইবার একটা শীস দিয়া ‘সুৎ’ শব্দ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমজাদকে পাঁজাকোলা করিয়া একদম কাঁধে তুলিয়া লইল।

মৌনী বাবা এবার ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্না শুরু করিল।

কথা কয় না

আমার ময়না,

হায়, হায় রে ...

চন্দ্র খালের সড়কে হাঁটে।

চন্দ্রমণি ডাকে, ও দাদা, ছেলেটাকে দুটো মুড়ি খাইয়ে নিয়ে যাও।

মাথা দোলায়। হ্যাঁ, বড় কথা মনে করেছিস, মণি।

কোটাল আবার ঘরের দিকে মুখ ফিরাইল।

বৃষ্টি ঝরিতেছিল অঝোরে। মাঠের খোলা জায়গায় জমাট টইটুমুর পানির উপর আকাশের ছায়া পড়ে। বর্ষা থামিলেই শালিখ-চড়াই আসিবে স্নানের লোভে ছুটিয়া।

দরিয়াবাবি সদর ছাড়িয়া সড়কের ঘুলি-পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জীবনে আর কোনদিন সে এতদূর আসে নাই, মাথায় চটের থলি টোফার মত করিয়া দেওয়া। পায়ের তলায় বৃষ্টিস্রোত বহিয়া যাইতেছে। চটের থলি পানি রোধ করিতে পারেনা। ইতিমধ্যে উপরদিক ভিজিয়া গিয়াছে।

দরিয়াবাবি নির্বিকার দাঁড়াইয়াছিল। বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে, তবু খেয়াল নাই। কার প্রতীক্ষায় সে দাঁড়াইয়া আছে?

সড়কের একপাশে গাছপালার নৈরাজ্য অল্প, তাই দূরে মাঠ দেখা যায়। অন্যান্য দিকে আকাট লতা আর গাছপালার জঙ্গল। মেঘমেদুর আকাশের আচ্ছাদনে নীরব-নিবিড় পল্লীর এই বিজন কোলটুকু ভয়াবহ, প্রেতায়িত—সামান্য শব্দে চমক লাগে।

সড়কে দরিয়াবাবি দাঁড়াইয়া থাকে। চঞ্চল চোখ বারবার সড়কের দূরতম রেখায়। তার গভীর মুখাবয়ব আকাশের বাদল যেন।

হঠাৎ দরিয়াবাবির দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। দূরে একটি বালকমূর্তি দেখা গেল। আমজাদ দ্রুত পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। একটিমাত্র লাল গামছা তার মাথায়।

বৃষ্টির পতন-রেখার ভেতর দিয়া তার বালকমূর্তি অপরূপ দেখায়। একটি পুতুল লাফাইয়া চলাফেরা করিতেছে।

দরিয়াবাবি আকস্মিক উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আমজাদ তার নিকটে পৌঁছিবার পূর্বেই জিজ্ঞাসা করে, শৈরমীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

বৃষ্টিম্নাত তার সমগ্র শরীর। শীতে আমজাদ কাঁপিতেছিল। সহজে জবাব দিতে পারে না।

মা'র কাছে যেসিয়া সে হাঁফ ফেলে কিছুক্ষণ, তারপর বিষণ্ণমুখেই জবাব দেয় : না গো মা। তবে শৈরমী-ফুফুর 'জা' বললে, সে মাঠ থেকে তাদের বাড়ি যাবে।

শৈরমী জাতে বাগদী। কৈবর্ত-পাড়ার চৈস ছাড়াইয়া গেলে জনপদের একটেরে বাগদীদের বাস। শৈরমীর সংসারে একমাত্র পুত্র পুত্র জীবিত। বহুদিন পূর্বে তার স্বামী পরলোকে। গণেশ দীর্ঘকাল রোগে ভুগে পরে হঠাৎ অকেজো হইয়া পড়ে। সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, এক হাত বাঁকিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সেও শৈরমীকে এই পুত্রের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পাড়ায় সে ঘুঁটে দেয়, মাঠের শাক তুলিয়া বেচে, কারো বাজার-সওদা কিনিয়া আনে। ফাইফরমাশেই তার জীবিকা সংগ্রহ হয়। জওয়ান পুত্রের এই দূরবস্থা। কায়িক পরিশ্রমের চাপেই শৈরমী তা সহ্য করিতে শিখিয়াছিল। দরিয়াবাবির সঙ্গে কয়েক বছরের পরিচয়। শৈরমী এই বাড়ি ঘুঁটে দিয়া যায়। সেই সূত্রেই হৃদয়তা গড়িয়া উঠিয়াছিল। শৈরমী গ্রামেরই ঝিউড়ী বলিয়া সে দরিয়াবাবিকে ভাবী সম্বোধন করিত।

আমজাদ শীতে কাঁপিতেছিল। সেদিকে দরিয়াবিবির লক্ষ্য নাই। কাদার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে যেন কত ভাল লাগে।

বিশ্বগ্ন-মুখ পুত্র ও জননী।

বৃষ্টি একটু কমিয়াছিল। গাছে-পাতায় মৃদু নিনাদ অহর্নিশ বাজিতেছে। পাখির ভিজে পাখনা-ঝাড়ার শব্দ এবার শোনা যায়।

যদি না আসে। নীরবতা ভাঙিল দরিয়াবিবি।

না গো মা, আসবে। ঘরে চলো, আমার শীত পেয়েছে।

হুঁশ হয় যেন দরিয়াবিবির। আঁচলের একপাশ শুষ্ক ছিল, তা দিয়া সে আমজাদের মাথা মুছাইয়া দিল।

এখানে মুছে কি হবে মা, বিষ্টি পড়ছে যে!

গৃহকর্মে নিপুণ দরিয়াবিবির কোন কাজে যেন সুতৌল নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে, এখন চুল মুছাইয়া দেওয়া বৃথা, এই কথাটুকু সে যেন উপলব্ধি করিতে পারে না।

একটা অশখ গাছের গোড়ায় অনেক ব্যাঙ লাফাইতেছে। শীতে কাঁপিতেছে, তবু মজা লাগে বেশ আমজাদের। খপ্ খপ্ করিয়া একটি ব্যাঙ সড়কের উপর বসিয়া বাদল পোকা খাইতেছে নীরবে।

আমজাদ জোরে এক 'সুট' দিয়া বলিল, মা, দ্যাখো ফুটবল খেলছি।

ধপাস শব্দে কয়েক হাত দূরে ব্যাঙটি আবার মাটির উপর পড়িল। চার হাত-পা ছাড়িয়া ফোক-ফোক শব্দ করে ব্যাঙের বাচ্চা।

দরিয়াবিবি এই সময় হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না।

আরে আমু, তোর ছেলেমি আর যাগু-সা।

নিজের কৃতিত্বে আমজাদ গম্ভীর হইয়া যায়। মাথা দোলাইয়া সে বলে, ঘরে আমাকে কিন্তু গরম ভাত খেতে দিতে হবে। এত ভিজেছি, আমার বুঝি ক্ষিদে লাগে না।

দরিয়াবিবি চুপ করিয়া গেল। তার মুখের হাসি নিভিয়া যায় তখনই।

আরো আকাশে মেঘ জমিতেছে। আরো কতদিন বর্ষা লাগিয়া থাকিবে বাংলাদেশের গ্রামে?

নঈমা কোথাও যায় নাই, আসেকজানের সঙ্গে সে বাগ-বিতণ্ডা করিতেছিল। দু'জনে মাঝে মাঝে কৃত্রিম বিবাদ চলে। গতকাল আসেকজান কিছু চাল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল। তারই সদগতি হইতেছে।

পান্তাভাত ছিল সকালের। দরিয়াবিবি রান্নার আয়োজন করে নাই। আমজাদ বাঁকিয়া বসিল, সে পান্তাভাত খাইবে না।

মেজাজ খারাপ, তবু দরিয়াবিবি আজ চুপ করিয়া গেল। অভিমানে আমজাদ কিছুই স্পর্শ করিল না। বিছানায় শুইয়া শুইয়া ক্ষুধার্ত জঠরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

দরিয়াবিবি ভিজা কাপড় ছাড়িয়া বসিয়া রহিল। গোয়ালে গরুগুলি খড় চিবাইতেছে। আজ আর কোন হাস্যামা নাই। কত নিশ্চিন্ত যেন দরিয়াবিবি। নঈমা আসেকজানের ঘরে খেলা করিতেছিল, তার আওয়াজ কানে পৌছায়।

বৃষ্টির কামাই নাই।

নিদ্রিত আমজাদের দিকে চাহিয়া দরিয়াবিবির বুকে শত তরঙ্গের আলোড়ন চলিতেছিল। বাহিরে তার প্রকাশ নাই। দরিয়াবিবি চুপচাপ বসিয়া। বহুদিনের যেন অবকাশ মিলিয়াছে। কর্মক্লান্ত জীবনে খুঁটিনাটি দিনগুলি তাই স্মরণে গাঁথা হইতেছে।

সামান্য পান্ডাভাত ছিল। দরিয়াবিবি খাওয়ার কথা সহজেই ভুলিয়া যায়। তারও ঘুমের চোখ বুজিয়া আসে। দেওয়ালে ঠেস দিয়া দরিয়াবিবি ঢুলিতে থাকে।

কোথা গো ভাবী, শব্দে চমকিয়া উঠিল দরিয়াবিবি।

সত্যই শৈরমী আসিয়াছে। ভিজ়ে কাপড়। হাতে একটি ন্যাকড়া কাপড়ে বাঁধা শাকের পুঁটলি।

দাওয়ার উপর বোঝা রাখিয়া শৈরমী বলিল, কেন ডেকেছিলে, ভাবী?

দরিয়াবিবি শৈরমীর কাছে যেন ছুটিয়া আসে। ঘুম উবিয়া গিয়াছে তার।

এই রাত্তায় যে ছায়া পড়ে না আর দিদির।

শৈরমীর রং কালো। বৃদ্ধ বয়সে চামড়া লাল হইয়া গিয়াছে।

রেখা-সংবলিত শরীরে আবার বৃষ্টিপাত শৈত্যের জ্বলুম। কুঁকড়াইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে শৈরমী। বড় কুঁহসৎ দেখায় তার শরীর।

কিন্তু তার কণ্ঠে হৃদয়ের অপূর্ব আভাস বাজে : কত কাজে থাকতে হয়, তোমার কাছে কি অজানা ভাবী। বর্ষাকালে ছেলেটাকে নিয়ে কষ্টের সীমা নেই।

এইবার রীতিমত হাঁপায় শৈরমী।

দরিয়াবিবি গণেশকে কোনদিন দেখে নাই। তবু শৈরমীর দুর্দশা তার কাছে বাস্তব। কোন কল্পনার প্রয়োজন হয় না তার।

নসীব, বোন। তোমার অমন রোজগারী পুতের এমন অসুখ দিলে, আল্লা।

শৈরমী বুকে দুই হাত রাখিয়া উজ্জ্বল ঝোঁজে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে চায় না সে। দরিয়াবিবি সহজে কোন কথা পাড়িতে দ্বিধাশ্রস্ত, কেবল দেবীর বাহানা তার।

পুঁটুলিতে কী আছে, দিদি?

শৈরমী জবাব দিল, ভাবী, কটা শাক আছে। একটু তেল আন, একদম 'চান' করে ঘরে ঢুকব।

দরিয়াবিবি ঘরের ভেতর হইতে সরিষার তেলের ভাঁড় আনিল।

শৈরমী তখন পুঁটলি খুলিতেছে। সে একরাশ শাক দাওয়ার উপর রাখিয়া দরিয়াবিবির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

আর দেবো, ভাবী?

না, এত মেটে শাক কি খাওয়া যায়! আর কি আছে পুঁটুলিতে?

কিছু নেই।

কৌতূহলের ছলে দরিয়াবিবি শাকে হাত দেওয়া মাত্র তার নীচে শামুক দেখিতে পাইল।

বেশিদূরে সে অগ্রসর হইল না। দরিয়াবিবি বুঝিতে পারে, শৈরমী ত খুব সুখে নাই। হাঁসের জন্য শামুক লইয়া গেলে এমন গোপনের কী আছে। আর বেশি কথা জিজ্ঞাসা করিল না দরিয়াবিবি।

ভাবী, এবার উঠি।

আর একটু বসো। বুড়ো হাড়ে কী এত শীত ঢুকেছে?

কৃত্রিম কোপনতার সঙ্গে বলে দরিয়াবিবি।

শৈরমী অনুনয় করে : ভাবী, আর এক দিন এসে গল্প করে যাব। যাই, ছেলেটাকে বর্ষায় ঘরে একা রেখে মন মানে না। পাছে কিছু হয়।

দরিয়াবিবি ক্রিয়াক্ষণ কোন জবাব দিল না। পিড়ির উপর বসিয়াছিল মাথা নীচু করিয়া, তেমনই বসিয়া রহিল। মুখের উপর কালো ছায়া পায়চারী করে তার।

হঠাৎ এক দম্কা নিঃশ্বাসে দরিয়াবিবি বলিয়া ফেলিল, দিদি, তোমার গুণধর ভাই তিন হুগা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে মুখ কালো করে। ঘরে বড্ড টানাটানি। একটা পুরাতন ঘড়া আছে— রেখে যদি কেউ পাঁচটা টাকা দেয়। আমি সুদ দেবো মাসে মাসে।

শৈরমী বিশ্বাস করে না। মিছামিছি বলছ, ভাবী।

দরিয়াবিবি হৃদ্যতার জন্যই শৈরমীকে কোনদিন কোন দুঃখের কথাই বলে নাই, বরং শৈরমীকে এক-আধটা পয়সা দিয়া সাহায্যের চেষ্টা করিয়াছে, আধ পয়সার শাক এক পয়সায় কিনিয়াছে।

হৃদ্যতার এই আর এক সোপান।

আজহারের উপর দরিয়াবিবির ক্রোধের অন্ত থাকে না।

দ্যাখো না, দিদি। ঘর ছেড়ে পালালো। আমিও ব্যেঙ্গস থাকলে কাউকে নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। এমন লোক ভূ-ভারতে না জন্মায়। এমন—

শৈরমী ধমক দিয়া বলিল, কি-সব সন্ধ্যাছাটির কথা মুখে আনছ অবেলায়, ছিছি! ভূমিও দিদি, সামান্য বাতাসেই হেলে পড়ো?

দরিয়াবিবি স্তব্ধ হইয়া যায় হঠাৎ।

আচ্ছা, ঘড়াটা দাও। অধর সাতের মা'র কাছে রেখে পাঁচটা টাকা আনব। বুড়ি দু'পয়সা সুদ চায় মাসে।

তাকেই দিও।

ধীরে কথা বলে দরিয়াবিবি। দুই চোখ ছলছল করে তার।

বাবাজী বিয়ের সময় যৌতুক দিয়েছিল। আগে কপাল ভেঙেছিল। সেখান থেকে অতিকষ্টে ঘড়া আর পেতল-কাঁসার কটা জিনিস এনেছিলাম।

সজল ডাগর দুই চক্ষু দরিয়াবিবির বাষ্পায়িত। থমথমে আকাশের মত মুখাবয়ব বড় সুন্দর দেখায়। পরিশ্রম-মলিন গৌর রঙ বিদ্যুতের আভাসের মত খেলিয়া গেল।

শৈরমী দুঃখ প্রকাশ করে : দাদার এমন উচিত হয় নি। ভাল ঘরের বউড়ী বাইরে বেরোয় না, সংসার দেখবে কে?

ভূমি-ই বলা দেখি, দিদি।

দরিয়াবিবি কয়েক মিনিটের জন্য ঘরে ঢুকিল। যখন বাহির হইল তার হাতে একটি পুরাতন পিতলের ঘড়া।

মাটির উপর রাখা মাত্র ঠুন শব্দ হয়।

শৈরমী বারবার ঘড়াটি পরীক্ষা করিতে লাগিল।

দেখব ভাবী, যদি দু'এক টাকা বেশি দেয়। যে মজবুত জিনিস।

বৃষ্টি থামিয়াছিল কিয়ৎক্ষণের জন্য।

দরিয়াবিবি একটি পান শৈরমীর হাতে দিয়া বলিল, দিদি, আঁচলের আড়ালে নিয়ে যাও। কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন বলো না, আমাদের ঘড়াটা। দিব্যি রইল, দিদি।

ভাবী, এতদিনে আমাকে এমন কাল-কেউটে ঠাওরালে। অদেইট খারাপ না হোলে ঘরের লক্ষ্মী পরের ঘরে কেউ রেখে আসে?

শৈরমী উঠিয়া পড়িল। আবার বৃষ্টি শুরু হইয়াছে। দরিয়াবিবি তখনও ঘড়াটা নাড়াচাড়া করে। কত অনিচ্ছার প্রতিরোধ মনে, তবু ধীরে ধীরে পিতলের সামগ্রী শৈরমীর হস্তে তুলিয়া দিতে হইল।

কাউকে বল না কিন্তু, দিদি। আমার মাথার দিব্যি।

শৈরমী চলিয়া গেল।

সামান্য চাল আছে, আমজাদের জন্য ভাজা হইবে। রাত্রে আর কিছুই ঝঞ্ঝাট নাই দরিয়াবিবির।

দূরে মেঘ-গর্জন প্রান্তর হইয়া ভাসিয়া আসে। সবুজের বন্যায় তরুলতা লুটোপুটি খায়। অবেলার মৌন আকাশ দরিয়াবিবির মুখের উপর বারবার ছায়া ফেলে।

* * * *

এই দুর্দিনে চন্দ্র কোটাল অনেক সাহায্য করিল। একটী কানাকড়ি সে দেয় নাই। গতরে মেহনৎ আর সহনভূতির কোন মূল্য নিরূপণ করা যায় কী? আরো দুই হুগাহ কাটিয়া গেল। আজহারের কোন পান্তা নাই। বর্ষায় গোবর হইয়া যাইত এতদিন পাকা আউশ ধান। চন্দ্র কোটাল মুনিস করিয়া নিজে সুকুখড় আজহার খাঁর ঘরে পৌছাইয়া দিয়া গেল। এবার ভাল ধান ফলে নাই। তবু বর্ষার পর দু'মাস কোন রকমে কাটিয়া যাইবে। দরিয়াবিবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বুক বাঁধে। চন্দ্র কোটালের উপদেশেই সে কোনো দেনা শোধ করিল না। দু'মাসে যদি আজহারের সংবাদ না আসে— যদি আর কোন দিনই না আসে। কুটিল হতাশার চক্রে রাখয় নিশ্চিষ্ট হইতে থাকে দরিয়াবিবি।

আমজাদ একদিন মখ্তব হইতে ফিরিয়া বলিল, মা, মৌলবী সাহেব মাইনে চেয়েছে। দরিয়াবিবি বিরক্ত হয় : থাক্ রোজ রোজ তাগাদা করতে হবে না মৌলবী সাহেবকে। কাল থেকে মখ্তবে যাসনে।

আমজাদের মুখ শুকাইয়া যায়।

দরিয়াবিবি একরাশ খুদের কাঁকর চয়ন করিতেছিল। আমজাদের দিকে চাহিয়া তার বিরক্তির ছায়া অদৃশ্য হয়। মুখ গম্ভীর করিয়া দরিয়াবিবি বলে, মৌলবী সাহেবকে বল, আমার বাপ এলে সব চুকিয়ে দেব।

আমজাদ তবু নড়িল না। সে জানে, মা ঐ এক বাক্যে বহুদিন মৌলবী সাহেবকে স্তোক দিয়াছে।

সাহসের উপর দিয়া আমজাদ মা'র কথার প্রতিবাদ করিল, তুমি ত রোজ ঐ কথা বলো।

দরিয়াবিবি অবনত মুখে কাঁকর বাছিতে থাকে, আমজাদের দিকে আর চাহিয়াও

দেখে না।

আমজাদ গুটিসুটি মারিয়া গতিবিধি লক্ষ্য করে শুধু।

বহুক্ষণের নিস্তব্ধতা জগদল ঠেকে আমজাদের নিকট, উস্খুস্ করে সে।

দরিয়াবিবি তার পুত্রের অস্তিত্ব যেন বিন্দুত হইয়াছে।

মা হঠাৎ ডাকিয়া ফেলে আমজাদ। আড়ষ্ট ঠোট হইতে কোনরকমে নিঃসৃত।

গম্ভীর দুই নেত্র প্রসারিত করিয়া দরিয়াবিবি একবার পুত্রের দিকে চাহিল মাত্র।

মা।

আমজাদের সম্বোধন আরো বাড়িয়া যায়।

এবার তীক্ষ্ণস্বরে জবাব আসে, কী?

মা।

না। কাল থেকে আর মথতবে গিয়ে কাজ নেই। ঢের হয়েছে লেখাপড়া।

আমজাদ মনে মনে উল্লসিত হয়। মথতবের ছেলদের ভাল লাগে। মথতব তার আদৌ ভাল লাগে না।

তবে কী করব, মা?

ব্যঙ্গস্বরে জবাব দিল দরিয়াবিবি : কী করবি আবার! চাষার ছেলে জাতব্যবসা ধরবি।

আমজাদ এইবার মাথা হেঁট করে। কৃষির মত কঠোর পরিশ্রমে কোন সম্মান নেই।

মুখের হাসি অল্লান রাখিয়া সে জবাব দিল, আমি-এই আট বছর বয়সে লাঙল ঠেলতে পারব?

তোর ঘাড় পারবে।

আমজাদ ভয় পায়, মা রীতিমত ক্রুদ্ধ।

এমন সময় হঠাৎ চন্দ্র কোটালের ডাক শোনা গেল দহলিজে।

আমজাদ হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল।

এমনি আসিয়াছে কোটাল। আজহারের কোন সংবাদ পাওয়া গেল কিনা। নিয়ামতপুরে ধানব্যবসায়ীরা প্রায়ই যায়। তারা কোন খোঁজ দিতে পারে নাই। অতবড় গঞ্জে আজহার খাঁর মত নগণ্য মানুষের তালিকা কোথাও লেখা থাকে না।

আমজাদ কোটালের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিল। একটু পরে দহলিজের আড়াল হইতে দরিয়াবিবি নিজেই কোটালকে ডাকিয়া বলে, কোটাল মশায়, আমজাদের একটা বন্দোবস্ত করে দিন।

চন্দ্র অবাক হইয়া যায়। আজ পর্দানশীনা দরিয়াবিবি নিজেই কথা বলিতেছে।

লঙ্কায় চন্দ্র কোটালের কণ্ঠস্বরে তার স্বাভাবিক গমক থাকে না।

কেন, কী হলো, ভাবী?

গরীবের ছেলে, খামাখা মথতবে মাইনা গুণে লাভ কী?

চন্দ্রের স্বাভাবিক রসিকতা-পটু কণ্ঠস্বর শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল সে।

তা ঠিক। তবে দুই-এক বছর দেখা উচিত। ঐ ত কচি ছেলে।

না, যখন বেশিদূর টানতে পারব না। খামাখা টাকা খরচ করে লাভ নেই।

চন্দ্র আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিল না।

ভাবী, বরং আমার সঙ্গেই থাকুক। মাছ-ধরা নৌকা বাওয়া শিখুক।

দরিয়াবিবি রাজি হইয়া গেল। ঐটুকু ছেলে এখনও সাঁতার শেখে নাই! সে নৌকা বাইবে? চন্দ্রের উপর সব নির্ভর করা চলে।

পান খাইয়া আমজাদকে একটু আদর করিয়া চন্দ্র কোটাল গাঁয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

পরিদিন সকালে আমজাদ অবাক হইয়া গেল। একটি ছোট লগী হাতে মা কোটালের নিকট পুত্রকে প্রেরণ করিতেছে। সত্যি নৌকার জীবন আরম্ভ হইবে নাকি!

মা'র দৃঢ় মুখাবয়ব দেখিয়া আর কোন আপত্তি করিল না আমজাদ। সামান্য মুড়ি কোঁচড়ে সে নদীর পথ ধরিল।

দু'বছর আগেও দরিয়াবিবি এমন ঘটনা-স্রোতের কল্পনা করে নাই। কত স্বপ্ন ছিল তাঁর চোখে শিশু-পুত্র লইয়া!

তুমি কি আর স্বপ্ন দেখো না, দরিয়াবিবি?

৯

মৌন মহিমায় বর্ষার আকাশে জাগিয়াছিল তারা— ক্ষুণ্ণ অন্তর লইয়া।

মফস্বল শহরের অন্তঃপাতী গণ্ডগ্রাম। সড়কের একটেরে আজহার ও কয়েকজন রাজমিস্ত্রি বাসা ভাড়া লইয়াছিল।

স্টেশনে যাত্রী পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য এ অঞ্চলের শেষ বাস্‌ বহুক্ষণ সড়কের উপর টায়ারের দাগ আঁকিয়া গিয়াছে।

আজহার একমনে তখনও নারিকেলী হঁকা টানিতেছিল। কঙ্কের দমের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ফুলকি ওড়ে বাতাসে। ক্রিয়ৎক্ষণের জন্য অন্ধকার সরিয়া যায়। বাসার দরজা চোখে পড়ে। আজহার চৌকাঠের উপর।

বাসার আয়তন সঙ্কীর্ণ। একদিকে মাত্র জানালা। মাটির দেওয়ালে চুন-বালি ছোপানো কোথাও রং ধসিয়া গিয়াছে। মেঝে সুসমতল নয়। তারই উপর মাদুর পাতিয়া আজহারের সঙ্গী ঘুমাইতেছিল। সারাদিন বৃষ্টির পর ভ্যাপসা গরমে ঘরের ভেতর আজহারের দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্বেই বিছানা ছাড়িয়া সে চৌকাঠে ধোঁয়ার আসর জমাইতে মগ্ন হইয়াছিল।

সড়কের পাশে একটি ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছিল। এই অঞ্চলে ভয়ানক মশা। খালি গায় শোয়া-বসার উপায় নাই। নিস্তেজ ক্লান্তির ছায়ায় কঙ্কে টানিতে টানিতে তার চোখ বুজিয়া আসে। আশেপাশে মশা তন্‌তন্‌ করে। এক-একবার গামছার ঝটকা মারে আজহার, আবার ধোঁয়ার সঙ্গে মিতালি চলে।

সড়কের গাছপালায় অন্ধকার জমিয়া রহিয়াছে। শীতল রাত্রির ডাকে জোনাকিদের চোখ নিদ্রাহীন। পানা-পুকুরের ধারে এই নিরীহ পতঙ্গের দেয়ালি উৎসবে কোন ছেদ পড়ে না।

ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আজহার নীরবে চারিদিক অবলোকন করে। পল্লু মন তার নিঃসাড় হইয়া গিয়াছে। চিত্তার এলোমেলো জটাজাল অন্ধকারে হামাগুড়ি দেওয়া পর্যন্ত বিস্মৃত। কোন কিছু মনে পড়ে না আজহার খাঁর।

নিয়ামতপুরে দু'দিন ছিল সে মাত্র। কাজ জুটিয়াছিল ভাল। কয়েক সপ্তাহ কাজ চলিত স্বচ্ছন্দে। জায়গাটা খুব পছন্দসই নয়। ইতার মাতালদের আড্ডা তার ভালো লাগে নাই। এখানের অন্যান্য রাজমিস্ত্রি বড় বদ-চরিত্রের। সামান্য দু'দিনের রোজগার ট্যাঁকে গুঁজিয়া আজহার পথে পাড়ি দিয়াছিল। কাজ কোথাও-না-কোথাও জুটিবেই, সে ভরসা ছিল তার। সড়কের পথেই নতুন ইমারতের কাঠামো দেখিয়া সে আশান্বিত বুকেই এখানে গৃহস্বামীর উমেদার হইয়াছিল। সঙ্গী মিস্ত্রীরা লোক মন্দ নয়। রোজ কম। তবু আজহার কোন প্রতিবাদ করে নাই, সহজেই সে কাজে লাগিয়াছিল।

গ্রামের নাম শাহানপুর। দু'মাইল দূরে স্টেশন। তারই আবহাওয়ায় গ্রাম ও শহরের যৌথ লীলাভূমিরূপে জায়গা মন্দ নয়। আজহারও আকর্ষিত হইয়াছিল।

রেলস্টেশন মাত্র বহুর দুই আগে খোলা হয়। এখনও বহু ব্যবসার ভবিষ্যৎ এই গ্রামে উঁকি মারিতেছে। কয়েকদিন অবস্থানের পর আজহার তাহা নীরবেই উপলব্ধি করিয়াছিল। যদি কোন পুঁজি জমানো যায়! আজহার তাই কায়ক্লেশে রীতিমত কৃচ্ছসাধন আরম্ভ করিয়াছিল।

সারাদিন খাটুনির পর আজ শরীর ভাল না, তার উপর বাসার ভেতর ভ্যাপসা গরম। সব মিলিয়া বড় অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিল আজহার। তার কোন স্পষ্ট চেতনা কিন্তু দাগ কাটে না কোথাও। নীরবে তাই হুঁকা পানই করিতেছিল। কয়েকবার হাই উঠিল।

আজহার খাঁ নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকে। তামাক প্রায় নিঃশেষ। অন্যদিকে হুঁকার আওয়াজের কামাই নাই।

স্মরণের প্রান্তর নিঃশেষে মুছিয়া দিয়াছে কালো অন্ধকারের প্রলেপ। শিরার দ্রুত কম্পন রাত্রির তরঙ্গশীর্ষে ঈষৎ ঝিলিকের রেখা টানিয়া আবার শান্ত হইয়া আসে।

প্রাগৈতিহাসিক বর্বরের আলস্য-মুখর অদ্ভুত বিরাম আকাঙ্ক্ষা আজহার খাঁর মেরুদণ্ডে ঘা দিয়া গেল।

এইবার জোরে কঙ্কে ফোঁকে আজহার। তামাক-না-দারাৎ। অসন্তুষ্ট চিন্তে সে কঙ্কে চৌকাঠের কোণে রাখিয়া দিল।

আর এক ছিলিম পাইলে মন্দ হইত না। সে হাই তুলিল। হঠাৎ আজহার তার পাশেই আর একজনের উপস্থিতি অনুভব করে। অন্ধকারে অপরিচিত মানুষটি।

আজহার মৃদু কণ্ঠে ডাকে : কে?

আমি, চাচা।

একটি বালকের কণ্ঠস্বর অন্ধকারে ঢেউ তোলে।

খলিল, এত রাতে বাইরে এসেছো?

জিজ্ঞাসা করে আজহার।

ঘুম ধরে না, চাচা।

ফোঁপানির শব্দ আসে আজহার খাঁর কানে।

খোয়ারি ভাঙিয়া যায় তার। কার কণ্ঠনালী-দুমড়ানো এই শব্দ, প্রথমে আজহার স্থির করিতে পারে না।

নিবিড় অন্ধকার। চৌকাঠের অপরদিকে আজহার হাত বাড়াইয়া দিল। খলিলের নাগাল পায় সে। হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজিয়া সে বসিয়া আছে। এতক্ষণ এই অবস্থায় সে ধীরে ধীরে জবাব দিতে ছিল তবে।

আজহারের সঙ্গী মিস্ত্রীর নাম ছিল ওদু। তারই ভাইপো খলিল। বয়স বারো হইবে কিনা সন্দেহ। বালক-বয়সেই চাচার সঙ্গে মিস্ত্রীর কাজ শেখার জন্য এই প্রবাস-জীবনের গ্লানি বহন করিতেছে।

আজহার খলিলের নিকটে সরিয়া আসিল। তার গায়ে ঈষৎ নাড়া দিয়া সরস কণ্ঠে আজহার সম্বোধন করে, কি হয়েছে, চাচা?

খলিল মাথা তুলিতে চায় না। হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজিয়া যেন বিশ্বের সমস্ত কলঙ্কের নিকট হইতে পরিত্রাণ চায় সে।

কিছু হয় নি ত, চাচা?

আবার আজহার নাড়া দিয়া বলিল, মাথা তুলে কথা বলো না, কি হয়েছে?

খুব মৃদুস্বরেই আলাপ বিনিময় চলিতেছে। ঘরের ভেতর সকলে দিনমজুর। কারো ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে।

খলিল নীরব।

আজহারের কৌতূহল মিটিল না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিল।

খলিল এইবার কোন জবাব দিল না। অদ্ভুত গায়েই সে বসিয়াছিল। আজহারের হাত নিজের পিঠের উপর ধীরে রাখিয়া আবার খলিল ফোঁপাইতে লাগিল।

আজহারের আঙুলের ডগায় যেন বিছা দংশন করিয়াছে। সে তড়িৎগতি খলিলের পিঠ হইতে হাত তুলিয়া লইয়া চীৎকার জিজ্ঞাসা করে : তোমার পিঠে এত দাগ?

খলিল আজহারের মুখে হাত চাপিয়া নিদ্রিত ব্যক্তিদের দিকে তাকায়। না, কারো কানে আজহারের চীৎকার পৌছায় নাই।

আজহার খলিলকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

বার বার হাত বুলায় সে খলিলের পিঠে।

কুয়াশানিদ্রিত প্রান্তর আবার জাগিয়া উঠিতেছে। মনে পড়িল বৈকি আজহারের, আমজাদের কথা, নঈমার মুখ, মহেশডাঙার জলাজাঙ্গল। আর দরিয়াবিবি? না, আজহারের মানসপটে পরিশ্রমপটু, সংসার-অভিজ্ঞ, সুঠাম-তনু দরিয়াবিবির কোন ছায়া ভাসিয়া উঠে না। হয়ত ভাসিয়া উঠিয়াছিল ক্ষণিক আলোর মলিন রেখায়। নিবীৰ্য একরকমের অস্থিরতা আজহারকে ব্যথিত করে বলিয়া সে তখন ছায়ার অন্যান্য জনতায় চিন্তার প্রহরীদের অজ্ঞাতবাসে পাঠাইল।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আজহার জিজ্ঞাসা করিল, কেউ মেরেছে বুঝি?

হ্যাঁ চাচা।

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল আজহার।

কচি গায়ে কার এমন ‘আজারে’ হাত উঠল?

খলিল কোন জবাব দিল না। নীরবে বসিয়া রহিল।

কে মেরেছে?

আজহার অস্ত্রিচিহ্নে জিজ্ঞাসা করিল।

খলিল অন্ধকারে চারিদিকে দৃষ্টি মেলে। তারপর আজহারের কানে কানে সে বলিল :

ওদু চাচা চেলাকাঠ দিয়ে—

টোক গিলিয়া খলিল আবার ফোঁপাইতে থাকে।

এঁা, ওদু এমন কড়া-জান?

খলিলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আজহার বলিয়া যায় : কি করেছিলে তুমি যে, এমন করে হাত চালায়?

গহর মিস্ত্রীর সুমী ভেঙে ফেলেছি। ইটের উপর পড়ে গেল কিনা।

গহর রাজমিস্ত্রী। সে-ও বাসার ভেতর নিদ্রিতের দলে। পাছে তার কানে কোন শব্দ যায়, ধরা-গলায় খলিল জবাব দিয়া চুপ করিল।

ছোট একটা সুমী ভেঙেছ, তার জন্য এত মার মারলে?

ফোঁপাইয়া কান্না আরম্ভ করিল খলিল।

আড়ষ্ট উচ্চারণের মধ্যদিয়া বোঝা যায় তার আবেদন : আমি চাচার সঙ্গে বাড়ি যেতে চেয়েছিলাম কিনা।

ওদু আজ বাড়ি গেছে?

হ্যাঁ, চাচা!

আজহার সান্ত্বনা দিতে চায় ওই অবোধ ব্রীলককে।

ওদু যাক না বাড়ি। আমরা রয়েছে, তোমার কোন ভয় নেই।

টোকাঠের একপাশে কখন সরিয়া গিয়াছে খলিল। আবার হাঁটুর মধ্যে তার মাথা গোঁজা। বিভীষিকাময়ী পৃথিবীর অর্ধলোকনের সাহস তার নাই।

একটু পরে ঘাড় গুঁজিয়াই খলিল জবাব দিল : আমার মন টেকে না চাচা।

ব্যাটাছেলে, কাজ-কাম না শিখলে চলবে কেন? বিদেশ ত ব্যাটাছেলেদের জন্যই।

তা মন অমন এক-আধটু খারাপ করে।

নিঃসাড় হইয়া গেল খলিল। কোন জবাব আসে না তার নিকট হইতে।

তোমার বাপ বেঁচে আছে, চাচা?

জিজ্ঞাসা করিল আজহার।

খলিল অন্ধকারে মাথা তোলে না। ক্লান্ত স্বর তার বাইরে আত্ননাদের মত শোনায় : না!

আবার মাথা গুঁজে বসে আছো? ভাবনা কিসের? আমরা ত রয়েছে। ওদু কাল-পরশ ফিরে আসবে।

আজহার খলিলের দিকে হাত প্রসারিত করে। খলিল ধীরে ধীরে খাঁর পাশে সরিয়া আসিল। ক্লান্ত দুইচোখ তার সড়কের দিকে।

পরে আজহারের মুখোমুখি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল : আজ দু'মাস এসেছি, চাচা। মা'র জন্যে মন কেমন করে-যে। ওদু-চাচা এইবার নিয়ে চারবার ঘরে গেল।

বিদেশে থাকতে শেখো। কাজ শিখলে তবে ত বড় মিস্ত্রী হবে। দুঃখ ঘুচবে। এই

দ্যাখ না, আমরা দেশে চাম্বাস করতাম, শহরে আসিনি। কুকুরের হাল।

কোন আশ্বাস পায় না খলিল।

পেট-ভাতায় ছ'মাস কাজ শিখলে তবে নাস্তার পয়সা বেরোবে। মাকে এক পয়সাও দিতে পারিনি। নাস্তার পয়সা বেরোলে তা বাঁচিয়েও কিছু পাঠাতে পারতাম।

আজহার খাঁ বিগলিত হৃদয়ে ওই দুধ-পোষ্য বালকের দিকে চাহিয়া থাকে। এত অল্প বয়সে পৃথিবীর রং চিনিতে শিখিয়াছে সে। এমন ছেলের উন্নতি আল্লা নিশ্চয় দেবেন। নসীব খুলবে বৈকি।

পুনরায় সরব হয় আজহার : আর ক'টা মাস, চাচা। তারপর নাস্তার পয়সা বেরোলে তোমার মাকে টাকা পাঠিয়ে। কেন, তোমার মা কিছু করেন না?

ধান কুটে ভাত জোটাতে হয়।

কথা সমাপ্ত করিয়া বড় লজ্জিত হয় খলিল। কুটুনীর ছেলে সে, এমন পরিচয় দিতে মাথা কাটা যায়। আবেগের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল খলিল।

আজহার আর কোন জিজ্ঞাসাবাদে মত্ত হয় না। নিঝুম সেও বসিয়া থাকে। এতটুকু ছেলে মা'র দুঃখের সঙ্গী। তিন-চার বছর পরে আমজাদ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে কে জানে?

মাত্র এক পলকের জন্য আমজাদের মুখ মনে পড়িল আজহারের। চন্দ্র কোটাল তাকে স্বপ্ন দেখিতে শিখাইয়াছে। তার কুয়াশা-আবর্তিত ফেনিল পটে কারো মুখ আর স্থিতি পায় না। স্টেশনের নিকট বর্ধিষ্ণু এই গ্রামে বেসা-পত্তনের অশেষ সুযোগ রহিয়াছে। খোদা কি মুখ তুলিয়া চাইবেন না একটিবার?

অজানিত ভীতির ফুৎকার আজহারের চিৎ আরো অস্থির-উন্মত্ত করিয়া তোলে। তিনবার বুকে 'কুলছ আন্না' পড়িয়া ফুঁক দিল সে।

খলিলের ঘন ঘন হাই উঠিতেছিল, আজহারের খেয়াল হয়। তার দিকে ফিরিয়া সে বলে, চাচা, আবার সকালে কাজে বেরোতে হবে। ঘুমিয়ে পড়ো।

তুমি ঘুমোবে না, চাচা?

অবোধ কণ্ঠের নিনাদ বড় লাগিল আজহারের কানে।

না, চাচা। আর এক ছিলিম খেয়ে শোব।

খলিল বাসার ভেতর প্রবেশ করিল। আজহার নূতন ছিলিম সাজে।

ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকে শেষরাত্রে। খণ্ড মেঘ ছড়াইয়া পড়ে গ্রাম-বনানীর উপর।

আকাশের মুখ কালো হইয়া গেল এক নিমিষে।

আজহার খাঁর সিদ্ধান্ত স্থির ছিল।

সপ্তা দুই পরে এই বাসার নিকটে বাসস্ট্যান্ডের নিকট সে তিন টাকা দিয়া একটি ছোট চালাঘর ভাড়া লইল। ঘরের বারান্দা দুইহাত মাত্র প্রস্থে। তারই একপাশে সঙ্গী ছুতারের সাহায্যে সে একটি শেল্ফ তৈয়ারি করিল। দোকানের ঘটা ছিল বেশি। অবশ্য মাল খুব পর্যাপ্ত নয়। আজহার কোনরকমে গোটা পঁচিশেক টাকা জমাইয়াছিল। তিন টাকা লইল মিস্ত্রী। বাকী বাইশ টাকায় সুঁচ-সুতো, মেয়েদের টিপ, স্কুলের

ছেলেদের পেনসিল, লজ্জা— এই জাতীয় ছোটখাট মনিহারী পণ্য-সম্ভারে সে দোকান সাজাইল।

পানের দোকান সঙ্গে রাখিবারও ইচ্ছা ছিল আজহার খাঁর। আরো কয়েকটি পানওয়ালা পূর্বেই আসর জমাইয়া রাখিয়াছে। তবু লোভ আছে খাঁর। ভবিষ্যতে যদি নসীবে জৌলুস লাগে, আর নতুন পণ্যে দোকানঘর চম্কাইয়া দিবে সে।

কয়েকদিন ভয়ানক মেহ্নতে কাটিয়া গেল। স্টেশন হইতে চার মাইল দূরে গঞ্জের উপর গোলদারী দোকান। একজন মাড়োয়ারী খুব বড় ব্যবসা ফাঁদিয়াছে। তার নিকটে এইসব জিনিস পাওয়া যায়। চার-পাঁচ মাইল হাঁটার কসরৎ বাড়ে। সঙ্গী মিস্ত্রীর ধর্ণা দিতে হয়। শত অনুরোধে সে রাত্রি-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া শেলফ তৈয়ারি করিয়া দিয়াছে।

গহর মিস্ত্রী ব্যাপারটা সোজাভাবে গ্রহণ করিল না। আজহার চলিয়া যাইতেছে, বাসা ভাড়া বেশি লাগে। সে নিরুৎসাহ করিবার বাগঅন্ত্র নিক্ষেপ করিল শত শত। একটু হিংসাও হইতেছিল বৈকি তার। গহর জানে না, পঁচিশটি টাকা জমাইতে আজহার কত নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে। বাউণ্ডেলের মত সংসারের কোন খোজ নাই। তার উপর কায়িক জুলুম। এত সহ্যের ক্ষমতা কয়জনারই বা আছে?

গহর বলিল, মিস্ত্রী তাহলে শেষে এইখানে দোকান ফাঁদলে। দেখো, যদি পাকা বাড়ি ওঠে।

আজহার নিরীহ বেচার। কোন জবাব দিল না। কিন্তু কথাটা সোজাসুজি তার মর্মে বিধিত থাকে।

কিছু করে-কন্মে খেতে হবে ত ভাই, তাই মন গেল, একটা দোকান করলাম।

গহরের রং ফর্সা, দীর্ঘতায় তুলিগাছ। কিন্তু ভয়ানক পাংলা শরীর। অবশ্য বাঁধন মজবুত। দাঁতগুলি খুব পরিষ্কার। সে পান খায় না।

না, তাতে আর কী। আচ্ছা, একটা বিড়ি দাও।

আজহার সহজে রাগে না। কিন্তু গহরের কথার ঝাল সে-ও আজ অনুভব করিল।

বিড়ি নেই, ফুরিয়ে গেছে।

মিথ্যা কথা বলিতে বাধে না আজহারের।

উঠিয়া পড়িল গহর।

চালাও দোকান, যদি পাকা বাড়ি ওঠে। একসঙ্গে কাজ করেছি বলে একদিন এসে থাকা যাবে।

গহরের পদক্ষেপের দিকে চোখ ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া যায় আজহার। মনে মনে বলিল, আমার মত হাভাতে গরীবকেও হিংসা করার লোক আছে পৃথিবীতে।

লজ্জাশূন্যের বোতলের পাশে পিপড়া উঠিতেছিল, আজহার সেদিকে মনোনিবেশ করিল।

একটু পরে আসিল খলিল। ভারী উৎফুল্ল সে।

চাচা, আপনার দোকানটা বেশ সুন্দর হয়েছে। যখন লোক রাখবে, আমাকে মনে করো।

আজহার স্তিমিত হাসি হাসে।

দোয়া করো, বাবা। আল্লার দোয়া লাগতে কতক্ষণ।

অনেক সামগ্রী খলিল কোনদিন গাঁয়ে দেখে নাই। সে বিস্মিত-চোখে চারদিকে তাকায়।

চাচা, একা লোক আমি। গোসল করতে গেলে দোকান বন্ধ করতে হয়। তুমি মাঝে মাঝে এসে বসো।

হ্যাঁ, বসব চাচা। বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। ওদু চাচা এবার নিয়ে যাবে বলেছে।

বেশ, বেশ।

দাওয়ার একপাশে খলিল উপবেশন করিল।

পাশাপাশি সাজানো শিশি-বোতলের দিকে সে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে।

আনমনা লজ্জেক্ষুসের বোতল হাতে তুলিয়া খলিল নাড়াচাড়া করে।

এতে কি আছে, চাচা?

লজ্জেক্ষুস।

খেতে কেমন লাগে?

খুব মিষ্টি। একটার দাম দু'পয়সা।

আজহারের কথা শেষ হওয়া মাত্র খলিল বোতল শেল্ফের কোণে রাখিয়া দিল। তার হাতে শত রাজ্যের আড়ষ্টতা।

আজহার তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বসিল। দোকানদার সে। দোকান খুলিয়াছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলে, একটা খাও না, চাচা।

লজ্জিত খলিল জবাব দিল, না।

আজহার আর বিলম্ব করে না। নিজের দু'টি মিষ্টান্ন বাহির করিয়া খলিলের হাতে দিল। আড়ষ্টতা কাটে না খলিলের। চাচা, আমি মিষ্টি খাই না। আমার কাছে পয়সা নেই।

খাও। খেয়ে ফেলো ব্যাটা।

তোমার দোকান চলবে কি করে?

এতটুকু ছেলে, সংসারের মার-প্যাচ এত বোঝে। অবাক হইয়া যায় আজহার খাঁ।

হাসিমুখে মিষ্টি খায় খলিল।

তুমি একটু বসো, আমি মাগরেবের নামাজ পড়ে আসি।

খলিল হঠাৎ কর্তা বনিয়া যায়। গম্ভীর মুখে সে বসিয়া থাকে। খরিদারের সঙ্গে আলাপ করে। খুব হাসি পায় তার। এমন একটা দোকান যদি দিতে পারত সে।

আজহার ফিরিয়া আসিলে সে সড়কের পথ ধরিল।

ছোট ডিপি জুলে দোকানের এক কোণে। দেখা যায় খলিল পথ হাঁটিতেছে। পার্শ্ববর্তী গাছপালার ছায়ায় ঢাকা সড়ক।

এতটুকু ছেলে।

আমজাদ কি অভিমান করিয়া মহেশভাণ্ডায় ফিরিয়া যাইতেছে?

শৈরমী পাড়ায় কলমী শাক বিক্রয় করিয়া দরিয়াবৌর সঙ্গে গল্প জুড়িয়াছিল। গণেশের শরীর ভাল নয়। কয়েকদিন পূর্বে দাওয়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। পঙ্গু বাম হাত একদম অচল হইয়া গিয়াছে। শৈরমীর সামান্য অবসর পর্যন্ত নাই।

দরিয়াবিবি দরদের সঙ্গেই এই বিধবার করুণ প্রাত্যহিকতার কাহিনী শুনিতেছিল। আজকাল বারবার তারও মনে দোলা লাগে, এই জীবনের পরিণতি কোথায় পৌঁছিব, কে জানে। আমজাদ ও নঈমার মুখের দিকে চাহিয়া দরিয়াবৌর মুখ শুকাইয়া যায়। আজহার খাঁ কোন খবর দেয় না, কয়েক মাস হইয়া গেল।

সাকেরের মা আসিয়া জুটিল এই সময়। দরিয়াবৌ একটি পিঁড়া আগাইয়া দিল।

বৌ যে আমাদের দিকে পা বাড়ানো না, মা।

দরিয়াবিবি এক সপ্তাহ সাকেরের বাড়ি যায় নাই। লজ্জিত হয় সে।

কত কাজ, দেখছেন না, মা। ফুরসৎ নেই, মা।

বৌ নিয়ে হাড়-মাংস পুড়ে ছাই হতে বসেছে।

শৈরমী এই প্রসঙ্গে যোগদান করিল : কি হয়েছে?

দিন মাস পার হয়ে গেল এখনও খালাস হওয়ার নাম নাই। কবরেজ ডাকব, বৌর তাতেও দশ অছিলা।

দরিয়াবৌ সন্দেহ প্রকাশ করে : দশ মাস হয়ে গেছে! না মা, তোমাদের হিসেবে ভুল আছে।

সাকেরের মা জোর দিয়া বলিল, না, দশ মাসের বেশি হবে ত কম নয়।

শৈরমী জবাব দিল : ভাবী, আসকের এগার মাস লেগে যায়।

দরিয়াবিবি মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল।

এগার মাস কেন, আঠার মাস লাগে।

সাকেরের মার মুখ কালো হইয়া যায়।— কি হাসছো বৌ, আমার পেটে ভাত সঁধেয় না। ছেলেটা দিনদিন বিগড়ে যাচ্ছে। দাস্তা করতে কোথায় চলে যায়। ছেলের মুখ দেখলে হয়ত ঠাণ্ডা হোত।

ও ব্যাটা ছেলেদের দস্তুর। তোমার ভাসুরপোর কোন খোঁজ নেই। একদিন খুপ করে এসে পড়বে। কি আর উপায় আছে, বলো।

শৈরমী ভরসা দিল : ঘাবড়ে যেও না, সাকেরের মা। ভগবান সফল দিয়েছে নিশ্চয়।

তোমার মুখে সুবন (সুবর্ণ) বর্ষুক, শৈরমী। আমার ঘুম হয় না চিন্তায়।

দরিয়াবিবি শৈরমীর দেওয়া কলমী শাক বাছিতে বাছিতে কথা বলিয়া যায়।

হাসুবৌকে বিকেলে দেখে আসব।

এসো একবার!

আবার সাকেরের মা বলিল : বৌটার মনের হৃদিস পাওয়া মুশকিল। ছেলে-ছেলে

করে গেল। আজকাল আর আমাকে ছাড়া কোথাও শোয় না। ছেলেটা এইজন্যই বুঝি আরো বিগড়েছে। আমিও ভাবি অয়লা-পয়লা বার এবার। পাছে কোন কষ্ট না হয়। বৌটা গোসল পর্যন্ত করে না, পাছে জ্বর হয়।

হাসুবৌর উদরক্ষীতির আয়তন সম্পর্কে দরিয়াবিবি প্রশ্ন উত্থাপন করিল।

দশ-মেসে পোয়াতির মত, বৌমা। সদাই হাঁই-ফাঁই করছে। হাসুবৌ বলে, তার পেটে খুব ব্যথা। তাই হাত পর্যন্ত দিতে দেয় না। একবার দাইকে ডেকে পাঠালাম। পেটে আঙুল পর্যন্ত ছোঁয়াতে দিলে না।

সুফল দিয়েছে, চাচি। তুমি দেখো। হয়-নয় শৈরমী বাগ্‌দিনী বলেছিল। গণেশের মা মন্তব্য করে। বৃদ্ধা বিশেষ আশ্বস্ত হয় না। বরং দরিয়াবিবি যেন একবার পাড়া-ভ্রমণে বাহির হয়, তার অনুরোধ জানাইল সে।

আজ হাতে অনেক কাজ আছে, মা। কাল বিকেলে ঠিক গিয়ে তোমার বৌর রোগ ধরে আসব।

শৈরমী আফশোস করিতে লাগিল : কলিকাল, দরিয়াভাবী মানুষের খারাবীর শেষ নেই।

দরিয়াবিবি মুখ নীচু করিয়া শাক বাছিতে লাগিল। সে নিজের চিন্তায় মশগুল ছিল।

সাকের ভাই এলে একবার পাঠিয়ে দियो। তার ভাইয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুক।

মনে করি চুপচাপ বসে থাকব। আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাব না।

এমনও লোক হয় সংসারে! ছেলেপুলের মায়া পর্ত্ত নেই।

শৈরমী তোপড়া গালে হাত রাখিয়া দরিয়াবিবির দিকে চাহিয়া রহিল। এই সহানুভূতি ভাল লাগে না দরিয়াবিবির। মেজাজ তার বৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে হঠাৎ।

একবার এসো, বৌমা।

সাকেরের মা চলিয়া গেল। শৈরমী এইবার ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠে বলে, ভাবী, আধখান পচা সুপুরী দেবে, আজকাল গা মাটি-মাটি লাগে, ভাত খেয়ে কিছু মুখে দিতে পাই নে।

দরিয়াবিবি ঘরের ভিতর হইতে শুধু সুপুরী নয়, তেলের বোতলও বাহির করিয়া আনিল।

শৈরমী দিদি, মাথায় একটু তেল দিয়ে যাও।

শৈরমী তার রেখাঙ্কিত করতালু প্রসারিত করিল।

মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে সে বলিয়া যায় : ভাবী, এই পাড়ায় এলে একটু মন ঠাণ্ডা হয়। কোঠা-বাড়িওয়ালা বামুনদের ওখানে গিয়ে দূর ছিঃ ছাড়া অন্য কথা শুনি নে। কপাল ধরিয়ে এসেছিলাম ভগবানের কাছে। ছেলেটার শুদ্ধ ভগবান হাত-পা ভেঙে ফেলে রাখলে।

দরিয়াবিবি জবাব দিল : সব জেঁতে (জাতিতে) ঐ এক ব্যাপার। রহিম বখ্‌শ জমিদার বলে সেবার তোমার দাদাকে কত অপমান করে গেল শুনেছিলে ত? গরীব হিন্দু আর মুসলমান নিজের জেঁতের কাছেই হোক আর অপরের জেঁতের কাছেই হোক, একই রকম মান-মজ্জিদে পায়।

আচ্ছা ভাবী, আমার মাথার কিরে— দাদার কোন খবর পাওনি? তবে চুপচাপ বসে আছো?

আর খবরের কোন দরকার নেই।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে দরিয়াবিবি জবাব দিতেছিল।

শৈরমী চুপ করিয়া গেল। আঁচলে আধখানা সুপুরী বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িল।

জাওলা পাঁকাল মাছ পেলে নিয়ে এসো, শৈরমী দিদি, ছেলেটার পেট গরম রেখেছে।

শৈরমী এইবার হাসিয়া উঠিল।

আমাকে পাগলী ঠাওরালে, ভাবী!

দরিয়াবিবি লজ্জায় মুখ নীচু করে। ঘড়া প্রসঙ্গে তার মর্যাদা কোথায় যেন আহত হইয়াছে।

না। তবে এমনি বলে রাখা ভালো।

শৈরমী আড়াল হইলে দরিয়াবিবি ঝরঝর কাঁদিয়া ফেলিল। চোখের পানি স্বতই রোধ মানে না। প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল দরিয়াবিবি। আসেক্‌জান পাড়ায় বাহির হইয়া গিয়াছে। কথা বলার কোন লোক আর নাই। দরিয়াবিবি শাক বাছিতে লাগিল।

আমজাদের ডাক কানে না গেলে হয়ত দরিয়াবিবি সারাদিন শাক লইয়া বসিয়া থাকিত। আনমনা ঘোর তার কাটিয়া যায়।

মা, এই দ্যাখো, আক্কা চিঠি আর কুড়ি টাকা পাঠিয়েছে।

আনন্দে যেন নৃত্য করিতে পাইলে আমজাদ সম্ভ্রষ্ট হইত। বগলে মখতবের দণ্ডর, একহাতে টাকা আর মনিঅর্ডারের কুপনের অংশ। দশদিন মাত্র আমজাদ চন্দ্র কোটালের সহযোগীরূপে কাজ করিয়াছিল। দরিয়াবিবির আদেশেই আমজাদ এখন মখতবের পড়ুয়া।

দরিয়াবিবির দুই চোখ বিস্ময়ে ভরিয়া যায়।

সত্যি টাকা পাঠিয়েছে, কে দিল তোকে টাকা?

পিয়ন এসেছিল। আমার নামে আক্কা টাকা পাঠিয়েছে। আমার টিপ-সই নিল পিয়ন।

দরিয়াবিবি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নোট দু'টি পুত্রের হাত হইতে লইয়া সে নাড়াচাড়া করে।

ঠিকানা দিয়েছে?

হ্যাঁ গো মা, এই ত লেখা রয়েছে।

আমজাদ জননীকে কুপনের অংশ দেখাইল, যেন মা'র অক্ষরজ্ঞান কত গভীর। দরিয়াবিবি কুপন হাতে লইয়া চক্ষুর দৃষ্টি সহজ করিল। অক্ষর-পরিচয়ের মূল্য তার নিকট এই প্রথম কঠিন সত্যরূপে ধরা দিল।

নঈমা কখন চুপিসারে দুইজনের কথাবার্তা শুনিতেছিল, সে ফুট কাটিল, “মা, টাকা দিয়েছে, চিঠি দিয়েছে।”

দরিয়াবিবি নঈমাকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিতে লাগিল।

হ্যাঁ। তোমাকে ময়রার দোকান থেকে মিঠাই কিনে দেব।

আমজাদ মুরুব্বীর মত মন্তব্য করিল : এই ত ক'মাস পরে মোটে কুড়িটা টাকা। তার চেয়ে গাঁয়ে থেকে জন খাটলে লাভ। জানো মা, আমাদের জমি ছাড়িয়ে নিতে পারে। আক্কা এসে চাষ না দিলে লোকে জমি রাখে?

পুত্রের সংসার-অভিজ্ঞ সিদ্ধান্ত দরিয়াবিবির কাছে ভাল লাগে না, যদিও সে মায়ের

কথার প্রতিধ্বনি করিতেছিল।

তুমি আর অত ফফর-দালালি করো না। যা করার আমি দেখে নেব।

আমার মাইনে দু'মাসের বাকী আছে। গভীর হইয়া আমজাদ জবাব দিল।

নূতন নোটের গন্ধ গুঁকিতে লাগিল দরিয়াবিবি। বাইরে দুপুরের সূর্য টলমল করিতেছিল।
বাস্তুর নিচে তেঁতুলের বন অলস সমীরে উল্লসিত।

নোট আঁচলে বাঁধিয়া দুটি খুচরা পয়সা দরিয়াবিবি আমজাদের হাতে দিয়া বলিল,
দোকান থেকে দু'জনে বিস্কুট কিনে খা।

নঈমা মা'র কোল হইতে নামিয়া পড়িল।

আসেক্জান পাড়া হইতে ফিরিয়া আসিল। চৌধুরী পাড়ার কার যেন ফাতেহা ছিল
আজ। আসেক্জান খালিহাতে ফিরিয়া আসে নাই, তার আঁচলের নিচে অবস্থিত পুঁটলি
দেখিয়া তা বোঝা যায়।

বৌমা, তোমাদের রান্নার আগেই এসেছি। ছেলেরা আমার সঙ্গে খাবে। অনেক গোস্তু
আর ভাত আছে।

না, আমাদের রান্না হবে এখনি।

খামাখা চাল নষ্ট করবে, মা।

নঈমা তখন চীৎকার করে বুড়ির আঁচল ধরিয়া।

ও দাদি, বাবাজী টাকা পাঠিয়েছে।

বৃদ্ধার চোখ আনন্দে সজল হইয়া ওঠে।

সত্যি বৌমা, খবর পাওয়া গেছে ছেলের।

হ্যাঁ, খালা। টাকাও দিয়েছে।

আমজাদ বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, ঠিকানা পাওয়া গেছে। আমি একদিন যাব
বাপজীর কাছে।

দরিয়াবিবি কথা-কাটাকাটি পছন্দ করে না, আসেক্জান আনন্দবিহবলতায় বিস্মৃত
হইয়াছিল।

বৌমা, ছেলেরা আমার সঙ্গে খাবে দুপুরে।

না। দোকানে যা আমজাদ। নঈমা, তুইও সঙ্গে যা।

বৃদ্ধা ক্ষুণ্ণ মনে নিজের ঝুপড়ির দিকে অগ্রসর হইল। মনে মনে রাগিয়াছিল। আজ
টাকার লোক, 'সাদ্কার', খাবারে এত ঘৃণা, ইস। বৌমার রোখ সে জানে। সহজেই নীরব
হইয়া গেল বৃদ্ধা।

দরিয়াবিবি আসেক্জানের গমন-পথের দিকে চাহিয়া বার বার জ্রুকুটি নিক্ষেপ করিল।

কয়েক মাস পূর্বে নঈমার একটি ফালি কাপড় হারাইয়া গিয়াছিল। দরিয়াবিবি বেদম প্রহার
করিয়াছিল সেদিন নঈমাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার সে একটি কাপড় হারাইয়া বাড়ি ফিরিল। দরিয়াবিবি আজ
কিছুই উচ্চবাচ্য করিল না। একে সংসারে হাজার রকমের টানাটানি, তার উপর এইসব
ঝামেলা পোহাইতে দরিয়াবিবি হিমসিম খাইয়া যায়। মাঝে মাঝে অগত্যা ললাটলিপির

উপর সমস্ত ক্রোধ খারিজ করিতে হয় ।

সাকেরের মার অনুরোধে পরদিন বিকালবেলা দরিয়াবিবি অবসরের ফাঁকে পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিল । সাকের কয়েকদিন হইতে বাড়িতেই আছে । রোহিনী চৌধুরী বোধহয় প্রজা টিট করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন ।

পাড়ার প্রবেশ-পথেই তার সঙ্গে দরিয়াবিবির সাক্ষাৎ হইল ।

এই যে ভাবী সাহেব, হঠাৎ ।

সাকের গোঁয়ার ও চোয়াড় বলিয়া খ্যাত । দরিয়াবিবির সঙ্গে তার ব্যবহার ভারী মধুর । চোখাচোখি দরিয়াবিবির দিকে চাহিয়া সে কথা বলে না পর্যন্ত । কণ্ঠস্বর তার সম্মুখে নরম হইয়া আসে । অথচ বিনয় সাকেরের স্বভাব-বিরুদ্ধ বিশ্লেষণ ।

দরিয়াবিবি মাথার শ্রুত ঘোমটা টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি সাকের ভাই । মাথাভাঙা কাজ নেই বুঝি এখন, তাই দেখা হয়ে গেল ।

আপনিও লজ্জা দেন ভাবী! লাঠি যখন চালাই, মাথা ভাঙে বৈকি । কিছু করে খেতে হবে ত । চুপচাপ বসে থাকলে কেউ চালডাল যোগাবে?

তোমার বড় ভাই চুপচাপ বসে নেই । সফরে বেরিয়েছে, দেখি কত মাল-মাস্তা নিয়ে ফেরে ।

সাকের বিস্মিত-উল্লাসে জিজ্ঞাসা করে, বড় ভাইয়ের খবর পাওয়া গেছে?

হ্যাঁ । কোথা জাহানপুর, সেখানে আছে ।

মাশায়াল্লাহ । এমন লোক, ডুব দিয়ে এতদিন কাটিয়ে দিলে ।

তার ঘরে চাল-ডাল যোগানো আছে, তাই সে প্যাকল মাছ সেজে বসে না থাকলে আর কে থাকবে ।

সাকের হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল ।

গুণধর ভাইয়ের কাণ্ড দেখে হাসি পায় সকলের ।

দরিয়াবিবি ঠোট দাঁতে চাপিয়া জবাব দিল ।

ভাবী সাহেব, চটে গেলেন । মরদ মানুষদের আপনারা ঐ রকম ভাবেন । চাল-ডাল জোটাতে তারা কম চেষ্টা করে না । চাল-ডাল না থাকলে ত মুখ বেঁকে নদীর চড়া হয়ে যায় । তাই মাথা ভাঙি, না মাথা পেতে দিই— এসব দেখবার কি সময় আছে । বড়ভাইকে খামাখা দোষেন ।

দরিয়াবিবি হাসি মুখে বলিয়া যায় : তুমি ভাই বেড়াতে বেড়িয়েছো । যাও । আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি । বড় ভাইয়ের হয়ে আর ওকালতির দরকার নেই ।

জো হুকুম ভাবী সাহেব । কুর্নিশের ভঙ্গীতে সাকের কিছুক্ষণ পিছু হটিয়া অন্যপথে আড়াল হইয়া গেল ।

দরিয়াবিবির হাস্যধ্বনি পাড়ার ঘুলি-পথে গুঞ্জরিত হয় । একটু দূরেই সাকেরের উঠান আর লাউ মাচাঙের প্রাঙ্গণ ।

সাকেরের মা হাসির শব্দ শুনিয়া কৌতূহলবশতঃ এই দিকে অগ্রসর হইয়াছিল ।

দরিয়াবিবিকে দেখিয়া সে আনন্দিত হয় । তুমি, বৌমা! হঠাৎ রাস্তায় এমন হাসছ?

সাকের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো । সে কোন দোষ গায়ে মাখে না । বড় ভাইয়ের

মতই। আমাকে জবাব দিল, ঘাড় না ভাঙলে কেউ খেতে দেবে? সাধে কী আর লাঠি ধরি।
ওর কথা ছাড়ো, মা। কান ঝালাপালা হয়ে গেল ওই এক কথা শুনে-শুনে। এসো, মা।
হাসুবৌ শান্তডীর গলা শুনিয়া মাচাঙের নিচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বড় শীর্ণ হইয়া
গিয়াছে তাহার শরীর। মুখ পাংশু। চোখের কোণে রক্তিমতা আছে কিনা সন্দেহ। চোখ
দু'টি সদ্য আরোগ্য রোগীর মত ভাসা ও বিষণ্ণতা-ক্লিষ্ট।

শান্তডী হাসুবৌকে দেখিয়া জুলিয়া উঠিল।

ওই যে অভাগীর বেটি, দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে কী আর আশ্বাস দেবে। সাকের না হলে
আমাদের এত জ্বালাবে কেন?

হাসুবৌ কোন জবাব দিল না। ক্লান্ত দুই চোখ মাটির সমতলে কি যেন খুঁজিতে
লাগিল।

খামাখা রাগ করো কেন, চাচি। এমন কচি বয়স, ছেলেমানুষ। পোয়াতিকে এমন
ফজিয়ৎ করলে রোগে পড়বে যে।

রোগটা নেই কোন্‌খানে?

দরিয়াবিবি হাসুবৌর নিকট অগ্রসর হইবামাত্র আতঙ্কিত চোখে সে একটু সরিয়া
দাঁড়াইল।

হাসু। দরিয়াবিবির ডাক।

জী, বড় বুঝ।

তোমার শরীর ভাল ত আজকাল?

না। সংক্ষিপ্ত নম্র উত্তর।

ক'দিনে এমন হয়ে গেছ।

দরিয়াবিবি পুনরায় প্রশ্ন করিল, তুমি দিনের হিসেব রেখেছিলে?

লজ্জায় হাসুবৌ চোখ নামাইল।

এগার মাস হয়েছে গেল। পেটে ব্যথা করে খুব নাকি?

জী।

দেখি একবার।

জী না, থাক্।

দরিয়াবিবি সাকেরের মা'র দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, চাচি, তুমি পেটে হাত দিয়ে
দেখোনি ছেলে নড়ে কিনা? মরা ছেলে পেটে থাকলে, শেষে পোয়াতি নিয়ে ভারী
টানাটানি হবে।

আমাকে ছুঁতে দেয় না, মা।

হাসুবৌ ঘরের দিকে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করিল, কোথা
যাস্ হাসু?

পিয়াস লেগেছে, বড় বুঝ।

পানি খেয়ে শিগ্গিরি আয়। শান্তডী আদেশ দিল। দরিয়াবৌ বিজ্ঞের মত সায় দিতে
লাগিল সাকেরের মা'র মন্তব্যের উপর।

বুড়ো বয়সে সংসারের খুনঝাট ভাল লাগে না, মা। কোথা নামাজের পাটিতে বসে

আল্লা-আল্লা করব, ওদের জন্য দোওয়া মাঙব; না, তা আর হবে না। এইসব ঝামেলা এই বয়সে পোষায়?

দরিয়াবির সহানুভূতি প্রকাশ পায় অন্যরূপে।

তা কী করবে চাচি। এইটুকু হাবাগোবা মেয়ে, তুমি না দেখলে সংসার চলে?

হাসুবৌ ঘর হইতে আর বাহির হয় না। বাহিরে দুইজন অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অবশ্য তাহাদের সময় অন্য কথাবার্তায় কাটিতে থাকে।

তুমি একটু দেখে যাও, মা। সত্যি পেটে যদি মরা ছেলে থাকে, মুশকিল।

তোমার বৌকে ডাকো, চাচি।

শাশুড়ীর ডাকে হাসুবৌ আবার মাচাঙের নিচে দাঁড়াইল।

অবেলার অন্ধকার আসন পাতিয়াছে লাউ-মাচার সরস মাটির উপর। কয়েকটি চড়ুই নীল পাতার বনে কিচিরমিচির করিতেছিল।

হাসুবৌ অবনত মুখে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল।

দরিয়াবির তার শীর্ণ হাত নিজের করতালুর উপর রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিতে লাগিল, হাসু, কান্না কিসের! আমিও মেয়েমানুষ, তোর দুঃখ বুঝি। স্বামী বাউগেলে হলে কোন মেয়েই সুখী হয় না।

সাকেরের মা দরিয়াবির সাভুনা গ্রহণ করিল না।

মা, বাঁজা মেয়ে, ক'বছর বিয়ে হলো, একটা ছেলে হলে সাকেরের চালচলন বদলে যেত।

দরিয়াবির হাসুবৌর রক্তশূন্য আঙুলের দিকে চাহিয়া কহিল, আমারও দুটো ছেলে, চাচি। কৈ, তোমার ভাসুরপো'র বাউগেলারি গেল? আর জোয়ান ছেলের এমন কচি বৌ করেছিলে কেন?

শাশুড়ী কোন জবাব দিল না।

হাসু, তোমার পেটটা একটু দেখি। যদি কপাল তোর ভাঙে, ছেলেটা পেটেই মরে থাকে, তাকে বাঁচাতে হবে ত।

আরো জোর কান্নার সঙ্গেই জবাব দিল হাসুবৌ। “আমাকে মরতে দাও বুবু। আমি সকলের গলার কাঁটা। আমি গোরস্থানে গেলেই ভাল।”

দরিয়াবির তার চিবুকে হাত দিয়া বলিল, মুখে যা-তা কথা আনিস্নে। দু'সাঁঝ এক। দেখি তোর পেট।

তোমার পায়ে পড়ি, দরিয়া বুবু, তোমার পায়ে পড়ি।

তীব্র ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে হাসুবৌর গলা বুজিয়া আসিতেছিল। দুই হাত প্রসারিত করিয়া সে নিজের কক্ষপট আবৃত করিল, চিলের নখর হইতে যেন বিহঙ্গিনী শাবক রক্ষা করিতেছে।

একটুও লাগবে না। একবার দেখব।

হাসুবৌ আরো পিছাইয়া যাইতেছিল।

দরিয়াবৌ ক্ষিপ্ৰগতিতে তার জঠরের কাপড় তুলিয়া একটান দিল।

এ কি! একরাশ বস্ত্রখণ্ডের টিবি যেন ধসিয়া পড়িতেছে। একটু জোর টানের সঙ্গেই একগাদা ফালি ছেঁড়া টুকরো কাপড় হাসুবৌর স্ফীত জঠরদেশ হইতে নামিয়া আসিল।

নঈমার ফালি লাল গামছা, আরো পাড়ার অপহৃত অনেক শিশুর কাপড় তার ভেতর।

এক নিমিষে মাচাঙের নিচে মূর্ছিত হইয়া হাসুবৌ পড়িয়া গেল। স্বাভাবিক তার জঠরদেশ—স্কীতির কোন চিহ্ন নাই সেখানে।

কাপড়ের স্তূপের সম্মুখে ফ্যাল ফ্যাল নেদ্রে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল সাকেরের মা ও দরিয়াবিবি।

১১

আজহার হিসেবী বটে, কিন্তু পরিবেশের কোন উপাদান সে তলাইয়া দেখিতে শেখে নাই কোনদিন। কপাল-ঠোকা গাণিতিক বিদ্যা দোকান করার পূর্বে তার একমাত্র ভরসা ছিল। পদে পদে নিজেই ভুল দেখিতে পাইয়াছিল আজহার। সংসার-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির এইসব ব্যাপারে তবু চোখ বুজিয়া বিধাতার দিকেই বার বার চাহিয়া থাকে।

স্টেশন হইতে সড়ক ধরিয়া বহু যাত্রী গ্রামের দিকে হাঁটিয়া যায়। তাহাদের অধিকাংশই শহর-প্রবাসী। মনিহারী দ্রব্য নগরে সস্তা পায় বলিয়া কেউ এইসব অঞ্চলে খরিদ করে না। যারা নিজ গ্রামে থাকে, তারা সামর্থ্যহীন। এক মাস দোকান চালানোর পর আজহার তা নির্মমভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিল। ভবিষ্যতের অন্ধকারে মায়াময় হাতছানি লুকাইয়া থাকে; আজহারের মত নামাজী পরহেজগার ব্যক্তি এই কুহকের রংকে মনে করিত ঈমানের অঙ্গ। সুতরাং সব ব্যাপারে নির্বিকার। দোকান খুলিয়া অবসর যাপনই একমাত্র দিন গুজরানের শ্রেষ্ঠ পন্থা। আজহারের সামান্য পুঁজি ছিল, ইতিমধ্যে সে বাড়িতে একবার টাকা পুস্টাইয়াছে, অবশিষ্ট মূলধন ভাঙাইয়া ভবিষ্যতের দিগন্ত জরিপ ছাড়া আর কোন পন্থা খোঁজা আছে?

মাঝে মাঝে হাট-ফেরত পসারিণীরা আজহারের দোকানে ভিড় করে। তারা কোনদিন শহর দেখে নাই, শহরের জিনিসের জন্য লোভ বেশি। ক'পয়সার সওদা বা তারা আঁচলে তুলতে পারে? একটা সস্তা স্যালুলয়েডের চিরুণী, দু'পয়সার রঙিন ফিতা, সূঁচ-সূতা অথবা এক ডিবা আলতা। কেবল গঞ্জের দিনে এই মহিয়সীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

আজহারের ধ্যান-ধারণা, কল্পনার সৌধ এই দোকানকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। ঈমানদার লোকের দিন আটকাইয়া থাকে না, আজহার এই মূলমন্ত্রটি সহজে বিস্মৃত হইত না। তাহারও দিন অতিবাহিত হইত বৈকি! কোনদিন রান্নাই হইল না। ময়রার দোকান হইতে দু'পয়সার মুড়ি ও বাতাসায় নৈশভোজ সমাপ্ত হইত। নিজেই লইয়া আজহার খাঁর কোন লোভ ছিল না বলিয়া সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস এক মুহূর্তও টলিত না।

গুরুবারে দুপুরবেলা সাদা লুঙি পরিয়া কিস্তি টুপী মাথায় সে তিন মাইল দূরে মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়িতে যাইত। এই সময় দোকান বন্ধ থাকিত মাত্র। নচেৎ শেষ বাস স্টেশনে যাওয়া পর্যন্ত দেখা যাইত, আজহারের দোকানে চিম্নীওয়ালা ছোট দেওয়ালীর বাতি জ্বলিতেছে।

দুই মাস কাটিয়া গেল। দোকানে কোন আয় নাই দেখিয়া আজহার আবার মিস্ত্রীদের

কাজে জুটিল। গহর মিস্ত্রী সেদিন খুব হাসিয়াছিল। আজহার তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছে। এমন হিংসাতুর মন কোথা হইতে আপদের মত তার সঙ্গ লইয়াছে অকস্মাৎ, আজহার কোনদিন তা ভাবিয়া দেখে নাই। সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যায় আবার দোকান খোলা হইত। গঞ্জের দিন কাজে যাইত না আজহার। সেদিন দু'পয়সা বিক্রি হয়, তাই।

গহর মিস্ত্রী একদিন অযাচিতভাবে আলাপ আরম্ভ করিল।

আজহার ভাই, আমার সঙ্গে কথা বলো না। সাথে আমি রাগ করি? কপালে মুণ্ডর মেরে এসেছি ভাই, এ জন্যে আর কিছু হবে না।

আজহার তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গহর বলিয়া যায় : পয়সা কামাবার হেঁকমত আছে, ফিকির আছে, ফন্দি আছে, তা যদি না জানো, দোকান দিলেই কী পয়সা হয়?

গহরের সহানুভূতি আদৌ খাদ মিশ্রিত নয়, আজহার বুঝিতে পারে।

তুমি ত কথা বলবে না, খাঁ। আমিই বলে যাই, শোন, দোকান খুলে খন্দের ঠকাতে হবে। তার কত ফন্দি। কথায় কথায় হলফ কর, সাতবার মাইরি বল। বল, কেনা দামে বেচছি, হুজুর। যদি লাভ নিই ত হারাম শুয়ার খাই। এমনি করে সাতশ শুয়ার খেলে তবে পয়সা হয়। পয়সা হলে হয়ত হাজী সাহেব হোয়ে আসতে পার। মক্কা-মদিনা ঘুরে এলে, ব্যস। সব সাফ।

গহরের শরীর পাংলা বলিয়া কথার ভারসাম্য রক্ষার জন্য তার পায়ে চাঞ্চল্য খুব বেশি ফুটিয়া উঠে।

আজহার এইবার মুখ খুলিল, লাভ না নিলে কীরবার চলে, ভাই?

তা হলেই মিথ্যে কথা বলতে হবে। আর যদি সাক্ষা কথাই বল, বেশি লাভ হবে না, হয়ত একদমই হবে না। তাতে সংসার চলে না।

কথাগুলি আজহারের খুব মনঃপুতি। ভয়ানক ছোট হইয়া যায় সে। তবু যেন গোলক-ধাঁধা হইতে পরিণাম পাইতে তার মন আকুলি-বিকুলি করে।

ঈমানদার হলে সংসার করা দায়।

শুধু দায়, চৌদ্দ পুরুষ জড়িয়ে পড়ে শুদ্ধ। বলিয়া গহর একটি বিড়ি ধরাইল।

বাসায় আরো মিস্ত্রী কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আজহার আজ দোকান খুলিতে যায় নাই। বাসার আড্ডা তার ভাল লাগিতেছিল।

গহর ডাকিল : ওদু। আছিস—

ওদু-মিস্ত্রী বাসার এক কোণে শায়িত অবস্থায় গল্পের দিকে কান খাড়া রাখিয়াছিল।
কি রে! সে জবাব দিল।

তোমার মনে আছে, সে-বার, বেলেঘাটার আড়ৎদারের কাজ করি। এক ব্যাটা চামার আমাদের কি ঠকান না ঠকালে!

ওদুর শরীর ক্লান্ত, তাই সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এইবার উঠিয়া বসিল।

গহর, সেই আড়ৎদারের নাম-ডাক কত জানিস, দুটো মসজিদ তৈরি করে দিয়েছে এবার। অথচ আমাদের খাটনীর দামটা দিলে না। কত টাকা বাকী ছিল, গহর?

চৌদ্দ টাকা ছ' আনা।

গহর বিড়ির ছাই টোকা দিয়া ফেলিয়া পুনরায় কহিল, ব্যাটা চৌদ্দ বছর দোজকে

জ্বলবে।

আজহার জবাব দিল, তা কি আর হয় ভাই। কেরামিন, কাতেবিন আমাদের গোনা আর নেকির কথা লিখেছে। হাশরের ময়দানে যেদিন বিচার হবে, দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করে দেখবে নেকি আর বদীর কোন্ পাল্লা ভারী। চৌদ্দ টাকা মেরে মসজিদ দিলে কোন গোনা থাকে না, নেকীর পাল্লা ভারি হয়ে যায়।

গহর ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল, আজহার ভাই, তোমার 'ওয়াজে'র থলিমুখ বন্ধ করো। চৌদ্দ টাকায় মসজিদ হয়? কত চৌদ্দজনের কত টাকা মেরেছে তার খবর রাখো?

আজহার সায় দিল : ঠিক বলেছ, ভাই! আমি অন্য কথা ভাবছিলাম কিনা।

ঐ রকম ভাবলে আর দোকান চলে না। মসজিদওয়ালা আড়ৎদারের মত ভাবো, জাল-জোচ্চোরি শেখো, কপাল খুলবে।

তৌবা!

গহর মিস্ত্রী খিলখিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। মুখ তার বন্ধ থাকে না।

তবেই তুমি কারবার চালিয়েছ। জুম্মার দিনে দেখি তোমার দোকান সারা দুপুর বন্ধ পড়ে থাকে। খদ্দের যা আসে তা ওই সময় আসে। তখন দোকান বন্ধ রাখলে চলে?

আজহার সহসা উত্তেজিত হয় না। আজ ঝোঁকের মাথায় সে প্রতিবাদ করিয়া বসিল, এ কি কথা তোমার মুখে, গহর ভাই! এবাদতের চেয়ে পেট এত বড়!

অত ঈমানদার হলে ফকিরী নিতে হবে।

আবার ব্যঙ্গের হাসি গহরের কণ্ঠে। একটু দম লইয়া সে ডাক দিল, খলিল চাচা, একটু তামাক সেজে আন।

বাসার এক কোনায় রান্না চলিতেছিল। খলিল তরকারীর হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছিল। বয়সে ছোট বলিয়া বাসার সকলের ফাই ফরমাস তাকে শুনিতে হয়।

দিচ্চি, চাচা।

গহর অবশ্য খলিলের চাচা নয়, ওদূর সঙ্গে একত্র কাজ করে বলিয়া সে আত্মীয়তা গুছাইয়া লইয়াছে।

ধোঁয়া দে বাবা, ধোঁয়া দে। আর এসব ভাল লাগে না।

খলিল তামাক সাজিয়া আনিল।

গহর কক্কে আজহারের হাতে দিয়া বলিল, খাঁয়ের পো, তুমিই প্রথমে আরম্ভ করো। থাক, তুমি শুরু কর। নরম সুরে জবাব দিল আজহার।

গহর অত্যন্ত বিনয়ী এখন, কক্কে গ্রহণ করিল না।

আজহার কয়েক টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতেছে আরামে চোখ বুজিয়া। তখন গহর সহাস্যে আবার বলিতে থাকে, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দাও, খাঁয়ের পো। বড় কঠিন ঠাই দুনিয়াটা।

নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল আজহার। সে চোখ বুজিয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

ওদুও কক্কের প্রত্যাশী, আজহারের মুখের দিকে সে চাহিয়াছিল। খলিল কর্তব্যস্থলে ফিরিয়া গিয়াছে। চুলায় চেলাকাঠ জ্বলিতেছিল, আগুনের আভায় দেখা যায় তার মুখ ঘামিয়া উঠিয়াছে।

গহর কন্ধে হাতে লইয়া কথাবার্তা শুরু করে। জীবনের অভিজ্ঞতা তার অফুরন্ত। ব্যবসা জগতের বহু মানুষ, মিস্ত্রীরূপে সে দেখিয়া আসিয়াছে। উপনীত মন্তব্য তার সব জায়গায় এক : ঈমানদারের জায়গা নাই সংসারে।

আজহারের পকেটে তস্‌বী থাকে। ঠোঁটের এত তোড়ের মধ্যে সে এক-একটি দানা টিপিয়া লইতেছিল। অবাক হইয়া যায় আজহার, এই বয়সে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে গহর!

ওদু!

ওদু আবার আড় হইয়া শুইয়াছিল বিছানার উপর। সে নিদ্রিত কিনা তারই পরীক্ষা লইল গহর!

কে রে।

ওদু, শোন্ একটা মজার গল্প। সেবার আমি হাওড়ায় থাকি। এক ব্যাটা এসে বলে, মিস্ত্রী, আমার কাছে তোমার পাঁচ-সাত দিনের কাজ হবে, 'ফুরোনে' ঠিক করে নাও। পাঁচ টাকা রফা হল। আমি টাকা চাইতে বলে এই ত, কাছেই আমার বাড়ি। দশ টাকার নোট আছে, খুচরো নেই। তুমি পাঁচটা টাকা দাও, আমি দশ টাকা বাড়ি থেকে দিয়ে দেব। আমার সঙ্গে এসো। যো হুকুম। পাঁচটা টাকা তার হাতে দিলুম। মিনিট দশেক দু'জনে হাঁটার পর সে বললে, ঐ আমার বাড়ি। তুমি দাঁড়াও বাইরে, আমি টাকা আনি। মুসলমানদের বাইরে চটের পর্দা ঝুলছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়েই রইলাম। এক ঘণ্টা গেল, সে আর আসে না। শেষে চেষ্টামেচি জুড়ে দিলাম একটা আধবয়সী মেয়ে বেরিয়ে এলো ডিপা হাতে। কাকে চাও? বাড়িওয়ালাকে জবাব দিলাম। মেয়েটা হেসে বলে, এখানে বাড়িওলী থাকে, বাড়িওয়ালা থাকে না। ভেতরে আসবে নাকি? আমি ত অবাক! একদম বেউশো পাড়া। গলির ওপাশ দিয়ে কুঁজা আছে, আমার বাড়িওয়ালা সে পথে পগার পার।

ওদু রস-নিষিক্ত গল্পের মহিমায় বোধ হয় আবার উঠিয়া বসিল। মৃদু হাস্যে সে বলে, তারপর?

তারপর ঘোড়ার ডিম। বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাকা।

বাড়িওয়ালীর কাছে অপেক্ষা করলে না?

শুধু হাতে আর অপেক্ষা চলে না। শোনো, আরো আছে। বছর সাতেক পরে পোস্তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, দেখি একটা বড়ো কারবারি বসে আছে। আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। সেই লোকটা গদীর উপর, আর কত কর্মচারী চারপাশে।

ওদু তুড়ি মাড়িয়া বলিল, শেষে টাকা আদায় করলে বলো তা হলে।

আদায়! অবিশ্বাসের হাসি গহরের কর্ণে।

ভয়ে পালিয়ে এলাম। আমার ময়লা চিরকুট কাপড় আর এই চেহারা, সেখানে থু'দিতো পারি?

আজহার তস্‌বি টিপিলেও গহরের দিকে তার ষোল আনা খেয়াল ছিল।

লোকটা ঠিক চিনেছিলো?

আলবৎ। কাবুলীদের মত চোখ। অত ভুল হয় না খাঁয়ের পো। ঐ রকম জুচ্চোরী ফন্দী এঁটে 'শেঠ' হয়ে বসেছে এখন। ঈমানের কাল আছে আর?

তাহলে বেঈমান না হলে দুনিয়ায় বেঁচে থাকা যায় না। আর কোন উপায় নেই?

আর্তনাদের মত শোনায় আজহারের প্রশ্ন। গহরের মুখের দিকে এমন বিষণ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া সে চাহিয়া রহিল যে, গহর চোখ ফিরাইতে বাধ্য হইল। সেও এবার গম্ভীর হইয়া যায়, কণ্ঠে তার আভাস ফুটিয়া উঠিতেছিল।

উপায় যদি জ্ঞানতুম, তাহলে এই দশা! আমার বিদ্যোতে কুলোয় না।

হতাশার তীব্র ব্যঞ্জনা মানুষের কণ্ঠস্বরে এমন করিয়া সহজে বাজে না। রূপকথা শুনিতে শুনিতে তার বাস্তব পদক্ষেপ যেন কাহিনীকার ও শ্রোতার সম্মুখে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে, রূপকথা তাই আর জন্মিতেছে না; সভায় বোবার মত সকলে দুই চোখ খুলিয়া কেবল চাহিয়া রহিয়াছে— যার কাজল গহনে শুধু বিস্ময়, ভয়, আর ভঙ্গুর মানস বুদ্বদের জনতা।

সকলেই চুপচাপ। ঘরের কোণে জ্বলন্ত চুলার উপর হাঁড়ির ভেতর চুই চুই শব্দ উঠিতেছিল কেবল।

আজহার যন্ত্রচালিতের মত তসবীর দানা এক এক করিয়া টিপিয়া যাইতেছিল। দ্রুত চলে তার আঙুল। গহর পর্যন্ত কেন নির্বাক হইয়া গিয়াছে? সেও জবাব দিতে পারে না।

খলিল বাহিরে গিয়াছিল ভাতের ফ্যান গড়াইতে। তার অদ্ভুত চীৎকার শোনা গেল। আজহার ঈষৎ তড়িৎ স্পৃষ্টের মত হঠাৎ বলিয়া ওঠে, গহর, বাইরে কি হল?

স্ব স্ব পৃথিবীতে সবাই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ওদু, গহর, আজহার তাড়াতাড়ি বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

খলিল তখন ফোপাইয়া কাঁদিতেছে। এক পাশে ভাতের হাঁড়ি বসানো।

কি হয়েছে? সকলের মুখে ওই এক কথা।

আমার হাত পুড়ে গেছে। ও, মা গৈয়ুম!

বয়সে ছোট বলিয়া সকলেই খলিলের মেহনতে নিজেদের বিশ্রামের আরাম ঝোঁজে। গহর এই দিকে বারো আনা গড়িয়েসী করে। নিজের ভাইপো বলিয়া ওদু একদম নবাব বনিয়া গিয়াছে।

আজহার অতি ব্যস্ততার সহিত বলিল, ঘরের ভেতর চলো। আলোয় দেখা যাক। একটু সাবধান হতে হয়, বাবা।

ওদু ধমক দিতে আরম্ভ করিল, এত বড় ছেলে, একটু হুঁশুশ নেই। পরের ছেলে নিয়ে এসে মুশকিল!

গহর অন্যান্য দিন নাবালকের উপর ওদুর তম্বী উপভোগ করে। আজ সে পর্যন্ত চটিয়া গেল।

ওদু, যা মুখে আসে তাই বললিস! ওইটুকু ছেলে, দেড় সের চালের ভাত পসানো চাট্টিখানি কথা নাকি? নিজে ত ছ'মাসে একবারও হাঁড়ি ছুঁসেনে।

ওদু গজর গজর করিতে লাগিল। গহরের তুঁড় ভয়ানক ধারালো, ওদু আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

হুকুমজারী কণ্ঠেই গহর বলিল, আমরা দেখছি ওকে, হাঁড়িটা নিয়ে যাও ঘরে। না, কুকুরের মেহমানদারী হবে আজ।

ওদু নীরবে আদেশ পালন করিল। কিন্তু সে এমন চটিয়াছিল যে, খলিলের দিক আর

চাইয়াও দেখিল না।

খলিলের ডান হাতের আঙুলের আগাগুলো ফোঁস্কায় ভরিয়া উঠিয়াছে। গহর বার বার আপসোস করিতে লাগিল।

চুলায় জ্বল দাও, দিয়ো। এসব কাজে আর হাত দিয়ো না, বাবা।

গহরের মুখে এমন সুমিষ্ট বাণী। খলিলের দক্ষ আঙুলের যন্ত্রণা সামান্য উপশম হয় যেন। তাড়ি গিলে এসেছে নাকি গহর, হঠাৎ এমন কথাবার্তা?

আজহার বলিল, আমি আলু বেটে দিচ্ছি। ফোঁসকার উপর জ্বালা বন্ধ হয়ে যাবে।

চটপট আলু বাটিতে বসিল আজহার। ততক্ষণ গহর ফোঁস্কার উপর তালের পাখার বাতাস করিতে লাগিল। তরকারী এখনও রান্না হয় নাই। হাঁড়ি লইয়া পড়িয়াছিল ওদু। এদিকে সে নির্বিকার।

ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়া আলুর পুলটিশ বাঁধিয়া দিল আজহার। হাতের যন্ত্রণা কমিয়া আসিতেছে ধীরে ধীরে।

আজও কৃতজ্ঞতার সহিত খলিল আজহারের মুখ অবলোকন করিতে লাগিল।

নিজের মনেই সে প্রশ্ন করিল, চাচা, তোমার দোকানটা বড় হলে আমাকে দোকানদার করবে?

আজহার তার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিল, কোন জবাব দিল না।

সম্মতির এই আর এক নূতন পদ্ধতি মনে করিয়া আরো উৎফুল্ল হইয়া উঠিল খলিল।

আমার এই কাজ ভাল লাগে না।

ওদু খলিলের দিকে একবার চাহিয়া আন্তরিক রান্নায় মন দিল। দৃষ্টির ভেতর তার কি ছিল দেখা গেল না।

গহর এখনও হাত হইতে পাখা ফেলে নাই। মাঝে মাঝে খলিলের মুখ হইতে আহ্ উহ্ শব্দ উচ্চারিত হইতেছিল। জ্বালা থামিলেও কজি পর্যন্ত টনটন করিতেছিল তার।

আজহার চাচা, আল্লা আপনার দোকানটার বাড় দিতো!

আজহার জবাব দিল, তোমার মুখে সুবন (সুবর্ণ) বর্ষক, চাচা।

গহর কোন মন্তব্যের দিকে গেল না। পাখা রাখিয়া উঠিয়া পড়িল সে। তার হাত মুখ ধোয়া দরকার। আজহার আবার বাতাস করিতে লাগিল।

ওদুকে যমের মত ভয় করে খলিল। চাচা ভাইপোয় কদাচিৎ প্রাণ খুলিয়া বাক্যালাপ হয়।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব দুলিয়া তবু বলে, ওদু চাচা, আমার মাকে খবর দিও না, সে বড় কাঁদবে।

ওদু প্রথমে জবাব দিল না। কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল, না, কাল-পরশু বাড়ি রেখে আসব তোকে। এখানে খামাখা বসে বসে খোরাকী খাওয়া।

প্রথমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল খলিলের মুখ, চাচার শেষ কথাগুলো তার সারা শরীরে কালি লেপিয়া দিল।

না চাচা, কাজ না শিখে আর ঘরে যাব না।

আচ্ছা তাই হবে, আর ডাল হবে, বলিয়া ওদু দুই চৌট চাপিয়া তরকারীর হাঁড়ির ঢাকনি খুলিল। শ্ শ্ শব্দ উঠিতেছিল, খলিল ক্লান্ত দৃষ্টি সেইদিকে মেলিয়া দিল। গহর ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পাখা হাতে লইল। সন্ধ্যার আড্ডা তার মেজাজ খারাপ করিয়া

দিয়াছে, সহজে না কোন বাঁকা কথা, না বাঁকা হাসি তার মুখে নিঃসৃত হইতেছিল।

রান্নার পর খলিলের বাসনে ডাল তরকারী মাখিয়া দিয়াছিল গহর। আজহার নিঃশব্দে এক লুক্কা তার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল। দগ্ধদগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এতক্ষণে খলিলের আঙ্গুলের ফোস্কা।

জুম্মার দিন। আজহার দুপুরের আগেই ভিনগাঁয়ে নামাজ পড়িতে গিয়াছিল। দোকান বন্ধ রাখিতে হয় নাই, খলিল বিপত্তির জন্য কাজে বাহির হইতে অক্ষম। তাই সে-ই দোকান তদারক করিতেছিল। বসিয়া বসিয়া খোরাকী খাওয়া চাচা পছন্দ করে না, তাই আজহারের নিকট সে দুআনা মজুরী চাহিয়াছিল। অবশ্য নানা অনুনয়ের ক্রটি করে নাই খলিল। গরীব বলিয়া সে এমন নির্লজ্জ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। একথা সে বার বার বলিয়াছিল। মজুরী লইয়া খলিল বাসায় খাইতে গিয়াছে, আসরের নামাজের সময় সে দোকানে আসিবে। আজহার চুপচাপ বসিয়াছিল। আজ খরিদ্দার বিশেষ নাই। সকাল ঝাঁক যা সামান্য বিক্রয় হইয়াছে। জোরে বাতাস বহিতেছিল। রাস্তার ধুলোয় জিনিসপত্র সাফ রাখা মুশ্কিল। আসবাবপত্র আজহার পরিষ্কার করিয়া আবার বিশ্রামে রত হইল।

দোকানের পচাতে ঝাঁকড়া শিরীষের ডালে শন্ শন্ শব্দ উঠিয়াছিল। মেঘের রং ঈষৎ কাজল, হয়ত ঝড় উঠিতে পারে। নিরুদ্দিষ্ট আকাশের যাত্রীদের সঙ্গী হইয়াছিল এক ঝাঁক শীতের পাখি। আজহার তার কোন সংবাদ জামিল না।

আনমনা বসিয়া থাকিলে নানা রাজ্যের চিন্তা আসিয়া ভিড় করে, সোয়াস্তি পায় না আজহার।

বাতাসের স্রোত হঠাৎ মন্দীভূত হইয়া গেল। একটি কোকিলা কর্কশ শব্দ করিয়া সম্মুখের বাঁশবনের ঝোপে আসিয়া বসিল। একটু পরে পথের মোড়ে শীসের শব্দ শোনা গেল।

আরো নূতন পাখি আসিল নাকি? শীসের শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

সড়কের দিকে মুখ ফিরাইয়া আজহার অবাক হইয়া গেল।

চন্দ্রের সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইবার পূর্বে সে 'সুইং' শব্দে শীসধ্বনির সমাপ্তি রেখা টানিয়া আজহারের দোকানের সম্মুখস্থ বাঁশের টাঁটির উপর বসিয়া পড়িল।

কোটাল, তুমি?

কৌতূহলে চন্দ্র কোটালের চক্ষুতারকা নাচিতে থাকে। আবার শীস দিয়া সে গুন গুন করিতে লাগিল :

মধুরায় ফিরে এসে
ভুলে গেছ বিন্দাবনের কথা।
আমি তোমায় চিনেছি শ্যাম,
খাইনি চোখের মাথা।

আজহার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উনুখ। কোটালের গান আর থামে না।

চন্দর, একটু থামো ভাই। জোর গলায় ডাকিল আজহার।

আগে বিড়ি দাও।

পা নাচাইতে থাকে চন্দ্র।

বিড়ি পান তামাক সব দিচ্ছি। বাড়ির ছেলেপুলেরা কেমন আছে?
গোঁফে তা দিয়া কোটাল জবাব দিল না, মুখ নীচু করিয়া বিড়ালের হাসি হাসিতে লাগিল।

অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছিল আজহার, সব ভাল আছে?

আবার গোঁফে লম্বা তা। মাথা দোলাইয়া চন্দ্র জবাব দিল, আমি তার কি জানি?

হাতের তালু প্রসারিত করিয়া চন্দ্র মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

ছেলেরা ভাল আছে?

আসরের নামাজের সময় নিকটবর্তী। খলিল দোকানের সম্মুখে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। এই লোকটিকে দেখিয়া সেও হতবাক। মনে মনে ভয়ানক হাসি পাইতেছিল তার।

খলিলের দিকে নজর পড়িল চন্দ্র কোটালের।

কার ছেলে, আজহার ভাই? ও বাবা, এখানে তাহলে সংসার পেতেছ? নিকে করলে নাকি ছেলেস্ত্র?

খলিল লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। আজহার অসোয়াস্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, চন্দ্র, থাম্ একটু। ও দোকান দেখে শোনে মাঝে মাঝে। আমাদের এক মিস্তিরির ভাইপো।

তাই ভালো। ঘরেও সব ভাল। আগে একটা বিড়ি দাও, তবে সব খুলে বলব।

আজহার জবাব দিল, কোটাল, একটু মিষ্টি আশ্বিনে দিই, তারপর বিড়ি খাও।

না, ওসব দরকার নেই।

অগত্যা আজহার বিড়ি-দেশলাই বাহির করিয়া দিল।

চন্দ্র কোটাল নিশ্চিন্তে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, সব ভাল আছে, ভগবানের দিন ত আটকে থাকে না কারো জন্য। তবে কখন কখন দুপায়ে চলে আর কখন হামাগুড়ি দিয়ে, কখন চার হাত পায়ে চালাতে হয়।

পাঁচ কথা কথা আজহারের সহজে বোধগম্য হয় না, আজ অবশ্য পরোক্ষ অনুভূতির সাহায্যে নির্দয়ভাবে সবকিছু উপলব্ধি করিল।

খা এইদিকে চতুর। মনের হঠাৎ-জাগা কোন বেদনা সে অন্য কথায় ঢাকিতে চায়।

অনেক দূর থেকে এসেছে। চলো, একটু ঠাণ্ডা হয়ে মিষ্টি খাও। আর কোন কাজ আছে?

কাজ! চন্দ্র কোটাল জুকুটি করিল। অনেক কাজ। দোকানটার মালপত্র গুটিয়ে এখনই

মহেশডাঙা রওনা হতে হবে।

আজহার যেন সব ঘুলাইয়া ফেলিতেছে।

শিগ্গির কেন? দোকানটা কিছুদিন দেখব।

চন্দ্র এবার সত্যি গম্ভীর হইয়া উঠিল। ভয়ানক তিক্ত কণ্ঠেই সে জবাব দিল, ওসব রাখো। আর লাখ টাকা কামাতে হবে না। ক'মাসে ঘরের কী দুর্দশা হোল দেখে আসবে চল। জমি ক'বিষে পর্যন্ত রহিম বখশ নিয়ে নিল। কদিন ফেলে রাখবে সে। দরিয়া-ভাবী বলে সংসার চলছে, আর কেউ হোলে টি টি করে ছাড়ত।

আজহার লজ্জায় মাথা নীচু করিল, চোখের কোণ তার সজল হইয়া উঠিয়াছে।

হাঁড়ির খবর আর হাতে ভেঙে লাভ নেই। তোমার চাদর দিয়ে এই ত কটা

জিনিসপত্তর—বেঁধে নিয়ে, চলো সরে পড়ি।

খলিল বোবা অবোধ শিশুর মতো আগন্তুক ক্ষাপা লোকটির গতিবিধি আড়চোখে লক্ষ্য করিতেছিল।

ঢের উপায় হয়েছে বিদেশে। চলো মহেশভাঙা। শাকপাতা খেয়ে চোখের উপর তবু সংসারটা দেখতে পাবে।

শিকড়-বশীভূত স্পের মত আজহার আর মাথা তুলিল না।

চন্দ্র সত্যি নাছোড়বান্দা। আজহার মদুভাবে নানা আপত্তি জানাইল, কিন্তু কিছুই টিকিল না। এক ঘন্টার মধ্যে চাদরে মণিহারী পণ্যগুলি বাঁধা পড়িল। চন্দ্র নিজে সড়কের ওপাড়ে এক পানওয়ালার নিকট কাঠের শেল্ফ ক'টা বিক্রয় করিয়া দিল। ক্ষতি হইল না এক পয়সা। সে ত আজহার খাঁ নয়।

কেমন বর্বর মনে হয় চন্দ্র কোটালকে খলিলের নিকট। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সুগোল, গুফবিশিষ্ট কোন দৈত্য নয়, হঠাৎ শাহানপুরে আসিয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া গেল।

আজহার প্রদত্ত একমুঠো মুড়ি-লজ্জেশ্বরস যা একমাত্র সান্ত্বনা।

বাসায় তখনও মিস্ত্রীরা ফিরিয়া আসে নাই। কারো সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না আজহার খাঁর। নিজের সূমি কল্লিকা-পাটা গুছাইয়া লইবার জন্য সে একবার বাসায় গিয়াছিল। খলিলের মনমরা ভাব দেখিয়া সে সত্যি ব্যথিত হইল।

একবার সময় এলে আমাদের গাঁয়ে এসো। মুহেলভাঙা, থ্যাণ্ড ট্রাক রোডের ধারে।

আচ্ছা, চাচা।

অনেক দূর আগাইয়া আসিল খলিল, জন্মদাখানার গহ্বরে সে একজন সমব্যথী হারাইল।

চন্দ্র কোটাল দোকানের মালপত্র পিঠে বুলাইয়া লইয়াছিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে সে বলিল, ঘাবড়ে যেও না, খাঁ ভাই। সামনে পুন্য মতে পীরের মেলায় সব বিক্রি হয়ে যাবে।

আজহার ছোট একটি পুঁটলি লইয়া হাঁটিতেছিল, কোন জবাব দিল না।

পড়ন্ত দিনের শেষভাগ। রৌদ্র মরিয়া গিয়াছে। গাছপালার ছায়া দীর্ঘতর হইয়া সড়কের উজ্জ্বলতা মুছিয়া দিতেছে।

জনপদ ছাড়াইয়া চন্দ্র গান ধরিল :

মথুরা ছেড়ে কোটাল যমালয়ে চলে,

মাঠে মাঠে গোপিনীরা ভাসে চোখের জলে,

ও-ও-ও-ও-ও—।

আজহার হাসিয়া উঠিল। বলিল, চন্দ্র, আবার ভাঁড় নাচের দলটা জমাও। গান বাঁধতে এখনও বেশ পারো।

চন্দ্র মাথা দোলায়, সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের বোঝা দুলিতে থাকে।

দেশে মানুষের দশা ভাল থাকলে চন্দ্রকে কি আর এত বোঝা বহিতে হয়!

ঘাড়ের বাম দিকে বোঝা বুলিতেছিল, কোটাল ডাহিনে লইয়া একবার ঝাঁকুনি দিল।

ওয়ো ওয়ো-ওয়ো—শ্যাম, এত দুস্থ দাও রে—
ধিকিধিকি তুষের আগুন মাঠের উদাস বাও রে—

সড়কের সর্পিলাত দূরে নিয়ামতপুরে গিয়া মিশিয়াছে। আরো দশ মাইল দূরে মহেশডাঙা। দ্বাদশীর চাঁদ আকাশে বহুক্ষণ আগেই আসর জুড়িয়াছিল। প্রান্তরের হাহাশ্বাস বাতাসের মূর্ছনায় বিলীন কোন দিনের ইতিহাস যোজনা করিতেছিল। শস্যায়িত বিষণ্ণতা জলা-জাঙালে।

চন্দ্র শীস দিতে লাগিল, শ—ওয়ো—ওয়ো—ওয়ো—

১২

অস্থান মাসের ভোরবেলা। দরিয়াবিবির ঘুম ভাঙিয়াছিল অনেকক্ষণ। ধান সিদ্ধ করিবার জন্য রাত্রির বিশামটুকু বহু আগেই তাকে বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

সামান্য শীত পড়িয়াছিল। তরল কুয়াশায় আচ্ছন্ন গাছপালার উপরে নিশ্চিন্ত তারকার দ্যুতি তখনও মিটিমিটি জ্বলিতেছিল।

মোটা শাড়ির আঁচলে পুরু করিয়া বুক ঢাকিয়া দরিয়াবিবি সিদ্ধ ধান আভিনার একদিকে ঢালিয়া রাখিতেছিল। ডাবা হইতে ভিজ্জে ধান হাঁড়ি-ভর্তি করার সময় ভয়ানক শীত ধরে। চুলার নিকটে অবশ্য উত্তাপ পাওয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য।

রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই। বারবার হাই উঠিতেছিল দরিয়াবিবির। আজহার-নঈমা ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আসেকজানের কাছে আমজাদ এখনও নিদ্রায় অচেতন। দরমায় মাঝে মাঝে মোরগ ডাকিতেছিল। বড় কর্কশ মুখে হয় তার শব্দ।

চুলায় জ্বাল দিতে দিতে ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছিল দরিয়াবিবি। মাস চার পরে নূতন সন্তানের জননী শিরোপা মিলিবে, এই চিন্তা বারবার পীড়া দিতেছিল তাকে। স্কীত জঠর লইয়া পরিশ্রমের কামাই নাই। দরিদ্রের গৃহে ইহারা কেন ভিড় করিতে আসে? নঈমার চোখের পিচুটি ভাল হইতেছে না। যদি অন্ধ হইয়া যায় সে। গরীব মেয়ের হয়ত বিবাহই হইবে না। সদরের দাতব্য হাসপাতাল পাঁচ মাইলের পথ। অতদূর কচি মেয়ে হাঁটিয়া যাইতে পারিবে? আমজাদের মখতবে পড়া শেষ হইয়া যাইবে এই বৎসর। তার আগামী শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। চন্দ্র কোটাল জমিগুলি নিজের নামে বিলি করিয়া লইয়াছিল বলিয়া তবু চাষাবাদের জীবিকার সম্বল রহিয়াছে—নচেৎ তা-ও ধূলিসাৎ হইত।

হঠাৎ ফিৎ ব্যথা ধরিয়াছিল দরিয়াবিবির জঠরে। চুলার আগুনে তার ফ্যাকাশে পাশাণ-স্তন্ধ মুখটি আরো কালো হইয়া গেল। পেটের কাপড় খুলিয়া চুলার উত্তাপ লাগাইতে রত হইল দরিয়াবিবি। আরো জাঁকিয়া আসে ব্যথা। এখনও দু'হাঁড়ি ধান সিদ্ধ করিতে হইবে। দরিয়াবিবির মুখে কোন আত্ননাদের শব্দ উথিত হইল না। উঠানে সিদ্ধ ধানের স্তূপ, তখনও উত্তপ্ত ধোঁয়াটে বাষ্প উদ্ভিত হইতেছে। দরিয়াবিবি তাড়াতাড়ি তারই উপর ঈষৎ জঠর চাপিয়া শুইয়া পড়িল। বারবার আশঙ্কিত হইতে লাগিল, এখনই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে।

একটু আগে শীতে কাঁপিতেছিল। এখন সর্বাস্থ ঘামিয়া উঠিয়াছে। কপালে শ্বেদবিন্দু

চক্‌চক্‌ করিতেছিল।

দরিয়াবিবি চারিদিকে চোখ ফিরাইল। বাস্তব নীচে গাছপালা স্তব্ধতায় ভোরের আলোক পান করিতেছে। নীল কলাবনের উপরটার শুকতারা অন্য দিনের চেয়ে আজ উজ্জ্বলতর মনে হয়। তবু ধূসর আকাশের চতুরভূমি।

অকস্মাৎ সটান হইয়া ধানের স্তূপ আলিঙ্গন করিয়া শুইয়া পড়িল দরিয়াবিবি। অসহ্য বেদনায় তার পা কাঁপিতে থাকে। একবার শব্দ করিয়া দাঁতে দাঁতে চাপিয়া নিশ্চল পড়িয়া রহিল উলঙ্গ ইন্ডের প্রতীক বহনকারিণী ভুলুষ্ঠিতা জননী।

সিদ্ধধানের উত্তাপে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে আবার চুলার মুখে আসিয়া বসিল দরিয়াবিবি। ধান টিপিয়া দেখিল, এইবার নামাইবার সময় হইয়াছে। দ্রুত হাত চালাইতে লাগিল সে।

এমন কর্মোন্মত্ত কেন দরিয়াবিবি? সংসারে শুধু মাত্র তারই স্বপ্নের জন্য! তার স্বামী নাই, আজহার নাই?

এক হাঁড়ি নামাইবার পর চুলায় জ্বাল দিতে দিতে দরিয়াবিবি পুনরায় চিন্তাস্রোতে মগ্ন হইয়া যায়। জগদল প্রস্তর-শিলার বুকে প্রস্রবণের বুদ্ধদ উপল-রেখায় মৃদু তরঙ্গে সমাহতি চায়।

চোখ বুজিয়া আসিতেছে ঘুমে, তবু কর্তব্যের বেড়ির নাগপাশ শিথিল করিবার কোন উপায় নাই। ধীরে ধীরে চুলায় জ্বাল দিতে লাগিল দরিয়াবিবি। উবু হইয়া বসার ফলে শিরদাঁড়া টনটন করিতেছে। একটি পিঁড়া সে টানিয়া আনিল ঘরের দাওয়া হইতে।

দখলয়ে প্রভাতের আলোর জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বনানীর নিঃসঙ্গ রাত্রি চরা পাখি বিশ্রামের জন্য ঠাঁই খুঁজিতেছে। প্রভাতের মনোহরণ ঝঙ্কারে জাগিয়া উঠিতেছে পশু-পাখি তরু-লতা কিমাণ-জনপদের অধিবাসীরা। গ্রামান্তর হইতে মুয়াজ্জিনের 'আহ্লাহ্ আকবর' ধ্বনি-মূর্ছনার রেশ রাখিয়া গেল মহেশভাঙার জলা-জাঙালে।

খাঁ-পাড়ার আশে-পাশে স্নানার্থী যুবতী-বধূ ছাড়া আর বোধ হয় কেহ জাগে নাই। আরো কত না রাত্রি দরিয়াবিবি একাকী জাগিয়া এমন সাংসারিকতায় নিজের সামান্য বিশ্রামটুকু বিসর্জন দিয়াছে। কোন ক্ষোভ নাই মনে। নিশ্চাপ্ত লৌহকঠিন পাথরের মূর্তির মন ঝঞ্ঝা-ক্ষুর প্রহরে বর্ষণের আঘাত নীরবে সহিয়া যাওয়া শুধু, প্রান্তরের দিকে ভাস্করের দূরপ্রসারী দৃষ্টির ছায়া মেলিয়া দিয়া। আজও তেমনি নীরবতায় নিজেকে আবৃত করিয়াছিল দরিয়াবিবি। অলক্ষিতে কখন চোখের কোণে অশ্রু জমিয়াছে, তারও খোঁজ রাখে নাই সে। পেশী, স্নায়ু আর মনের মিতালি অজানিতেই আসিয়াছে।

গগদেশে তপ্ত একফোঁটা অশ্রু-পতনে দরিয়াবিবি সজাগ হইয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া চারিদিকে করুণা-বিহ্বল দৃষ্টির সাহায্যে অবলোকন করিতে লাগিল।

দাওয়ার পাশে রান্নাঘর, তার পাশে টাটির বেড়া। গোয়ালঘরে যাওয়ার পথ। ভিটের ধারে গাছপালা আছে বলিয়া এইদিকে এখনও অন্ধকারের ভিড়। চুলার আলোর ঝলকানি তার ঠোঁটের উপর পড়িয়াছিল। হঠাৎ মানুষের ছায়া দেখিয়া দরিয়াবিবি দৃষ্টি আরো সজাগ করিল। মানুষের শিরোদেশের ভাঙা-ভাঙা ছায়াই ত বটে!

সকালে চোর আসে না, দরিয়াবিবিও ভয় পাওয়ার পাত্রী নয়; সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু অগ্রসর হওয়ামাত্র ছায়া সরিয়া গিয়াছে। টাটি খুলিয়া দরিয়াবিবি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। না, কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। মনে একটু খটকা লাগিল। আনমনা দরিয়াবিবি আবার চুলাশালে ফিরিয়া আসিল।

এইবার চোখকে অবিশ্বাসের কিছু নাই। সেই ছায়া তেমনই অবিকল টাটির উপর। কিন্তু অগ্রসর হওয়ামাত্র মিলাইয়া গেল।

ভয়ানক ধাঁধায় পড়িয়াছিল দরিয়াবিবি। জীন-ভূতের ব্যাপার নয় ত। একটু ভীত হইল আজহার-পত্নী। কিন্তু তৃতীয়বার টাটি খুলিয়া দেখিল, একটি দশ-বারো বছর বয়সের বালক কাঁঠাল গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে। ভোরের আলো তখনও এখানে অপরিচিত, ছেলেটির মুখে উজ্জ্বলতা পড়ে নাই।

এই খোকা। দরিয়াবিবি ডাক দিল। ছেলেটি ভোরের আলোকের ছায়ায় পা-পা করিয়া কিছু দূর আগাইয়া গেল।

দাঁড়াও। আগু রমণীর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়। ছেলেটির গমন-নিরন্ত, হঠাৎ মুখ ঢাকিয়া সে ফোঁপাইতে লাগিল।

দরিয়াবিবি ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বলিল, কা'দের ছেলে, খোকা? বাপ মরেছে বুঝি? পালিয়ে এসেছো?

সে কোন জবাব দিল না। ফোঁপাইতেছিল, এখন স্তব্ধ হইয়া গেল। মাঝে মাঝে তবু ফোঁপানির শব্দ ভোরের বাতাসে আলোড়ন তোলে।

কাদের খোকা তুমি? দরিয়াবিবি তাকে তপ্ত বস্ত্রের পাশে গভীরে টানিতে লাগিল অচেতন স্নেহে।

দরিয়াবিবির ঠোঁটে হাসি খেলিয়া যাক! —বেশ ছেলে ত। জবাব দেবে না?

এখনও এখানে অন্ধকারের ঘোর কণ্ঠ নাই। গাছের পাতায় অলস সমীরণের কানাকানি ধ্বনিত হয়।

আবার ফোঁপাইতে শুরু করিয়াছে ছেলেটি। কোন জবাব নাই তার মুখে।

অগত্যা দরিয়াবিবি বলিল, তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি নে, চলো আমাদের ঘরে।

মস্ত্র-মোহিতের মত বালকটি দরিয়াবিবির বাহুবেষ্টনে থাকিয়া হাঁটিতে লাগিল।

উঠানে ভোরের আকাশ থামিয়া পড়িয়াছে। মানুষের পরিচয় স্বচ্ছ দৃষ্টির কাছে অগোচর থাকে না।

খোকা, তোমার নাম কি।

বালকটি দরিয়াবিবির ডাগর চোখের দিকে নিজের আকর্ষণ-বিস্তৃত দুই নয়ন মেলিয়া দিল। গভীর মমতাময়ী আঁখি-পল্লবের অন্ধকার দূর হইতে না-হইতে দরিয়াবিবির চোখে পড়িল বালকের ক্রুর উপরে কালো দাগ।

বিস্মৃতির তিমির কে যেন এক নিমেষে মুছিয়া দিল।

মোনাদির, আমার মুনি— অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কয়েকটি কথা আধস্পষ্ট গুঞ্জনিত শুধু হয় নাই। সেইখানে বালকটিকে গভীরে বুকে বাঁধিয়া অকস্মাৎ বসিয়া পড়িল দরিয়াবিবি। তারপর শুরু হইল অঝোর আঁখির উৎস-মুখের প্রস্তর-বিদারণ।

ডুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিল মোনাদির মা'র কোলে মাথা গুঁজিয়া। বাইরের প্রভাত

স্নিগ্ধ আলো আর বায়ুতে আজ আর এতটুকু মমতাও ছড়ানো নাই।

একটু বসো, বাপ আমার।

সিন্ধুদান একটু আঁচ ধরিয়েছিল, পোড়া গন্ধ উঠিতেছে। দরিয়াবিবি মোনাদিরকে বসাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি হাঁড়ি নামাইল।

ধান ঢালা হইল যথাশীঘ্র। মোনাদির মাঝে মাঝে ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। অপরিচিত পরিবেশে তার চোখ কৌতূহলের কোন নেশায় ডুবিয়া যায় না। সে মা'র মুখের দিকে বারবার চাহিয়া থাকে।

কাজ শেষ হইয়া গেল, সে মোনাদিরের কচি মুখ ভুলিয়া তার ডাগর চোখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গরীব দাসী মাকে এতদিনে মনে পড়ল? ধরা-গলায় কথা শেষ করিয়া দরিয়াবিবি কচি ঠোঁটে-মুখ বারবার চুম্বন করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সে-ও উর্ধ্ব-নিবন্ধ নয়নে নীলিমার প্রশান্তি চয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বোধহয় আকাশের দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল।

বেশ ভাল ছিলে, মুনি?

মুনি সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দিল, হ্যাঁ, মা।

দরিয়াবিবি তাহাকে কোলে ভুলিয়া খুঁটিনাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

একটু পরে আসিল আজহার। ফজরের নামাজ শেষ করিয়া সে দহলিজ হইতে ফিরিতেছিল। দরিয়াবিবি কোলে একটি অপরিচিত স্নিগ্ধ দেখিয়া সে বিস্মিত।

কর ছেলে কোলে?

মাথায় তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিয়া দরিয়াবিবি নম্র কণ্ঠে জবাব দিল, আমার ছেলে এসেছে।

বা, বেশ সুন্দর ছেলে ত। কি সুন্দর চোখ দুটো।

দরিয়াবিবির মুখ রাঙা হইয়া উঠিতেছিল।

বাপ মুনি, তোমার আঁকাকে সালাম করো।

যন্ত্রচালিতের মত মোনাদির আজহারের পায়ে কদমবুজি শেষে আবার মা'র কোলে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিল।

তোমাকে যেতে দেব না।

আজহার চিবুক ধরিয়া তার মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগিল।

তুমি আমার বাবাজী আজ থেকে। আমি তোমার ছেলে।

নিজের রসিকতায় আজহার হাসিতে থাকে। তার স্বভাবের রীতিমত ব্যতিক্রম।

তোমার নাম বলো।

মোনাদির লজ্জায় মাথা নীচু করিল। জবাব দিল দরিয়াবিবি, মোনাদির হোসেন খাঁ। আমি মুনি ডাকতাম।

বেশ, বেশ। আমার মুনি বাবাজী।

হঠাৎ আজহার চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, আমু-নঈমা-আমু—

তারা বিছানা ছাড়িয়া সকলে ছুটিয়া আসিল কয়েক মুহূর্তে। ভোরের বেলা বিছানায় জ. গয়া কল্পনা করিতে আমজাদের খুব ভাল লাগে।

দেখে যা আমু-নঈমা, তোদের বড়ভাইকে দেখে যা।

তারা বিস্মিত নয়নে শিশু-সুলভ বিহ্বলতায় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

আজহারের উচ্ছ্বাস দেখিয়া দরিয়াবিবি মনে মনে আনন্দিত হয়। তার কোলে মোনাদির উপবিষ্ট বলিয়া নঈমা আমজাদ দূরে দাঁড়াইয়াছিল।

আয়, কাছে আয়, তোদের বড় ভাই।

মোনাদির কোন কথা বলিল না। আমজাদের হাত নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তার সন্নেহ দৃষ্টি নঈমার উপর পড়িলেও পিছুটি-ভরা চোখের জন্য কেমন যেন লাগিতেছিল তা-কে।

দরিয়াবিবি নৈরাশ্য-ক্লান্তি নিমেষে কখন ভুলিয়া গিয়াছে। ফলুধারার মত আনন্দের অন্তঃস্রোত তার পাঁজরে নূতন মেঘের মত খেলিয়া যায়।

তুমি ছেলেদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দাও। একটা কলার কাঁদিতে রং ধরেছে দেখে এসেছিলাম কাল, আজ পেকে গেছে নিশ্চয়। সকাল বেলাটা ছেলেদের ভাল নাস্তা হবে।

দরিয়াবিবি দ্রুতগতি চলিয়া গেল। মোনাদির মা'র গমন পথের দিকে চাহিয়া থাকে।

আজহার বলিল, তোমরা খেলা করো, আমি হুঁকোটা ধরিয়ে আনি আমজাদ, তোর আজ মখতবে গিয়ে কাজ নেই।

আনন্দে সে উঠানময় ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

১৩

ইঠাৎ নূতন কর্মোদ্যম ফিরিয়া আসিয়াছে দরিয়াবিবির। আজহার অবাধ হইয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর ভেতর সংসার-যাপনের যুগ্মবন্ধন থাকিলেও, এতদিন বড় ফাঁকা ঠেকিত সবকিছু। দরিয়াবিবি পাষণই ত বুটো আজকাল হৃদযাতার নব মুকুল প্রস্তুতিত হইতেছে কিমাণ-দম্পতিকে ঘিরিয়া। স্নেহযত্নের আতিশয্যের কোন কূল-কিনারা করিতে পারে না আজহার।

মোনাদির কয়েক দিনেই অপরিচয়ের বেড়াগুলি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। আজহার আমজাদ অপেক্ষা মোনাদিরকেই যেন বেশি স্নেহ করে। কোন ফাই-ফরমাস তাকে খাটিতে হয় না। গাঁ হইতে এক মাইল দূরে মাইনর স্কুলে আজহার তাকে ভর্তি করিয়া দিয়াছে। মাইনাপত্র যোগাইবার সাহস আছে তার। দরিয়াবিবির উৎসাহ কম নয়। পুরাতন দিনগুলির স্মৃতি কিছুটা উত্তাপ অবশ্য হ্রাস করিয়া ফেলে। আমজাদের মখতবের পড়া আর দু'মাস পরে শেষ হইয়া গেলে দু'ভাইয়ে এক সঙ্গে স্কুল যাইবে। এখনও দু'মাস। একা একা মোনাদির স্কুলে যায়, দরিয়াবিবি তার জন্য খুব উতলা হইয়া পড়ে। নদীর ধারে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে একদিন তার বাড়ি ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, সেদিন সকলের খাওয়া-দাওয়া সারিতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। বিকালে দরিয়াবিবি রান্না চড়ায় নাই।

মোনাদির আসেকজানকে দু'চোখে দেখিতে পারে না। তার নোংরামির নানা কীর্তন করে সে মায়ের কাছে। আমজাদ অবশ্য কোন বিপত্তি তোলে নাই। ঘর মাত্র দু'খানা। মোনাদির আসেকজানের কাছে ঘুমাইতে নারাজ।

বুড়ির মাথায় যা উকুন। অগত্যা দরিয়াবিবি নিজের ঘরেই তাকে স্থান দেয়। এখানেও উসখুস করে মোনাদির। তার সহজে ঘুম হয় না, সে উপলব্ধি করিয়াছিল। এই জন্য আর একটি চালা তৈরির বায়না ধরিয়াছিল দরিয়াবিবি। ঘরে চালের সঙ্গে চাল বাড়াইয়া একটি ছোট ছোট বেড়ার কামড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিল আজহার। চন্দ্র কোটাল শুধু তার গতরের মেহনত নয়, খড়ও দিয়াছিল দশ গণ্ড। এই ঘরে মোনাদির আর আমজাদ লেখাপড়া করে, বইপত্র রাখে। পাশে উদাস্ত এলাকা, গাছপালায় ভরা। জ্যোৎস্না রাতে আমজাদ মোনাদির দুইজনে প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে। আসেক্জান এই জন্য আফশোস করে নাই। আমজাদ তার কাছ হইতে সরিয়া গিয়াছে। কোন কোন রাতে বুড়ি হামাগুড়ি দিয়া তাদের কামরায় প্রবেশ করে। হয়ত এতক্ষণ গল্প চলিতেছিল, বুড়ির আগমনে চুপ হইয়া যায় দুই ভাই। মোনাদিরকে বুড়িও খুব ভাল চোখে দেখে না। 'বুড়ো পাখি কী পোষ মানে বৌমা, চাল-ছোলা খাওয়ানোই সার।' দরিয়াবিবির ধমকে আসেক্জান আর এমন কথা কোনদিন মুখে তোলে নাই। সে মনে মনে তুষের আগুন ধোঁয়াইয়া রাখিয়াছিল। আমজাদকে একা পাইলে বুড়ি নানা মন্তব্য দিয়া মনের ঝাল মেটায়। আমজাদও সহজে আসেক্জানের ছায়া মাড়ায় না। 'তোমার ব্যাটা, দরিয়াবৌ, মন্দ হয়ে গেছে, আর আমার কাছে শোবে কেন?' স্ফোভ মিশিয়া থাকে কথাটায়।

তবু মোনাদির এই সংসারে এক ব্যাপারে অনাখ্যীয়। দরিদ্রের কোন ছায়া তার চোখে পড়ুক, দরিয়াবিবি তা পছন্দ করে না। স্বামী-স্ত্রী ফিস্ফিস করিয়া দেনা-পাওনার কথা বলে। ঘরে চাল বাড়ন্ত হইলে দরিয়াবিবি পূর্বের ভ্রত আর হৈ-চৈ করে না স্বামীর সঙ্গে। পাছে কথাটা মোনাদিরের কানে পড়ে। হয়ত তার ফলে একদিন আবার চলিয়া যাইবে সে। পরাশ্রিত, তবু নিশ্চয় এমন গরীব হাটে সেখানে মোনাদির দিন কাটায় নাই। আজহার ঝাঁর লুঙি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। নামাজ রুখ (সহীহ) হয় কিনা সন্দেহ। সিজদার সময় হাঁটু বাহির হইয়া পড়ে। সে নিজে লুঙি না কিনিয়া মোনাদিরের হাফপ্যান্ট ও শার্ট কিনিয়া দিল। বালক হইলেও মোনাদির সংসারের শ্রী সম্পর্কে সচেতন। মা'র অনাখ্যীয়ভাব সে কোনদিন তলাইয়া দেখে নাই। মা'র সঙ্গই ত আশীর্বাদের সমান। অন্য কিছু নিশ্চয়োজন।

মোনাদিরের সবচেয়ে ভাব হাসুবৌর সঙ্গে। মাত্র কয়েকদিনে এমন আপন করিয়া লইয়াছে সে দরিয়াবিবির এই সন্তানটিকে। যেদিন স্কুল থাকে না, সারাদুপুর কাটে সাকেরের বাড়িতে। আমজাদ আর মোনাদির বইয়ের গল্প পড়িয়া শোনায়। অসহায় এই বধুটি নূতন করিয়া প্রাণপ্রাচুর্যের সন্ধান পায়। সাকেরের সঙ্গে মোনাদিরের মাখামাখি আরো বেশি। আমজাদ পূর্বে সাকেরকে এড়াইয়া চলিত। সে-ও আজকাল মোনাদিরের দেখাদেখি সাকের চাচার সঙ্গে সখ্য পাতাইয়াছে। মোনাদিরকে সে লাঠিখেলা শেখায়। দরিয়াবিবি তা পছন্দ করে নাই। তার সুন্দর কিশোর পুত্র চোয়াড় না হইয়া যায়।

জলা-জাঙাল, গোঠ-মাঠ নূতন ভাষা খুঁজিয়া পাইয়াছে। আমজাদও ফাই-ফরমাস গুনিতে চায় না, কেবল মোনাদিরের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। আজহার বর্তমানে পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছে সংসারে একজন প্রাণী বাড়িয়াছে বলিয়া। আমজাদকে এই সময় তার বেশি দরকার। সে কিন্তু ধরা-ছোঁয়া দেয় না।

চন্দ্র কোটালের সঙ্গে আজহার ঝাঁ শকরগঞ্জ আলুর চাষ করিয়াছিল। কচি লতায়

নদীর চর পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। গোড়ায় আলু ধরে নাই তখনও। মোনাদির আমজাদের সঙ্গে এই কচি গাছ তুলিয়া মূলের মিষ্টতা আশ্বাদ করিতে খুব ভালবাসে।

একদিন চন্দ্র কোটাল দুইজনকে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলিল।

সব আলুমূল খাওয়া হচ্ছে।

এক বাবলা বনের আড়ালে তাড়ি গিলিয়া শুইয়াছিল কোটাল। কিশোর কষ্ঠের আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তার চোখে পড়িল এই অপচয় দৃশ্য। চোখ আরো বড় করিয়া গৌফ ফুলাইয়া সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, আলুমূল খাওয়া হচ্ছে, চৌকিদার-চৌকিদার—

এমন চীৎকার করিতে লাগিল, যেন গ্রাম জুড়িয়া ডাকাত পড়িয়াছে।

আমজাদ ভয় পাইয়াছিল। মোনাদির পূর্বে এই লোকটিকে দেখিলেও এমন মূর্তি আর দেখে নাই।

না কোটাল চাচা, তুলে দেখছিলাম আলু হয়েছে নাকি।

আলু হয়েছে নাকি আসুক চৌকিদার। পালিয়ো না, খবরদার।

আমজাদ ওকালতি করিতে আসিল, ও আমার বড়ভাই।

তুমিও চোর। চৌকিদার দু'জনকেই ধরবে।

মোনাদির ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল, তার চোখে প্রায় পানি আসিয়া পড়িয়াছে।

চারিদিকে মাঠের প্রসারণ নীল-সবুজ রঙের মোহনা রচনা করিয়া চলিয়াছে। অবেলার মেঘে বর্ণকেলির সমারোহ নূতনতর মনে হয়।

কোটাল চারিদিকে চাহিয়া একবার হাই তুলিল।

চৌকিদার আসছে না, তাহলে আমাকেই দিয়ে যেতে হবে। দুই চোর। চলো আমার সঙ্গে—

আমজাদ থ' বনিয়া গেল। তার পা আর নড়ে না।

আমি নাছোড়বান্দা। গোঁফে তাঁ দিতে লাগিল কোটাল।

তোমরা পায়ে হেঁটে যাবে না। ও, বুঝেছি। তারপর চন্দ্র উবু হইয়া বসিয়া পড়িল ও বলিল, আচ্ছা, দুই চোর আমার কাঁধে ওঠো।

মোনাদির অগত্যা কী বা করিতে পারে। সুশীল-সুবোধ ছেলের মত দুইজনে চন্দ্র কোটালের কাঁধে চড়িল। ভয় হয় তাহাদের, পাছে পড়িয়া যায়। দুইজনে কোটালের বাবর চুল কষিয়া ধরিল।

ওরে বাবা, সব পাঠানের বাচ্চা, একদম ঘোড়া-চড়া করেছে— লিয়া চন্দ্র হাঁটিতে লাগিল। আরোহীদের ভয়ের অন্ত নাই। আমজাদের চোখে পানি গড়াইতেছে। মোনাদির চুপচাপ।

কোটালের বপুর দোলনে আরোহীরা আনন্দ পায় না।

হঠাৎ হি হি শব্দে হাসিয়া উঠিল চন্দ্র কোটাল।

—এই চোর চাচারা, চল সব চাচীর থানায়। এলোকেশী ঘরে আছে নাকি কে জানে? মোনাদির ও আমজাদ মাথার উপর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দুইজনের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

চন্দ্র কোটাল গান ধরিল। দু'জনের ঠোঁটে হাসি আর ধরে না।

প্রাণ যদি দিলে তুমি
প্রাণ-চোর শেষে—
কোকিল কেন রেখে গেল
এমন পোড়া দেশে।

মেঠো বাড়লের সুরে প্রান্তরের বুক ভরিয়া উঠিতে থাকে। আমজাদ ও মোনাদির দূরে-দূরে দৃষ্টি ছড়াইয়া অবেলা উপভোগ করিতে লাগিল।

মোনাদির বলিল, চন্দ্র চাচা, আমাদের নামিয়ে দাও।

না, সেটি হবে না। তোমার চাচীর থানায় চলো। লাল আলু আছে সারারাত আলু খাওয়াবে।

আমজাদ সব চিনিতে পারে। খালের সৈতো পার হইয়া তাল গাছের সারি, শেষে চন্দ্র চাচার টিবি। সেইদিকেই কোটাল অগ্রসর হইতেছে। ধীর-সমীরে ঝড়িবনে শন্ শন্ শব্দ উদ্ভিত হয়। কোটালের কোন দিকে ক্ষেপ নাই। বিরহিণী কোকিলের ডাকে জর্জরিত হৃদয়, তারই বিলাপোক্তি কণ্ঠে বাজিতে থাকে শুধু।

টিবির উপর এলোকেশী চন্দ্রমণির উকুন বাছিতেছিল। উঠানে খেলাব্যস্ত যোগীন ও গোপাল। তারা এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়া খুন।

চন্দ্রমণি ডাকিল, ও দাদা, পায়ে পড়ি, নামিয়ে দাও। পরের ছেলে পড়ে গেলে—
জোরে হাঁকিল চন্দ্র, পড়ে গেলে পণ্ডিত হয়ে যাবে।

মোনাদির এইবার ঝিলঝিল করিয়া কাঁধের উপর হাসিতে লাগিল।

ও বাবা—থানার কাছে এসে চোরেদের আবার হাসি দ্যাখো। চলো, চাচির থানায়, খাওয়াবে লাল আলু।

আমজাদও হাসিতে থাকে।

চন্দ্রমণি বলিল, দাদা, ভিটের উপর কাঁধে নিয়ে চড়ে না, তোমার ঘাড়টা ভাঙবে—
খামাখা ভাঙবে। অবিখাসের হাসি হাসিয়া দুই-তিন লাফে চন্দ্র একদম টিবির শীর্ষে পৌছিল।

কোটালের কাঁধ হইতে নামিয়া মোনাদির বড় লজ্জিত হয়। এই মাঠে সে আর কোনদিন আসে নাই। অপরিচিত জায়গা বলিয়া সে বিব্রত, নচেৎ অন্য কোন খটকা তার মনে নাই।

চোখ নামাইয়া গান করিতে লাগিল কোটাল। এলোকেশী চন্দ্রমণির উপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, তোমার মাথায় রাজ্যের উকুন।

“দাদার মগজে আর বোনের মাথায়।”

গান থামাইল চন্দ্র।

আমার মগজে? কই, বেছে দাও না। তখন এলোকেশীর হাসি থামে না।

মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মগজ দেখা যাবে কেন?

একটি মুণ্ডর পড়িয়াছিল উঠানে। সেটি নির্দেশ করিয়া চন্দ্র কপট-কোপন জবাব দিল।

ঐটা দিয়ে দাও এক ঘা। মগজ বেরিয়ে যাক।

চন্দ্রমণি ভারী রগিয়া যায়।

দাদা, তোমার মুখে যা আসে তাই বলো, ভারী অনাছিষ্টি।

নে, আবার নাকিকান্না। লাল আলু থাকে ত ছেলেগুলিকে খাওয়া।

আমজাদ যোগীন-গোপালকে চেনে, সে দৌড়াদৌড়ি শুরু করিয়া দিল বাস্তব উপর।

ইঁকা-কঙ্কের সচ্যবহার করিতে লাগিল চন্দ্র।

লাল আলু আনিয়াছিল কোটাল গঞ্জ হইতে। এলোকেশী বাঁশের ডোলে মুড়ি ও সেন্দ্র আলু মোনাদির-আমজাদকে খাইতে অনুরোধ করিল।

বড় লাজুক মোনাদির এইসব ব্যাপারে। তবু ধীরে ধীরে ঠোট সঞ্চালন বন্ধ থাকে না।

কোটালের চোখের তারা বারবার নাচে।

মিষ্টি আলু খাও যত পারো, আর গাছের কাছে যেও না। এবার ঠিক ঝোঁয়াড়ে দিয়ে আসব।

গোপাল মামার কথার প্রতিবাদ করিল, লোককে আবার ঝোঁয়াড়ে দেয়, মামা!

দেয় বাবা, দেয়। আমজাদের দিকে ফিরিয়া কোটাল বলিল, তোমার বাবাকে ঝোঁয়াড়ে রেখে আসব। ভারী ঘর ছেড়ে পালায়।

ধেং।

আমজাদ মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ঠোট বাঁকাইল। মোনাদির মুচকি হাসিল শুধু। বেলা-শেষ ধরিত্রীর বুকে সন্ধ্যার পূর্বরাগ শব্দে-বর্ণে-কুহর-কূজনে। ভিটার উপর হইতে দূরান্তের আবছা গ্রামগুলি এমন দেখা যায়, মোনাদির কোনদিন কল্পনা করে নাই। লাল আলু মুখে দিতে দিতে সে আনমনা হইয়া যায়। তার সুন্দর ডাগর চোখের চাহনি নিকটস্থ কোন বস্তুর উপর ক্ষণেকের জন্য আলোক তরঙ্গ ছড়ায় না। ছবির মত স্তব্ধ তালগাছের সারি, নিচে শাদা গৈয়ো পথ, হয়ত দু'একটি পথিক, পথ-শান্ত শাদা বাছুর, মেঘ আর পাখির ঝাঁক, তার বালক মনের পর্দায় বিচিত্রতার ইশারা রাখিয়া যায়।

চন্দ্র সকলের সঙ্গে তুড়ি দিয়া জুটাইতেছিল। আনমনা কেবল মোনাদির।

মুনিভাই, সাঁঝ হয়ে এলো, চলো, বাড়ি যাই। আমজাদ তার চমক ভাঙাইল।

আর একটু বস না। চাঁদনী রাত আছে, না-হলে চন্দ্র চাচা পৌছে দিয়ে আসবে।

অসম্মতি জানাইল চন্দ্র। না চাচা, আমার অনেক কাজ। গরু-বাছুর, তোলা হয়নি।

এই শীতে মুগুরী-পাংগুলো রাখতে হবে। জোয়ার আসতে বেশি দেরী নেই।

আমজাদ কহিল, মরা গাঙে মাছ পড়ে?

চন্দ্র : না চাচা, রান্নাটা চলে যায়।

মোনাদিরের গায়ে শাট ছিল। বাতাসে শীতের আমেজ তাকে তেমন কাবু করে না।

আমজাদের জন্যই অগত্যা উঠিতে হইল। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে দূর গ্রাম-সীমানা।

গৃহবাসীর স্নেহের প্রতীক্ষায় গোষ্ঠে বাঁধা গাই হাফা স্বরে আবেদন জানাইতেছিল।

দুই কিশোর হুটমনে গায়ের পথ ধরিল। মোনাদির যেন বোবা হইয়া গিয়াছে। মাঠের এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ত সে কোনদিন আসে নাই।

হঠাৎ সে মুখ খুলল, চন্দ্র চাচা একটা পাগল।

আব্বাও ওই কথা বলে।

কিশোর মনের সিদ্ধান্ত এত সুনিশ্চিত যে, শ্রৌতজনও হার স্বীকার করিবে—এই সাফল্যের গৌরবে যেন দুই ভাই খিলখিল শব্দে হাসিতে লাগিল।

আমজাদ বলিল, মুনিভাই, তুমি গান জানো না?

গান আমি গাইতে পারি, লজ্জা করে।

একটা গান গাও, মুনিভাই।

মোনাতির চাচার আশ্রয়েও কারো তোয়াক্কা রাখিত না। রাত্রে সকলে ঘুমাওয়া গেলে, সে গল্পের যাত্রাশালে সারারাত্রি কাটাইয়া দিত। তম্বী চলিত পরদিন।

মোনাতির রামপ্রসাদী বাউল চংয়ের গান আরম্ভ করিয়াছিল। তার অর্থ সে আদৌ বোঝে না। কণ্ঠের মিষ্টতায় কেবল মূর্ছনা অপূর্ব পুলকাবেশ সৃষ্টি করে কিষণ পল্লীর প্রেয়সীদের বুকে। আমজাদ জানিত না মোনাতিরের কণ্ঠ এত মিষ্টি।

মুনিভাইয়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়া যায়।

গান শেষ হইলে সে বলিল, মুনিভাই, তুমি চন্দ্র চাচার কাছে গান শেখো না কেন?

গান জানে চন্দ্র চাচা?

ভাঁড়-নাচের দল ছিল, আর গান জানে না? শুনলে না, কেমন গায়?

বেশ, ভাল লাগে। আমি বলব আর একদিন।

আরো কিন্তু গান পছন্দ করে না। বলে, ওসব শিখলে মানুষ খারাপ হয়ে যায়।

দূর-র-র! আমি কিন্তু গান শিখব।

আমজাদ মাথা দোলাইয়া অন্ধকারে সায় দিল।

পরদিন পড়ন্ত দুপুরে হাসুবৌর ঘরে আড্ডা জমিয়াছিল।

মোনাতিরের মতে, চন্দ্র কোটাল নামে এই গ্রামে একটি পাগল আছে। তার কাহিনী ফলাও করিয়া সে বর্ণনা করিতেছিল। আমজাদও এই বিষয়ে একমত। হাসুবৌ ত অন্য কোন মতই দিতে পারে না।

সাকেরের মা ঘরে ঢুকিতে গল্পস্রোত মন্দীভূত হইয়া গেল।

মোনাতিরকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, বেশ ছেলে বোঁমা। থাকো ভাই-মা'র কাছে।

পর কী কখন আপন হয়?

মোনাতির এই কাহিনী শুনিতে প্রস্তুত ছিল না।

সাকেরের মা বকিয়া যায়, জানো বোঁমা, একেই বলে খুনের টান। চাচা সোনা-দানা দিয়ে মানুষ করত, শেষে একটা শ্লেট ভেঙে ফেলেছিল তা সইল না। তোমার চাচা কী করে, ভাই?

মোনাতির স্তব্ধ হইয়া যায়।

থাকো, মায়ের কাছে থাকো। পাঁচ-সাত বছর মায়ের কাছ-ছাড়া বলে কী আর মা পর হয়ে যায়?

ভয়ানক বিরক্ত হয় মোনাতির মনে মনে। হাসুবৌ শাওড়ীকে দজ্জাল আখ্যা মনে মনেই দিতে থাকে। কাঠ-কুড়োনি বুড়ি বলিলে তবে আমজাদের গায়ের রাগ যায়।

সাকেরের মা কোন সাড়া না পাইয়া বকর বকর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আবার ভাঙা আসর নূতন করিয়া জমিয়া উঠিল।

সাকেরের ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ নাই। তৈজসপত্রই বেশি। এক কোণে একটা বড়

তড়পোশ পাতা। তারই উপর একদিকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে হাসুবৌ উপবিষ্ট। বই হাতে মোনাদির। বালিশের আড় হইয়া শ্রোতারূপে আমজাদ।

আলীবাবা ও চল্লিশ দস্যুর কাহিনী পাঠ করিতেছিল মোনাদির। কাসেম রত্ন-গুহার মধ্যে আবদ্ধ। বাহিরে আসিবার মন্ত্র সে ভুলিয়া গিয়াছে। ‘সিসেম খোল’ এইটুকু শব্দ মোনাদিরের মুখে— আবার তাকে পাঠ থামাইতে হইল। সাকের চাচা ঘরে ঢুকিয়াছে।

কি গো চাচার, গল্প পড়া হচ্ছে?

জী।

হাসুবৌ মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। গৃহ প্রবেশকর্তার দিকে তার চোখ সজাগ।

মোনাদির জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে চাচা?

দাঙ্গার খবর আছে, লাঠি নিতে এসেছি। কোণে তার তৈল-চিক্কণ লাঠির উপর সকলের নজর গেল।

হাসুবৌ মেঝের উপর দাঁড়াইয়া অনুরোধ করিল, না, কোথাও যেতে হবে না।

না, আগাম টাকা নিয়েছি। গম্ভীর কণ্ঠ সাকেরের।

মোনাদিরও চাচীর পক্ষ গ্রহণ করিল।

না চাচা, সঙ্কায় আমাদের খেলা শেখাবে। আজ কোথাও যেও না।

আমজাদ ওকালতীর প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করিল। লাঠি-হাতে সাকের কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। হাসুবৌর শান্ত-গম্ভীর মুখ তার চোখে পড়িয়াছিল বৈকি। কিশোর বালকগুলির জিদ বোধহয় জীবনে তাকে প্রথম জিদ-ছাড়া করিল।

বেশ, তোমরা গল্প করো। বলিয়া সাকের চলিয়া গেল।

গল্প আর পড়া হইল না। হাসুবৌ নিজেই গল্প করিতে লাগিল। মোনাদিরকে কত স্নেহ-মমতায় ডুবাইয়া রাখিতে চায় সে।

বেশ খোকা, বলিয়া হঠাৎ বিছানার উপর শায়িত মোনাদিরকে বুকে জড়াইয়া বার বার চুম্বন করিতে লাগিল। মাতৃস্নেহ যেন নূতন আধার পাইয়াছে।

মোনাদির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে না। তার ডাগর চোখ, সুন্দর গৌর কচি-ঠোটে যুবতীর গুষ্ঠ বিশ্বাস আনে এক রকমের।

বাড়ি ফিরিবার পথে মোনাদির আমজাদকে জিজ্ঞাসা করিল, এই, হাসুবৌ চুমু খায়, না কামড়ায় রে?

কেন? অবোধ বালকের মতই প্রশ্ন করিল আমজাদ।

এই দ্যাখ না, আমার গালে কত দাঁতের দাগ।

১৪

এই গ্রাম মোনাদিরের খুব ভাল লাগে। শূন্য ভিটা, ছোটখাটো তরুলতার জঙ্গল, বনানীর নিচে কোথাও কোথাও সরু পথ— তার মন আকর্ষণ করে। লুকোচুরি খেলার এমন জায়গা তাদের গ্রামে ছিল না। এই পার্শ্বকাটুকু তার মনোহরণ করে।

আমজাদও আজকাল ঘর-পলাতক। দুইজনে বাউঙলের মত গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া

বেড়াইতে লাগিল। আমজাদও ধীরে ধীরে দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ির ফাই-ফরমাস পূর্বের মত সম্পন্ন হয় না। দরিয়াবিবি মাঝে মাঝে খুব চটিয়া যায়। কিন্তু মোনাদির সম্বন্ধে সে খুব সচেতন। পাছে এতটুকু অনাদর-অবহেলার জন্য তাকে হারাইতে হয়। মোনাদিরের স্বভাব এমনই বেপরোয়া, মাথার উপর তর্কী করিবার লোক নাই, এই সুযোগে সে আরো বেপরোয়া হইয়া উঠিল।

গোরস্থানের জঙ্গলের পশ্চিম দিকে খেজুর গাছের সংখ্যা অনেক। নীল থোকা-থোকা কাঁচা খেজুর পাক ধরিতে এখনও দুইমাস। অত দৈর্ঘ্য বালকদের নাই। আমজাদের সহিত যুক্তি করিয়া মোনাদির একদিন এক কাঁদি কাঁচা খেজুর কাটিয়া আনিল। তার জন্য অসীম দুঃসাহসের দরকার। বেত-বনের ঘন ঝোপে বিষাক্ত সাপ থাকা বিচিত্র নয়। তা ছাড়া বুনো লতায় গা-হাত এমন কুটোয় যে অনেকেই খেজুর পাকিলেও এদিকে পা বাড়াইতে সাহস করে না।

মোনাদির পথ-প্রদর্শক। লতাগুল্ম ফাঁক করিয়া সে অগ্রসর হইয়াছিল। বুনো লতার স্পর্শ সে প্রথমে সহ্য করিয়াছে। কিন্তু আমজাদের গা কুটাইতেছিল ভয়ানক। জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। মোনাদির অগ্রজের মতই তাকে শান্ত করিল। কিন্তু ঘরে দরিয়াবিবি ক্ষোভে আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

দু'জনে আমার মাথা খেয়ে ছাড়বি কোনদিন। পয়পয় করে মানা করেছি, কবরস্থানের দিকে যাস নে বাবা— বাবারা কান কুলো করে বসে থাকবে।

দুই ভাই কোন জবাব দিল না। দরিয়াবিবি গরম পানিতে গামছা ভিজাইয়া পুত্রদের গা মুছাইয়া দিল।

মুনিভাই বললে, কাঁচা খেজুর খেতে খুব মজা।

আমজাদ মাকে বলিতেছিল।

মোনাদির প্রতিবাদ করিল : আমি বুঝি বলেছি মজা। খুব কষা।

আড়চোখে মোনাদিরের দিকে অগ্রসর দৃষ্টিপাত করিয়া আমজাদের গা মুছাইতে লাগিল পুনরায় দরিয়াবিবি। মোনাদির তখন মৌন। দরিয়াবিবি ইহা লক্ষ্য করিয়া আবার মোনাদিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

আয় মুনি, তোর গা-টা আবার মুছে দিই।

অভিমান-স্কন্ধ কণ্ঠ মোনাদিরের : না থাক্, আমার গা আর কুটোয় না।

দরিয়াবিবি কোন প্রতিবাদ কানে তুলল না।

দ্যাখ দিকি বাবা, গায়ে কাল কাল দাগ পড়ে গেছে। অত ঘন জঙ্গলে আর যেয়ো না।

বড় বড় সাপ আছে।

কি সাপ আছে, মা? আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল।

খুব বিষ সাপের, জাতসাপ আছে।

মোনাদির হাসিয়া উঠল —হ্যাঁ, সাপ আছে না হাতি। কই, আমরা একটা সাপের লেজও দেখিনি।

আমজাদ হাসিতে যোগ দিল। —মা, বড়ভাই সাপের লেজ দেখেনি। সাপ কাটলে লেজ খসে যায়। না, মা?

হ্যাঁ।

মোনাদির বিশ্বাস করে না এই প্রসঙ্গ।

হ্যাঁ, কাটলে লেজ খসে না ঘোড়ার ডিম। আমার চাচার একটা বেড়ে কুকুর ছিল, সে এত লোককে কেটেছে, তার লেজ একদম থাকত না তা হলে।

দরিয়াবিবি এতক্ষণ গম্ভীর হইয়াছিল, সে-ও উচ্চহাস্যে পুত্রদের আসরে যোগদান করিল।

আরে আমার বোবা ময়না, কুকুরের আবার লেজ খসে!

মোনাদির গা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, তবে যে আমু বলে।

তোমার গা কুটোচ্ছে? জিজ্ঞাসা করিল দরিয়াবিবি।

না, মা।

তবু—আমার কাছে লুকোবে?

মোনাদির সম্মুখে হঠাৎ মা'র কোমর জড়াইয়া আমজাদের দিকে আঙুল বাড়াইল।

ঐ ত আমাকে নিয়ে গেল।

কৃত্রিম কোপন দৃষ্টি প্রতিভাত হয় দরিয়াবিবির।

আমজাদ অভিমান করিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আর যদি কোথাও যাই, মনিভাই—

পরদিন আমজাদ তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল। স্কুলের ছুটির পর দুইজনেই গ্রাম-পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্যান্য ছেলেরা স্কুলের খাউন্ডে ফুটবল খেলে, মোনাদির সেখানে থাকতে চায় না। ভয়ানক ছোট হইয়া যায় সে অন্যান্য পড়ুয়াদের নিকট। তাহাদের বেশভূষা স্বতন্ত্র, পরিচ্ছেদে চিক্যতা থাকে। মোনাদির আমজাদের সঙ্গে-মাধুর্যে তাই পরিতৃপ্তির আশ্বাদ পাইয়াছিল।

আজও স্কুলের ছুটির পর দুইজনেই মাঠের দিকে চলিয়া গেল। চন্দ্র কোটাল বাড়ি নাই, ফসল লইয়া গঞ্জে গিয়াছে— সেখানে ভাল জমিল না। আমজাদ মজা খালের একটি ধারে কতকগুলি চিলের পালক কুড়াইয়া মোনাদিরকে উপহার দিল। ভাল কলমের কাজ চলিবে।

সন্ধ্যার পূর্বে লুকোচুরি খেলার সময় মোনাদির আমজাদের সঙ্গচ্যুত হইল। দুইজনে খেলার মাতামাতিতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। আমজাদের সঙ্গে দেখা না হইলেও মোনাদির বেশি বেগ পায় নাই। একটি বাক ফিরিতেই পরিচিত পথ দেখিয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিল। ওই শীর্ণ রাস্তাটি সাদা ফিতের দাগের মত আঁকবাঁক সমন্বয়ে পাড়ার ওদিকে মিশিয়া গিয়াছে। দুইপাশে শুধু নানা রকমের গাছ। সন্ধ্যা আসন্ন। ভয়াতুর মসৃণ অন্ধকার জমিয়া উঠিতেছে খানা-খোন্দলে, পত্র-পুঞ্জের অনাবৃত বৃকে। শাদা ঘাস ধূসরিমায় শিহরিয়া উঠিতেছে। পথের কিনারায় কেঁচো-মাটির দাগ, পায়ের আঙুলে অস্তিত্বের প্রমাণ জানায়! কত ক্ষুদ্র টিলা! মোনাদিরের দৃষ্টি মিশিয়া যায় চারিদিকে। বোবার মত বিস্ময়ে সে চাহিয়া থাকে। একটু আগাইতেই পালতে মাদারের ঘন বেড়া চোখে পড়িল। নিচে কেবল লতার উলঙ্গ মূল, উপরে পাতার নীল আভরণ। পাশে একটি পানাছাওয়া ডোবা, জলের আলোড়ন-ধ্বনি শোনা গেল। কৌতূহলে মোনাদির উবু হইয়া দেখিতে লাগিল সূর্যের লালিমা ডোবার উপর। রঙীন ঘাটের পৈঠায় একটি পিতলের কলস, গ্রাম্য কোন বধূ স্নান

করিতেছে। তার গৌর মুখ দেখা যায়। অঙ্ককার হইয়া আসিতেছে, এই ভয়ে মোনাদির পদক্ষেপ দ্রুত করিল। পুরাতন বড়ো আমের গাছ পড়িয়াছিল, গুঁড়িসহ একটি মোটা ডাল পথের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। মালিকেরা সামান্য ডালপালা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, ধড়টি এখনও বর্তমান। ফ্যাকড়া ডালের উপর বসিয়া মোনাদিরের দুলিতে ইচ্ছা করে। সময় নাই। আরো অঙ্ককার হইয়া গেলে ঘরে ফেরা দায় হইবে। কয়েক পা আগে একটি শূন্য ভিটে, পথ এখানে সামান্য উত্তরায়ের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ভিটার তিনদিকে আমগাছের পাহারা; ফাঁক দিয়া দূরে সন্ধ্যা কাশের ম্লান অঙ্গনে হলুদ রঙের মত মেঘ! মোনাদির দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তার চোখে শূন্যতার এই আকার জ্ঞান-রাজ্যের কোন বার্তা বহিয়া আনে না; তবু অসোয়াস্তি অনুভব করে সে। আবার ঢালু-পথ সমান্তরাল কয়েক বিঘা মাত্র। এইটুকু শেষ হইয়া গেলে সে পাড়ার অন্দরে ঢুকিয়া পড়িবে। এইখানে সে হাঁটিয়াছে আরো কয়েক দিন, কৌতূহলের নেশা আর এমন কোনদিন চাপিয়া বসে নাই। অঙ্ককার প্রলেপ টানিতেছে ধরিত্রীর উপর। মেঘের আলোয় সাদা পথের রেখা মুছিয়া যায় না। পানা-ভরা একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর পাড়ে বাঁশবনে নীড়-প্রত্যাগত বকের দল গুলতান করিতেছে। শাবকগুলির কঁক কঁক শব্দে উৎফুল্ল হয় মোনাদির। পুকুরের পাড়ের কোণে জীর্ণ কয়েকটি সুপারি গাছ। পাশে গোয়ালঘর। একটি বাছুর হাম্বারব ছাড়িতেছে। সড়কের পাশে, ইহার পর তালপাতার বেড়ার রেখা। ওদিকে গেরস্থদের সায়াং-জীবন শুরু হইয়াছে। জমাট ধোঁয়া উঠিতেছে গাছপালার ভিতর দিয়া। দৃষ্টি হাঁটিতেছিল মোনাদির। বেড়ার উপর শুষ্ক কলাপাতার দোদুল রেখামূর্তি, বাতাসে দুলিতেছে। হঠাৎ পথের পাশে খরখর শব্দ হইল। ভয় পাইয়াছিল প্রথমে, পরে সে কৌতূহলবশতঃ থম্কিয়া দাঁড়াইল। সাপ-খোপ নয় ত! এইখানে একটি শুষ্ক কাঁঠালগাছ বেড়ার খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার শব্দ হইল। মোনাদির দৌড় মারিবার জন্য পা তুলিয়াছে!

এমন সময় বালিকার কণ্ঠের সাবধান-বাণী শোনা গেল : এই খোকা—

মোনাদির ভাবিল কোন বর্ষীয়সী বোধহয় তার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। দৌড় বন্ধ করিয়া সে বেড়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

এই খোকা—

কোন বর্ষীয়সী নয়, একটি কচি মুখ কলাপাতার আড়াল ফাঁক করিয়া মৃদু ঠোঁট সঞ্চালন করিতেছে।

বালিকার মুখের একাংশ মাত্র দেখা যায়। মরা কাঁঠাল গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া সে আড়াল হইতে কেবল মুখটি বাহির করিয়া দিয়াছিল। আকাশের আলোয় মুখাবয়বের ডান দিক শুধু আলোকিত।

কোন জবাব যোগাইতেছিল না মোনাদিরের মুখে। এমন অবস্থায় বালিকা তাকে যথেষ্ট সাহায্য করিল।

কোন্ পাড়ার ছেলে?

আমতা আমতা করিয়া জবাব দিল মোনাদির : ঐ পাড়ার। অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে সে বিস্মৃতি হইল না।

ঐ পাড়ার।

ফিক্‌ফিক্‌ করিয়া মেয়েটি হাসিয়া উঠিল। — ঐ পাড়ার নাম নেই?

তোমার নাম আছে?

বড় মুখরা ত মেয়েটা। মোনাদির রাগিয়া উঠিয়াছিল মনে মনে।

আমার নাম নেই, তোর নাম আছে? 'তোর' শব্দটাতে বেশ জোর দিয়াছিল সে।

আমার নাম আছে, তোমার নামও আছে।

মোনাদির জিত ভাসাইয়া শব্দ করিল : আমা র ..না..ম আছেই— তারপর জিত যদুর সম্ভব বাহিরে প্রসারিত করিয়া বলিল : তোর নাম আছে?

ভারী বজ্জাত ছেলে ত। কাদের ছেলে রে?

মোনাদির আবার ব্যঙ্গ করিল। বেড়ায় আড়াল ফাঁক করিয়া গুঁড়ির উপর সে সশরীরে বাহিরে আসিল। মোনাদির দেখিল ফালি পরা একটি সুডোল তনু, বছর নয় কী দশের বালিকা। চুলগুলি এলোমেলো পিঠের উপর দোল খাইতেছে। মুখটি গোলাকার, গৌর রঙের উজ্জ্বলতা-উচ্ছল। টানা চক্ষুতারকা চড়ুই পাখির মত ক্রুর নিষ্ঠে চঞ্চলতায় অস্থির।

কাদের ছেলে রে? মেয়েটি ভেংচি দিতে বিলম্ব করিল না। মোনাদির এবার রীতিমত রাগিয়াছিল। পথের উপর ঢেলা ইত্যাদি কিছু না পাইয়া আক্রোশে সে ফুলিতেছিল।

দেবো পা ধরে নিচে ফেলে চিং পটাং।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি পা গুটাইয়া ভেংচি কাটিয়া বলিল, আমার পায়ে সালাম করবি নাকি?

মোনাদির হাতের তালুর ভিতর অন্য হাতের মুঠি কচলাইতে লাগিল।

দেবো পা ধরে ফেলে—

দাঁড়া ত রে বজ্জাত, বলিয়া মেয়েটি পাছের গুঁড়ি হইতে বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। তার পদধ্বনি শোনা যায়। ভয় পাইল মোনাদির। সে ছুট দিল এইবার সড়কের সোজাসুজি।

পশ্চাতে বালিকা কণ্ঠের ডাক শ্রুত হয় : এই খোকা, শুনে যাও— কিছু বলব না তোমাকে—

মোনাদির আবেদনে কোন সাড়া দিল না। ভীত-ব্রস্ত সে। কিছুদূর গিয়া পাছের কোলজোড়া অন্ধকারে থামিয়া একবার পশ্চাতে চাহিল। অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি আলুলায়িত-কুন্তলা চকিত-দেখা কিশোরী দাঁড়াইয়া রহিল। হ্যাঁ, সে-ই ত। ভুল হয় নি কিছু।

কেমন যেন মনমরা হইয়া বাড়ি ফিরিল মোনাদির।

১৫

পরদিন দুপুরে আহার সমাপ্তির পর মোনাদির কৌতূহলবশত পাড়ার পথে বাহির হইল। গত সন্ধ্যায় আবছা-দেখা সড়কের জগৎ। আজ দুপুরে চারিদিকে আনমনা দৃষ্টি ছড়াইতে তার কাছে নূতন ঠেকিল সবকিছু। হারানো পথ রেখা নূতন করিয়া সন্ধান করিতে লাগিল সে।

দু'পাশে তালপাতার বেড়া। মাঝখানে শুষ্ক কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি। জায়গাটা চিনিতে বেশি বিলম্ব হইল না। অবাক হইয়া মোনাদির অবলোকন করিতে লাগিল চারিদিক। কীট-পতঙ্গের ক্ষুদ্র জীবনলীলা। শুষ্ক কাঠের সেতু বাহিয়া একদল পিপীলিকা আহার মুখে অগ্রসর হইতেছে। ক্ষুদে লাল পিপড়ের সারি ছোঁড়া ঘুড়ির সূতার মত যেন বাতাসে কাঁপিতেছে। আঁকাবাঁকা গতি একটি তালপাতার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

মোনাদির একবার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইল। জোড়া সুপারি গাছের ওধারে গেরস্থ বাড়ি। ডিগ্‌ডিগ্‌ শব্দে একটি ক্ষুদে পাখি তেঁতুল বনে পতঙ্গ সন্ধান করিতেছিল।

এই, কাদের বোকা ছেলে রে। বালিকা কণ্ঠের ডাক। হঠাৎ ভয় পাইয়া মোনাদির পেছনে ফিরিবে কী, আর একটি কোমল হস্তে সে বন্দী। গত সন্ধ্যায় দেখা সেই বালিকাই। তার হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। মোনাদির প্রস্তুত ছিল না। মেয়েটি হাত ধরিয়া তাকে টানিতে টানিতে গেরস্থ বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মাকড়শার জালে যেন প্রতিবাদ করিবার অবসর নাই, দু'মিনিটের ভিতর ভোজভাজির মত কি যেন ঘটিয়া গেল। আর একটি গেরস্থর আঙিনায় সে এতক্ষণে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

ওমশা, শিগ্‌গির বেরোও, দেখো কা'দের ছেলে।

খিলখিল শব্দে হাসিতেছিল মেয়েটি।

কি রে আমিয়া।

আঙিনার সম্মুখে একটা খোড়ো চালের ঘর, ভোর দাওয়া হইতে একজন মেয়ে জবাব দিল। সে ঘরের দেওয়ালের মাটির ছোপ দিগ্‌ডিগ্‌ছিল।

আমিয়া আর একবার সমস্ত হাসি মিঃশেষ করিয়া দিল।

কি চুরি করবে বলে আজ বেলাবেলা বেরিয়েছে, মা।

মেয়েটি কর্মব্যস্ত। সে একবার এইদিকে চাহিয়া কাজ বন্ধ করিল।

আমিয়া, কা'দের এমন সুন্দর ছেলে?

হাসির স্রোতে ভাটা নাই।

সুপুরিগাছের কাছে দাঁড়িয়েছিল, ধরে এনেছি।

লাল মাটি মাখা ন্যাকড়া হাতে মেয়েটি দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল। আমিয়ার মা'র নাম আমিরন।

থোকা, কোথায় থাকো?

এমন ভাবাচাচা খাইয়া যাইবে মোনাদিরের মত চটপটে ছেলে, বিশ্বাস করা যায় না। আজ তার কণ্ঠে বাক্য হোঁচট খাইতেছিল।

আ-মি-খাঁ-পাড়ায় থাকি।

আমিরন বদনার পানি লইয়া হাত ধুইয়া ফেলিল।

খাঁ-পাড়ার কার ছেলে?

মোনাদির সন্কোচে মিশিয়া যাইতেছিল মাটির সঙ্গে। আর যা-ই হোক, আজহার খাঁ তার পিতা নয়।

আমার মা দরিয়াবিবি।

আমিরন দরিয়াবির চেষ্টা বয়সে বড়। প্রৌঢ়ত্বের ছাপ মুখাবয়বে স্পষ্ট। রোগা শরীর। গাল দু'টি সুসমায় উজ্জ্বল হইলেও, বয়সের দাগ পড়িয়াছে। একরকমের কৃত্রিম গাভীরে তার মুখখানি ছাওয়া।

অভ্যর্থনার হাসি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে।

দরিয়াবুবুর ছেলে, দরিয়াবুবুর ছেলে, বলিতে বলিতে আমিরন আগাইয়া আসিল।

আমিয়া তখনও হাসিতেছিল।

কৃত্রিম ক্রোধে তার দিকে ফিরিয়া আমিরন বলিল, হতচ্ছাড়ি, হিড়হিড় করে কাঁকে ধরে আনলি। মাফ চা।

আত্মীয়তার যোগসূত্র আছে এই কিশোরের সঙ্গে, আমিয়া তা কল্পনা করে নাই।

তুমি এসেছো শুনেছি, বাবা। গরীব মানুষ, কাজকর্মে সারাদিন যায়। খেটে খেটে আর পারি না। আজ ক'দিন যে খাঁ-পাড়ার দিকে যাই নি।

আমিয়া কৌতূহল-দৃষ্টি দিয়া মা ও আগন্তুক কিশোরের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ নখে মাটি খুঁটিতে লাগিল সে।

আমিরন হাঁক দিল : এই হতচ্ছাড়ি— একদম ভিজে বেড়াল-ছানা বনে গেলি যে, দাওয়ায় একটা বসবার জ্যাগা দে। চলো, বাবা।

আমিয়া মা'র আদেশ নীরবে পালন করিল। মোড়ার উপর যন্ত্র চালিতের মত বসিয়া পড়িল মোনাদির। তার পাশে বসিয়া আমিরন সংসারের কাহিনী-জাল বুনিতে থাকে।

মোনাদির এতক্ষণ মুখ খোলে নাই।

আমিরন বিবি বলিল, বাবা, একদম বেস্তার ব্যাটা। কথা বলো।

আজকে আসি, চাচী।

না, একটু বসো। কিছু খাও।

আমি ভাত খেয়ে এসেছি।

কোন প্রতিবাদ শুনিল না আমিরন। ডোলে করিয়া সামান্য মুড়ি তাহার সম্মুখে পরিবেশন করিল।

গরীব চাচী। কিছু কি ঘরে আছে, চাঁদ। তোমার চাচা আজ দু'বছর হোল ইন্তেকাল করেছে। ঐ হতভাগীকে নিয়ে জুলেপুড়ে মরছি। কথা শুনবে না, খালি গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।

জননী-কন্যার দৃষ্টি বিনিময় হইল। ভারী গম্ভীর হইয়া গিয়াছে আমিয়া।

তুমি কদিন এসেছো?

অনেকদিন হয়েছে গেল। মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে জবাব দিল মোনাদির।

ফুরসৎ নেই, বাবা। সকাল থেকে কত কাজ, গাই-গরু আছে একটা। মুরগী-হাঁস ছাগল-পাগল আর ঐ (আমিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ) পাগলী— আমার সংসারে এক ফোঁটা দম ফেলার উপায় নেই। খাঁ-পাড়ার মুখ দেখিনি ক'মাস।

মোনাদির অনুভব করিল, তার নূতন চাচী অনর্গল বকিতে অপটু নন। মাথা দোলাইয়া আমিরন নিজের কথায় সায দেয় : বেশ সুন্দর ছেলে। আমার দরিয়াবুবু কেমন? তার ছেলে রাজপুত্রের মত দেখতে হবে না?

লজ্জায় রাঙা হইতে থাকে মোনাদিরের কিশোর দুই কপোল।

কোন রকমে বেঁচে আছি, খোকা। কপালে মেহনৎ ছাড়া আর কিছু লেখন দিয়ে আসি নি। তোমার চাচা ভাল লোক ছিলেন। তোমার এই বাপের মত দশ চড়ে মুখ খুলত না। তার ফল আজ ভোগ করছি। দু'তিন বিঘে জমি ছিল, সব পরের গব্বে।

তারপর ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে কথা বলতে বলতে আঙুল বাড়াইয়া আমিরন আঙিনার ওপারে কয়েকটি খড়ো চাল দেখাইল।

ওই যে আশ্বিয়ার মেজ চাচা। একদম খান্নাস। বেওয়া মানুষ, তার দু'বিঘা মেরে নিলো। ফসল দিত না, শেষে লুকিয়ে রেজেস্টারি করে নিজের জমির সাথে ঢুকিয়ে দিলে। নিক্‌ হতভাগারা, আল্লা তার ইন্‌সাফ করবে। কত কত জিনিস আনে বাবা। এতিম মেয়েটার হাতে যদি একটু ছোঁয়ায়। স্বত্বে আছে কী?

মোনাদির শ্রিয়মাণ শিশুর মতই কাহিনী কান পাতিয়া শুনিতেছিল। আশ্বিয়াও তার মত এতিম। মনের কোনায় কোনায় মৃদু নিঃশ্বাস রুদ্ধ আবেগের ঝটিকা ফুৎকার রচনা করে। তবুও বিদায়ের জন্য উস্‌খুস্‌ করিতেছিল মোনাদির।

গেলো বছর বর্ষায় ঘরে একমুঠো চাল নেই। ধার করতে গেলাম। এক কুনকে চাল দিল না বেটি। একদিন উপোস করে মরি। আমার জমি নিলে, আমার পেটে দানা নেই।

আমিরনের চোখের কোনায় পানি জমিয়া উঠিতেছিল, আঁচলের খুঁট দিয়া মুছিতে লাগিল।

মোনাদির 'আসি চাচী' বলিয়া উঠিয়া পড়িল। আর কেউ হোক করুণ কাহিনীর শ্রোতা। কিছুই ভালো লাগে না তার।

আনমনা সড়কের সম্মুখে আসিয়া সে পিছনে তাকাইল একবার। কখন অজানিতে পিছু পিছু আসিয়াছিল আশ্বিয়া, সে লুক্কায় করে নাই। একবার উৎকর্ষ হইল মোনাদির। ই্যা, কান্নারই আওয়াজ। আমিরন চাচী মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে অশ্রু বিসর্জন দিতেছিল।

১৬

আমজাদ একদিন খবর আনিল, শৈরমীর পুত্র মারা গিয়াছে। তার পঙ্গু জীবনের অবসানে জননী অন্তত সোয়াস্তি পাইবে। দরিয়াবিবি পুত্রের সঙ্গে সেইসূত্রে নিজেদের বহু কাহিনী টানিয়া আনিল। বেচারী শৈরমী।

দরিয়াবিবি বলিয়াছিল, শৈরমীকে একবার ডেকে আনবি। মোনাদির ও আমজাদ বাগ্‌দী পাড়া হইতে পরদিন ফিরিয়া আসিল। শৈরমীও শয্যাশায়ী। প্রতিবেশীরা এতদিনে তার প্রতি কৃপাপরবশ। শৈরমীর দুরাত্মীয়া এক বিধবা নন্দ তার সেবা-পুশ্‌ষার ভার লইয়াছে।

আরো দুইদিন কাটিয়া গেল। আমজাদ রোজই তার খবর লইয়া আসে।

আজ অপরাহ্ণে আসিয়া সে বলিল, মা, শৈরমী পিসি আর বাঁচবে না।

বাঁচবে না! দরিয়াবিবি শ্রিয়মাণ মুখে পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

না গো, মা। একে পাৎলা চেহারা, রোগে-শোকে বুড়িকে চেনা যায় না।

দরিয়াবিবি এই বাগ্‌দী রমণীর সখিত্বের বহু স্মৃতি স্মরণ পথে টানিয়া আনিল। বন্ধক

ঘড়াটি আর ছাড়ানো হয় নাই। মাসে সংসারের খরচ বাড়িতেছে। আয়ের সংস্থান কোথায়? চন্দ্র কোটাল নূতন কোন ব্যবসা ফাঁদিবার আয়োজন করিতেছে। মূলধনহীন কোন ব্যবসা আরম্ভ করা যায় কিনা। কয়েক মাসে শুধু যুক্তি-পরামর্শই সার হইয়াছে। দরিয়াবিবি ভাবিল, সন্ধ্যায় একবার দেখা যাক, ঘড়া ছাড়ানোর টাকাটা যদি কোথাও থেকে যোগাড় করে আনতে পারি। প্রাচীন সামগ্রী ঘরছাড়া হইবে। কিন্তু শৈরমী কার কাছে বন্ধক রাখিয়া আসিয়াছে, সে জানে না।

দরিয়াবিবি আবার জিজ্ঞাসা করিল, বাঁচবে না?

আমজাদ মাথা দোলাইল, না গো, মা।

মোনাদির তার সঙ্গে গিয়াছিল, সেও মন্তব্য সমর্থন করিল।

ঘড়া চুলোয় যাক, একবার শৈরমীর সঙ্গে কি দেখাও হইবে না! এই চিন্তা দরিয়াবিবিকে বেশি পীড়িত করিতেছিল। বাগদীপাড়া দূর নয়। পনের মিনিটের পথ। গা ঢাকা অন্ধকারে অন্ধ ও পর্দা বাঁচাইয়া সে সহজেই শৈরমীকে দেখিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আজহার রাজি হইবে কী? এই একটি বিষয়ে দরিয়াবিবি আজহারকে ভয় করে। চাষী বাসীর সংসারে পর্দার অত ঝামেলা নাই। পাড়া পড়শীদের সঙ্গে দরিয়াবিবি স্বচ্ছন্দে দেখা করিতে যায়। কিন্তু ভিন পাড়ার, বিশেষ করিয়া বাগদীপাড়ার ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়িলে মুসলমান পাড়ায় আর তাদের কোন ইজ্জত থাকিবে না।

হৃদয়ের ঐশ্বর্য জাতি ধর্মের বালাই লুকাইয়া রাখে। শৈরমীর সরল প্রাণের পরিচয়পত্র যতই দরিয়াবিবির নিকট গাঁথা স্মৃতির সড়ক বাহিয়া উড়িয়া আসিতে লাগিল, সে ততই অস্থির হইয়া উঠিল। আমজাদের ছোট বেলায় একবার খুব ম্যালেরিয়া হয়। জীবনের কোন আশা ছিল না। শৈরমী প্রতিদিন তাকে দেখিতে আসিত। একদিন সে কয়েকটি বাতাসা আনিয়া দরিয়াবিবির হাতে দিয়াছিল।

কি হবে, শরীদি?

থোকাকে খাইয়ে দাও একটা।

কিসের বাতাসা?

শৈরমী মিথ্যা কথা বলে নাই। গ্রামের বারোয়ারীতলায় শিবালয়ে সে হরির লুট দিয়া আসিয়াছে আমজাদের নামে। তারই বাতাসা। ধর্মে বাধেই ত। দরিয়াবিবির মনেও ঝটকা লাগিয়াছিল। মরণাপন্ন পুত্রের শিয়রে দরিয়াবিবি কারো প্রাণে আঘাত দিতে রাজি ছিল না। যদি বাহার গায়ে 'বদদোয়া' লাগে। শৈরমীর সম্মুখেই সে আমজাদকে বাতাসা খাইতে দিয়াছিল। আল্লা কি মানুষের মন দেখেন না, যিনি সব দেখেন? অখ্যাত পল্লীর জননী হৃদয়েও সেদিন এই প্রশ্নই বারবার জাগিয়াছিল।

প্রত্যহ শৈরমীর জীবনের বহু অধ্যায় কল্পনায় পাঠ করিতে লাগিল দরিয়াবিবি। দুঃখের দিনে প্রতিবেশীদের কাছে যে লজ্জা বিরাট দীনতার প্রকাশ, দোসর পাইলে তার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। শৈরমীর মত দোসর দরিয়াবিবির দৈনন্দিতায় আকস্মিক আসিয়া জুটিয়াছিল।

তোর পিসি কথা বলতে পারে, আমজাদ?

বড় ক্ষীণ গলার আওয়াজ।

একবার তাকে দেখতে যেতে ইচ্ছে করে।

আমজাদও মুকুন্নি চালে বলিল, তুমি বাগদীপাড়া যাবে?

যেতে দোষ কী? তারা মানুষ নয়?

মোনাদির বলিল, মা, তুমি অভদ্র যেতে পারবে না, তোমার এই শরীর?

দরিয়াবাবি নিজের শরীরের দিকে চাহিয়া লজ্জিত হইল। তার স্কীত জঠর পুত্রের চোখেও ধরা পড়িয়াছে। আর এক সমস্যা। পূর্ণ গর্ভবতী একটি মেয়ে নিশাচর সাজিয়া বাগদীপাড়া গিয়াছে শুনিলে আজহার তাকে খুন করিয়া ফেলিবে। এই ব্যাপারে স্বামী কেউটে সাপের চেয়েও বিপজ্জনক। অথচ কত নিরীহ আজহার। এই নিরীহ লোকটি ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের ক্রটি দেখিলে কেন এইরূপ রক্তোন্মত্ত হইয়া যায়, দরিয়াবাবি ভাবিতে লাগিল।

পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল তিনজনের মধ্যে। আজহার ঘুমাইয়া পড়িলে আমজাদ, মোনাদির ও দরিয়াবাবি শৈরমীকে দেখিতে যাইবে। শুধু-হাতে রুগ্ন সখীর নিকট যাওয়া অশোভন। অন্তত দু'আনা পয়সা দরকার। যা হাত টান। সে ভার গ্রহণ করিল আমজাদ। আশেকজানের নিকট হইতে সে দু'আনা পয়সা আদায় করিয়া আনিবে।

সুযোগ আসিল সহজে। সারাদিনের ঝটুনির পর আজহার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সেদিন। তিনজনে গ্রামের অন্ধকার পথে পাড়ি দিল।

ফিস্‌ফিস্‌ কর্তে পথ চলার সময় দরিয়াবাবি জিজ্ঞাসা করিল, আমজাদ, পথ চিনিস? খুব। রোজ এই রাস্তা চম্বে ফেললাম।

মোনাদির পথটির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত নয়, সে চূপ করিয়া রহিল।

সরু সড়কের পাশে ঘন ঝোপ জঙ্গলবাসী আস্তাস বহিতেছিল। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির আকাশ বিহারের মত নেশা লাগে দরিয়াবাবির গায়ে। ঘরের আনাচ, কানাচ, বড়জোর প্রতিবেশীদের সীমানা ছাড়াইয়া পৃথিবীকে দেখিবার খুব বেশি সুযোগ ঘটে নাই তার।

গ্রহর দুই রাত্রি অতীত। চাষীদের সদরে পিদিম জ্বলিতেছে এখনও। তাসের আড্ডা চলিয়াছে বোধহয়। পথে লোকজন নাই। দরিয়াবাবি নিঃসঙ্কোচেই হাঁটিতেছিল। অন্ধকারেও সরু পথের গুহ্র দাগ চক্‌চক্‌ করিতেছে।

শৈরমীর ঘরে ঢুকিয়া দরিয়াবাবি শিহরিয়া উঠিল। ঝুপড়ি ঘর। পুরাতন হাঁড়িকুঁড়িপূর্ণ। ময়লা মাদুরের উপর আরো ময়লা একটি বালিশ মাথায় শৈরমী শুইয়াছিল। ঘরের চারিদিকে কোন জানালা নাই। ঝড়ের উপদ্রব জীর্ণ কুটিরের পাঁজরে সহ্য হইবে না, তাই এই ব্যবস্থা সহজে মানিয়া লয় গরীব কৃষকেরা। দম আটকাইয়া যাইতেছিল দরিয়াবাবির। তবু মমতার বিজয়ী আহ্বান সব অসোয়াস্তির চিহ্ন মুছিয়া ফেলে। শৈরমী চোখ খুলিয়া বিস্ময়ে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

দরিয়াবাবি ডাক দিল, সই।

শৈরমী জবাব দিল না। হাত-ইশারায় উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। দরিয়াবাবি দ্বিধাক্রান্ত করিল না। শৈরমীর আত্মীয়া শিয়রে বসিয়া পাখা দোলাইতেছিল।

দরিয়াবাবি জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছে?

কোথায় ভালো, মা।

আত্মীয়া মেয়েটি ম্রিয়মাণ কণ্ঠে জবাব দিল।

আবার ডাক দিল দরিয়াবিবি : সই। কেমন আছো?

গলায় কফ জমিয়াছিল শৈরমীর। ঘড়ঘড় শব্দ হয় শ্বাসনালীর ভিতর। সে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করিল।

নারীকণ্ঠের ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল : ভালো-ভালো।

আবার হাঁপাইতে লাগিল শৈরমী। বিধবা মেয়েটি আদিখ্যেতা শুরু করিল : কপাল দেখো, মা। গরীব আমরা, দেহটা যদি ভাল থাকে। শোকের ওপর আবার এই রোগ। ভগবানের কী ফুটো চোখও একটা আছে?

দরিয়াবিবির দিকে অদ্ভুত ক্লান্ত স্তিমিত দৃষ্টি মেলিয়া শৈরমী চাহিয়াছিল, চোখের পাতা আর পড়ে না। দরিয়াবিবিরও চক্ষু ফিরাইবার সামর্থ্য ছিল না যেন।

শৈরমী এবার গলা পরিষ্কার করিল কয়েকবার থক থক কাশিয়া।

সই, ভালো হই, যাব।

দরিয়াবিবি তার রেখাক্তি ময়লা হাতটি স্পর্শ করিয়া দেখিল। জ্বর নাই বোধ হয়। শীতল, ঠাণ্ডা হাত।

হ্যাঁ, এসো আবার।

মাথা দোলাইল শৈরমী।

সই।

সই।

তোমার ঘড়াটা, জয়া দাও ত। কথা বলিতে রীতিমত কষ্ট হইতেছিল শৈরমীর, ঘরের হাঁড়িকুঁড়ির জঙ্গলের দিকে সে হাত বাড়াইল।

আবার মৃদু ঠোট সঞ্চারিত হইল। আমি— আমি ছাড়িয়ে এনে রেখেছিলাম, টাকাটা আমার হাতে দিও।

শৈরমীর চোখের কোণ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। জয়া একটি পিতলের ঘড়া দরিয়াবিবির সম্মুখে রাখিল। সে-ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্যঞ্জনরত হইল।

শৈরমীর চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হয়, বহু-কখন প্রয়াসী সে। কিন্তু চুপ করিয়া রহিয়াছে। শ্বাসনালীর শব্দ আরো দ্রুত হইতেছে। বসিয়া রহিল দরিয়াবিবি নির্মম পাথরের মত। দারিদ্র্যের হিংস্র রূপ তার কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু এত বিভীষিকাময় তার অট্টহাস্য, দরিয়াবিবি আর কোনদিন শোনে নাই, শিহরিয়া উঠিতেছিল সে বারবার।

চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। ছেলে দু'টি নির্বোধ দর্শকের মত বসিয়াছিল। তাহাদের চোখের পাতায় ঘুম। দরিয়াবিবি আর বিলম্ব করিল না। জয়ার হাতে দুয়ানিটি গুঁজিয়া দিয়া বিদায় লইল। তবু একজন সমব্যথী পাইয়াছে শৈরমী। মেয়েটি ভিটার নিচে আগাইয়া আসিল।

কপাল মা। তবু ভিন পাড়া থেকে এসে দেখে গেলে। কেউ চোখও দেয় না। রাতটা কাটবে না। আর দেবী করব না। কফটা আবার এলো কিনা।

দ্রুত চলিয়া গেল জয়া।

ঘড়াটি মোনাদিরের বগলদাবা। আকাশে মেঘ জমিয়াছিল। চাঁদ আরো ঘনীভূত

অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে। জঠরের সন্তানের প্রতি মমতাবশতই বোধহয় দরিয়াবিরি সন্তর্পণে পা ফেলিতেছিল, নচেৎ চলৎ-শক্তি তার রহিত হইয়াছে।

ঘন বাঁশবনে বাতাসের আর্তনাদ মাথা কুটিতেছিল। হঠাৎ শৈরমীর ভিটা হইতে আকস্মিক রোদন নিনাদ শোনা গেল।

একবার থাম্, আমু।

দরিয়াবিরি ক্রমশঃ নিরস্ত হইয়া উৎকর্ষ হইল। জয়ার বুক ফাটা চীৎকার।

হ্যাঁ, চীৎকার।

আমু বলিল, মরে গেল গো পিসি।

দরিয়াবিরি দাঁড়াইয়া রহিল জড়পদার্থের মত। রক্তমাংসের নিচে মানুষে মানুষে সঙ্গীভূত হওয়ার যে পরিপ্লাবী উৎসধারা যুগ যুগান্তের শিকড় উৎপাটন করিয়া নব নব সভ্যতার বীজ ছড়াইয়া যায়— তারই সর্ব স্বীকারহীন চঞ্চল আর্তনাদ তরঙ্গের মত দরিয়াবিরির বুকে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। তারই আহ্বান ত এত নিশীথ রাত্রে ঘর ছাড়া করিয়া আনিয়াছে তার মত গর্ভবতী জননীকে।

দরিয়াবিরি শৈরমীর ভিটার দিকে মুখ ফিরাইল।

আমজাদ বলিল, কোথা যাও, মা। হিন্দুদের মড়া, হিন্দুদের ঘর, সেখানে গিয়ে তুমি কী করবে?

উচ্ছসিত কান্নায় বুক চাপিয়া পথের উপর বসিয়া পড়িল দরিয়াবিরি।

সকালে শৈরমীর মৃত্যু সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। দরিয়াবিরির কেমন মায়া বসিয়াছিল বাগ্‌দী এই রমণীর উপর। সাংসারিকতার ভিতরেও সেদিন মন হাল্কা করিতে পারিল না আজহার পত্নী।

মোনাদিরের জিড়েই বিকালে আশ্রয়ের বাড়ি গেল দরিয়াবিরি।

অবেলায় মুর্গী হাঁস লইয়া ব্যস্ত ছিল আমিরন। বহুদিন পরে দরিয়াবিরির আগমনে সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আশিয়া মোনাদিরকে দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

দুই পত্নী রমণী সংসারের খেদোক্তি জুড়িয়া দিল। মোনাদির-আমজাদ চূপ করিয়া বসিয়া থাকার পাত্র নয়। আশিয়ার সঙ্গে প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া তাহারা সড়কের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

পত্নীর এই অংশে গাছপালা থাকিলেও ঘন জঙ্গল মনে হয় না। আমজাদের এইজন্য এলাকাটা খুব পছন্দ। মার্বেল খেলিবার এমন সুপ্রশস্ত চত্বর অন্যদিকে নাই।

দুই ভাই খেলা করিতে লাগিল। আশিয়া দর্শক মাত্র।

গাবুর ভেতর মার্বেল 'পিল' করিতে করিতে মোনাদির বলিল, আশিয়া, তুই মখতবে যাস? মখতবে যাব না কেন? বুড়ো হোতে বসেছি, লেখাপড়া শিখব না?

বড় পাকা কথা। কথার চেয়ে ঝাঁঝ আরো বেশি। — আরে আমার দাদী সাহেবা।

কৈ চল, কী পড়িস দেখব।

মোনাদির মার্বেল খেলা ছাড়িয়া দিল।

চলো। আশিয়া হাত ধরিয়া সেদিনের মতই তাহাকে টানিতে টানিতে অঙ্গনে প্রবেশ

করিল। সে পড়ার বই বাহির না করিয়া একটি ছড়ার বই বাহির করিল মোনাদিরের সম্মুখে। শিশু-পাঠ্য, সুন্দর প্রচ্ছদপট, একটি পুস্তক। ছড়া ও ছবি-পূর্ণ। মোনাদির এমন পুস্তক পূর্বে দেখে নাই। বেশ মজা পাইতেছিল সে।

তুই, এই বই পড়তে পারিস?

ঠোট উন্টাইয়া আশিয়া জবাব দিল, পারব না কেন?

একটি ছড়া মিহি কণ্ঠে সে আবৃত্তি করিতে লাগিল।

বেশ ত। এই বই পেলি কোথায়?

মঞ্চতবে রহিম বক্শ চৌধুরীর মেয়ে পড়ে। তারই কোন আত্মীয় পুস্তকটা উপহার পাঠাইয়াছে।

মন্তব্যে মোনাদিরও পশ্চাৎপদ নয়।

তুই বেশ কাজের বুড়ি। পাকা বুড়ি।

মুখ ভেংচাইয়া উঠিল আশিয়া : বুড়ি বলবার কে তুমি? মোটে সাত বছর বয়েস।

আমজাদ সশব্দে হাসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ চলিল ছড়া পাঠ। অবেলার বাতাসে শিশু কণ্ঠের গুঞ্জন।

তুমি এসো আর একদিন, অন্য বই আনব।

আমজাদ মোনাদিরের কাছে নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। আগন্তুক বালকের উপর তার হিংসা হয়, কিন্তু তা নিবৃত্তির একটা সহজ উপায়ও সে এই কয়েক মাসে আয়ত্ত করিয়াছে। মার উপর তার দরদ ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। দর্শকের মত আমজাদ ছড়া পাঠের সভায় যোগ দিয়াছিল।

আমিরন চাচী হাঁক দিল এই হতভাগি, এই বই নিয়ে হল্লা কেন এত? কদিন বা তোকে মঞ্চতবে পাঠাতে পারব।

দরিয়াবিবি ধমক দিল : খামাখা তুমি মেয়েকে ধমকাও। বেশ লক্ষ্মী মেয়ে। চালাক, পড়াশুনায় ঝোঁক আছে।

চালাক। পাঁচ বছর বাদ বুকে পাথর হয়ে বসবে ঐ মেয়ে। বেওয়া মায়ের আবার স্নেহ যত্ন শাস্তি।

খোদার দিন খোদা চালায়। ভেবে ভেবে আমারও পাজরা ঝাঁঝরা হোয়ে গেল। ভাবি, দূর ছাই, আর চিন্তা করব না, তবু সব গোল পাকিয়ে আসে।

মোনাদির তখন একটি ছড়া আবৃত্তি করিতেছিল। শেষ হইলে আশিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, আর একটা পড়ো না মানু ভাই। তোমার মুখে বেশ মানায়।

প্রশংসায় মোনাদিরের বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। তবু ধমক দিয়া বলিল, হ্যাঁ, আর ফাজলেমি করতে হবে না। বদমাইস।

মোনাদির আর একটি ছড়া আবৃত্তি করিল। জননীদেব মध्ये তখন দুঃখ দারিদ্র্যের কথোপকথন চলিতেছিল। আমিরন চাচীর পাড়ার আত্মীয়রা মোটেই সদয় নয়। ভিটেমাটি ছাড়া হইলে, এই কয়েকটি গাছপালা ও পুকুর পুকুরিণীর উপর দৌরাঙ্গ করিতে পারিলে তারা সম্ভ্রষ্ট হইবে।

দরিয়াবিবি অতীত আত্মীয়দের ব্যবহারের স্মৃতি বয়ান করিত লাগিল।

বহুদিন এইদিকে দরিয়াবিবি আসে নাই। বড় পরিচ্ছন্ন আমিরনবিবি। দীনতার ভিতর এমন সৌন্দর্যের ভূষণা বাঁচিয়া রহিয়াছে। উঠান, ঘাটের পথ, দাওয়া ঝকঝকে; গৃহলক্ষ্মীর স্বর্গ রহিয়াছে মাচাঙ, সজী ও গাছপালার উপর।

সন্ধ্যা নামিতেছে। আর দেবী চলে না, ছড়ার আসরও ভাঙিতে হইল। মোনাদির এখানে পরিচিত মনের সন্ধান পাইয়াছে। কয়েকদিন আগেকার অসোয়াস্তি ভুলিয়া গেল। আদিয়া ও আমিরন সড়ক পর্যন্ত আগাইয়া আসিল।

সড়কে আবার ভারী হইতে থাকে দরিয়াবিবির মন। এতক্ষণ বেশ ছিল সে। শৈরমী শাকের বোঝা মাথায় অবসন্ন সন্ধ্যায় সড়কে হাঁটিতেছে যেন, তারই সম্মুখে।

১৭

শকরগঞ্জ আলুর চাষে অনেক লোকসান গিয়াছিল। চন্দ্র কোটাল হাসিমুখেই বলিল, খাঁ সাহেব, আমাদের কপালটা পাথর চাপা।

আজহার নিরুত্তর ছিল। সংসারে পোষ্য সংখ্যা বাড়িতেছে। আয়ের অঙ্ক যদি নড়চড় না হয়, বাঁচার আর কোন আশ্বাদ থাকে না।

চিন্তায় আজহারের ঘুম হয় না ঠিকমত। তার মস্তিষ্কের কলকজা এমনিই চালু নয়। মনের অন্ধকারে হামাগুড়ি দেওয়ার মধ্যেই সে শান্তি পায়।

চন্দ্র কোটাল অলস নয়। রোজগারের পেছা সে সহজে আবিষ্কার করে। আজহার অবাক হইয়া গেল। চন্দ্র কোটাল বাস্তব টিবির পাশেই আর এক চালাঘর তুলিয়াছে। তার ভিতর একটি ভাড়া হারমোনিয়াম, পুরাতন বেহালা, পরচুলা আর বাইজী সাজার পোশাক। চন্দ্র ভিতরে বসিয়া একজন যুবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিল।

এ কি, চন্দ্র? আজহার জিজ্ঞাসা করিল।

এসো, মাদুরের উপরে বসো। সব বলছি। একটা ভাঁড়-নাচের দল করলাম আবার।

আজহার মাদুরের উপর বসিয়া তামাক ফুঁকিতে লাগিল।

হ্যা হ্যা। শেষে আবার বুড়ো বয়সে এইসব কাজে হাত দিলে!

জঠরের উপর হাত বুলাইয়া চন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

বুড়ো বয়স। কিন্তু এই জায়গাটা বুড়ো হোতে জানে না।

আজহার বলিল, তোমাদের মহড়া চলছে?

চন্দ্র। খুব জোরে সোরে চলছে। এবার ‘বস্ত্রহরণ পালা’ করব।

আজহার। ওটা তুমি ভালই করতে। এত সাজগোজ। টাকা পেলে কোথা?

চন্দ্র পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকের পিঠে হাত থাপড়াইয়া জবাব দিল, এই যে আমার রাজেন্দ্র ভায়া আছে। ও বহুত দিন শহরে ছিল। শহরের ছাঁটকাট এনেছে কিন্তু পয়সা আনতে পারে নি।

রাজেন্দ্র এই গ্রামের কৃষক পল্লীর সন্তান। সত্যি তার ছাঁটকাট শহরে। পরনে ধুতি, গায়ে হাফ শার্ট। চুল দশ-আনা ছ’আনা।

রাজেন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিল, আর কেন ওসব চন্দ্রদা। এতেও যে পয়সা আসবে, মনে হয় না। তবে ফুর্তি করে দিনটা কাটানো যায়।

চন্দ্র। দাও না ভাই একটা গান শুনিয়ে।

তোঁবা বলিয়া আজহার মুখ কাঁচুমাচু করিল। রাজেন্দ্রের গান-গাওয়ার তেমন উৎসাহ ছিল না, গুণগুণ করিতে লাগিল। চন্দ্র একটু অপ্রস্তুত হইল বৈকি।

চন্দ্র। দেখো ঝাঁ ভাই, এবার যখন রাজেন্দ্রকে পেয়েছি, দল ঠিক চলবে। ওর হাত গলা দুই সমান চলে। বেহালার ছড়ি ধরতে ওর জুড়ি নেই। যাত্রার দল সব ‘ফেল’ মারবে। দেখো।

আজহারের এই আবহাওয়া ভাল লাগে না। কয়েকটি পুরাতন শাড়ি ঝুলিতেছিল আলনায়। জিজ্ঞাসা করিল, ওগুলো কী নাচের সাজ?

জবাব দিল চন্দ্র, হ্যাঁ। রাজেন্দ্র এনেছে সঙ্গে করে। আজহার সহজেই সবকিছু গ্রহণ করিতে পারিল না। রাজেন্দ্রের বদনাম অনেক। বাউরী পাড়ার একটি বিবাহিতা মেয়ে লইয়া সে উধাও হইয়াছিল দেশ হইতে সাত বছর পূর্বে। বাউরী মেয়েটির স্বামী ও দেবর গত বৎসর মারা গিয়াছে। নচেৎ রাজেন্দ্র দেশে ফিরিতে সাহস করিত না। তার প্রবাস জীবনের কত কাহিনী গুজবের আকারে পল্লীগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাউরী মেয়েটি এখন নিষিদ্ধ পল্লীতে আশ্রিত। রাজেন্দ্র তার উপার্জনে আশ্রিত। থিয়েটারের এক বাইজী রাজেন্দ্রের প্রেমে পড়িয়াছিল। তার পশ্চাতে সে খোয়ায় হইয়া বর্তমানে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। বহু টাকার মালিক রাজেন্দ্র দাস, অধর দাসের পুত্র। হাতেম বখ্স খাঁর সন্তানেরা শহরে তার কল্যাণে ময়ূর উড়াইয়া বেড়াইতেছে কার্তিকের মত। গুজবের শেষ নাই।

এইজন্য আজহার পরিচয় পাইয়া বড় বিগড়াইয়া গিয়াছিল মনে মনে। রাজেন্দ্রকে চেনা দায়। রংটি ফর্সা। শহরের ছায়ায় আরো জৌলুস খুলিয়াছে; সংলাপে কৃষক পল্লীর কোন খুঁ পড়ে না। যেন কতদিন সে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে।

এমন লোকের সঙ্গে চন্দ্র জঘন্য ব্যবসা ফাঁদিতে গেল! কোটাল নেশা করে, সুতরাং অচিরেই সে গোলায় যাইবে। মুখ ফুটিয়া আজহার কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

চন্দ্র কোটালের উৎসাহের অন্ত নাই। সুদীর্ঘ গৌফে সে ঘন ঘন তা দিতে লাগিল।

দেখো আজহার ভাই, এবার ফসল যদি ভাল হয়, আমাদের বায়নার অভাব হবে না।

ফসল আল্লার মেহেরবাণী। নিস্তেজ কণ্ঠে জবাব দিল আজহার।

রাজেন্দ্র হারমোনিয়াম টানিয়া রীড় টিপিতে লাগিল। পড়ন্ত দুপুর। চন্দ্র কোটাল মাদুরের উপর তাল দিতে ব্যস্ত। আজহারের মুখে কোন কথা নাই।

আজহার ভাই— চন্দ্র মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া উঠিল।

আজহার কিছু বুঝিতে পারে না। নূতন রোজগারের পছন্দ জুটিয়াছে। মরীচিকার স্বপ্নে চন্দ্র কোটালের মুখে আনন্দের বন্যা আসিয়াছিল। নিষ্ক্রিয় আজহারকে সে ডাক দিল, কিন্তু তার মধ্যে বিদ্বেষের ভাব প্রচ্ছন্ন। আজহার ইহার বিন্দু-বিসর্গ উপলব্ধি করিতে পারিল না।

তোমার সঙ্গে আমার আরো কথা আছে, চলো, আজহার ভাই। রাজেন্দ্রের দিকে কোটাল দৃষ্টি বিনিময়ের সাহায্যে তাকে অপেক্ষা করিতে বলিল।

ঝাঁ সাহেব, তুমিও আমাদের দলে ঢুকে পড়ো।

আজহার চন্দ্রের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

কোটালের দাওয়ায় বসিয়া আজহার আরো বিস্মিত হইল। শ্রী লাগিয়াছে তার ঘরে। বাঁশের নড়বড়ে খুঁটি বদলাইয়া একটি কাঠের খুঁটি লাগাইয়াছে সে। আলু চাষে নিশ্চয় কোটাল তাকে ফাঁকি দিয়াছে। চন্দ্রমণির অসুখ সারিয়া গিয়াছে। সাদা পরিষ্কার থান কাপড় পরনে। খানিক আগে পান খাইয়াছিল। রাঙা ঠোঁটে তাকে বেশ মানায়, দুই সম্ভানের জননী বলিলে ভুল করা হইবে। আজহার কোটাল সম্বন্ধে কোন নীচতা মনে প্রশ্রয় দিতে পারে না। ফাঁকি দেওয়ার লোক সে নয়। নূতন দলের জন্য রাজেন্দ্র বোধহয় খরচ করিতেছে। তার সম্বন্ধে এত শুজব, তবে ভিত্তিহীন নয়।

আজহারের অভ্যর্থনার ক্রটি হয় না কোথাও। কোটাল বলিল, আজহার ভাই, সত্যি, বুড়ো বয়সে কোমর নাচান আর ভাল লাগে না। রাজেন্দ্র ছোঁড়াটা ধরে বসল। দেখি কপাল ঠুকে—যা আছে ভাগ্যে।

চন্দ্র কোটাল পূর্বে ভাঁড়-নাচের দলে কাজ করিত। দশ-বিশ মাইল দূরে গঞ্জে গঞ্জে তাহাদের ডাক পড়িত। এমন প্রবাস জীবনের সময় এলোকেশীকে সে এক মাহিষ্য বাড়িতে সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছিল। এলোকেশী তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়। রাজেন্দ্রের কীর্তিকলাপের খোঁটা দিয়া চন্দ্রের নিকট আজহার কোন অভিযোগ করিতে সাহস করিল না।

স্তিমিত স্বর আজহারের : চেষ্টা করে দেখো। আমার সঙ্গে আর একটা চাষ বাস করো।

নিশ্চয় নিশ্চয়। জাত ব্যবসা আমি ছাড়ব না। ওটা ত বাড়তি কাজ। বায়না পাব, কি না পাব কে জানে।

সংসারে আর ভাল লাগে না।

আমারও ওই দশা।

চন্দ্রমণি বেশ ফুটফুটে প্রজাপতির মত। স্বাস্থ্যের জৌলুসের সঙ্গে তাকে আরো সুন্দরী মনে হয়। ছেলে দুইটি উঠানে লাফালাফি করিতেছে। আজহার কল্পনায় এমনই সাংসারিক চিত্র আঁকিতে লাগিল। তার সংসারে কী স্বাচ্ছন্দ্যের এমন হাওয়া লাগিবে না?

তামাক নিঃশেষ করিয়া আজহার উঠিয়া পড়িল। বলিল, ভেবে দেখো, চন্দ্র। যদি পুঁজি পাও।

আচ্ছা, আচ্ছা।

কোটালের কণ্ঠস্বরে আনন্দের উচ্ছ্বাস। হিংসা হয় আজহারের মুহূর্তের জন্য।

মাঠের নিঃসঙ্গ পথে গুদাসীন্দের বোঝা আজহারের বুকে জগদলের মত চাপিয়া বসিতেছে যেন। হারমোনিয়ামের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল। জুড়ি গান ধরিয়াছে রাজেন্দ্র ও চন্দ্র কোটাল।

১৮

আঁতুরঘরে আর কোন দিন এত দীর্ঘকালব্যাপী দরিয়াবিবিকে পড়িয়া থাকিতে হয় নাই। সূঠম স্বাস্থ্য তার। পাঁচ দিন পার হইলেই সে আবার সংসার গুছাইয়া লইত। আসেক্জান

এই কয়দিন তাকে সাহায্য করিত। বর্তমানে তার দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত। অকেজো বুড়ি সংসারের কোন কাজে লাগিল না। আমিরন চাচীর শরণাপন্ন হইল আজহার খাঁ। সেও বিধবা মানুষ। সংসারের আগল পাগল লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু আমিরন-চাচী সহজে রাজি হইয়া গেল। তার সিদ্ধান্ত সত্ত্বে সংসার-শৃংখলার ছবি আঁকিয়া লইল। গরু দু'টি এই কয়েকদিন আর মাঠে ছাড়া হইবে না। গোয়ালে শুইয়া শুইয়া খড় খাক্। মুরগি হাঁস আখিয়ার তদারকে। নিশ্চিন্ত আমিরন চাচী।

দরিয়াবিবি কৃতজ্ঞতায় ডুবিয়া গেল।

আসেকজানের ঘরটি বর্তমানে আঁতুরঘর। অন্ধকার। দিনের আলো সঁধোয় না। কোণে কোণে পুরাতন ঝুল জমিয়া রহিয়াছে। অশ্বাস্থ্যকর গন্ধে দম বন্ধ হইয়া আসে। ইহার ভিতর দরিয়াবিবি শুইয়াছিল। পাশে সদ্যোজাত শিশু মেয়েটি। অর্ধ পরিকৃত ন্যাকড়ায় প্রস্তুত কাঁথার উপর যেন পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মা'র আদল নবজাতকের চোখে-মুখে।

দরিয়াবিবি শিশুর দিকে চাহিয়া বলিল, আমি বুবু, তোমার দয়ায় এ যাত্রা হয়ত বেঁচে যাব।

ছি ছি, বুবু। তোমাকে শক্ত মেয়ে মনে করতাম। তুমি এত কাতর হোয়ে পড়ছ?

আর কোন দিন এমন হয় নি। শরীর খুব ভাল ঠেকছে না।

দাওয়ায় আস্তানা পাতিয়াছিল আসেকজান। তার কানে কথাটা সহজে প্রবেশ করে। সে খেদোক্তি আরম্ভ করিল : আমারও নসীব, বৌ। চোখের মাথা খেয়ে বসে আছি। আগে তবু ফাই-ফরমাস এই অকালে গুনতে পারতাম।

দরিয়াবিবির জ্বর হইতেছিল অল্প অল্প। কবিরাজ আসিয়াছিল একদিন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডিস্পেন্সারি হইতে বর্তমানে ঔষধ আনা হয়। কবিরাজের ঔষধে কিছুই ফল হইল না। কিন্তু ডিস্পেন্সারি প্রায় তিন মাসের দূরে। আমজাদ ও মোনাদিরের মুখ রৌদ্রের তাপে শুকাইয়া যায়। আজহার খাঁ জমির কাজ ও টাকা ঋণের উপায় লইয়া ব্যস্ত। সংসার লগুঙও। সময় মত সকলের খাওয়া হয় না। নসীমার দুই চোখে এমন পিঁচুটি জমে যে, দুপুরের আগে সে চোখ খুলিতে পারে না। দাওয়ায় বসিয়া আসেকজানের নিকট সে নাকি কান্না কাঁদিতে থাকে। শুইয়া শুইয়া দরিয়াবিবি তিরস্কার করে। তখন মুহূর্তের জন্য সে থামে। আবার শুরু হয় ক্রন্দন।

আমিরন চাচীকে কোন দোষ দেওয়া চলে না। গৃহিণীপনায় সে কম নয়। পরের সংসার অনভ্যাসের ফলেই গুছাইতে এত বিলম্ব।

মোনাদির স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মা'র পাশে গিয়া আর বসিয়া থাকিতে ভালবাসে না। দরিয়াবিবির আহ্বানে সাড়া দিলেও, কোন উৎসাহ পায় না সে। এই আবহাওয়া সে যেন বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু বোনটির দিকে চাহিয়া সে এক রকমের লজ্জা অনুভব করে। কোন সচেতন কারণ অবশ্য তার উপলব্ধির বাহির। সৌন্দর্যের পুত্তলি। মোনাদিরের দুই চক্ষু কোন আনন্দের উপকরণ খুঁজিয়া পায় না। এইজন্য মোনাদির পাড়ার গাছ-গাছালির তলায় বেশিক্ষণ থাকিতে ভালবাসে। সঙ্গে আখিয়া বা আমজাদ। অথচ মা'র ফাই-ফরমাসের জন্য এই সময় তাদের ঘরে থাকা উচিত।

খোলা টাটির ফাঁক দিয়া বাহিরের জগৎ যা দরিয়াবিবির চোখে পড়ে। কর্মনিষ্ঠ, চঞ্চল তার মনও স্থিতি পায় না এই অন্ধকারে। শুইয়া শুইয়া খবরদারী গ্রহণে তার

কার্পণ্য নাই। মুনি খেয়েছে কিনা, আমু কোথা, নঈমার চোখ কি রকম। হাজার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন। জেলা বোর্ডের ডিস্পেন্সারির ডাক্তার বিছানায় শুইয়া থাকিতে আদেশ দিয়াছিল। প্রসূতি কতটুকু বা তা পালন করিতে পারে? উঠিতে হয় বৈকি দরিয়াবিকেকে। আমিরন চাচী এই জন্য বড় বিব্রত। প্রস্রাব পায়খানা ফেলিবার ভারটুকু সে অতি কষ্টে দরিয়াবিকের নিকট হইতে গ্রহণ করিল।

তুমি ভাল হোয়ে নাও তারপর শোধ দিও।

শোধ! বলিয়া মুখ কুঞ্চিত করিল দরিয়াবিকি। নবজাতক হাত পা নাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতে সে তাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। পুরাতন সূত্রের আবার খেই চলে : শোধ এ-জন্মে নয়। আমার মোনাদিরটা বড় হোক।

চুপ করিয়া গেল দরিয়াবিকি। মাথার যন্ত্রণা হইতেছে।

আমিরন বিবি জিজ্ঞাসা করিল, একটু মাথা টিপে দিই?

না। তুমি রান্না সেরে ফেল।

হ্যাঁ, সেরে ফেলি। এক দৌড়ে বাড়ি যেতে হবে। ডাবায় পানি দিতে বলেছিলাম গরু দুটোকেও কী ছোট বালুতি করে পানি তুলেছে কিনা কে জানে। সারাদিন শুকিয়ে মরবে।

তা যেয়ো। তুমি যা দিলে বোন, শোধ-শোধ আর ইহজন্মে কেউ করতে পারে না।

এত কাঙালীপনা কেন? অথচ দরিয়াবিকির প্রশান্ত মনের সম্মুখে ঝড়-ঝঞ্ঝা কত তুচ্ছ। কাতুরে কিশোরীর মত দরিয়াবিকি।

কিছু ভেবো না। সব দুঃখ আল্লাই তরাবেন।

আল্লা-আল্লা।

বিদ্রূপের ঝুঁকি খুলিয়া গেল দরিয়াবিকির মুখের উপর।

আল্লাই যদি সব করেন, তবে আমাদের এত দুঃখ দিয়ে কী পান তিনি? আমার ঈমান নেই, নষ্ট হোয়ে যাচ্ছে বুঝ।

ছি, ও কথা মুখে আনতে নেই।

থাক আল্লা। রোগ হোলে ওষুধ খেলে ভাল হয়।

এই ভাল হওয়ার রাস্তাটা ত মানুষকে খুঁজে বের করতে হোয়েছে। ওটা ত আল্লা মগজে ঢুকিয়ে দেননি। তবে আর আল্লার কথা কেন মুখে। দুনিয়ার দুঃখকষ্ট রোগবলাই সবকিছুর পিতিকার আমাদেরই করতে হবে। আল্লা থাকে থাক্, না থাকে না থাক্। দু'তিন বছরে আমার ঈমান গেছে।

স্তম্ভিত আমিরন চাচী!

কি বলছো রোগের ঝোঁকে! ওসব আমি বুঝি নে।

দরিয়াবিকি ক্লিষ্ট বেদনায় চোখ বন্ধ করিল। তার জগতের উপর কাল ছায়া নামিয়াছে।

আবার উন্মীলিত পক্ষ দৃষ্টি আমিরনের সর্বাঙ্গ কৃতজ্ঞতায় লেহন করিতে থাকে।

রাগ করো না, বুঝ। তুমি নামাজ পড়ো। আমি পড়া ছেড়ে দিয়েছি। মন বসে না।

খামাখা যাতে মন নেই, তা করে কোন লাভ নেই।

আমিরন চাচী দরিয়াবিকির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, এখন চুপ করো। তোমার মাথা ঠিক নেই।

হুঁ!

পায়ের গাঁটে অসহ্য যন্ত্রণা, সটান পা লম্বা করিতে লাগিল দরিয়াবিবি।

ঘুমোও তুমি। আমি কাজ সেরে আসবো।

খোকাদের একটু ডেকে দাও।

আচ্ছা, বলিয়া আমিরন বিবি রান্নাঘরের দিকে নিভ্রান্ত হইল।

খোকারা কেউ এই তল্লাটে ছিল না। হাসুবৌ মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর লইয়া যায়। দরিয়াবিবির শারীরিক পরিচর্যা সে ফুরসৎ মত সম্পন্ন করে। বেশিক্ষণ বাহিরে থাকার যো নাই তার। শাওড়ী এই নির্বোধ রুগ্ন বধূটিকে চোখে চোখে রাখিতে চায়। জীন-ভূতের পাল্লায় সর্বনাশ হইতে চলিয়াছে তার। সংসারে বংশধর না আসিলে পুত্র আর ঘরমুখো হইবে না। বধূর উপর খর মেজাজ ফলাইলেও সাকেরের মা আসলে করুণা-পরবশ। ছেলেগুলিকে কয়েকদিন নিজের কাছে রাখিতে চাহিয়াছিল হাসুবৌ। দরিয়াবিবি রাজি হয় নাই। তাহাদের সংসারও খুব সম্ভল নয়। আত্মীয়তার দৌরাণ্ডে মনের সাধারণ মিলটুকু পাছে হারাইতে হয়, দরিয়াবিবি সে আশংকা করিয়াছিল। কিন্তু তার পুত্রবধূ গাছ-গাছালির উৎসঙ্গে আদর না পাইলে হাসুবৌর কাছেই ছুটিয়া যায়, সেখানে আহালাদি করে না। মোনাদির মা'র কড়া হুকুম পালন করিত। হাজার সাধাসাধির পরও সে হাসুবৌর বাড়িতে কোন খাবার হাতে লইত না।

কাঁচা দুপুরে তারই অভিনয় চলিতেছিল। হাসুবৌর হাতে কয়েকটি সন্দেশ। তক্তপোশে আমজাদ, আমিয়া ও মোনাদির।

হাসুবৌ। লক্ষ্মী ছেলেদের মত খেয়ে ফেলো। 'হাম্ হাম্' শব্দ করিল হাসুবৌ।

না, আমি খাব না। মা বকবে।

মা দেখতে আসছে নাকি?

এরা বলে দেবে।

ওরাও যে খাবে।

মোনাদিরের আর কোন ভয় নাই। হাত পাতিয়া সে সন্দেশ গ্রহণ করিল। তারপর যৌথ 'হাম্-হাম্'র পালা। হাসুবৌ হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

সাকেরের মা ঘরে ঢুকিয়া একচোট হাসিয়া লইল।

বৌমা রান্নাবান্না দেখো। অভাগীর বেটী কপাল এনেছি' কী, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করবি।

হাসুবৌ পাথর হইয়া যায়। আমজাদ ইত্যাদিরা সন্দেশে কামড় দিয়া বসিয়া থাকে, আর মুখ নড়ে না।

আপন মনেই বকিতে লাগিল বুড়ি : যত-সব অভাগীর কপাল। একটা ছেলের হা-পিত্যেশ মিটল না। সাকেরটা গেছে কোথা লাঠি নিয়ে! কোনদিন কী কপালে আছে আল্লা জানে।

বাহির হইয়া গেল বুড়ি। বুড়ি ত নয়, আপদ! ঘরে আবার হাসির হব্বা।

মোনাদির একটি গল্পের বই পড়া শুরু করিল। সকলে মন দিয়া শোনে। হাসুবৌ মোনাদিরের নিকটে। তার চাল-চলন, পঠন-ভঙ্গী বড় সুন্দর দেখায়।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মোনাদির পল্ল শেখ করিয়া বাহিরের দিকে চাছিল। দুপুর চলিয়া পড়িতেছে। না, আর বস। বায় না। ক্ষুধা লাগিয়াছে তার।

আমিয়ারকে সে বলিল, চল না, বাড়ি যাবি না?

চলো না, মুনি ভাই।

হাসুবৌ বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া বলিল, আমি, ভুই যেতে চাস, যা। আবার গুকে কেন টানাটানি!

আমি ওর সঙ্গে যাব। কাঁচুমাচু হাইয়া আমিয়া জবাব দিল।

না, আমিও যাব।

মোনাদির তত্ত্বপোশ হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। হাসুবৌ আক্কেশ বিকল দেখিয়া অনুকূল কণ্ঠে বলিল, মুনি, দরিয়াবুবুকে দেবে আসব।

তবে চলো।

খুব উৎসুক নয় মোনাদির। স্বাভাবিক শালীনতা যেন সে এই বয়সে আয়ত্ত করিয়াছে। হাসুবৌ জবাব দিল : আমি তোমাকে হেঁটে যেতে দিচ্ছি নে, আমার কোলে চড়ে। দেখি, সোনা।

বাধা দিল মোনাদির : আমি কি ঝোঁড়া, না আমার পায়ে মেহদী দিয়েছি?

কোন বাধা হাসুবৌ স্বীকার করিল না। মোনাদিরকে সে কোলে তুলিয়া নইল।

আমজাদ 'ফুট' কাটিল : খেড়ে ছেলে কোলে উঠেছে।

শাসাইয়া জবাব দিল হাসুবৌ, তোর কী রে! দুষ্ট এগার বছর বয়সে যদি খেড়ে, তুই কী?

মোনাদির কোলে চড়িয়াছিল, কিন্তু আরাম নাই তার বুকে। পান্ডার লোকে হাসিবে কৈকি!

পয়ন-উদ্দেশ্য পা বাড়াইয়া হাসুবৌ মোনাদিরকে বলিল, নন্দী, আমার গলাটা জড়িয়ে ধরো, না হলে আছাড় বেয়ে পড়ে যাবে।

ঘরে আদৌ মন টেকে না মোনাদিরের। হাসুবৌ দরিয়াবিবির মাথা টিপিয়া দিতেছিল। মোনাদির কয়েক মিনিট মার সঙ্গে বাকগলাপ করিয়া উঠিয়া গেল। আমিঘর চাচী সকলের খাবার দিতেছিল। আজহাঘের ভাত রান্নাঘরে চাপা থাকে। মঠের কাজ ছাড়া চন্দ্র কোটালের সঙ্গে সে কোথায় কী করিতেছে তার কেউ হৃদিস জানে না।

বাওয়া শেষ হওয়ার পর মোনাদির একটির মার ঘরে টুকি দিয়া পান্ডায় উঠাও হইয়া গেল। আমিয়া দুপুরবেলা ঘরে গিয়াছে, সেদিকেই বেলা ভাল জমিবে।

হাসুবৌ ডাক দিয়া কোন সাড়া পাইল না। দরিয়াবিবি বিস্ময় মুখে বলিল, আমি কিছুনাশ পড়া-অন্নি ওর যে কী হয়েছে।

হাসুবৌ জবাব দিল, এই কদিন আমার কাছে না হয় থাকত। তুমি আবার রাজি হও না।

না বৌ, সে হয় না। একে অনেক কষ্টে ও ফিরে এসেছে। আমার চোখে চোখে থাক।

খুব ত তোমার চোখে চোখে আছে!

হাসুবৌ ঝানিক পরে চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় কিন্তু এলোমেলো সাংসারিক জটাজাল কুঞ্জী পঞ্চাইয়া গেল।

ভর সন্ধ্যা। তবু একটি ছেলে ঘরে ফেরে নাই। আসেক্জান আজকাল রাত্রি কাটাইবার সুযোগ অন্য কোথাও পাইলে এখানে থাকে না। কী বা সাহায্যে লাগে সে। নঈমা দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইতে জানে শুধু। সন্কার পর সে-ও ভাল দেখিতে পায় না। হাসপাতালের ডাক্তার চোখ দেখিয়া পথের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। অত পয়সা খাঁ-পরিবারে কারো নাই যে, আহাৰ্য রোগের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হইবে। আমিরন চাচী মুরগি-হাঁস তুলিতে কিছুক্ষণের জন্য বাড়ি গিয়াছে।

দরিয়াবিবি করুণ স্বরে ডাকিতেছিল, একটু পানি দিয়ে যা—। কণ্ঠস্বর তার রোগে-শোকে ক্ষীণ। অনেকক্ষণ কারো জবাব না পাইয়া সে প্রাণপণে একবার চীৎকার করিয়া উঠিল, তোরা কী মরে গেছিস সব?

নঈমা জবাব দিয়াছিল। অক্ষমের আর কোন চারা নাই। এই সময় আজহার খাঁ ফিরিয়া আসিল। তখনও তার কাঁধে লাঙল। দরিয়াবিবির আত্ননাদ শুনিয়া আজহার আর গোয়ালঘরে লাঙল রাখিতেও যায় নাই।

কি হলো, দরিয়াবৌ?

একটু পানি।

উঠানেই লাঙল রাখিয়া কলস হইতে পানি গড়াইল আজহার। দরিয়াবিবি নিশ্চিন্তে পান সমাধা করিয়া গ্লাস স্বামীর হাতে দিয়াছে, দেখা গেল উঠানের উপর আমজাদ একটি কঞ্চি হাতে অগ্রসর হইতেছে, পশ্চাতে মোনাদির।

গ্লাস মাটিতে নামাইয়া আজহার খাঁ তীরবেগে ছুটিয়া আসিল, কোথায় ছিলি হারামজাদা? দাঁড়া—বলিয়া সে আমজাদের কান ধরিয়া চুপুটিঘাত ও পরে আছাড় দিয়া উঠানে ফেলিয়া দিল। ইহার পর শুরু হইল মোনাদিরের উপর ঐ প্রচণ্ড শাস্তি। হাতের কঞ্চি লইয়া আজহার খাঁ দুইজনকে একই সঙ্গে প্রহার শুরু করিল : যত সব পর-খেগো হারামীর বাচ্চা। খেয়ে টইটই ঘুরে বেড়াবে। শুয়োরের বাচ্চা, মরো নি তোমরা—।

নঈমা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। তার পরিবেশে কী ঘটিতেছে সে না দেখিলেও নির্মমভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল। তারই ফলে ক্রন্দন ও চীৎকার।

আজহার খাঁ ছুটিয়া আসিয়া তাকেও দু'ঘা চাব্কাইল।

উঠানে হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গিয়াছে। নিরীহ আজহার খাঁ, সে হঠাৎ এমন পাষাণ হইতে পারে, কল্পনার বাহিরে।

দরিয়াবিবিও বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। সেও চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে : দাঁড়াও, তোর মরদের গুপ্তিতুষ্টি করেছে। এত বড় বৃকের পাটা, আমার ছেলেদের গায়ে হাত—।

ছুটিয়া আসিল দরিয়াবিবি উঠানের উপর। দাওয়ার উপর হইতে পীড়িত শরীরে কিরূপে অবতরণ করিল, সেই মুহূর্তটুকু তার জবাব দিতে পারে।

আজহার রণে ভঙ্গ দিয়া লাঙল কাঁধে দহলিজের দিকে চলিয়া গেল।

উঠানের উপর ধূলি-লুপ্তিত অবস্থায় মোনাদির ও আমজাদ। কয়েক জায়গা ফাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে শরীর হইতে।

দরিয়াবিবি আগাইয়া আসিবার পূর্বে স-চীৎকার মূর্ছিত হইয়া পড়িল মাটির উপর।

একটু পরে আসিল লণ্ঠন-হাতে সাকের, হাসুবৌ ও তার শাশুড়ী।

আমিরন চাচীর সেবার অপূর্ব দক্ষতায় এই যাত্রা সত্যি বাঁচিয়া গেল দরিয়াবিবি। গরীবের সংসারে বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে শুধু মনের জোরেই নিজকে চাঙ্গা করিয়া তুলিল খাঁ-পত্নী। এই তিন সপ্তাহে সে আরো একটি দোসর পাইয়াছে জীবনে—আমিরন ও আশিয়া। রোগ-শয্যায় শৈরমীর দীন-মৃত্যুচ্ছবি দরিয়াবিবির মানসপটে ফুটিয়া উঠিত। হয়ত তেমন মৃত্যু হইবে তার। আমিরন চাচী ধীরে ধীরে তার মানসিক স্বাস্থ্যও ফিরাইয়া আনিয়াছে। নূতন কচি মেয়েটির দিকে চাহিয়া দরিয়াবিবি ক্ষুদ্র মনে মনে। এই রূপরাশি দরিদ্রের কুটিরে তামা হইয়া যাইবে। আমজাদ ও মোনাদিরকে লক্ষ্য করিয়া দরিয়াবিবি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

এই কয়েকদিনে পুরাতন স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিত দরিয়াবিবির। মোনাদির তাকে দাগা দিয়া গিয়াছে। তার কোন খোঁজ নাই। মার খাইয়া সে বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। পরদিন ভোরবেলা হইতে সে নিরুদ্দেশ। সাকের দরিয়াবিবির আগেকার বাড়িতে সন্ধান লইয়াছিল। মোনাদির সেখানে যায় নাই।

কান্নাকাটির কসুর করিল না দরিয়াবিবি। আজহারের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দৈনন্দিনতার চাকায় মিশিয়া গিয়াছিল দরিয়াবিবি। স্ত্রীর সমস্ত কর্তব্য সে সম্পন্ন করে। কিন্তু নির্বাক। তার নির্মম মুখের দিকে চাহিয়া আজহার কথা বলিতে সাহস করে না। সংসারে দুই জন জীব একসঙ্গে বসবাস করিতেছে মাত্র। পশুর মত একে অপরের ভাষা বোঝে না, সেইজন্য বাক্যালাপেরও কোন প্রয়োজন নাই।

চন্দ্র কোটাল ভাঁড়-নাচ লইয়া খুব মজিয়াছিল। কয়েকটি মঞ্চে ইতিমধ্যে সে আসার জমাইয়া আসিয়াছে। দরিয়াবিবির জন্মের সময় এলোকেশী চন্দ্রমণি কয়েকদিন আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিল। মোনাদির আজহারের তিরস্কারে এই ঘর পরিত্যাগ করিয়াছে, তাও জানিত চন্দ্র কোটাল। কিন্তু তা লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিঃশব্দের পাহাড় মাথা তুলিয়াছে, এই সংবাদ তার জানা ছিল না।

আজহার একদিন সমস্ত বৃত্তান্ত কোটালকে বলিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

তোমারও রাগ আছে তা হলে?

হাসিতে লাগিল চন্দ্র। মেনি বিড়ালেরা মাঝে মাঝে রুই মাছের মুড়া গিলিয়া ফেলে। আজহার রাগিতে পারে, আশ্চর্যের বিষয় নয়।

হঠাৎ, অমন মারা উঠিৎ হয়নি।

ভাবীর পায়ে ধরেছো?

গোপে তা দিতে লাগিল চন্দ্র।

তৌবা। তুমি একবার গিয়ে বলো, এমন করে সংসার চলে?

চলুক। বেশ ত, দশ বছর কথা বলেছ, এখন কথা না বললে চলবে না?

দূর পাগল।

এইবার ভাল ফসল হইয়াছিল। আজহার খুব সংসার-বিবর্ত নয়। কল্পনায় ছবি আঁকিতে সে-ও ভালবাসে।

চন্দ্র কোটাল সেইদিন দরিয়াবিকে হাস্য-কৌতুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।
ভাবী, আমার ভাঁড়-মাচ তোমাকে দেখাতে পারলাম না। যা ধর্মের কড়াকড়ি তোমাদের।
একদিন দেখে আসব তোমার বাড়ি গিয়ে। টাঁটির আড়াল হইতে দরিয়াবির জবাব দিল।

আমার সঙ্গে কথা বলছ। আর খাঁয়ের সঙ্গে কেন কথা নেই?

চুপ করিয়া গেল দরিয়াবিবি। একটু পরে আসিল উত্তর, আমার ছেলেকে যদি কেউ তাড়িয়ে দেয়—

সেটা নিশ্চয় অপরাধ। আমি যদি মূনি বুড়োকে এনে দিই।

আসে এনে দাও।

নিশ্চয় এনে দেব। নিশ্চয়।

আমজাদকে মারল, আমি রাগ করিনি। কিন্তু একটা হতভাগ্য এখানে ঠাঁই নিজেছিল, তার উপর হাত চালালে। আমার দিকে একবার দেখলে না।

সেটা ভারী অন্যায় করেছে।

চন্দ্র কোটালের বাক্য সমাপ্ত হওয়ার আগে দরিয়াবির বলিতে লাগিল, বড় দুষ্টী আমার মূনি, তার গায়ে হাত দিলে—হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল দরিয়াবিবি। চন্দ্র কোটাল তা উপলব্ধি করিতে পারে। হাস্যপ্রিয় তার মত ক্ষুদ্রাঙ্গী আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

দহলিজে ফিরিয়া আজহার খাঁকে মেসুর ধমক দিল।

সত্যি বাঁ ভাই, ভারী অন্যায় করেছে। বোকা না ছেলের মায়া?

আজহার গুড়ুক ফঁকিতেছিল। রিলদের মত নিজেজ দুই চকু বুঁজিয়া সে জবাব দিল, হঁ।

চন্দ্র কোটাল আজ হরিয়া গিয়াছে। সে চুপ করিয়া রহিল।

যোজ করে দেখো না, চন্দর।

আমি লোক নাপাছি। আমার বাহন্য আছে শ্যামগঞ্জে। দেখা যাক।

চন্দ্র কোটাল আজ বিশেষ ভণিতা না করিয়া উঠিয়া পড়িল।

আজহার গুড়ুক ফঁকিয়া যায়। নিশ্চয় হইয়া উঠিতেছে সে সব বিষয়ে।

বিষে দুই জমির ভাল ফসল পাইয়াছিল। এই বছর সংসারে ঘাস তিন টানাটানি চলিতে পারে। টাকা পাইয়া আজহার দরিয়াবির জন্য একটি তাঁতের শাদা শাড়ি কিনিয়া আনিল। কথাবার্তা নাই দম্পতির তেতর। ততপোশে শাড়ি রাখিয়া দরিয়াবির উদ্দেশ্যে সে কয়েকটি কথা বলিয়াছিল মাত্র।

কয়েকদিন পরে আরো ফসল আসিল ঘরে। আজহার দেখিল তার দেওয়া কাশড় পরিয়া রহিয়াছে আসেকজান। চাহিয়া রহিল সেই দিকে কিয়ৎক্ষণ। নিরীহ মানুষটির বুকেও শত প্রশ্নের কল্লোল উঠিয়াছে।

সেইদিন বৈকালে আজহার বাঁ সুভা-কল্লিক-সুর্মি হাতে তিন পাঁয়ের পথ ধরিল।

পরদিন আমজাদ একবার পিতার প্রসঙ্গ তুলিয়াছিল। তাহাকে ধমকে জব্ব করিয়া দিল দরিয়াবিবি।

আলু-পেঁয়াজের গুস্ত করিতে ইয়াকুব গঞ্জে আসিয়াছিল। সেদিন ভাল বেপারী জোটে নাই। বেশি মাল কেনা হইল না। পাঁচ ক্রোশ বাড়ি ফিরিয়া আবার গঞ্জে আসা মহা হাস্যাম। আজহারের বাড়ি নিকটে, পুরাতন আত্মীয়তা ঝালাই করা হবে তবু। তাই ভাবিয়া সে বহু বছর পরে গরীব মামাতো ভাইয়ের অঙ্গনে পা বাড়াইয়াছিল।

দরিয়াবিবি ইয়াকুবকে সহজে চিনিতে পারে নাই। কয়েক বছরে তাহার চেহারা বেশ বদলাইয়া গিয়াছে।

আমাকে চিনতে পারলে না? আমি তোমার সেই দেবর— যে বড্ড বেশি বিরক্ত করত। এসো, এসো।

দরিয়াবিবির সম্ভাষণে স্মৃতিশক্তি পুনরুজ্জীবন লাভ করে।

ভাবী, গঞ্জে এসে মুশকিলে পড়েছিলাম। মাল কেনা হয়নি।

তাই বুঝি গরীবের কুঁড়েঘরে হাতি—

ইয়াকুব কথা লুফিয়া লইল, হাতি নয়, বরং চামচিকে বলুন, তা-ও সহ্য হবে।

বহুদিন আগে ইয়াকুব এই বাড়ি আসিয়াছিল। তবে বেশভূষার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে লম্বা-কোঁচা ধুতি পরিয়াছিল। নাকের সোজাসুজি টেরি, চুলগুলি ঢেউ খেলানো, পায়ে কালো পাম-সু, গায়ে খুলা-পাঞ্জাবী। পানের দাগ দাঁতের গোড়ায়। হাসির ভিতর বাঁকা মনের পরিচয় ফুটিয়া উঠে।

ইয়াকুব সম্পর্কে আজহারের ফুপাতো ভাই। জোত-জমি আছে শ'বিঘা। তার ধান,— তা ছাড়া মওসুমে আলু, পটল, পেঁয়াজ, পাট ইত্যাদি লইয়া সে ব্যবসা করে। গত কয়েক বছরে সে বেশ পয়সা রোজগার করিয়াছে, এ সংবাদ দরিয়াবিবি জানিত। তার আরো প্রমাণ, বর্তমানে তার সংসারে দুই স্ত্রী বর্তমান। কয়েক মাস আগে আর একটি বিবাহের যোগাড় করিয়াছিল। প্রতিবেশী ও দ্বিতীয় স্ত্রীর আত্মীয়দের জুলুমে ইয়াকুব সে সদিচ্ছা পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিল।

আজহার ভাই কোথা? একটি মাদুরের উপর বসিয়া ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করিল।

দরিয়াবিবি আগে এক গ্লাস পানি দিয়াছিল। এখন ইয়াকুবের জন্য পান সাজিতেছিল। সে পান-ই সাজিতে লাগিল, কোন জবাব দিল না।

ইয়াকুব আবার প্রশ্ন করিল, ভাই কোথা?

আমি কী জানি? আজ পনের দিন বেরিয়েছে। একটা খবর পঙ্কজন্তু দেয়নি।

আচ্ছা মজার লোক। খালি দোকান-দোকান আর ব্যবসার ঝোঁক। ওসব ভাল মানুষ দিয়ে ব্যবসা হয় না।

ইয়াকুবের হাতে পানের খিলি দিয়া দরিয়াবিবি জবাব দিল, কে বোঝাবে বলো। মাঝে মাঝে খেয়াল চাপে।

আজহার ভাই ওই রকম। কত জায়গায় কত রকমের ব্যবসা ফেঁদেছে। শেষ পর্যন্ত

টিকে থাকতে পারে না। সেটা ওর মহাদোষ।

অবেলা। দিনের আলো ক্রমশঃ নিভিয়া আসিতেছিল। ইয়াকুব হাসির ঢেউ তুলিয়া পকেট হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিল।

ভাবী, কিছু মনে করবেন না। আমি রাত্রে খিচুড়ি খাব। ঘি আর ভাল চাল কিনে আনাও। মুরগি পাড়ায় পাওয়া যায়?

পাড়ায় পাওয়া যায় না, তবে আমার ঘরে আছে।

বহুত আচ্ছা।

দরিয়াবিবি নোট গ্রহণ করতে রাজি হইল না। এমন মেহমান না আসাই ভাল। অপমানিত হওয়ার ক্রিষ্টতা তার বুকে গিয়া বিধিল। ইয়াকুব নাছোড়বান্দা। আমজাদ ও নঈমা পাশে দাঁড়াইয়া পিতার ফুপাতো ভাইয়ের কাণ্ড দেখিতেছিল।

ইয়াকুব দুই জনের হাতে দু'টি পাঁচ টাকার নোট গুঁজিয়া দিল।

খোকা-খুকী, তোমরা মিষ্টি কিনে খেয়ো।

দরিয়াবিবি আরো প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু ইয়াকুব কর্ণপাত করিল না।

এমন ব্যাপার করলে আমার বাড়ি এসো না, ভাই। আমরা গরীব।

অভিমান-ক্ষুণ্ণ ইয়াকুব কহিল, আমার ভাইপো ভাইঝিরা আমার পর? বেশ, তুমি যা খুশি বলো। আজহার ভাই আসুক না।

আবার প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল ইয়াকুব, সে যেস কত রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছে।

দরিয়াবিবিকে অগত্য উঠিতে হইল। খাতিরদারীর সরঞ্জাম অল্প নয়।

আমজাদ নিজের নোটটি সযত্নে ভাঁজ করিয়া মা'র হাতে দিল। তার ফুরসৎ নাই। ঘিয়ের জন্য কৈবর্তপাড়ায় যাইতে হইবে। এমন মজুরী পাইলে সে কাজে অবহেলা করিতে রাজি নয়। একটি বোতল হাতে সে চলিয়া গেল।

মুরগি জবাই করা হইল তখনই। দরিয়াবিবির একটি বড় মোরগ ছিল, সেটি এখনও বাড়ি ফেরে নাই। কত দেৱী হইবে কে জানে। বকাড়ির মুরগি নষ্ট করিলে আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যায়। ডিম আর বাচ্চা রোগীর জন্য অনেকে ক্রয় করে।

রান্নাঘরে দরিয়াবিবি খুব ব্যস্ত। ছোট খুকীটা ভয়ানক কান্না জুড়িয়াছিল।

ইয়াকুব অভয় দিল, ভাবী, রান্না করো। আমি খুকীকে কোলে নিই।

খুকীর কান্না থামিয়া গেল। তাকে কোলে লইয়াই ইয়াকুব রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

দরিয়াবিবি বসন সংযত করিতে সময় পায় না।

অপ্রস্তুত হইয়া ইয়াকুব বাহিরে ফিরিয়া বলিল, ভাবী, তোমার খুকীটা বেশ।

হ্যাঁ, ভাই। বেশ সুন্দর হয়েছে মেয়ে।

ইয়াকুব আবার খুকীকে দোলাইতে দোলাইতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

হাসিয়া সে বলিল, তা হ'বে না, মা কেমন?

লজ্জায় রাঙা হইয়া ওঠে দরিয়াবিবির মুখ। গোস্বতের হাঁড়িতে মশলা দিতেছিল সে। ধনে-ভাজা নাই। একটি 'তাওয়া' চড়াইয়া দিল দরিয়াবিবি। ইয়াকুবের উপস্থিতি একটু অসোয়াস্তিকর।

দরিয়াবিবি ডাকিল, ইয়াকুব ভাই।

জী।

বাইরে যাও না। তুমি কী রান্না শিখবে?

কে শেখায়, ভাবী।

থাক, আর শিখে কাজ নেই। দুই বাঁদীর ঘর—তার রান্না শিখতে হয় না।

হয় বৈকি।

তুমি খুকীকে বাতাসে নিয়ে যাও। যা ধোঁয়া এখানে।

দরিয়াবিবি নিজ মনে রান্না করিতে লাগিল।

ইয়াকুবের কথা শেষ হয় না। সে আবার আসিল খুকীকে কোলে করিয়া।

ভাবী, আজহার ভাই পনের দিন গেছে, খবর দেয় নি?

না।

তুমি বলে তার সংসার করো। এমন লোক খবর দেবে না তা বলে।

আমরা ত তার কেউ নই।

দরিয়াবিবি চুলায় ফুঁক দিতেছিল বাঁশের চোঙ্গার সাহায্যে। ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিতেছিল সারা রান্নাশাল।

আহা। এমন সুন্দর খুকী, তার মায়া তাকে বেঁধে রাখতে পারে না।

বড় বিরক্তি বোধ করিতেছিল দরিয়াবিবি।

টাকার মায়া সবচেয়ে বড়। আবার কোথাও কিছু ফেঁদে বসেছে, লাখ টাকা কামাবে। সেবার চন্দ্র কোটাল ওর খোঁজ পেয়ে তবে ফিরিয়ে আনে।

দেখা যাক, আমিও চেষ্টা করব।

অত দয়ার কাজ নেই। নেই আসুক সে।

ইয়াকুব দরিয়াবিবির চোখের দিকে চাহিল, জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। হয়ত ধোঁয়ায়, হয়ত সাংসারিক তাড়নার আঘাতেই ইয়াকুব তা উপলব্ধির চেষ্টা করিল।

দরিয়াবিবি কোন সহানুভূতি চায় না। ইয়াকুব উঠিয়া গেলে সে সন্তুষ্ট হয়। আড়চোখে তার দিকে দরিয়াবিবি ধূমায়িত চুলায় আরো ধোঁয়া করিতে লাগিল, তারপর বলিল, উঠে যাও না, ভাই। খুকীদের বড় চোখের দোষ হয় ধোঁয়া লেগে।

ইয়াকুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠিয়া গেল।

গেরস্থলির কাজ, মেহমানের জন্য বিশেষ রান্না। বহু দেবী হইয়া গেল। দু'টি মাত্র ঘর, ইয়াকুবের শোয়ার জায়গা আর এক সমস্যা। আজ আমজাদকে দাওয়ায় শুইতে হইল।

গঞ্জের কাজ সারিয়া আরো তিন দিন ইয়াকুব এইখানে রহিয়া গেল। আজহারের তল্লাসী করিতেছে সে। কৃতজ্ঞতায় গলিয়া দরিয়াবিবি, খাতিরদারীর ক্রটি না হয়, সেদিক বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিল। দুহাতে খরচ করিতেছিল ইয়াকুব। সন্দেশের স্বাদ এই বাড়ির ছেলেরা মৌলুদ শরীফ বা পাড়ার কোন বিশেষ উপলক্ষে চাখিতে পায়। ইয়াকুব নানা রকমের মিষ্টি কিনিয়া আনিয়াছিল। ময়দা, ঘি, পরটা, আরো চর্ব্য-চুষ্যের ব্যবস্থা সে রীতিমত করিতেছিল।

বাড়িতে ধুম লাগিয়াছে উৎসবের। আসেক্জানকে পর্যন্ত ইয়াকুব বাহির হইতে দেয় নাই। সেও অতিথি এই বাড়ির।

দরিয়াবিবি চক্ষুলাজ্জার জন্য কোন কথা ইয়াকুবকে বলে নাই। নচেৎ সে-ও এই মহসিনীপনা খুব ভাল চোখে দেখিতেছিল না।

আরো দুই দিন থাকিয়া বিদায় লইল ইয়াকুব। আমজাদ অনেক দূর তার সঙ্গে আসিল।

২১

হাসুবৌ আমজাদকে দুপুরবেলা ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ি যায় নাই সে। পাড়ার এক টেরে গাছের ছায়ায় একটি গুড়ির উপর দুই জনে বসিল।

কেন ডেকে আনলে, আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল।

লক্ষী ছেলে, বসো না—সন্দেশ কিনে দেব।

না, জলদি বলো।

হাসুবৌ ইতস্ততঃ করিতেছিল।

মুনি, আর আসবে না?

আমি কি জানি। মা কত কাঁদে। আবার সঙ্গে কথা বলে না।

হাসুবৌ বলিল, তোর আকা চলে গেল। মুনি ছেলেটা ভারী বদ। আমজাদ সায় দিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মুখচোরা ভাব কাটিয়া যাইতেছে।

বদ! তুমি ভারী ভালো?

হাসুবৌ আমজাদকে আদর করিতে লাগিল। না, সে বেশ ভাল। আমজাদ একটু দূরে সরিয়া গিয়া ব্যঙ্গ করিল, আমাকে আদর করতে হবে না। মুনিভাই নেই, তাই।

হাসুবৌ অবাক হইয়া যায়। এইটুকু ছেলে, তারও মনে ঈর্ষার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে।

হাসুবৌ তার নিকটে সরিয়া আসিল। আবার তার চুলের উপর হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিল। না, তুমি বেশ ভাল ছেলে।

আমজাদ জবাব দিল, না।

হাসুবৌ পুনরায় বলিল, যদি তুমি একটা কাজ করো, তোমাকে বেশি আদর করব। কি, শুনি।

একবার মুনির খবর দিতে পারো?

আমি কি করে নেব।

হাসুবৌ আনমনা, গাছপালার ফাঁক অতিক্রান্ত দূরের আকাশের দিকে চাহিয়াছিল।

খোয়ার কাটাইয়া সে আবার বলিল, তুমি তাদের গাঁয়ে যাও না।

আমজাদ অক্ষমতা জানাইল।

খুব বেশি দূর নয়। আমি গরুর গাড়ির পয়সা দেব।

মা যে বকবে।

না, স্কুলে যাওয়ার নাম করে চলে যাবে।

হাসুবৌ আঁচলের গিট খুলিয়া একটি আধুলি বাহির করিল।

এই নাও, তোমার কাছে রেখে দাও, কতক্ষণ আর লাগবে।

যা যদি শোনে! শঙ্কিত দৃষ্টি আমজাদের চোখে ।

না, কেউ বলবে না ।

মহেশভাষ্য পাছালা এত ঘন । এই জারুগাটি আরো নীরব । বাতাসের মৃদু নিনাদ ।
কোশেঝড়ে একদল বুনা পাখি কোথায় অদৃশ্য থাকিয়া হঠাৎ ভাকিয়া উঠিল ।

ভূমি যাবে?

হ্যাঁ । যাখা দোলাইল আমজাদ ।

বেশ, লক্ষী ছেলে ।

হাসুবৌ সুকুমারমতি বালকের চোখের দিকে চাহিয়া আনমনা আলিঙ্গনে জড়াইল
আমজাদকে । বেশ লক্ষী ছেলে ভূমি । মৃদুভাবে বন-ঝেড়ের নীরবতা হঠাৎ চমক বাইতে
থাকে ।

বেশ লক্ষী ছেলে ভূমি ।

আমাকে ছেড়ে দাও ।

না ।

মুনিভাইয়ের মত আমার গালে কমড়ে দিয়ো না কেন, হাসুচাচী ।

হাসুবৌ শুদ্ধ হইয়া আলিঙ্গন প্রব করিয়া দিল, দূরে সরিয়া পেল সে ।

আমজাদ হাসিতে থাকে । হাসু চাচী, মুনিভাই একটা ব্যাণা । প্রজাপতি ধরে বলে,
ওর রঙ ভুলে গাবের জায়া রান্নাব ।

নিরুত্তর হাসুবৌ ।

আজ্ঞে চাচী, প্রজাপতির রঙে জায়া রঙ করা যায়?

হ্যাঁ । আমি তোমার জায়া রঙ করে দেব । ভূমি একবার মুনির ববর এনে দাও ।
দেখো না, তোমার যা কত কঁদে ।

মায়ার নামে আমজাদের করুণা হয় । দুচকটে সে জবাব দিল, নিশ্চয় যাব । চার আনা
পকুর গাড়ির ভড়া । আমি চার আনার সুড়ি কিনব ।

বেশ ।

হাসুবৌ হাত বাড়াইল আমজাদের দিকে । সে তখন এক দৌড়ে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে ।

২২

দরিয়াবিবি ছোট মেয়েটির নাম রাখিয়াছিল শরীকন । ডাকনাম শরী । শৈরমীর স্মৃতি একবার
তার মনে জাগিয়াছিল বৈকি । সেই দীন-জীবনের করুণ অবসান-মুহূর্ত! ডাক নামে শৈরমীর
স্মৃতি বাঁচিয়া থাক । দেশের বিশাল মানচিত্রের এক কোণে নামহীন গ্রাম্য জননীর দীন
প্রচেষ্টা— জাতি-ধর্ম ঘেঁষানে মানবতার উপর নৈরাজ্যের কোন ফণা খেলিতে পারে না ।

কিন্তু গ্রামে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল ।

ব্রাহ্মী চৌধুরী ও হাতেম বাঁর মধ্যে গত কয়েক বছর একটি বিধা-পক্ষাশয়ের জলাশয়
নইয়া মন-কষাকষি চলিতেছিল । এতদিন জলাশয় চৌধুরীদের দখলে ছিল । দলিলে হাতেম
বাঁর প্রাণ্য হইলেও সে ইহার কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই । জলাশয় জমা নইয়াছিল কয়েকজন

মুসলমান জেলে। ইহাদের ভদ্রবংশীয় মুসলমানেরা আত্মরক্ষা বলে। বিলের আয় মন্দ নয়। হাতেম খাঁ কয়েকজন আত্মরক্ষাকে হাত করিয়া খাজনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্ররোচনা দিল। তাহারা সেইমত খাজনা বন্ধ করিয়াছে। রোহিণী চৌধুরী এই শলাপরামর্শ ভালরূপে আঁচ করিয়াছিল। তিলি-বাগদী-ডোম শ্রেণীর কৃষক হিন্দু হাত করিয়া গ্রামে তিনি দাস্তার প্ররোচনা দিতে লাগিলেন।

হাতেম বক্শ ইদানিং ঘোরতর মুসলমান সাজিয়াছেন। তাঁর পুত্রেরা অন্দরমহলেই শরাব পান করেন। তিনি কোন কথা বলেন না। নিজেও নামাজ-রোজার ধার ধারেন না। বর্তমানে জুম্মার নামাজের সময় হাতেম বখশকে মসজিদে দেখা যায়। তাঁর কালোশাদা দাড়ি স্বেত-খোজাফে আরো শুভ্র রং ধারণ করিয়াছে। শাদা পিরহান হাঁটু পর্যন্ত ঝুলাইয়া একটি ‘আসা’ (ছড়ি) হাতে গ্রামের অন্ধকারে দারোয়ান সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান। বৈঠক, শলা-পরামর্শ আর যুক্তির বহর। নামাজের সময় না হইলেও তিনি এতেলা দেন। নামাজ ‘কাজা’ করা শক্ত গোনাহ। হাদিস-কোরানের সম্মতি এজেঙ্গী লইয়াছেন তিনি। গ্রামের মখতবগুলির জীর্ণ-দশা। এক পয়সা তিনি খরচ করেন নাই। বর্তমানে তিনি একটি ‘তামদারী’ করিয়া গ্রামের মুসলমানদের পোলাও-কোর্ম খাওয়াইলেন। কাফের হিন্দু জমিদার মুসলমানদের সর্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িবে, এই কথা পাকে প্রকারে প্রচারণার খোলসে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

নিষ্ঠেজ মহেশডাঙার জীবনে তবু চাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিয়াছে। হিন্দু পাড়ায় রোহিণী চৌধুরীর কার্পণ্য নাই। প্রচারণা শক্তি তাঁরও কম নয়।

সাকেরকে হাতেম বখশ এতদিন আমল দিত না। তার লাঠির জোর দশ গাঁ জানে। হাতেম বখশ দাওয়াৎ খাওয়াইয়া, টাকা-পয়সার ঘুষে তাহাকে ক্রয় করিয়া ফেলিল। সেও হালফিল ভয়ানক মুসলমান হইয়া উঠিয়াছে। ইমামের পেছনে ‘ইমামের যা নিয়ৎ আমারও তাই’ বলিয়া ঈদ ও বকর ঈদে যে বছরে দুইবার মাত্র নামাজ পড়িত, সেও নামাজ শিখিতেছে। বাংলা নামাজ-শিক্ষা পঞ্জ হইতে কিনিয়া আনিয়াছে ঠিকমত আরবী উচ্চারণ হয় না, তা লইয়া হাসাহাসি করিতে গিয়া হাসুবৌ ভয়ানক তাড়া খাইল। নূতন কাক নাকি বিষ্ঠা খাওয়ার যম, এমন মন্তব্য করিয়াছিল নিরীহ বৌটি। ‘সুপারী খাওয়া ছাড়ো, তোমার জিভ সরল হোক।’

চন্দ্র কোটাল পালের গোদা সাজিয়াছে। শেখপাড়ার একজন মুসলমানের সঙ্গে জমির আল লইয়া গত বৎসর তার বচসা হইয়াছিল। রোহিণী চৌধুরীর মোসাহেবরা সেই উপলক্ষ যথারীতি কাজে লাগাইল। পাড়ায় পাড়ায় চন্দ্র কোটাল বলিয়া বেড়াইতেছে, মুসলমানেরা যদি টু-শব্দ করে, উড়িয়ে দাও তুড়ি দিয়ে।

জলাশয়ের পাশে একদিন দুই প্রজাদলে ছোটখাটো সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। কয়েকজন জখম হইয়াছিল। আদালতে মামলা দায়ের হইল। আহতদের পয়সা নাই। চৌধুরী ও হাতেম বখশের যখন পয়সা আছে, তখন কিছুর অভাব হইবে না।

গ্রাম থমথম করিতেছে।

এমনই আসন্ন অপরাহ্নে আজহার খাঁ ফিরিয়া আসিল। কাঁধে ঝোলানো থলে, তার ভিতর মনিহারী দ্রব্য। লাটিম, আলতার ডিবা, ছোট মেয়েদের হাতের চুড়ি ইত্যাদি।

নঈমা ও আমজাদ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রত্যেকে উপহার পাইয়াছে। আমজাদের

জন্য খাতা-পেন্সিল, লাল রবার। লাটু-লেন্ডি জোর করিয়া সে আদায় করিল। নষ্টমার সওগাত কানফুল, কয়েকটি রেশমী চুড়ি।

দরিয়াবিবির স্তব্ধতা ভাঙিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানের সেতু তেমনই যোগ-ছিন্ন। তিরিশটা টাকা আনিয়াছিল আজহার খাঁ। চার মাস সে বেকার বসিয়া থাকে নাই। তবে দোকান সে করিয়াছিল গত একমাস। দোকানদারী পোষাইল না।

দরিয়াবিবির হাতেও টাকা ছিল। ইয়াকুব দেদার খরচ করিয়া যায় এইখানে। গঞ্জের দিনে সে প্রায়ই আসে। আজহার ফিরিয়া না আসিলে, তার কোন হাত-টান হইত না। আমজাদের স্কুলের বেতন পর্যন্ত ইয়াকুব মাস-মাস দিবে বলিয়া শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয় নাই, তিন মাসের টাকা অগ্রিম দিয়া গিয়াছে।

গ্রামের কথা শুনিয়া আজহার থ হইয়া গেল। আমজাদ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিতে লাগিল পিতার নিকট। সাকের চাচা নাকি বলিয়াছে, রোজগারের মরশুম এসেছে। সে দুই জমিদারের নিকট টাকা লুটিতেছে। রোহিণী চৌধুরীকে সে আশ্বাস দিয়াছে, দাঙ্গার দিন লাঠি ধরব না, কসম করছি—ব্যস দেখব হাতেম বখ্শ কত লেঠেল আনে। হাতেম বখ্শকে সাকের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, পাঠানের বাচ্চা শেষ লাঠিখেলা দেখিয়ে যাব।

আজহার খাঁ বিলম্ব করিল না। খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া একদম মাঠের দিকে গেল। বাজে ঝঞ্ঝাটের চেয়ে মাঠের অবস্থা তার প্রথমে জানা দরকার। মাঠ, ফসল, তার কামধেনু। ওই বছর ফসল পাইয়াছিল বলিয়া সুখসারেও শ্রী বজায় আছে। সকলে রবিফসলের চাষ দিতেছে। গরু-বাছুরের জলুমের জন্যে কয়েকজন চাষী বাখারীর বেড়া প্রস্তুত করিতেছে। পটল দিবে সকলে এবার উত্তরমুখ গত বছর ভাল ফলে নাই। কুমড়া আর মুলোর চাষ চলিতেছে।

দেরী হইয়া গিয়াছে তার। তাই নাকি। ‘নাবি’ ফসল হইবে। সেজন্য আজহার বেশি অনুতাপ করিল না।

চন্দ্র কোটালের সঙ্গে দেখা করা দরকার, চন্দ্র! মনে মনে হাসিয়া উঠিল আজহার। সন্ধ্যার পদক্ষেপে শূন্য মাঠের আইল বিচিত্র বর্ণে অদৃশ্য হইতেছে।

চন্দ্র দাওয়ায় বসিয়াছিল, আজহারকে সে অভিভাষণ জানাইল না, বসিতে পর্যন্ত বলিল না।

চন্দ্র।

সে নিরন্তর।

এলোকেশী একটি পিড়া বাহির করিয়া আজহারকে বসিতে দিল। চন্দ্রমণি আসিল পিছু পিছু। আজহার ডাকিল, চন্দ্র!

কোন জবাব দিতেছে না সে। এলোকেশীর দিকে ফিরিয়া আজহার বলিল, কি, আজ চন্দ্র নেশা করে বসে আছে?

এলোকেশী ভয়ানক রাগিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল : ও কী, বসে আছে যেন সং। লোক এলো, কথা বলো। গাঁয়ে হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া ত ভাইয়ের সঙ্গে কী। যতসব অপসিষ্টি, হতচ্ছাড়া লোক।

এলোকেশী বলিতে লাগিল, জমিদারে জমিদারে ঝগড়া। বড়লোকে বড়লোকে

দলাদলি তাদের কী? তাদের জমিদারী নিয়ে যাবে—ওই যে বসে আছে, রোহিণীবাবু
জলাশয়টা শুকে দিয়ে যাবে। তাই নিয়ে দিন-রাত টইটই হিন্দুশাস্ত্র যুরছে ॥

যার উদ্দেশ্যে বাক্যবাণ বর্ষিত হইতেছিল, সে নিজের মূর্তির মত বসিয়া বহিল।
বোকা-চোখ মিটমিট করিয়া সে আজহারের দিকে চাহিয়া আবার চোখ ক্লিয়াইয়া নইল ॥

করুে সাজিয়া আনিল চন্দ্রমণি। আজহার নীরবে টানিতে লাগিল। যোয়া ছাড়ার
অবকাশে সে আবার ডাকিল, চন্দর।

আজহার স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। বড় ক্ষুব্ধতার : চন্দর! আমি এতদিন দেশছাড়া।
জানি চন্দর আছে। বড়লোকে বড়লোকে দলাদলি, আমার গরীবেরা কেন ওর মধ্যে?

এলোকেশী আবার এক পশলা বর্ষণ করিয়া গেল। দাওয়ায় একটা মাদুরে আড়
হইয়া চন্দ্র হঁকা পান করিতে লাগিল। ভীষ্মের শরশয্যা আরম্ভ হইল। এলোকেশীর বাপ তা
হইলে ব্যর্থ নাই, কিন্তু ভীষ্মদেব শরে কাতর নন, কষ্টমরে কাতর হওয়ার কোন লক্ষণ
দেখা গেল না। একবার সে হাই তুলিল।

সন্ধ্যায় গ্রাম ছাইয়া গিয়াছে ॥

উঠানে নীরবতা। দূরে মাঠে বাছুর ডাকিতেছিল।

আজহার উঠিবার পূর্বে বলিল, যোগীনের মা, আবার কাল আসব, আজ ওর মেজাজ
ঠিক নেই।

ভিটার উপর হইতে নামিয়া পড়িল আজহার স্বাক্ষর প্রলেপিত মাঠে; তার মনের
মতই শূন্য। সে বাতাসের পদ-সঙ্কলন-ধ্বনি শুনিতে লাগিল।

একবার উৎকর্ষ হইল আজহার। চন্দ্র কোটাল গাল পাড়িতেছে : না, আমার দু'চোখ
নেই আর মুসলমানদের দেখি—দু'চোখ নেই ॥

এলোকেশীর কষ্টমর তার সঙ্গে ভা থাকবে কেন? তাড়ি গিলে গিলে চোখের মাথাও
যে গিলেছে।

আবার ভর্সনার শরজাল : চূপ, শালী।

এলোকেশীর জবাব : আমার বোনের সঙ্গে অত কেন ॥ নিজের বোনকে দিয়ে এসো
না রোহিণীবাবুকে। এখনো ত বয়স রয়েছে—পীড়িত করবে ॥

আজহার হাঁটিতে লাগিল। এই একটিমাত্র আশ্রয়ভালা মানুষকে চিনিয়াছিল, সে তার
কত নিকট। এতটুকু দরদের জায়গা আর নাই তার পৃথিবীতে।

পেছনে ফিরিয়া আজহার অব্যক্ত বেদনার কোটালের তিটের দিকে আবার চাহিল।
দুই চোখ তার জলে ভরিয়া উঠিল। দরিদ্রাবিবি কি মরিয়া গিয়াছে?

পরদিন বিকালে আজহার রবি-কসলের জন্য জমি তৈয়ারি করিতেছিল। বহুদিন মূলা
চাষ করে নাই সে। এইবার মূলা ও তরমুজ দেওয়া হইবে এইখানে। জমির কিনারায়
শকরগঞ্জ আলু। আমজাদও সঙ্গে আসিয়াছিল। আজকাল আজহারকে সে বুঝে এড়াইয়া
চলে। কিন্তু পিতার নিষ্ঠুর গাষ্ট্রিকের সম্মুখে সে ভগ্নানক ভীক। মাঠে কাজ করা তার ভাল
লাগে না। স্কুলের পড়ুয়া, সে কেন সাধারণ চাকীর মত এই বয়সে জমির খবরদারী করিবে?

পিতার আদেশ নীরবে পালন করে ॥ কয়েকটি বাঁশ কাটিয়া আনিয়াছিল আজহার।
আমজাদ তার বাখারী তুলিতেছিল। গরু-বাছুরের যা জলুম, বেড়া না দিলে কসল আদায়

হইবে না।

আরেক কৃষক দূরে কর্মব্যস্ত। এক মাসে এইখানে সমীর চঞ্চল ধান-বন রং রেখায় মাঠগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এখন শূন্য ক্ষেত! খামারে গাদা উঠিয়াছে। অবেলার শূন্যতার মধ্যেও তেমনি জ্রুটিটির ছোঁয়া নাই। গ্রীষ্মকালে সমস্ত প্রান্তর যেন গ্রাস করিতে আসে।

আজহার সমগ্র মাঠের দিকে তাকায় না। আমজাদ নীরবে কাজ করিতেছিল।

শীস-ধ্বনি শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। নিশ্চয় চন্দ্র কাকা আসছে, কয়েক বিঘা দূরেই তার জমি। খালের ঢালু পাড় হইতে চন্দ্র কোটালের অবয়ব ক্রমশঃ দৃশ্যমান হইতে লাগিল।

আমজাদের কাজে মন নাই। এখন চন্দ্র কাকা আসিয়া পড়িবে। তখন হয়ত তাকে কোন কাজই করিতে হইবে না। তার মৃদু হাস্যে কপোল রাঙিয়া উঠিতেছিল।

চন্দ্র কোটাল সোজা এই জমির দিকে আসিল না। একটি কলাগাছের আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত শীস বহু আগে নিভিয়া গিয়াছে।

আমজাদই প্রথম সম্ভাষণ জানাইল, ও চন্দ্র কাকা—। চোখাচোখি দুইজন। হাস্য সংবরণ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল কোটাল।

ও, কাকা!

কাকা কোন জবাব দিল না।

আজহার কোদাল চালাইয়া জমি পরিপাটি করিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া আবার চক্ষু অবনত করিল।

আমজাদ হাসিমুখে অগ্রসর হইতে গেল। আজহার ধমক দিল, কাজ কর, আমু।

চন্দ্র কোটাল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তার দৃষ্টি অন্যদিকে। আজহার নীরব, নত মুখে কাজ করিতে লাগিল। দু'জনে যেন কোন পরিচয় নাই। আমজাদ মুখ চাওয়া চাওয়া করিতেছিল। গায়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। তারই কী ফল এই।

চন্দ্র কোটাল জমির পাশ দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইত লাগিল, ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল গাছপালার আড়ালে, সন্ধ্যার বেশি দেবী নাই।

আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল, চন্দ্র কাকা কথা বলল না যে?

না।

পিতার জবাবের ধাঁচ দেখিয়া আমজাদ আর অন্য প্রশ্ন করিল না।

শীসের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল। নিশ্চয় চন্দ্র কাকা। আমজাদ স্বয়ং বিষণ্ণ, মাঠের দিকে বারবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

২৩

চন্দ্রমণির সঙ্গে আজহারের পথে হঠাৎ দেখা হইয়াছিল। মাঝে মাঝে চন্দ্রমণি গ্রামের ভিতরে আসে। চন্দ্রই কেবল গ্রাম-ছাড়া, তার অন্যান্য আত্মীয়েরা এখনও পূর্ব পুরুষের ভিটায় বাস করিতেছে।

আজহার অন্যমনস্ক পথ হাঁটিতেছিল। ‘ও দাদা’ শব্দে সে চমকিত হইয়া প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইল। না, চন্দ্রমণিকে সহজে চেনা যায় না। তার খোলস-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বেশ পরিষ্কার কাপড় পরনে, পানের কষে ঠোট দু’টি রাঙা। বিধবা বলিয়া চন্দ্রমণির যেন কোন পরিচয় নাই। আজহার চন্দ্রমণিকে কোন যুবতী পরন্তী মনে করিয়া হঠাৎ অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিল।

ও দাদা, আমি চন্দ্রমণি।

আজহার সেদিন বৈকালে চন্দ্রমণির এই রূপ দেখে নাই। অবাক হইয়া গেল সে। চন্দ্র কোটালের আয়-উপার্জন নিশ্চয় বাড়িয়াছে। রাজেন্দ্রের সঙ্গে ভাঁড়-নাচের দল গড়িয়া সে ভালই করিয়াছে।

ও মণি, তুই! আমি ত ভাবছিলাম আর কেউ।

চন্দ্রমণি কিশোরীর মত হাসিতে লাগিল। বছর আগে ম্যালেরিয়া জ্বরে কি ‘ছিরি’ না হইয়াছিল তার।

তুমি আর যাও না যে দাদা!

আজহার লজ্জায় মুখ নীচু করিল।

কি করে যাই! চন্দ্র একদম কথা পর্যন্ত বলে না।

ও নিয়ে বৌদির সঙ্গে রোজ ঝগড়া বাধে।

চন্দ্রমণি এলোকেশীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

চন্দ্রকে সেদিন দেখলাম। ওর শরীরটা খারাপ।

রাখালেরা একপাল গরু তাড়াইয়া আসিতেছিল। চন্দ্রমণি ও আজহার পথের এক পাশ হইয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিল।

শরীর খারাপ হবে না। কত তাড়ি গেল। আর আজকাল দাদা কি যেন হয়ে গেছে।

কি হয়েছে?

সে মন-মেজাজ আর নেই। আমাকে দেখতে পারে না। কথায় কথায় গালিগালাজ।

খামাখা?

হ্যাঁ, দাদা।

আজহার চন্দ্র কোটালের এই অধঃপতনে কোন দুঃখ প্রকাশ করিল না। গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আরো একপাল গরু আসিতেছে। আজহার সেইদিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল, চন্দ্র আসলে ভালমানুষ। ও কেন এমন হয়ে গেল।

কি জানি।

রাজেন্দ্রের পাল্লায় পড়েছে?

চন্দ্রমণি হঠাৎ কোন জবাব দিল না, চুপ করিয়া গেল।

আজহার প্রসঙ্গ-স্রোত বন্ধ করিল না : রাজেন্দ্র ছোঁড়াটা তেমন ভাল নয়। ওর সঙ্গে বেশি তাড়ি গলে বোধহয়।

না দাদা!

চন্দ্রমণি অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিল, কণ্ঠস্বর তার প্রমাণ।

গাঁয়ের বড় লোকদের ঝগড়া থেকে দাদার মেজাজ আরো বিগড়ে গেছে।

সত্যি, মণি। আমিও রাগে সেদিন চন্দ্রের সঙ্গে কথা বললাম না। ও মাঠে এসেছিল।
আমারও মেজাজের ঠিক নেই।

চন্দ্রমণি আবার হাসিতে লাগিল। আমার দুই দাদাই পাগল।

আজহারকে রসিকতা স্পর্শও করিল না।

পুরাতন খেই টানিতে ব্যস্ত সে : আজকাল রোজগার কেমন করছে।

তা, মা লক্ষ্মীর কৃপায় বেশ। নাচের দলে দু'পয়সা হয়।

আজহার হঠাৎ হিংসুকের মত বেদনা অনুভব করে। বেশ আছে চন্দ্র কোটাল।

আমি যাই দাদা, আর একদিন আসবেন।

চন্দ্রমণি আর সেখানে দাঁড়াইল না।

২৪

দুই জমিদারে মামলা বাধিয়াছে। গ্রামে আর কোন গোলমাল নাই। সাময়িক উত্তেজনা নিভিয়া গিয়াছিল। চন্দ্র কোটাল আজহারকে এড়াইয়া চলে। দুই পরিবারে পূর্বের মত সম্ভাব নাই। এলোকেশী কোনদিন ঝগড়া-কলহ পছন্দ করে না। কোটালের সঙ্গে তার মতবিরোধ প্রায় দেখা যায়। আজহার বহুদিন চন্দ্রের বাড়ির ভিটার পাশে গিয়াও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সাহসে কুলাইয়া উঠিতে পারে নাই। সাকের আবার রোহিণী চৌধুরীর সঙ্গে খাতির পাতাইয়াছে। কিশাণেরা রবি-ফসল গুইয়া ব্যস্ত। জমিদারের কোন্দলে কারো কোন উৎসাহ নাই।

এলোকেশী একদিন স্বেচ্ছায় দরিয়াবিরি সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। আজহার বাড়ি ছিল না, আলু-বীজ ক্রয় করিতে ভিন-গাঁয়ে গিয়াছিল।

দরিয়াবিরি রৌদ্রে বসিয়া পাজা খাইতেছিল তখন।

এলোকেশী হাসিয়া বলিল, ঠিক সময় এসেছি।

এসো দিদি।

শশব্যস্ত দরিয়াবিরি একটা পিঁড়া আগাইয়া দিল।

কিন্তু এলোকেশী আরো ব্যস্ততা দেখাইতেছিল।

তুমি খেয়ে নাও, আমি এখনি উঠব।

এত তাড়া কেন? ও, আমার সঙ্গে ঝগড়া আছে নাকি?

এলোকেশী হাসিতে লাগিল।

কেন, বলো দিদি। সব জায়গায় খালি কোন্দল। গাঁয়ে, আমার ঘরে।

কোটালের সঙ্গে?

হ্যাঁ।

দরিয়াবিরি যথা দ্রুত আহার সম্পন্ন করিল। এলোকেশী তারপর দশটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, দিদি, এই টাকা ক'টা রেখে দিও। জমা রাখলাম।

আমার কাছে কেন?

রেখে দাও।

পরে কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া সে বলিল, রেখে গেলাম। ঘরে কী রাখার জো আছে?

আজকাল নাচে বেশ পয়সা আসছে।

তা আসছে। রাজেন্দ্র ছোঁড়াটা বেশ কাজের। এখন বলে যাত্রার দল করব।

আরো সাংসারিক কথা হইতেছিল। উঠানে হঠাৎ আগন্তকের ছায়া পড়িল। এলোকেশী লোকটিকে কখনও এখানে দেখে নাই। সে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিল।

দরিয়াবিবি উঠানের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

এসো ভাই। দরিয়াবিবির ঠোটে কৌতুক-মাখা হাসি। আগন্তক ইয়াকুব। দরিয়াবিবি এলোকেশীর কানে কানে বলিল, আমার দেওর।

ইয়াকুব দাওয়ায় একটি মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল। হাতে একটি পুঁটুলি ছিল। সে খবরদারীর ভার দরিয়াবিবির উপর।

সব ভালো? দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করিল। এলোকেশী লজ্জায় কলাবৌ সাজিয়া বসিয়া ছিল। ধমকের সুরে দরিয়াবিবি বলিল, ঘোমটা খোল না বৌ। ও আমাদের দেওর।

এলোকেশী ঘোমটা খুলিয়া ইয়াকুবকে ভালোরূপে দেখিয়া লইল।

শরীর ভালো নয়, ভাবী। আজ চার দিন জ্বর। তোমার এখানে এসে পড়লাম।

বাড়ি থেকে দু'দিন-তাহলে জ্বর গায়েই বেরিয়েছে?

হ্যাঁ।

এলোকেশী বিদায় হইল।

দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসাবাদে কসুর করে নুড়ি জ্বর গায়ে বেরিয়েছে?

হ্যাঁ।

এ কি? আর কেউ ছিল না ব্যাকসার জন্য। এতক্ষণ ইয়াকুব কোন অস্থিরতা দেখায় নাই। হঠাৎ সে চাপিয়া বলিল, ভাবী, একটু ঘুমোবার জায়গা করে দাও।

দিচ্ছি। কিন্তু আমার বোনেরা কেমন-ধারা মেয়ে! তোমার জ্বর, অথচ গঞ্জে আসতে দিল।

চুপ করিয়া রহিল ইয়াকুব। রৌদ্রের উত্তাপ তার শরীরে মনোরম লাগিতেছিল। সে বাহিরে মাথা বাড়াইয়া দিল। ছেলেদের পড়ার ঘরে দরিয়াবিবি শয্যা রচনা করিয়া ফিরিয়া আসিল। তার মুখের কামাই নাই : ভারী খারাপ কথা। তোমার জ্বর। অথচ ছেড়ে দিল। কেউ খোঁজ নেয়নি বোধহয়।

নিস্তব্ধতা যেন ইয়াকুবের জবাব। তবু সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, না। খোঁজ নিয়েছিলে বৈকি। আমার মাথাটায় হাত দিয়ে দ্যাখো।

দরিয়াবিবি কপালের উষ্ণতা পরীক্ষা করিল। ভারী গরম। তোমার মুখ দেখে অসুখ হয়েছে বলে মনে হয় না। উঠে গিয়ে শুয়ে পড়।

দরিয়াবিবি আবার বলিল, বাড়ির লোকগুলো কী! এত জ্বর, ছেড়ে দিল?

ইয়াকুব জবাব দিল, আমি গঞ্জ থেকে আসছি।

আসলে ইয়াকুবের মত মিথ্যাবাদী সংসারে অল্প। দাম্পত্য-জীবনে তার সুখ নাই। প্রায়ই দুই স্ত্রী কোন্দল বাধাইয়া থাকে। তা ছাড়া তার মত পেশাদার লম্পটের কীর্তিকাহিনী

স্ত্রীদের কানেও প্রবেশ করে বৈকি।

স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছিল। দরিয়াবিবি ইহার বিন্দু বিসর্গ জানে না। গ্রামের সঙ্গতিপন্ন মানুষদের মধ্যে ইয়াকুবের প্রতিপত্তি খুব বেশি। কারণ সে তাদের সমগোত্র। ধান-আলু-পেঁয়াজের কারবারে ইয়াকুব কত উপার্জন করে, তা দরিয়াবিবির অবগতির বাহিরে।

গত কয়েক মাস ইয়াকুব যাতায়াত করিতেছে। তার খোলা মন স্বতঃই সমীহ আকর্ষণ করে। কোন ক্রটি রহিল না দরিয়াবিবির সেবায়। মাথায় উত্তাপ উঠিয়াছিল। ঠাণ্ডা পানি দিয়া তাহা সে ধুইয়া দিল। মোটা কাঁথা বিছাইয়া দিল তক্তাপোশে। অবশ্য তা ইয়াকুবের টাকায় কেনা। গায়ে একটি তাঁতের চাদর দিল দরিয়াবিবি।

আসেকজান নিজে ঘর হইতে বাহির হয় না। সে আমজাদের নিকট খবর সংগ্রহ করিত। একটি পুরাতন শাল ছিল তার সিন্দুকে। কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি, আত্মীয়রা দান করিয়াছিল। দরিয়াবিবি চাদরের জায়গায় শালের আবরণ চড়াইল। বড় নির্ঝঞ্ঝাট গৃহস্থ অনুভব করিতেছিল ইয়াকুব, আমজাদ নিজে মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। নঈমা পিঁচুটি ভরা চোখ লইয়া কৌতূহলে সবকিছু দেখিতেছিল।

আজও ইয়াকুব কুটুম্বপনার কোন খুঁত রাখে নাই। ছেলেদের জন্য মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাবার আনিয়াছিল। পুঁটলি নয়, ছেলেদের রত্ন-ভাণ্ডার। ছোট খুকীর কথা পর্যন্ত ইয়াকুব ভোলে নাই। তার জন্য পাংলা জামা আনিয়াছিল।

দরিয়াবিবি পথ তৈয়ার করিয়া আনিল। ইয়াকুব নিস্তেজ চোখে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে। বড় আরাম তার।

দরিয়াবিবি বলিল, ডাক্তার ডাকাই জাই।

ঘোর আপত্তি জানাইল ইয়াকুব না, এমনি সেরে যাবে। ওষুধ গেলা আমার ভাল লাগে না।

একটি নোট বাহির করিল সে, কথা ও সাণ্ড শেষ করিয়া।

দরিয়াবিবি কোন আপত্তি জানাইল না। কারণ এই ক্ষেত্রে অনিচ্ছা বৃথা। ইয়াকুবের হাত হইতে নিস্তার নাই। হাজার কথা বলিতে শুরু করিবে।

দুপুরে ইয়াকুব জুরের ঘোরে উঁ-উঁ শব্দ করিতেছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না। হঠাৎ খুট শব্দে সে জাগিয়া উঠিল। দরিয়াবিবি তার সম্মুখে।

খাঁ-পত্নী জিজ্ঞাসা করিল, শরীর ভাল?

না, ভাবী।

তারপর ইয়াকুব কাতরোক্তি আরো বাড়াইয়া কহিল, মাথা ভেঙে পড়ছে। একটু টিপে দিলে ভাল লাগে।

দরিয়াবিবি কয়েকবার আমজাদকে ডাকিল, কোন জবাব নাই। ইয়াকুব ইঙ্গিত করিল বিছানার উপর বসিতে।

আচ্ছা, আমি টিপে দিচ্ছি। ছেলেগুলো বজ্জাৎ। বলিয়া দরিয়াবিবি ইয়াকুবের মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল।

ইয়াকুব নিরুত্তর। সে নীরবে একবার চক্ষুর পাতা খুলিতেছিল, পর মুহূর্তে বন্ধ

করিতেছিল।

ভাবী, তোমার কাছে বেশি ঋণ কচ্ছি।

ধার। আমি বরং—

ইয়াকুব হঠাৎ হাত তুলিয়া তার মুখে চাপা দিতে গেল। দরিয়াবিবি মুখ তার নাগালের বাহিরে রাখিয়া বলিল, ঋণ আমরাই করছি।

ইয়াকুব আবার একটি নোট বাহির করিল। তবে আর একটু ঋণ বাড়াত্ত ভাবী। না হলে আমি মরে যাব। আমার শেষ জ্বর।

এমন মানুষ। জ্বরের বিকার নয় ত? দরিয়াবিবি নোটটা নাড়াচাড়া করিয়া ইয়াকুবের ব্যাগেই রাখিয়া দিল। নিঃশব্দে লক্ষ্য করিল ইয়াকুব, আর কোন কথা বলিল না।

ডাক্তার ডাকি। কি বলো ভাই?

না। যদি ডাক্তার ডাকো, আমি জ্বর গায়েই বাড়ি ফিরব।

দরিয়াবিবি নিরুপায়। বড় একরোখা ইয়াকুব, সামান্য কয়েক মাসের পরিচয়ে সে উপলব্ধি করিয়াছিল। চুপ করিয়া গেল সে।

ঘুমাইয়া পড়িল ইয়াকুব কয়েক মিনিটে। দরিয়াবিবি মাথা টোপা বন্ধ করিল। আমজাদের গলার আওয়াজ পাইয়া সে বিছানার পাশ ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। বেশি বেলা নাই। সংসারের হাজার কাজ অপেক্ষা করিতেছে।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে বস্তা মাথায় ফিরিয়া আসিল আজহার। পটল বীজ পায় নাই। পটল 'আলের' দাম বেশি। তাও প্রায় শুষ্ক।

ইয়াকুব এখানে জ্বরে ভুগিতেছে। সে-সুপ্ত তার কানে গেল। তার সঙ্গে সাক্ষাতের তেমন কোন উৎসাহ দেখাইল না আজহার।

হাত-মুখ ধুইয়া, কিছু আহারের পর সে দাওয়ায় তামাক নিঃশেষ করিতে লাগিল।

দরিয়াবিবি বলিল, একবার দেখে এসো। তোমার কী একটু মেন্সভে (মনুষ্যত্ব) নেই। কি মনে করবে।

আজহার এই ধমকে সন্তুষ্ট হয়। সংসারের কাজে দরিয়াবিবি আবার পরামর্শ করিতেছে তার সহিত। সহযোগিতার দরদই ত সে প্রত্যাশা করে। ইয়াকুবের সহিত অনেক কথা হইল। সংসার, চাষ-বাস, ছেলেদের লেখাপড়া, নঈমার চোখের অসুখ ইত্যাদি। পটল-আলের কথাও বলিল আজহার।

ইয়াকুব পকেট হইতে কুড়িটি টাকা আজহারের হাতে দিয়া বলিল, বড় ভাই, আপনি কত জায়গায় ঘুরছেন। আমার সঙ্গে ব্যবসা করুন। কোন কিছু আটকাবে না।

আজহার নোট লইয়া বসিয়া রহিল। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সে গ্রহণ করিল এই দান।

জবাব দিন।

হ্যাঁ। কত কষ্ট করছি। তোমার সঙ্গে ব্যবসা করব, সে ত ভাল কথা।

আজহার আরো গল্প ছাড়িল।

কয়েক প্রহর রাত্রি অতিবাহিত। দরিয়াবিবির ধমকে আজহার গল্প সমাপ্ত করিল।

ভাত পরিবেশনের সময় দরিয়াবিবি হাসিয়া বলিল, ওর সঙ্গে দেখা করছিলেন না, এখন যে আঠার মত জড়িয়ে গিয়েছে?

বৈশাখের এক ঝঞ্ঝা-উতোল রাত্রে আসেক্জান মরিয়া গেল। কেহ খোঁজও রাখে নাই। আমজাদ অন্য ঘরে ঘুমাইত আজকাল। পরদিন অনেক বেলা হইয়া গেলে, আসেক্জান উঠিল না। খোঁজ লইতে গেল দরিয়াবিবি। বৃদ্ধার ঠাণ্ডা মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করিল দরিয়াবিবি। আমজাদ, নঈমা, আজহার বোবার মত চাহিয়া রহিল অনেকক্ষণ। বুড়ির আত্মীয়-স্বজন কেহই ছিল না। প্রতিবেশীদের সহায়তায় দাফন-কাফন শেষ করিল আজহার।

আসেক্জানের একটি পেন্টরা খোলা হইল। দশ-বারোটি খুচরো টাকা ও কয়েকখানি কাপড় পাওয়া গেল। বিশেষ লাভ হয় নাই দরিয়াবিবির। কাফনেই দশ টাকা গিয়াছে।

এই অসহায় বৃদ্ধার কথা বারবার মনে পড়ে দরিয়াবিবির। তার জীবনের পরিসমাপ্তি কিরূপে ঘটবে, সে কি জানে? হয়ত এমন অপমৃত্যু তারও কপালে লেখা আছে। কতদিন হইল শৈরমী মরিয়া গিয়াছে। কত দিন!

এক সপ্তাহে আসেক্জানের নাম মিটিয়া গেল এই বাড়ি হইতে। চতুর্থ দিনে পাড়ার দুইজন ভিক্ষুককে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া দরিয়াবিবি 'চাহ্‌রাম' সমাপ্ত করিল।

আমজাদ কিন্তু ভয়ে একা ঘুমাইতে পারিল না কয়েকদিন। মোনাদির নাই কাছে। নিজের ছোট কুঠরীতে শুইতে তার বড় ভয় লাগে।

দরিয়াবিবি ধমক দিয়া বলিল, ভয় কি, ব্যাটা! তোমার দাদি আম্মা তার ভেস্তু নসীব করেছে। ভয় কী?

আমজাদের তবু ভয় কাটিল না। কয়েকদিন দরিয়াবিবি শরীফনটক লইয়া আমজাদের ঘরে আস্তানা পাতিল।

স্কুলে পণ্ডিতের মুখে আমজাদ ভূতের কাহিনী শুনিয়াছিল। মন হইতে তা সহজে মুছিয়া যায় না।

মাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, মা, মরে গেলে ভূত হয় মানুষ?

যারা খারাপ লোক, তারা ভূত হয়।

আসেক্‌ দাদি কি হয়েছে?

ছিঃ ভয় কি, আমু। সে ভাল মানুষ। আল্লা তার ভেস্তু নসীব করেছে।

ভাল মানুষ আবার পরের বাড়ি খায়!

গরীব ছিল যে। গরীব।

দরিয়াবিবি ঈষৎ বিচলিত হয় মনে মনে। জবাব যেন ছেলের মন মত হয় নাই।

আমার ভয় করে। দাদি রাত্রে পাশে ঘুমায়।

থুথু-কুঁড়ি ছড়াইল দরিয়াবিবি পুত্রের গায়ে।

তার পাশে শুয়ে এত বড় হোলে কিনা, তাই মনে হয়।

আমার ভয় করে কেন, মা?

বেটাছেলে। তোর বুকের পাটা নেই।

ইস।

আমজাদ তবু রাতে দরিয়াবির কোল ঘেঁষিয়া ঘুমাইত। বাহিরে কাঁঠাল গাছের বনে বনে দমকা বাতাস লাগিলে সে মাকে জড়াইয়া ধরিত। গোরস্থান হইতে আসেকজান দাদি লাঠি হাতে কারো চলিশা খাইতে যাইতেছে।

ব্যাপারটা আজহারের কানে গেলে সে একদিন আমজাদকে মখতবের মৌলবী সাহেবের কাছে লইয়া গেল। তিনি ফুক্ দিয়া দিলেন। সঙ্গে এক গ্রাস পানি-পড়া। গোটা একটি টাকা বাহির হইয়া গেল দুই ফুক্কের ঠেলায়।

মৌলবী সাহেব জুম্মাবারে আর একবার আমজাদকে আসিতে বলিল, আজহার তা শুনিল মাত্র। আবার এক টাকার বন্দোবস্ত আর কি। আজহার মনে মনে যোগ করিল।

আমজাদের ভয় সহজে কাটিল না। আজকাল সন্ধ্যায় একা একা সে দাওয়ায় বসিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু মা'র কাছে সে সব চাপিয়া গেল। বাগাড়ম্বরে তার বুকের পাটা কয়েক মাইল চওড়া।

আমজাদের ভয় গেল অন্য এক ঘটনার ধাক্কায়।

আজহারের হাতে ইয়াকুবের দেওয়া টাকা ছাড়া আরো কিছু টাকা জমিয়াছে। আসেকজানের একটি ছোট বাস্র তার কাছে গচ্ছিত ছিল। দরিয়াবির তাহা জানিত না। ভিতরে আরো গোটা কুড়ি টাকা ছিল। এই ব্যাপার শুণাক্ষরে দরিয়াবির কানে উঠে নাই।

গোটা পঞ্চাশেক টাকা। মাছের ব্যবসা অথবা অন্য কোন ব্যবসা করা চলে। ইয়াকুবকে সে পছন্দ করে না। তার টেরি ও রঙীক লুঙ্গী অথবা কোঁচা-টিল ধুতি আজহারের মনে ঘৃণার উদ্বেক করে। সে তা কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম নয়। তার সঙ্গে ব্যবসাও সম্ভব নয়। সে বয়সে ছোট, তার ইশারায় চলি, আজহার সমীচীন মনে করে না। ব্যবসায় পুঁজি তার! সুতরাং অঙ্গুলি হেলনে ওঠা-বসা ছাড়া উপায় নাই।

চন্দ্রকে পাওয়া যাইত! চন্দ্র কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে মন টানাটানি লইয়া আর এদিক মাড়ায় না। এলোকেশী সেদিনও আসিয়াছিল। কি বুদ্ধিমতী মেয়ে। দাদা, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, আমরা উলুখড়। তাতে মাথা ভাঙতে যাই কেন? এলোকেশী ঠিক বলে। চন্দরের কাহিনী স্বতন্ত্র। তার আশা আজহার খাঁ ছাড়িয়া দিয়াছিল।

এই গ্রামে দুই মতাবলম্বী বাস করে— হানাফী ও লা-মজহাবী। লা-মজহাবীরা সংখ্যায় অধিক। হাতেম বখ্শ খাঁ হানাফী। তারই ইদানিং উৎসাহে গ্রামে বিরাট ‘ওয়াজের’ বন্দোবস্ত হইল। দুই সম্প্রদায়ের মুসলমানের সায় ছিল তার পেছনে। এই উপলক্ষে তিন-চার জন মৌলানা নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভাব স্তিমিত হইয়াছিল। জল-কর লইয়া কিছুটা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। হাতেম বখ্শ তবু সন্তুষ্ট নয়। সব কাফের হইয়া যাইতে বসিয়াছে। কয়েকজন মুসলমান এখনও রোহিণী চৌধুরীর পক্ষে। আরো ধর্মভাব উদ্দীপিত করা দরকার। মুসলমানেরা সংঘবদ্ধ হইতেছে না, হাতেম বখ্শ খাঁর বড় আফশোস। ইসলামের অবনতি দেখিয়া তার বুক কত শত ফাটল দেখা দিয়াছে।

গ্রামের ঈদগাহে ওয়াজের মজলিস বসিয়াছিল। বিরাট সামিয়ানা পাতা হইয়াছে। মৌলানাদের আসনের জন্য তক্তপোষ পাতা। নীচে মাদুর সতরঞ্চও বিছানো। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু মুসলমান আসিয়াছে।

ওয়াজ শুরু হইল। এখন মৌলানা বক্তৃতা শুরু করিলেন।

ভাইগণ—

ভাইগণ সকলে উৎকর্ষ হইল। ইসলামের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া মৌলানা কাঁদিয়া ফেলিলেন। অশ্রু আপ্ত কণ্ঠেই ঢোক গিলিয়া তিনি বলিলেন, ইসলাম বিপন্ন। শুধু হাতেম বখ্শের মত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জীবিত আছেন বলিয়া ইসলাম জেঁন্দা রহিয়াছে। হয়ত তার গোরস্থান-গমনে ইসলাম না গোরস্থানে চলিয়া যায়। সব মুসলমান কাফের হইতে বসিয়াছে। ইহার জন্য ফেরেশতারা পর্যন্ত কাঁদিয়া আহাজারী করিতেছে। তবু মুসলমানের খেয়াল নাই। আল্লার না-ফরমান (অবাধ্য) বান্দারা আল্লার বুকে শুলের মত বিধিতেছে। হায়, আল্লা।

তিনি আর এক দফা অশ্রুপাত করিলেন। সম্মুখে সতরঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন হাতেম বখ্শ খাঁ, তিনি ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছিতে লাগিলেন।

শ্রোতাদের চক্ষু না সিক্ত হইলেও হৃদয় ভিজিয়া গেল।

পেয়ারা ভাইগণ, আমার আল্লা আলেমুল গায়েব কোরানে ফরমাচ্ছেন, তোমরা এক হও। এক রশী পাকড়ে ধরো। কবে মজবুত।

মৌলানা দৃঢ় মুষ্টি ধরিলেন।

মজবুত করে ধরো। হাতেম বখ্শ সাহেব যেমন মজবুত করে ধরেছেন।

বারবার হাতেম বখ্শের নাম উচ্চারিত হওয়ার ফলে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিল। স্বর্বাঙ্গী প্ররশ্য মূল কারণ।

আবার শুরু হইল: পেয়ারা ভাইগণ, আল্লার হুকুম যদি না পালন করেন, দোখখের আগুনে সব জ্বলে পুড়ে খাক হোয়ে যাবেন। আখেরাতে আপনারা রসুলের সুপারিশ পাবেন না— হরগিজ না।

হরগিজ না, হরগিজ না—।

সভায় সকলের মাথা নড়িয়া উঠিল। মৌলানা দম লইয়া বলিলেন, আপনারা দরুদ শরীফ পড়ুন।

‘বালাগোল উলা বেকামালেহি’-রব সভায় অনেকক্ষণ শোনা গেল।

দোজখের আগুন কোনোদিন নেভে না।

শক্ত গুণাগার বন্দাদের জর্ন্য শক্ত সাজা— এত আগুন— গর্মি এত তার সেদ্ধাতে (উষ্ণতা)।

মৌলানা দোজখের বর্ণনা দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, বোধহয় আগুনের উত্তাপে। তিনি এক গ্লাস পানি গলাধঃকরণ করিলেন। একটি ঢেকুর তুলিয়া তিনি পুনরায় দোজখের আগুন দেখাইতে লাগিলেন। গরমের দিন। সভা আরো গরম হইয়া উঠিল।

একজন শ্রোতা গোলাব ছিটাইয়া দিলেন ইতিমধ্যে। বাতাসে গন্ধের আমেজ। সভা

বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ইহার পর দ্বিতীয় মৌলানা উঠিলেন। তিনি লা-মাজহাবী মুসলমান কর্তৃক দাওয়াৎ পাইয়া ছিলেন।

তিনিও প্রথমে কিছুক্ষণ ইসলামের দুর্দশার বর্ণনা করিলেন।

তার মুখে গ্রামের অন্যান্য মাতব্বর মুসলমানদের নাম শোনা গেল। তাঁরাই একমাত্র আদর্শ মুসলমান রূপে গণ্য। হাতেম বখ্শের নাম ঐ লিস্টে নাই। তিনি মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করিতেছিলেন।

ইহার পর মৌলানা আলম ইসলামের আখ্যায়িকা শুরু করিলেন। হজরত আলীর মত মুসলমান আর অনুগ্রহণ করে না। তিনি ছিলেন সৌম্য-শান্ত দীর্ঘকায় পুরুষ, নাতি পর্যন্ত তাঁর শূশ্রুরাজি লম্বিত।

অন্য একজন মৌলানা প্রতিবাদ করিলেন। না, হজরৎ আলী দীর্ঘকায় ছিলেন না। তাঁর দাড়ি অত লম্বা নয়।

চুপ করুন।

ধমক দিলেন প্রথম মৌলানা।

কেন, চুপ করব?

চুপ করুন, হজরতের নাম নিয়ে এমন বেয়াদবী করবেন না।

বেয়াদবী। ইমাম আবু হানিফা ভুল বলেছেন?

আবু হানিফা কে?

ইমামের কথা ঠিক নয়।

লা-মাজহাবীরা খুব সম্ভব। সভায় তাদের দলে আনন্দের গুঞ্জন শুরু হয়। কিন্তু হানাফিরা মৌলানার উপর চটিয়া উঠিতেছিল।

প্রথম মৌলানা আবার বলেন, চুপ করুন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি চুপ করার বান্দা নন।

কোন দলিলে এমন আজগুবি কথা পেয়েছো? তিরমিজী শরীফে আছে, হজরৎ আলীর দাড়ি নাতি পর্যন্ত নয়।

ঝুট তোমার তিরমিজী।

হানাফিরা তাহাদের মৌলানার সমর্থক। তাহারা আর চুপ থাকে না। সভায় ফিস্ফাস শব্দ শুরু হয়।

চুপ করুন।

না, আমি চুপ করব না।

বেয়াদব।

কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চলিল। তুমুল বাক-যুদ্ধ।

প্রথম মৌলানার ধৈর্য আর টেকে না। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, তুমি বেয়াদবের বাচ্চা।

তবে রে হারামজাদা।

দ্বিতীয় মৌলানা অত্যন্ত উঠিয়া প্রথম মৌলানা শাহ ফখরুদ্দিনের গালে এক চড় মারিলেন।

দ্বিতীয় মৌলানা হেফজুল্লা সাহেব প্রাথমিক তাল সামলাইয়া ধরিলেন ফখরুদ্দিনের

দাড়ি। তারপর ঠাস এক চড়।

শেষে দুইজনে পরস্পরের দাড়ি ধরিয়া চুলাচুলি গুরু করিল। সভায় হট্টগোল। দুই দল সমর্থক ছুটিয়া আসিল। মৌলানাদের দ্বন্দ্ব মুরীদানদের মধ্যেও হাতহাতির সুযোগ খুলিয়া দিল।

মারো শালা— লা-মজ্জাহবীদের-মারো শালা— হানাফিদের— ওয়াজের মজলিশে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাতারা হঠাৎ খিস্তী বয়ান শুরু করিলেন।

হাতেম বখ্শ এতক্ষণে সক্রিয়। প্রথম মৌলানার সমর্থনে তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন। হাতাহাতি থামিল না দেখিয়া তিনি অন্ধকারে গা আড়াল দিলেন। ইজ্ঞৎ বাঁচাইলেন চতুরজনের মত।

আজহার খাঁও এই ওয়াজের মজলিশে আসিয়াছিল। সে নিরীহ ব্যক্তি কিন্তু এই ব্যাপারে সে পাক্কা মুসলমান। এমন বর্বর হইয়া উঠিতে পারে সে হাত আজহার কম চালায় নাই। মজলিশের বাতি নিভিয়া গিয়াছিল। মনের সুখে সে হাতের সাধ মিটাইল। গলা-ফাটা চীৎকার করে সে: শালা হানাফিদের খতম করে দাও। কে বলিবে, আজহার নিতান্ত বেচার মানুষ। পাকা মুসলমান। ধর্মের অপমান সে সহ্য করিতে পারে না।

দাড়ি লইয়া বিরোধ বাধিয়াছিল। সভা শেষে অনেকে আস্ত দাড়ি লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিল না, কয়েকজন জখম হইল। শুধু তাই নয়, দুই গ্রাম দুই শিবিরে পরিণত হইল।

পরদিন লা-মজ্জাহবী পাড়ার লোক হানাফিদের সুযোগ পাইয়া মার দিল। হানাফিরা তার পাল্টা প্রতিশোধ লইল। মৌলানাগণ সেন্দীপতিরূপে এই গ্রাম-যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফিল্ড-মার্শালদের ফিল্ড দেখা গেল না। তাহারা সদর-অন্দরে অবস্থান করিয়া কচি মুরগির আবাদ লইতেছিলেন, সঙ্গে শোলাও পরোটা বাদ পড়ে নাই।

এক সপ্তাহ গ্রামে এই অবস্থা। আরো কতদিন কাটিত, কে জানে। সাকের এই সময় সকলের একটি উপকার করিল। প্রথম দিন সেও হুজুগে মাতিয়াছিল। পরে মৌলানাদের কীর্তি সে বুঝিতে পারে। ইহারাই এত গোলমালের খুঁটি। ভয়ানক চটিয়া গেল সে।

লাঠি হাতে সে প্রথমে হানাফি পাড়ায় উপস্থিত হইল। সে পাড়ায় প্রবেশের আগেই চীৎকার করিতে লাগিল: আমি মারামারি করতে আসিনি, যদিও আমার হাতে লাঠি আছে।

অন্যান্য প্রতিবেশী মজা দেখিতে দাঁড়াইল। এই গোয়ার লোকের সঙ্গে লাঠিবাঁজি করিতে কেহ সক্ষম হইবে না।

দহলিজ হইতে সে এক মৌলানাকে কান ধরিয়া টানিয়া আনিল। তারপর দুই চড় ও এক লাঠির ঘা দিয়া বলিল: নিকালো হিয়াসে। কাইজ্যা বাধাতে এসেছে, শালারা। চশমখোর শালারা নিজের রাগ সামলাতে পারে না। কুকুর-কুকুর। আবার মুরীদ করতে এসেছে।

মৌলানার মুরীদগণ শুদ্ধ। হুজুরের দুর্দশার মুখে কেহ ছুটিয়া আসিল না।

সাকের নিজে ওহাবী। নিজের পাড়ায় এক মৌলানাকে ভয়ানক চাবুক বাজির পর হাঁকাইয়া দিল।

গ্রাম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। প্রথমে কয়েকজন সাকেরের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, পরে দুই হাত তুলিয়া শোকর। মেয়েমহলের অনেকে সাকেরের জন্য আল্লাহর দরগায় দোয়া

প্রার্থনা করিল। ছেলেপুলে লইয়া এতদিন শান্তি ছিল না। কখন কে জখম হয়। অনেক মেয়ের বৃকের ধুকধুকানি ভাব এতদিনে গেল।

গ্রাম দুই দিনে স্বাভাবিক।

আজহার প্রকৃতিস্থ হইয়াছে পুনরায়। এই কয়দিন দরিয়াবিবি পর্যন্ত তার চেহারা দেখিয়া মনে মনে ভয় পাইত। ধর্মের নামে সে যেন জানোয়ার বনিয়া যায়, অথচ আর কখনও তার এই তেজ চোখে পড়ে না।

সুযোগ বুঝিয়া দরিয়াবিবি একদিন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, যখন কেউ বিনা দোষে তোমার উপর জুলুম করে, তখন ত ভিজে বিড়াল সেজে বসে রইলে।

হঁ।

দরিয়াবিবি ব্যঙ্গ-শব্দ করিল, হঁ।

তারপর সে সাকেরের পৌরুষের প্রশংসা আরম্ভ মাত্র আজহার নিঃশব্দে মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

আমজাদ বহু পূর্বে মাঠে গিয়াছে। স্কুলের ছুটি। তার লজ্জা লাগে মাঠের কাজে। কিন্তু বাড়ির দুর্দশা দেখিয়া পিতাকে সাহায্য করিতে বেশ আনন্দ পায়। যদিও পিতার উপর তার শ্রদ্ধা দিনদিন কমিয়া যাইতেছে। তার আকা যেন কি রকম!

জমির এক কোণে লঙ্কাচারা রোপণের জন্য মাটি তৈয়ারি হইতেছিল। লাঙল হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু পরিপাটি বাকী।

বেড়া দিতে হইবে মজবুত করিয়া। গরু ছাগলের উৎপাত লঙ্কা গাছের উপর বেশি। সারি বন্দী চারা পুঁতিবার জন্য 'আইল' সোজা করিতে হইবে।

আমজাদ এইসব কাজ খুব ভালবাসে। ছোট কোদাল লইয়া সে সোজা রেখাকার মাটি সাজাইতেছিল। এই সময় পশুরা বৃষ্টি হইয়া গেল, পানি-বওয়ার মেহনত দরকার হইল না।

হঠাৎ আজহারকে দেখিয়া সে উৎফুল্ল হয় না।

অমনি বলে, আকা।

আকা, তুমি অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছো, দেখছি।

হ্যাঁ আকা।

বেশ।

এবার লঙ্কা হোলে হাটে নিয়ে যাব না। আমাদের সারাবছর কিনতে হয়।

কিন্তু তখন হাত টান থাকলে তুমি কি তা মনে রাখবে?

লজ্জিত হয় আজহার মন্তব্যে। সত্যি তার খেয়াল থাকে না তখন। অথচ ক্ষেতের ফসল বেচিয়া দিয়া সারা বছর মুদীর দোকানের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়।

না, এবার আর বেচব না আল্লা চায়-ত।

থামিয়া গেল আজহার। হাতে টাকা আছে, তবু খটকা তার মনে। আল্লার করুণা মুছিয়া যাইতে কতক্ষণ।

দিনের আলো নিভিয়া আসিতেছে। মাঠের রূপ বদলাইয়া যায়। পিতা-পুত্রে রবি ফসলের টুকিটাকি কাজ করে।

হঠাৎ গানের আওয়াজ শোনা গেল।

পিতা-পুত্র উৎকর্ণ। গানের কলি দোহরাইয়া গায়ক গাহিতেছে :

ভগবান, তোমার মাথায় কাঁটা,

ও তোমার মাথায় কাঁটা।

যে চেয়েছে তোমার দিকে

তারই চোখে লঙ্কা-বাটা।

ও ছড়িয়ে দিলে, ছড়িয়ে দিলে

মারলে তারে তিলে তিলে

ও আমার বৃথা ফসল কাটা

ও তোমার মাথায় কাঁটা।

কণ্ঠস্বর পরিচিত।

আজহার আবার নিজমনে কাজ করিতে লাগিল।

চন্দ্রকাকা, না আব্বা?

আজহার কোন জবাব দিল না। আমজাদ মাঠের দিকে চাহিয়াছিল। গায়কের অবয়ব তখনও দৃষ্টির বাহিরে।

আনমনা আমজাদ। আজহার লক্ষ করে। কাজে গাফিলতি সে পছন্দ করে না।

কাজ কর, আমু।

চন্দ্রকাকা, না?

হুঁ, তা কি করতে চাও?

পিতার কণ্ঠস্বর উষ্ণ। আমজাদ মাথা হেঁট করিয়া ক্ষেতে লঙ্কাচারা বসায়। আড়চোখে মাঠের দিকে চাহিয়া থাকে।

যে চেয়েছে তোমার দিকে

তারই চোখে লঙ্কা বাটা।

গান পুনরায় শুরু হইয়াছে।

আমজাদ হাসিয়া বলে, আব্বা, চন্দ্র কাকা পাগল। ভগবান মানে আল্লা, না আব্বা?

কাজ কর।

ধমক দিয়া উঠিল আজহার।

কলাবনের আড়াল হইতে মেঠোপথে চন্দ্র বাহির হইল। কণ্ঠস্বর নিকটবর্তী হইতেছে। আমজাদ মনে মনে খুশি হয়। কিন্তু আনন্দ আর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। চন্দ্র কাকা আর এদিকে আসিবে না। হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া। নিকুচি করি ঝগড়ার, কি-সব বাজে কথা। আমজাদ ভিতরে তাতিয়া উঠে।

আজহার আবার আনমনা আমজাদকে কাজে মনোযোগ দিতে বলিল।

গায়ক এইদিকে আসিতেছে। আড়চোখে আমজাদ দেখিল, আজ চন্দ্র কোটাল জমির বেড়ার ওপারে থমকিয়া দাঁড়ায় নাই। সে তাহাদের দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে।

আরো নিকটে, ঠিক তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্র কোটাল।

আজহার চুপচাপ কাজ করিয়া যাইতেছে। কোটালের উপস্থিতি যেন সে অবহেলা করিতে চায়। পিতার ভয়ে আমজাদ তাহার দিকে তাকায় না।

তিনজনে নিস্তব্ধ। এমন অসোয়াস্তিকর মুহূর্ত কারো জীবনে যেন আসে নাই। কোটাল হঠাৎ বোকার মত হাসিয়া উঠিল। আমজাদ তার দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। হাসি পায় তার। শুধু পিতার ভয়ে চুপ করিয়া আছে।

—আজহার ভাই, ও খাঁসাহেব। বলিয়া চন্দ্র থামিয়া গেল। অপরপক্ষ তখনও নীরব।

এই চাচা, তোমার বাবা এবার বোবা হোয়ে গেছে নাকি?

বোবা বাবা। ও-কার আর আ-কার।

চন্দ্র আমজাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল।

আজহার বিন্দুমাত্র নড়িল না। তার হাতের কাজ অবশ্য স্তব্ধ। তারপর খিলখিল হাসিয়া চন্দ্র হঠাৎ দণ্ডায়মান আজহারের ঠিক পায়ের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া তার চোখের দিকে তাকাইল। চোখে চোখ পড়ে। কোটালের হাসি সংক্রামক। আজহার না হাসিয়া পারে না।

চন্দ্র তখন তুড়ি দিয়া এক লাফে উঠিয়া আমজাদকে কাঁধে তুলিয়া লইল। আমজাদ আজকাল বড় হইয়াছে। কাঁধে উঠিতে তার লজ্জা লাগে। কিন্তু বারণের অবসর কোথায়। এতক্ষণে সে শূন্যে।

চন্দ্র নাচিতে নাচিতে বলে, ধম্ম-টম্ম আমি মানি নে। যতসব বেজন্মাদের কীর্তি। গান ধরিল সে,

ভগবান তোমার মাথায় ঝাঁটা,

পুত্র তোমার মাথায় ঝাঁটা।

তারপরই সে বলে, আজহার ভাই, আমি ভাবতাম আমাদের সাতরকম জাত আছে। তোমাদেরও তাই। ঠিক করেছে সাকের। আমাদের শালা পুরুত ঠাউর (ঠাকুর) আর তোমাদের ওই—।

কথা শেষ করিতে পারে না সে। খিলখিল হাসির শব্দে বেলাশেষের মাঠ ভরিয়া ওঠে।

‘সুইং’ শব্দে আমজাদকে কাঁধ হইতে নামাইয়া সে বলিল, তামাক দাও।

অন্য কারো কথা বলার অবসর নাই।

চন্দ্র আবার কহিল, আমাদের পুরুত এলে আমিও দাড়ি ছিড়ে লেঙ্গা। ধর্মের নিকুচি। যতসব চালবাজি শালাদের ঝাণ্ডা লাগানোর।

আজহার এতক্ষণে মুখ খুলিল, এই পাগল চন্দর।

ঝাঁকড়া-চুল মাথা নাড়িয়া চন্দ্র পদবী গ্রহণ করিল। তারপর আমজাদের দিকে চাহিয়া সে বলিল, চাচা, তোমার বাবার দাড়ি ছিড়ে লেঙ্গা।

তিনজনে দম ভরিয়া হাসিতে থাকে এইবার।

আজহার জিজ্ঞাসা করিল, চন্দ্র, তোমার হয়েছিল কি এতদিন?

ভূতে ধরেছিল।

একদম মামদো ভূত।

হ্যাঁ, খাঁ ভাই। আমার চোখ খুলে গেছে কাল।

কাল!

হ্যাঁ।

হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া যায় চন্দ্র। তার মুখাবয়বে থরথর কম্পন দেখা যায়। অশ্রুসজল চোখ।

আজহার ভাবে, কি হইল চন্দরের। এ আবার কোন্ রকম পাগলামি! এতক্ষণ ত সে হাসিতেছিল।

চন্দ্র পাথর। তার চোখ দিয়া অশ্রুর ফোঁটা ঝরিতেছে।

কি হোল, চন্দর?

আজহার নিকটে আসিয়া সমব্যথা মাখা দুই হাত বাড়াইল।

কি হোয়েছে?

শালতরু যেন শিলীভূত।

কি হয়েছে?

শিবু, ইসমাইল সদরের হাসপাতালে মারা গেছে।

মারা গেছে।

আজহারের মুখে আর কোন কথা নাই। সেও বজ্রাহত, স্তব্ধ হইয়া গেল।

জলকর নইয়া দাস্কার সময় শিবু ও ইসমাইল বেশ জীর্ণ হইয়াছিল। সদর হাসপাতালে ছিল তারা এতদিন। দুইজনে খুব পরিচিত বন্ধু।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকে তিনজন। সন্ধ্যার কালিমালেপন শুরু হইয়াছে দিক-দিগন্তরে।

ফোঁপাইয়া উঠিল চন্দ্র, ওদের বাড়িতে কি কান্না। শিবুর বৌ ছেলেপুলে নিয়ে হয়ত না খেয়ে মরবে। রোহিণী আর হাতেম শালার কি আসে যায়। আমার চোখ খুলে গেছে কাল সদরের হাসপাতালে।

ফোঁপাইতে থাকে চন্দ্র, কথা শেষ হয় না।

আজহার নির্বাক। চন্দ্র আর কোন কথা বলিল না, নিজীবের মত বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আর কাহারও মুখ দেখা যায় না। নিস্তব্ধতা প্রথম ভাঙিয়া আজহার বলিল, চলো চন্দর, বাড়ি চলো।

চন্দ্র কোন জবাব না দিয়া উঠিয়া পড়িল। আর কোন বাক্যালাপ করিল না মাত্র। সে মাঠের পথ ধরিয়াছে।

পিতা-পুত্র হতবাক। তাহারা গ্রামের পথে অগ্রসর হইল। আমজাদের অশ্বোয়াস্তি, বহুদিন পরে চন্দ্র কাকার সঙ্গে দেখা। কিন্তু সন্ধ্যাটি আজ মাঠেই মারা গেল।

কাঠা দশেক জমি পার হইয়া আমজাদ গুনিতে পায় চন্দ্র কোটাল যেন গান ধরিয়াছে আজহার বলে, সত্যি পাগল চন্দর। তাড়ি গিলেছে বোধহয়।

না, আব্বা। মুখে গন্ধ নেই একদম।

সায়ং-আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তরে মেঠো সুর বাতাসের আলিঙ্গনে ভাসিয়া যায়। আমজাদে: শ্রুতিভ্রম মাত্র।

ভগবান, তোমার মাথায় ঝাঁটা,
ও তোমার মাথায় ঝাঁটা
যে চেয়েছে তোমার দিকে
তারই চোখে লঙ্কা বাটা।
ও তোমার মাথায় ঝাঁটা॥

আমজাদের কান সুরের অন্বেষণে চলে।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল, আক্কা, ভগবান মানে আল্লা, না?
আজহার ঠাণ্ডা কণ্ঠে জবাব দিল, হ্যাঁ।

২৬

হাসুবৌ আজকাল প্রায়ই দরিয়াবিবির খোঁজ লইতে আসে। শাওড়ীর কড়া তাগিদের তাড়া না আসিলে এই বাড়ি হইতে যাওয়ার নাম করে না সে।

আমজাদ মোনাদিরের খবর লইয়াছিল। সে তার আগেকার বাড়িতে যায় নাই। দরিয়াবিবি এ খবর জানে না। হাসুবৌ আমজাদকে তাহা বলিতে বারণ করিয়াছিল। পাছে তার মা আরো ব্যাকুল হইয়া পড়ে। আমজাদ তাই মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সে ওই গাঁয়ে আছে, মা।

হাসুবৌ গোপনে আমজাদের উপর ভার দিয়াছে, মুনির খবর আনা চাই-ই কিন্তু। হাসু চাচী, আমি আরো কয়েকজনকে তাগাদা দিয়েছি। এই ষড়যন্ত্রের কোন খোঁজ দরিয়াবিবি রাখে না। সে চলিয়া গিয়াছে, তা যাক। কোন উপায় ত আর নাই। তবু আত্মীয়দের সঙ্গে আছে, দরিয়াবিবির বুকে যেন বাঁধা থাকে সে।

হাসুবৌ জিজ্ঞাসা করিল, আমুর মা বুবু, তোমার নৃতন মেয়েটি কিন্তু বেশ। আমাকে দিয়ে দাও, আমার ত ছেলেমেয়ে নেই।

তা কি দেওয়া যায়, পাগলী।

আমার কত সাধ একটা ছেলে— কানা খোঁড়াও যদি একটা ছেলে কি মেয়ে পেতাম।

দরিয়াবিবি এই বক্ত্যা-নারীর ব্যথা অনুভব করে।

আল্লা দিলে হবে। তোর বয়স ত চলে যায় নি।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল হাসুবৌ নীরবে।

এমন সময় আসিল আমিরন চাচী। সঙ্গে আমিয়া।

দরিয়াবিবি খুব খুশি হয়, এসো বুবু।

কৈফিয়ৎ দিতে থাকে আমিরন চাচী, “এতদিন পরে আজ একটু ফুরসৎ পেয়েছি ‘জান্’-ঝালাপালা কাজে কাজে।”

আসলে আমাদের মনে নেই।

দরিয়াবিবি কৃত্রিম ও কুটিল হাসির ছায়ায় চাহিয়া থাকে।

তুমি ত বলবেই দরিয়াবু! সত্যি নান ঝঞ্ঝাট।

পেটে আর ভাত সৈঁধোয় না।

কেন?

তারপর আমিরন চাচী তার দেবরের কাহিনী বলে। জমিগুলি হস্তগত করিতে সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তিন-চার বছর পরে আশিয়াকে বিদায় করিতে এই জমিগুলি কাজে লাগিত। হয়ত জমি দেখাইয়া কোন ঘর-জামাই পাওয়া যাইত। ওই ত এক রত্তি মেয়ে। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া ভিটায় বাস অসম্ভব।

দরিয়াবিবির সহানুভূতি আজও হ্রাস হয় না।

আশিয়ার জন্য অত মাথা ঘামিয়ে না। আল্লার মাল আল্লার হাতে সঁপে দেবে। কিন্তু তোমার দেবরটা এত ছোটলোক!

আর ঘরে বসে থাকে কী? পরের দিকে চেয়ে আছে শকুনের মত।

আশিয়া মা'র পাশে ছিল না। আমজাদের সহিত সে দাওয়ার বাহিরে কাঁঠাল তলায় নানা কথায় ব্যস্ত।

মুনি আর এলো না?

আমজাদ বিমর্ষ কণ্ঠে জবাব দিল, সে চলে গেছে কি-না। মা এখনও তার জন্য কত কাঁদে।

কবে যে আবার আসবে। তোর মুনিভাই কিন্তু বেশ।

বেশ, না?

হ্যাঁ।

মুনিভাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে না।

খোঁজ করে নিয়ে আয় না তাকে।

খোঁজ নিয়েছি।

আসল কথা প্রায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। হাসুবৌর উপদেশ স্মরণ হয় অকস্মাৎ।

কথা ঘুরাইয়া আমজাদ বলে, খোঁজ নিয়েছি। আসবে ইচ্ছামত।

আশিয়া জবাবে সন্তুষ্ট হয় না।

তুমি বড় মিছে কথা বলো। খোঁজ নিলে আর আসে না?

সে আসতে চায় না।

তার মুখে পড়া বেশ মানায়।

মোনাতির সকল প্রশ্ন ও জবাবের কেন্দ্র। আর যেন কোন কথা নাই পৃথিবীতে।

আমিরন চাচী, হাসুবৌ, দরিয়াবিবি গৃহস্থালির নানা গল্প করে। দুঃখ-লাঘবিনী শক্তি আছে কথার। একের বেদনা-কাহিনী অপরের দুঃখান্নির মুখে ছাই চাপা দিতে পারে। সহানুভূতির হেতু আরো অটুট হয় তার জোরে।

হাসুবৌকে আমিরন চাচী বলে, হতভাগি, ছেলেমেয়ে চাস, এই দ্যাখ, আমরা পুড়ে মরছি।

এমন পুড়ে মরতেই বা জায়গা পাই কোথায়?

দরিয়াবিবির মন কয়েকদিন ভাল ছিল। নিত্যনূতন অভাব-বিজড়িত সংসারে যেন

সামান্য সচ্ছলতার হাওয়া ঢুকিয়াছে। গল্পে গল্পে সময় কাটিয়া যায়। আশিয়া এই বাড়ি আসিলে আর যাইতে চায় না।।

প্রায় সন্ধ্যা। এবার বাড়ি ফিরিতে হয়। মা'র ডাক আশিয়ার কানে যায় না।

তুমি যাও না, মা।

তুই এই বাড়িতে থাক তবে, বুবুর বৌ হয়ে।

দরিয়াবিবি কিছুক্ষণ আগে তার গোপন-মনে এমনই কল্পনার দুর্গ রচনা করিয়াছিল। মোনাদির আর চার বছরে ষোলয় পড়িবে। তখন—

আমিরন চাচীর কথা শুনিয়া দরিয়াবিবি হাসিয়া উঠিল।

বেশ, রেখে যাও।

আমার গায়ে হাওয়া লাগে। খাইয়ে-পরিয়ে এখন মানুষ ত করো।

হাসুবৌ কথা গায়ে মাখিয়া লইল।

আমাকে দাও, আমি খাওয়াব-পরাব।

বেশ, নিয়ে যা।

আয়, আশিয়া আয় না, মা।

সাকেরের মা'র চড়া আওয়াজ দূর হইতে শোনা যায়। হাসুবৌ চলিয়া গেল।

আমজাদ চাচীদের আগাইয়া দিতে আসিল। মা'র বারণ সে শোনে না। তার আর ভূতের ভয় করে না। চন্দ্র কাকার গানের ঢেউয়ে সব কোথায আসিয়া গিয়াছে। হোক না সন্ধ্যা।

অস্পষ্ট বনের সড়কে মা-মেয়ে সন্তর্পণে ভ্রমসর হয়। আমজাদ কিছুদূর গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

সন্ধ্যার আঁধার-বন্দী বাতাস বেড়িয়াছে শিরশির বহিয়া যায়। সেদিনও সন্ধ্যা ছিল। সেদিন মুনিভাই সঙ্গে ছিল। হঠাৎ তার দুই চোখ ছাপাইয়া পানি আসে। মুনিভাইকে সে সত্যি ভালবাসিয়াছিল।

২৭

চন্দ্র কোটালের অবসর নাই।

এই বছর ভাল ফসল হইয়াছিল। গ্রামে গ্রামে ভাঁড়-নাচের আসর বসে। অনেক বায়না কোটালের। রাজেন্দ্র সাজ-পোশাক আনিয়াছিল। বেশ জাঁক-জমকের সঙ্গে তার দল জমিয়া উঠিয়াছে। এই জন্য বিভিন্ন গ্রাম হইতে ডাক আসে।

আজহার নূতন ব্যবসা-পত্তনের সঙ্গী পায় না। কোটালও তাকে কিছুদিন সবুর করিতে বলিল। মনঃক্ষুণ্ণ হয় আজহার। হয়ত পরে তার হাতে টাকা থাকিবে না। সে নিজেই কোন সুরাহা করিবে।

গঞ্জের দিনে ইয়াকুব আসিয়াছিল। সেও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। আজহার তার কথায় সায় দেয় না। ইয়াকুব একা আসে না ত। সঙ্গে হাট-বাজার। মুরগি, ঘী এমনকি সরু চাল পর্যন্ত সে লইয়া আসে। আজহার এসব পছন্দ করে না। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগে।

এইজন্য ইয়াকুবের সঙ্গে কোন অংশীদারী কাজ তার ভাল লাগে না।

দরিয়াবাবি আজকাল ইয়াকুবের চাল-চলন সহজে গ্রহণ করে। তার আত্মসম্মান সহজে তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে না। আপনজন আত্মীয়, সে কিছু সঙ্গে আনিলে, অত সংবেদনশীল হইলে চলিবে কেন?

আজহার চুপচাপ থাকে। মেহমানদারীর কাজে দরিয়াবাবির বেশ উৎসাহ দেখা যায়। বহুদিন পরে এই বাড়িতে পলান্নের সৌরভ পাওয়া গেল। আরো দু'তিন রকমের তরকারী হইল। ইয়াকুব লুচি তৈয়ারী করিতে বলিয়াছিল। দরিয়াবাবির সম্মতি ছিল না। কাল সকালে নাস্তার সময় তৈয়ারী হইবে। বাড়ির ছেলেরা ইয়াকুবের নামে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে। ইয়াকুব চাচা নামে মধু ঝরে না শুধু, নষ্টমার জিহ্বায় রীতিমত লালা ঝরে।

আমজাদের স্কুলের বেতন সে নিয়মিত দিয়া আসিতেছে।

কয়েক বছর পূর্বে দরিয়াবাবি সামান্য দান-গ্রহণে আসেকজানের সহিত বিবাদ করিত। সেই তেজ অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বামীর মানসিকতা সে চেনে। আজহারের উপর তার ক্ষোভ হ্রাস পায় না। আত্মীয়-স্বজনের সহিত অত বাঁধাবাঁধি নিয়ম চলে না।

রাত্রে আহারের সময় আজহার ডাল ও দৈনন্দিন বরাদ্দ একটি আলুর তরকারী দিয়া ভোজ সমাধা করিল। মাগুর মাছ আনিয়াছিল ইয়াকুব। সে তা স্পর্শ করিল না।

দরিয়াবাবি শুধায়, গোশ্বত খাবে না?

না, আমার পেটের গোলমাল আছে।

আসলে আজহার মনের কথা চাপিয়া গেল। ইয়াকুবের কয়েকটি টাকা সে লইয়াছে তাহা যেন তার গায়ে হুল ফুটাইতেছে। টাকা ফেরত দেওয়ার উপায় নাই। তার স্বপুত্রাজ্য যে ধূলিসাৎ হইয়া যায় টাকাগুলির অভাবে এই বাধ্য-বাধকতার ছায়ায় আজহার নিরুপায়। নচেৎ সে ইয়াকুবের মুখোমুখি এই দাঁতব্যাগিরি বন্ধ করিবার হুকুম দিত।

দরিয়াবাবি কোথায় যা দিতে হয়, ভালরূপেই জানে।

রাত্রে স্বামীকে বলিল, আমুর ইস্কুলের মাইনে মাসে মাসে দিতে হয়রান। সামনে বছর ফসল যদি না হয়, কিভাবে যে দিন কাটবে।

আজহার কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিল।

জবাব দাও, এসব কথা মনে আছে! খালি ব্যবসা-ব্যবসা। কতবারই কত টাকা উড়িয়ে দিলে।

আল্লার মরজী হলে কতক্ষণ।

বিরক্ত হয় দরিয়াবাবি, আল্লার মরজী মরজী করে ত দশ বছর কেটে গেল। এখন তোমার মরজী হলে বাঁচা যায়।

আজহার জবাব দিতে গিয়া থামিয়া গেল।

ইয়াকুব ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করো না। দেখো না, আল্লার মরজী কোন্ দিকে যায়।

ওর সঙ্গে ব্যবসা পোষাবে না।

তা পোষাবে কেন?

দরিয়াবাবি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আজহারের নির্বুদ্ধিতার শত রকম ব্যাখ্যা করিল।

কিন্তু অপর পক্ষ নীরব। আনমনা কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে জানে না।

পরদিন সকালে আবার নাস্তার বহর। ইয়াকুব দরিয়াবিবিকে তার বাৎসরিক মুনাফার বয়ান দিল। তিন হাজার টাকা পাইয়াছে পাটে, গোলদারীর দোকানে দু'হাজার ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাস্তা খাওয়ার সময় আজহারকে পাওয়া গেল না। সে মাঠে চলিয়া গিয়াছে। গোয়াল-ঘরে গরু-ছাগল কিছু নাই। দরিয়াবিবির অনুমান মিথ্যা নয়।

ইয়াকুব বলিল, ভাবী সাহেব, কেমন যেন আমাদের ভাই সাহেব। আমার সঙ্গে কাজকর্ম করত, আল্লা মুখ তুলে চাইতেন।

মাথায় ছিট আছে। কে পারবে বলো ওর সঙ্গে।

আপনার মত আক্কেল থাকলে আমি এতদিনে লাখপতি হয়ে যেতাম।

প্রশংসায় সম্বষ্ট হয় দরিয়াবিবি। দেবরকে সে পান সাজিয়া দিতেছিল। বাটায় সুপারি নাই। একবার উঠিল দরিয়াবিবি— সিকায় সুপারি আছে। ঘরে প্রবেশের সময় সে একবার পিছন ফেরে। ইয়াকুব তার গমনপথ অথবা নিতম্বের দিকে চাহিয়া আছে, বোঝা যায় না। কিন্তু তার দৃষ্টি খুব শোভন মনে হয় না।

পানের বাটার নিকট ফিরিয়া আসিল দরিয়াবিবি সংকুচিত।

চোখাচোখি ইয়াকুবের দিকে সে তাকায়। না, তার দৃষ্টিভ্রম। আসলে ইয়াকুবের দৃষ্টি যেন এইরূপ।

অবসর সময়ে তার মনে আন্দোলন জাগে। ফ্রান্সে লোকটা খারাপ নয়। তবে অমার্জিত রুচি। এই জাতীয় দ্বন্দ্বের ভিতর দরিয়াবিবি সমস্যার সমাধান খোঁজে। ব্যবসাদার লম্পট সম্বন্ধে দরিয়াবিবির কোন জ্ঞান ছিল না। আজহার তার গুণগ্রামের হৃদিস জানিত বলিয়া দূরে দূরে থাকিত।

সেদিন সকালেই ইয়াকুব চলিয়া গেল। দুপুরবেলা বিছানা পরিষ্কার করিতে গিয়া বালিশের নীচে একটি দশ টাকার নোট পাইল, দাঁড়াইয়া রহিল দরিয়াবিবি কিছুক্ষণ স্তব্ধ। মুঠির মধ্যে নোট অজানিতেই সে দুমড়াইতে থাকে। সচেতন হইলে সে সংকুচিত নোটটি আঁচলে বাঁধিয়া রাখিল।

মাঠের সামান্য কাজ করিয়া আজহার চন্দ্র কোটালের বাড়ি গিয়াছিল। সে বিকালে গানের বায়নায যাইবে। সাজগোজ হইতেছে সকালে।

চন্দ্র আজহারকে বসিতে দিয়া তামাক সাজিতে লাগিল। শিবুর বৌ আগে আসিয়াছিল। একটি বছর চার বয়সের ছেলে মা'র অঙ্গসংলগ্ন হইয়া আঙ্গুল চুষিতেছে। কাঁখে আর একটি মেয়ে।

আজহারের চোখে পড়িতে শিবুর বৌ ঘোমটা বাড়াইয়া দিল।

কেমন আছে, বৌ।

বৌ অশ্রুসজল কণ্ঠেই জবাব দিল, ভগবান মেরেছেন। আমাদের আর থাকাথাকি, চাচা।

শিবু আজহারকে চাচা বলিয়া ডাকিত। সেই সূত্রে এই আত্মীয়তা।

আজহার সমবেদনার কোন কথা যেন খুঁজিয়া পায় না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। শিবুর বৌর কানে তা পৌছায়।

চন্দ্র এমন সময় কলিকা হাতে আজহারের পাশে আসিয়া বসিল।

দেখেছ ত খাঁ সাহেব। এই তোমার-আমার ধর্ম।

তা দেখছি।

দেখছ। ঘোড়ার ডিম দেখছ। ধর্ম না কচু। হাতেম বখ্শ যদি মুসলমান হয়, কি রোহিণী হিন্দু হয় তবে চণ্ডাল কে?

দেখছি সব।

তুমি কিছু দেখতে পাও না, খাঁ। টাকার নামে শালারা ধার্মিক। খামাখা দুটো গরীবের প্রাণ গেল।

শিবুর বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তুমি গিয়েছিলে মা, রোহিণী চৌধুরীর কাছে? গিয়েছিলাম, পাঁচটা টাকা দিয়েছিল।

বড় স্রিয়মাণ কণ্ঠ শিবুর বৌর।

শোনো, খাঁ। পাঁচ টাকা। অমন টাকায় মুতে দাও। একটা লোকের দাম পাঁচ টাকা। আজহার ভাই, গরীবে গরীবে যতদিন বেঁচে আছি, আর ধর্মের কথা কানে আনছি না। আমিও রোহিণীর ফাঁদে পড়েছিলাম। শালা রোহিণী।

গালাগাল দিয়ে না খামাখা।

গালাগাল দেব না। তুমি শিবুর বৌকে খাওয়াতে পারবে? ধরো, খাওয়াতে পারলে, কিন্তু ওর স্বামীকে জ্যান্ত করে দিতে পারবে? গালাগাল দোব না—?

রক্তচক্ষু কোটাল হুকা টানিতে লাগিল।

শিবুর ছেলোটো দুইজনের দিকে অবোধ মন্থনে চাহিয়া থাকে।

গালাগাল দোব না। ইসমাইলের বৌ ছেলেপুলে নিয়ে বাবার বাড়ি চলে গেল। তারাও গরীব। তুমি ত চেন দশহাটার মল্লিকদের।

হুঁ চিনি।

শিবুর বৌর কেউ নেই। তার চালে খড় নেই দু'আঁটি। বলছি, বৌ এখানে এসে থাক। আমি আর একটা কুঁড়ে তুলব। গাঁয়ের বাসেদ, পাঁড়, গণেশ সবাই গায়ে-গতরে খেটে দেবে বলেছে।

আজহার বলিল, যখন যা দরকার আমাকে ডেকো।

তা আলবৎ ডাকব। হাতেম বখ্শের গুপ্তিগুরু শহরে মদ টানে, সে মুসলমান, তুমিও তার কথায় উঠো বসো, না?

তুমিও ত রোহিণীর কথায় নেচেছিলে?

লজ্জিত কোটাল জবাব দিল, তা ঠিক। কিন্তু আর নয়। শালাদের ধর্মের নিকুচি। আর আজহার ভাই, তোমার মিন্মিনে স্বভাব আমার ভাল লাগে না। জোর গলায় বুক ঠুকে ওদের কাছে কথা বলতে হবে।

ওরা বড়লোক। পুলিশ-দারোগা—।

কথা তার মুখ হইতে চন্দ্র যেন লুফিয়া লইল, আইন নেই? আমরা ত দু'চারজন নই। গাঁয়ের হাজার হাজার গরীব। পুলিশ যদি আইনমত না চলে, ওদের কথায় ওঠে-বসে; আমাদের লাঠি নেই, বল নেই—?

ভাঁটার মত দুই চক্ষু ঘোরে কোটালের।

হঠাৎ থামিয়া সে বলে, কথায় কথায় দেবী হয়ে গেল, অনেক গোছগাছ বাকী। পরে এসো তুমি। শিবু বৌমা, এখানে খেয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি যেয়ো—

দুইজনে আসর ভাঙিয়া দিল।

আজহার গ্রামের পথে শিবুর বৌর কথা ভাবে। ভবিষ্যতের সংস্থান তারও নাই। একমাত্র আশ্রয় পথ। না, সে আবার ভাগ্য অবশেষে বাহির হইবে। টাকার জন্য এত হীনতা যখন স্বীকার করিয়াছে, ঘরে পড়িয়া থাকা ভাল নয়। কপাল ফিরিবে না তার?

খোদার মরজী হইলে কতক্ষণ!

২৮

সকাল-সকাল দরিয়াবাবি গৃহস্থালির কাজ সারিয়া বসিয়াছিল। কোলে ছোট খুকী শরী।

ঈষৎ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। আমজাদ নিজের ঘরে জোরে জোরে পাঠাভ্যাস করিতেছে। আজহার দাওয়ায় বসিয়া হুঁকা লইয়া মশগুল। শুড়শুড় শব্দ উঠিতেছে।

মুনির মা!

আজহার ডাক দিল। মোনাদির আসিবার পর দরিয়াবাবির নাম বদলাইয়া ফেলিয়াছিল সে। কালেভদ্রে আমুর মা বলিয়া ডাক দিত।

কেন?

আজ ওদিকের গাঁয়ে গিয়েছিলাম।

কেন?

বীজ ধান কেনা দরকার।

উত্তপ্ত কণ্ঠ দরিয়াবাবির, তা আমাকে শোনানোর কোন দরকার আছে?

না। এমনি—।

আজহার চুপ করিয়া গেল। কিন্তু তার কথার খেঁই শেষ হয় নাই, কণ্ঠে তার পরিচয়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ সে বলে, ও গাঁয়ে গিয়েছিলাম, শুনলাম মুনি নাকি—। দরিয়াবাবি উৎকর্ষ হয় এইবার।

আজহার বলিতে থাকে : মুনি, ওগাঁয়ে নেই।

নেই!

শ্রুতি-ব্রমের উপর এখনও বিশ্বাস আছে দরিয়াবাবির।

পুনরুক্তি করিল, কে নেই?

মুনি।

মুনি ও-গাঁয়ে নেই?

না।

কতদিন নেই!

এখান থেকে যাওয়ার পর আর নাকি ওখানে যায় নি।

আমজাদের ডাক পড়িল। সে পড়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল।

দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করে, আমু, তোর মুনিভাই তবে যে তার চাচার বাড়িতে আছে, আগে বলেছিলি?

আমি ত তাদের বাড়ি যাইনি। শুনে এসেছিলাম।

দরিয়াবিবি ক্ষোভে আগুন হইয়া উঠে, শুনে এসেছিলি—।

তারপর পুত্রের দিকে কটমট চোখে তাকায়।

আমজাদ প্রায় কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম। নিজের সাফাই সে দক্ষ আসামীর মত গাহিয়া গেল। আজহারের আফশোস বড় কম নয়। নিজের উপর বারবার ধিক্কার দিতে লাগিল।

আমার চণ্ডাল মেজাজে সেদিন আগুন ধরেছিল। এই হাতে ‘আজার’ হোক।

দরিয়াবিবি আর কোন কথা বলিল না। কারো বাক্যলাপ তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল কি-না সন্দেহের ব্যাপার।

সমগ্র দাওয়া স্তব্ধ এক নিমেষে।

আমজাদ পা টিপিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তার পাঠ্যাভ্যাস নিভিয়া গিয়াছে। কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। আজহার হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। দরিয়াবিবি কখন শরীকে লইয়া উঠিয়া গিয়াছে, তার খোঁজও সে রাখিল না। সেই অবস্থায় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙার পর তার অচেনা ঠেকে সব জায়গা। দাওয়ায় পিদিম নাই। উঠানে অন্ধকার আর অন্ধকার। একরাশ ঝিঁ ঝিঁ উর্ধ্বশ্বাসে জ্বলিতেছে। আজহারের মস্তিষ্কে তার অনুকরণ চলে। সন্তর্পণে সে ঘরের দ্বারাে করায়ত্ত করিল। না, সব বন্ধ। আমজাদের ঘরও খোলা নাই। অভুক্ত সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেও ঘুমাইয়া পড়িল দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া।

পরদিন খুব ভোরে আজহার মনে চলিয়া গেল।

দরিয়াবিবির ডাকে আমিরন চাচী হাজির হইল পরদিন। মুনির খোঁজ গ্রহণের সে প্রতিশ্রুতি দিল।

বিকালে আমিরন চাচী হতাশ। সংবাদ দিয়া গেল মুনি চাচার বাড়ি যায় নাই। ভয়ানক কান্না জুড়িল দরিয়াবিবি। কারো স্তোক বাক্যে তা থামে না। হাসুবৌ আসিয়াছিল। তারও চোখের পানি সহজে থামে না।

ও যদি একদম আর এ বাড়ি না আসত আমার দুঃখ ছিল না। কিন্তু এলো, আমি তাড়িয়ে দিলাম—।

দরিয়াবিবি ফোঁপাইতে থাকে।

বেটাছেলে, কোথাও গেছে। আমি আরো খোঁজ নিচ্ছি। আশ্বাস দিল আমিরন চাচী।

আর সে ফিরে আসবে! কোথা গেল, অতটুকু কচি ছেলে।

আমি গণৎকারের কাছে গুনিয়ে আসব। কোন্ দিকে গেছে, কবে ফিরে আসবে ঠিক বলে দেবে, সেবার আমার বোনের দেবর এমনি—।

আমিরন চাচী নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বলিল।

দরিয়াবিবি আশ্বস্ত হয় না, তবু অনুরোধ করিল, আমি পাঁচ পয়সা দেব, বোন।

পাঁচ পয়সা আর একটা সুপারি লাগে।

আমিরন চাচী জবাব দিল।

তুমি এখনই নিয়ে যাও।

আমিয়া বাড়িতে আছে, আমিরন চাচী আর দেবী করিতে পারে না। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। বেশ অন্ধকার চারিদিক। বন-বাদাড় ভাঙিয়া যাইতে হইবে।

পয়সা, সুপারি আমি দেব। মুনি আমার ছেলে নয় নাকি? চাচীর সহানুভূতি অকৃত্রিম। হাসুবৌ ও আমিরন চাচী বিদায় লইল।

আজহার মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমজাদ শুধু সে সংবাদ জানে। থমথমে আবহাওয়ার জন্য পিতাকে একবার দেখিয়া সে নিজের ঘরে ডিপার আলোয় চুপিচুপি পড়িতেছিল। কিন্তু পড়ায় তার কোন মন ছিল না।

দরিয়াবিবি সকলে চলিয়া গেলে আমজাদের ঘরে আসিল।

আমু।

মা।

কাল ও গাঁয়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবি। আর একবার গঞ্জের দিকে যাস।

আচ্ছা, মা। মুনিভাইয়ের জন্য আমারও মন কেমন করে।

সত্যি সজল হইয়া উঠে আমজাদের চক্ষু।

তোর আক্কা মাঠ থেকে আসে নি?

এসেছিল ত। খানিক আগে দেখেছি।

ডিপা হাতে দরিয়াবিবি ঘরে প্রবেশ করিল। বাঁশের আলনায়ে আজহারের লুঙি-পিরহান কিছু নাই। কাটা দেওয়ালের গায়ে একটি কপুঙ্গী ছিল। আজহারের সূতা-কল্লিক-পাটা উষো ও যাবতীয় রাজমিস্ত্রীর সরঞ্জাম থাকিত। সব শূন্য।

দরিয়াবিবি চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইল এবং সবকিছু নিমেষে উপলব্ধি করিল।

২৯

তোমার বাবা আবার রুই-পোনা ধরতে গেছে। চুনো চানা খেয়ে কি খাঁসাহেবের দিন কাটে? জানো, চাচা?

চন্দ্র ও আমজাদের মধ্যে বাক্যালাপ হইতেছিল। হাসিয়া হাসিয়া কোটাল কথাগুলি উচ্চারণ করিল। দরিয়াবিবি দহলিজের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে, চন্দ্রের তা খেয়াল ছিল না। তার মুখের হাসি তখনই নিভিয়া গেল।

দরিয়াবিবি চন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়াছিল। আমজাদ জানে, বিপদে আপদে মা প্রথমে চন্দ্র কাকার কথাই মনে করে। পুত্রের মারফৎ এতক্ষণ অনেক কথাই দরিয়াবিবি তাহাকে শোনাইয়াছে।

তাই।

হাসি চাপা দিতে চন্দ্র কোটাল আবার উচ্চারণ করিল, তাই ত ভাবী সাহেব। এমন মানুষ আমি আর একটা দেখিনি। মাঝে মাঝে কি যেন ঝোক চাপে! দু'হণ্টা গেল। মানুষ একটা খবর ত দেয়। তা-ও না।

দরিয়াবিবির দীর্ঘশ্বাস কোটালের কানে যায়। চন্দ্র সহসা কোন জবাব দিতে পারে না। আবহাওয়া হালকা করিতে সে ওস্তাদ। কিন্তু সেও কেমন যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল। আমজাদ বলিল, জানো কাকা, আব্বা আমাদের দেখতে পারে না। তাই বাড়ি ছেড়ে পালায়।

চন্দ্র প্রতিবাদ জানাইল, তা না, চাচা। খেয়ালী মানুষ। সংসার নিয়ে কষ্ট পায়। তাই মাঝে মাঝে ঐ সব করে। ভাবে দুঃখ যাবে। কিন্তু দুঃখ কি সহজে যায়? বিটিশ রাজত্ব। আগে বিটিশ যাক, রোহিণী-হাতেম বখ্শ ঐ শালারা যাক, তবে না দুঃখ যাবে।

আমজাদ এত কথা বোঝে না।

সে সায় দিতে রাজি নয়। পিতার প্রতি তার আক্রোশ আছে।

কিন্তু ব্যাপার কি জানো, তোমার বাবা—। চন্দ্র কোটালের বাক্য আড়াল হইতে পূর্ণ করিল দরিয়াবিবি, 'চুপ শয়তান'।

চন্দ্র এবার হাসিল। সে যেন আত্মস্থ হইয়াছে। ঠিক বলেছেন ভাবী। আমার মনে যা হয়, মুখে তা বলে ফেলি। কিন্তু খাঁ ভাই? উহু জান গেলেও বেশি কথা বলে না। যদি কারও হাজার টাকায় 'চুপ শয়তান' দরকার হোত, আমি তোমার বাবাকে বেচে দিতাম বাবা। চন্দ্র হা হা শব্দে হাসিতে লাগিল। আমজাদ সঙ্গে যোগ দিল।

এমন সময় ভিতর হইতে ধমকের সুরে দরিয়াবিবি ডাকিল, আমু, তোর কাকাকে জমির কথা জিজ্ঞেস কর।

দুই জনের হাসি হঠাৎ বন্ধ হইল। আমজাদ নেয়, জবাব দিল কোটাল।

ভাবী সাহেব, তার জন্য আপনি ঘাবড়াবেন না। ধান আমি নিজে কেটে দেব। এবার খড়ের দাম খুব বেশি। মানুষ ঘরদোর ছাওয়াচ্ছে। পনর-ষোল টাকা কাহন। আমি ভাবছি, খড় কিছু রেখে বাকী বেচে দেব।

কাহন খানেক রেখে দেবেন। মুদুকণ্ঠে দরিয়াবিবি জবাব দিল।

চন্দ্র আবার বলিল, শুধু ধান কাটা নয়, তরমুজ আর কুমড়া বিঘে খানেক জমিতে দেব ভাবছি। কিন্তু আমার আসর গানের বায়না আছে। আমজাদ চাচা আছে, দেখি কি বন্দোবস্ত করা যায়।

দরিয়াবিবি এবার আমজাদকে ডাকিয়া বলে, আমু, তোর চাচাকে পান তামাক এনে দে।

ঘোর আপত্তি জানাইল চন্দ্র। না, এখন কিছু দরকার নেই। আমি আজ উঠি, ভাবী সাহেব। আমার ক্ষেতে অনেক কাজ পড়ে আছে। সত্যিই চন্দ্র কোটাল উঠিয়া পড়িল। আমজাদ তার অনুসরণে গেল। মহেশভাঙার জলাজঙ্গল ভরা পথে পথে চন্দ্র কাকার সহিত বেড়াইতে পাইলে সে আর কিছু চায় না। কত হাসির গান, মশকরা আর প্রাণ ঢালা আদর না পাওয়া যায় চন্দ্রকাকার কাছ হইতে!

ভাবী সাহেব, ঘাবড়াবেন না— চন্দ্রের স্তোকবাক্যে দরিয়াবিবি জোর পায়, কিন্তু আসোয়াস্তি যায় না। গত বিশ বছর এমন কতবার ঘটিয়াছে। বার-ফাট্টা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যদি আর না আসে। দৈহিক শক্তি এতদিন দরিয়াবিবির সহায় ছিল। আজও স্বাস্থ্য তার অটুট। কিন্তু মন বড় নিস্তেজ ও নিঃসঙ্গ।

আত্ম-চিন্তায় মশগুল দরিয়াবিবি। উঠানে একটি ছাগলকে কাঁঠাল পাতা খাওয়াইতেছিল। শরী দাওয়ায় চুপচাপ একা ঘুমাইয়া। সে বড় লক্ষ্মী মেয়ে, কেবল ক্ষুধার সময় কাঁদে। পেটভরা থাকিলে শুধু ঘুমায়। দরিয়াবিবি তাই বড় নিশ্চিত, নির্বিঘ্নে সাংসারিক কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। ছাগলগুলি দরিয়াবিবির বড় প্রিয়। প্রতি বছর বছর বাচ্চা হয়। ঈদ ইত্যাদি পর্ব উপলক্ষে লোকে ছাগল কেনে। তখন ছাগল বেচায় একটা আনন্দ আছে। দাম বেশি পাওয়া যায়, তা ছাড়া টানাটানির দিন একটু সহজ হয়।

এই প্রাণীদের লইয়া দরিয়াবিবি ব্যস্ত। আমিরন চাচী কখন ধীরে ধীরে উঠানে ঢুকিয়াছে তা সে লক্ষ করে নাই। পাতা খাওয়ানো ত একটা দৈনন্দিন কাজ। দরিয়াবিবি ছাগলগুলির দিকে ভালরূপে তাকায় নাই। কাঁঠালের ডালপালা শুধু আগাইয়া দিতেছিল। মনে নানা হিসাব নিকাশের ঝড়।

আমিরন চাচী দরিয়াবিবির থমথমে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে ডাক দিল, বুবু।

দরিয়াবিবির ঠোটে অভ্যর্থনামুখর হাসি।

কখন এলে?

তারও খোঁজ নেই? কর্তাবিরাগী, গিল্লীর মন এমন উদাস না হলে চলে— বলিয়া আমিরন চাচী হাসিয়া উঠিলেন।

দরিয়াবিবির মুখ আবার থমথমে। আমিরন চাচী অপ্রস্তুত হইয়া যায়। দরিয়াবিবি সেদিকে চোখপড়া মাত্র সে ছাগলগুলিকে হাঁকাইয়া দিয়া চাচীর কোমর জড়াইয়া বলিল, ঘরের ভিতর চলো বুবু। কি আমার কর্তা বে— তার জন্য আবার চিন্তা!

আমিরন চাচী সহানুভূতির সুরে জবাব দিল, এমন লোক—।

কিন্তু যেন ঝাপটা দিয়া দরিয়াবিবি তার মুখের কথা নিভাইয়া দিল। চলো, পান খাই, দুটো কথা বলি।

নদীর ধারে বাস

দুক্ষু বারো মাস

রাখো বাজে কথা।

আমিরন চাচী দরিয়াবিবির সুখের কৃত্রিমতা কিছুই ধরিতে পারে না।

দুইজনে সত্যই কিছুক্ষণ আজোবাজে আলাপ করিল। গ্রামের কথা, পাড়া-পড়শীদের কথা। সাকের কোথায় দাঙ্গা করিতে গিয়াছে, হাসুবৌ শান্তুড়ীর গঞ্জন আজকাল অনেক বেশি শোনে, ইত্যাদি।

আমিরন চাচী কাজের লোক। গরু-বাহুর-হাঁস-মুরগী লইয়া সে এক রাজ্যের অধিশ্বরী। বেশিক্ষণ কথা-ফোড়নের সময় কোথায়? একটি খবর দিতে আসিয়া সে এতক্ষণ সুযোগ খুঁজিতেছিল। হঠাৎ চাচী বলিয়া ফেলিল, দরিয়াবুবু, একটা খবর আছে।

কত সংবাদের জন্যই দরিয়াবিবি হা-প্রত্যাশায় নিমজ্জিত, তখনই উৎকর্ণ উন্মুখ ব্যথ্যেতায় চাচীর দিকে তাকাইল।

আমাদের মুনি চাচার খবর পেয়েছি।

দরিয়াবিবি অন্য কোন সংবাদ পাইলে যেন সন্তুষ্ট হইত। বেশি উৎসাহ না দেখাইয়া সহজ গলায় বলিল, কি খবর?

মুনি চাচা ও বাড়ি থেকে চলে গেছে। আরো পাঁচ ক্রোশ দূরে কি স্কুল আছে, সেখানেই পড়ে। চাচাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আর নেই। আমিরন চাচী খুব তরল গলায় পরিবেশন করিল।

যেখানেই থাক, ভাল থাক। আমার ছেলে ত নয়, আমার কি জোর আছে! ভয়ানক নির্লিপ্ত শোনায়ে দরিয়াবিবির কণ্ঠ।

প্রতিবাদ জানাইল আমিরন চাচী, তোমার ছেলে নয় কে বললে? দেখো রক্তের টান, চাচা আবার তোমার কোলেই ফিরে আসবে।

আসুক বা না আসুক, যেখানে থাক বেঁচে থাক। তুমি কোথা থেকে খবর পেলে?

আমি খবর পেয়েছি। আমার এক মামাতো ভাই আছে মুনিদের গাঁয়ের পাশে। তাকে খোঁজ নিতে বলেছিলাম।...তোমার মেহেরবানী বুঝে।

তারপর আমিরন চাচী কর্তব্যের ডাকেই উঠিয়া পড়িল। আশ্বিয়া একা বাড়িতে আছে। দেবর বিধবার সম্পত্তি হরণের নানা পায়তারা কষিতেছে। আর বেশিক্ষণ এখানে কাটানো চলে না। আমিরন চাচী কিন্তু অবাক হয়। আজ তার বুঝে পুত্র প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিল না। অথচ অন্য সময় ঘটনার পর ঘটনা এই এক কথাই বড় হইয়া দেখা দেয়।

দরিয়াবিবি আমিরন চাচীকে দহলিজ পর্যন্ত আগাইয়া দিল ও আবার আসার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু উঠানের দিকে অগ্রসর হইতেই তার পা যেন আর চলে না। ধীরে ধীরে ছোট্ট শরীর বিছানার পাশে আসিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল ও তার ঘুমন্ত মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তখন দরিয়াবিবি কী ভাবিতেছিল, শুধু সেই তার খবর রাখে।

৩০

গঞ্জের পথে ইয়াকুব আসিয়াছিল খোঁজ-খবর লইতে। সে খালি হাতে আসে না। ছেলেদের জন্য মিষ্টি, তা ছাড়া এত জিনিসপত্র আনে যার প্রাচুর্যই যে কোন সংসারের পক্ষে তিন-চার দিনের জন্য লোভনীয়। দরিয়াবিবি প্রথম প্রথম মৃদু আপত্তি জানাইত। এখন নিজেই ইয়াকুব আনীত মায়া পেটিকা নিজের হাতে খোলে। অবশ্য উৎসাহ দেখায় না বিশেষ।

এবার ইয়াকুব বড় বড় কই ও বড় বড় চিংড়ি মাছ পর্যন্ত আনিয়াছিল। আজহার ঘরে থাকিলে মাঝে মাঝে মাছ ধরিতে যায়। তখন এমন মাছ এই বাড়ির হাঁড়িতে উঠে। নচেৎ এত দামে এমন আমিষ আহারের সামর্থ্য কোথায়?

ইয়াকুব ফোড়ন দিয়া বলিল, ভাবী, এবার মটরগুঁটি পাওয়া গেল না। বড় চিংড়ি আর মটরগুঁটি আমার খুব পছন্দ।

তোমার ক্ষেতে হয় না? দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করিল।

না। অসময়ে সব সময় কি আর এই ফসল তোলা যায়?

ছেলেরা ইয়াকুব চাচাকে ঘিরিয়া থাকে। নষ্টমা কাছ ছাড়া হয় না; বরং অন্য সময় মাঝে জিজ্ঞাসা করে, চাচা কবে আসবে মা? কারণ চাচা একা আসে না। আমজাদ কাছ

ঘেঁষিয়া বসে। সে লাজুক, তাই সে কম কথা বলে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইয়াকুবের সঙ্গ ত্যাগ করে না।

লৌকিকতার রেশ আর নাই। মেহমান হইলেও ইয়াকুব আহারের ফিরিস্তি নিজেই দিয়া থাকে। কারণ যোগাড় সে বহন করিয়া আনে।

দরিয়াবিবি বিকালে লুচি ভাজিতেছিল। পাশে কোন ছেলেপুলে নাই। নঈমা একবার আসিয়াছিল শিশুসুলভ প্রত্যাশায়। কিন্তু মা বসিতে দেয় নাই, ধমক দিয়া তাহাদের ভাগাইয়াছে। আরো বকুনি খাইয়াছে আমজাদ। এত বড় ছেলে স্কুলে পড়িস। এমন হাঁ খেয়ে কেন? কোনদিন লুচি দেখিসনি চোখে? ইহার চোটে দুরন্ত পেটুকও ছুটিয়া পলাইত।

আজহারের কথা এই বাড়িতে ছেলেরা কেহ মুখে আনে না। ইয়াকুব তার কথা জিজ্ঞাসা করে সারাদিন। কুশল জিজ্ঞাসার রীতিটুকু পর্যন্ত সে পালন করে নাই। অথচ আত্মীয়।

কড়ায় গরম তেলে ফেলা লুচির ছ্যাক ছ্যাক শব্দ হইতেছিল। দরিয়াবিবি আনমনা কাজ করিয়া যায়। সে নিজের চিন্তায় বৃন্দ, তা-ও মুখাবয়বে প্রমাণ। দরিয়াবিবির সুডৌল গৌর মুখ চুলার আঁচে ঘামিতেছিল।

ভাবী, ভাবী— আপনার রান্না কত দূর। ডাক দিতে দিতে ইয়াকুব চুলাশালে প্রবেশ করিল।

বেগুন ভাজা হয়ে গেছে, এখন লুচি ভাজছি। ইয়াকুবের দিকে না তাকাইয়া চুলার ভিতর এক খণ্ড লাকড়ি ঠেলিতে ঠেলিতে দরিয়াবিবি জবাব দিল।

এখানেই দিন, গরম গরম লুচি খাওয়া যাক।

বেশ। কিন্তু বসার জায়গা কোথায়?

বসার জায়গা কি হবে? এই আমি বুসে দেখিয়ে দিচ্ছি— বলিয়া ইয়াকুব উবু বসিয়া পড়িল।

তোমার কাপড়-চোপড় ময়লা হবে। ইয়াকুবের পরনে সিল্কের লুঙি। গায়ে শাদা শার্ট। দরিয়াবিবি মিথ্যা বলে নাই।

না, আমি ত আর ছেলেমানুষ নই। যেন কত রসিকতা করা হইল। ইয়াকুব বেদম হাসিয়া উঠিল।

বেশ, বসো। আমি থালা বাটি নামিয়ে আনি।

দরিয়াবিবি মাচাং হইতে লোয়াজিমা কয়েকটি নামাইয়া আনিল এবং বেগুনভাজা ও লুচি পরিবেশন করিতে লাগিল।

থালায় হাত নামাইয়া ইয়াকুব বলিল, ভাবী, ছেলেদের ডাকেন।

ওরা খেয়েছে। সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত জবাব। ইয়াকুব চাহিয়া দেখিল দরিয়াবিবি তখন লুচি-বেলায় মগ্ন। উত্তপ্ত কড়ার দিকে তার আড়চোখের দৃষ্টি। সেখানে টগবগ শব্দে তেল ফুটিতেছে।

সত্যি ওরা খেয়েছে?

হ্যাঁ। দরিয়াবিবির কণ্ঠ ঈষৎ তীক্ষ্ণ শোনায।

দরিয়াবিবি গরম লুচি ছাঁকিয়া পাতে দিতে লাগিল। ইয়াকুব ধীরে ধীরে খাওয়া শুরু করে। ভাবী, একটু পানি।

দরিয়াবিবি ঝটপট হুকুম তামিল করিল। আর কোন বাক্যালাপ যেন এগোয় না। ইয়াকুব দরিয়াবিবিকে রীতিমত ভয় করে। তার চোখের দিকে সহজে তাকাইতে পারে না। থম্‌থমে মুখ যেন শাসনভঙ্গীর আদল। ইয়াকুব অসোয়াস্তি বোধ করে। তবে সে দুই স্ত্রীর পতিদেব। মনের গোপনে একটা আত্মবিশ্বাস আছে তার। কিন্তু এখানে যেন সব ঠাণ্ডা হইয়া যায়। দরিয়াবিবি কত শান্ত। অথচ ইয়াকুব অসোয়াস্তি অনুভব করে।

নিজের মনেই সে বলিয়া যায়, আপনার বাড়ি এলে যা শান্তি পাওয়া যায়, আর কোথাও তা মেলে না।

আবার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কেন?

কেন? যত্নআত্মি কে করে?

যত্নআত্মি! দরিয়াবিবি হাসিয়া উঠিল। ইয়াকুব কান খাড়া করিল। কথাটা বিদ্রূপের মত শোনাইতেছে না ত? কিন্তু কিছু উপলব্ধি করিতে পারি না। দরিয়াবিবি কোন সুযোগ না দিয়া বলিল, তুমি যত্ন-আত্মি কোথায় দেখলে?

কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা দোকানদারী ভাব।

ইয়াকুব মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়। তবু আবহাওয়া আরো সন্নিহিত করিতে বলিল, না, ভাবী, এসব কপালের কথা। এমন শান্তি আমি ঘরেও পাই না।

তোমার ত খোদার মরজী দু'বিবি আছে?

বিবি! বিবি কোথায় দেখলেন ভাবী?

ঘরের সে দুটো তবে কি?

গোশ্বতের ঢিবি।

দরিয়াবিবি এবার হাসিয়া ইয়াকুবের দিকে তাকাইল। তখনই চোখ নামাইয়া বলিল, আমি বিবিসাবদের দেখিনি। মোটা হলে যদি গোশ্বতের ঢিবি হয়, আমি ত গোশ্বতের পাহাড়।

না ভাবী। আপনি সংসারের লক্ষ্মী।

দরিয়াবিবি এই প্রশংসায় সন্তুষ্ট হয়। সেও হাসিতে থাকে এবং বলে, নূতন কথা শোনালে ভাই।

ইয়াকুব এই নৈকট্যের প্রসাদই ত চায়। সে খুশি হইয়া বলিল, বাচ্চাদের ডাকেন, আমাকে আর দুটো লুচি দিন।

সহজ গলায় দরিয়াবিবি জবাব দিল, বাচ্চারা পরে খাবে। তুমি এখন খাও।

ইয়াকুব খাওয়া শেষ করিয়া বলিল, ভাবী, আমি একটু বেড়িয়ে আসি। আপনাদের গাঁ খানা বড় জংলাটে। টাকা পকেটে করে ঘোরা যায় না। আমার ব্যাগটা রাখেন।

আমার কাছে কেন?

ইয়াকুব টাকার ব্যাগ হাতে বলিল, চুরি হওয়ার ভয় আছে।

কত টাকা আছে?

পাঁচশ'।

না ভাই। এত টাকা— হঠাৎ রাত্রে চোর এসে নিয়ে গেলে—।

- আপনার কাছে চোর টাকা চুরি করতে আসবে না। ইয়াকুব মৃদু হাসি ছিটাইয়া বলিল।

তবে কেন আসবে?

কথা ঘুরাইয়া ইয়াকুব জবাব দিল, চোরের ভয় নেই? আপনার যা সাহস। আমার গোশতের টিবির। এমন জংলা জায়গায় থাকলে দশটা দারওয়ান রাখতে হোত।

দরিয়াববি হাত পাতিয়া দিল। ইয়াকুব মানিবাগ দিতে বিলম্ব করিল না। বাহিরে তখন গোধূলি। ইয়াকুব বাহির হইয়া আসিল। দরিয়াববি আঁচলে ব্যাগ বাঁধিয়া আবার কাজে মনোযোগ দিল।

পরদিন দুপুরে ইয়াকুব গঞ্জের নৌকা ধরিবে। যাইবার সময় সে বলিল, ভাবী, আমার ব্যাগটা দিন।

দরিয়াববি আমানত ফিরাইয়া দেওয়ার সময় বলিল, ভাই, তোমার কাছে একটা আরজ আছে।

ভয়ানক অধীরতা প্রকাশ করিল ইয়াকুব। সে ভাবিয়াছিল, ব্যাগে আরো টাকা আছে, হয়ত দরিয়াববি ঋণের আবেদন জানাইবে।

আপনার আরজ কি? হুকুম বলুন। তাড়াতাড়ি বলুন।

একটা খোঁজ-খবর নিও।

তা আর নেব না। আমি মনে করেন আপনাদের পর, ভাবী? ইয়াকুব দরিয়াববির মুখের দিকে তাকায়। সে কিন্তু নতমুখী। দৃষ্টি মাটির উপর কি যেন খুঁজিতেছে।

খুব মৃদু কণ্ঠেই দরিয়াববি জবাব দিল, আমাদেরই খোঁজ নয়।

ইয়াকুব হতাশ। আবার প্রশ্ন করিল, তবে কার?

তোমার ভাইয়ের খবরটা।

ওহ্ আজহার ভাইয়ের! তিনি ত খোঁজলী লোক, আসবেন একদিন। ইয়াকুব জবাব দিল অত্যন্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে।

তার জন্য আপনি এত উত্তেজিত কেন? বিস্ময় প্রকাশ করিল ইয়াকুব।

স্বামীর জন্য এত মাথাব্যথা কেন, তুমি তা-ই জিজ্ঞেস করছ? দরিয়াববি সোজাসুজি ইয়াকুবের দিকে তাকাইল।

না-না, তা নয়। আমি ভাবছি, একটু বিরাগী ধরনের মানুষ তার জন্যে ভেবে লাভ কী। ইয়াকুব তখনই দৃষ্টি নামাইয়া অপরাধী সুলভ কণ্ঠে জানাইল।

তবু ভাবতে হয়। শহরে মালপত্র কিনতে তোমার লোক যায়, তাই খবর নিতে বলছি।

নিশ্চয়, খবর নেব বৈকি। আমি তার কোন ত্রুটি রাখব না।

নিও ভাই। আল্লা তোমার ভাল করবে। দরিয়াববির কণ্ঠস্বরে কোন খাদ ছিল না।

গঞ্জের বেলা হয়ে গেল। আপনাকে খবর দেব, আপনি নিশ্চিত থাকেন।

ইয়াকুব আর দেরী করিল না। দরিয়াববির ঘরে ফিরিয়া আসিল।

৩১

দরিয়াববি আগে আশ পাশের দু'একটি ভিটা ভাড়া আর কারো বাড়ি যাইত না। তার নিজেরও লজ্জা করিত। তা'ছাড়া ছিল আজহারের ভয়। এমনি শান্ত মানুষ, কিন্তু বেশরিয়তী

দেখিলে আর রক্ষা ছিল না। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সাংসারিক প্রয়োজনে দরিয়াবিবিকে অন্য পাড়ায় যাইতে হয়।

আমিরন চাচীর বাড়ি পাড়ার এক টেরে। পথে এত ঝোপ-জঙ্গল। আর এই সড়ক প্রায় নির্জন থাকে। কারণ লোক-চলাচল কম। দরিয়াবিবির পর্যন্ত ভয় হয়। তাই সঙ্গে আমজাদকে লইত। নঈমা মা ছাড়া ঘরে থাকে না। সেও প্রায় সঙ্গে যায়। আমজাদের এই পথে হাঁটিতে খুব আরাম লাগে। সে এইজন্যে মাঝে মাঝে ‘আমিরন চাচীর বাড়ি চলো’ বলিয়া দরিয়াবিবির কাছে বায়না ধরে।

চাচীর বাড়ির আরো আকর্ষণ ছিল। আমিরন চাচী ঘরে ছেলেদের জন্য মোয়া, নাড়ু কিছু-না-কিছু সব সময় মজুদ রাখে। আর আখিয়া মেয়েটি বড় প্রাণবন্ত। সেখানে গেলে মেয়েদের গল্পের অবসরে বেশ কিছুক্ষণ খেলা করা যায়।

আমজাদ সেদিন জিদ ধরিয়া দরিয়াবিবিকে চাচীর বাড়ি লইয়া গেল। হাতে বিশেষ কাজ নাই। দরিয়াবিবির কোন আপত্তি ছিল না। সেখানে গেলে মন কিছু হালকা হয়।

আমিরন চাচী গরুকে এই মাত্র জাব দিয়া হাত ধুইতেছিল। হঠাৎ দরিয়াবিবি ও ছেলেদের দেখিয়া স্মিতহাস্যে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল, এসো বুঝ এসো। আরে, আজ আমজাদ চাচা, নঈমা খালা শুদ্ধ এসেছে। ও আখিয়া, বেরিয়ে আয়।

ডাক দেওয়ার আগেই মেয়ে হাজির।

আখিয়া আর একটু ডাগর হইয়াছে। চাঞ্চল্য আরো কমে নাই। সে আমজাদের দুই হাত ধরিয়া বলিল, আমু ভাই, চলো ঘুঘুর বাসা দেখে আসি। তালগাছের পাশে একটা করঞ্জা গাছের কোটরে বাসা বানিয়াছে।

চল।

আর কার তোয়াক্কা। আখিয়ার পিছু পিছু আমজাদও দৌড়াইতে লাগিল। পিছন হইতে আমিরন চাচী চীৎকার দিয়া ডাকিল, তোরা বেশি ঝোপের ভিতর যাসনি, বড় সাপের জুলুম বেড়েছে। কিন্তু তার কথা কে শোনে?

আমিরন চাচী পান সাজিয়া দিল। দরিয়াবিবির সাধারণত পান খাওয়ার অভ্যাস নাই। তবে চাচীর দান প্রত্যাখ্যান করে না।

আমিরন চাচী জিজ্ঞাসা করিল, আজ কি রান্না হলো?

রান্না সেরে এসেছি।

আমিরন চাচী যেন প্রশ্নের জবাব পাইয়াছে। তাই অন্য প্রশ্ন উত্থাপন করিল।

আমার দেওরটা আসলে লোক খারাপ ছিল না।

আমিরন চাচীর কথার মধ্যে দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করিল, আবার জুলুম ধরেছে নাকি?

অভ্যেস আর সহজে যায়! সেদিন খামাখা আমার ঝাড়ের দু’খানা বাঁশ কেটে নিল। নিক, ওর ছেলের কবরে লাগবে। আমিরন চাচীর গলা হইতে যেন এক ঝলক আগুন বাহির হইল।

দরিয়াবিবিও ঘৃণা প্রকাশ করল, বেওয়া মানুষ, তাকে দু’গাছি এনে দেওয়া দূরে থাক, তারই চুরি, এসব সইবে না।

ওদের সয়। পরের মেরে মেরে বড় হচ্ছে। এদিকে লেফাফা ঠিক আছে। আজকাল

আবার মসজিদের মুয়াজ্জিনগিরি করে।

নঈমার চোখ দিয়া পানি পড়ে। সে দৌড়াদৌড়ি আর ভালবাসে না। চাচী দু'টি মোয়া দিয়াছিল। সে তা চিবাইতে ব্যস্ত। বোধহয় গলায় বাঁধিয়াছিল, তাই চাচীর নিকট পানি চাহিল।

কথায় ছেদ পড়িল। দরিয়াবিবি তখন চাচীর উঠানের চারিদিকে চাহিয়া থাকে। এখানে আসিলে সত্যি, বুকে জোর পাওয়া যায়। বিধবা মানুষ। অথচ সংসার বেশ চলাইয়া যাইতেছে। উঠানটি নিখুঁত পরিষ্কার থাকে। আশেপাশে সজি আনাজের গাছ। গত বছর চাচী একটি লেবু গাছ লাগাইয়াছিল। তা-ও পত্র-সম্ভারে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সংসার বড় নয়, এইজন্যই আমিমন সামাল দিতে পারে। দরিয়াবিবি ভাবিতে লাগিল।

আমিমন চাচী পানির গ্লাস নঈমার হাতে দিল।

ওর জন্য আবার গ্লাস দিয়েছ, এখনই ভাঙবে। দরিয়াবিবি সাবধান করিল।

আমিমন চাচী আপত্তি জানাইল, আমি ধরে আছি। ঘরে কিইবা আছে বুঝে। এই গ্লাসটা, তোমার ভাই তখন বেঁচে। হরিশপুরের মেলা থেকে এনেছিল।

আমার ঘরেও সব ভেঙেছে। পুরাতন কাঁচের দু'চারটে জিনিস আছে, তুলে রেখেছি। কেউ মানুষ জন এলে বের করতে হয়। দরিয়াবিবি সায় দিল।

আমিমন চাচীর সময় কম। বিকালে গরু বাছুরের খবরদারীতে বহু সময় যায়। শাকসব্জীর গাছ আছে আশে-পাশে; পানি না দিলে চলে না। চাচী তাই দ্রুত কথা বলিতেছিল। আজ মোনাদির কি আজহারের প্রসঙ্গ আমিমন চাচী মুখ দিয়া বাহির করিল না, পাছে দরিয়াবিবি কষ্ট পায় বা হঠাৎ কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়।

কিন্তু কথা প্রসঙ্গে এই সাপই ছোবল তুলিল।

আমিমন চাচী বলিতেছিল, বুঝে একা মানুষ হলে আমি কি ভয় পেতাম। তেমন ডরানেওয়ালী মায়ে পয়দা করে নি। কিন্তু ঐ যে-এক গলার কাঁটা রয়েছে।

দরিয়াবিবি কথাটা ঠাহর করিতে পারিল না সহজে। গলার কাঁটা। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সে চাচীর মুখের দিকে তাকাইল।

আমিমন চাচী হাসিয়া উঠিল। তুমি আমার গলার কাঁটা দেখিনি? বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল। দরিয়াবিবি খামাখা হাসে, আর সত্যিই চাচীর কণ্ঠনালীর দিকে তাকায়।

আমিমন চাচী হাসে আর বলে, তুমি ডাক্তার হেকিম হলে আমার কাঁটা দেখতে পেতে।

আমাকে আগে বলো নি, বুঝে! দরিয়াবিবির বিস্ময়ের অবধি নাই। আমিমন চাচী আরো হাসিতে থাকে। আর বিশেষ বেলা নাই। তাই বলিল, দাঁড়াও বুঝে, গলার কাঁটা দেখাচ্ছি। অ আখিয়া, অ আখিয়া। শেষের দিকে চাচী চীৎকার জুড়িল।

নিকটেই ছিল, আমজাদ ও আখিয়া আসিয়া উপস্থিত। ঐ আমার গলার কাঁটা, চাচী আখিয়ার দিকে আঙুল বাড়াইল।

কি মা? আখিয়া খেলা ছাড়িয়া আসিয়াছে। এখানে দাঁড়াইতে রাজি নয়।

যা, খেল্ গে।

ছেলেমেয়ে দুটি আবার দৌড়াইয়া পলাইল। তখন দরিয়াবিবি হাসিতে হাসিতে বলে,
তুমি লোককে এমন বোকা বানাতে পারো।

গলার কাঁটা নয়? একা হলে ঝাড়া হাত পা যা খুশি করতাম। যেমন ইচ্ছে থাকতাম।
বুবু, এখন কত কথা ভাবতে হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবনায় নিদ ধরে না।
চাচীর মুখের উপর দিয়া ছায়া খেলিয়া গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দরিয়াবিবি বলিল, বুবু, আমার কতগুলো দ্যাখো। সব ত বেঁচে
নেই। এইগুলো ত আমার পায়ের বেড়ি। ক'বছরে কি যেন হয়ে গেলাম।

তবু ওদের ছাড়া ঘর মানায় না। হাসুবৌটার দশা দ্যাখো। সোয়ামীর চোখের বালি,
শাউড়ীর কাঁটা। একটা ছেলেপুলে নেই।

ও বেশ আছে। যার নেই, তার এক ধান্দা। যার আছে তার শতেক ধান্দা।

হক্ কথা বুবু।

আমার মুনটা এখানে থাকলে, আমি কোন কিছুতেই ভয় পেতাম না।

আমিরন চাচী এই প্রসঙ্গ এড়াইতে চায়। কিন্তু দরিয়াবিবি রেহাই দিল না।

মুনি থাকলে, আমি আশ্বিনাকে ঘরে নিয়ে যেতাম। কি তোমার কাছেই থাকত।
তোমার আর কেউ নেই— একটা ছেলে সংসারে বাড়ত।

আমিরন চাচী যেন চাঁদের স্বপ্নে বিভোর। বলিল, বুবু, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।
আহ্ আমার কি সে কপাল হবে। তুমি রাজি হোলেও ঐ ভাই? তোমরা উঁচু ঋ বংশ।

তালপুকুর ঘটি ডোবে না। বেশ ব্যঙ্গসুরে দরিয়াবিবি বলিল, আমার ছেলের বিয়ে
দিলে কে কী বলবে? সে ত আর মোনাদিরের ঘাপ নয়।

আমিরন চাচী বড় খুশি হয়। কিন্তু মিথ্যা কল্পনা, তা উপলব্ধি করেও।

কিন্তু ছেলেটা চলে গেল—

দরিয়াবিবি বড় বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। আমিরন চাচী তাড়াতাড়ি ছেলেদের ডাকিয়া নাড়ু
খাওয়াইল। সেই হুটগোলে সহজ আবহাওয়া ফিরিয়া আসে। সন্ধ্যা হইতে আর দেরি
নাই। দরিয়াবিবি কাজের মর্যাদা জানে। চাচীকে সে ছুটি দিল।

পৃথিবী কত বড়। পাক্কী-জানালায় ফাঁক দিয়া কতটুকু আর দেখা যায়। ঝোপে-
ঝোপে এই সড়ক পথে হাঁটিবার সময় আমজাদের মত দরিয়াবিবিও অদ্ভুত আশ্বাদ পায়।

গা-ঢাকা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। জঙ্গলে জঙ্গলে তখন জোনাকিরা প্রদীপ কাড়াকাড়ি শুরু
করিয়াছিল।

৩২

চন্দ্র একরাশ তাড়ি গিলিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। ভিটার কাছাকাছি আসিতে দেখা গেল,
তার ঘাড়ে একটি আধপোড়া চেলা কাঠ। শাসান হইতে চন্দ্র তুলিয়া লইয়াছিল, তা আর
বুঝিতে দেবী হয় না।

দুপুর বেলা মাঠে কেউ থাকে না। এতক্ষণ আপনমনে চন্দ্র গান করিতেছিল। কিন্তু
বাড়ির কাছে হঠাৎ গান বন্ধ হইয়া গেল। গায়ক পর মুহূর্তে যোদ্ধা সাজিয়াছে। কোটাল

পোড়া চেলা কাঠখানি বাঁই-বাঁই শব্দে ঘুরাইতেছে আর মুখে ‘হট-যাও, হট-যাও’ রব।

চন্দ্রমণি, তার ছেলেরা আর কোটালের স্ত্রী হঠাৎ হিন্দী চীৎকার শুনিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। প্রথমে বিস্ময়, তারপর সকলে তামাসা দেখিতে লাগিল। চন্দ্রমণির দুই ছেলে মামার কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া খুন। কোটালের স্ত্রী কিন্তু খুব চটিয়াছিল। তাড়ি ত চন্দ্র কোটালের কাছে জল। আপত্তি সেখানে নেয়। এই অবেলায় মড়াকাঠ কাঁধের উপর! এমন অলক্ষ্যে কাণ্ড কোটাল-স্ত্রীর সহ্যের বাহিরে।

সেও চীৎকার করিয়া বলিল, তুমি এসো ঘরে, তোমার ‘হট-যাও’ আমি বের করব। চন্দ্রমণির চোখ ভ্রাতৃজায়ার দিকে। ছি ছি, দাদার যত বয়স বাড়ছে, তত টিটেমি বাড়ছে।

তুমি ঐ কাঠ নিয়ে ভিটের উপর একবার ওঠো দেখি। কোটাল-গিন্নী শাসাইতে লাগিল।

চন্দ্র হঠাৎ চেলাকাঠ ঘুরানো থামাইল, তারপর চীৎকার করিয়া শুধাইল, কিয়া হয়।

কিয়া হয়? তোমার হুঙ্কাহুয়া বের করব, একবার ওঠো দেখি। কোটাল আবার যোদ্ধার হুঙ্কারে চেলাকাঠ ঘুরাইতে লাগিল। কিন্তু ভিটার নিকটে কয়েকটা চারা করঞ্জা গাছের কাছে আসিয়া থামিল। যোগীন তখন মামার উদ্দেশে ডাক দিল, মামা, উপরে এসো না, মামী মারবে।

চূপ বেটো। আমি জমিদার হ্যায়, হ্যামকো কোন্ রোকেগা। কাঁধে গদা লইয়া ভীমের মত চন্দ্র সটান খাড়া হইল। বাবরী চুল বাতাসে এলোমেলো। চক্ষু দুটো নেশার ছলকে গোল ভাঁটার মত। যোগীনের ছোট ভাই ত রীতিমত ভয় পাইয়া মার আঁচলে আশ্রয় লইল।

ভিটার উপরে কোটাল-পত্নী কোমরে কাপড় জুড়াইয়া হুংকার হাড়িল, মড়াকাঠ ফেলে ভাল মানুষের মত আবার নদীতে স্নান করে এসো। না হলে— স্ত্রীর বন্ধমুষ্টি, চন্দ্র ভালরূপে ঠাहर করিল।

হট যাও, হাম জমিদার হ্যায়। তুমিও কোটাল সমস্ত মাঠের দিকে আঙ্গুল অর্ধবৃত্তাকারে বাড়াইয়া বলিল, হট যাও, সমস্ত জমি আমার হ্যায়। ইয়াকি পায় হ্যায়— রোকেদেগা।

একবার ভিটের উপর উঠে দ্যাখো। কোটাল পত্নী ভ্যাংচাইয়া বলিল।

কোটাল জবাব না দিয়া চেলাকাঠখানির সাহায্যে ধাঁই ধাঁই চারা গাছগুলি পিটাইতে লাগিল আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার— এইসব আমার প্রজা আছে—বাত নেই শোন্তা? কিছুক্ষণ এই তরুপ্রজা ঠ্যাঙ্গানো চলিল। ভিটার উপরে সকলে তখন বেদম হাসিতে শুরু করিয়াছে। কোটালের বিরোচিত শৌর্যের উৎসাহ আরো বাড়িয়া যায়।

গিন্নী চীৎকার দিল, এই পাগল— পাগল।

পাগল! যোদ্ধা মুগুর উঁচাইয়া থামিল। প্রথমে ব্যঙ্গের হাসি, পরে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে হুঙ্কার হাড়িল, পাগল! জমিদার শালা পাগল? .

পাগল, পাগল।

ছেলেরা চীৎকার দিয়া হাসিল, পাগল, পাগল!

সব মার ডালেগা— বলিয়া মুগুর-বিশারদ আবার কল্লিত প্রজাদের শায়েস্তা করিতে লাগিল। নেশা বেজায় চড়িয়াছিল।

প্রতিপক্ষ তখন হাসিয়া লুটাইবার উপক্রম। সুযোগ বুঝিয়া চন্দ্র ভিটার দিকে এক পা অগ্রসর হইল। তখন গিন্নী একটা চেলাকাঠ লইয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্র চীৎকার দিয়া বলিল, পাগল না হোলে মানুষ ঠ্যাঙায়? সব মার ডালো।

আবার মুগ্ধবাজি চলিল।

খিলখিল নারী হাস্যে তখন অবেলার রং আরো ঘন হয়।

কতক্ষণ এমন চলিত কে জনে? এই সময় আমজাদ ভিটার পথে উপস্থিত হইল। দরিয়াবির জরুরী আদেশেই সে এই দিকে আসিয়াছিল। সে ভাষাভাষা খাইয়া গেল। কাকার নূতন কীর্তি। কিন্তু সে রণংদেহি মূর্তি দেখিয়া বেশ ভয় পাইয়াছিল। মা'র আদেশ হাতে করিয়াই ফিরিয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছিল। হঠাৎ যোদ্ধার নজর সেদিকে গেল।

প্রজারা নিস্তার পাইল। মুগ্ধ উচাইয়া মহাবীর আমজাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমজাদের ভয়ে মুখ শুকাইয়া যায়। সে সাহসের উপর ভর দিয়া বলিয়া ফেলিল, কাকা আপনাকে মা ডাকছে। খুব দরকার।

যোদ্ধার কানে যেন কথাটা গেল না। গজেন্দ্র-গমন ও স্বক-শোভিত গদা অবিচল থাকে।

কিন্তু চন্দ্র ভয়ের ফুরসৎ দিল না। হঠাৎ গদা ফেলিয়া সে আমজাদকে কাঁধে তুলিয়া লইল। ছেলেবেলা বেশ মজা লাগিত! এখন আমজাদ কিশোর, তার বড় লজ্জা করে। কাকা, আমাকে নামিয়ে দাও। সে মিনতি জানাইল। কিন্তু নেশাখোর নিজের খেয়ালে বিভোর। কবিগানের সর্দার তখন গান ও নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে।

চাচা এল অবেলায়।

এখন কোথায় কি পাই?

খেতে দিওয়া দায়।

হাঁস রয়েছে পুকুর পাড়ে

মুন্সি আর ডিম না পাড়ে

ঝোপে-ঝোপে বন-বাদাড়ে

শেয়ালছানাও নাই ॥

চন্দ্র হঠাৎ মাথা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল উঠিল, তওবা, মুসলমানের ছেলে। তারপর ওয়াক-শব্দে থুথু ফেলিল। গানের নূতন কলি শুরু হয়।

ভাইপো তুমি কর না ভাবনা

আমি ওসব কিছুই খাব না।

ঘরে আছে মুটকী চাচী

তারে কর না জবাই ॥

আহা চাচা, আক্কেল বটে

বলিহারি, বলিহারি যাই ॥

চন্দ্র ঝাঁপড়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভিটার উপর হাসির মণ্ডল ছুটিল। পড়ন্ত বেলা। দিকে দিকে রং লাগিয়াছে। ঝাঁকুনি খাওয়া গান মাঠে মাঠে রেশ রাখিয়া যায়।

ঘরে আছে মুটকী চাচী

তারে কর না জবাই ॥

সলজ্জ, তবু আমজাদ কাঁধের উপর হাসিতে লাগিল।

বছর ঘুরিয়া গেল।

সূর্য-প্রদক্ষিণ শুধু স্থাবর-জঙ্গমের সহগামী নয়। সংসারের বিচিত্র প্রক্ষেপও সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়। সচ্ছলতা-অনটন, হাসি-কান্না বিচিত্র ছন্দ তার দাগ রাখিয়া যায়।

এই আবর্ত দরিয়াবিককে টানিয়া লইয়া গেল ক্রমশঃ দিশাহারা পথে। এক ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল স্বামী আর নিরুদ্দিষ্ট প্রবাসী নয়। আজহার ফিরিয়া আসিয়াছিল মাত্র তিন সপ্তাহের মেয়াদ লইয়া। এক বছরে কত কি-না করিয়াছে। রাজমন্ত্রী তার আদিম পেশা, ইটের পাঁজার সর্দারী, মসজিদের সহকারী আর মনোহারীর দোকান— তার আর এক মরীচিকা-মাথা সখ। নূতন মোড় ফেরার স্বপ্নে সে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বাড়ি ফেরার আগে সে একটি দোকান পাতিয়াছিল। তার নিরীহ শান্ত মনেও তখন অস্থিরতার ছোঁয়াচ। নিজের দিকে সে নিজে চাহিতে শিখিয়াছিল। নামাজে মন থাকে না। জায়নামাজের পাটির উপর কখনও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সেজ্জদা দিতে গিয়া। কেন এমন হয়? কোটাল চন্দ্র ত বিধর্মী। তার চেয়েও দুঃখী। কিন্তু সে আনন্দের অধিকারী। জীবনের ঝান্টা তার পাখনাকে পঙ্কু করিতে পারে নাই। অথচ-সে! বুকের ভিতর বাঁচা ও সংসার গোছানোর হাজার তৃষ্ণা লইয়া কলে-পড়া মুষিকের মত পরিত্রাণের আশায় দিখিদিখি ছুটাছুটি করিতেছে। সকলের রুজি-দেমেওয়ালা আল্লার উপর তার বিশ্বাস কতটুকু? আজহার ক্লান্ত অবসর সময়ে নিজের কাছে এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজিত। শেষদিনে হঠাৎ দাম লইয়া এক খরিদারের সঙ্গে ঝগড়াই করিয়া বসিল। পরদিন দোকান বিক্রয় হইয়া গেল। আবার গ্রামেই সে ফিরিয়া যাইবে। চন্দ্রের কাছে জিজ্ঞাসা করিবে, বাঁচার আনন্দ সে কোথা হইতে পায়? রহিম বংশ, হাতেম খাঁদের চন্দ্র ঘৃণা করে। এই ঘৃণার মধ্যে কী আনন্দ আছে? ঘৃণা ত হিংসা। এমন পাকের মধ্যে পদ্মফুল ফোটে? আর যা-ই করুক, চন্দ্রের সঙ্গে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ সে মিলাইয়া দিবে। সে তাড়ি খাক, নাচুক বা গান করুক, তা দেখার আবশ্যক নাই আজহারের। আজহার বুকে নূতন জোর পাইয়াছিল। মাঠের মাটির সঙ্গে সে কেন প্রবঞ্চনা করিবে না আর। জীবনের বোঝাপড়া হোক আবার। চন্দ্রের সঙ্গে আজহারকে উত্তোল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু গ্রামে সে ত একা আসিল না। জেলা-জেলাস্তর ঘোরার ফলে বাঁকুড়ার দূরন্ত ম্যালেরিয়া আগেই দেহে বাসা বাঁধিয়াছিল। মাঝে মাঝে ভুগিতে হইত। পথেই নূতন প্রতিক্রিয়া শুরু। শেষ অঙ্ক মহেশডাঙায় অভিনীত হইল মাত্র।

নিরীহ ঈমানদার মানুষ— এইজন্য সমশ্রেণীর বন্ধুদের নিকট হইতে এই কয়েকদিন আজহার সহানুভূতি কম পায় নাই। চন্দ্র কোটাল প্রায়ই বসিয়া থাকিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বাক্যালাপ হইত নামমাত্র। তবু তার উপস্থিতির কামাই ছিল না। রোগ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে এক মন্দিরের ঠাকুরের কাছ হইতে চন্দ্র গাছের শিকড় আনিয়া আজহারের হাতে বাঁধিয়া দিল। অন্য সময় কত আপত্তি করিত, হয়ত দুইজনের মধ্যে চটাচটি হইয়া যাইত।

কিন্তু মৃত্যু-পথযাত্রী আজহার আর এক মানুষ। চন্দ্রের নিকট নিজেকে সঁপিয়া দিতেই ত সে গ্রামে আসিয়াছিল। এই বাড়িতে আসিলে চন্দ্রের ছোঁয়াচ হাসি কাহাকে না স্পর্শ করিত। কিন্তু চন্দ্রও আজকাল ভয়ানক গম্ভীর। একদিন দম-ভর তাড়ি খাইয়া আসিয়াও সে চুপচাপ বসিয়াছিল। কারো প্রশ্নের কোন জবাব দেয় নাই। তারপর আপন মনেই বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছিল। এই সংসারের ভবিষ্যৎ যেন এখনই তার সম্মুখে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত খাড়া। সহানুভূতি, এমন কি ইয়াকুবের কাছেও, সীমাতীত ভাবে পাওয়া গেল। সে পাঁচ মাইল দূর হইতে পাঙ্কী করিয়া পাস-করা ডাক্তার আনিল। তখন শেষ অবস্থা। ডাক্তার কোন আশা দিতে পারিল না।

দরিয়াবির একদা-তেজ যেন উবিয়া গিয়াছিল। অবশ্য গৃহস্থালীর কাজ ও সেবার কোন ক্রটি ছিল না। সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে রোগীর বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু আজহার নির্বিকার। নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার কোন সচেতনতা ছিল না। দরিয়াবির দিকে একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিত না সে। পাষাণের মত নিঃসাড় খোলা দুই চোখ আর দেখার কাজে লাগে না যেন-এখন তা চিরন্তন হাতিয়ার। দরিয়াবি কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ-না-রবে তার পরিসমাপ্তি হইত মাত্র। এই নীরবতা দরিয়াবিকে ভয়ানক চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামীর কাছে নঈমা বা আমজাদকে ঘন ঘন পাঠাইত। কথা হইত শুধু নঈমার সঙ্গে। সে-ই যেন শুধু তার সব কথা বুঝিতে পারে। দরিয়াবি পিতা ৭ কন্যার কথোপকথনকালে উপস্থিত হইত। আজহার তখন নীরব। দরিয়াবি পাশে বসিয়া উঠিয়া আসিত ও অলক্ষ্যে চোখের পানি মুছিত। কত দায়িত্ব পিছনে পড়িয়া থাকিল। এই চিন্তা কি একবারও তোমার মনে জাগে না? দরিয়াবি ভাবিত, সে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিত না।

আজহারের গলায় কেমন ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছিল। আজকাল সারারাত্রি পিদিম জ্বলে। দরিয়াবি উঠিয়া তখন জিজ্ঞাসা করিল, কষ্ট হচ্ছে?

না। তারপর আজহার দরিয়াবির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমুর মা, আমি—। কথা থামিয়া গেল।

দরিয়াবি তখন জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে কিছু বলবে?

মাথা নাড়িয়া আজহার সম্মতি জানাইল ও পলকহীন চোখে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হইল।

অধীর দরিয়াবি স্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে শুধাইল, কিছু বলবে?

আজহার কোনো কথা বলিল না। শীর্ণ হাতখানি দরিয়াবির হাতের দিকে বাড়ানোর পথে আবার মুঠিবদ্ধ করিয়া লইল। চোখ তেমনই পলকহীন। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোন প্রতিধ্বনি ছিল না এই নীরবতার মুখোমুখি। এখনি ঐ ঠোঁট হইতে কথা ঝরিবে। দরিয়াবি আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। কিন্তু আর কোন কথা বলা হইল না। জীবন-যোদ্ধা পৃথিবীর কাছ হইতে ইত্যবসরে ছাড়পত্র পাইয়াছিল। শুধু চোখ দুটি তখনও সজীব। দরিয়াবি তাহা বুঝিতে পারে নাই। মৃত স্বামীর চোখের দিকে দৃষ্টি পাতিয়া সে চাহিয়া রহিল, চাহিয়া রহিল।

আমিরন চাচী যুক্তি দিয়াছিল, আরো হাঁস-মুরগি, বকরী-খাসী পোষো। বুঝে। কোন রকমে দিন চলবেই। তোমার ভাই মারা যেতে আমিও চোখে আন্ধার দেখেছিলাম। এখন বুক বাঁধতে হবে, ভাবনা করলে ত দিন যাবে না।

দরিয়াবাবি কথায় সায় দিয়াছিল। কিন্তু তার পক্ষে বাধা অনেক। সে পর্দানশীনা। কাছে মাঠ নাই। আমজাদ লেখাপড়া আগেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। গরু-বাহুর মাঠে লইয়া যাইতে নিমরাজী। ইলেকের এমনই প্রভাব। আজহারকে সে খুব ভয় করিত, তাই মুখের উপর কোন জবাব দেওয়ার সাহস পাইত না। এখন সে বে-পরোয়া। চাষাবাদ তার ভাল লাগে না। চন্দ্র কাকার সঙ্গে প্রথম বছর চাষাবাদে গায়ে-গতরে খাটিয়াছিল। কিন্তু ধান বেশি হইল না। মাটির জন্য দরদ ছিল না। নিড়েন ঠিকমত দেওয়া হয় নাই। পর বৎসর চন্দ্র কোটাল তাই তিন বিঘা জমি বিক্রয় করিয়া দিতে বলিল। গ্রহীতা ইয়াকুব। দেড় বিঘা জমি ছিল, আমজাদের জন্য তাহাও বিক্রয় হইয়া গেল। চন্দ্র কাকার সংস্পর্শ তার ভাল লাগে না। এত মেহনত আমজাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দরিয়াবাবি রাগ করিলেও পুত্রের উপর ক্ষোভ ছিল না। তের বছর বয়সের পক্ষে চাষাবাদ যেন ঠাট্টার ব্যাপার।

আমিরন চাচীর সংসার ছোট। কিন্তু দরিয়াবাবির সংসারে এতগুলি পেট চালানো সহজ নয়। প্রথম দিকে সহানুভূতি কারো কম ছিল না। কিন্তু তারও সীমা আছে। বেচারী চন্দ্র নিজেই অস্থির। সে চাষ করে, মাছ ধরে, গান করে। কিন্তু সব সময় রোজগার হয় না। তবু তার আন্তরিকতা অকৃত্রিম। নিজেকে না আসিলেও বোনকে পাঠাইয়া খোঁজ-খবর লয়। এলোকেশী খালি হাতে আসে-না। কোন দিন মাছ, মাঠের ফসল, অন্ততঃ একফালি কুমড়া হাতে সে লৌকিকতা রক্ষা করে।

চারিদিকে ভাঙন। নইমার চোখে আজকাল খুব পিঁচুটি জমে। চোখে ভাল দেখে না হয়ত অন্ধ হইয়া যাইবে।

ইয়াকুব মাঝে মাঝে চিরাচরিত আড়ম্বরে আসে। মাঝে মাঝে টাকাও সাহায্য করে। দরিয়াবাবি কর্ত্ত চাহিতে লজ্জা পায় না। কিন্তু এইভাবে দিন কতদূর গড়াইতে পারে। আগে ঘরে দুধ ছিল। এখন গাইটা অল্প দুধ দেয়, তা-ও বিক্রয় করিতে হয়। শরী-র মুখে দুধ ওঠে না। তিন বছরের মেয়ে ভাত ধরিয়াছে বড়দের মত। তার মাঝে মাঝে পেটের অসুখ করে, সহজে সারে না। শুধু শরীরের কাঠামোর জোরে টিকিয়া আছে।

দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ করিবার জন্য এমনই দুর্দিনে মোনাদিরের পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে:

মা, আমার সালাম জানিবেন। বহুদিন বহু জায়গায় ঘুরিয়া আমি এখন স্কুলে পড়িতেছি। পাঁচটা টাকা যদি মাস-মাস আমার জন্য পাঠান, কোন রকমে আমার দিন চলিতে

পারে। আপনাদের অসুবিধা হইলে পাঠাইবেন না। আমার দিন এক রকমে চলিয়া যাইবে। আয়ু, নষ্টমাদের জন্য আমার স্নেহ।

আপনার স্নেহের
মুনি

একটি ইন্ডেলাপের পত্র আসিয়াছিল। আমজাদ পড়িয়া শোনাইল। দরিয়াবির যুগপৎ আনন্দ ও নিরাশায় খামখানি হাতের মুঠায় ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। তিন-চার বৎসর অতিবাহিত। কত বড় হইয়াছে মুনি! একটি দীর্ঘশ্বাসে দরিয়াবির এই চিন্তা সমাহিত করিল। পাঁচটি টাকা সাত রাজার ধন নয়। তবু সে-কথাই আগে ভাবিতে হয়।

আমজাদ পাশে বসিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, মা, মুনি ভাইকে টাকা পাঠাবে না? পাঠাব। পাঠাতে পারবি?

তা আর পারব না! তুমি টাকা দিও, মনি অর্ডার করে আসব। পোস্টাপিস আছে পাশের গায়ে।

দরিয়াবির টোটে কৃত্রিম হাসি দেখা দিল। আমজাদ এখনও কত অবোধ।

কিছুক্ষণ আগে আমজাদ সংবাদ আনিয়াছিল, এবার জমির ধান ইয়াকুব নৌকায় বোঝাই দিয়া লইয়া গিয়াছে। এতদিন জমি বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু ধান, বর্গা পরিশোধের পর অর্ধেক পাওয়া যাইত। ইয়াকুবের করুণা! এবার জা-ও বন্ধ। জমি কিনিয়াছে, ফসল লইয়া যাইবে—বৈচিত্র্য কিছু নাই। তবু দরিয়াবির ক্ষোভে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুত্রের কাছে সংবাদ পাইয়া আর কোন কিছু জিজ্ঞাস্যদের প্রয়োজন সে মনে করে নাই।

মুনির পত্র হাতে ইয়াকুবের কথাই প্রথমে স্মরণ হইল ও হঠাৎ অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, “পাঁচটা টাকা”। আমজাদ তখন শুনিতে পাইল না।

দু’দিন পর ইয়াকুব এখানে পৌঁছিলে, দরিয়াবির তার শরণাপন্ন হইল।

ভাই, আমার একটা আরজ আজ তোমাকে রাখতে হবে।

আপনার আরজ। বলুন-বলুন। ইয়াকুব ভয়ানক আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, আপনি এত চূপচাপ থাকেন।

ভাই, চূপচাপ কি সাধে থাকি। দেখছ না, কত সুখে আছি।

আপনার দুঃখ কি। আপনার মুখের হাসির দাম লাখ টাকা।

অন্য সময় এমন গায়ে-পড়া প্রশংসা দরিয়াবির বেয়াদবীর সামিল মনে করিত। আজ তা গায়ে মাখিয়া লইল। ইয়াকুব কিন্তু কথাটা বলিয়াই দরিয়াবির দিকে আড়চোখে তাকাইল।

লাখ টাকা নয়, পাঁচ টাকার আরজ।

মোটে। ইয়াকুব ঠোট কঁচকাইল।

হ্যাঁ।

মোটে?

হ্যাঁ, কিন্তু মাস-মাস দিতে হবে।

কাউকে দেবেন?

হ্যাঁ।

কা'কে?

তা কোনোদিন জানতে চেয়ো না।

আপনার যা হুকুম। ইয়াকুব হাসিয়া ঘাড় নোয়াইল ও কহিল, আপনি বলেন, আর কি দরকার। আপনি একদম পাথরের মত কি-না, মুখে কিছু বলেন না। আজ ধান নিয়ে গেলাম। কই, কিছু ত বললেন না?

তোমার জমির ধান তুমি নিয়ে গেছ। কি আবার বলতে হবে? দরিয়াবির কণ্ঠে মোলায়েম ব্যঙ্গের সুর।

কেন বলবেন না? আপনারা আমার আপনজন। জমি কিনেছি বলে ধানও নিয়ে যাব? নিশ্চয় নিয়ে যাবে।

আপনজনেরা এমন নিষ্ঠুর হয় না।

নিষ্ঠুর আবার কি?

নিশ্চয়। জিজ্ঞেস করতে ত পারতেন, কেন ধান নিয়ে গেলাম। থাক সে কথা। এখন আমাকেই বলতে হয়। ঘরে আমার দু'টি গোস্তের ঢিবি আছে। ইয়াকুব একগাল হাসি মুখ হইতে খলাস করিয়া বলিল, তাদের চোখ টাটায়। জমি কিনেছি অথচ ঘরে ধান যায় না। এবার তাই নিয়ে গেলাম। এই নিন ধানের টাকা।

ইয়াকুব পকেট হইতে পঁচিশ টাকা বাহির করিল।

এখন বাজার-দর আড়াই টাকা! দশ মণ ধান হয়েছিল। দরিয়াবির ইয়াকুবের দিকে তাকাইল। কৃতজ্ঞতার এমন দৃষ্টি কেহ কখনো দরিয়াবির চোখে দেখে নাই।

ইয়াকুব মানিব্যাগ হইতে আবার পঁচিশ টাকার একটি নোট বাহির করিল।

এই নিন। আমি মাসে মাসে এই টাকাটাও দেব।

দরিয়াবির হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

ভাবী, আমাকে আপনজন মনে করবেন।

দরিয়াবির তার কোন জবাব দিল না। ইয়াকুবের দিকে সোজাসুজি তাকাইল মাত্র। সে ভয়ে চোখ নামাইয়া লইল।

ইয়াকুবের হালচাল রাখে শুইয়া দরিয়াবির তোলপাড় করিতে লাগিল। বালিশের নীচে নোটখানি এখনও চাপা। অন্ধকারে হাতড়াইয়া দরিয়াবির নোটখানি নিজের চেখের উপর চাপিয়া ধরিল। ভয়ানক কান্না পাইয়াছিল তার।

চোখের পানি শুষিয়া লইতে এমন কাগজেরই যেন দরিয়াবির প্রয়োজন বেশি।

৩৫

পোস্টাপিস হইতে আমজাদ একটি খাম কিনিয়া আনিয়াছিল।

দরিয়াবির বলিল, একটা চিঠি লিখে দে, আমু। তোর মনি ভাই যেন তাড়াতাড়ি আসে। আমজাদ পত্র লিখিতে বসিল। এমন সময় হাসুবৌ হাজির হইল।

দরিয়াবির জিজ্ঞাসা করে, হাসুবৌ, আর যে এদিকে এলে না? দশ-বারো দিন হোলো।

সম্পূর্ণিত হাসুবৌ চারিদিকে চাহিয়া লইল, যেন তার আওয়াজ বেশিদূর না পৌছায়;
অথবা কেউ আছে কি-না। পরে ফিস্ফাস্ শব্দে বলিল, শাউড়ীর মেজাজ জানো না, বুবু?
এদিকে এলেই চটে। আর ছেলে হয় নি। আর খোঁটা ধরে শুরু করবে হাজার কাল্লাম।

কখন আসি, বুবু।

সাকের ভাই কোথায়?

তার ভাবনাতেও অস্থির ছিলাম। আবার কোন জমিদারের জমি দখলে গিয়েছিল!

মানা করতে পারো না?

মানা শোনে কৈ? এবার পায়ে চোট লেগেছে। চুন-হলুদ করে দিলাম কাল। আজ
ভালো আছে। সাত আট দিন গিয়েছিল। এই জন্যেও ভেবে ভেবে অস্থির। ছাই, মন ভাল
না থাকলে কি কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে?

হাসুবৌ দরিয়াবিবির দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাইল।

সহভানুভূতি জানাইল দরিয়াবিবি, তা ঠিক। মন ভাল না থাকলে খাট-পালঙ্কে শুয়েও
সুখ নেই। অতঃপর আমজাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমু, আর অন্য কোন কথা
লিখিস নে। শুধু আমার কথা লেখ। আর আমরা ভাল আছি।

আমজাদ পেন্সিল চালাইতে চালাইতে জবাব দিল, আচ্ছা মা।

হাসুবৌ জিজ্ঞাসা করিল, কাকে চিঠি দিচ্ছ বুবু?

আমার মুনিকে।

মুনির খবর পেয়েছ?

হ্যাঁ।

সোব্‌হান আদ্বা। আমু চাচা, আমার দোয়া লিখে দিও। হাসুবৌ বড় উৎফুল্ল হইয়া
উঠিল। পরে বলিল, কি সুন্দর ছেলে! এমন না হোলে মায়ের কোল জুড়ায়!

আমার বুক জ্বলতেই রইল, হাসুবৌ। দরিয়াবিবি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল।

বুবু, তোমার ধন তোমার বুকেই ফিরে আসবে। দেখো, আমার কথা নিশ্চয় সত্যি
হবে। আমার মন বলছে।

সোনা-কপালী, তোমার মুখে কাটা যাই। তা যদি হয়, আমি এই অকূলেও কূল পাই।

ঠিক তোমার হকের ধন ফিরে আসবে।

পনের বছর বয়স। এখন কত বড় হয়েছে। আজ ক'বছর চোখের দেখা দেখতে
পাই নি।

দরিয়াবিবির কাতরদৃষ্টি হাসুবৌকে স্পর্শ করিল। দুইজনে একে অপরের দিকে তাকায়।

আমাজদের লেখা শেষ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

তবে আবার কি লিখিবি?

লিখে দেব— আক্বা ইন্তেকাল করেছে।

ধমক দিয়া উঠিল দরিয়াবিবি, না, ওসব লিখতে হবে না।

আচ্ছা।

শান্ত আমজাদ যেন ঠাণ্ডা হইয়া গেছে, এমন উচ্চারণের ভঙ্গী।

হাসুবৌ উঠিয়া বলিল, এখন যাই বুঝ। আমু চাচা, আমাকে একটু এগিয়ে দাও।

আমজাদ খুব রাজী। সে হাসুবৌর অনুসরণ করিল।

ভিটার নীচে সড়কের উপর দুই জনে দাঁড়াইল। গোধূলির ছায়ায় চারিদিক বিষণ্ণ। হাসুবৌর গা এমন ঝোপে-ঝাড়ে সত্যি ছুঁছুঁ করে। মহেশডাঙা জঙ্গল বলিলেই চলে। নীচের পথের সাদা-সাদা রেখা আব্ধা। দু'পাশে ঝিঁ ঝিঁ ডাকা অনেকক্ষণ গুরু হইয়াছে। আমজাদের পিছনে হাসুবৌ।

কিয়দূর অগ্রসর হইলে বৌ আমজাদের হাত ধরিয়া বলিল, চাচা, আমার দোয়া লিখে দিয়েছো?

দিয়েছি, হাসু চাচী।

সত্য? কিরা দিচ্ছি আমার গা-ছুঁয়ে বল।

আমজাদ হাসুবৌর কাঁধ ছুঁইয়া বলিল, দিয়েছি, দিয়েছি, দিয়েছি, তিন সত্যি।

হাসুবৌ খুব খুশি হইয়া বলিল, কাল এসো চাচা, তোমার জন্য ক্ষীর বানিয়ে রাখব।

আচ্ছা, আসব।

আর মূনির চিঠি এলে খবর দিও, দেবী করো না চাচ।

হাসুবৌর অনুরোধ ভঙ্গী বড় অদ্ভুত দেখায়।

এবার তুমি যাও। এখন আমি বাড়ি যেতে পারব। পথে সাপ দেখে যাস, বাপ।

আমজাদের নিজেরই ভয় লাগিতেছে এবার। জবাব দেওয়ার জন্য সে আর বিলম্ব করিল না। তার সবচেয়ে বেশি ভয় সাপের।

৩৬

তিন-চার মাস পরে মোনাদিরের আর একটি পত্র আসিল। সে ঠিকানা বদল করিয়াছে। এত বাড়িতে জায়গীর ছিল। কোন কারণে তাহারা আর ছাত্র রাখিতে পারে না। তাই অন্যত্র গিয়াছে মোনাদির। সেখানে মাসিক পনের টাকার কম খরচ পড়ে না। এখন সে কি করিবে, তাহাই ভাবনার ব্যাপার।

দরিয়াবিবির মনে আন্দোলন করিতে লাগিল। পনের টাকায় তাহাদের সমস্ত মাস নির্বিঘ্নে চলিতে পারে। ধান যে কয় মণ পাওয়া যায়, তাহা দিয়া চার মাসের মাত্র খোরাক হয়। বাকী দিন আল্লাই চালান। কখনও আমজাদ চন্দ্রের সঙ্গে মুনিশ খাঁটিতে যায়। এত ছোট ছেলে লোকে লইতে চায় না। শুধু চন্দ্রের খাতিরে তিন আনা চার আনা দেয় মাত্র। গরু, বাছুর, মুরগি-হাঁস ডিম বিক্রি ইত্যাদির উপর দিয়া কোন রকমে দিন গুজরান। ইহার উপর মূনির এই অনুরোধ। দরিয়াবিবি ভাবিতে লাগিল। উপায় একটা স্থির করিতে হইবে। আবার ইয়াকুবের ধর্ণা! না তা সম্ভব নয়। তবু একই কেন্দ্রে সমস্ত চিন্তা স্রোতায়িত হইতে লাগিল। শেষে দরিয়াবিবি স্থির করিল, ইয়াকুবকে বলিয়া দেখিতে হইবে।

ইয়াকুব প্রস্তাব শুনিয়া হাসিয়া বলিল, ভাবী, আপনার যা দরকার, আমাকে বলেন

না কেন?

ভাই, তুমি আমাদের জন্য অনেক করেছ। আমার বলতেও লজ্জা লাগে।

কোন লজ্জা করবেন না। আপনার মুখের হাসি আমি দেখতে চাই।

হাসি কি সহজে আসে!

মন নরম থাকলে আসে বৈকি।

ইয়াকুব দরিয়াবির দিকে চাহিয়া আবার মৃদু হাসিল। বৈধব্যের পর দরিয়াবির শরীরের তেমন পরিবর্তন ঘটে নাই। চেহারা আর একটু রুক্ষতার ছাপ লাগিয়াছে মাত্র। তার ফলে আরো আগ্রমণীর মত দেখায় দরিয়াবিকে। হঠাৎ কারো চোখে পড়িলে মনে হইবে, যেন কত দেমাকী। কিন্তু দরিয়াবি নিজে দিকে চাহিয়া আর কিছু দিশা করিতে পারে না। সে যেন আসেকজানের মত হইয়া যাইতেছে। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যায় তখন দরিয়াবি।

না ভাই। বাইরে থেকে আমি দেখতে অমন। খুব মোলায়েম সুরে দরিয়াবির জবাব দিল।

আপনি কষ্ট পান খামাখা। আমাকে বললেই হয়। পনের টাকা আমি মাস-মাস দেব। আপনি যাওয়ার সময় তিন মাসের আগাম চেয়ে নেবেন।

আল্লা তোমার মঙ্গল করুক, ভাই। ধনে-দৌলতে তিনি তোমাকে আরো বাড়ান।

প্রায় গদগদভাবে দরিয়াবি উচ্চারণ করিল।

আপনার দোয়া। তারপর ইয়াকুব আবার নিজের মত তাকাইয়া বলিল, আপনার হাসির দাম লাখ টাকা।

খামাখা লজ্জা দাও, ভাই। আমরা গরীব-দুঃখী, আমাদের আবার হাসি— তার আবার দাম। ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া দরিয়াবির রাক্য সমাপ্ত করিল।

ইয়াকুব হাসি ছাড়িয়া বোধ হয় আর কিছু মূল্য যাচাইয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। দরিয়াবি তার সুযোগ দিল না। ওদিকে হাঁড়ি চড়িয়ে এসেছি, এঁচে গেল, গন্ধ উঠেছে— বলিয়া দরিয়াবি রান্নাঘরের দিকে ছুটিল।

ইয়াকুব দরিয়াবির ছন্দময় দেহাবয়বের দিকে পশ্চাৎ হইতে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

উপবাস এই সংসারে দরিয়াবির জন্য অচেনা কিছু নয়। মাঝে মাঝে কোনদিন ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়েরা হাঁড়িতে ভাত থাকা পর্যন্ত আর ক্ষান্ত হয় না। দরিয়াবি তখন পরিবেশন করিয়াই খুশি। এই চালাকি মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। তখন আমজাদ লজ্জিত হয়। নঈমা, শরীফা কি-বা বোঝে। আমিরন চাচীর কাছে ধরা পড়িলে দরিয়াবি খুব বকুনি খায়। একদিন ত চাচী অভিমান করিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, আমরা ত আত্মীয়-স্বজন নই, আমাদের কাছে কেন কিছু বলবেন, বুবু। দু'মুঠো চাল কি তরকারী আমজাদকে দিয়ে আনালে কি আমি অসুবিধায় পড়তাম?

কিন্তু দরিয়াবি আরো অভিমানী। কোন কিছু যাত্রার বেলা সে যেন মর্মে মর্মে মরিয়া থাকে। নিজের অতীতের দিকে চাহিয়া সে নিজেকেই আর বিশ্বাস করে না। আত্মবিশ্বাস ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্বে অনুহীন দিন এমন বিষণ্ণ বোঝা মনে হইত না।

সেদিন রাত্রে আমজাদ ও নঈমার জন্য দরিয়াবিবির ঠোঁটে আর ভাত উঠে নাই। সকালে শরীর বড় ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছিল। ইয়াকুব আসিল সেই সময়। রাজগীর কমতি নাই তার। ভাল চাল, মাছ শাক-সবজি, ঘী কিছু বাদ পড়ে নাই তার আড়ম্বর-লীলায়।

দরিয়াবিবি অগত্যা রান্নায় বসিল। তারপর সকলের শেষ খাওয়া। দরিয়াবিবি অভুক্ত শরীরে সেদিন আহার করিল। রীতিমত আহার। পূর্বে অপরের দেওয়া অনু সম্মুখে, সে আসেক্‌জানের চল্লিশার খাওয়ার কথা স্মরণ করিত। আজ অতৃপ্তির কোন বলাই ছিল না। ক্ষুধার্ত জঠর বাকীটুকু পরিবেশন করিল।

দুপুরের পর আমজাদ চন্দ্রকাকার কাছে কাজের তল্লাশে গেল। নঈমা শরীকে কোলে করিয়া হাসুবৌর বাড়ি পৌছিল। আগের দিন বৌ তাহাদের দাওয়াৎ করিয়া গিয়াছিল। নূতন ছাঁচিলাউ কাটা হইয়াছে, ক্ষীর রান্না হইবে আজ।

হাতে বহু কাজ। হাঁড়িপাতিল মাজা হয় নাই, গৃহপালিত আগল-পাগলদের খবরদারী বাকী আছে। তবু ভরা খাটে খোয়ারী ধরিয়াছিল। একটু গড়াইয়া উঠিয়া পড়িবে, এই আশায় শোয়ামাত্র কিন্তু দরিয়াবিবির বেশ ঘুম পাইল। অভুক্ত শরীর মাঝে মাঝে যদি ছুটি চায়, তা বিচিহ্ন কিছু নয়।

বাইরে বৈশাখের উত্তপ্ত দিন। এখানে ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করিয়া গরম ঝামাল আসে না। তাই ঘরের ভেতর ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হয়। জানালার পাশে কাঁঠাল গাছে ঘুঘু ডাকিতেছিল। একটানা স্বরে। আজ কোন উদ্বেগ দরিয়াবিবির-কাজের শরীরে হানা দিতে পারে না। বেশ ঘুম ধরিয়া গেল।

কিন্তু ঘুম তাহার আবার আচমকাই ভাঙিল। দরিয়াবিবি হঠাৎ অনুভব করে, কার যেন গভীর আলিঙ্গনে সে একদম নিশ্চিন্ত। চোখ খুলিয়া দেখিল, ইয়াকুব। দরিয়াবিবি প্রথমে ঘরের খোলা টাটির দিকে চাহিল। ঝোপের দরজা খোলা ছিল, এখন বন্ধ। দরিয়াবিবির মনে হয় হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে তার সমস্ত শরীর। আর একজনের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস শুধু নাকে লাগিতেছে। একবার উঠিতে গেল সে। কিন্তু দুর্দান্ত দৃঢ়তায় আর একজন তাহাকে সাপটিয়া বাঁধিতেছিল। নিস্তেজ নিখরতায় দরিয়াবিবি চূপ করিয়া রহিল। আর চোখ খুলিল না। সে যেন অন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী তাহার নিকট নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে আবৃত।

বাইরে পুত্র-হারা ঘুঘু জননী এক মনে শুধু ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইতে লাগিল।

৩৭

সন্ধ্যায় আহারের সময় আমজাদ বলিল, মা, ইয়াকুব চাচা হঠাৎ চলে গেল। কাল ত যাবার কথা।

দরিয়াবিবি প্রথমে জবাব দিল না। পরে হঠাৎ আশুন হইয়া বলিল, খাচ্ছিস, খা। তোর আবার এত কথা কেন? আমজাদ মা'র দিকে একবার চাহিয়া আবার আহারে মনোনিবেশ করিল।

সকালে সে আবার বকুনি খাইল। বাড়ির পাদারে সকালে উঠিয়া আমজাদ দেখে,

রান্না তরকারী নয়, শুধু-কাঁচা শাক-সজ্জি পর্যন্ত পড়িয়া রহিয়াছে। কাল ইয়াকুব চাচা এইসব আনিয়াছিল, সে জানে। তাই তাড়াতাড়ি মা'র কাছে উর্ধ্বশ্বাসে নৌড়িয়া আসিল।

মা, আস্তাকুঁড়ে কত তরকারী কে ফেলে দিয়েছে তুমি দেখবে এসো।

দরিয়াবিবি হাঁস-মুরগিদের একমনে খুঁদ-কুড়া খাওয়াইতেছিল, সে যেন পুত্রের কথা শুনিয়া শুনি ন।

পুত্র আবার এগুলো দিল।

দরিয়াবিবি তখন ধমক দিয়া বলিল, হাতে কাজ আছে দেখছিস নে? চোখ কি ফুটো হয়ে গেছে তোর?

আমজাদ মা'র ধুমধামে চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিল, এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা সমীচীন নয়।

তিন চার দিন আমজাদ নিরীহ ছেলের মত ঘরে রহিল। মা'র এমন মূর্তি সে আর পূর্বে দেখে নাই। এমনভাবে কত দিন কাটিত কে জানে, আবার ইয়াকুব চাচার আগমনে সব শান্ত হইল। এবার সে একা আসে নাই। সঙ্গে পুত্র ও রসদসম্ভার আনিয়াছিল। তার ছেলের বয়স নয় কি দশ। আমজাদের প্রায় সমবয়সী। হঠাৎ পুত্র সঙ্গে কেন? দরিয়াবিবি অচেনা ছেলের সম্মুখে স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হইল, ইয়াকুবকে জিজ্ঞাসাবাদ করিল। দেবরের চাল বোঝার সাধ্য দরিয়াবিবির নাই।

মোনাদির আবার পত্র লিখিয়াছিল। তাই পুত্রসহ বাড়ি ফেরার আগে দরিয়াবিবি ইয়াকুবের নিকট হইতে পনেরটি টাকা চাহিয়া লইল।

আমজাদ বৃষ্টিতে পারে, মা'র মেজাজ ঠিক হয় নাই। আজকাল সে বকুনি খায়, নইমা— এমনকি শরী পর্যন্ত কান্নাকাটি করিলে প্রহার ভোগ করে। মা এমন ছিলেন না। একদিন সে আমিরন চাচীর কাছে বেড়াইতে গিয়া অভিযোগ করিয়া আসিল।

কাজের চাপে ক'দিন আমিরন চাচী এই বাড়ি আসিতে পারে নাই।

একদিন আসিয়া জেরা শুরু করিল, বুবু, তুমি নাকি ছেলের বড় মারধোর কর?

পোড়াজানে যদি মারধোর করি, কী অন্যায়টা করি? এগুলো মরলে আমার হাঁড় জুড়ায়।

আমিরন চাচী বাধা দিল, ছি ছি বুবু, এমন অপয়া কথা মুখে আনে! আমার একটা। সেও কম জ্বালায় না।

একটা আর দুটো। এরা জ্বালাতেই আসে। একজন ত মুখই আর দেখায় না। তার জন্য জ্বলছি। আর সঙ্গে যে ক'টা আছে, তারাও কম জ্বালাচ্ছে না। আদ্যা এগুলো তুলে নিতে পারে না?

দরিয়াবিবি খুব অপ্রকৃতিস্থ। আমিরন চাচী কাজের বাহানায় সেদিন আর বেশিক্ষণ বাক্যালাপ করিল না। চলিয়া গেল।

দুপুরে কুঁড়া পায় নাই, উঠানে তাই কতগুলি মুরগি কটকট শব্দে কান ঝালাপালা করিতেছিল। দরিয়াবিবি ক্রোধে হাতের নাগালে পাওয়া একটি মুরগি ধরিয়া এক আছাড় দিল। আহত প্রাণী ঝটপট করিতে লাগিল।

নইমা চোখে ভাল দেখে না, দাওয়ায় বসিয়াছিল। সে সেখানে হইতে বলিল, মা, মুরগি

জবাই করছ? দরিয়াবিবি চীৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়া হারামজাদী, তোকে জবাই করব।

আমজাদ এই সময় খেলা সারিয়া ফিরিতেছিল। সে মা'র হৃদয় গুনিয়া ধীরে ধীরে দহলিজের দিকে চলিয়া গেল। হাওয়া ফিরিলে, সে-ও ফিরিয়া আসিবে।

৩৮

শাপদেরা ওঁৎ পাতায় সুদক্ষ। ইয়াকুবের কৌশলের অন্ত ছিল না। রক্তের আশ্বাদ পাওয়া শিকারী প্রাণীর মত সে এই বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল। অসতর্ক ও অসহায় মুহূর্তের সুযোগের সে কোন অসম্ভাবহার করিত না। সঙ্গতির ভেলা ভাসাইয়া ক্রিপে নদী পারাপার করিতে হয়, তা-ও সে জানিত বৈকি।

*

*

*

*

বাড়ির আবহাওয়া আমজাদের কাছে অসহ্য লাগে। মা সব সময় কি যেন চিন্তায় বৃন্দ। পান হইতে চুন খসিলে শাঁসানি-বকুনি। আর কোন দিন সে এমন আসোয়াস্তির সম্মুখীন হয় নাই।

আমজাদই একদিন আসিয়া খবর দিল, মা, মুনিভাই পত্র দিয়েছে। লিখেছে, কাল আসবে।

কাল?

হ্যাঁ।

বেশ। আমজাদ মা'র মুখের দিকে চাহিল। কোন ফুল্লতার আভাস নাই। যেন দৈনন্দিন ঘটনার মত কোন সংবাদ আনিয়াছে সে।

মা! আমজাদ ডাক দিল।

কি?

আমি লিখেছিলাম, আঝা মারা গেছেন। সংসারে বড় টানাটানি। তুমি একবার এসো, মুনিভাই।

তোকে এসব কে লিখতে বলেছিল? দরিয়াবিবি পুত্রের দিকে রুদ্ধ চোখে তাকাইল। আমজাদ সোজাসুজি তাকাইতে পারে না, কিন্তু নরম গলায় জবাব দিল, মা, আঝা মেরেছিল, তাই মুনিভাই আসতে চায় না। আমি তোমাকে না জানিয়ে এই জন্য খবর দিয়েছিলাম।

বেশ। তারপর দরিয়াবিবি অন্য কাজে চলিয়া গেল।

পরদিন আমজাদ নিজেই গ্রামের মেঠো পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। রেল স্টেশন অনেক দূরে। মুনি ভাই ক্রান্ত হাঁটিয়া আসিবে, এতটুকু অভ্যর্থনা না করিলে সে সোয়াস্তি পাইবে না।

সত্যই মোনাদির আসিয়াছিল। দুই ভাইয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিলে নঈমা চীৎকার শুরু করিল, দাদা এসেছে মা, দাদা এসেছে।

দরিয়াবিবি তখন রান্নাশালায়। পাঁচ মিনিট তার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মোনাদির অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

মা কোথায়, নমু? নঈমাকে আদর করিতে করিতে মোনাদির জিজ্ঞাসা করিল।

রান্নাঘরে ।

আমু চল, আমি যাচ্ছি । সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল । চুলা জ্বলিতেছে । অগ্নিশিখার হিস্‌হিস্‌ শব্দ হইতেছে মাত্র । দরিয়াবিবি চুলায় জ্বাল দিতে দিতে একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে ঠেস রাখিয়া ঘুমাইতেছে ।

বিস্মিত দুই ভ্রাতা । আমজাদ ডাকিল, মা মা, দ্যাখো, কে এসেছে ।

দরিয়াবিবি হঠাৎ চোখ খুলিয়া বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিল । কোন আকুল ব্যগ্রতায় উঠিয়া হস্ত প্রসারিত করিল না ।

মোনাদিরের শরীরের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে । পনের বছর বয়স । বেশ লম্বা-চওড়া । গৌফের রেখায় তার গৌরবর্ণ ওষ্ঠের শোভা ঢাকা পড়িয়াছে । দরিয়াবিবি যেন তাই দেখিতেছিল ।

আমজাদ বলিল, চিনতে পারছ না মা, মুনিভাই । দ্যাখো কত বড় হয়েছে ।

দরিয়াবিবির চোখের পাতা বন্ধ হয় না । পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী বসিয়া আছে ।

মোনাদির ডাকিল, মা ।

অপরপক্ষ কোন সাড়া দিল না । শুধু চোখের পলক ফেলিয়া দরিয়াবিবি আবার তাকাইয়া রহিল ।

বিস্মিত আমজাদ । নইমা পিছন পিছন আসিয়া দাঁড়াইল ।

এতক্ষণ মনে ছিল না । মোনাদির কদমবুসি করিতে বসিয়া পড়িয়া মা'র পায়ের দিকে হাত বাড়াইল । তখনই দরিয়াবিবি হাউ মাউ শব্দে পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল ।

মোনাদির মা'র উত্তণ্ড নিঃশ্বাস ও উদ্বেলিত বক্ষের স্পন্দন সারাশরীরে অনুভব করে । সে-ও নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল ।

৩৯

বুঝু দ্যাখো দ্যাখো, মুনি চাচা বড় হয়ে কেমন দেখাচ্ছে । আমিরন চাচী দরিয়াবিবিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল ।

তিন-চার বছর— কিছুটা বেড়েছে ।

কিছুটা নয় । মুখখানা দ্যাখো । বড় হলে তুমি দেখো বুঝু, আট-পিঠ আমার মত হবে ।

তোমার পায়ের নখের যুগ্মি হোয়ে বেঁচে থাক ।

আমার যত চুল, চাচার তত বছর পরমায় (পরমায়ু) হোক— আমি দোয়া করছি ।

আমিরন চাচীর দাওয়ায় রীতিমত ভিড় । দুপুরের পরেই দরিয়াবিবির ছেলের লইয়া আসিয়াছে । হাসুবৌ পর্যন্ত এখানে আসার জিদ ধরিয়াছে । ভিটার গঞ্জির মধ্যে বছরের পর বছর আর কাঁহাতক ভাল লাগে । সে-ও আজ শাশুড়ীর তোয়াক্কা না করিয়া আসিয়াছে ।

মোনাদির রীতিমত ঘামিতে থাকে । সে বেশ চটপটে ছেলে । কিন্তু এমন আগন্তুক পরিবেশে সে বড় ম্লান হইয়া যায় । আশিয়া হাঁ করিয়া মোনাদিরের দিকে তাকায় । পাঁচ বছর আগে সে গোখুলি লাগা সড়কে মোনাদিরকে কেমন বোকা বানাইয়াছিল, আজ মনে

পড়িয়া যায়। আশ্বিয়ার সারা শরীর লজ্জায় ছাওয়া।

আমিরন চাচী মেয়েকে ধমক দিয়া বলিল, দেখছিস কি হতভাগী, তোর মুনিভাই। যা, তোরা সব খেলা কর্ গে। কিন্তু আশ্বিয়া আশ্রয়ার্থী, সে ধীরে ধীরে দরিয়াবিবির পাশে আসিয়া বসিল আর নড়িতে চাহিল না। হাসুবৌর কাছে ত মোনাদির আর মুখ খুলিতে পারে না। হাঁ-না দিয়া জবাব দায়সারা করে। হাসুবৌ মোনাদিরের উদ্ধারে আসিল, চাচা, কথা বলো, তুমি কেমন হয়ে গেছ।

মোনাদির মাথা হেঁট করিল। মা'র আদেশে সে আসিয়া চাচীকে সালাম করিয়াছিল আর মুখ খুলিতে পারে নাই।

এমন লাজুক কেন, চাচা। আমিরন চাচী মোনাদিরের দিকে চাহিল।

পুত্রের বদলে জবাব দিল মা, বড় হয়েছে— এখন সব বোঝে ত। মুরুব্বীদের সামনে কি বেশি কথা বলে? বেয়াদবী হয় যে!

তোমরা খেলা কর গে। যা, যা আশ্বিয়া, যা। আমিরন চাচী মেয়েকে এক ঠেলা দিল।

আমজাদ মুনিভাইয়ের সঙ্গ পাইলে আর কিছু চায় না। সে বলিল, চলো দাদা।

এতক্ষণে মনোমত প্রস্তাব আসিয়াছে। মোনাদির সাড়া দিতে বিলম্ব করিল না। আশ্বিয়া তখন সলজ্জ ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে এক দৌড়ে আমজাদ ও মোনাদিরের পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। হাসুবৌ কহিল, চাচীকে মেয়ে একখানা। বড়া ভাজা। দেখলে, কীভাবে দৌড় মারল।

যাক যাক। ও একটা জ্বালানি।

মেয়ের প্রশংসা মা সহ্য করিতে পারিল না।

বুবু, ছেলে এবার তোমার হেল না? আমিও ত বলেছি, না এসে পারে?

আমার কোন ভরসা নেই।

এমন অলক্ষণে কথা মুখে এনো না।

দরিয়াবিবি কোন জবাব দিল না, শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। চাচী আবার জিজ্ঞাসা করিল, ক'দিন থাকবে?

স্কুলের ছুটি আছে চারদিন। পরশু আবার চলে যাবে।

ও, বলিয়া আমিরন চাচী একটু চিন্তাশিত হইল।

তোমরা খুব বুঝিয়ে বলো, বোন। আবার যদি চলে যায়, আমি আর বাঁচব না।

হাসুবৌ ও আমিরন চাচী এক জোটে সায় দিল, নিশ্চয় বলব।

আশ্বিয়া হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিল। তার দিকে সকলের লক্ষ্য।

এই পোড়ামুখী, হাসছিস কেন?

আশ্বিয়া মা'র মধুর সম্বোধনে হাসি ক্ষান্ত দিল। পরে বলিল, মুনিভাই গাছে চড়ে গান ধরেছিল। হঠাৎ একটা বাঁদর দেখে নামতে নামতে কাঠপিপড়ে কামড়েছে। তাই হাসি।

আবার কোথা থেকে মড়ার বাঁদর এসেছে। গাছপালা রাখা দায়। সেদিন আমার শিমগাছ খেয়ে গেছে। আমিরন চাচী উঠানের গাছপালার দিকে তাকাইল।

কথায় কথায় বেলা শেষ। মোনাদির ফিরিয়া আসিলে আজ চাচী নানা উপদেশ দিলেন। আম্মিয়ার জড়তা কাটিয়াছে। সে সকলের সঙ্গে খুব চাকুম চাকুম শব্দে মুড়ি ও নাড়ু খাইল।

দরিয়াবিবি বলিল, অবেলাটা বড় সুখে কাটল আমিরন বোন।

আবার এসো মুনি চাচা। তুমি পরশু দিন সকালে যাবে, তখন আমি থাকব এই হতভাগীকে সঙ্গে নিয়ে। চাচী সহাস্যে মেয়ের দিকে আঙুল বাড়াইল।

হাসুবৌ শুধু বড় ম্রিয়মাণ। তার আবার শাশুড়ীর ভয় জাগিয়াছে।

আজ আমিরন চাচী সকলের সঙ্গে সড়কের অনেক দূর পর্যন্ত আগাইয়া আসিল কথা বলিতে বলিতে। কথা আর ফুরায় না।

৪০

চন্দ্র কোটালের প্রস্তাব মোনাদিরের খুব ভাল লাগিয়াছিল। মুনি চাচা লেখাপড়া জানে, আমাদের গানের দলের অধিকারী হবে, আর সমস্ত গান লিখে রাখবে। আজকাল গৈয়ো, সোজা গান বাবুরা পছন্দ করে না। চাচা ভাস্ক ঠিক করে দেবে?

কিন্তু যথাসময়ে মোনাদির চলিয়া গেল। এই বাড়িতে কেন যেন মন টেকে না। মাঝে মাঝে মায়ের হৃদয়ের উত্তাপহীনতা সে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছিল। এই তিনদিনেই সে বুঝিয়াছিল, মা আগের মত তার জন্য আকুলি-বিকুলি করে না। দরিয়াবিবির আকস্মিক ব্যবহারে আমজাদ দুঃখ পাইত, মোনাদির মিস্ত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু কিশোরের মনে তার কোন বিশেষ দাগ পড়িল না। যাওয়ার দিন দরিয়াবিবি বারবার অনুরোধ করিল, সে যেন ছুটি পাইলেই চলিয়া আসে।

হাসুবৌ ইদানীং এই বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত করে। কাছে সহানুভূতিশীল আর কোন প্রতিবেশী নাই। বক্ষ্যা জীবনে জুলুম সহ্য করিতে হয়। এইখানে তবু মনের ভার হাল্কা করা যায়। দরিয়াবিবি এই নিরীহ সরল বধূটির প্রতি বড় স্নেহশীল। সাক্ষের মা তাই লইয়া মনে মনে গজ্ গজ্ করিত, অবশ্য মুখে কিছু বলিত না। কারণ সাক্ষের দরিয়াবিবির কথা সহজে অবহেলা করে না। দরিয়াবিবির খাতিরে সে তার মার সঙ্গে বিবাদ জুড়িতেও প্রস্তুত।

মোনাদির চলিয়া যাওয়ার দিন খুব সকাল সকাল হাসুবৌ এখানে আসিয়াছিল। অনেক বেলা হইয়া গেল, তবু বাড়ি যাওয়ার নাম নাই। দরিয়াবিবির সহিত এ-কথা সে-কথা ও গৃহস্থালীর ছোটখাটো কাজ করিয়া দিল।

বুঝ, মন খারাপ করো না, এমন সোনার চাঁদ ছেলে। ও তোমার ছাড়া কার? এমন বহু সান্ত্বনা-বাক্য হাসুবৌর মুখে আজ যেন লাগিয়াই ছিল।

দরিয়াবিবি বড় বিষণ্ণ। কাজকর্ম করিতেছিল, কিন্তু সহজ কথোপকথনে তার মন ছিল না।

বাঁশের একটি চুপড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হাসুবৌর সহযোগিতায় দরিয়াবিবি তা মেরামত করিতে বসিল।

বুবু, আল্লার মরজী, তোমার শরীর বেশ আছে। তুমি বেশ মোটা হচ্ছে।

দরিয়াবিবি কোথায় কাপড় অসম্বৃত এই আশঙ্কায় নিজের দিকে চাহিয়া লইয়া জবাব দিল, লোকে বলে, আছে ভালো, কিন্তু ওদিকে শালুক খেয়ে যে দাঁত কালো তার খবর কেউ রাখে না।

হাসুবৌ চুপ করিয়া গেল। দরিয়াবিবির কণ্ঠে সৌহার্দের লেশ ছিল না। যেন ঝগড়ার মুখে আর একজনের সঙ্গে সে কথা কাটাকাটি করিতেছে।

শাশুড়ীর চীৎকার শোনা গেল। হাসুবৌ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দরিয়াবিবির যেন তার উপর কত খাপ্পা। হাসুবৌ তাই ভয় পাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, এখন যাই, বুবু।

দরিয়াবিবি নিজের মনে একটি কক্ষি ফাড়িতে লাগিল, কোন জবাব দিল না-হয়ত শুনিতে পায় নাই। সে নিজের কাজে মগ্ন। হাসুবৌ অপরাধীর মত বিদায় লইল।

সেদিন বিকালে ইয়াকুব আসিল। সঙ্গে পুত্র। তাহাকে দরিয়াবিবির কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল। আবার দু'দিন পরে আসিবে সে।

সমগ্র পরিবারের রসদ দিয়া গিয়াছে, দরিয়াবিবির কোন অসুবিধা ছিল না। নিজের ছেলে আজই প্রবাসী, আবার পরের সন্তান ঘাড়ে। কিন্তু দরিয়াবিবি কোন অবহেলা দেখাইল না। ছেলেটার নাম ওয়ায়েস। বেশ ফুটফুটে কথা বলে। আর বড় সুন্দর জবাব দিতে পারে। দরিয়াবিবি মানসিক ভার কাটাইবার উদ্দেশ্যে ছেলেটিকে ইয়াকুবের অন্দর মহলের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল।

তোমার দুই মা, না?

হ্যাঁ, চাচী। ছোটমা আর বড়মা। আমি শুধু মায়ের ছেলে। আমরা দু'ভাই।

তোমার ছোটমা কেমন?

খুব ঝগড়া করে মায়ের সঙ্গে বড়মার সঙ্গে।

তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে?

হ্যাঁ। আজ ঝগড়া হয়েছে। তাই আমাকে বাপ নিয়ে এলো।

ঝগড়া হোলো?

রোজ ঝগড়া হয়। আজকাল বাপ ঘরে থাকে না।

কোথায় থাকে?

দহ্লিজে ঘুমায়। আর বাপের অসুখ আছে। শরীর খারাপ।

দরিয়াবিবি চুপ করিয়া যায়। ছেলেটিকে নিজের পাশে শোয়াইয়া আরো তথ্য সংগ্রহ করিল। ইয়াকুবের অন্দর মহল একটি দোজখ। মোটামুটি গ্রাম্য জীবনের সম্ভ্রলতা আছে, তাই বাড়ির মেয়েরা রান্না-খাওয়া ছাড়া বেকার। টাকার গরম, শাড়ির গরম দেখাইতে পরস্পরে হিংসা, ঝগড়া। এইটুকু ছেলেও কেমন কূটচক্রের ইতিহাস জানে।

দু'দিন পর ইয়াকুব ছেলেটিকে লইয়া যাইবার সময় বলিল, দরিয়াভাবী (আর ভাবী সাহেব বলে না) ছেলেটাকে এনে রেখে দেব। ওখানে থাকলে আর মানুষ হবে না।

কথার জবাব দিতে হয়, আমজাদ সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। দরিয়াবিবি বলিল, তোমার পাকা বাড়ি, এখানে বাঁশের ঘরে কেন?

সেখানে ছেলেগুলো মার জন্য খারাপ হবে। খালি কিচামিচি ঝগড়া-ঝাটি।

দরিয়াবিবি আর কোন জবাব দিল না।

ইয়াকুব পুত্রকে লইয়া পথাভিমুখী হইল। আমজাদের সঙ্গে ওয়ায়েসের খুব খাতির জমিয়াছে। সে-ও পিছন পিছন গেল।

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা, তোমাকে পনের টাকা দিয়েছে। ভুলে গিয়েছিল। ওয়ায়েসের বাপ বললে।

মুনি মাত্র দুটাকা সঙ্গে নিয়ে গেছে। কালই টাকা পাঠিয়ে দিতে হয়। মনে মনে দরিয়াবিবি সাত-পাঁচ ভাবিতে লাগিল।

৪১

অচল দিনকে প্রাণপণে ঠেলিতে হয়। সমস্ত উদগ্র শিরা-উপশিরা বিদ্রোহী, তবু বিশ্রাম কি শৈথিল্য দেওয়া চলে না। উৎরাইয়ের বাকে বোঝাও অনড় হইয়া সংগ্রামশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে ব্যঙ্গ করে। উপত্যকায় তখন আবার ঝড় দেখা দিলে, অসহায়তা-নৈরাশ্য মেঘ গর্জনের সঙ্গেই বিকট প্রতিধ্বনির ধাক্কার বেগে ছুটিয়া আসে।

দরিয়াবিবি উৎরাইয়ের মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। চারিদিকে শ্বাপদ-সংকুল খাদ ভরা অরণ্যানী। পানি আর তৃষ্ণা মেটায় না, বাতাস আর শ্রান্তি হরণ করে না।

মা।

দরিয়াবিবি চাউলের কাঁকর বাহিতেছিল। উদ্ভানের দিকে পিঠ। সুতরাং আগন্তকের সংবাদ সে জানিতে পারে নাই। চকিতে চোখে ফিরাইয়া দরিয়াবিবি অবাক হইয়া গেল। মোনাদির আসিয়াছে। পিঠের উপর একটু বোঝা-সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। পথ-চলার ক্লান্তি পথিকের নিঃশ্বাসের প্রতীত্য ধরা পড়ে।

হঠাৎ এলি নাকি, বাবা?

গরমের ছুটি হোতে এখনও তিন মাস বাকী। স্কুলে পরীক্ষা হচ্ছে, এক হপ্তা ছুটি। তাই চলে এলাম।

বেশ করেছে।

দরিয়াবিবি তাড়াতাড়ি নিজের হাতে মোনাদিরের জামা খুলিয়া ঘাম মুছিয়া দিল। হাঁকডাকে আমজাদ আসিয়া হাজির। সে একটা মোড়া আগাইয়া দিল।

দরিয়াবিবি বড় খুশি। তাড়াতাড়ি ভাত চাপাইয়া দিল। দুপুরের হাঁড়ি শূন্য। কিছুক্ষণ আগে তাহারা আহার সমাধান করিয়াছে। আমজাদ মাঝে মাঝে হাত-খরচের লোভে মুরগি-হাঁসের ডিম লুকাইয়া রাখে। সে একটি ডিম আনিয়া দিল।

দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করিল, আগা কোথা পেলি?

আমাদের লাল মুরগিটা যেখানে-সেখানে ডিম পাড়ে। কাল গোয়ালঘরের মাচাঙে ছিল। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।

পুত্রের আবিষ্কার-দক্ষতায় দরিয়াবিবি খুব উৎফুল্ল হয়। সে আলুভাজা আর ডাল করিতে চাহিয়াছিল। এখন ডিম পাওয়া গেল। আহারের ষোলকলা পূর্ণ।

মোনাদির পুকুরে গোসল করিয়া আসিল। অজানা পরিতৃপ্তি তার মনে। তাই ভাই-

বোনদের সঙ্গে নানা গল্প ছাড়িল। ঝোলা হইতে কয়েকটি মাটির পুতুল সে নঈমা ও শরীকে দিল। তাহাদের খুশির অন্ত নাই। একজোড়া ভাল লাটিম বাহির করিল মোনাদির আমজাদের জন্য। দুই ভাইয়ে কাল নদীর ধারে গাছতলায় খেলব, এই প্রস্তাবে আমজাদ লাফাইয়া উঠিল।

দরিয়াবিরির কাছে সমস্ত বৈকাল যেন সুরের মত বাজিতে থাকে। ছেলেপুলেদের লইয়া সে বহুদিন এমন আনন্দ পায় নাই। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সে রাত্রির রান্নায় বসিল। আমিরন চাচীর গাছ হইতে একটি লাউ চাহিতে গিয়াছিল আমজাদ। সে লাউয়ের সঙ্গে একটা মুরগিছানা দিয়াছে। কদু-গোস্তের তরকারী রাখিতে দরিয়াবিরি সমস্ত নৈপুণ্য ঢালিয়া দিল।

আহার শেষে দাওয়ায় অনেকক্ষণ গল্প-গুজব শুরু হইল। মোনাদিরের কাছে পরিবেশ আর অচেনা নয়। সে বেশ সহজ। দরিয়াবিরিও প্রাণ খুলিয়া ছেলেদের হল্পায় যোগ দিল।

পরদিন আমজাদ ও মোনাদির টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। চন্দ্র কোটালের ভিটায়, নদীর ধারে, মাঠে মাঠে, সড়কের আশপাশে ঝোপে-জঙ্গলে দুইজনের গতিবিধি। আমজাদ ত এমন স্বাধীনতাই প্রতিদিন কামনা করে। একা একা সে আবার বড় ভীকু ও লাজুক। শুধু মুনি ভাই সঙ্গে থাকিলেই সে সব কাটাইয়া উঠিতে পারে।

মা'র মেজাজ বড় হালুকা আজকাল। আমজাদ তাই আরো খুশি।

মোনাদিরই প্রথম অনুজকে জিজ্ঞাসা করিল, আম্মা মা বড় মোটা হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ। মুনি ভাই, আমার মনে হয় অসুখ।

না। মা'র শরীর আমার মত কিনা।

তা ঠিক মুনি ভাই। বড় হোলে তুমি চন্দ্র কাকার মত জোওয়ান হবে।

তাই ত বেঁচে আছি। স্কুলের যেখানে যা খাওয়ায়, এতদিন আমারও অসুখ করত।

দ্রাভবিক্রমে আমজাদ গৌরবান্বিত। সে প্রস্তাব করিল, তুমি সাকের চাচার কাছে লাঠি খেলা শিখবে?

গ্রামে এসে থাকলে নিশ্চয় শিখব। আমি খুব ভাল লাঠিখেলা শিখতে পারব। মোনাদির হাতের পেশী দেখাইল।

নদীর ধারে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া দুইজনের কথাবার্তা চলিতেছিল। চৈত্র মাস। তাই নদী শুষ্ক। দুই পাশে চরে খাগড়া বন। মাছরাঙার বাসা খুঁজিয়া অনেকক্ষণ দুইজনে কাটাইয়াছে। কোন লাভ হয় নাই। একটি বড় চালতা গাছের গুঁড়ির উপর দুইজনে ঠেস দিয়া দূরে দূরে চাহিতেছিল। আকাশ একদম মেঘহীন। রৌদ্রের তরল ঝরণায় সমস্ত মাঠ ঝমঝম বাজিতেছে। নিঃসঙ্গ তালগাছ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে প্রত্যঙ্গের খরখরানি মিশাইয়া দিয়াছে। গ্রাম্য দুই বালক কথার ফাঁকে ফাঁকে পৃথিবীর বিশালতা অনুভব করে।

শুধু ক্ষুধার তাড়না এই অবসর উপভোগে ছেদ টানিল। মোনাদির বাড়ি ফিরিয়া দেখিল ইয়াকুব আসিয়াছে। মা বলে নাই, তবে আমজাদ বলিয়াছে, এই লোকটি গত তিন-চার বৎসর তাহাদের বহু উপকার করিয়াছে। মোনাদির অচেনা লোকের সম্মুখে বড় লাজুক। শুধু সে আর নিজে কোন আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারে না।

রাত্রে ছেলেরা আহারে বসিল। দরিয়াবিরি ঘ্রিয়মাণ দাসীর মত কর্তব্য সম্পাদন

করিতে লাগিল। আমজাদ আসর জমাইত চায়। কি একটা মুনি-সম্পর্কিত রসিকতা করিতে গিয়া সে ধমক খাইল। তখন আহারই একমাত্র তপস্যা হইয়া দাঁড়াইল সকলের পক্ষে।

দুইটি মাত্র কক্ষ। আমজাদ ও ইয়াকুব এক কামরায়, অন্য কামরায় মা'র কাছে নঈমা ও শরী-র সহিত মোনাদিরের শয়ন ব্যবস্থা হইল।

আজ মা'র সঙ্গে বিশেষ কোন কথা হইল না। সারাদিন কত খাটে, এই ভাবিয়া মোনাদির ঘুমাইয়া পড়িল।

দরিয়াবিবি বিন্দ্র বহুক্ষণ পড়িয়া রহিল। গরমের দিন। তবু একটি কাঁথায় তার হাঁটু পর্যন্ত চাপা। গরম, তার উপর দৈনন্দিন চিন্তার টানাপোড়েন। বাহিরে জানালা দিয়া দেখা যায় আকাশ ভরিয়া কত জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

ঘুম আসিতেছিল না। দরিয়াবিবি সকলকে ঘুমন্ত দেখিয়া ধীরে ধীরে টাটি খুলিয়া উঠানে দাঁড়াইল। জানালার কাছে কাঁঠাল গাছের পাতার ফাঁকে জোছনা পড়িয়াছে মাটির উপর। দরিয়াবিবি আনমনা গিয়া দাঁড়াইল। আকাশে নিশ্চয় কয়েকটি তারা জ্বলিতেছে মাত্র। সমস্ত আকাশ ত গাছের তলা হইতে দেখা যায় না। দরিয়াবিবি দাঁড়াইয়া রহিল বেশ কিছুক্ষণ। সুপ্ত প্রেমের নীরবতা কুচিং পাখির ডাকে, দূরগত কুকুরের চীৎকারে চিড় খায় মাত্র।

হয়ত অনন্তকাল এমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে দরিয়াবিবি আনন্দিত হইত, কিন্তু হঠাৎ মানুষের ছায়া পড়িল জোছনায়। শিহরিয়া, তাড়াতাড়ি উঠানের দিকে যাইবে, সে দেখিল ইয়াকুব তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। মমোহিতের মত দরিয়াবিবি নিজের জায়গায় স্থাপু।

কয়েক মুহূর্ত পরে সম্মিৎ ফিরিয়া আসিলে দরিয়াবিবি ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠে বলিল, এখানে কেন?

কেন, তুমি জানো না, দরিয়াবিবি ইয়াকুব তার হাত ধরিয়াছে ততক্ষণে।

হয়ত হাত টানাটানি শুরু হইত, জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া মোনাদির ডাকিল, মা, এত রাতে তুমি একা বাইরে গেছ, আমাকে ডাকলে না কেন?

আসছি বাপ। তুমি ঘুমোচ্ছিলে, তাই আর জাগাই নি।

ইয়াকুব চোরের মত আড়াল অন্ধকারে লীন হইতে গেল, কিন্তু তার লম্বা ছায়া জোছনার হাত এড়াইতে পারিল না।

দরিয়াবিবি কম্পিত বুকে তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা বন্ধ করিল। মোনাদির তখনও জানালায় দাঁড়াইয়া। মাকে, বলিল, মা চোরটোর হবে। একটা লোকের ছায়া পড়ল কাঁঠাল গাছের পাশে।

না। অন্ধকারে দরিয়াবিবি আবার বলিল, তুমি এসো, শুয়ে পড়।

যাই। মা, তুমি একলা এমন রাতে বেরিয়ে না।

কি আছে আমাদের, চোর আসবে?

মোনাদির কয়েক মিনিট জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া নিজের বিছানায় ফিরিয়া আসিল।

সারাদিনের ক্লান্তি, উদ্বেগজনিত নিদ্রাহীনতা— ভোরের দিকে দরিয়াবিবির চোখে ভয়ানক ঘুম নামিয়াছিল। কাক ডাকা সকাল তার জীবনে প্রথম দেখে নাই।

আরো কতক্ষণ ঘুমাইত কে জানে, হঠাৎ আমজাদ আসিয়া ডাক দিল, মা, মা।

খোঁয়ারি চোখে দরিয়াবিবি ধমক দিল, কি, এত ডাকছিস কেন?

মুনি ভাইয়ের-কাপড়-চোপড় কোথা?

বাশের আলনায় আছে।

কই নেই ত?

দরিয়াবিবি চোখ খুলিয়া চাহিল।

তোর ঘরে নেই?

না। ইয়াকুব চাচা সকালেই চলে গেছে।

দরিয়াবিবি কাঁথা জড়াইয়া উঠিয়া পড়িল। বারবার চোখ কচলাইল। মোনাদিরের
ঝোলা, কাপড়-চোপড় আলনায় নাই।

বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল দরিয়াবিবি। তার শরীর থরথর কাঁপিতেছে।

দিঘীর পাড়ে গিয়ে দেখে তুই, সেদিকে গেছে বোধহয়।

আমজাদ চলিয়া গেলে দরিয়াবিবি পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, মোনাদিরের বই-পত্র
নাই।

দরিয়াবিবি হয়ত মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু মনে মনে বুকে জোর সঞ্চয় করে
সে। না, মূর্ছা যাওয়া তার সাজে না।

তাল সামাল দেওয়ার জন্য কিম ধরা মাথা দুই হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া দাওয়ার
উপর দরিয়াবিবি বসিয়া পড়িল। একটু হাঁফ ফেলা দরকার শুধু।

৪২

চন্দ্রমণি এক রাতে রাজেন্দ্রের সঙ্গে স্নান ত্যাগ করিয়াছিল। চন্দ্র কোটাল প্রায় একমাস
আর গ্রামের ভিতর আসে নাই। আমজাদ নিজেই যাইত খোঁজ-খবর লইতে। চন্দ্র যেন
আর এক রকম হইয়া গিয়াছে। তাড়ি সে খায়। কিন্তু নিঃশব্দে খায়। আর হুলা করে না,
গান করে না। চন্দ্রমণির ছেলে দু'টি মামার কাছেই আছে।

দরিয়াবিবি এই সংবাদ শুনিয়াছিল হাসুবোর মুখে, আমিরন চাচীর মুখে। কিন্তু কোন
মন্তব্য করে নাই। বিপদে-আপদে কোটালের কাছে আমজাদকে পাঠানো বৃথা। যে-যার
মাথার ঘায়েই পাগল। এইজন্য দরিয়াবিবি কোটালের জন্য বড় দুঃখিত। আহা, এমন
মানুষের কপাল বটে! কিন্তু উপায় কোথায়? দাদার গলগ্রহ জীবনের চেয়ে চন্দ্রমণি আর
কারো আশ্রয়ে গিয়াছে। সংসারের কতটুকু ক্ষতি তাতে? হয়ত দরিয়াবিবির মনে এইসব
কথা উঁকি দিয়াছিল।

দরিয়াবিবির একদিন সন্ধ্যায় কোটালের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আমজাদ খুব
রাজি। কিন্তু আর যেন সেদিকে পা বাড়ানোর উৎসাহ নাই। খ্যাপা কোটালের সংসার
দেখার ইচ্ছা কার না হয়? আজহারের মত ধর্মাত্মক ধর্মভীরু লোকটি চন্দ্রকে চিনিয়াছিল।
কিন্তু সে জীবিত থাকিতে দরিয়াবিবি এমন প্রস্তাব উত্থাপন করে নাই। আর যাওয়া হোলো
না দরিয়াবিবি সেদিন মনে মনেই উচ্চারণ করিল। গ্রাম্য জীবনে একজনের অপবাদ সমস্ত
বাড়ির উপর ভর করিয়া থাকে।

এক মাস পরে আমজাদ মা'র কাছে আসিয়া জানাইল, মা, আজ মুনি ভাইয়ের টাকা ফেরত এলো। এই নাও টাকা। আমজাদ পনেরটি টাকা গণিয়া দিল।

টাকা ফেরত এলো কেন?

পিয়ন বললে মুনিভাই সেখান থেকে চলে গেছে।

অস্টুট কণ্ঠে দরিয়াবিবি একবার উচ্চারণ করিল, চলে গেছে! তারপর পুত্রের সহিত আর কোন বাক্যালাপ করিল না। অবিচল মূর্তির মত টাকা কয়টি হাতে দরিয়াবিবি বসিয়া রহিল। দুশ্চারিণী জননীর দান সং সন্তান কেন গ্রহণ করিবে? মুনি—

আমজাদ হাসুবৌকে তখনই খবর দিয়া আসিয়াছিল। পিয়ন তাহাদের বাড়ির পাশেই দাঁড়ায়। হাসুবৌ আসিল। দরিয়াবিবির অশ্রুসজল মুখের দিকে চাহিয়া সে আর কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে পাশে বসিয়া পড়িল।

দরিয়াবিবির মুখাবয়ব ক্রমশ থমথমে, গৌরসুডোল গগুদেশ বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। হাসুবৌ আমজাদকে বলিল, বাবা, একটু পানি এনে দে।

আমজাদ বিলম্ব করিল না আদেশ-পালনে।

হাসুবৌ দরিয়াবিবির চোখের পানি মুছাইতে মুছাইতে বলিল, বুবু একটু বারফাটা ছেলে। আবার আসবে। বেটাছেলের জন্য এত চিন্তা কেন?

দরিয়াবিবি কোন জবাব দিল না। হাসুবৌ আবহাওয়া সহজ করিতে ছুঁতানাতা খোঁজে। বলিল, বুবু, সন্ধ্যা হয়, এখন কত কাজ তোমার, উঠো পড়।

উঠানে একপাল মুরগি-হাঁস কোলাহল তুলিয়াছিল। ইহাদের সাক্ষ্য-ভোজন বাকি। হাসুবৌ আরো জিদ ধরিল, বুবু, তুমি না উঠলে আমি বাড়ি যেতে পারব না। তোমার ছেলে তোমারই আছে।

দরিয়াবিবির চোখে আর পানি নাই। কিন্তু বড় চিন্তান্বিত সে। হাঁটুর উপর থুংনী রাখিয়া অবিচলতার নারী-প্রতীক রূপে বসিয়া রহিল।

ওঠো বুবু। হাসুবৌ হাত ধরিয়া বলিল, ওঠো। তোমার নিজের শরীরও ভাল নয়। কেমন ফোলা-দেখাচ্ছে। এমন করলে শরীর টেকে?

তুমি যাও। আমি উঠছি। দরিয়াবিবি মৃদু কণ্ঠে বলিল।

তুমি ওঠো।

উঠছি। তুমি যাও।

বেশ, আমি উঠানের পৈঠা পর্যন্ত গিয়ে দেখব, না উঠলে আবার আসছি।

হাসুবৌর যা কথা তাই কাজ। কিন্তু দরিয়াবিবি সত্যি তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাঁস-মুরগির খবরদারীতে মনোযোগ দিল।

৪৩

সাকের নইমাকে সদরের হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল। চোখের দৃষ্টি তার ক্রমশ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। এত বেশি পিঁচুটি পড়ে, সকালে সে চোখই খুলিতে পারে না। তাই দরিয়াবিবি সাকেরের শরণাপন্ন হয়। চন্দ্র কোটাল বহুদিন এদিকে মাড়ায় নাই।

হাসপাতালের ডাক্তার ঔষধ দিয়াছে। কিন্তু প্রতিকার অনিশ্চিত। ডাক্তারের অভিমত দরিয়াবিবি শুনিয়াছিল। কিন্তু সে ব্যাপারটা আর গুরুতর মনে করে না। অন্ধের কি দিন বন্ধ থাকে?

গত দুই মাসে দরিয়াবিবি বড় স্থির ও শান্ত হইয়া আসিল। কাজের গাফিলতি হয় না কিন্তু সব কাজ ধীরে ধীরে। মন যেন আর কোথাও উধাও, তারই পটভূমিকায় দৈনন্দিনতার কর্তব্য-সাধন মাত্র। ছেলেদের উপর রাগও নাই। শরী কত বিরক্ত করে, দরিয়াবিবি মোটেই তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। আমজাদ একদিন মা'র কোপন-স্বভাবের জন্য যেমন ভীত হইয়াছিল, আজ আবার বর্তমান অবস্থার জন্য তেমনই ভয় পাইল। তার ছেঁড়া লুঙি ও শার্ট সেদিন পাওয়া গেল না। নালিশ জানাইলে মা জবাব দিল, গেছে যাক। আর কোন ধমক নয়। দরিয়াবিবি যেন ধমক দিতে ভুলিয়া দিয়াছে। আমজাদ তাই অস্বাভাবিকতার আবহাওয়া স্বতঃই টের পায়। আমিরন চাটী আসিলে দরিয়াবিবির চাঞ্চল্য সামান্য বাড়ে। হাসুবৌ কোন পাত্তা পায় না। তাহার সহিত দু-একটি কথা হয় মাত্র। চুপচাপ বসিয়া বসিয়া সে চলিয়া যায়। দরিয়াবিবি কোনদিন মুখরা ছিল না। কিন্তু এখন তার সমস্ত কথা যেন শেষ হইয়া গিয়াছে।

একদিন সকালেই রাজকীয় উপহারে সজ্জিত ইয়াকুব আসিল। ছেলেদের সম্মুখে দরিয়াবিবি কোন নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘৃণা করে। সহজেই সে জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিল।

ইয়াকুব তাড়াতাড়ি আমজাদের বিছানায় শুইয়া পড়িল। তার চোখমুখ কোটাগত ও শীর্ণ। দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসাবাদ কিছুই করে না। কখন এলে? বা এই জাতীয় মামূলী প্রশ্ন মাত্র।

একটু পরে আমজাদের কক্ষ দরিয়াবিবি প্রবেশ করিল।

ঘুমুচ্ছে? ইয়াকুবের নিকট তার প্রথম প্রশ্ন। ইয়াকুব মুখে চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়াছিল। দিনের আলোয় মুখ দেখাইতে সে যেন ভয় পায়।

ইয়াকুব মুখের আবরণ খুলিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি দরিয়াবিবির তরফে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কিছু বলছ?

দরিয়াবিবি প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। ইয়াকুবের মুখের উপর পনেরটি রূপার টাকা বানবান শব্দে রাখিয়া বলিল, মাস-মাস তোমাকে এই টাকা আর দিতে হবে না।

কেন? ইয়াকুবের মুখ বিবর্ণ। জুরে তার হাড় সিঁদ্ধ হইতেছিল, এমনই দেহে কোন জৌলুস ছিল না।

দরিয়াবিবি কক্ষ-ত্যাগের জন্য পা বাড়াইলে প্রায় আসন্ন-মৃত্যু রোগীর চেহারা-কণ্ঠে ইয়াকুব ডাকিল, শোনো।

দরিয়াবিবি গমন-পথের দিকে চাহিয়া পেছন ফিরিয়া বলিল, বলো।

আমার বড় জ্বর, আজ এক সপ্তাহ। আমি তোমাদের এখানে একটু শান্তি পেতে এসেছি।

আমরা কি তোমার কাপড়ে আগুন লাগাচ্ছি? বড় নির্মমের মত দরিয়াবিবি জবাব দিল।

তা কেন? এমন দুঃখের দিনে তোমরা আমাকে জায়গা দিয়েছ, তা কি কম উপকার?

আমার ঘরে শান্তি নেই, দেহ ভাল নয়। এই টাকাগুলো নিয়ে গেলে আমার মনে কোন কষ্ট থাকবে না।

ও টাকাগুলোর আর দরকার নেই।

নেই?

না। দরিয়াবিবি তখনই আবার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সাণ্ড খাবে?

হ্যাঁ। কাতর কণ্ঠের আর্তনাদের মত শোনায়ে ইয়াকুবের জবাব।

দরিয়াবিবি রোগীর অন্য প্রয়োজন জানানোর অপেক্ষায় রহিল না। দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

আমজাদ আজ মা'র উৎসাহ দেখিয়া অবাক। মাছ ছিল কয়েক রকমের। ইয়াকুব সের দুই খাসীর গোস্ত ও অন্যান্য শাক-সজিসহ ঘি আনিয়াছিল। দরিয়াবিবি পরম আগ্রহে রন্ধন-বিদ্যা উজাড়ে মনোযোগ দিল। শত্রু কোথাও যেন ধরাশায়ী। তাই যেন বিজয়ী বীরের উল্লাস। খাওয়ার সময় উৎসাহে আদৌ ভাঁটা পড়িল না। মা'র এমন আগ্রহাশ্রিত আহার আমজাদ জীবনে দেখে নাই। রান্না হইয়াছিল চমৎকার।

ভূরিভোজনের বিশ্রামের পর সাণ্ড হাতে ঢুকিয়া দরিয়াবিবি দেখিল, ইয়াকুব ঘুমাইতেছে। ভাঙা তক্তাপোষের একদিকে বাটা বসাইয়া সে চাহিয়া দেখিল। তার মুখের এমন পূর্ণ আদল সে আগে দেখে নাই। মলিন লতার মত সারা চেহারায় বিশীর্ণতা। কত দুঃখ-ভারাক্রান্ত এই শায়িত ব্যক্তি, তা তার চোখের কালিম্বা কোণগুলিতে স্পষ্ট।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দরিয়াবিবি ঐ মুখ পূর্ণানুপূর্ণ অবলোকন করিল। বেচারার বড় দুঃখী! ঘরে সাতদিন জুরে ভুগিয়াছে, আজও জুর-জুর-দেহে গৃহত্যাগী। খুব জ্বর, হয়ত এই শেষ শয্যা। আজহারের শেষ কক্ষটি দিন দরিয়াবিবির চোখে নিমেষে খেলিয়া গেল।

নিঃশব্দে ইয়াকুব ঘুমাইতেছিল অথবা চোখ বুজিয়া ছিল কে জানে। দরিয়াবিবির কেমন মায়া হয়। হঠাৎ তার বৃকে করুণা উথলিয়া উঠে। নৌকায় সারা পথ আসিয়াছে, এক মাইল হাঁটিয়াছে, এখনও অভুক্ত। এখনও অভুক্ত! দরিয়াবিবি আর স্থির থাকিতে পারে! তার ইচ্ছা হইলঃ একবার ঘুম ভাঙাই সাণ্ডটুকু খেয়ে নিক্। কিন্তু ডাকিতে গিয়া, থামিয়া গেল। কে যেন গলা টিপিয়া ধরিল অকস্মাৎ।

দুঃখী মানুষ দুরারে আশ্রয় লইয়াছে। সমস্ত ঘৃণা দরিয়াবিবির মন হইতে মুছিয়া যায়। ইয়াকুবের দিকে সে তাকাইল। গায়ে ঠিকমত চাদর নাই। পাঁজরের প্রান্ত খোলা। পায়ের দিকে হাঁটুর পরে আর চাদর নাই। খোলা গায়ে জ্বর আরো বাড়িতে পারে।

দরিয়াবিবি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। জ্বরের উত্তাপ না ছুঁইয়া বোঝা যাইবে। অতি সন্তর্পণে সে তাপ দেখিল। জ্বর যে খুব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই ধীরে ধীরে গাখানি চাদরে ঢাকিয়া দিল। তখনও হাত তোলা সম্পূর্ণ হয় নাই, ইয়াকুব চোখ মেলিয়া তাকাইল। বান মাছের গর্ত খুঁজিতে গিয়া যেন হঠাৎ সাপ ঠেকিয়াছে হাতে—দরিয়াবিবি এমনই আতঙ্কিত শিরণে তাড়াতাড়ি পিছাইয়া দ্রুত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রমণের পথ ধরিল ও তাড়াতাড়ি বলিল, “তক্তাপোষের উপর সাণ্ড রইল, উঠে খেয়ো।”

ইয়াকুব চোখ বুজিল, হয়ত পুনর্বীর ঘুমাইতে।

অসুখ কমিল না।

ইয়াকুবের বাড়ি হইতে লোক আসিয়াছিল খোঁজ লইতে। এখানে ডাক্তার দশ মাইল দূরে থাকে। চিকিৎসার দিকে ইয়াকুবের কোন খেয়াল ছিল না। বাড়ির লোক ফিরিয়া গেল।

কিন্তু তিন দিন পরে নদীর ঘাট হতে খবর আসিল, আরো লোক আসিয়াছে। ইয়াকুবের এখানে থাকা হইবে না। দুই নৌকা বোঝাই ইয়াকুবের দুই পত্নীই হাজির হইল। গৃহে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর উপায় নাই। তা-ই হইল। ইয়াকুবের অগস্ত্য যাত্রা। ইয়াকুব অসুখে মরে নাই। কিন্তু আর ফিরিল না। মহেশডাঙার পথ সে চিরতরে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

দরিয়াবির চতুর্দিকে অন্ধকারের নৈরাজ্য। অন্ধকারই অন্ধকারের পরিসমাপ্তি ঘটায়। নচেৎ অভ্যস্ত জীবনে মানুষ আনন্দ পাইত কি করিয়া? এই ক্ষেত্রে সেই পথও চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল।

দুই-তিন মাস পরেই তিলে তিলে অনটন-উপবাস, উদ্বেগের সড়ক বহিয়া সেই রাত্রি আসিল— অন্ধকার যার লীলাভূমি। দরিয়াবির এই তমসার যেন প্রয়োজন ছিল। সে সত্যই হাত তুলিয়া আল্লার শোক্‌রিয়া আদায় করিল। ও যদি দিবালাকে আসিত? এত মানুষের সম্মুখে, পুত্র-কন্যার সম্মুখে! তোমার কত মরজী আল্লা। তোমার এই রহমতটুকুর জন্য তোমার কাছে হাজার শোক্‌রিয়া, হাজার মোনাজাত!

গভীর রাত্রের কালো ডানা মহেশডাঙার উপর প্রসারিত। সুপ্তির শাসন দিকে দিকে। নৈশ পাখির দল হয়ত জাগিয়া আছে। আর জাগিয়াছিল দরিয়াবির।

ধীর মৃদু বাতাস বহিতেছিল। দরিয়াবির হস্তস্থিত প্রদীপের শিখা তাই কম্পমান। দরিয়াবির জাগিয়া ছিল, জাগিয়া উঠিল। দাওয়ার উপর ডিপা হাতে দণ্ডায়মান। বাহির হইতে টাটির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে সে কিছুক্ষণ আগে। আমজাদ, শরী, প্রায়াক্ক নঈমা— সকলে ঘুমাইতেছে। কান পাতিয়া সে শুনিল শিশু-কিশোরদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ। এইভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

দরিয়াবির নিঃশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকিল ও ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। মজবুত বাঁধা কি না, তাও একবার টানিয়া দেখিল। তারপর কম্পিত হাতে ডিপা এক জায়গায় নামাইয়া একটি মাদুর পাতিল।

বহুদিন গোপন ছিল। কিন্তু বিকাশের ধারা কোথাও বন্ধ হয় না। সময় শুধু এই একটিমাত্র ক্ষেত্রের অপেক্ষা করে।

দরিয়াবির সমস্ত শরীর নাড়া দিতেছে, তবু এতক্ষণ সে মুখে যন্ত্রণার সামান্য কুঞ্জন পর্যন্ত ফেলে নাই। সমস্ত কাজের ভার তার নিজেরই উপর। তার ত কেউ সাহায্যে আসিবে না।

মাদুর পাতিয়া দরিয়াবির গায়ের ছেঁড়া কুর্তখানি খোলা মাত্র আরো কাপড় বাহির হইল। শরীর ব্যাপিয়া তখন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শুরু হইয়াছে। তাড়াতাড়ি কোমরের কাপড়

পর্যন্ত আলগা করিয়া দিল। তখন একরাশ কাপড়, হেঁড়া ন্যাকড়া, নষ্টমার ফালি, আমজাদের হেঁড়া শাট— এক স্তুপ বাহির হইল। আসনুগ্রসবা জননীর স্কীত উদরখানি প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয় না। আরো অন্ধকারে রহিয়াছে বিশ্বের বিস্ময়তম মানবশিশুর নীড়খানি। দরিয়াবিরির পেটের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। হঠাৎ তার মনে পড়িল আমিরন চাচীর কথা, 'বুবুর শরীর যেন পেটে পড়ছে'। আহ, সত্যি যদি ফাটিয়া যাইত-কি সুখই না পাওয়া যাইত। দরিয়াবিরি জোরে একবার প্রশান্তির নিঃশ্বাস লইল। আরো কাজ আছে। উদর অন্ধকারে মুমুক্ষু মানব শিশু যতই আত্ননাদ করুক বাহিরে আসর আকুলতায়, কর্তব্যের ডাকে দরিয়াবিরি সারাজীবন অনড়। আজ তার কোন নড়চড় হইবে না। ঘুঁটের মাচা হইতে ছোট ছোট বহু কাঁথা দরিয়াবিরি মাদুরের এককোণে রাখিল।

তারপর উবুড় হইয়া সে সমস্ত মাদুর চাপিয়া ধরিল। আহ, এখন শুধু একটু চীৎকারের স্বাধীনতা পাওয়া যাইত। ছেলেরা না জাগিয়া ওঠে। তাই সারাদিন কাহাকেও ঘুমাইতে দেয় নাই। অসহ্য বেদনায় দরিয়াবিরি এই প্রথম মুখ কুঞ্জন করিল। মাদুরে হাত পিছলাইয়া যায়, তাই একটু আগাইয়া সে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিল। মাটির কন্যা জননীর আশ্রয় ছাড়া আর কোথায় তাকুঁ পাইবে?

দরিয়াবিরি অসহ্য যন্ত্রণায় দিশাহারা হয় না। আগন্তুক অতিথির অসম্মান সে কিরূপে সহ্য করিবে? এত হাত দিয়া পেছনে দেখিতে হয়, সে না হঠাৎ মাটির উপর আছাড় খায়।

দরিয়াবিরির চোখে আর কোন প্রশ্ন নাই। তুর্য্যক্ৰিত হোক, হে আদিম শিশু তোমার আগমন। এত যন্ত্রণার মধ্যে জননী তোমার পৃথুই ত চেয়ে থাকে। কত লজ্জা, কত অপমান ধিক্কার বাহিরের জগতে প্রতীক্ষমাণ আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষমাণ। আগু রমণী মাঝে মাঝে মনের সঙ্গে যোঝাযুজির ক্ষেত্রে ক্রুদ্ধতার পরাস্ত। আজ বিজয়িনীর মত দরিয়াবিরি ধাত্রী ও প্রসূতি হইয়া যায় একত্রে। নিজের নিজের শরীরের উপর অসম্ভব ঝাঁকুনি প্রয়োগ করে সে। গৃহস্থের দুলালীর মত স্নেহ বহুক্ষণ এই ঘরে পড়িয়া থাকিতে চায় না। প্রসূতি এবং সে আবার ধাত্রী একাধারে। আরো কাজ আছে। কাজ...

দেড় ঘন্টা কেমন করিয়া কাটিল, বিধাতা হয়ত জানেন।

প্রথম শিশুর অসহায় চীৎকারে ছোট রান্নাঘরটি একবার সচকিত হইল।

মাটির গামলা ও পানি পূর্বেই রাখা ছিল।

দরিয়াবিরি প্রথমে শিশুকে বুকে তুলিয়া লইল। হয়ত তাকে বুকে চাপিয়াই বসিয়া থাকিত। শিশুর চীৎকারে খেয়াল হয়। এই সাবধানবাণীর জন্য দরিয়াবিরি বড় কৃতজ্ঞ-সজল চোখে শিশুর দিকে তাকাইল; তারপর গামলায় গোসলের সব খুঁটিনাটি সম্পন্ন করিল। অতঃপর শয্যার ব্যবস্থা। কয়েকটি রঙীন কাঁথা দরিয়াবিরি বিছাইল ও দুইটি কাঁথা মুড়িয়া নবজাতককে শোয়াইয়া দিল। সে নিজে তখনও দিগ্‌ঘসনা। তাড়াতাড়ি নিজে পরিষ্কার হইয়া তার নবতম অতিথিকে মাই খুলিয়া দিল। কি সুন্দর চুকচুক শব্দ হয়। কি মোটা তাজা গৌর রং শিশু! দরিয়াবিরি উম দিতে থাকে। শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ কয়েকবিন্দু অশ্রু পড়িল অলক্ষিতে।

বাহিরে শৃগাল গ্রহর ডাকিল। দুই পেচক কলহ করিয়া আবার জুড়িকণ্ঠ মিশাইল। দরিয়াবিরি বসিয়া রহিল।

নব প্রসূতির দেহে কোথাও কি যন্ত্রণা আছে, দুর্বলতার আক্রমণ আছে? হয়ত নাই। তাই নির্বিকার দরিয়াবিবি বসিয়া রহিল। উম পাইয়া শিশু ঘুমাইতে লাগিল। সেও কেমন নির্বিকার। বাহিরের পৃথিবী সুপ্ত। এখানে গ্রাম্য রান্নাঘরের বৃকে কি গভীর প্রশান্তি। পুত্র ও জননী পরস্পরের সান্নিধ্যে পৃথিবীকে ভুলিয়া গিয়াছে।

মানুষের পক্ষে বিস্মরণ কি এত সহজ? দরমায় মোরগ বাক দিল। ভোর হইয়া আসিয়াছে। দরিয়াবিবি মনে মনে শুধু ভাবিল, ভোর হয়ে এসেছে। ভাল কথা একটু পরে সকাল হবে।

আবার মোরগ ডাকিল। সাকেরদের পাড়া হইতেও মোরগের আওয়াজ আসিতেছে। আরো ভোর হইল।

শিশুকে শোয়াতে গেলে সে হাত পা নাড়িয়া একটু শিহরিয়া উঠিল, তার কাঁচা ঘুমে ব্যাঘাত। আবার সে শান্ত হইয়া গেল।

দরিয়াবিবি নবজাতকের দিকে অপলক চাহিয়া, বার কয়েক চুম্বন করিল।

তারপর উঠিয়া পড়িল। শ্রুত গতি নয়, দ্রুত। দরিয়াবিবি কর্তব্যে ঢিলা, কে এমন অপবাদ দিবে?

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকিতেছিল চালের বাতার কাছাকাছি ফাঁক দিয়া। তখনও বাহিরে অন্ধকার।

গরুর দড়ীগাছি দরিয়াবিবি নিজেই মাচাঙে দাঁড়াইয়া চালে টানাইল। শুধু প্রসূতি, ধাত্রী নয়। আর এক কর্তব্য সম্পাদনা বাকী আছে। দরিয়াবিবি যে জন্মাদ।

শিশুর বিছানায় গিয়া সে দেখিল, পুত্র ঘুমাইতেছে। পুত্র! বেটা ছেলে! কয়েকবার মৃদু চুম্বন দিয়া দরিয়াবিবি উঠিয়া দাঁড়াইল। কুকুরের কি অসীম স্নেহ ও প্রভু ভক্তি। নিজের হাতে ইহাদের দরিয়াবিবি কত খদ কড়া খাওয়ায় প্রতিদিন। কৃতজ্ঞ প্রাণী— ভোরের সানাই বাজাইল।

আর দেৱী করা চলে না। দরিয়াবিবি নিজের মনে উচ্চারণ করিল। হঠাৎ আসেকজানের কথা মনে পড়িল তার। বড়ি চক্লিশা খাইয়া ঘরে ফিরিতেছে, হাতে খাবারের পুঁটলি, লাঠির উপর ভর দিয়া বৃদ্ধা হাঁটিতেছে।...

দড়ীর ফাঁসের দিকে দরিয়াবিবি তাকাইল। সারাজীবনে কত উদ্বেগ, কত সংগ্রামজনিত ক্লান্তি ওইখানে ঝুলাইয়া রাখিয়া আজ সে নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

তার আগে দরিয়াবিবি ডিপা নিভাইয়া ঘর অন্ধকার করিয়া দিল।

৪৫

রৌদ্র উঠিয়াছিল গাছপালায়, আকাশ ভরিয়া।

মার তাড়া নাই। আমজাদ নঈমা শরী খুব ঘুমাইয়াছিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া আর কেউ বাহিরে আসিতে পারে না। অগত্যা চৈচামেচি। সাকেরের মা হাসুবৌকে খবর লইতে পাঠাইয়াছিল। সে টাটি খুলিয়া দিল।

আবার রান্নাঘরের টাটি বাহির হইতে তাহাকেই কৌশলে খুলিতে হইল। হাসুবৌর

প্রথম চোখ পড়িল রঙীন কাঁথার অরণ্যে। সদ্যোজাত ঘুমন্ত শিশু।

তারপর উপরের দিকে চাহিয়া সে চীৎকারে করিয়া উঠিল। আতঙ্কিত পরিবেশের মধ্যে সে কাঁথাসহ শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইল আর নামাইল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে জনবিরল গ্রামের এই অখ্যাত অঙ্গনটি ক্ষুদ্র জনতায় ভরিয়া উঠিল। আসিল রহিম বখ্শ, রোহিণী চৌধুরী, চৌদিকার, সাকের, আমিরন চাচী অনেকে। রহিম বখ্শ, রোহিণী চৌধুরী— যাহাদের পা'র ধূলা কোনদিন দীন আজহারের অঙ্গনে পড়ে নাই, তাহারাও আসিয়াছিল। সংসারে প্রতিদিন মৃত্যুর তোরণ যারা সাজাইয়া রাখে, মৃত্যুর প্রতি তাহাদের কৌতূহল বেশি। কৌতূহল মিটাইতে হইবে বৈকি! তাঁহারা আসিয়াছিলেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সার্টিফিকেটেই সব কাজ হইল। থানা পর্যন্ত আর দাঁড়াইল না।

হাসুবৌ শিশুটিকে বুকে করিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল। সাকের প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু হাসুবৌ মরিয়া। তার সুগু অদম্য তেজের মুখে, নিষ্পাপ শিশুর নিরপরাধিতার সাফাই কীর্তনের মুখে সকলের জবরদস্তি উবিয়া গেল।

আমিরন চাচী শরী, আমজাদ ও নঈমাকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিল।

আরো দুই তিন মাস পরে আসিল মোনাদির। চটকলে কাজ লইয়াছে সে। আরো জওয়ান। জঙ্গীভাব চেহায়ায় স্পষ্ট।

আমিরন চাচী তাহার হাত ধরিয়া হাউমাউ করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। মোনাদির রাজি হইয়াছে : শহরে তার কর্মস্থল, কিন্তু তার আবাসভূমি চিরদিনের জন্য মহেশডাঙায়।

আমজাদকে লইয়া মোনাদির চন্দ্র কোটালের ওখানে গেল। সাত দিনের ছুটি লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মন আর গ্রাম ছাড়িতে চায় না।

কোটালের কাছে মোনাদির প্রস্তাব করিল, “গানের দল করা যায় কি না।”

কোটাল বলিল, “চাচা, লোকে আর গান শুনতে চায় না। গান গেয়ে পেটের ভাত জোটানো দায়।”

মোনাদির বড় নিরাশ হইল। কোটাল নিজেই জানাইল, গ্রামে নিয়মিত কোন কাজই আর মেলে না।

মোনাদির তাই বলিল, “কাকা, আপনি শহরে চলেন। আপনার যা মেহনত করার ক্ষমতা, চটকলে আপনাকে লুফে নেবে।”

“সত্যি।”

“হ্যাঁ কাকা, আমি ‘মেট্’কে বলে আপনার কাজ জুটিয়ে দেব।”

“বেশ। তুমি কবে যাবে?”

“পরশু। আমজাদকেও কাজে লাগিয়ে দেব।”

“বেশ আমিও যাব।”

অচেনা জীবনের জন্য কোটালের পরম উৎসাহ। তবু কোটাল একবার স্তব্ধ হইয়া গেল, দিগন্ত বিসারী বিরল তালগাছ ক্ষত মাঠের বুকের দিকে চাহিয়া।

অবেলার আকাশে নীড় সন্ধানী পাখিরা দল বাঁধিয়া অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মেঠো আমেজে কোটাল তন্নয়, কেমন যেন বিষণ্ণতা বৃকে।

তবু সে বলিল, “চাচা, পরশু কখন বেরুবে? রেল স্টেশনে তিন জনে যাব।”

আমজাদ মুনিভা’য়ের সঙ্গে সে দুনিয়ার অপর পিঠে যাইতে প্রস্তুত।

*

*

*

*

গোধূলি নামিয়াছিল।

আবছা অন্ধকারের প্রলেপ এখনই দিকে দিকে ছড়ানো। অস্তাচলের লালিমা নিভিয়া যাইতেছে।

দরিয়াবিবির কবরের পাশে তিনটি ছায়ামূর্তি দণ্ডায়মান। ইহাদের চেনা যায়। মোনাদির, আমজাদ ও কোটাল।

মাথা নীচু করিয়া মোনাদির দাঁড়াইয়া থাকে। দুই চোখ ভরিয়া অশ্রুর প্লাবন। মোনাদির এখন শহরের নাগরিক। গত ছ’মাসে চটকলে এমন সব মানুষের সন্ধান পাইয়াছে, তাদের ছোঁয়ায় সে চোখে নূতন অঙ্গন পরিয়াছে। এই পৃথিবীর বহু হৃদিস সে জানে। তবু চক্ষুর পানি আর রোধ করিতে পারে না। তার বৃকে চাড়া দিয়া ওঠে বেদনার রাগ রাগিণীর তোড় মুখর ঝঙ্কার। অক্ষুট কর্তে সে বলে, “মা গো, তোমার বৃকে একটু ঠাঁই দিও।”

মোনাদির হঠাৎ ডুকরাইয়া উঠিল, আবেগ আর রোধ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য।

কোটাল আগাইয়া আসিয়া বলিল, “চাচা, বেটাছেলে, মার জন্য কি এত কাঁদে? আমারও ত মা নেই। চলো, দেবী হয়ে যাচ্ছে।”

কিন্তু চন্দ্র অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

অশ্রুরুদ্ধ কর্তে সে নিজেও বলিয়া ফেলিল, “দরিয়াবিবি, সেলাম...সেলাম...”

দুই বাহুর মধ্যে দুই ভাইকে জড়াইয়া চন্দ্র কোটাল অগ্রসর হইল।

তারা তিন জনে অগ্রসর হইল। চেন-অচেনা সড়কের দিকে।

ক্ৰীতদাসেৰ হাসি



‘কীর্তিদাসের হাসি’ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার এক দৈবী ব্যাপার।

মৌলানা জালাল, মাসুদ সহ, আমরা তিনজনে ছুটি কাটাতে বেরিয়েছিলাম। নেহায়েৎ নিরুদ্দেশের পাড়ি। কিন্তু নানা দুর্বিপাকে এসে পৌঁছলাম এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে, আমারই এক সহপাঠিনীর বাড়িতে, নাম রউফন নেসা। খুব ভাল ছাত্রী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের আর এক সেরা ছাত্র তাকে দাগা দিয়ে গিয়েছিল, তার খুঁটিনাটি হৃদিস আমার জানা আছে। ডিগ্রীর উচ্চতা দিয়ে কত মেয়ে যে প্রতারিত হয়, তার উদাহরণ রফউন। ছাত্রটা পরে এক ঠিকাদারের মেয়েকে বিয়ে করেছিল আট আনা রাজত্ব সহ।

দশ বছর আর রউফনের কোন খোঁজ রাখি নি। হঠাৎ অকস্মলে পৌঁছে জানা গেল, সে গ্রামে এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে, সে-ই প্রধান শিক্ষয়িত্রী। সংসারে একমাত্র অবলম্বন পিতামহ শাহ ফরিদউদ্দীন জৌনপুরী। নব্বুই বছর বয়স। এখন আর চোখে দেখেন না। কানে ঠিকমত শোনেন না। কানের কাছে মুখ নিয়ে অথবা খুব জোরে কথা বলতে হয়। প্রথম জীবনে তিনি লেখাপড়ার কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন। বর্মায়ুদ্ধের সময় লুসাই অঞ্চলে লড়ায়ে যান। পরে গৃহত্যাগ করে যান বিহার-যুক্ত প্রদেশ এলাকায়। ফিরে আসেন আর্বা-ফার্সির বিরাট মৌলানা-রূপে। বহু সাগরেদ আছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু গত তিরিশ বছর তিনি বাইরের জগতের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখেন না। তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিশালা যে-কোন প্রভুত্বের বিভাগের বিরাট সম্পদ।

একদিনের প্রবাস জীবন।

পরদিন সকালে বিদায়। অতিথি আপ্যায়নের ঘটা ছিল বেশী। তাই মৌলানা জালাল রসিকতা করে বলেছিলেন, “রউফন, তুমি কী আমাদের সেই ‘সহস্র ও এক রজনী’ বা ‘আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা’র পেটোরোগী বানাতে চাও যে গৃহকর্তা রুটি আনতে গেলে তরকারী খেয়ে বসত আর তরকারী আনতে গেলে রুটি খেয়ে ফেলত।”

তারপর সকলে বেশ তুমুল হাসি হাসছিলাম।

দাদু, শাহ সাহেব, কানে শোনেন না। কিন্তু অত হট্টগোলে সচেতন! রউফনকে হাত ইশারায় ডেকেছিলেন।

ফরিদউদ্দীন জৌনপুরীর কানের কাছে রউফন মুখ নিয়ে বলেছিল, “দাদু, ওরা ‘আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা’র গল্প নিয়ে হাসাহাসি করছে।”

দাদু হেসে-হেসে বলেছিলেন, “বন্ধুগণ, ওটা আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা (সহস্র ও এক রাত্রি) নয়। ও কেতাবের পুরা নাম “আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে। সহস্র দুই রাত্রি।”

“দাদু, আমি ইংরেজীর ছাত্র। আমি ত শুনেছি ‘thousand and on night’ সহস্র ও এক রাত্রি।” জবাব মাসুদের।

“ভুল শুনেছ।”

“ভুল?” মাসুদের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ চ্যালেঞ্জের ছোঁয়াচ।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভুল। তোমরা ত পড়ো বেঈমান ইংরেজের কেতাব। যাদের গোলাম ছিলে দেড়শ’ বছর। আসল বই ত দ্যাখো নি।”

দাদুর কণ্ঠস্বর তপ্ত। তিনি নিজের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। চোখে না দেখলেও, উঠান-ঘর সব তাঁর মুখস্থ। আলমারী খুলে ঠিক তৃতীয় সেল্ফের মাঝখান থেকে একটা জেলদ-করা কেতাব বের করলেন।

তারপর একটু অবজ্ঞা-জড়িত সুরেই কেতাবখানা আমাদের টেবিলে ফেলে দিয়ে বললেন, “দোস্তেরা, একবার চোখে দেখে নাও।”

আমরা তিনজনে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। মৌলানা জালাল আরবী জানেন। কিন্তু আমরা ত পড়তে পারি।

বিরাট পাণ্ডুলিপি। ছাপা কেতাব নয়। মলাট খোলার পর দেখা গেল কেতাবের নাম: আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে।

আমরা ত অবাক।

জিজ্ঞেস করল মাসুদ, “দাদু, এ পাণ্ডুলিপি আপনি কোথায় পেলেন?”

দশ মিনিট ধরে তিনি ইতিহাস বললেন। হালাকু খানের বগদাদ ধ্বংসের সময় এই পাণ্ডুলিপি আসে হিন্দুস্থানে। নানা হাত-ফেরীর পর পৌঁছায় শাহ সুজার কাছে। তিনি আরাকানে পলায়নের সময় পাণ্ডুলিপি মুর্শিদাবাদে এক ওমরাহের কাছে রেখে চলে যান। সেখান থেকে জৌনপুর। ফরিদ উদ্দীন সাহেব জৌনপুর থেকে এটা উদ্ধার করেন।

তিনি বললেন, “নাস্তালিখ অঙ্করে লেখা।” অনেকে এটা ঠিকমত পড়তে পারে না পর্যন্ত।”

জিজ্ঞেস করলাম, “এটাই তা হোলে আসল আলেফ লায়লা?”

“হ্যাঁ, ভাই।”

আমরা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলাম। মাসুদ বললে, “দ্যাখেন ত শেষ গল্পটা কি? অর্থাৎ হাজার এক রাত্রির গল্পটা।”

“শাহজাদা হাবিবের কাহিনী।”

“তা-হোলে ঠিক আছে। তারপরের কাহিনীর নাম কি?”

মৌলানা জালাল পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে জবাব দিলেন, “জাহাকুল আব্দ অর্থাৎ গোলামের হাসি।”

আমরা বিস্মিত। কিন্তু মৌলানা জালাল আর্বি জানেন, সহজে মেনে নেবেন কেন? তিনি পাতা উল্টে জিজ্ঞেস করলেন, “হুজুর, আলেফ লায়লায় প্রত্যেক গল্প দুনিয়াজাদীর অনুরোধে শাহরেজাদী বলা শুরু করে। এখানে ত তা দেখছি না।”

“ওই কটা পাতা নেই। সংখ্যা দেখো।”

মৌলানা তা মিলিয়ে নিয়ে খুবই অবাক! আমাদের দিকে তাকালেন।

বিশ্বের বিস্ময় এই পাণ্ডুলিপি। আমি প্রস্তাব দিলাম, “দাদু, এটা আমরা কপি করিয়ে নিতে চাই আমাদের লাইব্রেরীর জন্য। তারপর আপনার কপি পাঠিয়ে দেব।”

ঈষৎ কাঠখড় পোড়ানোর পর দাদু রাজী হোয়ে গেলেন। রউফনের মুখে শুনেছিলাম,

সাধারণত তিনি এসব কাছ-ছাড়া করেন না। সেদিন আমাদের জন্য তাঁর স্নেহের ঢল নেমেছিল বোঝা যায়।

শুকরিয়া, ধন্যবাদ মৌলানা জালাল, তুমি এখানে আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছিলে! এই আবিষ্কার আমাকে পাগল করে তুলেছিল।

আরো দু-দিন হয়ত থাকা যেত, কারণ চতুর্থ দিনে কলেজ খুলছে। কিন্তু আর না। এই রত্নগুহা থেকে আবিষ্কৃত একটি রত্ন পৃথিবীকে না দেখানো পর্যন্ত আমার আর স্বস্তি ছিল না।

সেদিনই বিদায় নিলাম দুপুরের পর। রউফনের মিনতির কোন দাম দিতে পারলাম না, দুঃখ।

শা' সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিতে সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। তাঁকে ধরে-ধরে আনা হোলো দহলিজ পর্যন্ত।

সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে এল রউফন। জীবনের কাছে পরাজয় না-মানা বীরেরই পৌত্রী। সে কিন্তু তার সজল চোখ আজ লুকাতে পারল না। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সেই সেরা ছাত্রটির কাছে প্রত্যাখ্যাত হোয়ে রউফন এমনি চোখেই আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। জীবনকে কিন্তু সে খোয়ার হাতে দেয় নি। বীরের পৌত্রী আগু-মানবী।

গাড়িতে উঠে মাথা ঝুঁকিয়ে হাত তুললাম। শ্রদ্ধা স্নেহ মমতা— সব কিছুর পতাকা যেন আমার করতালু।

আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল।

মাথা নীচু করে রউফন সড়ক থেকে বাড়ি অভিমুখে এগোতে লাগল।

শহর ফিরেই মৌলানা জালালের সহায়তায় আলফ লায়লা ওয়া লায়লানে'র শেষ কাহিনীটা বাংলায় তরজমা করে ফেললাম।

বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের মমতার জন্যেই ত পৃথিবীতে বাঁচা।

জাহাফুল আবদ

:

ক্রীতদাসের হাসি

১

খলিফা হাক্কনর রশীদের প্রাসাদের এক অংশে সহধর্মিণী বেগম জুবায়দা ও বাঁদী মেহেরজান কথোপকথন-রত।

বেগম : মেহের।

মেহেরজান : বেগম সাহেবা।

বেগম : যা, এবার যা।

মেহের : আগে ওরা তন্দ্রায় ঝিমোক। মহলের প্রহরীরা এখনও জেগে আছে।

বেগম : আর তাতারী জেগে আছে তোর জেন্য।

মেহের : কিন্তু বেগম সাহেবা, ধরা পড়লে খলিফা আমাকে কতল করে ছাড়বেন।
বেগম : সে আমি দেখে নেব। আর এই নে। যদি বিপদে পড়িস্ আমার অঙ্গুরী রেখে দে। পাহারাদারদের দেখালে ছেড়ে দেবে।
মেহের : তবু ভয় লাগে, বেগম সাহেবা।
বেগম : আজ হঠাৎ ভয় লাগছে কেন?
মেহের : এম্মি। খলিফা ত আমাকে দেখেন নি। দেখলে মেহেরবানী করতেন।
প্রহরীদের হাতে ধরা পড়লে আর রক্ষা থাকবে না!
বেগম : যা। এই সুম্‌সাম রাত। এখন জওয়ানের বুকের মধ্যে বাঁধা পড়তে কি যে সুখ—

মেহের : আপনি আমাকে ঈর্ষা করছেন, বেগম সাহেবা?

“মেহেরজান” দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বেগম সাহেবা বললেন, “দুই সীনা একত্র দেখলে আমার কি যে খুশী লাগে!”

“বেগম সাহেবা”, মেহেরজান জবাব দিলে, “এইজন্যে আমি কেয়ামত तक আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার বাঁদী ত আছি-ই। বেহেশতেও যেন আল্লা আমাকে আপনার বাঁদী বানিয়ে রাখেন।”

—“তুই যা। বড় বাজে কথা বলিস্। যা, আর দেরী করিস্ না। একটু দাঁড়া—
তোর চোখের সূর্য্য কোণের দিকে একটু মুছে গেছে—”

বেগম সাহেবা নিজেই আয়নার সামনে মেহেরজানকে দাঁড় করানোর পর সূর্য্যার রেখা স্থান-শোভায় ভরিয়ে তুললেন।

—আহ্, তোকে যা মানিয়েছে। এই ঘাঘরা সদরিয়া, ওড়না নেকাব। ফেরেস্তারা তোকে না তুলে নিয়ে যায়।

—বড় লজ্জা দেন, বেগম সাহেবা।

—যা, তাতারী না পাগল হয়েছে যায় আজ তোকে দেখে।

—বেয়াদবী মাফ করবেন, বেগম সাহেবা। সে ত পাগল আছেই। বুকে জড়িয়ে না ছাড়া করে ফেলে।

—সে ত ভালই। তুই তার বদনে বদনে লেপটে যাবি, আর কাছছাড়া হাতে হবে না।

—কি যে বলেন, বেগম সাহেবা। ঘোড়ার সহিস, শুধু আপনার মেহেরবানীতে—

—ওকে দেখে ভেবেছিলাম, তোর সঙ্গে ভাল মানাবে। হাব্‌সী গোলাম। কিন্তু সুন্দর সূঠাম দেহ নওজোয়ান।

—মানুষ হিসেবে ও আরো সুন্দর।

—যা, যা। ষড় কথা বাড়াস্। আঙুর নিয়েছিস্ ত?

মেহেরজান ওড়নার আড়াল থেকে বেগম সাহেবাকে এক গোছা আঙুর দেখাল।

—তুই নিজেই আজ আঙুর। এর চেয়ে আর বড় মেওয়া তাতারীর কাছে কিছুই হতে পারে না। (বুকে টোকা দিয়া) এখানেও ত বোঁটায় ভাল ফল ধরেছে।

বেগম সাহেবা হাসতে লাগলেন। সরমে মেহেরজান মুখ নীচু করে আর কুঁচকানো গালের পাশ দিয়ে চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে বেগম সাহেবাকে দেখে।

—এবার যা।

—আর খোড়া— একটা কথা, বেগম সাহেবা। আপনি কেন আমাকে এত পেয়ার করেন?

—তুই এলি। তাই আমি খুশি। তুই আছিস, তাই এই প্রাসাদে আমার আনন্দ আছে। নচেৎ এই বিরাট মহলে কে কার? বেগম, বাঁদী ত শত শত। কিন্তু কাছের মানুষ মেলা দায়।

—খলিফা ত আপনাকেই...

—সে কথা রাখ।

—আমার আজ যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি রুল মুয়েনীন ত আজ আপনার মহলে আসবেন না। কাছে থাকতে দিন।

—না। আর এ-কি বলছিস, মেহেরজান? যা, যা। আর একজনের বুক খাঁ খাঁ করছে। গোনাগার হোতে পারব না। ভোর হওয়ার আগে ঠিক ফিরে আসিস।

—আমি ত ভয় পাই! দু-জনে কখন ঘুমিয়ে পড়ি জানি না। যদি রাতে ঘুম আর না ভাঙে...

—না, এ ভুল কোনদিন করিস নে। যদিও খলিফা আমার কথা রাখেন— কিন্তু কখন কি হয়, কে জানে। মরজী যেখানে ইন্সারফ সেখানে কোন কিছুর উপর বিশ্বাস রাখতে নেই।

—আপনি ভয় পান, আর আমি ভয় পাব না, বেগম সাহেবা?

—না। তবু সাবধান থাকা ভাল।

—তবে খলিফা আমাকে কখনও দেখেন নি। সেই যা ভরসা। হঠাৎ পথে ধরা পড়লে বলব, বেগম সাহেবা বাগানে ফুল আনতে পাঠিয়েছিলেন।

—খলিফা দেখেন নি। সে ভুলি-ই। কখন কি ঘটে এই মহলে, কেউ বলতে পারে না।

—আমার তাই ত রোজ যেতে ইচ্ছে করে না, বেগম সাহেবা।

—না, যা। তাতারী জেগে আছে মহলের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

—আচ্ছা, বেগম সাহেবা।

—খোদা হাফেজ। ফি আমানীল্লাহ।

নীচে তরুলতা শোভিত প্রাঙ্গণ চত্বর। তারপর বাগানের সীমানা শুরু। বাতাবী লেবুর সারি, দ্রাক্ষাকুঞ্জ— অন্যান্য গাছের ঘন সন্নিবেশে রাত্রি অন্ধকার-জমাট। পথের হৃদিস পাওয়া কষ্টকর। বেগম জুবায়দা অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। বাঁদী মেহেরজান কি কালো অন্ধকার, না হাবসী গোলামের কালো বুক এতক্ষণে হারিয়ে গেল?

আখরোট-খুবানী ডাল বুলে আছে ওইখানে পূব দরওয়াজার দু'পাশের দেওয়ালের পাথর ঘিরে। তারই নীচে তো তাতারী প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। ডালের ঝোপ ছেড়ে মেহেরজান কখন তার হাতে হাতে দিয়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

হাবসী গোলাম আজ অপেক্ষা করবে ত? দাঁড়িয়ে থাকবে না স্পন্দিত বুক, সারাদিনের কঠোর ক্লান্তির পর?

বেগম জুবায়দার মনে সেই প্রশ্ন, মেহেরজানের মনে সেই প্রশ্ন।

প্রাসাদ-কক্ষে হারুনর রশীদ পায়চারী-রত। মুখে আবেগ-চাঞ্চল্যের ছাপ। বারান্দায় পদধ্বনির শব্দে উৎকর্ণ বগদাদ-অধিপতি হেঁকে উঠলেন, “কে?”

জবাব আসে “জাঁহাপনা, বান্দা-নেওয়াজ, আমি মশ্ৰুর।”

হারুন : এসো, এসো মশ্ৰুর। আজ আমি বড় একা। হ্যাঁ, একা।

মশ্ৰুর : জাঁহাপনা, আর্মেনিয়া থেকে একশ’ মুজ্জরানী— নর্তকী আনিয়েছি। ওদের ডাক দেব, হুকুম দিন।

হারুন : বড় একা, মশ্ৰুর। মুজ্জরানী দিয়ে শুন্যতার সেই বোধ দূর হবে না।

মশ্ৰুর : হুজুর, আপনার যা খায়েশ, শুধু বলুন। আস্তামায়ো তায়াতান। (শ্রবণ অর্থ পালন)।

হারুন : না, কিছু না। বড় একা লাগছে। আজ জাফর বার্মেকী নেই, আব্বাসা নেই।

মশ্ৰুর : জনাবে আল্লা, সেদিনও আপনার ফরমাবরদার গোলাম কোন কিছু অমান্য করে নি।

হারুন : হ্যাঁ, মশ্ৰুর। তোমার আবলুস কালো দেওয়ার মত কদ, তোমার পাহাড়ের মত বাজু— সব সময় আমার আর তলওয়ারের ইজ্জৎ রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু আমার বৃকের পাষণ-ভার নষ্টাতে পারে না? তুমিই একমাত্র পুরাতন বন্ধু রয়ে গেছে। আর সবাই ওপারে।

মশ্ৰুর : আলম্পানা— আলম্পানা—

হারুন : দহসৎ— ভয় পেয়ে না। আমি এখন আমিরুল মুমেনীন হারুনর রশীদ নই। আমি দরবারে নেই— হারেমে আছি। আমি তোমার বন্ধু, মশ্ৰুর।

মশ্ৰুর : জাঁহাপনা, আপনি যেদিন রাতে উজীরে আজম জাফর বার্মেকীর কতল্ পারোয়ানা লিখলেন, তখন বার বার ফিরে এসেছি তার দরওয়াজা থেকে। আপনার কাছে নাফরমান সাজতে পারব না— আবার ছুটে গিয়েছি। আপনি সবুর করলেন না।

হারুন : মশ্ৰুর, আজো নিজের বিচার মানুষ নিজে করতে শেখেনি। সে খোদকসী (আত্মহত্যা) করতে পারে, যেমন সে রোজ গোস্তের জন্য দুম্বা কি গাইকসী করে, কিন্তু নিজের বিচার করে না। সে-কথা আর উত্থাপন করো না কোনদিন।

মশ্ৰুর : জাঁহাপনা, গোস্তাখি মাফ করবেন। মা’জী মা’জী— অতীত অতীত। তা আর কবর খুঁড়ে তুলবেন না।

হারুন : মশ্ৰুর, মানুষের লাশ কি কবরে পড়ে থাকে আর পচে?

মশ্ৰুর : আলেমরা সেই রায় দেয়।

হারুন : না, না— মশ্ৰুর। দিওয়ানে এতক্ষণ বসেছিলাম। এখন পায়চারী করছি।

কেন জানো? লাশ কবরে শুয়ে থাকে না। লাশ কথা বলে। তার ধাক্কা আরো শক্ত আরো কঠিন। জেন্দা মানুষের কণ্ঠ সেখানে ক্ষীণ ফিসফিসানি, ভাঁড়ার ঘরে নেংটি-ইঁদুরের পায়ের আওয়াজ মাত্র। বসে থাকতে পারলাম না।

মশরুর : জাঁহাপনা, মন থেকে সব মুছে ফেলুন।

হারুন : সব মুছে দিতে পারি। কিন্তু স্মৃতি, মশরুর? স্মৃতি লাশ জেন্দা করে তোলে।

মশরুর : স্মৃতি সমস্ত কণ্ঠ-কে জেন্দা করে তুলতে পারে, জনাব। কিন্তু আলম্পানা, সকলের স্মৃতিশক্তি থাকে না। হাবা বোবারা যেমন। তবে অতীতের কথা অনেকে বলে। সে ত এগোতে না পেরে, দুঃসহ বর্তমান থেকে পালানোর কুস্তি-প্যাঁচ মাত্র। ও এক রকমের ভেক্সি, জীবনী-শক্তির লক্ষণ নয়। বলিষ্ঠ মানুষেরই স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন হয় সম্মনে পা ফেলার জন্য।

হারুন : আহ মশরুর, তুমি ত শুধু জন্মাদ নও, তুমি আলেমুল আলেম। পণ্ডিতের পণ্ডিত। তাই ত আমার বন্ধু। কিন্তু স্মৃতি আমাকে ঘুমাতে দেয় না।

মশরুর : চলুন, কিছুদিন বগদাদের ঝামেলা ছেড়ে আর কোথাও যাই।

হারুন : কিন্তু আব্বাসা আমার সঙ্গ ছাড়বে? না-না। ঘরের মধ্যে জ্যান্ত, কবরে দাফন হোলো তার। সোজা কথায়, পুঁতে ফেললাম। কতটুকু তার অপরাধ? জাফরের প্রতি মহব্বৎ— কিন্তু আমি কি?

খলিফা হারুনের রশীদ হা-হা-রবে প্রায় উন্মত্তের মত হেসে উঠলেন। পায়চারী করতে লাগলেন। হাবসী মশরুর মাথা-নীচু, তহরীফী বাঁধার ভঙ্গী বুকে দুই হাত, পাথর-মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। হারুনের রশীদ পায়চারী হঠাৎ থামিয়ে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মশরুরের বুকে মৃদু তর্জনী আঘাত করলেন। আবার হা-হা হাসি। তারপরই পায়চারী-রত অবস্থায় বলে উঠলেন, কতটুকু তার অপরাধ? জাফরের সঙ্গে কি রকম শাদী দিলাম? ‘আকদ’ হলো অথচ রসুমৎ হবে না কোনদিন। শক্ত শর্ত। কঠিন কারার। মশরুর” —

মশরুর : আলম্পানা।

হারুন : আব্বাসা বাকী কাজ নিজে তামাম করলে। রসুমৎ-ব্যবস্থার ভার নিজের হাতে নিলে যা বেরাদর নিলেন না। শর্ত ভঙ্গের কঠোর শাস্তিও দিলাম। আব্বাসী কওমের খুন বার্মেকী কওমের সঙ্গে মিশে নাপাক হবে— না, তা হতে দিতাম না মশরুর—

মশরুর : আলম্পানা।

হারুন : আব্বাসা আমার সগুণা সহোদর বোন। হা-হাঃ।

মশরুর : জাঁহাপনা—।

হারুনের রশীদ মশরুরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন, হাবসী জন্মাদ চক্ষু তোলার সাহস পায় না। পায়চারী-সচল মুহূর্ত পৃথিবীর মতই ঘূর্ণমান। কিন্তু সমান তাল ও রেখায় নয়। আমি রুল মুমেনীন আবার হঠাৎ থেমে মৃদু কণ্ঠে বললেন, “মশরুর, আমি স্মৃতি উপড়ে ফেলতে চাই, সমস্ত স্মৃতি।”

মশরুর : চলুন, বাগানে যাই। নারঙ্গী বনে ফুল ফুটেছে। কোথাও জামুরায় পাক ধরছে। বাগানে অঝোর গন্ধ। খোশবু মনের বোঝা হাল্কা করে আলম্পানা।

হারুন : তা-ই চলো। হারেমের এই কামরা আমার কাছে দোজখ। স্মৃতির ‘হাবিয়া’ নরক আমার খুন শুকিয়ে দিয়েছে। গুম-খুন আমার ঘুম। এখানে আর না।

মশরুর ঠিকই বলেছিল। ফল আর ফুলের খোশবুর সঙ্গে জুটেছিল ঠাণ্ডা হাওয়ার হাল্কা স্পর্শ। থোকা থোকা অন্ধকার কোথাও জমাট, কোথাও ঈষৎ ফিকে। তাই এখানকার বহু-মাত্রিক দুনিয়া বহু-মাত্রিক মনের নাগাল পায় বৈকি। পায়ের নিচে ঘাসের কোমলতা অন্যান্য অঙ্গের সান্নিধ্য খোঁজে। মিটিমিটি নক্ষত্র বর্তিকা বাঁদীর কর্তব্য-সমাপনে নেমে আসে।

পায়চারী করতে করতে খলিফা বল্লেন, “মশরুর, তোমার কথামত ঠিক জায়গায় এসেছি। আমি মনে শান্তি পাচ্ছি। আগুনের জ্বালা আর পোড়ায় না। আঁচ, আঁচ ত থাকবেই।”

মশরুর : শুক্রিয়া, জাঁহাপনা।

হারুন : মশরুর, তোমার মনে পড়ে, আমরা চারজনে কতদিন বগ্দাদের সড়কে, কতো বেগানার কত রাত কাটিয়ে দিয়েছি?

মশরুর : জাঁহাপনা, মওতের আগে তক্ বান্দা তা ভুলতে পারবে না।

হারুন : মনে পড়ে ... মণিকার মান্জারের মহলে সেই রাত্রির কথা? অদ্ভুত সেই আওরত— শাদীর সময় যার শত-ছিল শওহর ব্যভিচারী হোলে, দু’শ’ কোড়া দুই পাজরে খেতে হতো। দুই চক্ষু উপড়ে তুলে দিতে হবে। ... মনে পড়ে?

মশরুর : কেয়ামৎ তক্ মনে থাকবে, বান্দা নওয়াজ, ভূত্যাপালনকারী।

হারুন : মনে পড়ে, সিন্দবাদ নাবিকের কথা? তার হস্তম সফরের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী?

মশরুর : বান্দার স্মৃতিশক্তির পরিচয় ত আপনার জানা আছে, জিল্লুল্লাহ।

হারুন : সব মনে আছে। জাফর আর আব্বাসা কবরে শুয়েও ভুলে যায় নি। কিন্তু আমি ভুলে যেতে চাই।

মশরুর : জাঁহাপনা, সে-সব কথা আর তুলবেন না। চমৎকার রাত্রি। আপনি যদি মগ্নুর করেন, কবি ইস্হাককে ডেকে আনি। তার গজল শোনা যাক।

হারুন : না, মশরুর। নির্জনতাই আমার পছন্দ। এখানে রাত্রির হাওয়া পাজরের দাহ নিভিয়ে দিতে পারে। কবির জায়গা আর কোথাও। ওরা বুকের কল্লোল আরো বাড়িয়ে তোলে।

মশরুর : বান্দা-নওয়াজ, ভূত্যা-পালক, তবে চলুন— শহরের সড়কে হাঁটি। বগ্দাদ শহর ত ঘুম জানে না। কোথাও না কোথাও কিছু পাওয়া যাবে, মনের বাতাস ফেরাতে।

হারুন : না মশরুর। এই লেবাসে অসম্ভব। আর দু’জনে ত বহুদিন বেরোই নি। উম্মায়েদ খুনীদের গোয়েন্দা, গুপ্তা— কোথায় কিভাবে ওঁৎ পেতে আছে,

কে জানে।

মশরুর : জাঁহাপনা, উম্মায়েদরা কর্দোবা শহরে পালিয়েছে। ওরা আর এদিকে চোখ ফেরাবে না।

হারুন : মশরুর, খেলাফৎ ত পাও নি। বুঝবে না রাজত্বের লোভ কত। ওই লোভের আগুনের কাছে হাবিয়া-দোজখ সামাদানের ঝিলিক মাত্র। বিবেক, মমতা, মনুষ্যত্ব— সব পুড়ে যায় সেই আগুনে। উমাইয়ারা আমার বংশ প্রতিষ্ঠাতা আবুল আক্বাসকে গাল দেয় সাফ্‌ফাহ— রক্তপিপাসু বলে— আর ওরা? জাব দরিয়ার তীরে যদি আবুল আক্বাস হেরে যেত? জয় বা পরাজয়ের গ্লানি মেটাতে পরাজিতদের গাল দেওয়া একটা রেওয়াজ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। উমাইয়াদের পাশা যদি ঠিক পড়ত— তখন? নীতি এখানে বড় কথা নয়। বল— লোক-বল, অস্ত্র-বল, অর্থ-বল সব নীতির মাপকাঠি। তাই দু'জনের বগদাদ শহরে এই অবস্থায় পায়চারী করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

মশরুর : জাঁহাপনা, উমাইয়াদের ঘাড় অত তাকৎ রাখে না।

হারুন : না রাখুক। হুঁশিয়ারী ভাল, হুঁশিয়ারী ভাল, মশরুর।

মশরুর : জিল্লুল্লাহ, আপনার মহল এই “কাওসুল আক্বদারের” বাগানে কতদিনের পুরাতন গাছ রয়েছে।

হারুন : বহুদিনের। আক্বাজান মরহুম মেহ্‌দী বলতেন— দুইশ' বছর আগে এখানে— কিন্তু ও কি, মশরুর?

মশরুর : কি, জাঁহাপনা?

হারুন : (উৎকর্ষ) ওই—

মশরুর : কি, আমিরুল মুমেনীন?

হারুন : তুমি শুন্তে পাচ্ছে না?

মশরুর : না, আলম্পানা।

হারুন : হাসি, হাসি— কে যেন হাসছে।

মশরুর : হ্যাঁ, শুন্তে পাচ্ছি।

হারুন : আমার মহলের গায়ে কে হাসছে এত রাতে— এই হাসি— একটু চুপ করো।

খলিফা হারুনের রশীদ টোটে তর্জনী রেখে ইঙ্গিত করলেন, একদম নিঃশব্দ দাঁড়াও।

সত্যি, চতুর্দিকের সুমসাম বিয়াবান যেন হাসির মওজে দোলা খাচ্ছে। খুব জোর হাসি নয়। অস্পষ্ট। তবু তার রণন উৎসমুখের খবর পাঠায়। উৎকর্ষ কিছুক্ষণ শোনার পর, হারুনের রশীদ স্তব্ধতা ভেঙ্গে উচ্চারণ করলেন, “মশরুর। শুনেছো এমন হাসি? কে হাসছে আমার মহলের দেওয়ালের ওদিকে? এ হাসি টোটে থেকে উৎসারিত হয় না। এই উৎস সুখ-ডগমগ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ। ঝর্ণা যেমন নির্জন পাহাড়ের উৎসঙ্গ- দেশ থেকে বেরিয়ে আসে উপলবিনুর্নী পাশে ঠেলে ঠেলে— বিজন পথ-ভ্রষ্ট তৃষ্ণার্ত পথিককে সঙ্গীতে আমন্ত্রণ দিতে— এই হাসি তেমনই বক্ষঝর্ণা-উৎসারিত। কিন্তু কে এই সুখীজন—

আমার হিংসা হয়, মশরুর। আমি বগদাদ-অধীশ্বর সুখ-ভিক্ষুক। সে ত আমার তুলনায় বগদাদের ভিক্ষুক, তবু সুখের অধীশ্বর! কে, সে?

মশরুর জবাব দিলে, “আলম্পানা, ওদিকে ত হাবসী গোলামেরা থাকে।”

হারুন : হাবসী গোলাম?

মশরুর : হ্যাঁ, বাদশা-নামদার।

হারুন : গোলামেরা এমন হাসি হাসতে পারে?

মশরুর : পারে, আমিরুল মুমেনীন। ওরা সুখ পায় না, কিন্তু সুখের মর্ম বোঝে। মনুষ্যত্বহীন, কিন্তু মনুষ্যত্বের আশ্বাদ পায়। ওরা হাসে।

হারুন : মনে হয় কোন জীন-পরীর হাসি। কিন্তু কান দিয়ে শোন ত। মিহি-মোটো দু-রকম হাসি যেন একত্রে মিশে বাতাসের লাগাম ধরে আসছে।

মশরুর : তা-ই মনে হয়।

হারুন : কিন্তু কারা হাসছে? কোন মানব-মানবী? কোন মানব-মানবী একত্রে?

মশরুর : গোলামের হাসি, জাঁহাপনা।

হারুন : ওরা হাসবে, আমি হাসতে পারব না? না, তা হয় না।

মশরুর : হাসি থেমে গেল, জিব্বল্লাহ্।

হারুন : হ্যাঁ। তা-ই মশরুর। কিন্তু ওর রেশ আমার কানে এখনও বাজছে।

মশরুর : সত্যি, অদ্ভুত হাসি।

হারুন : মশরুর, চেয়ে দেখো ওই দিকে। ওই খুবানির গাছের ডাল যেখানে দেওয়ালের লাগালাগি মিশেছে কে যেন সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ল।

মশরুর : না, জাঁহাপনা। এখানে কে আসবে? কার এত সাহস?

হারুন : একটু এগোও। দেখো, ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ডাল যেমন কাঁপে, খুবানির শাখা তেমনই কাঁপছে।

মশরুর : আমিরুল মুমেনীন, কোন নিশাচর পাখি বসেছিল, হয়ত এখনই উড়ে গেল। তার ডানার ঝাপটের শব্দে এমন মনে হয়।

হারুন : হয়ত তা-ই। এখন কত রাত্রি?

মশরুর : আলম্পানা, ঐ ত দজলা নদীর উপরে আদম-সুরত হেঁটে হেঁটে দূরে নামছে! আর বেশী প্রহর বাকী নেই শুকতারা ওঠার।

হারুন : চলো, এখন মহলে ফিরে যাই। এই রাত্রির কথা যেন কেউ টের না পায়, মশরুর। আহ, ঐ হাসি আমি হাসতে পারতাম! কাল আবার আমাদের তালাসী নিতে হবে— এমনই রায়ে।

মশরুর : আসসামায়া তায়তান— শ্রবণ অর্থ পালন।

হারুন : মশরুর।

মশরুর : জাঁহাপনা।

হারুন : আজ আমি ঘুমাব, অনেক— অনেক ঘুম। কাল দরবার হবে না, ওমরাদের বলে দিও। আমি শুধু হাসি শুন্ছি। আমি এমনই হাসি হাসতে চাই।
চলে। ...

হারুনর রশীদের কওসুল-আকদার বা সবুজ প্রাসাদ রাত্রির নৈশব্য-মোড়কে কৃষ্ণবর্ণ। মহলের কোথাও কোথাও আলো জ্বলছে, কিন্তু উদ্যান আগেকার মতই সুপ্তি-মগ্ন, অন্ধকার। খোজা প্রহরীরা কোথাও কোথাও নিজের জায়গায় মোতায়েন আছে। তাদের দেখা যায় না। জুতার আওয়াজ নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে ওঠে নি এখন-ও। বাতাসের গতায়তি হয়ত শব্দ তোলে, কিন্তু তার ছোঁয়াচ নির্জনতা ভেদ করতে পারে না। সুপ্তির বর্ম এখানে বড় কঠিন।

“মশরুর, ধীরে”, আবার কাফ্তান গোলাপ ডালের কাঁটায় বিধে গিয়েছিল, তা ছাড়াতে ছাড়াতে খলিফা হারুনর রশীদ বললেন।

“জাঁহাপনা, আজ কেউ আর হাসছে না।” মশরুর জবাব দিলে।

দু'জনে হাঁটছিলেন উদ্যানের সাধারণ রক্তিম পাথরের পথ ছেড়ে, ঘাসের উপর, গাছের কোল ঘেষে ঘেষে। নির্জনতার প্রান্তরে অজ্ঞাতবাস বিক্ষত হৃদয়ের প্রলেপ। হয়ত সেই জন্যে অথবা অন্য কারণে আমিরুল মুমেনীন হাঁটছিলেন। আজ তাঁর দেহাবয়বে চাঞ্চল্য প্রায় অনুপস্থিত। হাঁটছেন, দু'একটা কথা বলছেন। আবার কান খাড়া করছেন। ছায়ার মত সঙ্গী মশরুর অন্ধকারে যেন নিঃশ্বাসের বাতাস।

—মশরুর।

—জাঁহাপনা।

—কিছু শুনতে পাচ্ছে?

—হ্যাঁ, জিল্লুরাহ। সেই হাসি।

—দাঁড়াও, চুপ করে শোনো।

—আজ আরো স্পষ্ট, আরো জীবন্ত।

—মানব-মানবীর মিলিত হাসি।

—গোলামেরা এত রাত জেগে থাকে?

—থাকে, জাঁহাপনা! বিশ্রাম অর্থ ত শুধু ঘুম নয়।

—এগোও, দেখা যাক কোন দিক থেকে এই হাসির শব্দ আসে।

তাঁরা দু'জনে এগোতে লাগলেন। কাওসুল আকদারের বিস্তৃত দেওয়ালের ওপার থেকে বিচ্ছুরিত হাসির অনুরণন ছুটে আসে। আর কিছু বোঝা যায় না। দু'জন স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শোনেন, খোলা আকাশের নীচে। স্মৃত এই হাসির পরিমাপ শুধু শব্দে করা চলে না। কর্ণপটে আশাবরী রাগ তারা গ্রামে পৌছে যে-সুরের বিকিমিকি রচনা করে এই হাসি প্রায় তারই তুলনা। কিন্তু মানুষ এই হাসি হাসতে পারে— বিশেষ করে গোলামেরা? আমিরুল মুমেনীন প্রশ্ন তুললেন ফিস্ ফিস্ কণ্ঠে।

জবাব দিলে মশরুর, “জাঁহাপনা, চলুন। প্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে এর তল্লাশ শেষ করি।

হারুন : না, মশরুর, এত হুটগোলে হয়ত সব পণ্ড হয়ে যাবে। বুলবুলের ডাক

বনের আড়ালে বসে শুন্তে হয়।

মশ্ৰুৰ : আমি কিন্তু বুলবুল দেখার পক্ষপাতী, আলম্পানা।

হারুন : আমি কিন্তু কম পক্ষপাতী? কিন্তু এত তাড়াহুড়ায় হয়ত কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না। বুলবুল উড়ে পালাবে।

মশ্ৰুৰ : তার চেয়ে আমাকে দুই রাত্রি সময় দিন, আমি সব হদিস বের করব।

হারুন : বেশ। দু'দিন বহু কাজ আছে। শুনেছি রোমের সুলতান সেই হতভাগ্য নিসিফোরাসের বহু সমর্থক গুপ্তঘাতক সেজেছে। আমিরদের আমিরী চালে নানা গলদ ঢুকেছে। তাই নানা কাজ, আমি দু'দিন ব্যস্তই থাকব। তুমি বের কর হাসির হদিস।

মশ্ৰুৰ : আস্‌সাময়ো তায়তান।

হারুন : কিন্তু মনে রেখো, মশ্ৰুৰ। দু'দিন সময়। তার বেশী নয়।

মশ্ৰুৰ : বান্দার গর্দান জিম্মা রইল, জাঁহাপনা।

হারুন : বেশ। এবারকার যুদ্ধে রোমের বহু গোলাম বন্দী হয়েছে। বাজারে গোলামের দাম খুব সস্তা। ওরা তবু হাসে? আর এই হাসি অসম্ভব মনে হয়।

মশ্ৰুৰ : দু'দিন আমিরুল মুমেনীন। সবই জানা যাবে।

হারুন : বেশ।

হারুনের রশীদ আবার উৎকর্ষ। শুন্‌লেন সেই মানব-মানবীরা হাসছে। রুমুঝুমু নিনাদ তরুলতার ক্রোড়ে, বাতাসের পাখনায়, পাখ পাখাঙ্গিদের স্থির পালকের আবেশে, যখন—
বসুন্ধরা হাস্যমগ্ন।

৪

তৃতীয় রাত্রি।

স্থান. কাওসুল আকদারের উদ্যান। এই রঙ্গক্ষেত্রে দুইজন পরিচিত অভিনেতাই উপস্থিত, আরো দুই রাত্রি যাদের সঙ্গে দেখা।

—জাঁহাপনা।

—মশ্ৰুৰ, তোমার হদিস বাতাও।

মশ্ৰুৰ : জাঁহাপনা, জায়গা বিশেষে কানের চেয়ে চোখের কিম্বৎ বেশী। আমি আজ হদিস মুখে বলব না, আপনাকে শোনাব না। আপনার মেহেরবান দুই আঁখিপটে সব ছবি পড়বে, আপনি দেখবেন। এখন আমাকে অনুসরণ করুন।

হারুন : কোন্ দিকে মশ্ৰুৰ?

মশ্ৰুৰ : সেই দেওয়ালের কাছেই। কিন্তু একটু দূরে। একটা বাদাম গাছের ডালের কাছে।

হারুন : তা-ই চলো।

মশ্ৰুৰ : বান্দার গোস্তাখি মাফ করবেন, জাঁহাপনা। আর একটা আরজ। আপনাকে

তকলীফ করে সামান্য উঁচুতে গাছের ডালে চড়তে হবে।

হারুন : তকলীফ কি? তুমি জানো না, ছেলেবেলায় আমি পিতার চোখে ধুলো দিয়ে কতদিন এইসব গাছে চড়েছি। আমার কোন কষ্ট নেই।

মশরুর : তা আমি শুনেছি নামদার।

দুই জনে অন্ধকারে লেবাস পর্যন্ত গোপন করে এগোতে লাগলেন। গাছের পাকা পাতা ঝরে। আমিরুল মুমেনীন কান খাড়া করেন।

হাঁটতে হাঁটতে তিনি প্রশ্ন করলেন, “মশরুর, আজ এত রাত্রি, সেই হাসির রণন ত পাচ্ছি না।”

মশরুর : জাঁহাপনা, বান্দাকে এই বিষয়ে আর কোন সওয়াল করবেন না। আপনার সতর্ক, নেঘাবান চোখের কাছে সব হাজির হবে।

হারুন : মশরুর, তুমি ধাঁধায় ফেললে। হঠাৎ প্রহরীদের সঙ্গে দেখা হোয়ে গেলে?

মশরুর : না, ওরা আজ এদিকে আসবে না। আমি মানা করে দিয়েছি।

হারুন : তা বুঝেছি। মশরুর কোন কাঁচা কাজ করে না।

মশরুর : জাঁহাপনা, এই সেই বাদামের দারাখৎ (বৃক্ষ), এই গাছের ডালে আমাদের চড়তে হবে।

হারুন : আচ্ছা, জুতা খোলার প্রয়োজন হবে না। আমার আঁবা শুধু খুলে এক পাশে রেখে দিই।

মশরুর : আলম্পানা, আমি খুলে নিচ্ছি।
প্রায় পনের হাত উর্ধ্বে ঋতু ডালে মশরুর ও আমিরুল মুমেনীন উঠে বসলেন।

মশরুর : জাঁহাপনা, একবার স্মৃতির বগদাদ— আপনার গড়া বগদাদকে এই উঁচু থেকে দেখে নিন। চমৎকার। কত আলো চারদিকে। এই রাত্রি তবু মানুষের স্পন্দন, হৃৎস্পন্দনের মতই ধুকধুক করছে। দজলা নদীর বুকে গুফার উপর আলোর ঝিকিমিকি দেখুন। গুফাদারেরা গজল গাইছে, দাঁড় টানছে। আমিরুল মুমেনীনের গড়া বগদাদ, এক-কথায় অপূর্ব।

হারুন : মশরুর, মহলের মিনার থেকে কত রাত বগদাদকে দেখেছি। কিন্তু আজকের দেখা কোনদিন ভুলতে পারব না। গাছপালার মধ্যে বসে যেন আদিম দুনিয়া থেকে দেখছি মানুষের গড়া জিনিসকে। ইনসান-ও স্রষ্টা। আর ইনসানের তৈরী চিহ্ন বিধাতার চিহ্নের চেয়ে কিছু নগণ্য নয়। আমার বগদাদের এই ইমারৎ, সব কিছু হয়ত আজরাইলের থাবায় লয় পেয়ে যাবে, কিন্তু বগদাদ অমর উপকথায় পরিণত হবে। আজরাইল সেখানে পৌছতে পারবে না।

মশরুর : আলহামদোলিল্লাহ, জাঁহাপনা।

হারুন : বগদাদ দুনিয়ার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে রোশনাই হোয়ে থাকবে, মশরুর।

মশরুর : আলহামদোলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লার।

হারুন : কিন্তু মশরুর, সেই হাসির ত কোন আলামৎ-চিহ্ন-পাওয়া যাচ্ছে না।

- মশ্ৰুৱৰ : জাঁহাপনা, আমাৰ হাত থেকে এই কাঁচখানা গ্ৰহণ কৰুন, কিমিয়াৰ কাছ
থেকে আনা।
- হাৰুন : কেন?
- মশ্ৰুৱৰ : এটা চোখে দিলে পাচু অন্ধকাৰেও আবছা কিছু দেখতে পাবেন। আৰ ওই
দিকে তাকান। ওই যে খুবানীৰ ডাল বুলে রয়েছে— সেদিন যে-জায়গাটা
আপনাৰ নেঘাবান চোখে পড়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে থাকুন, আলম্পানা।
- হাৰুন : বেশ। কিন্তু কিছুই ত দেখতে পাছি না।
- মশ্ৰুৱৰ : দেখতে পাবেন, নুরুল্লাহ্। আৰ খুব আস্তে কথা বলবেন। আশেপাশে
দেখুন। আমাৰ কাছে-ও একটা কাঁচ আছে। চোখে লাগাই।
- হাৰুন : কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সব অন্ধকার।
- মশ্ৰুৱৰ : আমিরুল মুমেনীন, ঐ ঝুলন্ত ডালের সোজাসুজি দেওয়ালের ওপাশে অৰ্থাৎ
বাগানের দিকে দেখুন।
- হাৰুন : হ্যাঁ, দেখতে পাছি। অবশ্য ঝালা। একজন আওরৎ, হ্যাঁ, আওরৎ-ই
আসছে। ওড়না, সদরীয়া, নেকাব— সবই আছে। আমাৰ মহলের আওরৎ
কোন বেগম, কোন বাঁদী, মশ্ৰুৱৰ?
- মশ্ৰুৱৰ : বান্দাকে নাচাৰ কৰবেন না, জাঁহাপনা। শুধু আপনাৰ মেহেৰবান চোখে
দেখুন।
- হাৰুন : কিন্তু আমাৰ চোখ মেহেৰবান নয়। আমাৰ মহলের বেগম না— বাঁদী?
একি মশ্ৰুৱৰ, ডাল ধরে বুজো ও-যে দেওয়ালের উপর চড়ল, তারপর
ওদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল— ইশাৰায় কী যেন বললে। নিচে কি কেউ দাঁড়িয়ে
আছে? ও কি মহলের বেগম, না বাঁদী?
- মশ্ৰুৱৰ : জাঁহাপনা, আমি কোন জবাব দেব না। একটু সবুৰ কৰুন। বান্দাকে আৰ
গোস্তাখিৰ গোনায় গোনাগাৰ কৰবেন না।
- হাৰুন : সবুৰ। মশ্ৰুৱৰ, গোস্তায় আমাৰ খুন টগবগ্ ফুটছে।
- মশ্ৰুৱৰ : আলম্পানা, সবুৎ (প্ৰমাণ) বা একটা কাজেৰ সব না দেখে আপনি গোস্তা
হোতে পারেন না।
- হাৰুন : তা সহী (ঠিক)।
- মশ্ৰুৱৰ : আলম্পানা, এবাৰ ডাইনে বিশ-তিনিশ হাত দূৰে একটু কোনাকোনি আপনাৰ
নেঘাবান চোখ সৱান। ওটা গোলামদের বস্তী। ঐ এক ঝরোকায় আলো
জ্বলছে মিটিমিটি। ওদিকে তাকান। চোখে কাঁচ লাগাতে ভুলবেন না।
- হাৰুন : ওখানে কেন?
- মশ্ৰুৱৰ : দেখুন, আলি-শান।
- হাৰুন : মশ্ৰুৱৰ, তুমি শুধু তেলস্মাতি ধাঁধা সৃষ্টি কৰছ।
- মশ্ৰুৱৰ : এবাৰ দেখুন।
- হাৰুন : ও ত গোলাম বসতের ঘর। কিছু মাটি উঁচু করে ফেলে দিওয়ানের মত
বানিয়েছে। উপরে বিছানা পাতা। বেশ রঙীনই মনে হয়। গোলামের ঘরে—

এই তাকিয়া? আর ত কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মশ্ৰুর : জাঁহাপনা, আপনি শুধু দেখে যান।

হারুন : আমি ত দেখছি-ই।

পাশাপাশি উপবিষ্ট মশ্ৰুর ও হারুনের রশীদ। কত রাত্রি কে জানে? গাছের কয়েকটা ডাল এক জায়গা থেকে বেরিয়েছে। এমন ঝড়ি। বেশ হেলান দিয়ে এখানে বসা যায়। কিন্তু কৌতূহলী মানুষ ত আরামের স্বাদ-প্রার্থী নয়। আমিরুল মুমেনীন ও মশ্ৰুর শিরদাঁড়া-সটান মনোনিবেশে দৃশ্য দেখতে লাগলেন। শোনার ক্ষেত্র নেই, বলা বাহুল্য।

গোলাম-বসতের সাধারণ মাটির ঘর যেমন হয়, এই ঘরের মশালা তার চেয়ে অন্য কিছু নয়। কিন্তু তবু পরিপাটি আছে। মাটির দিওয়ান জানালার পাশে। মরুভূমির লু'হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য সমস্ত ঘরেরই জানালা উঁচুতে। যেন সোজাসুজি বাতাস মুখে না লাগে। গাছের পাতার তৈরি দুই পাল্লা। কখনও বন্ধ, কখনও খোলা থাকে। নিচের রাস্তা থেকে কিছু দেখা যায় না। অনেক উপর থেকে ঘরের মেঝে চোখে পড়ে।

হঠাৎ মেটে দিওয়ানের উপর এক হাবসী নওজোয়ান এসে শুয়ে পড়ল, ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। তার পেছনেই এলো আরমেনী এক তরুণী। সে বসে পড়ল এক পাশে। হাতে একগোছা আঙুর। শুচ্ছ সমেত সে হাবসী নওজোয়ানের ঠোঁটের উপর ধরে ও নাড়াতে থাকে। হাবসী আঙুরের লোভে ঠোঁট বাড়ায়। তরুণী তখন দ্রাক্ষাশুচ্ছ উপরে তুলে নেয় আর মিটিমিটি হাসে। হাবসী জোয়ান এবার বালিশ থেকে আরো উর্ধ্বে মুখ তোলে, কিন্তু আঙুর শুচ্ছ তেমনই আরো উপরে সরে যায়।

কথা শোনা যায় না, তবু কেউ কাছে থাকলে শুনতে পেত বৈকি।

তরুণী : তুমি বড় লোভী, তরুণী? তোমার সবুর সয় না।

যুবক : মেহেরজান, সবুর করা যায় না। ভাল মেওয়া দেখলে জিভে পানি এমি আসে।

তরুণী : এসো, আর একবার চেষ্টা করো, তোমার ঠোঁটের কাছে আঙুর ঝুলিয়ে ধরি।

যুবক : তোমার ঠোঁটে আরো বেশী মেওয়া আছে।

তরুণী : বেশ, তাই ঋণ। কিন্তু আঙুর পাবে না।

যুবক : আঙুরে আমার প্রয়োজন নেই। ও আমার আমাদের নসীবে জুটে না। বেগম জুবায়দার মেহেরবানী, আঙুর-ও জুটেছে।

তরুণী : শুধু আঙুর? আর কিছু না?

যুবক : সেই মেওয়া—

উভয়ের হাস্যধ্বনি আর কামরার ভেতরে আবদ্ধ থাকে না। এই প্রাণদ হাসি শুধু এই মুহূর্তে পাওয়া যায়— হৃদয় যেখানে হৃদয়ের বার্তা উপলব্ধি করে, সান্নিধ্যের ব্যগ্রতায় নিজের অস্তিত্ব আর আলাদা রাখতে নারাজ। বাতাস হয়ত লোভেই ছুটে আসে তার তরঙ্গে নতুন সুর জুড়ে দিতে। বাতাসকে এখানে আমন্ত্রণ দিতে হয় না।

যুবক : মেহেরজান, আগে এই মেওয়া দাও। তারপর তোমার মেওয়া দিও।

তরুণী : আবার চেষ্টা করো।

যুবক : না। আমি এই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

তরুণী : আহা, রাগ করো না। আজ আমিও সবুর করতে পারব না। ভয় হয়।
খলিফার কানে গেলে—

যুবক : ভেবে লাভ নেই, মেহেরজান। বেগম সাহেবা যখন আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, আমি আর ডরাই না।

তরুণী : এসো, আঙুর খাও। আমি ত তোমার জন্যে আনি। বেগম সাহেবা আমাকে রোজ অনেক কিছু খাওয়ান।

যুবক : মেহেরজান, তুমি ভারী সুন্দর, তোমার কথার মতই সুন্দর। বিধাতা তোমাকে ঝুটো করেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

তরুণী : ঝুটো?

যুবক : বিধাতা ত সব জানেন। তোমার ভূত-ভিবষ্যৎ। এই আঠারো বছরে তুমি কি দাঁড়াবে তা ত তিনি জানতেন। সেই কল্পনার মূর্তিতে তিনি কি তোমার চোঁট আস্ত রেখেছেন, মেহেরজান?

তরুণী : তিনি কি করেছেন জানি না, তুমি ত—

আবার সেই উতরোল হাসি ওঠে এই জীর্ণগৃহের মধ্যে। ফিরদৌস (বেহেশতের নাম) ত দূরে নয়। বুকের কপাট খুললে যে হাওয়া বেরোয়, তারই স্নিগ্ধতা আর শীতলতা দিয়েই বেহেশত তৈরী। আজকের হাসি সহজে থামা জানি না। লয়াভরের মত তারি মধ্যে তরুণী মুখের কথা ছড়িয়ে যায়।

তরুণী : বিধাতার উপর খালি চক্ষুর অপবাদ কেন? রসিক কী সেখানেই গুধু থেমে থাকতে পারে?

যুবক : আহ্ মেহেরজান—

যুবক আর দিওয়ানে শুয়ে থাকে না। ধড়মড় উঠে পড়েই সে তরুণীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে। তারপর বিধাতার উপর যে অপবাদ দিয়েছিল সে তারই অভিনয় শুরু করে। চারি-চক্ষুর মিলন, বহু শতাব্দীর প্রবাদ। চোঁটের কথা কেন কেউ কোনদিন উল্লেখ করে নি?

যুবক : (ফিস্‌ফিস্‌ করে) তোমার বুকের মেওয়া কি কম মধুময়, মেহেরজান।

তরুণী : তুমি যে কতদিনের দুর্ভিক্ষে উপবাসী। খালি খাওয়া ছাড়া আর কোন কথাই নেই মুখে।

যুবক : উপবাসী, অনাহারী। নিশ্চয়ই তোমার মত ইফতারীর জন্য আমি সারা জন্ম উপবাসী থাকতে রাজী। কিন্তু আর কথা বলব না।

তরুণী : তুমি আমার সদ্রিয়া, কাঁচুলী খুলছ কেন? তোমার দুই হাত আমি ভেঙে দেব। খাওয়া ছেড়ে এবার চাওয়া ধরেছ।

যুবক : মেহেরজান, তুমি সত্যি, সত্যি মেহেরজান। প্রাণে করুণা ঢেলে দিতে পারো।

তরুণী : আমার খোলা সীনায় তোমার চোঁট তাতারী। আগে আমার চোঁটে ছিল তোমার চোঁট। তোমার অধঃপতন ঘটছে, ক্রমশঃ নীচের দিকে নামছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় গিয়ে যে থামবে— যাও— ।

কৃত্রিম ক্রোধ ও হাসির যুগল-ডানায় সওয়ার মেহেরজান । বাহুপাশ ছাড়িয়ে, দিওয়ানের পাশে দাঁড়ায় । সমস্ত শরীর নগ্ন । পরনে শুধু ঘাগরা ।

তাতারীও সামনে এসে দাঁড়িয়ে তরুণীর চোখের দিকে তাকায় । নিস্তব্ধ মুহূর্ত । তারপর মেহেরজানের ঘাড়ের হাত দিয়ে সে-ও হাসতে থাকে । দুইজনে হাসে । যেন স্মৃতির রোমহুণ-লীলায় দু'জন ভেসে যাচ্ছে । এই সুখ-সমুদ্রের প্রবাহ অনন্তকালের রেখায় হয়ত মিশে গেছে । কবে? তারা কেউ জানে না ।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে যেন উভয়ের সম্মিত ফিরে আসে । হাবসী যুবক মেহেরজানকে বকে জড়িয়ে শূন্য তুলে নিয়ে এসে আলতোভাবে দিওয়ানে রাখলে । তারপর বাতি নিভিয়ে দিল ।

অন্ধকারে দুই জনে অনেকক্ষণ হাসতে থাকে । কেন? সে তারা-ই ভাল জানে, আর জানে বিধাতা ।

প্রেমিক-প্রেমিকার কুহর শুনেছে কোন দিন? না শুনে থাকো, লেখক তোমাকে আর কিছু বোঝাতে পারবে না ।

৫

মশরুর : জাঁহাপনা ।

হারুন : কি মশরুর?

মশরুর : কি দেখছেন?

হারুন : দেখছি না, শুন্ছি?

মশরুর : কি, আলম্পানা?

হারুন : হাসি শুন্ছি । হাসি থেমে গেছে, তবু শুন্ছি । কিন্তু আমার মল থেকে নৈশ অভিসার! কে— কে এরা, কে?

মশরুর : জাঁহাপনা ।

হারুন : মশরুর, আমি জানতে চাই, মহলের কোন বেগম না বাঁদী?

মশরুর : মহলের কেউ নিশ্চয় । আর ত কিছু জানার প্রয়োজন নেই আলম্পানা ।

হারুন : আছে । আমার ইজ্জৎ কি কিছু নয়?

মশরুর : তৌবাস্তাগ্‌ফেরুল্লা ।

হারুন : তবে কে ওরা?

মশরুর : আর জানার চেষ্টা করবেন না, জিহ্নুল্লাহ ।

হারুন : না, আমাকে জানতেই হবে, আর তা জানাবে তুমি ।

মশরুর : বাদশা নামদার, বান্দাকে গোনাগার করবেন না ।

হারুন : বলো তুমি কি জানো?

মশরুর : জাঁহাপনা, মাফ করুন বান্দাকে ।

হারুন : না, মশরুর । পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে শুধু তুমি আছ । তোমার প্রতি বেদীল

হওয়ার অপরাধে আমাকে অপরাধী করো না।

মশ্ৰুন্নর : জাঁহাপনা, আমি মাফ চাইছি দু'হাত জোড় করে। আমার কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনে কি বুঝতে পারছেন না, আলম্পানা, কেন— কেন— আমার মুখ বন্ধ হয়ে আসছে।

হারুন : কিন্তু মশ্ৰুন্নর, তুমি কি নিজের গর্দানের কোন দামও দাও না?

মশ্ৰুন্নর : জাঁহাপনা, অনেক গর্দান নিয়েছি এই হাতে, আর কত দামী দামী গর্দান— মহামান্য জাফর বার্মেকী, যিনি দুনিয়াকে কামিজের গলায় কফতান লাগানো শিখিয়ে গেছেন— সেই গর্দান। আমার এই হলকুমের (দ্রাবীদেশ) দাম তো তুচ্ছ তার কাছে। আপনার মেহেরবানী হয়, দানা-পানি নিঃশ্বাসের জন্য এই হলকুম রাখবেন— না হয় কলম-তরাস— কর্তন করবেন।

হারুন : এত অভিমান করো না। তুমি জানো, তার দাম আমার কাছে কিছু নয়। সোজা বলো, আসল রহস্য কী? বড় ভুল করেছি— কবি ইস্হাককে সঙ্গে না নিয়ে। ঐ প্রেমের দৃশ্য দেখে হয়ত উম্‌দা গজল লিখে বসত, না হয় তোমার বেয়াদবির সাক্ষী থাকত।

মশ্ৰুন্নর : জাঁহাপনা, এই সুমসাম রাত্রি। এই রইল তলওয়ার। আপনি নিজের হাতে আমাকে কতল করুন, কেউ দেখবে না, কেউ শুনবে না। কিন্তু মশ্ৰুন্নর বেয়াদবির কলঙ্ক বোঝা মাথায় সেইতে পারবে না। নচেৎ হলকুম দিন, আপনার বহু নেমক-পানি যে হলকুমের পথে গেছে, তা আপনার সামনে এই তলওয়ার খিঁচে দু'ফাঁক করে আপনাকে উপহার দিয়ে যাই।

হারুন : মাথা তোলো, মশ্ৰুন্নর, আমার ইজ্জৎ তুমি দেখছ না। কোন ব্যভিচারিণী বেগম থাকলে তোমার কি উচিত নয়, হুঁশিয়ার হওয়ার জন্য খবর দেওয়া? তুমি বন্ধুর কাজ করছ না।

মশ্ৰুন্নর : জাঁহাপনা, আমি এইটুকু বলতে পারি, মজকুর আওরৎ মহলের কোন বেগম নয়।

হারুন : বেশ। তাহলে তুমি আসল ভেদ খোলাসা করছ না কেন? তোমার বাধা কোথায়? আর মনে রেখো, মহলের ভেতর ব্যভিচারিণী বান্দী পর্যন্ত আমি রাখতে পারি না।

মশ্ৰুন্নর : ও ব্যভিচারিণী নয়, জাঁহাপনা। তাও আপনাকে জানিয়ে দিলুম।

হারুন : তুমি ধাঁধা আরও বাড়িয়ে তুলছ, মশ্ৰুন্নর।

মশ্ৰুন্নর : আমাকে গোনাগার করবেন না। তার চেয়ে তলওয়ার নিজের হাতে গ্রহণ করুন। মশ্ৰুন্নর প্রাণের জন্য এতটুকু লালায়িত নয়। অবাধ্য বান্দা হিসেবে তার বাঁচার কোন অধিকার নেই, বাঁচতে চায় না সে।

হারুন : আমি জানতে চাই।

মশ্ৰুন্নর : আমি জানাতে পারি না, আমি অক্ষম, আলম্পানা।

হারুন : কেন পারো না?

- মশরুর : আরো মানুষ এর সঙ্গে জড়িত ।
- হারুন : বেশ । আচ্ছা নাদান তুমি, এতক্ষণ তা বলো নি কেন?
- মশরুর : জাঁহাপনা, বান্দার আক্কেল কম, তা আপনি জানেন ।
- হারুন : শোনো মশরুর, আমি পাক্ কোরান-ছোঁয়া কসম করে বলছি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি করব না । আর তার গোস্তাখি যদি অমার্জনীয় হয়— হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর নামে কসম, তবু আমি তার বা তাদের কোন ক্ষতি করব না ।
- মশরুর : আলম্পানা, তাহোলে শুনুন । এর মধ্যে কোন রহস্য নেই । মজ্কুর আওরৎ আমেনী বাঁদী, নাম মেহেরজান । বেগম জুবায়দা ওকে খুবই পেয়ার করেন । তাই হাবসী গোলামের সঙ্গে গোপনে ওর শাদী দিয়েছেন ।
- হারুন : হাহ্ হা, মশরুর । এ-ই কথাটুকু বলতে তোমার এত সঙ্কোচ । তুমি হাসালে, সত্যি হাসালে । তুমি সাফ পানি ঘোলা করতে ওস্তাদ । বেগম জুবায়দা এমন কিছু কসুর করেন নি, যার জন্য তুমি এত ঘোরপাক খেলে ।
- মশরুর : তবু জাঁহাপনা, আমি যে তাঁর কাছে কড়াল করেছিলাম—
- হারুন : সে আমি দেখব । মশরুর, সত্যি হাসি পাচ্ছে । একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে হঠাৎ যদি কিছু করে বস্‌তাম, আমার আফসোসের সীমা থাকত না । কিন্তু মশরুর, আমি এমন বাঁদী জীবনে দেখি নি ।
- মশরুর : জাঁহাপনা, মেহেরজান সত্যি খুবসুস্থ । মুসলে এক সিপাহসালারের ‘মাল-এ গনীমৎ’ (যুদ্ধের বাখরায় প্রাপ্ত দ্রব্য) ছিল । বেগম সাহেবা ওকে মহলে আনান । বড় বিশ্বাসী আওরৎ । তাই বেগম সাহেবা ওকে ভালবাসেন ।
- হারুন : মশরুর, কিন্তু কাল আমার রাত্রে দেখা হবে । আমার অন্য এরাদা আছে । বেগম সাহেবা যেন এইসব রাত্রির খোঁজ না পান ।
- মশরুর : বহৎ আচ্ছা, জনাব । বান্দার গর্দান জিম্মা ।
- হারুন : হ্যাঁ, শোনো মশরুর । তুমি কবি ইস্‌হাককে খবর দিও, সে যেন রুবাব সঙ্গে নিয়ে কাল রাত্রে হাজির হয় ।
- মশরুর : আস্‌সামাযো তায়তান ইয়া আমিরুল মুমেনীন ।

৬

রুবাবের কান্না এই মাত্র থেমে গেল । তারপর চাপা হাসির আওয়াজ শোনা যায় । চাপা কিন্তু প্রাণদ । অন্যান্য দিনের মত এই রাত্রিও শুদ্ধ শীতলতার ভাণ্ডার, বাতাসের কারাগার । বাগিচায় হারুনের রশীদ, আবু ইস্‌হাক, মশরুর কথোপকথন-রত ।

হারুন : আবু ইস্‌হাক, তোমার সঙ্গ এইজন্যে ছাড়তে পারি নে । বহুদিন পর তুমি হাসালে, সত্যি হাসালে । আবার আবৃত্তি করো ।

ইস্‌হাক : আলম্পানা, আবু ইস্‌হাকও কোনদিন আমিরুল মুমেনীনকে ত্যাগ করে যেতে পারবে না । তবে শুনুন :

ইরানী মেয়ের সীনা ভাল,
মিশরী মেয়ের উরু ।
আরবী মেয়ের নাভীর নীচে
স্বর্ণ ঠারে ভুরু ।

- হারুন : হাহ্ হা, শোনো মশরুর । কিন্তু মিশরী মেয়েরা তোমাকে কতল করে ছাড়বে কবি ।
- ইস্‌হাক : আলম্পানা, আবু ইস্‌হাক এমন বহুবার কতল হয়ে গেছে, সুতরাং ডর নিস্ত ।
- হারুন : ইরানী মেয়েরা তোমাকে খুন করবে, কবি ।
- ইস্‌হাক : ওদের দুই সীনার উপত্যকার মাঝখানে আমার কবর হয়ে গেছে, জাঁহাপনা! লাশকে কি কেউ খুন করে?
- হারুন : শোনো, মশরুর । বিষণ্ণ রাত্রে কবি ইস্‌হাকের সঙ্গ পেলে আর কোন চিন্তা থাকে না । কিন্তু কবি কখন কোন্ পান্‌শালায় হারিয়ে যায়, খুঁজে পাওয়া মুশকিল ।
- ইস্‌হাক : আপনার বান্দা মশরুর তা জানে । শুধু মশরুর কেন, দুনিয়ার সবাই জানে, মশরুরের তলওয়ারের ঝিলিক আর ইস্‌হাকের কথার ঝিলিকের কাছে বিদ্যুৎ তুচ্ছ ।
- হারুন : কিন্তু কবি, তুমি আরমেনী মেয়ে সম্পর্কে কোন রুবায়ী লিখবে না?
- ইস্‌হাক : জাঁহাপনা, আজ প্রথম দেখলাম আরমেনী মেয়ে, তাও দূর থেকে গাছে সওয়ার হয়ে । তাই ওরা প্যারিজ আছে ।
- হারুন : কিন্তু কি দেখলে?
- ইস্‌হাক : দেখলাম মশরুরের তলওয়ারের ঝিলিক হার মেনে গেল ।
- হারুন : আর কি দেখলে?
- ইস্‌হাক : দেখলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না— দেহের প্রতীক ছন্দ, না ছন্দের প্রতীক দেহ ।
- হারুন : আর কি শুনলে?
- ইস্‌হাক : শুনলাম, আদমকে তৈরীর পর বিধাতা হয়ত যে-হাসি হেসেছিল তারই অনুরণন ।
- হারুন : আবু ইস্‌হাক, তুমি সত্যি সুরের কবি । মশরুর, কাল খাজাঞ্চীখানা থেকে কবিকে চার হাজার আশরফী দেওয়ার বন্দোবস্ত করবে । আমার ফরমান ।
- মশরুর : আসসামায়া তায়তান ।
- হারুন : কবি, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই ।
- ইস্‌হাক : বলুন, আলম্পানা ।
- হারুন : ঝুটো চিজ কি খাওয়া যায়?
- ইস্‌হাক : চিজ?
- হারুন : হ্যাঁ ।

- ইস্হাক : খাওয়া যায়, আবার যায় না ।
- হারুন : সে কেমন?
- ইস্হাক : অনেক জিনিস ঝুটো হয়, তা খাওয়া চলে না । হেকিমী ইলেমের বিরোধী ।
আবার অনেক চিজ যা কখনই ঝুটো হয় না, উচ্ছিষ্ট হয় না । সেখানে
হেকিম ইলেম ‘থ’ অসহায় ।
- হারুন : এমন চিজ আছে?
- ইস্হাক : কিন্তু হঠাৎ এমন অদ্ভুত সওয়াল, জাঁহাপনা?
- হারুন : এমনি জিজ্ঞেস করছি । হ্যাঁ, কোন্ চিজ কোনদিন ঝুটো হয় না?
- ইস্হাক : জীবন এবং যৌবন, জাঁহাপনা । নদী কি কেউ কোনদিন উচ্ছিষ্ট করতে
পারে?
- হারুন : না, পারে না ।
- ইস্হাক : জীবন যৌবন বহতা নদীর মত । কত তৃষ্ণার্ত আকষ্ট পান করে যাবে, তবু
ঝুটো হবে না । কিন্তু জীবন যৌবন ছাড়া আর সব কিছু উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় ।
যা বহতা নয়, তা-ই উচ্ছিষ্ট ।
- হারুন : কবি আবু ইস্হাক, তুমি শুধু বাদক নও, সত্যিকার কবি— বিরাট কবি ।
মশ্ৰুর, ইস্হাককে আরো পাঁচ হাজার আশরফী সওগাত দিলাম । কাল
বন্দোবস্ত করো ।
- মশ্ৰুর : আস্সামায়ো তায়তান ।
- ইস্হাক : আমিৰুল মুমেনীন, আপনি হুসদা-নওয়াজ তা জানি, কিন্তু গরীবের উপর
এত মেহেরবান হবেন না?
- হারুন : আবু ইস্হাক, তোমার মর্যাদা হারুনের রশীদের খাজাঞ্চীখানা দিতে পারে
না । তা জানি, তবু—
- ইস্হাক : জাঁহাপনা, শুক্রিয়া— হাজার— লাখ শুক্রিয়া ।
- হারুন : মশ্ৰুর ।
- মশ্ৰুর : আমিৰুল মুমেনীন ।
- হারুন : আজকের নৈশ অভিযান এখানে শেষ হোক । আমার ঘুম পাচ্ছে । কাল
তুমি শহর কোতোয়ালকে বলে রাখবে, আমার দশ-পনের জন কোতোয়াল
দরকার হবে ।
- মশ্ৰুর : যো হুকুম, আলম্পানা ।
- হারুন : হ্যাঁ, কাল আবার আমাদের এখানে দেখা হচ্ছে । মজলিশ ভাঙার আগে,
আবু ইস্হাক, তোমার রুবায়ে আবার আনন্দের মওজ তোলা ।
[রুবাব বেজে চলে]

কাওসুল আকদারের বাগ-বাগিচায় সুরের হিল্লোল ।

বগ্‌দাদের সড়কে অবাধ রাত্রি ।

গোলাম-বস্তি নিঝুম ।

পরদিন রাত্রি।

গোলাম-বস্তী নিব্বুঝুম।

তারা দু'জনে ঘুমিয়ে ছিল, মৃত্যু-রূপা ঘুম— একে অপরের অঙ্গের পাকে পাকে একাকার।

হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দ হোলো। প্রথমে ধীরে, মৃদু শব্দ। তারপর জোরে, দ্রুত।

—তাতারী, শুনছো?

—কে... কি ...

মেহেরজান : শুনছো?

তাতারী : কি মেহেরজান?

মেহেরজান : দুয়ারে কে ঘা দিচ্ছে।

তাতারী : আমার ঘোড়াটা হয়ত দড়ি ছিঁড়ে আমার খোঁজে এসেছে।

মেহেরজান : না, না— এ তোমার পেয়ারা ঘোড়া নয়। মানুষ।

তাতারী : শুয়ে থাকো, কোন সাড়া দিও না।

মেহেরজান : আরো জোরে ঘা দিচ্ছে, দরজা ভেঙে পড়বে। আমি হলফ করে বলতে পারি ঘোড়া নয়। তুমি সাড়া দাও।

তাতারী : কে?

নেপথ্যে : দরজা খোল।

তাতারী : কেন?

নেপথ্যে : দরকার আছে।

তাতারী : কে?

নেপথ্যে : এই গোলাম, দরজা খোল। নচেৎ লাথি দিয়ে ভেঙে ফেলব।

তাতারী : কে আপনি, জনাব?

নেপথ্যে : আমি মশরুর।

তাতারী : জাঁহাপনা, এখনই খুলছি। (ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠে) মেহেরজান, সর্বনাশ! তুমি তাড়াতাড়ি বোরখা পরে নাও।

মেহেরজান : (ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে) তাতারী, আল্লা যেন সহায়, নেঘাবান হন। কোথাও লুকানোর জায়গা নেই?

তাতারী : এই ছোট খুপরী, লুকাবে কোথায়?

মেহেরজান : তবে আল্লা যা নসীবে রেখেছেন, আমি বোরখা পরে নিই, তুমি দরজা খুলে দাও।

নেপথ্যে : এই জলদি কর, দরজা খোল।

- তাতারী : দিচ্ছি জনাব। বোরখা পরেছ?
- মেহেরজান : পরেছি।
- তাতারী : আসুন, জনাব। (নতজানু) আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান্ ইয়া মওলানা। এ কি! স্বয়ং আমিরুল মুমেনীন। লা-হাওলা ওলা কুয়াতা, আলম্পানা, বান্দার গোস্তাখি মাফ করবেন। এই শির ঝুঁকালাম। গোস্তাখির জন্য আমার কঠোর সাজা দিন, জাঁহাপনা।
- হারুন : তুই ঘরের প্রদীপ জ্বালিয়েছিস, আরো আলো— আরো রোশ্‌নাই চাই।
- তাতারী : জাঁহাপনা গরীবের আর তো কিছু নেই। তবে পাশের প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে আনি।
- হারুন : মশ্‌রুর, কোতোয়ালদের একটা আলো আন্‌তে বলো, শিগ্‌গির।
- মশ্‌রুর : যো হুকুম, জাঁহাপনা।
- তাতারী : আলম্পানা, গোস্তাখি মাফ করবেন বান্দার সওয়ালে। এই সুম্‌সাম রাত্রে আপনার পয়জার এই গোলামদের বস্তীতে জিল্লুল্লাহ্‌র আবির্ভাব? কিছু বুঝতে পারছি নে।
- হারুন : আবু ইস্‌হাক।
- ইস্‌হাক : জাঁহাপনা।
- হারুন : আমার বদলে তুমি জবাব দাও।
- ইস্‌হাক : এই গোলাম, জাঁহাপনা তোর হাসি শুনে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তোর জন্যে ইনাম নিয়ে এসেছেন।
- তাতারী : ইনাম?
- ইস্‌হাক : হ্যাঁ, ইনাম।
- তাতারী : কিন্তু জাঁহাপনা, বান্দার কোন গুণ নেই, আর বান্দা এমন কোন কাজ করে নি, যার জন্যে সে ইনাম প্রত্যাশী হতে পারে।
- ইস্‌হাক : গোলাম, তোর হাসি বড় মধুর। তাই আমিরুল মুমেনীন সেই হাসির রেশ ধরে এখানে এসে পৌঁছেছেন।
- তাতারী : জনাব, বান্দাকে আর গোনাগার করবেন না। গোলাম, তার আবার হাসি!
- হারুন : না, সত্যি। ইস্‌হাক আমার কথাই বলছে। আমি সেই জন্যেই এসেছি।
- তাতারী : আমিরুল মুমেনীন, আল্লা আপনার শান শওকত আরো বৃদ্ধি করুন, আপনার দবদবা দিকেদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। আপনি দুনিয়ার আমীর হন। গরীবের এই জুপড়িতে কি করে যে আপনারে জায়গা দিই।
- মশ্‌রুর : চুপ কর, গোলাম।
- হারুন : এই যে কোতোয়ালেরা আলো এনেছে। এখন চারিদিক বেশ চোখে পড়ে। এই গোলাম, ওটা কী?
- তাতারী : কি জাঁহাপনা?
- হারুন : ওই যে দেওয়ালের সাথে কালো বোরখা লেগে রয়েছে।
- তাতারী : জাঁহাপনা—

হারুন : কি?
 তাতারী : জাঁহাপনা—
 মশরুর : জবাব দে, নফর।
 তাতারী : জাঁহাপনা, বান্দাকে কতল করুন। বান্দা এই জবাব দিতে অক্ষম।
 হারুন : জবাব দে, নচেৎ—
 তাতারী : জাঁহাপনা।
 হারুন : মশরুর, এই বান্দরের জিভ ছিঁড়ে নাও, এখনও জবাব দিচ্ছে না।
 মশরুর : আবু ইসহাক, দ্যাখো দ্যাখো, গোলামটা ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদছে, তবু জবাব দিচ্ছে না।
 ইসহাক : আমি দেখি, মশরুর। এই, আমিরুল মুমেনীনের সওয়ালের জবাব দে।
 হারুন : মশরুর, যা ভেবেছিলাম তা নয়, না-ফরমান গোলাম। একে কতল করো।
 এফসনি।
 মেহেরজান : (বোরখা খুলিতে খুলিতে) না, না আমিরুল মুমেনীন। দেওয়ালের গায়ে শুধু বোরখা নেই, আমি আছি তার ভেতরে। ওকে মাফ করুন।
 হারুন : আবু ইসহাক, মশরুর— দ্যাখো। বোরখার অন্ধকার ছিঁড়ে এই মাহতাব (চাঁদ) কোথা থেকে উদয় হলো? থামো মশরুর। জবাব পাওয়া গেছে।
 এই, তুই কে?
 মেহেরজান : (নতজানু) জাঁহাপনা, মজকুর জামিনা আপনার বাঁদী।
 হারুন : বাঁদী।
 মেহেরজান : হ্যাঁ, জাঁহাপনা।
 হারুন : কোন্ দেশী বাঁদী এমনি?
 মেহেরজান : আরমেনী বাঁদী, আমিরুল মুমেনীন।
 হারুন : এই গোলাম, উঠে দাঁড়া। একটা জবাব দিবি, তবু এত ভয়। এ তোর কে?
 তাতারী : আমার বিবি আলম্পানা।
 হারুন : তোর বিবি?
 তাতারী : হ্যাঁ, জাঁহাপনা।
 হারুন : তুই শাদী করেছিস্, অথচ খবর দিস্ নি? গোলামের আত্মপর্দা বড় বেড়ে গেছে। আলেক্সো শহরে কতকগুলো গোলামের তাই মাথা খেঁতলে দিতে হোলো।
 তাতারী : জাঁহাপনা, গোস্তাখি মাফ করবেন। আপনার পায়ের খাক্ এই গোলাম। তার আবার শাদী। তার আবার দাওয়াৎ।
 হারুন : তোর কি জানা নেই, আপন মাওলার (প্রভু) হুকুম ছাড়া কোন গোলাম শাদী করতে পারে না বা নিজের বেটির শাদী দিতে পারে না?
 তাতারী : জানি, জাঁহাপনা।
 হারুন : তবে—
 তাতারী : তার সাজা নিতে আমি প্রস্তুত আছি। অবাধ্য, নাফরমান বান্দার যা' শাস্তি

হয়, তাই আমার প্রাপ্য।

হারুন : হ্যাঁ, তোর গর্দান যাওয়া-ই উচিত। এই বাঁদী, তুই কোথা থাকিস্?

মেহেরজান : আপনার মহলের বাঁদী, জাঁহাপনা।

হারুন : আমার মহলের বাঁদী শাদী করেছে গোলাম, অথচ আমাকে কেউ জানায় নি। তাজ্জব ব্যাপার। তোকে কোনদিন দেখি নি?

মেহেরজান : না, আলম্পানা।

হারুন : অমন নতজানু করজোড়ে তোর থাকার দরকার নেই। উঠে দাঁড়া।

মেহেরজান : জাঁহাপনা। বান্দীকে আর গোনাগার করবেন না।

হারুন : আমি যা বলি, তা শোন্। এখানে মশরুর খাড়া আছে তা ভুলে যাস্ নি। উঠে দাঁড়া।

মশরুর : জাঁহাপনা—

হারুন : গোলাম, তোর আত্মপর্দা আসমান ছাড়িয়ে গেছে। কুকুরের মত তোদের জিভ ছিঁড়ে নিলে তবে গায়ের ঝাল মেটে।

তাতারী : জাঁহাপনা, বান্দা গোনাগার। আপনার যা মরজী, তা-ই করুন। বান্দার কোন দুঃখ নেই।

হারুন : আবু ইসহাক, এ গোলাম ত চমৎকার কথা বলে। ঠিক তোমার মত।

ইসহাক : হ্যাঁ, আলম্পানা। যারা ভাল কথা বলতে পারে, তারা ভাল হাসতে-ও-পারে।

হারুন : কেন, আবু ইসহাক?

ইসহাক : আলম্পানা, সাধারণ কথা নয়, ভাল কথার মূল কি? ভাল কথা হচ্ছে রুহের (আত্মার) প্রতিধ্বনি— সেখানেই জমে থাকে, তারপর ঝর্নার মত বেরোয়। অনাবিল হাসি হচ্ছে ভাল কথারই শারীরিক রূপ। তাই জিব্বুল্লাহ, যারা ভাল কথা বলতে পারে, তারা ভাল হাসতেও পারে। হাসি আর কথার মূল উৎস এক জায়গায়।

হারুন : ও আবু ইসহাক, তুমি ফলসাফা-দর্শন শুরু করে দিলে। এত বোঝার মত ধৈর্য এখন আমার নেই। এই বাঁদী— তোর কিছু বলার আছে?

তাতারী : না, জাঁহাপনা। গোনাগার, নাফরমান— আমাদের কতল করুন।

হারুন : মশরুর, তৈরি হও। আমার ফরমান মোতাবেক এদের শাস্তি দেবে। এক চুল না এদিক-ওদিক হয়।

মশরুর : যো হুকুম আলম্পানা।

হারুন : হাজেরান (সমবেত), মজলিস— মশরুর, কবি আবু ইসহাক এবং কোতোয়ালগণ, এই দুই বান্দা এবং বান্দী কানুনের খেলাপ যে কাজ করেছে, তার জন্য এদের শাস্তি কী? তলওয়ারে গর্দান গ্রহণ করা যায়, অঙ্গচ্ছেদ করা চলে, একদিকের পাঁজর নামিয়ে নেওয়া চলে। কিন্তু তলওয়ারের আরো শক্তি আছে। তলওয়ারে লোহার জিঞ্জির ছিন্ন করতে পারে। আমি এই মজলিসে ঘোষণা করছি— আজ থেকে এই দুই বান্দা-

বান্দীর গোলামীর জিজির ছিন্ন হোক । এ দুই জনে মুক্ত— আজাদ, আমার রাজত্বের দুই জন স্বাধীন নাগরিক ।

[সকলে : মারহাবা । মারহাবা ।]

তাতারী : হে আমিরুল মুমেনীন, আপনার মেহেরবানী সীমাহীন, আপনার হৃদয় বিশাল, আমরা উভয়ে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ । হে জিবুল্লাহ, আপনার দুই বাহুতে আরো শক্তি সঞ্চিত হোক যেন সিকান্দার শাহর মত আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর হন । আমিরুল মুমেনীন জিন্দাবাদ ।

[সকলে : মারহাবা । মারহাবা ।]

হারুন : আমি আরো ঘোষণা করছি, এই মুহূর্ত থেকে হাবসী তাতারী— কয়েক মুহূর্ত আগে যে গোলাম ছিল, বগ্দাদ শহরে পশ্চিমে আমার যে বাগিচা আছে সেই বাগিচা এবং তার যাবতীয় গোলাম বান্দী, মালমাল্লা, আসবাব সব কিছুর সে মালিক । তার সমস্ত লেবাস ও দিনগজরানের খরচ আজ থেকে খাজাঞ্চীখানা বহন করবে ।

[সকলে : মারহাবা । মারহাবা ।]

তাতারী : জাঁহাপনা, আপনার করুণার ঋণ আমরা কোনদিন শোধ দিতে পারব না ।

হারুন : যাও, কোতোয়াল— এখন-ই হাবসী তাতারীকে আমার বাগিচায় নিয়ে যাও । লেবাস সেখানে প্রচুর আছে । এই বেশে যেন কোনদিন ওকে আমি না দেখি ।

সকলে : সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা ।

হারুন : একটু সবুর করো, কোতোয়াল । তোমাদের হাসির জন্য আমি এই ইনাম দিলাম । দাঁড়াও দুইজনে । আর একবার সেই হাসি হাসো ।

তাতারী : জাঁহাপনা, বান্দাকে অনেক কিছু দিয়েছেন । তার বোঝায় বান্দার ঘাড় ক্লান্ত । আজ হাসি আসতে পারে না, জাঁহাপনা ।

হারুন : বেশ । কিন্তু মনে রেখো, হাসি তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে । এই হাসিই আমি গুণতে চাই । হ্যাঁ, আমি গুণতে চাই । আমার বুক যখন ভারাক্রান্ত থাকবে, তখনই তোমার হাসি আমি কামনা করব । যাও, এখন নাই-বা হাসলে । কোতোয়াল, একে নিয়ে যা । বান্দী, তুমি মহলে ফিরে যাও ।

ইস্‌হাক : জাঁহাপনা, গোলাম ত চলে গেল । এখন আবু ইস্‌হাকের কথা শুনুন । এই আরমেনী বান্দী, তৌবা— এই আরমেনী আওরতের জন্য কি ইনাম দিবেন? কান শোনার জন্য পাগল ।

হারুন : সে আরো বড় ইনাম । চলো মেহেরজান । আমাদের সঙ্গে চলো । তুমি বেগম জুবায়দার কাছে ফিরে যাও । তবে তুমি আর বান্দী নও ।

মেহেরজান : জাঁহাপনা, আপনি অশেষ মেহেরবান । আপনার মরজীই আমার মরজী ।

হারুন : মেহেরজান, তুমিও এত মিষ্টি কথা বলতে পারো । আজব দুনিয়া । রাত্রি প্রায় শেষ । চলো মশরুর । আবু ইস্‌হাক, তোমার গজল-শোনা রাত্রি আবার আসবে । নিরাশ হয়ো না, কবি ।

ইস্‌হাক : আলম্পানা, আবু ইস্‌হাক আশা মানে না— নিরাশা জানে না। আবু ইস্‌হাক বিশ্বের মুসাফির। সে যা দেখে, তারই গান করে। চলুন, জাঁহাপনা।...

৮

অন্দর মহল। আবু ইস্‌হাক ও হারুনর রশীদ।

—আবু ইস্‌হাক।

—জাঁহাপনা।

হারুন : হাব্‌সী গোলামের খবর জানো?

ইস্‌হাক : না, আমিরুল মুমেনীন।

হারুন : আমিও তিন দিন খোঁজ নিতে পারি নি, তাই বাগিচার মোহাফেজকে ডাকতে পাঠিয়েছি।

ইস্‌হাক : মোহাফেজ ডাকার দরকার নেই, আলম্পানা। গোলাম যা পেয়েছে, তার তুলনা নেই। এই বদান্যতা শুধু জিল্লুল্লাহ খলিফা হারুনর রশীদ-বিন্-মেহ্‌দীর পক্ষেই সম্ভব।

হারুন : তবু খোঁজ নিতে হয়। কারণ ওর হাসি শোনার প্রয়োজন আমার আছে। ঐ ত মশ্‌রুর মোহাফেজ-কে নিয়ে হাজির। আহ্‌ আর কুর্গিশের প্রয়োজন নেই। এসো, মশ্‌রুর।

মশ্‌রুর : জাঁহাপনা, মোহাফেজ হাজির।

হারুন : মোহাফেজ, হাব্‌সী তাত্‌বীর কোন তকলীফ হচ্ছে না ত?

মোহাফেজ : জাঁহাপনা, আপনার নির্দেশক খেয়ে বহুদিন এই বাগিচার মোহাফেজ-পদে নিযুক্ত আছি। বহু কাহিনী শুনেছি। কিন্তু এমন কাহিনী কখনও শুনি নি, জাঁহাপনা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে যে ভিক্ষুক ছিল, তৃতীয় প্রহরে সে আমীর। এ শুধু বগ্দাদেই সম্ভব।

হারুন : গোলাম লেবাস পরেছে ত?

মোহাফেজ : আমিরুল মুমেনীন, কালো চেহারা, লেবাস পরার পর ওকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

হারুন : বহুৎ আচ্ছা। ওর কোন কষ্ট হচ্ছে না ত?

মোহাফেজ : আলম্পানা, যেটুকু তকলিফ, সে-শুধু অনভ্যাসের কষ্ট। বিছানা, গালিচা, গোলাম, বান্দী, মুজ্রানী— এর মধ্যে ইঠাৎ একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করা কী বিচিত্র?

হারুন : কোন অস্বোয়াস্তি দেখলে নাকি?

মোহাফেজ : হ্যাঁ জনাব। এই গোলাম কাউকে হুকুম দেয় না।

হারুন : রঙ হোক, তখন দেবে।

মোহাফেজ : নিচে গালিচার উপর শুয়ে থাকে।

হারুন : ও-সব ঠিক হয়ে যাবে। আহেস্তা-আহেস্তা।

মোহাফেজ : আমিৰুল মুমেনীন, মুজ্ৰানীরা ত বিৰক্ত হয়ে গেছে।

হাৰুন : কেন?

মোহাফেজ : ওরা বলে, এখানে বেকার হয়ে যাচ্ছি। আজ তিনদিন খানাপিনা নাচ-গান কিছু-ই হচ্ছে না।

হাৰুন : হচ্ছে না?

মোহাফেজ : না, জাঁহাপনা, হবে কি করে? আমি একদিন পাঁচজন মুজ্ৰানীকে জনাব তাতারীর কাছে পাঠালাম। সবাই নওজওয়ান। সকলকে ফেরৎ পাঠালে। বললে, যাও।

হাৰুন : আচ্ছা—।

মোহাফেজ : জাঁহাপনা, তা ছাড়া— আপনি এত কিছু দিয়েছেন— অন্য মানুষ হলে আনন্দে পাগল হয়ে যেত। এর সে-সব কিছু নেই। সব সময় গম্ভীর।

হাৰুন : সব সময়?

মোহাফেজ : হ্যাঁ, জাঁহাপনা। বাবুর্চিখানা ঠিক রাখে। একবার খেতে যায় মাত্র।

হাৰুন : একবার?

মোহাফেজ : হ্যাঁ, আলম্পানা। রাতে কিছু খায় না। অলিন্দে বসে আকাশের তারা দেখে আর চুপচাপ বসে থাকে।

হাৰুন : কোন গোলাম বেয়াদবি করছে না তত্ত্বের সঙ্গে?

মোহাফেজ : না, জাঁহাপনা। আপনার হুকুম— কোন শয়তানের বাচ্চা বরখেলাপ করবে?

হাৰুন : এই গোলাম হাসে না?

মোহাফেজ : জাঁহাপনা, জোরে হাসি তুসূরের কথা— গোস্তাখি মাফ করবেন, আমরা কেউ ওর দাঁতই দেখিনি না।

হাৰুন : হাসে না?

মোহাফেজ : না, জিল্লুল্লাহ্।

হাৰুন : হাসে না?

মোহাফেজ : না, জিল্লুল্লাহ্।

হাৰুন : হাসে না?

মোহাফেজ : না, জাঁহাপনা।

হাৰুন : একবার-ও না?

মোহাফেজ : না, জাঁহাপনা। আমি 'গীবৎ' পরনিন্দা করছি না। আপনি এই দোষে আমার গর্দান নিতে পারেন।

হাৰুন : আশ্চর্য। যাও, মোহাফেজ। তুমি খুব তরীবতের সঙ্গে ওকে রাখবে। যদি কোন ক্রটি কানে আসে, আমি সমস্ত গোলামদের সঙ্গে তোমাকেও কতল করব।

মোহাফেজ : আস্‌সামায়া তায়তান। আস্‌সালামো আলায়কুম ইয়া আমিৰুল মুমেনীন।

হাৰুন : মশ্ৰুর, মোহাফেজ যা বলে গেল, তোমার বিশ্বাস হয়?

মশ্ৰুর : বিশ্বাস হয় না, তবু বিশ্বাস করতে হয়, কারণ মোহাফেজ সাহেব ঈমানদার

কর্মচারী।

হারুন : আবু ইসহাক, তোমার বিশ্বাস হয়?

ইসহাক : হয়, জাঁহাপনা!

হারুন : কেন?

ইসহাক : হেকিমী দাওয়াই তৈরি করতে অনেক রকম উপাদান প্রয়োজন হয়। তেমনি হাসির জন্য বহু অনুপান দরকার। হাসি একটা জিনিস। কিন্তু হাসি তৈরি হয় নানা জিনিস দিয়ে; খাওয়া লাগে, পরা লাগে, আরাম লাগে, শিক্ষা লাগে, আরো বহু কিছু।

হারুন : নানা চিজ?

ইসহাক : হ্যাঁ, খলিফা নামাদার। তার একটা উপাদানের যদি অভাব ঘটে, আর হাসি তৈরী হবে না। ধরুন, সব আছে— নিরাপত্তা নেই। হাসি তৈরি হবে না।

হারুন : হবে না?

ইসহাক : না, জাঁহাপনা। আমার মনে হয়, অনেক উপাদান হয়ত আছে, কিন্তু কোন একটা উপাদানের অভাব ঘটেছে।

হারুন : তোমার কি ধারণা?

ইসহাক : বেয়াদবি মাফ করবেন ত, জাঁহাপনা?

হারুন : বেয়াদবি? এই কামরায় আমি আমিরুল মুমেনীন নই, তোমাদের বন্ধু। বেয়াদবির কোন প্রশ্ন ওঠে না।

ইসহাক : মেহেরজান কোথায়, আলহামদুলিল্লাহ?

হারুন : সে আর কারো 'জানে' মেহের (করণা) ঢালতে গেছে।

ইসহাক : তা ত উচিত নয়। মেহেরজান বিবাহিত স্ত্রী। আর কারো জন্যে সে হারাম।

হারুন : তোমার মতে হারাম। কিন্তু আরো-কারো মতে হারাম নয়।

ইসহাক : হারাম নয়?

হারুন : না।

ইসহাক : এমন ফতোয়া কেউ দিতে পারে?

হারুন : আলেম পারে। এই দ্যাখো, আলেম আবদুল কুদ্দুসের ফতোয়া। তিনি লিখছেন, মেহেরজান কেনা বাঁদী। মালিকের হুকুম ছাড়া তার কোন শাদী হতে পারে না। যদি হয়, তা না-জায়েজ (শাস্ত্রসিদ্ধ নয়)। মজকুর বাঁদী মেহেরজান ও গোলাম হাবসী তাতারীর শাদী না-জায়েজ। সই দেখেছ?

ইসহাক : দেখলাম, জাঁহাপনা। কিন্তু জনাব আবদুল কুদ্দুস এই ফতোয়া দিলেন?

হারুন : দেবেন না কেন?

ইসহাক : জাঁহাপনা, শাস্ত্রকে চোখ ঠারা যায়, কিন্তু বিবেককে চোখ ঠারা অত সহজ নয়।

হারুন : তুমি কি বলতে চাও?

ইসহাক : আবদুল কুদ্দুস আল্লার কালাম বিক্রি করেছেন।

হারুন : দুনিয়া ত কেনা-বেচার জায়গা। আর তিনি তোমার মত আহম্মক নন।

- ইস্হাক : কেন জাঁহাপনা?
- হারুন : এই বগ্দাদ শহরে তিন্ তিন্খানা আলীশান মাকান, ইমারৎ, বাগ-বাগিচা-
আর বছর বছর পাঁচ হাজার 'দীরহাম' যায় খাজাঞ্চীখানা থেকে। তিনি
এসব খোয়াতে যাবেন নাকি তোমার মত আক্কেল দেখাতে গিয়ে? আমি
কি দিই, তা-ও তিনি যেমন জানেন, আমি কি চাই তা-ও তিনি তেমন
বোঝেন। দোকানদার-খরিদারে এ-রকম সম্পর্ক না থাকলে কি দুনিয়া
চলে?
- ইস্হাক : কিন্তু, জাঁহাপনা—
- হারুন : আহ, ইস্হাক, তুমি বড় বক্ষ্যা হুজ্জতে এগোও। খোওয়াব-চারী কবি,
কিছুই বোঝ না। তুমি জানো, দীরহামের মোজেজা (অলৌকিক) শক্তি
আছে। দীরহাম অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।
- ইস্হাক : না, আলম্পানা।
- হারুন : দীরহামের তাকৎ অসম্ভব, অশেষ। তোমাকে বুঝিয়ে বলা যাক্। তুমি
কালো আঙুর পছন্দ করো, না সবুজ আঙুর?
- ইস্হাক : সবুজ আঙুর।
- হারুন : বেশ। সবুজ আঙুর না পেলো—
- ইস্হাক : কালো আঙুর খাই।
- হারুন : ধরো, বাজারে সবুজ আঙুর আছে কিন্তু দাম খুব চড়া। অত পয়সা তোমার
নেই। তখন?
- ইস্হাক : তখন কালো আঙুর কিনি।
- হারুন : কিন্তু মনে রেখো, হোমীর কাছে নয়, শুধু এমনিতোও কালো আঙুর সবুজ
আঙুর এক নয়। দুয়ের আশ্বাদ আলাদা। কিন্তু তোমার দীরহামের পরিমাপে
দুই-ই এক। দীরহামের কত কুওৎ, কত শক্তি বুঝতে পারছো।
- ইস্হাক : পাচ্ছি, জাঁহাপনা।
- হারুন : খোয়াব নিয়ে থাকো, তুমি সহজে এ-সব বুঝবে না। যাক সে ব্যাপার।
কথায় কথায় আমরা অনেক তফাৎ চলে এসেছি। গোলামের হাসি বন্ধ
হয়ে গেছে কেন?
- ইস্হাক : জাঁহাপনা, ও হয়ত আর হাসবেই না।
- হারুন : আবু ইস্হাক, তোমার জন্যেই আমার পাগ্লা-গারদ বানাতে হবে। গোলাম
আবার হাসবে না? দেখে নিও, দীরহাম কি করতে পারে। মশরুর, তুমি
সাক্ষী।
- ইস্হাক : জাঁহাপনা, যদি উপাদানের অভাব হয়?
- হারুন : তোমার ওসব বুট দর্শন, ইস্হাক। পরশু আমরা তিনজনে গোলামের
হাসি শুনতে যাব, কাল খবর পাঠাব। তোমার দাওয়াৎ রইল, আবু ইস্হাক।
মনে থাকে যেন, পরশু আমরা তিনজনে হাব্‌সী তাতারীর মেহমান।
- ইস্হাক : বহৎ খুব, জাঁহাপনা।

হারুন : মশরুর, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইসহাক আক্কলের তেজ হারিয়ে ফেলেছে।
 মশরুর : জাঁহাপনা, আমার তলওয়ারের তেজ কিন্তু বাড়ছে।
 হারুন : চলো, এখন ওঠা যাক।
 মশরুর : যো-হুকুম, আলম্পানা।

৯

কাল রাত্রি। বাগিচার কক্ষ। মোহাফেজ ও তাতারী।

—মোহাফেজ।

—জনাব।

—তুমি জানো চারদিন আগে আমি কি ছিলাম?

—জনাব, তা জানি বৈকি।

—কিন্তু তুমি কি ছিলে, তা জানো না। জানো?

—আপনি কি বলতে চান, জনাব?

—তোমার মত অনেকেই জানে না যে তারা কী। আমি গোলাম ছিলাম, খুব নীচুদরের গোলাম। কিন্তু তুমি-ও গোলাম, আমির্কল মুমেনীনের গোলাম। অবশ্যি উঁচুদরের গোলাম।

—তা সত্যি, জনাব।

—আজ চাকা ঘুরে গেছে। তুমি আমার চেয়ে অনেক নীচুদরের গোলাম। আমার-ও গোলাম।

—আলবৎ।

—কিন্তু আমি ভুলে যাই নি, আমি গোলাম ছিলাম।

—জনাব, তাতারী। আপনি বড় হক কথা বলেন।

—শোনো, মোহাফেজ। এসো হাতে হাত মেলাও। মনে রেখো, তুমি-ও যা, আমি-ও তা-ই।

—গুক্‌রিয়া, জনাব।

—কিন্তু বড় গোলামেরা ছোট গোলামদের মনে রাখে না। ছোট গোলাম বড় গোলাম হলে তার-ও সেই অবস্থা ঘটে। গোলামখানার এ এক মহা দস্তুর।

—আপনার কথা শুনতে বড় মিষ্টি লাগে।

—এখন শোনো, মোহাফেজ। বাইরে আমাদের যে-সম্বন্ধ আছে তা থাক। কিন্তু ভেতরে আমরা পরস্পরের মোহাফেজ— রক্ষক।

—গুক্‌রিয়া, জনাব।

—জেনে রেখো, আমি গোলাম গোলাম-ই আছি।

—না, না, জনাব।

—সত্যি। সত্যি বলছি। তুমি কি মনে করো, এই বাদী গোলাম মুজ্‌রানী ইমারৎ গালিচার মধ্যে খুব স্বোয়াস্তিতে আছি?

—কোন তকলীফ হচ্ছে, বলুন। নচেৎ আমির্কল মুমেনীন আমার গর্দান নিয়ে নেবেন।

—না, তোমার দোষ নয়। আমরা অর্থাৎ গোলামেরা নিজের যোগ্যতা আর মেহনৎ দিয়ে কোন জিনিস অর্জন না করলে, শ্বেয়াস্তি পাই না। যোগ্যতা, মেহনতের বাইরে থেকে হঠাৎ কিছু যদি আমাদের উপর ঝরে পড়ে, তাতে সুখ কোথায়? মগজ আর তাগদের জোরে কোন জিনিস না পেলে আমরা মজা পাই না। এই বাগাবাগিচা আমার মেহনতের ফল নয়।

—সত্যি হুজুর?

—হ্যাঁ, সত্যি। মনে রেখো, যোগ্যতা থেকে কোন চিজ না পেলে তা ঢিলে লেবাসের মত বেখাপ্পা-ই দেখায়। আর যোগ্যতা-মেহনৎ ব্যতিরেকে যারা পুরস্কার প্রার্থী— তারা ই হচ্ছে দুনিয়ার আসল গোলাম।

—জাঁহাপনা, আপনি উজীর মরহুম জাফর বারমেকীর মত আক্কেলমন্দ কথা বলেন।

—চুপ। জাফরের নাম তোমার মুখে শুনে খলিফা জিভ ছিঁড়ে ফেলবে।

—হুজুর আপনি, তাই বলছি।

—আমাকে জনাব-হুজুর সম্বোধনে ডাক দিও না। আমরা বন্ধু।

—আপনি যখন অভয় দিলেন—

—শোনো, তোমাকে আমার একটা খবর দিতে হবে।

—খবর?

—হ্যাঁ, খবর। তুমি কি বগ্দাদের সড়কে, কাফিখানায় ফরসুৎ-মত ঘোরাঘুরি কর না?

—তা করি বৈকি।

—তুমি তাহলে খবর যোগাড় করতে পারবে।

—কি খবর বলুন?

—কিন্তু, এ-খবর খোদা আমিরুল মুমেনীনের কাওসুল আক্দার প্রাসাদের খবর।

—জনাব, পাথরে, দেওয়ালে খবর আটকা থাকে না। যারা মহলে থাকে, তারা-ও মানুষ। চোখে দেখলে বা কানে শুনে মুখে না বলে পারে না। চোখের, কানের, মুখের একটা যোগসাজশ আছে।

—আছে?

—আছে বৈকি। বেগম খৈজুরান যে নিজের বড় ছেলে হাদীকে দাসী দিয়ে গলা টিপিয়ে মেরেছিল, তা কি করে জানাজানি হলো? খলিফা হাদী মারা গেলেন, তাই না হারুনর রশীদ খলিফা হলেন!

—তা-ই নাকি?

—আপনি জানেন না? বগ্দাদের সবাই জানে, আর আপনি জানেন না? যাকে জিজ্ঞেস করেন, সে-ই ঐ জবাব দেবে, কিছু জানে না। বড় মজার ব্যাপার।

—শোনো মোহাফেজ, যদিও মহলের খবর, কিন্তু খবর একটা তুচ্ছ ব্যক্তির।

—কে সে?

—বলছি। তুচ্ছ ব্যক্তি সে। বেগম জুবায়দার খাস-বাঁদী মেহেরজান। তারই খবর চাই।

—শাহী সড়কের এক কাফিখানায় আমি কাল সন্ধ্যায় বসেছিলাম। সেখানে খবর শুনলাম।

—কি খবর।

—আমার ত তেমন শোনার গা ছিল না। একজন আর একজনকে বলছে, মহলে নাকি এক রূপের তুফান এসেছে— এক আরমেনী বান্দী। খলিফা নাকি তাকে শাদীও করতে পারে।

—আর কি শুনলে?

—হুজুর, আমার কান তো বেশি ওদিকে যায় না, বয়স পঞ্চাশের উপর।

জওয়ান হলে এসব রসালো কথার দিকে মন যায়। কানও যায়।

—আজ তুমি বেড়াতে বেরিয়ে দ্যাখো যদি কোন খবর আনতে পারো।

—আচ্ছা, জনাব।

—আবার জনাব কেন? এসো, হাতে হাত মেলাও।

১০

বগ্দাদের সড়কে রাত্রি।

শহরের উপকণ্ঠে নির্জনতার রাজগী অনেক আগে শুরু হয়েছে। কিন্তু সরাইখানার আলো তখনও নেভে নি। আনন্দ-তালাসী পথিকজনের আনাগোনা কুচিং কানে আসে।

আব্ধা অন্ধকারে দুই ব্যক্তি হাঁটছিল। হঠাৎ একজন হেসে উঠল। অপর ব্যক্তি আর চুপ থাকতে পারে না। সেও সঙ্গীর পথ অনুসরণ করে।

—আবু নওয়াস।

—কি আবুল আতাহিয়া।

আতাহিয়া : তুমি হাসছো?

নওয়াস : হ্যাঁ, হাসছি।

আতাহিয়া : অবিশ্যি তোমার কবিতা পড়ে মনে হয়, তুমি সত্যি মনে মনে হাসতে পারো। আমাকে দিয়ে তা হয় না।

নওয়াস : তা আমি জানি, তুমি দুনিয়ায় শুধু কেয়ামৎ দ্যাখো।

আতাহিয়া : আর তুমি?

নওয়াস : বেহেশ্ত। এই দুনিয়াই আমার বেহেশ্ত।

আতাহিয়া : শরাব আর সাকী থাকতে, তোমাকে আর আল্লা হেদায়েৎ করবেন না।

নওয়াস : তোমাকে শয়তান পথ দেখায়।

আতাহিয়া : কেন?

নওয়াস : শয়তানের পথ মৃত্যুর পথ। জীবনের সড়ক আলাদা। তুমি শুধু মৃত্যুর কথাই বলো।

আতাহিয়া : তুমি ত মরুভূমির মধ্যে জীবনকে খুঁজছো।

নওয়াস : মোটেই না। আমার সেই কবিতা পড়ো নি, আতাহিয়া?

আতাহিয়া : কোন্ কবিতা নওয়াস?

নওয়াস : বলছি, শোন।

বেদুইনদের মাঝখানে বৃথা কর আনন্দ-সন্ধান ।
কিবা ভোগ করে তারা, যারা ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর লোক?
ধাক ওরা ওইখানে, বসে খুব উষ্ট্রদুগ্ধ খাক;
যারা কতু শেখেনিক সৃস্ম প্রাণ-উপভোগ ।

আতাহিয়া : একে বুঝি বলে মরুভূমিতে জীবন-সন্ধান?

নওয়াস : তুমি আজকাল আর্ষী ভুলে যাচ্ছ, আতাহিয়া । না, আমার কবিতা বুঝতে তোমার কষ্ট হয়?

আতাহিয়া : তার চেয়ে বলো না কেন আমি আমার ওয়ালেদের (বাপ) নাম ভুলে যাচ্ছি ।

নওয়াস : তবে ভুল তুমি করো । বুদ্ধি আর বোধি— আক্কেল আর উপভোগ, দুই-ই জীবনে দরকার । কারণ, ইন্দ্রিয়ের পথ আবার বোধির-ও পথ । যে-মুহূর্তে তুমি একটা বন্ধ করবে, অন্যটা-ও থেমে যাবে । তখন তুমি আর গোটা ইনসান— পূর্ণ মানব নও ।

সাকী, পানপাত্র ভরে দাও মদিরা ধারায়

অন্ধকারে কেন? এসো আলোর সভায় ।।

বিনা পানে নিরানন্দ শুষ্ক অভিশপ্ত ক্ষণ ।

মাতালের মত টলি— সেই ত অমূল্য জীবন ।।

আর আতাহিয়া, সেই জায়গায় তুমি কি লিখছো?

‘জাম’ ঘিরে বসিয়াছে যত সব মওজী ইনসান,

দুনিয়ার হাত থেকে কঁচি তারা মৃত্যু-মদ্য পান ।।

ছোঃ— এটা কি কবির কথা?

আতাহিয়া : শোন, নওয়াস । কবিতা তোমার চেয়ে খারাপ না লিখলেও কথায় পারব না ।

নওয়াস : ও কথা ছাড়ে । তুমি মেহুদীর বাঁদী উৎবা-র প্রেমে পড়েছিলে?

আতাহিয়া : পড়েছিলাম ।

নওয়াস : কেন?

আতাহিয়া : তা জানি নে ।

নওয়াস : তখন তুমি জীবনকে খুঁজেছিলে । প্রেমের পথ, ভোগের পথ, উপভোগের পথ, জীবনের পথ, সব এক জায়গায় বহু সর্পমিথুনের জড়া জড়ির মত । ওকে আলাদা করতে যেয়ো না, বন্ধু ।

আতাহিয়া : আজ অনেক খামর (শরাব) টেনেছো মনে হচ্ছে ।

নওয়াস : তা ত বটেই । শোনো, তোমাতে আমাতে তফাৎ কি জানো?

আতাহিয়া : কি তফাৎ?

নওয়াস : আমি আঙুর ফল খাই । আর তুমি? তুমি দ্রাক্ষালতা চিবোও । আর মনে মনে বলো, আঙুর যখন এমন মিষ্টি, দেখা যাক ওর আসল মাদ্দা বা

উৎসটা কেমন? একটু চিৰোই।

আতাহিয়া : নওয়াস, তুমি আজ বিলকুল শরাবী।

নওয়াস : আতাহিয়া, একটা গল্প শোনো।

আতাহিয়া : বলো।

নওয়াস : তখন আমি কুফা শহরে। এক বাঁদীর আশ্রমের জালে ধরা পড়ে গেলাম।

আতাহিয়া : তোমার মত পাকা মৎস্য?

নওয়াস : কথায় বাধা দিও না। প্রেমে আর খাদে বেশি তফাৎ নেই, পড়ে গেলাম। সব কথা তোমার শুনে দরকার নেই। যাক অনেক ঘোরাফেরা কান্নাকাটি আরজী মিনতি অগয়রহের পর আমার মহবুবা (দয়িত) ওলিদা-কে পেলাম। শোনো, ওর সদরিয়া (জামা বিশেষ) খুলে আমি ত বেহুঁশ হওয়ার উপক্রম। এমন সুগঠিত তীক্ষ্ণ বোঁটা স্তন আমি, খোদার কসম আর জীবনে দেখি নি। ছেলেরা কেতাব পড়ে তিন্কা দিয়ে অক্ষরের কাতার ঠিক রাখার জন্যে। এ ঠিক সেই তিন্কার মত। ভাবলাম, এটা হাতে থাকলে আমি আর জীবনে কাতারভ্রষ্ট হব না অর্থাৎ গোনার পথে অসৎ পথে পড়ব না। আল্লার মেহেরবানী, এমন তিন্কা জুটিয়ে দিয়েছেন, জীবনের কেতাব পড়তে আমার আর ভুল হবে না। আরো শোনো। সেই অবস্থায় আমি কোথায় তিন্কা হাতে গ্রহণ করব, তিন্কা, আমার মাথা ঝুঁকে গেল। আমি সীনার ঠিক নীচে নরম ত্বকের উপর ঠোট রাখলাম। লোকে পা চুম্বে, কদম-বুসী করে, আমি করে বুসলাম স্তন-বুসী, সীনা-বুসী,— যা বলো।

আতাহিয়া : হাহ্ হা, আবু নওয়াস। স্বপ্নহাবা! ইয়া আবু নওয়াস। আহ্লান সাহ্লান, ইয়া নওয়াস। মাইয়োকিলা আজিহিল কালাম ইল্লা আবু নওয়াস— আবু নওয়াস ছাড়া কে আর এমন কথা বলতে পারবে? হাহ্ হা হাহ্ হা...

নওয়াস : আহ্, আমার পিঠে এতো থাপড়চ্ছে কেন, আতাহিয়া? তোমার হাসি থামাও, নচেৎ এখনই তোমার আঁতড়ী বেরিয়ে পড়বে। আর এতো হেসো, না, এখনই আমি রুল মুমেনীন তা কিনে নেবেন।

আতাহিয়া : আহ্, আবু নওয়াস। আর একটু হেসে নিতে দাও। পেটে কুলুপ লেগে গেল।... আমি রুল মুমেনীন আজকাল হাসির সওদাগরি করেন না কি?

নওয়াস : তুমি জানো না?

আতাহিয়া : না।

নওয়াস : হাসির অনেক দাম। লাখ দীরহামের-ও বেশি।

আতাহিয়া : সত্যি?

নওয়াস : কাল তিনি তোমাকে আমার মারফৎ দাওয়াৎ দিয়েছেন। গোলামের হাসি শুন্তে যাবো। আবু ইস্হাক থাকবে। খানাপিনা গান বাজনা সব আছে।

আতাহিয়া : আলহামদোলিল্লাহ্।

নওয়াস : চলো, অনেক রাত হয়ে গেছে। সরাইখানা বন্ধ। সড়কে লোকজন কম। তার উপর অঙ্কার।

আতাহিয়া : তোমার ভয় কী? তোমার ত তিন্কা আছে।

দুই কবি হেসে উঠল জনশূন্য সড়কের উপর। প্রতিধ্বনি দূরে দূরে সহজে অস্তিত্ব হারায় না।

নিদ্রিত মহানগরী বগ্দাদ।

তার দুই কবি শুধু জেগে ছিল।

জীবনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কবিতা কি কখনও বিশ্রাম নিতে পারে?

১১

বেগম জুবায়দা, আপনার পাজর কি রিক্ত? নৈশ হাহাশ্বাসের মুখে দজলার উপরের দিকে চেয়ে, প্রতীক্ষার দুর্ভেদ্য অরণ্যে পদধ্বনি শুনে কোন লাভ নেই। বক্ষ-বক্ষ, সীনা-ব-সীনার সাধনা সন্ধ্যাসিনী জানে না। তাই তারা কৃচ্ছ আর আত্মনিগ্রহের জোয়ালে প্রতারিত যৌবনের আরশীতে বিবেকের প্রতিফলন দেখতে চায়। বিকৃত ইচ্ছা তাদের কাছেই আনন্দের মরীচিকা। গতিহীনতার দুর্গন্ধ, স্বর্গীয় সৌরভ মনে হয় নাসিকার নিঃসাড় সড়কে। মেহেরজান আপনার কাছে ফিরে আসবে না হৃদয়ে উত্তাপ দিতে। না-ই আসুক। আপনার তৃষ্ণার্ত দুই চোখ আত্মার সোপান গ'ড়ে তুলুক কল্পনায়। কল্পনা ত মিথ্যা হয়ে যায় না। মহাকাল তাকেই বরণ করে। নির্জনতা-বিহারী মেহেরজান, নাই বা এলো কোলাহলের জোয়ারের মত। বিশাল আকাশ। তাই ত নক্ষত্রেরা নিঃসঙ্গ। আপনার প্রাণের অসীমতায় শুধু দু'টি শুকতারা জেগে থাকে।

আদাব, বেগম সাহেবা।

১২

তাতারীর বাগিচা।

কার্পেট-শোভিত কক্ষ। বিশেষভাবে আজ আলোকসজ্জার পরিপাটি দেখা যায়। চার কোণে চারটি সামাদান জ্বলছে। উপরে ঝাড়-বাতি। তাকিয়া, গের্দা চারিদিকে সাজানো। কক্ষের দক্ষিণ দিকে সংলগ্ন একটি বারান্দা। এখানে তাতারী কক্ষের ভেতরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরিধানে পাজামা পিরহান।

বাগান থেকে ফুলের খোশবু এই কামরা পর্যন্ত ধাওয়া করে। তবু মাঝে মাঝে দ্রাক্ষারস-সৌরভের কাছে পেছিয়ে যেতে হয়। তিন-চারজন সাকী জাম্ ও পেয়ালা হাতে প্রতীক্ষমান।

হারুন : তাতারী!

তাতারী : আলম্পানা।

হারুন : ওখানে কেন? আজ আমরা তোমার মেহমান। এই দ্যাখো, কত শরীফ মানুষ এসেছে তোমার বাগিচায়। আবু নওয়াস, আবুল আতাহিয়া, আবু ইসহাক। এদের যেমন দরবারে তেমনি নিজের মাকানে পাওয়া নসীবের কথা। তুমি ভুলে যাও না কেন তুমি আর গোলাম নও। এসো, এসো।

তাতারী : জাঁহপনা...

হারুন : খানাপিনা যথেষ্ট হয়েছে। আবু নওয়াস আর মাটিতে পা ফেলবে না। কি বলো, আতাহিয়া?

আতাহিয়া : জাঁহাপনা, আবু নওয়াস সব সময় মাথায় হাঁটে। ও আর কখনই বা পা ব্যবহার করে?

হারুন : কিন্তু আজ কদম টলটলমান।

আতাহিয়া : জাঁহাপনা, গুর খোঁয়ারী এসে গেছে। এই নওয়াস!

নওয়াস : জী।

আতাহিয়া : ঘুমোচ্ছ কেন? হাসি শুনবে না?

নওয়াস : আতাহিয়া, তুমি আমার লেজ ছাড়া আর কিছু নও। কিন্তু দুম্বার লেজ বেজায় ভারী।

আতাহিয়া : আমিরুল মুমেনীন, আপনি সাক্ষী থাকুন। নিজের মুখে স্বীকার করেছে, আবু নওয়াস একটা দুম্বা।

নওয়াস : আতাহিয়া, হুজুরের সামনে বেয়াদবি করো না। তুমি তা হলে মেনে নিচ্ছে, তুমি একটা লেজ।

আতাহিয়া : তুমি দুম্বা হলে, আমার লেজ হতে আপত্তি নেই।

নওয়াস : দু...ম্...বা... লেজ। দুম্বা লেজ।

আতাহিয়া : আবু নওয়াস, তোমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

হারুন : থামো দুই জনে। তোমাদের কবিদের সঙ্গ মাঝে মাঝে আমাকে ভয়ানক বিরক্ত করে তোলে। খালি কথা আর কথা। তাতারী, এরা এসেছে তোমার হাসি শুনতে। একবার সেই হাসি— বিশ্বজয়ী হাসি— শুনিয়ে দাও ত। এই নওয়াস...

নওয়াস : জাঁহাপনা।

হারুন : চোখ খোলো।

নওয়াস : আস্‌সামোয়ো তায়তান।

হারুন : হ্যাঁ, তাতারী, তোমার হাসি শুনিয়ে দাও। কী...? এখানে লজ্জা পাচ্ছে। ঐ বারান্দায় গিয়েই হাসি শুনিয়ে দাও।

তাতারী : জাঁহাপনা।

হারুন : কী বলো।

তাতারী : হাসতে পারছি না, আমিরুল মুমেনীন।

হারুন : তুমি কি আবু নওয়াসের মত পানিতে ডুবে আছো?

তাতারী : না, জাঁহাপনা। আপনি দেখেছেন, ও পানি আমি স্পর্শ করি না।

হারুন : তবে হাসবে না'যে।

তাতারী : আলম্পানা, হাসি আসছে না।

হারুন : আবু ইসহাক, একে হাসির দাওয়াই দাও।

ইসহাক : জাঁহাপনা, ও এখনি হাসবে। এ-ই হাসো ত হে।

তাতারী : হাসতে পারছি না, জনাব আবু ইসহাক।

হারুন : আমি খোদ আমিরুল মুমেনীন হুকুম দিচ্ছি, তুমি হাসো। তোমার হাসি আমরা শুনতে চাই। হাসি শোনার জন্যে এদের ডেকে এনেছি। বেইজ্জৎ হব?

সময়ের ভারের কাছে হিমালয় পরাজয় স্বীকার করে। এখানে মহাজাল স্বয়ং অনড়। সকলের নিঃশ্বাস ভারী। কামরায় সকলে নিস্তব্ধ। সকলের দৃষ্টি একজনের দুই ঠোঁটের উপর নিবদ্ধ। কাল হয়তো এখানেই থেমে থাকত, যদি না হারুনের রশীদ হঠাৎ গর্জে উঠতেন।

হারুন : হাসো।... কি এখনও হাসছে না?

তাতারী : জাঁহাপনা।

হারুন : আমাকে বহু মানুষ জাঁহাপনা বলে, তোমার কাছ থেকে ও ডাক শুনতে চাই না। আমি শুনতে চাই হাসি।

তাতারী : জাঁহাপনা...

হারুন : বুঝেছি। তুমি হাসবে না। তুমি আমাকে বন্ধুদের সামনে বেইজ্জৎ করতে চাও। মশরুর...

মশরুর : জাঁহাপনা, এই নাফরমান বান্দার গর্দান এখনই দু-টুকরা করি।

আতাহিয়া : জাঁহাপনা...

হারুন : কি আবুল আতাহিয়া, তুমি আবার কি বলতে চাও।

আতাহিয়া : জিল্লুরাহ্ এখনই ওর সাজা দেবেন না।

হারুন : কেন?

আতাহিয়া : আলম্পানা, কারণ— এত খাদ্যাদি আবার গান-বাজনা আর হাসির পর, একদা-গোলামের হাসি শুনলেও চলবে।

হারুন : আতাহিয়া, তুমি চুপ করে। মশরুর—

মশরুর : জাঁহাপনা—

হারুন : তলওয়ার খোলো। দেরী করছ কেন?

নওয়াস : আলম্পানা, আলম্পানা... আমি কবি আপনি জানেন। নাফরমানের গর্দান নেওয়া উচিত। কিন্তু এর অপরাধ কতটুকু বিচার করে দেখা হোক। ও হাসছে না। কিন্তু হাসির জন্য ওয়াক্ত লাগে, যেমন নামাজের জন্য প্রয়োজন হয়।

হারুন : আবু নওয়াস, তোমার কবিত্বের খোঁচা এখন গাছে বুলিয়ে রাখো। ওয়াক্ত লাগে? সময় লাগে?

আতাহিয়া : হাঁ, জাঁহাপনা। সব সময় হাসি আসে না।

নওয়াস : আমি ত আপনাকে, নুরুদ্দাহ্ আগেই বলেছি, উপাদান লাগে।

হারুন : আবু নওয়াস, তুমি হুঁশে আছো তা হলে।

নওয়াস : আলম্পানা, হুঁশে থাকার জন্যই আমি বেহুঁশ হই। আল্ খামারো লী কামারান্। সুরা আমার কাছে আকাশের চাঁদ।

হারুন : কি বলতে চাও তুমি, আবু নওয়াস? সাফ-সাফ বলো।

নওয়াস : আস্সামায়ো তায়তান। হুজুর দুনিয়ায় কত দাস্তাহাজামা, খুন-খারাবি, ঝগড়া-

কোন্দাল, লোভ মোহ মাৎসর্য। এ সব কি দেখা যায় চোখে? বেহুঁশ থাকাই লাভ। আমার ওই হুঁশ আছে বলেই আমি বেহুঁশ থাকতে চাই। আর যাদের সে হুঁশ নেই অর্থাৎ যারা বেহুঁশ— তারা হুঁশে থাকে, আর যারা হুঁশে থাকে তারা বেহুঁশ। দুনিয়ার তাবৎ লড়াইবাজ্ দাঙ্গাবাজ্ ফেরেক্বাজ্ আওরৎবাজ্ ঘোড়াবাজ্ মরদবাজ্ নিজেদের ভয়ানক হুঁশিয়ার মনে করে।

হারুন : নওয়াস, তুমি যে কী বলছ, আমার ও বোঝার সাধ্য নেই। মরদবাজ্ আবার কি? আরগুলো খোড়াবহুৎ বুঝি।

নওয়াস : আলম্পানা, সেই লুৎ-আলয়হেস্ সালামের জমানায়—

[সকলে : হা-হ হা-হ হা। হা হ হা হ হা হ]

হারুন : আবুল আতাহিয়া, তোমাদের মত কবি এবং বাদক সঙ্গে থাকলে আর খেলাফৎ চলবে না। মশ্‌রুর, তোমার তলওয়ার নামাও। কিন্তু মনে রেখো, তাতারী তোমাকে যা দিয়েছি, তা আর কেউ পেলে আবার আমার গোলাম হতে চাইত। এত বাগ্‌বাগিচা বান্দী গোলাম ধনদৌলত। খবরদার আর নেমকহারামির অপবাদ নিজের মাথায় ঢালবে না। আজ তোমাকে মাফ করলাম। কয়েকদিন পর আবার আসছি, তোমার হাসি আমরা শুনব। মনে রেখো...

১৩

কাল রাত্রি। মজ্‌কুর জায়গা পরিচিত বাগিচা। ঘুড়ুর আওয়াজ শোনা গেল। অনেকক্ষণ। হয়ত কয়েক শতাব্দী। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে সময়ের পাখনা ছিড়ে যায়। শতাব্দী মুহূর্তের মধ্যে গুহায়িত হয়।

ঘুড়ুর আওয়াজ থেমে গেল। তারপর রুম্‌বুম্‌ রিনিঠিনি রব ওঠে। সে শুধু পা ফেলার অনুষ্‌ঙ্গ হিসেবে। যে-পায়ে ঘুড়ুর এতক্ষণ মুখর ছিল, সেই যুগল চরণ এখন হাঁটার কাজে নিয়োজিত।

রুম্‌বুম্‌... রুম্‌বুম্‌...রিনিঠিনি...হঠাৎ সেই শব্দও নির্বাপিত।

তাতারী হঠাৎ চকিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলে, “তুমি কে... তুমি কে? কে তোমাকে এখানে পাঠালে?”

— জনাব তাতারী, বান্দীকে মাফ করবেন। আমার নাম বুসায়না। আমাকে আমির্‌রুল মুমেনীন পাঠিয়েছেন।

তাতারী : তুমি কে?

বুসায়না : আমার নাম বগ্দাদে জানে না, এমন ইন্‌সান ত কম আছে। আমি রোক্তাসা (নর্তকী) বুসায়না।

তাতারী : কি চাও?

বুসায়না : খলিফার হুকুম, আমি যেন আপনার খেদমৎ করতে পারি।

তাতারী : বুসায়না, খেদমতের জন্যে এখানে বান্দা-বান্দী আছে।

- বুসায়না : কিন্তু তারা আপনাকে আনন্দ দিতে পারে না। আপনার মুখের হাসি কে যেন কেড়ে নিয়েছে। আমি এসেছি আপনার মুখে হাসি ফিরিয়ে দিতে।
- তাতারী : বুসায়না, তাই কী তোমার এই লেবাস?
- বুসায়না : কি দেখলেন, জনাব?
- তাতারী : লেবাস দেহ-আবরণের জন্য। তোমার লেবাস দেহ উলঙ্গার্থে। এর সাহায্যে তুমি আমাকে আনন্দ দেবে?
- বুসায়না : জনাব, রোক্তাসা আপনাকে জাগিয়ে তুলবে।
- তাতারী : তার চেয়ে তুমি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে যাও বুসায়না, তোমার মেহেরবানী কোনদিন ভুলতে পারব না। আমার চোখে ঘুম নেই। ঘুমের ঘোরে থাকি। কিন্তু শিরা-উপশিরা বিশ্রাম নিতে পারে না। কণ্টক-মুকুট মাথায় হজরত ঈসা, যীশুখ্রীষ্ট অমর। আমার কণ্টক-শয্যা আমাকে কি দেবে?
- বুসায়না : খলিফা সেই জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার কালো ঠোঁট বর্ষার কালো মেঘের মত। ও তে চুম্বনের বিদ্যুৎ-ই শুধু শোভা পায়।
- তাতারী : না। সরে যাও, বুসায়না। তুমি আমাকে বেইজ্ঞ করতে এগিয়ো না।
- বুসায়না : বান্দীর গোনা মাফ করবেন, জনাব।
- তাতারী : তুমি আমার পাশ থেকে সরে ঐ দিওয়ানে বসো।
- বুসায়না : কেন?
- তাতারী : তুমি আমাকে আনন্দ দিতে পারবে না।
- বুসায়না : সমস্ত বগদাদ শহরে বুসায়নার পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতে প্রস্তুত। আর আপনার মুখে এই কথা।
- তাতারী : আনন্দের উপকরণ আমার কাছে নেই।
- বুসায়না : কেন নেই?
- তাতারী : মানবীর যৌবনই কি যথেষ্ট? তাহলে জননী-রূপে সে কিরূপে মর্যাদা পায়? ও কি! তোমার সদরিয়া খুলে ফেলছ কেন? জানো, জননীর খোলা স্তন বহুদিন আমি পান করেছি। বুঝলাম, তোমার তূণে আদিম কয়েকটা শর আছে মাত্র।
- বুসায়না : জনাব, এগিয়ে আসুন। নতজানু এক নারী আপনাকে আহ্বান দিচ্ছে। আমার এই যৌবন- কে আপনি বেইজ্ঞাৎ করবেন না।
- তাতারী : বুসায়না, তুমি ত মোড়-জানু। অঙ্গসঙ্কীর্ণণে আনন্দ-আহরণ আমার কাছে অজ্ঞাত কিছু নয়— জন্তুদের কাছেও না। আমি মানুষ। আমার মন প্রয়োজন হয়!
- বুসায়না : সে-মন এখন প্রয়োজন নয় কেন?
- তাতারী : বুসায়না, সময়-ও মানুষের সৃষ্টি। মানুষ আছে বলেই সময় আছে। সময়ের-ও প্রয়োজন হয়।
- বুসায়না : সে-সময় এখন নয়?
- তাতারী : না। তোমার খোলা বুক ওড়নায় ঢাকো। নারীর বিবসনা হওয়ার প্রয়োজন

আছে। কিন্তু সে কেবল প্রেমে। নারীর নির্লজ্জ হওয়ার অধিকার আছে; তা-ও শুধু প্রেমে। একটি মানুষ যার সন্নিধ্যে তার অস্তিত্ব অর্থহীন হয়— তেমন মানুষের জন্যে। জমিন-দরদী দেহকান (চাষী) যেমন নহরের পানি নিজের জমির জন্য বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখে, প্রেমিক-নারী তেমনই সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ একটি হৃদয়ের জন্য সঞ্চিত রাখে। তোমার দেহের দিকে তাকাও। ও ত সওদাগরের দোকান, লেবাস আর জেওরে (অলঙ্কার) ঠাসা। দীরহাম দিলেই পাওয়া যায়। নারীর মূল্য অত সস্তা নয়। যে নারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব-জাতির শিশু-কে পৃথিবীতে আমন্ত্রণ দিয়ে আনে, যে নারী শাস্ত্রত মানবতার জননী— বসুন্ধরার অনন্ত অঙ্গীকার, সে অত সস্তা হয় না, বুসায়না। তুমি ভুল ঠিকানায় এসেছো। যারা তোমাকে পাঠিয়েছে, তারাও পৃথিবীর ঠিকানা জানে না।

- বুসায়না : আমাকে আপনি বেইজ্জৎ করবেন না।
- তাতারী : না বুসায়না। প্রতিদিন কিছু দীরহাম হুঁড়ে ফেলে, যারা তোমাকে বেইজ্জৎ করে আমি তাদের মত তোমাদের অসম্মান করতে শিখিনি। আমি গোলাম। দীরহাম দিয়ে সব কিছু কেনার পাগলামি থেকে অন্তত আল্লা আমাকে রেহাই দিয়েছেন।
- বুসায়না : না, জনাব। আপনি গোলাম নন! অতীতের কথা ভুলে যান। আপনি আমাকে ইজ্জৎ-আব্বুই দিয়েছেন। কিন্তু তার বদৌলত...
- তাতারী : কাঁদছো কেন, বুসায়না। ক্যান্টো চোখের পানি— আর সে পানি যদি শিশু কি আওরতের হয়, আমি সহ্য করতে পারি না। কাঁদছো কেন?
- বুসায়না : জনাব...
- তাতারী : কি বলো।
- বুসায়না : জনাব, বুসায়নার পায়ের তলায় বগ্দাদের আমির-ওমরাদের ফরজন্দরা কত চোখের পানি ফেলে যায়। দরবারের ষড়যন্ত্র, ঈর্ষা, দব্দবা, লোভে-থকা, বিবি-ক্লান্ত কত আমির রঈস বুসায়নার পয়জারে হাঁফ ছাড়তে আসে— সেই রোক্তাসা আজ কাঁদছি না, হাসছি।
- তাতারী : কিন্তু হাসি তোমাকে প্রতারণা করছে।
- বুসায়না : কাঁদছি। হ্যাঁ, কাঁদছি। কারণ এই বয়সে ধন-দৌলতের আলবুরুজ পাহাড়ে উঠে, কেউ মৃত্যু চোখে দেখতে চায় না।
- তাতারী : মৃত্যু?
- বুসায়না : হ্যাঁ, মৃত্যু। কাল ফজরে, আপনার বাগিচায় আমি কতল হয়ে যাব। মশরুরের তলওয়ারের তেজ একটি নারীর হল্কুম (গ্রীবা) ছেদে অপারগ তা উন্মাদও বিশ্বাস করবে না।
- তাতারী : কিন্তু মশরুর তোমাকে কতল করবে কেন?
- বুসায়না : খলিফার হুকুম। আমিরুল মুমেনীন বলেছেন, আমি যদি আপনার খেদমত করতে না পারি, ফজরে আমার গর্দান যাবে।

- তাতারী : তুমি এই বাজি ধরলে কেন?
- বুসায়না : আত্মবিশ্বাস ছিল। সমস্ত বগ্দাদ আজ লোভের দরিয়া। এখানে কে গুচ্ছ থাকতে পারে? শানশওক্ত, দব্দবা তারই শিকার সমস্ত মানুষ। তারা কোনদিন মানুষ ছিল ভুলে গেছে। আমি ত বগ্দাদের বাসিন্দা। আমি আর নতুন কি হবো? তাই আত্মবিশ্বাস ছিল। আর থাকবে না বা কেন? কত আমির-ওমর দেখলাম। কাঁচা দীরহাম আর কাঁচা গোশতের খরিদদার। কতজনকে ফতে করলাম। তার জন্য ইলেম লাগে না, সাধনা লাগে না— একটু হাসি, একটু লেবাস এদিক-ওদিক। ধন-দৌলত বিনা মেহনতে আসে। এখানেও বিনা মেহনৎ। শুধু জয় আর জয়। বাজি ধরেছিলাম। হেরে গেছি। কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) দেব বৈকি। আর কাঁদব না।
- তাতারী : কিন্তু আমি তোমাকে মরতে দেব না।
- বুসায়না : কেন?
- তাতারী : তুমি মহিয়সী নারী। হয়ত বাঁচার খাতিরে বগ্দাদের ঐ দরিয়ায় ডুব দিয়েছিলে। কিন্তু সামান্য ভাসমান কাঠের টুকরো দেখে তুমি মাটির মানুষ, ডাঙায় ওঠার চেষ্টা পাচ্ছে। তোমাকে মরতে দেওয়া পাপ।
- বুসায়না : কিন্তু কে আমাকে বাঁচাবে? আপনাকে আর বেইজ্ঞ করতে পারব না।
- তাতারী : সেইজন্যেই ত সোজা উপায় পেয়ে গেছি।
- বুসায়না : সোজা?
- তাতারী : হ্যাঁ, বুসায়না, তুমিও আমার মতো আত্মার ব্যাধিগ্রস্ত। ঐ দেওয়ালে তলওয়ার লট্কানো— আমাকে কুণ্ডল করো। এ জায়গা আমার কাছে অসহ্য, শ্বাসরোধী।
- বুসায়না : তাহলে পালিয়ে যান না কেন? আপনি ত গোলাম নন।
- তাতারী : বাহ্ হা, বুসায়না। এই ধন-দৌলত দেখে সেই রাতে ভুলে ছিলাম। পরে সব বুঝে ভাবলাম পালাই! বাদ মগ্গরেব শহরের ফটক থেকে বেরুতে যাব, দেখলাম শাস্ত্রী। বল্লে, এই শহরের বাইরে যেতে পারবেন না। খলিফার হুকুম। আমি কেমন স্বাধীন, বুঝেছো বুসায়না? এই বান্দী বান্দা মুজ্রানী ইমারতের মধ্যে আমি স্বাধীন। একটা মোরগকে কতগুলো মুরগীর সঙ্গে খুল্লার মধ্যে রেখে দেওয়ার মত। তোমার মেহেরবানী আমি কেয়ামত তক্, রোজ হাশরের দিন পর্যন্ত ভুলতে পারব না। আমাকে কতল করো। এই নাও তলওয়ার।
- বুসায়না : না বেরাদর, আপনাকে মরতে দিতে পারব না। বগ্দাদের সাহারার মধ্যে এই একটি ওয়েসীস আমি পেয়েছি, তা নাস্তানাবুদ করতে পারব না।
- তাতারী : তবে?
- বুসায়না : সব মাথায় পেতে নেব। কত কালিমা ত সারা জীবন বইলাম। খুনেই তা সাফ হতে পারে। আসুক মশ্রুর, তার জন্য অপেক্ষা করব।
- তাতারী : না বুসায়না। জীবন অনেক মূল্যবান। তা-ই আত্মহত্যা করি নি। আত্মহত্যা

ভীকু বুজ্জীলের কাজ। মানুষ জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। সে পিছু হটে না। জন্তরা যেমন লেজ গুটিয়ে পালায়, তেমন পালায় না। কিন্তু বুসায়না, তোমার আত্মার সন্ধান আমি পেয়েছি। তুমি এখান থেকে যেয়ো না। আমি কাল ফজরে জবাব দেব, হয়ত মুখ হাসিশূন্য, কিন্তু জবাব দেব আমি। মশ্‌রুর...। একি, বুসায়না কোথায় গেল?... মোহাফেজ... মোহাফেজ...

তাতারী : বুসায়না কোথায় গেল?

মোহাফেজ : এই ত এখানে ছিল।

তাতারী : দ্যাখো, কোথায় গেল। ওর পায়ে ঘুঙুর আছে। যেখানে যাবে, বাজবে।

মোহাফেজ : ঘুঙুর? ঐ ত পড়ে আছে গালিচার উপর।

তাতারী : কখন খুললে, আশ্চর্য! যাও, ওর খোঁজ করে আমার কাছে নিয়ে এসো।

মোহাফেজ : যো হকুম, হজুর।

১৪

সরাইখানায় তারা গজল শুনছিল।

কত দূর থেকে আসে লু-হাওয়ায় তীর
সে কি তোমার নিঃশ্বাস সাক্ষী,
আমার কদমে জিজির
কত আমার তোমার উমেদার
এ দীল সংগেসির, বেকারার
সুমসাম রাতে আহাজারী সার,
পাথরে কুটা ফুটা শির।
আমার কদমে জিজির।।

রুবায়ের আওয়াজ শুধু এই স্বরে বিষণ্ণতার আমেজ ছুঁয়ে যায়। বগ্দাদের সরাইখানার অঙ্ককার। গায়ক হয়ত আদেশ দিয়েছিল আলো নিভিয়ে দিতে।

গজল অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। যেন আজ আর শেষ হবে না। শ্রোতার বৃন্দ। বিরহীর আত্ননাদ সকলের বুকে জারিয়ে গেছে। এখানে সবাই প্রেমিক। ঝাপসা অঙ্ককারে শুধু বহু মানুষের আন্দাজ পাওয়া যায়।

হঠাৎ একজন হো হো শব্দে চতুর্দিক সচকিত করে হেসে উঠল।

আসরে ফাটল দেখা দেয়, তাই বহু শ্রোতাই বিরক্ত!

সত্যি গায়কের গজল খেমে গেল পরিবেশ মোতাবেক। তার কণ্ঠ থেকে আর রাগ বেরোয় না— যা রাগিণীর পুরুষ রূপ। গোস্বাধৃত তার গলার আওয়াজ।

—আবুল আতাহিয়া, বেয়াদবের মত হাসছে কেন?

—আবু নওয়াস, মাথায় জম্জমের ঠাণ্ডা পানি ঢালো।

নওয়াস : এমন গজলটা ধরেছিলাম। সব জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলে।

- আতাহিয়া : তার মালিক তো স্রেফ আল্লা । আমি তো বান্দা ।
- নওয়াস : তোমার এমন আক্কেল বলেই তো তেমি কবিতা লেখো ।
- আতাহিয়া : তোমার আক্কেল আছে, স্মৃতিশক্তি আছে?
- নওয়াস : আল্লা মাথার খুলিটা এখনও শূন্য করে নেন নি ।
- আতাহিয়া : নিয়েছে । টের পাও নি ।
- নওয়াস : দ্যাখো, এখনই লড়াই বেধে যাবে ।
- আতাহিয়া : তাতো বাধবেই । নাদানকে নাদান বললেই, তার গলা থেকে গান বেরোয় না ।
- নওয়াস : আমি নাদান?
- আতাহিয়া : প্রায় । পুরো নয় । সেদিন যে বল্লে, তুমি জীবনের কবি, জীবনের গান গাও; আর আমি মৃত্যুর কবি, নিরাশাবাদী অগয়রহ । আরো কি কি বল্লে । আজ তুমি কি গজল গাইছ?
- নওয়াস : উঃ, আবুল আতাহিয়া । তোমার মাথার খুলিটা হেকিমকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নাও । ওটা খালি হয়ে গেছে, টের পাও নি ।
- আতাহিয়া : এই বুঝি জীবনের গান?
- নওয়াস : বিরহে দুঃখ আছে । দুঃখ কি জীবনে আসে না? এতে জীবন-বহির্ভূত কি দেখলে?
- আতাহিয়া : মৃত্যু কি জীবনে আসে না?
- নওয়াস : আসে । সে একবার মাত্র । তুমি নিয়ে হাজার বার নাকী কান্না কাঁদতে হবে না কি, তুমি যা করো?
- আতাহিয়া : নওয়াস, দুঃখের গান গাওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে । আজ তুমি যে-বিরহের গান গাইলে এমন মজা আর কোনদিন পাইনি । তোমার কবিতা ফিকে লাগে এর কাছে ।
- নওয়াস : আবুল আতাহিয়া, তুল করো না । দুঃখ আর মৃত্যু এক জিনিস নয় । দুঃখের গান গাই দুঃখকে দূর করার জন্যে, দুঃখের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারব, তার জন্যে । যারা এই জীবন জীইয়ে তুলতে পারে না, তারা কবিতা লেখে শকুনদের জন্যে । পারশীরা শকুনের কাছে যেমন মড়া ফেলে দেয়, ওই কবিরা তেমন কবিতা ছুঁড়ে দেয় পাঠকদের জন্যে । আজান দিয়ে মুসল্লি ডাকে, তুমি কবিতা দিয়ে মানুষ ডাকার বন্দোবস্ত করো । তুমি—
- আতাহিয়া : থামো, থামো । এলাম দু-দণ্ড মওজ করতে, তুমি কি যে কচ্ কচ্ শুরু করে দিলে । তৌবাস্তগ্ফেরুল্লা ।
- নওয়াস : শয়তান তোমার কাছাকাছি থাকে কি না, তাই তোমার বার বার আস্তাগ্ফেরুল্লা পড়তে হয় ।
- আতাহিয়া : হাহ্ হা, আমি তো শয়তানের কাছেই বসে আছি, ঠিক বলেছে ।
- নওয়াস : শয়তানই বিশ্বসৃষ্টির আগে প্রথম ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োগসাধন করেছিল । সেই যুক্তিই মানুষের সভ্যতার উন্নতির অন্যতম বড় উপাদান । মনে রেখো আবুল

- আতাহিয়া : মাঝে মাঝে শয়তানেই হয়তো আসল মনুষ্যত্বের সূচনা ঘটে।
- আতাহিয়া : শয়তানের যুক্তি দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।
- নওয়াস : আতাহিয়া, যুক্তির পেছনে কি থাকে জানো?
- আতাহিয়া : না।
- নওয়াস : তা তোমার জানার কথা নয়। যুক্তির পেছনে থাকে মুক্তির স্বপ্ন। এই মুক্তির স্বপ্নই মানুষকে মানুষ বানায়। আমি তাই দুনিয়ার তামাসা ভাল করে দেখি।
- আতাহিয়া : নওয়াস, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা দায়। কারণ, চোর আর ছেনাল কারচুপিতে খুব দড়।
- নওয়াস : আতাহিয়া, আজ কষে গালাগাল দাও। আমি আজ মওজে আছি। আমার আর এক মজলিশ বাকী আছে।
- আতাহিয়া : তোমার সঙ্গে আজ রাত কাটাচ্ছি না।
- নওয়াস : নীরস তুমি। মওজ দেখলে তোমার দীল বাতাসে কাঁপে। কিন্তু বন্ধু, জীবনকে খুঁজে পেতে হাটে হাটে ঘুরতে হয়।
- আতাহিয়া : কিন্তু তুমি যে শুধু রূপের হাটে ঘুরে বেড়াও।
- নওয়াস : রূপের হাট-ই আসল হাট। মানুষ যদি তা না আবিষ্কার করত, এই দুনিয়ার বাঁচার আর কোন মজা থাকত না। ফুল তো বনে ফোটে। কিন্তু তাকে আমরা সাজিয়ে ফোটাতে চাই। তাই বাগান করি। রূপের নেশা থেকেই কাজের উৎপত্তি অথবা কাজ থেকে রূপের নেশার উৎপত্তি... আর কাজই সমস্ত সংসারকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার মত নিকুম্মারা আকাশের দিকে তাকায়। কাজের আর রূপে মিতালি পাতিয়েই তো ইনসান এগোচ্ছে। যখন আর ওই দুই খোঁট একত্রে মেলাতে পারে না, তখনই মানুষ হয় ইবলিশ। মুনাফেকীর (ভণ্ডামি) জন্ম সেইখানে।
- আতাহিয়া : কিন্তু নওয়াস, জাহেলী (অজ্ঞতা) থেকেও তো মুনাফেকীর জন্ম হতে পারে।
- নওয়াস : তা হয়। কিন্তু জাহেলী তো একটা তাসীর (ফল)। তুমি কেমন মা-বাপ-ইয়ার-দোস্ত-মুল্লুকে মানুষ, তার উপরও অনেকটা নির্ভর করে।
- আতাহিয়া : কিন্তু এ আমরা কোথায় যাচ্ছি?
- নওয়াস : কেন?
- আতাহিয়া : এলাম, দু-দণ্ড মওজ করব। তুমি পান করবে, আমি গান শুনব। সে জায়গায় এসব কি শুরু করলে?
- নওয়াস : রুহ সাফা (আত্ম-পরিষ্কার) পানি ত তোমার জঠরে যায় না, তাই আমার জায়গাটা তোমার ঠিকানা-মত নয়।
- আতাহিয়া : না, ইয়ার। আবার গজল গাও।
- নওয়াস : কিন্তু গজল আর জমবে না।
- আতাহিয়া : কেন?
- নওয়াস : কল্পনার বোরারকে (শর্গীয় বাহন) চড়ে, তুমি দুনিয়ার তাবৎ সুলতানার

(রানী) সঙ্গে ‘জেনা’ ব্যভিচার করতে পারো, আর এ খাহেশও স্বাভাবিক ।
কিন্তু মাটির উপর পড়লে, বিবিরও মত নিতে হয় ।

আতাহিয়া : লা-হাওয়া, লা-হাওয়া । বাঁচাও প্রভু শয়তান থেকে ।

নওয়াস : সত্যি ।

আতাহিয়া : কিন্তু আমি বলছি, তোমার কল্পনা যদি ভেঙে থাকে, জোড়া দাও ।

নওয়াস : তা আর সম্ভব নয় । দ্যাখো আবুল আতাহিয়া, তুমি আর যাই করো আমার সঙ্গে বাজি ধরো না । খোদা আমিরুল মুমেনীন আমার সঙ্গে বাজি ধরে প্রায় হারতে বসছেন ।

আতাহিয়া : তোমার সঙ্গে বাজি?

নওয়াস : তারই ফয়সালা আছে কাল । পরে সব শুনবে । আজ থাক্, চলো ওঠা যাক্ ।

আতাহিয়া : আবু নওয়াস, বগদাদ তোমাকে চেনে না, তাই তোমার এত বদনাম ।

নওয়াস : বন্ধু মহাপুরুষদের অনেক দেরীতে চেনা যায় । চল্লিশ বৎসর লেগে গিয়েছিল হয়রত মুহাম্মদ (দঃ) কে জানতে । তাই বলে আমি একটা বিশেষ কিছু... তা মনে করো না । এক দেশে বাদশার নাম ছিল হবু । মন্তীর নাম ছিল গুব । মহাপুরুষেরা নবুয়ৎ (নবীত্ব) পায়, আমি এবার গবুয়ৎ পেয়ে যাব ।

আতাহিয়া : হা-হা-হা, আবু নওয়াস । তোমাকে ঠিকমত বুঝি না, তবু বুক বুক মিলাতে ইচ্ছা করে ।

নওয়াস : খবরদার । এর নাম বুৎ-পরস্তি — প্রতীমা পূজা । ও মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায় । অর্থাৎ ধ্বংসের স্তূপে । বুঝবে, তবে বুক বুক মিলাবে । সব জিনিস তুমি যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করবে, নচেৎ তুমিও বুৎ-পরস্ত (প্রতীমা পূজক) — সে তুমি মুসলমানই হও আর ইহুদীই হও । না, আর কথা না । ওহে সরাইওয়াল! তোমার শরাবের দাম কাল নিও ।

সরাইওয়াল : আচ্ছা জনাব । আস্‌সালামো আলায়কুম ।

উভয়ে : ওআলায়কুম আস্‌সালাম ।

১৫

বেগম জুবায়দা দাঁড়িয়েছিলেন, যেখান থেকে একদিন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল মেহেরজান । বাগানে তেমনই অন্ধকার । সাদা পাথরের রাস্তা হয়ত কিছুটা আভাস দিয়ে যায় । হয়ত মেহেরজান এই পথেই আবার ফিরে আসবে । মালে-গনীমতের মধ্যে এমন উপহার পাওয়া যায়? কথাটা একবার বেগমের মনে জাগল । তিনি পায়চারী করতে লাগলেন ।

কালো বোরখা পরিহিতা এক নারী হঠাৎ পেছন থেকে তাঁকে ডাক দিলে ফিস্‌ফিস্‌ কর্তে :

—বেগম সাহেবা ।

—কে তুতী?

—জী, বেগম সাহেবা ।

তুতী মহলের ক্রীতদাসী। বোরখা খুলে ফেলেছে সে ততক্ষণে।

—কোন খবর পেলি?

—না, বেগম সাহেবা। এই বিরাট মহল। যেখানে শত শত গোলাম আর বান্দী, সেখানে খবর পাওয়া মুশকিল।

—আমি ত আর কিছু চাই নে। কেমন আছে, এইটুকু খবর পেলেই খুশি।

—বেগম সাহেবা, আপনি ওকে বড় ভালবাসতেন।

—তা ত বাসতাম। পরের দুঃখ মুছে নিতে পারলে রুহে আত্মায় কত যে শান্তি, তা যদি মানুষ জানত।

—বেগম সাহেবা, আপনি ফেরেশতা। বেহেশতের হ্র দুনিয়ায় এসেছেন।

—যা, কি-যে সব বলিস্। পানির জন্য মানুষের কত কষ্ট। আমি একটা নহর কাটাও ঠিক করেছি।

—বেগম সাহেবা, সবাই আল্লার কাছে হাত তুলে আপনার জন্যে দোয়া মাঙবে।

—তুই মেহেরজানের খবর আন্তে পারলি না।

—বেগম সাহেবা, এই মহলের ব্যাপার ত আপনি জানেন। এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। সকলে যে-যার স্বার্থ নিয়ে আছে। মেহেরজান... এখানে না-ও থাকতে পারে।

—হঁ। তুই যা। খবরদার, এ-খবর কেউ না জানে।

—খোদার কসম, বেগম সাহেবা। আপনি মাহের সমান। আমার কাছ থেকে কোন খবর আল্লার ফেরেশতা পর্যন্ত বের করতে পারবে না।

তুতী চলে গেল।

বেগম সাহেবা দাঁড়িয়ে রইলেন খান্সার মতই অনড়। উৎকর্ণ। বাতাসের ঈষৎ শব্দ তাঁকে উচ্চকিত করে তোলে।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মেহেরজান। তাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। তার একমাত্র দুশ্মন দুরন্ত যৌবন। সেই যা ভয়। নচেৎ এমন নিভাঁজ অন্ধকারেই ত সে ফিরে আসবে।

বেগম জুবায়দা বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

১৬

মোহাফেজ এবং হারুনর রশীদ।

—মোহাফেজ?

—আমিরুল মুমেনীন, আপনার বান্দা।

হারুন : গোলাম তাতারীর খবর কী? গোলাম এবার হাসছে?

মোহাফেজ : না জাঁহাপনা।

হারুন : এত দূর হিমাকৎ— আস্পর্ধা!

মোহাফেজ : জাঁহাপনা, গোলাম চূপচাপই থাকে। আহার প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। সে-খবর দিতে আমি আসি নি।

হারুন : তবে তুমি কি খবর নিয়ে এসেছো?

মোহাফেজ : জাঁহাপনা, বুসায়না আত্মহত্যা করেছে!

হারুন : বুসায়না আত্মহত্যা করেছে!

হারুন : বাগিচার এক গাছের ডালে ঝুলছিল, আজ বিকেলে দেখা গেল। আমরা কেউ খোঁজই পাইনি।

হারুন : বুসায়না আত্মহত্যা করেছে, না, গোলাম তাকে খুন করেছে?

মোহাফেজ : জাঁহাপনা, সব খবর আমার জানা নেই। কাল রাত্রে তাতারী আমাকে ডেকে বললে, বুসায়না কোথা গেল খোঁজ কর।

হারুন : বুসায়না, রাত্রে গোলামের কাছে ছিল না?

মোহাফেজ : না জাঁহাপনা।

হারুন : মশরুর, মশরুর।

মশরুর : জাঁহাপনা।

হারুন : এখনই কোতোয়ালকে ডাকো। শুনেছো, বুসায়না আত্মহত্যা করেছে।

মশরুর : এখনই শুন্লাম।

হারুন : যাও, কোতোয়ালকে খুনের তদারক করতে বলো। আমি এখনই বাগিচায় যাব।

মশরুর : আসসামায়ে তায়তান।

হারুন : মোহাফেজ, এতদূর আম্পর্ধা গোলামের। গোলামকে আবার গোলাম বানাব। তার দেহ টুকরো টুকরো করব না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিলে তিলে পশুপক্ষী পোকার আহাৰ্য্য বানাব। হাবসী গোলামের এত সীনার জোর? মোহাফেজ...

মোহাফেজ : জিন্দুল্লাহ।

হারুন : গোলাম এই খবর জানে?

মোহাফেজ : আলম্পানা, গোলামের কাছে এই খবর যাওয়া মাত্র সে ত পাগলের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, তারপর দৌড়ে গেল সেই গাছের নিচে। অন্যান্য গোলামের সাহায্যে গাছ থেকে লাশ নামিয়ে সে ত ছাতিপেটা শুরু করল, আর হাউ হাউ কান্না। জমিনের উপর কি পটুকান খাওয়া। বহেনের জন্যেও ত কেউ এমন করে না।

হারুন : তাজ্জব ব্যাপার। মশরুর ফজরে গিয়ে শুনে এসেছিল, বুসায়না নিজের মাকানে ফিরে গেছে। মাকানেও ছিল না।

মোহাফেজ : জাঁহাপনা, গোলাম বুসায়নার গোসলের ব্যবস্থা করেছে।

হারুন : কিন্তু সকালে মশরুরকে গোলাম বলেছিল, বুসায়নাকে সে জায়গা দেয় নি ঘরে।

মোহাফেজ : আলম্পানা, আল্লা এর মাজেজার রহস্য জানে।

হারুন : বাগিচায় আর কেউ আছে?

মোহাফেজ : জাঁহাপনা, বগ্দাদে বুসায়নার রূপের খ্যাতি কে না শুনেছে। ধনদৌলতের রোশনাই-ও তার কম নয়। সমস্ত বগ্দাদ আজ বাগিচায় ভেঙে পড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাশের পাশে পাগলের মত কাঁদছে আপনার গোলাম তাতারী।

- হারুন : মশরুর, কোতোয়াল পাঠিয়ে বাগানের ভিড় হটাও। আমি খোদ্ যাব।
- মশরুর : জাঁহাপনা, এই মোহাফেজকে বিদায় দিন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।
- হারুন : যাও, মোহাফেজ।
- মোহাফেজ : আসসালামো আলায়কুম ইয়া আমিরুল মুমেনীন।
- মশরুর : জাঁহাপনা, গোলাম খুন করে ওকে গাছে ঝুলিয়ে দেয় নি ত?
- হারুন : নিমকহারামকে দিয়ে কি না সম্ভব! গোলাম একটা পাথরের পিণ্ড ছাড়া আর কি। বুসায়না যে ওর কাছে ছিল না, তাও সত্য। মোহাফেজের জবানী তার প্রমাণ। হয়ত বুসায়না বাজি ধরে হেরে গিয়েছিল। তাই তোমার তলওয়ারের ভয়ে গাছে ঝুলেছে।
- মশরুর : ওর মাজেরা আলেমুল গায়েবই জানেন।
- হারুন : চলো, সরেজমিন তদারক করা যাক। কিন্তু তার আগে মশরুর, সেই বান্দীর বাচ্চা, বান্দরের বাচ্চাকে কয়েদখানায় নিয়ে যেতে বেলো। একদম ‘হাবিয়া’ কয়েদখানায়। পোকামাকড় বিচ্ছুর সঙ্গেই জিন্দেগানী চলার উপযুক্ত ও একটা কমিনা-কমজাত। নওয়াসের কাছে আমাকে বেইজ্ঞ করে ছাড়ছে। এত বেসুমার মালমাস্তার মালিক করে দিলাম। তবু গোলামের বাচ্চা হাসল না। তবে হাসি আয়ি আদায় করব। যাও, মশরুর। আমার প্রতিটি লফজ শব্দ যেন ঠিকঠিক পালন হয়।
- মশরুর : আসসামায়ো তায়তান।

১৭

আবু নওয়াস হাঁটছিল।

পাশে দজ্জা বয়ে চলেছে। মেঘে গোধূলির ঝিলিমিলি। এখানে শহর থেমে গেছে। বেবহা ময়দানের প্রারম্ভ। মরুভূমির অংশ বিশেষ। তবে এখানে আবাদ আছে। আর আছে খুর্মী গাছের সারি।

নদীর উপর শুফাদারেরা শুফা বেয়ে চলেছে। কোন কোন শুফা বোঝাই তরমুজ, তামাক কফি। সন্ধ্যার আগে ঝাপসা স্তিমিত এই জীবন-নীলার দিকে নওয়াসের কোন লক্ষ্য নেই। বালু-তীর। খালি পায়ে হাঁটার জন্য মনোরম। নওয়াস তাই হাঁটছে। তীরে দজ্জার ঢেউ এসে লাগে, কখনও কখনও নওয়াসের পায়ে আছড়ে পড়ে। কবি একটু চমকায় মাত্র। তারপর হাঁটতে থাকে। কোন কিছুর দিকে তার আকর্ষণ নেই। উটের কাফেলা চলেছে দূরে দূরে। গোধূলির অন্ধকারে খেজুর বীথির পাশে পাশে এই দৃশ্য অবসরভোগীর আশীর্বাদ। কিন্তু নওয়াসের চোখ আজ কোন বস্তুর উপর এককভাবে বিদ্ধ হয় না। দৃষ্টি স্পর্শ করে, গ্রহণ করে না কিছুই।

নওয়াস যেন আজ অনন্তের মুসাফির। তাড়াহুড়া নেই, ক্ষিপ্ততা নেই। আরো—
আরো কিছু আছে চোখে দেখার। তাই হঠাৎ একাগ্রতার প্রয়োজন-বোধ লাগে না।

নওয়াস হাঁটছিল। দজলা ঈষৎ শান্ত, ঈষৎ নীরব। তবু মানুষের মেহনতের নানা পট
তো সাজানো। নওয়াস তা দেখতে প্রস্তুত নয়।

মরুভূমির বুকে কি সে কোন পানশালার খোঁজ পেয়েছে? না, এই বালুর চাঁচর রাজ্যে
পানি স্বপ্ন-মাত্র। পানশালা ত বেহেশত।

আর শহরের শ্রেষ্ঠ পানশালা ত সে ছেড়ে এসেছিল গোখুলির পূর্বে।

আকাশে নক্ষত্র ফুটতে থাকে এক এক করে। নওয়াস সেদিকে একবার তাকিয়ে
দিগন্তেই কি যেন ঝুঁজতে লাগল। পানশালার পর নারী নওয়াসের অস্বিষ্ট। কিন্তু মানবীর
কোন প্রয়োজন নেই তার। চাঁদ-সড়কের রোক্তাসাদের উঁচু বুক আজ তাকে বাধা দিতে
পারে নি।

হঠাৎ থামল নওয়াস। দজলার কুলুকুলু-স্বর শুধু তার কানে আসে। আর কোন শব্দ
সে কান দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না।

দিগন্তের দিকে নওয়াসের দুই চোখ— অন্ধকারে যেন প্রশ্নের জবাব খুঁজছে। প্রশ্নকারী,
উত্তরদাতা উভয়ই সে নিজে।

নওয়াসের দুই চোটে হঠাৎ মৃদু হাসির আঁচড় দেখা গেল। তারপর বেশ জোরেই
হেসে উঠল সে।

আন্দোলিত মন তখন চোঁটের কিনারায় প্রতিধ্বনিত তোলে : নওয়াস, নওয়াস। আরো
হাসো, হাসো। দুনিয়ায় তোমাকে সকলে শরীরী মদ্যপ বলেই জানবে। আর জানবে কবি-
রূপে। বলবে, ব্যভিচারী নওয়াস। তোমার কলঙ্কই বেঁচে থাকবে, তোমার অস্তিত্ব থাকবে
না। কেউ জানবে না, তুমি কেন কলঙ্কের কালি-বোঝা নিজের মুখে মাথায় তুলে নিয়েছিলে?
হাসো, হাসো, নওয়াস।

নওয়াস সত্যি নিজের মনে হাসতে লাগল। তারপর চুপ করে গেল। গম্ভীর তার
মুখাবয়ব।

খেজুরের বীথি এখানে ঝাপসা, আকাশের গায়ে এসে মিশেছে।

আবার নওয়াস সোচ্চার বলতে লাগল : আমিও মানুষের মনের অন্ধকারে এমনই
আকাশ রচনা করে যাব। মৃত্তিকা-জাত, তবু আসমানের সঙ্গী। আমার কলঙ্ক কেউ
বুঝবে না। জীবনের দিকে দিকে হে অমৃতের পুত্র, অগ্নিসর হও। মৃত্তিকা থেকে আকাশে
পাড়ি দাও— কিন্তু তোমার দুই পা সব সময় যেন মাটির উপর থাকে। এইভাবে
আকাশও তোমার কাছে ধরা দিয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা তা করো না। আকাশের খোঁজে
এগোও, এদিকে পৃথিবীতে হারিয়ে যাও। তোমাদের মানুষ বলেই আর কেউ চেনে না।
তুমি পৃথিবী-বিস্মৃত, তাই মনুষ্যত্ব-বিস্মৃত। নওয়াস তাই কলঙ্কের কালি মেখে নিলে।
শিব-হাল নওয়াস। আবে-হায়াৎ বিলিয়ে দিয়ে জহর নিজে পান করলে। শূন্য আকাশ
তোমাদের কাছে এত প্রিয় যে, বৈচিত্র্য-গর্ভা পৃথিবীর দিকে তাকালে না। তাই কবি
নওয়াস তার কবি-ব্রত ধারণ করলে—। হোক পাক, সহজ আনন্দ— এই সহজ
আনন্দের দিকে আগে মানুষকে টানো— জীবনকে ভালবাসতে শিখুক মানুষ। তাই ত

শরাব-সাকী আমার কাব্য প্রাত্যহিকতার প্রতীক। কাকে বোঝাব এই কথা?— একটি মানুষ-যদি পৃথিবীতে মানুষের মত বাঁচবার অভিলাষী হয়, নওয়াসের কলঙ্ক সার্থক। সূর্যের মত আমার জন্য থাক কলঙ্ক জ্বালা আর জ্বালা— তোমাদের জন্যে থাক শুধু প্রাণদাতী আলো আর আলো। চতুর্দিকে কালিমা-ময় জাল বিছিয়ে অঙ্গার কী হীরককে জ্যোতিহীন, না নির্মূল্য করতে পারে? কিন্তু নওয়াস, তুব— তবু, তোমার হৃদয় আবেগ-উদ্বেলিত কেন? শান্ত হও, মন। রাত্রি নামে গোধূলি শিখরে—

নওয়াস হঠাৎ অল্প জায়গার মধ্যে পাগলের মত পায়চারী করতে লাগলো। অঙ্ককার চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। নওয়াস তারই কয়েদখানায় হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ওঠেঃ না, না।

সে জানে এই কঠিন কারো কাছে পৌঁছাবে না। তবু থেকে গেল সে, বুক অস্থিরতা সত্ত্বেও। আবার শহরের দিকে মুখ ফেরায় আবু নওয়াস। রহস্যময়ী দীপান্বিতা বগ্দাদ আবার হেসে উঠেছে। সেখানেই ত সে ছুটে যাবে। জীবনধারা থেকে আঁজলা পান না করলে ত তার তৃষ্ণা মিটবে না। মানুষের জীবনই মদিরা বিশেষ, তাই ত সে মদিরায় জীবনকে খুঁজেছে।

বগ্দাদ-অভিমুখী নওয়াস। দজলা হয়ত জোয়ারে উত্তাল। তার পদধ্বনি বার বার শমে তেহাই মারছে। গজল গাইছে গুফাদারেরা দল বেঁধে। সুরের খেই পাকড়ে গুন গুন করতে লাগল আবু নওয়াস।

জীবনের সবক নিতে বগ্দাদেই ত তাকে ফিরে যেতে হবে। বিরাট মরুভূমি আর শূন্যতার উপাসনা তার ব্রত নয়।

আবু নওয়াস জোর পা ফেলতে লাগল।

শহরের দরওয়াজার কাছাকাছি দজলার বুক বিপণী-সারির আলো পড়েছে।

নওয়াস ডাবলে, “দজলা ত নদী নয়— আমার বুক। সম্মুখে কোথাও অঙ্ককার আছে বলে কী এই নদীর স্রোতদল শহরের আলোম্রাত এক জায়গায় থম্কে দাঁড়ায়? অঙ্ককারের রহস্য কী তাদের টানে না?... আমি নিজেই এক দজলা।”

হাঙ্কা বুক হাসল আবু নওয়াস। অতঃপর নিকটস্থ এক পানশালায় ঢুকে পড়ল, সেখানে আবুল আতাহিয়া তার প্রতীক্ষার্থী বসে ছিল।

—এসো, এসো। কোথায় ছিলে তুমি?

—হারিয়ে গিয়েছিলাম, আতাহিয়া।

আতাহিয়া : তুমি দেখছি আর এক মেহেরজান।

নওয়াস : না, আবুল আতাহিয়া। সত্যি হারিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। এই খুঁজে পাওয়ার আনন্দটুকু আজ পান করব। আমার শরাবের প্রয়োজন হবে না।

আতাহিয়া : বেশ, তবে চলো, ওঠা যাক। বগ্দাদের নৈশ স্রোতে অবগাহনের পর আজ ঘরে ফিরব। এসব জায়গা আমার ভাল লাগে না। তোমার জন্যেই শুধু আসা।

নওয়াস : বেশ, তাই চলো।

লৌহ গরাদের ওপারে আকাশ ।

শুধু কি আকাশ? পৃথিবী নিজের অন্তহীন বিস্তার অস্বীকারের জন্য গগ্নির মধ্যে বিচিত্রার আতসবাজি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে এগোয় । থামতে চাইলেও থামতে পারে না । তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষের মধ্যেই, তাই পৃথিবী ভেঙে ভেঙে টুকরো-টুকরো ছড়িয়ে পড়ে; কিশোরীর দুর্বাবনে কুঁচফল হারিয়ে পুনরায় খোঁজার মত । খুঁজে পাওয়ার পর আবার ছড়ানো । ঝর্ণা-উৎসারিত ছত্রাকার জলবিন্দুর উত্থানে-পতনে এই লীলার আভাস কিছুটা চোখে পড়ে । তাই গরাদের ওপাশে শুধু আকাশই অস্তিত্বের ইশারা জাগায় না, ধেয়ে আসে চূর্ণিত পৃথিবী, টুকরো-টুকরো রঙীন কাঁচের মত অন্তহীন বর্ণসজ্জায়— পলানুপল, দণ্ড-প্রহর, অহর্নিশ ।

গরাদের ওপারে তাই ত মানুষ মাথা কোটে । নিশ্চাপ্ত পাথরেও চेतনার প্রলেপ আরোপ করে । মেজে-মেজে হৃদয়কে করে তোলে অমলিন নিদাগ আর্শি । সেখানে অন্ততঃ পৃথিবীর ছায়া পড়ুক ।

গরাদের এপার এবং ওপারের দূরত্ব-পার্থক্য মুছে দিতে তাই নবেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয় । ধারা-বিচ্ছিন্ন উপনদী সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে । তরঙ্গ-কল্লোল একক শব্দে কখনও মুক্তি পায় না ।

ওইখানে হাবসী-মুখের দিকে তাকাও । কোড়াহুত ও-মুখ কি অনড় স্বৈর্ঘ্যে অবিকল? না । কৃষ্ণ হাবসীমুখ সফেদ আরমেনী মুখের আদর্শে কী ভুবে যাচ্ছে না? আর্শির সমতল রূপান্তর ধরে রাখছে না শুধু ।

তুমি হয়ত দেখতে পাও না । কারণ তুমি সেই নবেন্দ্রিয়ের অধিকারী নও । তার চেয়ে গরাদের প্রাচীরেই কান পাতে । পাষণেও চেননা-প্রবাহ আছে ।

অভিশপ্ত বগ্দাদ এখনও নিদ্রা-সম্বাহিত । তার ঘুম যেন কেয়ামতের পরও ভাঙবে না ।

১৯

বগ্দাদের এই সরাইখানার প্রবেশ-পথ খুবই সঙ্কীর্ণ । মালিক একটা ছোট গালিচার উপর উপবিষ্ট । পিছনে মোটা গের্দা । সামনে রূপার নল-সংযুক্ত হক্ক। । আনমনা ধূমপান করছিল সে ।

কিন্তু এই প্রবেশ-পথ পার হয়ে গেলেই সরাইয়ের আসল চেহারা দেখা যায় । স্তিমিত আলোয় বিরাট হলের মধ্যে নৈশ-বিলাসীরা বসে আছে । কেউ নিঃসঙ্গ । কেউ দল-বাঁধা । এখানে কফি-শরাবের মজলিশ গুল্জার । কল-গুঞ্জনের বিভিন্ন গ্রাম সমস্ত কক্ষে নিনাদিত । মৃদু ফিস্‌ফিসানি থেকে হাহ্‌হা— হৈহো রব, সবই এই জায়গায় সাজে । কোনায় কোনায় নর্তকীদের নাচ, মাঝে মাঝে ঘুঙুর ও তাম্বুরীণের আওয়াজের সঙ্গে হঠাৎ টেউ ভুলে যায়; তা আছড়ে পড়ে নানা বিভঙ্গে । কেউ শুধু তাকিয়ে দেখে আবার জামে ঠোট নামায়, কেউ তালি-সংযোগে চীৎকার দিয়ে ওঠে, “মারহাবা, মারহাবা ।” যেন কেয়ামৎ হঠাৎ দেখা

দিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। পৃথিবী আবার আনন্দে নির্বিবাদ।

অন্যান্য দিনের মত আজও সরাইখানা এতক্ষণ গুলজার ছিল। তারপর আওয়াজের তোড় কমে গেছে। কিন্তু কথার তোড় থামছে না। অবিশ্যি লয় মৃদু, খাদ-অভিমুখী।

সরাইখানার মাঝখানে একটি পাথুরে-মাটির ছোট উঁচু চবুতরা। তার উপর এতক্ষণ কয়েক জন বসে বসে কফি পান করছিল। এক জন হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠলঃ সাবাস, আবু নওয়াস, সাবাস।

তারপর সমস্ত সরাইখানায় ওই একই নাম ঘুরে ঘুরে আসে। আবু নওয়াস। আবু— আবু নওয়াস। আবু নওয়াসের কি হবে?

নতুন কয়েকজন আগন্তুক এসে পড়ল। সরাইয়ের গুহায়। হয়ত এই স্তিমিত ভাবের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। সরাইখানায় কি কেউ আসে গৃহোচিত নীরবতা উপভোগে? সকলের তরঙ্গে গা ঢেলে সবাই স্নানার্থী এইখানে। শ্রিয়মাণতা এখানে নিষিদ্ধ, পাপ।

আগন্তুক একজন সরাইয়ের মাঝামাঝি এসে চিৎকার দিয়ে উঠলঃ গোটা বগ্দাদ কি আজ মৃত না কোন কেয়ামত খবর পাওয়া গেছে— যার জন্যে সরাইখানা আজ ঠাণ্ডা গোরস্থান?

চারিদিক থেকে চোখ এই চ্যালেঞ্জ-দাতার উপর পড়ল।

প্রথমে অনেকে প্রশ্নটা বুঝতে পারে না। উত্তর-প্রার্থীর উদ্দেশ্য কি? কি জবাব চায় সে? আবার শোনা গেল কর্কশ কণ্ঠস্বর, “বগ্দাদ কি মৃত না কেয়ামতের প্রতীক্ষার্থী?”

এইবার কয়েকজন কফির, পেয়ালার চোঁট থেকে নামিয়ে নওজোয়ানের দিকে তাকায়। বিরক্ত হয় অনেকে। সরাইয়ের হাওয়া যেন এই তরুণ আগন্তুক বিষয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিম কোনা থেকে আর এক যুবক দাড়িয়ে জবাব দিলে, “আপনি অন্ততঃ বসে পড়ে শ্রমাণ দিন যে, আপনি মরেননি।”

—কিন্তু বগ্দাদ মরে গেছে।

—না।

—তবে এই সুমসাম ভাব কেন?

—বগ্দাদ তার যৌবনের উৎসব পালন করছে। বগ্দাদের নওরোজ আজ।

—নওরোজ কি এইভাবে পালিত হয়? গোরস্থানের স্তব্ধতায়?

—বগ্দাদ মরে গিয়েছিল। আজ বগ্দাদ বেঁচে উঠেছে। তাই আমার হুল্লোড়ে মেতে তার পবিত্রতা নষ্ট করতে রাজি নই। আপনার ভাল না লাগে অন্য সরাই দেখুন। বগ্দাদে তার অভাব নেই।

—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে।

—বগ্দাদ দুনিয়ার শয়তানদের কাছে একটা ধাঁধা। আর তুমি এত সহজে বুঝে ফেলবে, নওজোয়ান?

—মেহেরবানী করুন, আপনাদের এই প্রহেলিকা আর সহ্য করতে পারছি নে।

—আজ বগ্দাদ বেঁচে উঠেছে।

—কবে তার মৃত্যু হয়েছিল?

—তার খোঁজ পান নি, টের পান নি?

—ব্যাপার কি, ভাই?

—আজ বগদাদ বেঁচে উঠেছে। আপনি তো জানেন, বুসায়না খুনের ইন্সায়ফ হচ্ছিল আজ আমিরুল মুমেনীনের দরবারে। আমির-ওমরাহ-কাজী সবাই বললে, হাবসী তাতারী এই খুন করেছে। খুন কা বদলা খুন। গর্দান নেওয়া হোক হাবসীর।

তখন সরাইয়ের আর এক কোনায় অন্য দুই নওজোয়ান চিৎকার দিয়ে উঠল, “থামুন—থামুন।” তাদের প্রসারিত করতালু আর আঙুলের দিকে সকলের দৃষ্টি আবার ধাবিত হয়।

“থামুন, থামুন”, রবে দুইজনে এগিয়ে এলো, দুই নওজোয়ান। তারপর তারা বললে, “আজ আমরা দুইজনে দরবারে ছিলাম। সব কথাই মনে আছে। আমাদের একজনকে খলিফা আর একজনকে নওয়াস মনে করলেই আপনারা গোটা দরবার চোখের সামনে দেখতে পাবেন।”

“বেসক-নিশ্চয়-নিশ্চয়,” সমর্থনের রব উঠল চারিদিক থেকে। “এতক্ষণ তো শুনছিলাম, এবার চোখেও দেখতে পাব।” জনান্তিকে একজন প্রস্তাব করলে, “চতুরটা ছেড়ে দিন। ওখানে খলিফা বসুন। আর নওয়াস নিচে দাঁড়াক। সকলের দেখতে সুবিধা হবে।”

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

প্রস্তাব-মত মঞ্চ সজ্জিত হতে আর বেশি বিলম্ব ঘটে না। তারপরই সরাই দরবারে পরিণত হয়। আগন্তুক দুইজন তখন অভিনেতা।

নওয়াস : জাঁহাপনা—

আমিরুল : কি নওয়াস?

নওয়াস : জাঁহাপনা, বান্দার গোস্তাষি মাফ করবেন। বুসায়না-হত্যার বিচার আমি এতক্ষণ নিজের চোখে দেখলাম। কিন্তু এতে খুনের কোন প্রমাণ হয় না।

আমিরুল : প্রমাণ হয় না?

নওয়াস : না। এক জনের জান ‘হালাক’ (ধ্বংস) করার আগে সমস্ত নিখুঁত প্রমাণ পাওয়া উচিত। কারণ, আমরা কেউ জানের মালিক নই। প্রাণ-ধ্বংস সহজ, সৃষ্টি অনেক কঠিন কাজ।

আমিরুল : তুমি কি বলতে চাও?

নওয়াস : এই বিচার ভুল, আলম্পানা।

আমিরুল : কেন ভুল?

নওয়াস : প্রমাণ নেই। কেউ চোখে দেখে নি।

আমিরুল : সব সময় চোখে দেখার প্রয়োজন হয় না। সাক্ষীসাবুদ এবং ঘটনা থেকেই আন্দাজ করা যায়।

নওয়াস : বিচারের ক্ষেত্রে আন্দাজের কোন জায়গা নেই।

আমিরুল : বুসায়না কি খামাখা মারা গেল?

নওয়াস : খামাখা না, আলম্পানা। কিন্তু হাবসী জওয়ান তাকে খুন করে নি। আর এতো খোদকসী— আত্মহত্যার ব্যাপার।

আমিরুল : কিন্তু গোলাম নিজের সাফায়ে একটা কথা পর্যন্ত বললে না, মুখ খুললে

না। তা কি অভিযোগ স্বীকার নয়?

নওয়াস : না জাঁহাপনা। আর স্বীকার করলেও ক্ষেত্র অনুযায়ী অনেক সময় খুন স্বীকারকারীর উপর বর্তায় না। বেটার হত্যাপরোধ অনেক সময় কি পিতা নিজের কাঁধে তুলে নেয় না?

আমিরুল : কিন্তু এই গোলাম সব কিছু করতে পারে।

নওয়াস : না, জিন্দুল্লাহ্। ও কালো গোলাম কালো পাথর। স্তব্ধ। কালো পাথর কোনদিন নকল হয় না। সাদা আর ঝলমলে পাথরই সহজে নকল করা যায়।

আমিরুল : আবু নওয়াস, তুমি কি বলতে চাও, আমার বিচার ভুল?

নওয়াস : হ্যাঁ, আলম্পানা।

আমিরুল : ভুল? আবু নওয়াস, তোমার জিভ সামলাও।

নওয়াস : জাঁহাপনা, ভুলকে ভুল বলা কবিদের ধর্ম। আমরা শুধু সুন্দরের পূজারী-ই নই।

আমিরুল : আমি ভুল বিচার করি?

নওয়াস : জিন্দুল্লাহ্, ইনসান ভুল করে বসে বৈকি। আমরা জানি, আমিরুল মুমেনীন ফেরেশতা নন।

আমিরুল : নওয়াস, চূপ— চূপ! তোমার বেয়াদবি আমি ক্ষমা করব না।

নওয়াস : জাঁহাপনা, আলহাক্কো মোররুন— সত্য তত্ত্ব পদার্থ, তা আপনি জানেন।

আমিরুল : আবু নওয়াস, তুমি হদ্ ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আমার কাজী-আমির-ওমরা— এত লোক, যারা প্রতিদিন বিচার ক্ষেত্রে তারা ত বিচারে কোন ভুল দেখল না।

নওয়াস : জাঁহাপনা, তারা যখন অশ্লীলতার চোখ দিয়েই দেখে, তখন নিজেদের চোখ ব্যবহার করে না। আর যখন নিজেদের চোখও দেখার কাজে লাগায়, তখন আপনার চোখের ঝিলিক তারা আগেই দেখে নেয়।

আমিরুল : উপস্থিত এত শরীফ মানুষদের তুমি বেইজ্ঞ করছ, আবু নওয়াস।

নওয়াস : না জাঁহাপনা। নওয়াস মদ্যপ। মাতালেরা দুনিয়ার কারো উপর শত্রুতা করে না— এক নিজের উপর ছাড়া। কাউকে বেইজ্ঞ করা আমার খসলতের বাইরে।

আমিরুল : অর্থাৎ আমার ইন্সায়ফ ভুল।

নওয়াস : হ্যাঁ, আলম্পানা।

আমিরুল : খামুস্, নওয়াস। তোমার বুকের পাটা আদ্যার জমিন ছাপিয়ে যাচ্ছে। বেয়াদব ইনসানকে আমি মাফ করি না। তোমাকেও মাফ করব না। শুধু এক শর্তে, তুমি ক্ষমা পেতে পারো— এই উপস্থিত শরীফ ব্যক্তিদের কাছে যদি মাফ চাও। নচেৎ—

নওয়াস : নওয়াস আপনার দরবারে কোন গুনা করে নি, জাঁহাপনা।

আমিরুল : তুমি মাফ চাও।

নওয়াস : বে-কসুর নিরপরাধ কিভাবে ক্ষমা চাইবে?

আমিরুল : মাফ চাও।

- নওয়াস : আপনি আমাকে এই কাজ থেকে মাফ করুন ।
- আমিরুল : নওয়াস, তুমি বেয়াদব নও শুধু । না-ফরমান । গোলামের সঙ্গে তোমারও গর্দান ধূলায় লুটিয়ে পড়ক— । মশরুর—
- নওয়াস : জাঁহাপনা, আপনার যা মরজী । কিন্তু জাঁহাপনা মনে রাখবেন, আপনার সাধের বগ্দাদকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আজ আমি আমার গর্দান বাড়িয়ে দিলাম— কারণ এই বগ্দাদকে আমি ভালবাসি, আমার জন্মভূমি বগ্দাদ । ভবিষ্যতের একটি মানুষ অন্ততঃ বলবে, বগ্দাদ অবিচারের কাছে মাথা নোয়ায় নি । জাঁহাপনা—
- আমিরুল : মশরুর একে আজ কয়েদখানায় রাখো, কাল দরবারে আবার নতুন বিচার হবে এই না-ফরমান, অবাধ্য কবির ।
- নওয়াস : জাঁহাপনা, একটা কথা বলবার দাবি জানাচ্ছি । বগ্দাদকে আপনি যেমন ভালবাসেন, তেমনি আমিও ভালবাসি । কিন্তু আপনার বগ্দাদের কোন ঐশ্বর্যই টিকবে না । টিকে থাকবে শুধু বগ্দাদের বিবেক এবং বিবেক-সাধনা । ও কেউ ধ্বংস করতে পারে না । ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে থাকলেও ওর কণ্ঠধ্বনি অনাগত মানুষ শুনবে— তারা বগ্দাদকে বাঁচিয়ে তুলবে । তাই আজ অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালুম । যে-বীজ আপনি রোপণ করেছেন, তাই একদিন বগ্দাদকে গ্রাস করবে । তাই আবু নওয়াস আজ কবন্ধ সাজল । নিজের হাতে নিজের গর্দানকে গেন্দুয়ার মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে যেন বগ্দাদের বিবেক আবার চীৎকার দিয়ে উঠতে পারে, “আমি কবি, চিরন্তনের কণ্ঠস্বর! মশরুরের তলওয়ার, আমিরুল মুমেনীনের জুকুটি-দণ্ড কবির হলকুমের (জীবা) নিকটে পৌছাতে পারেনা । বগ্দাদের প্রেম আমাকে বানিয়েছে কবি, বগ্দাদের প্রেম আমাকে করে তোলে শহীদ । কবির নিত্যকার শহীদ— কারণ, জীবনকে সব সময় তারা পিছনে ফেলে চলে । জীবন থেকে জীবনান্তর । কবির তাই মাত্র একটি বার পুনরুজ্জীবনের স্বর্গলোভী শহীদ নয় । তারা বাঁচে, আবার শহীদ হয়; শহীদ হয়, আবার বেঁচে ওঠে । জীবন-মৃত্যুর সাময়িক ফারাকে তাই তারা বিহ্বল হয় না, শঙ্কাত্রাসে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে না । কবিমাত্রই রক্তবীজ, বিবেকের নিক্কাম সাধক । চলো মশরুর । নিয়ে চলো । তোমার তলওয়ারের ধার এতদিন কোন মানুষ স্পর্শ করে নি । এবার অন্ততঃ সে কলঙ্ক থেকে রেহাই পাবে । আদাব, আমিরুল মুমেনীন ।”

“আরো বললাম, মশরুরের সঙ্গে যেতে যেতে”— হঠাৎ সরাইখানার আর এক কোনায় দেখা গেল, এতক্ষণ ভিড়ে দগ্ধমান এক ব্যক্তি প্রথম বক্তার বাক্য সমাপ্তি-মাত্র কথা বলতে বলতে অগ্রসর হচ্ছে । ভিড় ঠেলে এগোয় সে । মুখে কথা, “বললাম, বগ্দাদের নর-নারীর কান্নায় আমি কাঁদি, তাদের আনন্দে আমি হাসি— তারাই আমার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্যনা, শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । তারাই আমার কবিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে । তাদের জীবনযাত্রার ধারাই আমার রসের উৎস । মশরুর আমার কোন দুঃখ নেই । বগ্দাদের বাসিন্দা আমার ভীর্ণ বৃকে সাহস যোগায় । তাদের কথা আমার ঘুমন্ত কথাকে জাগিয়ে তোলে । তাই মৃত্যুতে

আমার দুঃখ নেই। কারণ, বগ্দাদের বন্ধুগণ—।”

বক্তা ততক্ষণে অভিনেতা-নওয়াসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সকলে আনন্দে চীৎকার দিয়ে ওঠে, “আবু নওয়াস, আবু নওয়াস।”

“বগ্দাদের বন্ধুগণ, তোমাদের ভালবাসায়, তোমাদের কবি আবার তোমাদের মাঝখানে ফিরে এসেছে। আমি রুল মুমেনীন পরে নিভতে মশরুরকে আমার সামনে বললেন, “একজন নিরীহ কবিকে খুন করে— বগ্দাদবাসীদের আমি কি জবাব দেব? তাই বন্ধুগণ, তোমাদের নিকট, তোমাদের নিঃশ্বাসের উত্তাপে চাক্ষা আবু নওয়াস এইখানে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যুর পর ফেরেশতা যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি বগ্দাদে না বেহেশতে যেতে চাও? আমি জবাব দেব, বগ্দাদে।”

“আহ্‌লান সাহ্‌লান ইয়া আবু নওয়াস, স্বাগতম, হে আবু নওয়াস”। চারিদিক থেকে রব ওঠে।

“কিন্তু, বন্ধুগণ, সরাইখানা নীরব কেন? জল্পাদের হাতে যদি আমার গর্দান যেতো, তোমরা কি সরাইখানা জমিয়ে তুলতে না? একটি মানুষের মৃত্যু এভাবে দেখা উচিত নয়। আমি ত জীবনের কবি। তোমাদের স্তব্ধ দেখলেই আমার আত্মা বিষণ্ণ হয়ে পড়ত। আকাশের কোন নক্ষত্র খসে গেলে কি অন্যান্য তারা নিজের কর্তব্য ভুলে যায়? রবং সেই শূন্য জায়গা পূরণে এগিয়ে আসে নব উজ্জ্বলতায়।— এসো, সরাইখানা আমরা আজ ভর-পেয়ালা করে তুলি। নতুন গজল শোনাব আমি। আনন্দ কর, বগ্দাদবাসী। মওজ-তরঙ্গ তোলা অঙ্গ-সমুদ্রে, চিত্ত অরণ্যে, রুবাব পান্থপঞ্চমে—

সুরে, সুরায়, নৃত্য চঞ্চলতায়, স্বর-মুক্তির স্বেচ্ছন্দতায় সরাইখানায় আবার বন্যা ডাকল।
উচ্চ চত্বরে উপবিষ্ট নওয়াস।

আনন্দস্রোত নানা দিক থেকে এই খানে আছড়ে পড়ছে।

নওয়াসের সম্মুখে পানপাত্র।

কিন্তু তার দুই চোখ বিবাগী। এই প্রাণ-প্রবাহে কি যেন বার বার খুঁজতে লাগল।

২০

আমিরুল মুমেনীনের মহল।

নিশীথ রাত্রি।

—কে?

—মশরুর, জাঁহাপনা।

—গোলামকে এনেছো?

—হাঁ, জাঁহাপনা।

—ওকে পৌছে দিয়ে, তুমি বাইরে যাও। ওর সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।

—আস্‌সামায়ে তায়াতান।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ তাতারীর প্রবেশ। সমস্ত শরীর কোড়াঘাতে জর্জর। দেহ প্রায় তুকহীন। কপালে, গণ্ডদেশে দগ্‌দগে ঘা) তাতারী, জানি, তুমি আমার

কথার জবাব দেবে না। কিন্তু আজ খলিফারূপে আমি তোমাকে ডাকি নি।

তাতারী : [কণ্ঠে ঘড়ঘড় শব্দ। শ্বাস-কষ্ট।]

হারুন : আজ তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-রূপে তোমাকে এইখানে ডেকে এনেছি।
তুমি দেখছো, বাইরের বাতাসের কত দাম। আমি তোমার সমস্ত মঙ্গলের
জন্য প্রস্তুত। আমাকে ভুল বুঝো না।

তাতারী : [খলিফার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু চোখ স্ফীত। ফলে তাকানো
কষ্টকর।]

হারুন : তুমি একটিবার হাসো। তা-হোলে তুমি যা চাও, তাই পাবে। আমার
সুদক্ষ হেকিম রয়েছে, তারা শরীর সাত দিনে আবার পূর্বের মত চাঙ্গা করে
তুলবে। তোমার একটা হাসি শুধু প্রয়োজন। জবাব দাও।

তাতারী : [নিরুত্তর]

হারুন : আবু নওয়াসের কাছে আমি অপদস্থ। তুমি নাকি আর কোনদিন হাসবেই
না। কিন্তু কেন? কেন তুমি জীবনের পেয়ালা এমনভাবে পায়ে ঠেলে দিচ্ছ?
তুমি নওজোয়ান। জীবনের সমস্ত সড়ক তোমার জন্য দু'পাশে ফল-ফুল
নিয়ে অপেক্ষা করছে। আর তুমি নিজের দুই চোখ যেন অন্ধ করে দিয়েছ।
কানে আর শ্রুতিশক্তি রাখো নি। কেন? এই নিশীথ রাত্রি, কেউ শুনবে না।
তুমি শুধু জবাব দাও, আমি পাক কোয়ান ছুঁয়ে কসম করছি— তোমার
নালিশের ভিৎ আমি উপড়ে ফেলতে চেষ্টা পাব। তস্বী হাতে কস্বীর মত
আমাকে ভণ্ড মনে করো না। আমার কসমের দাম আছে।... তবুও তুমি
নিরুত্তর! কি চাও তুমি? একটা গোলামের যা কাম্য, তার চেয়ে ঢের ঢের
বেশী, অনেক কিছু তোমাকে দিয়েছিলুম, তুমি নিলে না। এত জুলুম সহ্য
করছ, অথচ তোমার কথা যেখানে কাজে পরিণত হতে পারে সঙ্গে সঙ্গে...
সেই সুযোগ তুমি নিচ্ছ না। আমি নিজে ভেবে পাই নে। তোমরা কি আর
কোন ধাতুতে গড়া? একটা জবাব দাও...[পায়চারী রত] একটা জবাব...
একটা হাসি... আচ্ছা, হাসি জাহান্নামে যাক, একটা জবাব দাও। আমি
তোমার সব অপরাধ মাফ করে দেব। যা চাও তাই পাবে। সময় দিলুম ...
বুঝেছি, তুমি ... নির্বাক থাকবে, হাসবে না ... বেশ। যাও। তোমাকে তিন
দিনের মেয়াদ দিলুম। শুধু একটি হাসি হেসে তুমি জীবনের সবকিছু অধিকার
ফিরে পেতে পারো। নচেৎ আরো শাস্তি— হ্যাঁ, শাস্তি— যা কোনদিন তুমি
কল্পনাও করো নি। তোমাকে ভেবে দেখার সময় দিলুম।..

(হাততালি প্রদান) মশরুর—

মশরুর : জাঁহাপনা!

হারুন : মশরুর, গোলামকে নিয়ে যাও।

মশরুর : আস্‌সামায়ো তায়াতান।

হারুন : মশরুর,— না থাক, আর একদিন বলব।

[সকলের প্রস্থান]

নহরে জুবায়দার তীর। বিকাল বেলা। খর্জুরবীথির পাশে একটা টিলার উপর আতাহিয়া ও আবু নওয়াস উপবিষ্ট।

আতাহিয়া : নহরে বাতাসের দোলা লাগছে, দ্যাখো দ্যাখো, নওয়াস।

নওয়াস : নারীর স্নেহ পানি-রূপে এখানে বিগলিত হয়ে ঝরে পড়ছে, আতাহিয়া।
আহু, মানবের প্রেম-মমতা যদি এমনই রূপ পেতো!

আতাহিয়া : কিন্তু তুমি দিন দিন এমন উদাসীন হয়ে যাচ্ছ, আমার আর ভাল লাগছে না, আবু নওয়াস। তুমি আর উচ্ছলিত ঝর্ণা নও।

নওয়াস : আতাহিয়া, সাহারা মরুর অনেক নিচে পৃথিবীর বুক যে-পানি সঞ্চিত রেখেছে— তা কি শাস্ত, অনুচ্ছল?

আতাহিয়া : তা নয়।

নওয়াস : মাঝে মাঝে উপরে সব শুকিয়ে ফেলতে হয়, ভেতরে সরস তাজা থাকার জন্যে।

আতাহিয়া : কিন্তু আমি তোমার স্তব্ধতা সহিতে পারি নে। উপরিভাগ শুকিয়ে ফেলতে যে অনেক কষ্ট, নওয়াস।

নওয়াস : তা ত হবেই। সকলের কথা তোমার মুখ দিয়ে বলার ভার যে নিয়েছ, বন্ধু। তোমার একার বোঝা ত হালকা। কিন্তু শত-সহস্রের বোঝা যখন তোমার কণ্ঠে চাপে— তখন থেকে চায় শুকিয়ে সাহারা হতে? কিন্তু প্রাণধারা সঞ্জীবনের জন্য এই বিশৃঙ্খলাই মাঝে মাঝে বেছে নিতে হয়।

আতাহিয়া : চলো, কোন সরাই খুঁজিয়ে যাই।

নওয়াস : আমি এখন সরাই খানার দর্শক, শরীকদার নই।

আতাহিয়া : তুমি চলো।

নওয়াস : দর্শনকার আর শরীকদার-রূপেই জীবনকে মেলাতে হয় তবেই জীবনের শতদল ফোটে। চলো।

আতাহিয়া : কিন্তু চুপ করে যেয়ো না। তোমার কথাই ত আমি শুনতে চাই।

নওয়াস : তা হলে এই বুকে কান পাতে, মুখের দিকে তাকিয়ে না।

আতাহিয়া : যথাদেশ। তা-ই শুনব বন্ধু। চলো, তার আগে কোন পানশালার ওতে আড়াল হয়ে নিই।

নওয়াস : চলো।

সময়, গোখুলি বেলা। স্থান, কারাগারের চত্বর। হাকুনর রশীদ, মশরুরের প্রবেশ। চত্বরের পাশে দণ্ডায়মান তাতারী ও কোড়াদার। তাতারীর হাতে-পায়ে জিজির। কোড়াদারের হাতে

চাবুক। চতুরের দুই ভাগ। একদিক উঁচু। অন্যদিক কয়েদীর অবস্থানভূমি। সেদিকটা নিচু।

হারুন : তাতারী, তিন দিনের জায়গায় তিন বৎসর কেটে গেল। তোমার জীবনের মেয়াদ বহু দিনদিন বাড়িয়ে দিয়েছি। আজ কিন্তু আমি বোঝাপড়া করতে চাই। বাজি ধরে, বন্ধুদের কাছে আমি হেরেছি। কিন্তু আর না...। তোমাকে আমি শেষ সুযোগ দিতে চাই। জবাব দাও...

[তাতারীর দিকে তাকাল। সে নিশ্চল পাথরের মত দণ্ডায়মান। সমস্ত শরীরে চামড়া নেই বললেই চলে। অবয়ব কিন্তু পূর্বের মতই আছে। নির্যাতনে তা ক্ষয়ে যায় নি। তাতারী অবশ্য পৃথিবীকে আর সম্পূর্ণ দেখে না। দুই স্ফীত ভুরু চোখের উপর ঝুলে পড়েছে। চাবুকের আঘাত-ফল।]

জবাব দাও... আবু নওয়াস বলেছিল, তুমি কালো পাথর। সত্যি তুমি কালো পাথর। তোমার শরীর কি ফুলাদের মত ইস্পাতে গড়া? চাবুকের ঘায়ে তুমি নাকি আত্ননাদ পর্যন্ত করো না। সত্যি কোড়াদার?

কোড়াদার : জাঁহাপনা, বহুদিন আপনার নেমক খেয়েছি। কিন্তু এমন হিমাকাণ্ডওয়াল কয়েদী আমি কোনদিন দেখি নি। পিটে পিটে ওকে দূরন্ত করলেও, ও শব্দ করে না, আওয়াজ তোলে না।

হারুন : কি করে?

কোড়াদার : দেখবেন, আলম্পানা?

হারুন : হ্যাঁ, সেই জন্যেই ত এসেছি।

কোড়াদার : তবে দেখুন—

[কোড়া চালায়। অব্যক্ত ধ্বংসপ্রায় তাতারী শুধু দক্ষ অভিনেতার মত মুখমণ্ডল বিকৃত করে, আর হাঁপায়।]

হারুন : খামুস, কোড়াদার! আর কি করে?

কোড়াদার : জাঁহাপনা বেহুঁশ হয়ে যায়। কিন্তু তখনও গোড়ায় না, আত্ননাদ করে না। জনাব, এ কয়েদী ইনসান নয়। জীন, দেও বা পাথর।

হারুন : যা কোড়াদার, তুই বাইরে যা। কোড়া মশরুরের হাতে দে। যে হাতে মশরুর তলওয়ার চালায়, সেই হাতে আজ কোড়া চালাবে।

কোড়াদার : জো হজুর, জাঁহাপনা।

[মশরুরের হাতে কোড়া-প্রদান এবং প্রস্থান।]

মশরুর : আলম্পানা, কয়েদীর সমস্ত শরীর থেকে প্রায় খুন ঝরছে, ওর উপর আর কোড় চালানো বৃথা। বেহুঁশ হয়ে যাবে। আর কথা বলা চলবে না— যে জন্যে আপনার এখানে আগমন।

হারুন : বেশ, কোড়া ফেলে দাও। তবে রাখো, দরকার হাতে পারে।— তাতারী, মনে রেখো আজ তোমার কেয়ামত। আজরাইলও (যমদূত) আজ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। জবাব দাও— জবাব দাও। বেতমীজ গোলাম তবু স্থির নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। মশরুর এই বেতমীজের জিত টেনে টেনে ছেঁড়ার আয়োজন করতে হয়।

মশ্ৰুৱৰ : তা হোলে কি কথা-বলা সহজ হ'বে, জাঁহাপনা?

হাৰুন : হুঁ, মশ্ৰুৱৰ, সেও এক সমস্যা। ইনসানৰ সঙ্গে লড়া যায় কিন্তু এ ত পাথৰ— (পায়চাৰী-ৱত) গোলাম, তোমাকে শেষ সুযোগ দিলাম। নচেৎ— তারপর মশ্ৰুৱৰ তার কাজ শুরু করবে... জবাব দাও... (তাতারী নিৰ্বিকার। শাৰীৰিক যন্ত্ৰণায় শুধু মুখ কুঁচকে নিঃশ্বাস নেয় আৰ ফেলে) না, মশ্ৰুৱৰ— বৃথা কালক্ষেপ।

[হাততালি দিল। দুই জন গ্ৰহীৰ প্ৰবেশ]

গ্ৰহী : জাঁহাপনা।

হাৰুন : ওই কামৰায় একজন জানানা অপেক্ষা কৰছে, তাকে নিয়ে আয়।

গ্ৰহীদ্বয় : আসসামায়েো তায়াতান।

(প্ৰস্থান)

হাৰুন : (অঙ্গুলি নিৰ্দেশ) এক আজব সমস্যা।

মশ্ৰুৱৰ : জাঁহাপনা, সমস্যা জীইয়ে রেখে লাভ কি? আপনি শুধু হুকুম দিন।

হাৰুন : মশ্ৰুৱৰ, তার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? আমি ভাবছি—

মশ্ৰুৱৰ : আলম্পানা, কি ভাবছেন?

হাৰুন : ভাবছি, এত দৈহিক যন্ত্ৰণা এরা সহ্য করে কিভাবে?

মশ্ৰুৱৰ : জাঁহাপনা, আবু নওয়াস বলে— মানুষ আনন্দাতীত আরো কিছু পায়, যার কাছে এই যন্ত্ৰণা আৰ যন্ত্ৰণা মৰ্ণে হয় না।

হাৰুন : আনন্দাতীত— ও একটা পাগলৰ প্ৰলাপ। আবু নওয়াসই তা বলতে পারে।

মশ্ৰুৱৰ : আমি কিন্তু এই কয়েদীকে দেখে তা প্ৰায় বিশ্বাস করতে বসেছি।

হাৰুন : তুমিও বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছে।

মশ্ৰুৱৰ : জাঁহাপনা, অথবা এরা বোধ হয় মানুষ নয় অথবা মানুষ যা দিয়ে তৈরি এদের উপাদান তার চেয়ে আলাদা।

হাৰুন : তোমার পাগল হতে বেশি দেৱী নেই। এই দ্যাখো...

[এতক্ষণ তাতারী দাঁড়াইয়াছিল। শৰীৰে বোধ হয় অব্যক্ত যন্ত্ৰণা, তাই ধীৰে ধীৰে বসিয়া পড়িল। জায়গাটা বালুময়। হতব্যক্তিৰ ৰক্ত পৰিষ্কাৰেৰ সুবিধাৰ জন্য এই ব্যবস্থা। তাতারী বসিয়া পড়িল। তারপর দুই গোড়ালি চাপিয়া ধরিয়া মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে গুঁজিয়া দিল। সবই নিঃশব্দে ঘটে।]

মশ্ৰুৱৰ : জাঁহাপনা—

হাৰুন : আস্তে আস্তে, মশ্ৰুৱৰ।

[দুই জন ফিস্ফিস্ কৰ্তে কথা বলে]

আস্তে, একটু বিশ্রাম নিক্।

মশ্ৰুৱৰ : ওৱ বিশ্রামেৰ প্ৰয়োজন নেই।

হাৰুন : আছে। একটু তেজ সঞ্চয় করে নিক্।

মশ্ৰুৱৰ : জাঁহাপনা, তেজের উৎস আনন্দ। ওৱ তেজ হয়ত সেই এক জায়গা থেকেই আসে।

হারুন : মশরুর। তুমি বড় বাজে বকো। শুধু দেখো, দেখো। ওর তেজের সব পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি আজ। এই গোলাম—
 |কথার ছেদ পড়ে। মেহেরজানের প্রবেশ। পরনে রেশমি লেবাস। যৌবন সর্বান্তে ক্ষমাপ্রার্থীর মতো লুটাইয়া পড়িতেছে। চোখেমুখে হাসির ঝিলিক ছাপাইয়া ওঠে। আগু-রমণীর মতো চলাফেরা।|

মেহেরজান : জাঁহাপনা, কোথায় আপনার তামাসা? আমি—

হারুন : [হঠাৎ পেছন ফিরে] ধীরে, আস্তে—
 [এবার সকলে খুব নিচু গলায় সংলাপ-রত]

মেহেরজান : বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু আপনার তামাশা কোথায়? আমি ত কোতোয়ালের মাকানে বসে বসে হয়রান। শেষে আপনার ডাক যে পড়ল, তার জন্য শুকরিয়া, ধন্যবাদ—

হারুন : তামাশা নিশ্চয় দেখবে।

মেহেরজান : কিন্তু কোথায়?

হারুন : আছে, বেগম সাহেবা।

মেহেরজান : কিন্তু কই?

হারুন : [উপবিষ্ট তাতারীর দিকে নির্দেশ] ওই—

মেহেরজান : ও কে?

হারুন : একটা নাফরমান, অবাধ্য কয়েদী, আমার কথার কোন ইজ্জৎ রাখে না।

মেহেরজান : ওর গর্দান দু-টুকরা করেন। ওর অপরাধ কি?

হারুন : তার শুমার নেই।

মেহেরজান : তবু—

হারুন : আমার অবাধ্য গোলাম।

মেহেরজান : চাবুক লাগান।

হারুন : তা-ই লাগিয়ে লাগিয়ে ত শরীরের ওই দশা।

মেহেরজান : বেশ করেছেন। কিন্তু গোলামটা কে?

হারুন : বলছি, সব বলব তোমাকে।

মেহেরজান : কে এই গোলাম, মশরুর?

হারুন : মশরুর ওর নাম জানে না।

মেহেরজান : তা মশরুর নিজের মুখেই বললে পারে। গোলামটা কে?

হারুন : তুমি এগিয়ে গিয়ে নিজেই জিজ্ঞাসা কর না।

মেহেরজান : বেশ।
 [অগ্রসর হইয়া চতুরের কিনারায় আসে, তারপর বেশ জোরেই ডাক দেয়।
 এরপর স্বাভাবিক কণ্ঠে সব সংলাপ]
 কে— তুমি কে?
 [হাঁটুর মধ্যে মুখ গোঁজা তাতারী প্রথম 'ক' শব্দে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত মাথা তোলো। তারপর ধীরে ধীরে মেহেরজানের দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ রাখিয়া ঝাড়া

হয়।

তুমি কে?

[তাতারী উদ্ভাস্তের মত জিজ্ঞির-বাঁধা দুই হাত তোলার চেষ্টা করে]

কে তুমি?

[কোন জবাব আসে না। পেছনে ফেরে মেহেরজান]

কে এই গোলাম, আমিরুল মুমেনীন?

হারুন : তুমিই জিজ্ঞেস কর, জবাব নাও।

মেহেরজান : (মুখ ফিরাইয়া) তুমি কে? জবাব দাও। জবাব দিচ্ছ না কেন? (আবার খলিফার দিকে) কে এই গোলাম, জাঁহাপনা? ও জবাব দিচ্ছে না।

হারুন : জবাব আদায় কর।

মেহেরজান : তুমি কে?

[তাতারী নিরুত্তর]

হারুন : এ-কে চেনো না?

মেহেরজান : না।

হারুন : মশরুর, হাহ্ হা, মশরুর।

[হাসিতে লাগিল। বাধা]

মেহেরজান : হাসি বন্ধ করুন আমিরুল মুমেনীন। কে এই গোলাম?

হারুন : তুমি এ-কে চেনো না?

মেহেরজান : দুনিয়ার তামাম মানুষ কি আগ্নার জানা যে এ-কে চিন্বে?

হারুন : হাহ্ হা।... জিজ্ঞেস কর ও তোমাকে চেনে কি না।

মেহেরজান : জাঁহাপনা, কয়েদখানার এই অন্ধকারে এই বুঝি আপনার তামাশা? আমি বাইরে চললাম।

হারুন : তা যাও। কিন্তু তার জন্যে সারাজীবন আফসোস করতে হবে।

মেহেরজান : কেন?

হারুন : তুমি ওকে চেনো।

মেহেরজান : চিনি?

হারুন : হাঁ। ওই কোঁকড়া-কঠিন চুলের দিকে তাকাও। গায়ের চামড়া তো আর কালো নেই। চুল ঠিক আছে।

মেহেরজান : তুমি কে কয়েদী? জবাব দাও।

হারুন : হাহ্ হা। চার বছর ধরে আমরা জবাব পাই নি, আর তুমি। এই কয়েক লহমায় উত্তর পাবে।

মেহেরজান : কিন্তু এ কে? আমি চিনতে পারছি নে, জাঁহাপনা।

হারুন : হাহ্ হা। চিনতে পারলে না? গোলাম তাতারীকে আজ চিনতে পারলে না, মেহেরজান?

মেহেরজান : তাতারী... তাতারী... কিন্তু তাতারীর এই দশা কেন?

হারুন : নাফরমান অবাধ্য। তাই—

মেহেরজান : নাফরমান । কি ওর অপরাধ?

হারুন : মুখের কথা বন্ধ করেছে । ওকে কি না দিয়েছিলুম । বাগবাগিচা তয়খানা, বাঁদী গোলাম ইমারত— সব ইন্কার ঘৃণা করলে । বন্ধ করলে মুখের কথা । তাই চার বছর ধরে, তিলে তিলে শায়েস্তা হচ্ছে—

মেহেরজান : ইন্কার করলে?

হারুন : হ্যাঁ ।

মেহেরজান : ইন্কার করলে [একটু অগ্রসর হয়, পরে পেছনে ফিরিয়া]... জাঁহাপনা, যে নাফরমান তাকে কতল করেন নি কেন?

হারুন : হিমাকতের শাস্তি দেব বলে ।

মেহেরজান : সে শাস্তি ত অনেক পেয়েছে । আজ এখনই ওকে কতল করুন । হুকুম দিন, মশরুরকে ।

হারুন : তা তোমার পরামর্শে হবে না, মেহেরজান । আজো ও কথা বলুক, ওর সব অপরাধ আমি মাফ করে দেব ।

মেহেরজান : তাতারী, কথা বল, জবাব দাও । খোদা আমিরুল মুমেনীন ওয়াদা করেছেন । কথা বল । তোমার সমস্ত শরীর জখমে-খুনে জারেজার । এই জর্জর দেহের যন্ত্রণা আর কেন সহ্য করবে? কথা বল ।
(তাতারী নিরুত্তর)

হারুন : হাহ্ হা । জবাব আদায় কর, মেহেরজান ।

মেহেরজান : তাতারী, খোঁদার ওয়াস্তে— [একবার কথা বলা । বল...]হারুনের রশীদ হাসিতে লাগিলেন । হাসি থামিলে জাঁহাপনা, ওকে কতল করুন । ওর এই কষ্ট আর সহ্য করা যায় না । হুকুম দিন মশরুরকে ।

হারুন : না, মেহেরজান । কতল আমি ওকে করব না । জীবনকে যে পাশার ঘুটি বানাতে পারে এত সহজে, তাকে হত্যা করব না । তিলে তিলে দক্ষে দক্ষে—

মেহেরজান : না, জাঁহাপনা, এত নিষ্ঠুর হবেন না । দয়া করুন ।—

[নতজানু]

আমি আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা চাইছি, ওকে কতল করুন ।

হারুন : না, না— তা হবে না ।

মেহেরজান : হবে না?

হারুন : না ।

মেহেরজান : (উদ্ভাষ) হবে না... [তাতারীর দিকে অগ্রসর] কথা বল, তাতারী । তুমি এমন নির্বোধ কেন? স্বপ্নভাঙার পর স্বপ্নে-দেখা ধন-দৌলত হারানোর শোকে কেউ কোনদিন কাঁদে নাকি— এক নির্বোধ ছাড়া । নিজেকে কেন এইভাবে চুরমার করে ফেলছ? কথা বল । আমিরুল মুমেনীন ওয়াদা করেছেন... কথা বলো ... আমি তোমার দিকে চেয়ে রইলাম, কান পেতে রইলাম...
[তাতারী নিরুত্তর । খলিফা হাসিয়া উঠিলেন । হাসি থামার পর, মেহেরজান

ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, একদম তাতারীর কাছে বালুভূমির উপর। কথা বোলো, আমি অনুরোধ করছি। কথা বোলো....

তুমি যা বলতে, তুমি কি এত যত্নগা বুকে আজও তাই মনে রেখেছ। তুমি বলতে, “মেহেরজান, গোলামের মহব্বৎ আর এক আলাদা চিজ। তা আমির-ওমরার মহব্বৎ নয়। তারা দৌলতের কদর বোঝে। আর দৌলতের বড় গুণ হল বিনিময় আর হাতফেরী হওয়া। হস্তান্তর ছাড়া তার গুণ প্রকাশ পায় না। আমির-ওমরার মহব্বৎ এই হাতফেরীর মহব্বৎ। গোলামের প্রেম দ্রুততার মত স্থির— আকাশের একটি প্রান্তে একাকী মৌন— অবিচল— (রোরুদ্যমান) তুমি তেমনই অবিচল আছ। কিন্তু আমি... আমি ত বিনিময়ের ভাঁটিতে সিদ্ধ হয়ে গেলাম। আর বান্দী থাকলাম না। কোড়াঘাতের এত ব্যথা বয়েছ, এস মুছিয়ে দিই মুছিয়ে নিই—

[মেহেরজান হস্ত প্রসার মাত্র]

- হারুন : শান্তী শান্তী—
[দুই প্রহরীর প্রবেশ]
শান্তী, যা এই বিবি সাহেবকে বাইরে নিয়ে যা।
- মেহেরজান : [আতঙ্কিত] না, না।
- হারুন : সরম করিস নে, প্রহরী। দুইজনে দুই হাত ধর।
[তথাকরণ, টানিতে টানিতে অগ্রসর]
- মেহেরজান : [পশ্চাতে মুখ] তোমার যত্নগা মুখে নিতে পারলাম না, তোমার নির্মল দেহ স্পর্শের যোগ্যতা আমার নেই ... নাই বা স্পর্শ করলাম এই কলঙ্কিত হাতে [চীৎকার] তাতারী— তাতারী—
[কারাগার হইতে অপসৃত্যমান মুখ, শেষবার মেহেরজান ডাকে : তাতারী]
- তাতারী : (সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ) মেহেরজান, মেহেরজান (তারপরই) শোন, হারুন রশীদ—
- হারুন : বেতমীজ, জাঁহাপনা বল।
- মশরুর : বেয়াদব। বল আমিরুল মুমেনীন।
- তাতারী : শোন, হারুন রশীদ—
- হারুন : কোড়াদার মশরুর, মশরুর, কোড়া চালাও। বেয়াদব, বেয়াদব—
[কোড়া চালাইতে থাকে সেই অবস্থায়]
- তাতারী : শোন, হারুন রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব—। কিন্তু— কিন্তু— ক্রীতদাসের হাসি— না— না— না— না—
[পতন ও মৃত্যু, বেগে আবু নওয়াসের প্রবেশ]
- নওয়াস : আমিরুল মুমেনীন, হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।

[এইখানে পাঞ্জলিপি ছিল]

অসমাপ্ত

শব্দপঞ্জী

অগয়রহ	অ	ইত্যাদি
আক্কেলমন্দ্	আ	বুদ্ধিমান
আজ্জরাইল		যমদূত
আবে-হায়াৎ		যে-জল-পানে অমরত্ব মেলে
আলম্পানা		জগৎ পালক
আক্দ্		মন্ত্ৰগৃত বিবাহ
আদম সুরত		কালপুরুষ
আস্‌সামায়ো ভায়তান		শ্রবণ অর্থ পালন
আল্‌হামদোলিষ্টাহ		আল্‌লার জন্য প্রশংসা
আমিরুল মুমেনীন		মুসলমানদের শাসক প্রধান
আলিশান		খুব ঝলমলে
ইনসান	ই	মানুষ
ইনাম		পুরস্কার
উম্‌দা	উ	ভাল
উমেদার		প্রত্যাশী
কওম, কৌম	ক	গোষ্ঠী
কাফতান		আস্তিন
কুওৎ		শক্তি
কোড়া		চাবুক
খোয়ার	খ	শূন্য
খোয়ারি		তন্দ্রা
খোদকসী		আত্মহত্যা
খোশবু		সুগন্ধ
খুয়া		দরমা
খামুস		চূপ
খসলৎ		বভাব

গীবৎ
গেদা
গোঙ্
গেন্দুয়া

পরনিব্দা
উচু বালিশ
মাংস
খেলার বল

চ

চিঞ্জ

জিনিস

জ

জেনা
জেলদ
জেন্দা
জিন্দুত্বাহ্
জিম্মা
জাহেল

ব্যভিচার
মলাট
জীবিত
আল্লার ছায়া
সংরক্ষণের দায়িত্ব
অজ্ঞান

ত

তেলেস্মাৎ
তৌবাত্তাগফেরুল্লা
তিনকা
তরীবত

যাদু
শয়তান থেকে মুক্তি দাও, আল্লা
খড়
স্মৃতি, প্রাচুর্য

দ

দোস্ত
দহুসৎ
দাফন
দারাখৎ
দব্দবা
দীরহাম
দস্তর

বন্ধু
ভয়
কবর দেওয়া
বৃক্ষ
প্রতিপত্তি
মুদ্রা
নিয়ম

ন

নুরুল্লাহ্
নেকাব
নেমক
নসীব
নফর
নাফরমান
নিস্ত

দেবজ্যোতি
খোমটা
লবণ
ভাগ্য
ভৃত্য
অবাধ্য
নেই

ফ

ফরমাবরদার
ফল্‌সাফা
ফরজন্দ
ফেরেশতা

অনুগত
ফিলজফী, দর্শন
ছেলে
দেবদূত

মেহেরবানী
মুজরানী
মহক্বৎ
মালে গনীমৎ
মজ্কুর
মাওলা
মারহাবা
মোহাফেজ
মোজেজা
মেহ্মান
মহবুবা
মুসল্লী
মাকান

র

রসুমৎ
রুবাব
রোক্তাসা

ল

লাহাওলা
লেবাস
লুৎ

শ

শান-শওকত

স

সগুগা
সীনা
সাফ্ফাহ
সবুৎ
সদ্রিয়া
সুমসাম
সীনা-ব-সীনা
সঙ্গেসার
সরম

হ

হিমাকৎ
হাবিয়া
হর

দয়া
নর্তকী
শ্রেম
ধর্মযুদ্ধে প্রাণ মাল
উল্লেশিত
প্রভু
সাবাস
রক্ষক
অলৌকিক শক্তি
অতিথি
প্রিয়তম
নমাজী
ঘর

বাসরশয্যা
বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
নর্তকী

শয়তান থেকে বাঁচার মন্ত্র
পোশাক
পয়গম্বরের নাম

চাকচিক্য, আড়ম্বর

সহোদর
বুক
রক্তপিপাসু
প্রমাণ
জামা
নিঝুম
বুকে বুকে
পাথর দ্বারা চূর্ণ
লজ্জা

আম্পর্ধা
নরক বিশেষ
অঙ্গরী

চৌরসন্ধি



কালু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

হোটেল বসে বসে অশোয়াস্তি পোয়ানো কাঁহাতক আর ভাল লাগে? তাই সে আবার এক বোতল বীয়ারের অর্ডার দিলে। গ্রীষ্মকালে দুপুরে এই পানীয় পেলে ক্লান্তি, খিঁচড়ানো মেজাজের খোঁচানি থেকে সহজে রেহাই পাওয়া যায়। কালু হাল্লাক হয়েছে বসেছে, তা বলা চলে না। তবে মেজাজ বিগুড়ে ছিল। এখন একটু পানী ঢাললে যদি সরস হয়, তা-ই করা যাক। অর্ডার দিয়েও কিন্তু মনে মনে সে ইতস্ততঃ করছিল। তিন চার কাপ চায়ের পর আবার বীয়ার? ভুরু কুঁচকে হোটেলের চারিদিকে কালু একবার তাকিয়ে নিলে। লোকজন বেশী নেই। এক কোণায় তিন তরুণ চায়ের কাপ সম্মুখে গুলতানি করছে। হয়ত কলেজপলাতক ছোকরার দল। লাঞ্চের সময় কিছু ভিড় জমেছিল। কালু কিন্তু কিছু খায়নি। তার দুপুরের আহার কোন কালে দুপুরে হয় না। তিনটে, কখনও কখনও চারটে বেজে যায়। আজ আর ধারা বদলায়নি। কাউন্টারে এক বুড়ো কেশিয়ার সিগারেট টানছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। কালুর হাই উঠল যেন তাকে দেখেই। তারও কিছু বিশ্রামের বাড়ী, শয়ন দরকার। সেই ভূমিকায় সে চেয়ারে আরো একটু হেলান দিতে দিতে পা ছড়ানোর সময় পাংলুনের বেল্ট টিলে করলে।

ইতিমধ্যে বয় বোতল আর গ্রাস টেবিলে রাখলে। গ্রাস-বোতলে একটা ঠোকাঠুকি হয়েছে গেল। শব্দ উঠল, তা যেন কাঁচ-জাতীয়, বরং ইস্পাতের। কালুর মনে হলো, দেশে আজকাল ভালই গ্রাসের কাজ চলছে। বয় দাঁড়িয়েছিল। কালু তার দিকে ইশারা করলে, কেটে পড়ো। মাল সে নিজেই ঢালবে। দেয়ী করলে না কালু। আবার সোজা হোতে হয়। বোতল কাৎ করে সে পানীয় ঢালতে লাগল। ফেনা উঠেছে প্রচুর। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে কালু। আজ যেন আগেই মৌতাত লেগেছে। ঘুমঘুম কেন চোখ? হয়ত অনেকক্ষণ বসে থাকার জের। একটা ছ্যাক ছ্যাক শব্দ উঠল এই সময়। একটু সচকিত কালু। পরে লজ্জা পায়। হোটেলের বাবুর্চিখানায় কী যেন ভাজা হচ্ছে। তারি শব্দ। এক রকম গন্ধ ভেসে এলো। ঘাস শুকিয়ে হঠাৎ পানী ঢাললে যেমন বাস বেরোয়। কালুর স্বাগ-ইন্দ্রিয় এবার টনটনিতে ওঠে। ছাই, আজ হোলো কী? মেজাজ ফিরে আসছে না। সব চেয়ে উত্তম, গ্রাসে ডুব দাও। এক গ্রাস বীয়ার কালু এক চুমুকে মেরে দিলে। তারপর আবার গ্রাস বোকাই করতে লাগল। কিন্তু কী ভেবে অর্ধেক গিয়ে থামলে। কিছু বীয়ার বোতলে রইল। আবার ভাবলে সে, চীপ্‌স্‌ কি কট্লেট অর্ডার দিবে নাকি? না, থাক। চুমুক কাজে লেগেছে। আরো কত কত হাই উঠত। কিন্তু সে-পথ বন্ধ।

এবার ছোট্ট-সে-ছোট্ট এক চুমুক মেরে কালু গ্রাস নামিয়ে রাখলে। গোঁপে কিছু লেগেছে, মুছতে হোলো। মাথার উপর পাখা ঘুরছিল। তবু গরম যায় না। শার্টে বুকের

দু'টো বোতাম খুলে ফেললে কালু। আন্তিন গুটিয়ে নিলে। আবার চেয়ারে হেলান দিতে গিয়েও সে সটান ঝুঁকে গ্লাসে মারলে চুমুক। কিন্তু চুমুক নয়, চুমু। ঠোঁটে আলতোভাবে একটু তরল মেখে নিলে। গলার মধ্যে ক' ফেঁটা গেল, খোদাকে মালুম। বোধ হয়, বীয়ারটা বেশ একটু তেতো। তাই ঠোঁট কুঁচকালে কালু। চোখ ছড়িয়ে দিতে তার নজরে ধরা পড়ল, নতুন নতুন ইমারতগুলো আকাশ অঙ্গি খাড়া। ঝাঝা দেখায় কোন কোন দেওয়াল। দ্রুত বীয়ার পানের ফল, বোধ হয়। কিন্তু বাইরে রোদ্দুর খা খা করছে। ও, আমার জীপটা গরম হয়ে থাকবে। সীটও তাতা লোহা ঠেকবে বসার সময়। কোথাও ছায়ায় রেখে এলেই ভাল হোত। কিন্তু আলস্য এমন পেয়ে বসেছিল। কালু আর উঠল না। বরং পকেট থেকে সিগারেট বের করলে। দেশালাইয়ে ঠুকতে লাগল। মাথা একটু ভার-ভার। তবু বেশ আরাম পাওয়া যাচ্ছে। তাই আবার পা ছড়িয়ে দিলে কালু। তারপর ধীরে ধীরে সিগারেট টানতে লাগল। হোটেলের একটু চাঞ্চল্য বাড়ল। গোটা তিনেক মেয়ে খেতে এসেছে। তারা চার পাঁচটা টেবিল ফারাকে গিয়ে বসল। কালুর ভাঁটা-ভাঁটা বিরাট চোখ, ক্রুরতা ও হাসির সংমিশ্রণ সহ, তার বিরাট কদের সঙ্গে মানান-সই। এমন চোখ প্রায় বুঁজে ফেললেও কিছু না কিছু দেখা যাবে। সোজা তাকাতে তার লজ্জা লাগে। অপরের মাইয়া। বেরোক রাস্তায়। তা-তে কী। সরম যে-যার নিজের ব্যাপার। একজন ন্যাংটা হাঁটলে ত তার সামনে নিজেও উলঙ্গ চলা যায় না। মেয়েগুলো চায়ের অর্ডার দিলে। বোধহয়, টাইপিষ্ট। ফাঁকে এক কাপ চা খেয়ে আছে। লাঞ্চের সময় কাজের চাপে বেরোতে পারেনি। মেয়েগুলো বেহায়া নয়। এদিক ওদিক চাওয়া-চাওয়ি করছে না। একটি মেয়ে হঠাৎ আর এক জনের কথায় খিঁচখিল হেসে উঠল। কালু তখন প্রায় বোঁজা চোখ একটু বেশী করে খুলে দেখে নিলেন। যুবতী মেয়ে। পঁচিশ হবে। কে জানে বিয়ে হয়েছে কিনা। আগে এই শহরে বেরোত দু'-চারটে হিন্দু মেয়ে। সব হাঁ করে চেয়ে থাকত। এখন মুসলমান মেয়েদেরই রকম দ্যাখো। আর হাঁ করতে হবে না। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবে? ডাইনে বাঁয়ে আগায় পাছায়— চোখ খুলেছ কি মেয়ে, আর কণ্ঠী মেয়ে। মুসলমানগো অইল কী? হিন্দুদের এত গালাইলি ক্যান, ব্যাডারা? মেয়ে তিনটি তখন মুচকি মুচকি হাসছে নিজেদের মধ্যে। একটি চায়ের কাপ নামিয়ে অন্য একজনের খুৎনী নেড়ে দিলে। কালুর চোখ বুঁজে যায়। সুরঞ্জনের বিয়ে দিতে হয়। চৌদ্দয় পড়েছে তার মেয়ে। অহন একটা ভাল দুলা পাইলে আর দেবী না। হাতী পোষা যায়, মেয়ে পোষা যায় না। শহরে কেলেকারী বড় বেড়ে গেছে। কালু আবার গ্লাসে চুমুক দিতে সটান হোলো। না, এক বোতল ত কাবার, হ্যাঁ প্রায় কাবার। আর একটার অর্ডার দিলে তখনই। দু' বোতলেই জমে। বনিয়াদের উপর ঘর উঠে। নেশার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। মেয়ে তিনটে উঠে গেল। সময় পানীর মত খরচ হয়েছে যায়। অথচ সে বসে আছে সদুর অপেক্ষায়। যাক, বয়টা বড় কাজের, দেবী করেনি। বোতলের গায়ে হাত দিলে কালু। না, তেমন ঠাণ্ডা নয়। খোঁজ দিলে বয়, ফ্রীজ কিছুক্ষণ আগে থেকে বিগড়েছে। শালা, মাথা বিগড়ে যাচ্ছে ত, শালাদের ফ্রীজ। এই ঠাণ্ডাতেই চলবে। সদু এলে রক্ষা। কিছুদিন কেমন যেন চলছে। দেশে কত ফাঁক সৃষ্টি হচ্ছে। পটেকে তা হোতে দোষ কী? কিছু ঝরে পড়ুক। আমাদের মত গরীব গাড়লরা বেঁচে যায়। কালু বীয়ার ঢাললে নিজে।

বয় সরে গেছে। বখশীশের লোভ নেই তার। দুপুরে অনেক কামিয়েছে। এক সাহেব ত পুরো এক টাকা তন্তরীর উপর রেখে দিয়েছিল। কেশিয়ার দেখেছে। ব্যাটার চোখ টাটায়। অথচ নিজে তিন শ' পায়, তার দিকে খেয়াল নেই বয়ের মাথায় হাত বুলাতে ওস্তাদ। নতুন চাকরী পেতে ম্যানেজারকে পর্যন্ত কিছু খাওয়াতে হয়েছিল। বয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে যখন আড়চোখে তাকিয়ে ছিল আর কালু বীয়ার ঢালছিল, তখন আরো কথা ওঠে মনে, যা না জানলেও দুনিয়ার কারো কোন ক্ষতি নেই। তবে মন চূপ থাকে না। কালুর একটু ঝিমঝিম খোঁয়ারি লাগছে চোখে, তখন সেও ধানাইপানাই শুরু করলে, একদম বীয়ারের বুদ্ধদের মত নিঃসন্ত। ব্যবসায় জোয়ার ভাটা আছে। খালি এস্টার্লিশমেন্ট খরচা অর্থাৎ মাথায় মাথায় ব্যবসা চালাতে গেলে যেটুকু খরচা লাগে— কর্মচারীর বেতন, ঘরভাড়া নিজের খাইখরচা অগররহ— এসব চলে গেলেই, কে আর অত মাথা ঘামায়? এবার তবীলে টান পড়তে পারে। গত ক'মাস গাড়ী ঠিক রেল বরাবর চলছে না। অবিশ্যি অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। একটা কিছু করতে হয়। পা লম্বা করলে, কালু হেলান দিলে এবং তারপর আধখোলা চোখে পৃথিবী দেখতে লাগলে। হোটেলের আবার ঝিমোনি শুরু হয়েছে। খরিন্দার একটাও নেই। তিনটে বাজে। যত পারে বাজুক। কেশিয়ার একটু পক্ষীঘুম দিয়ে নিচ্ছে টেবিলের উপর এক পা তুলে। বয়-বর্গ কীচেনের ওধারে বোধ হয় যাচ্ছে। এই লোক-হীনতায় কালু খুব সোয়াস্তি পেতে লাগল। মগজেও কিছু গাঁজানি শুরু হয়েছে। আর কোন খিচড়ানি নেই মগজে। সদু যখন হয় আঙ্গিক। আবার পুকুরের পুরাতন রুই নিজের ঘাটে এসে ঘাই মারছে। সদু, সদু, চুলোয়সক। আসবে, না হয় না আসবে। কালু আবার খাড়া বসল। বীয়ারের চুমুকের কাছে এখন নববিবাহিত বৌর ঠোটও পান্সে, ফিকে লাগবে। আনন্দ, আনন্দ। গ্রাস নাঙ্গিয়ে রেখেছে ঠোট থেকে কালু এই মাত্র। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বড় মাছি— কুস্তিলের সঙ্গে নয়, আমাশার রোগীর সঙ্গে যার বেশী দহরম-মহরম, সেই মাছি! ওয়াক ঝুং। কাচুমাচু মুখ কালু সত্যি মেঝের উপর এক গাদা থুথু ফেলে নিলে। অবিশ্যি মাছি এসেছিল। কিন্তু কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। গ্রাসে ত বসেনি। তবু 'কুয়' এসে গিয়েছিল। চট করে আবার গ্রাসে মুখ দাও। বমি, মাছি থেকে রক্ষা। চোখ বুঁজে বিশ সেকেন্ডের চুমুক মারলে কালু। শরীর একটু প্রসারণ চায়। লম্বা করে পা। বেল্ট ত ঢিলে করাই আছে। খোঁয়ারি একটু জেকে এলো। তখন কালু তা হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় মাথা একটু খাড়া করতে গেল, কিন্তু অঙ্গের অন্যান্য টুকরো সায় দিলে না। একটু জিরোও। একটু আরাম করে। কালুর মনে হোলো তার লেবাস আর বদনে থাকতে নারাজ। সব খসে যাচ্ছে পাংলুন, শার্ট, জুতা। তাঁর লেবাস একদম বদলে যাচ্ছে। কিন্তু ধর্ম আছে শালীনতার নতুন কাপড় পড়িয়ে দিচ্ছে তাকে। একটা রং-ছুট লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, বহুৎ ছিদ্দির নক্ষত্র গামছা কাঁধে। জায়গাও বদলে গেছে। এই হোটেল— সে-নেই।...

নর্দমার উপর মাছি। মোতো যত পারো মোতো। আর তাড়ি গিলে, না মুতে উপায় নেই। চাতালের উপর কালু, বসে আছে আরো অনেকে। সবাই তার মত। কেউ রিক্সা টানে, কেউ ঠেলাগাড়ী, কেউ মজুর কামীন, যোগাড়ী বা ঐ জাতীয়। দেশী তাড়ির এক

মহফিল গুলজার হয়ে ওঠে সন্ধ্যার কিছু পরে। কালু বসে বসে তাড়ি খাচ্ছিল। মেটে ভাঁড় সামনে রাখা। সারাদিন রিক্সা টানার পর কিংবা টানার ফাঁকে ফাঁকে এসব না হোলে তাগদ আসবে কোথা থেকে? কালু তখন বলত, ইঞ্জিনে কয়লা মারছি, বাই! কারণ, তার পরই আবার রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। অনেক সময় হয়ত মহাজনের ভাড়া ওঠেনি তখনও, কাজেই শুধু বসে তাড়ি গিললে ত আর চলবে না। বউবাচ্চা উপোস করবে। আর যেদিন ভাড়া উঠে যেত, আরো দু-চার পায়সা বাড়তি থাকত, তখন মৌজ, মৌজ। চালাও নাও দাউদকান্দি। এক দিকে ভাটির দোকানদার কলস থেকে তাড়ি ঢালছে। খরিন্দার বে-যার বসে যাচ্ছে। বসবে বা কোথায়? একটা বেঞ্চি ভরে যায়। তখন সবাই চাতালে বসে। পাশা-পাশি ভাঁড় রেখে গপ্প চল। হাড়-ভাঙা খাটুনি এখানে ডুবে যায়। দোকানদার বেশ ইঁশিয়ার লোক। চাতালে এক কোণা দিয়ে এক লম্বা ড্রেগ বানিয়ে রেখেছে। কারণ, পানী খেলে পানী ছাড়তে হয়। তখন পাইপ খুলে দাও। বেশী তকলীফ করতে হবে না। রাত্রিও এখানে কানা মাছি উড়ে আসে। কালুর চোখে পড়ল ভাঁড়ে একটা মাছি পড়ে গেছে। তুলে ফেলে দিতে গেল। পাশের এক অচেনা লোক, সে এতক্ষণ বৃন্দ তাড়ি খাচ্ছিল, কারো সঙ্গে মুখ খোলেনি। এহেন ব্যক্তি হঠাৎ হে-হে কর-কী কর-কী ধারায় চিলে উঠল? আরে ভাই, তোমার নসীব খুলছে। চার আনার তাড়ি, আর মাছি ফাউ। এমন সওদা কার কবালে কও জোড়ে? ঢুকঢুকু খাইয়া লও। কালু অবিশ্যি তাড়ি ফেলে দেওয়ার কথা ভাবছিল। কিন্তু চার গজা পয়সা! নর্দমায় ফেলে দিতে বাধে, বেশ একটু বাধে। পাশে বসেছিল মোসলেম আলি, লোহার শুদামের কুলি। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তাকে ষাট বছরের জয়ীফ বুড়ো দেখায়। চুল পেকে গেছে। গলার কণ্ঠা বেচপ বেরিয়ে এসেছে একদম থুৎনী-পার। সে বেঞ্চির উপর বসেছিল, হাতে ভাঁড়। এক দিকের পছা তুলে সে আগে একটা সশব্দ বাৎকর্ম করে নিক্ষেপ, তারপর নিজের মনে হি-হি হেসে উঠল। এমন হাসি, এবং কি বলতেও চায় সে। কথা আটকে গেছে। তাই তা তুলে ইশারা করে। তারপর তাল সামলে কালুর ভাঁড় তুলে নিয়ে বলে, তোমার মুখ দেখে বোঝা গেছে, তুমি এই লাইনে নতুন। আমার টাটকা ভাঁড়ে ডুব দাও, আমি তোমার মাছি খাব। তারপর ঢকঢক, এক চুমুকে অনেকখানি গিলে উর্ধনেত্র হয়ে রইল। একজন তখন নেপথ্যে রসিকতা করলে, পৌছে গেছে। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক কোন উচ্চস্তরে এখন সে আসীন বা উপস্থিত। জমায়েৎ চোখ তখন সব মোসলেম আলির উপর। কিন্তু জহরী লোক। মণিমানিক্যের ঝলকে তার চোখ অভ্যস্ত। সুতরাং বেশীক্ষণ আর দামী পাথরের উপর নিবদ্ধ থাকতে পারেনা। একটা ঢোক গিলে সে পাশ্চবর্তী সঙ্গীর জানুর উপর চটাং-শব্দে তালু মেরে গান ধরলে...

যেদিন খন লাং মরেছে

হুইনি আর কারো কাছে...

কোরাস ধরবে কী, অন্যেরা হো-হো হেসে উঠল। মোসলেম আলির কোন দিকে ক্রক্ষেপ নেই। তার বিরহিনী। বারান্দা মৃত প্রিয়তমের জন্য খেদ করতেই লাগল। তাড়ির আড্ডায় অসত্য ঝুট কিছু থাকে না। মানুষের মুখ থেকে যা বেরোয় তা অন্তর থেকেই বেরিয়ে আসে। ভাষা এখানে সত্যিই ভাষা। ভগমি নয়। ঝুট নেই। ঝুটা আর কী থাকবে?

অপরের চুমুক দেওয়া ভাঁড়। কিন্তু কালুর অত ঘিন ছিল না। তা-ছাড়া সেও পৌছব পৌছব করছিল। কিন্তু পারেনি। রাস্তায় তার রিক্সা অপেক্ষা করছে। কেউ চুরি করে নিয়ে গেলে ত মহাজনের দণ্ড দিতেই হবে। বুজির রাস্তাও বন্ধ। এই ডাঙা বা ধর্ণির জন্য কালু ডুবতে পারছিল না। নচেৎ মন কী আর ছুটি, না, সাঁতার কাটতে কখনও বিমুখ থাকে। এমন পাশাপাশি ঘেসাঘেসি উত্তাপ ত কোথাও মেলে না। উঃ, আলির গান চলেছে ত চলেছেই। বেটা ছেলের গলায় মেয়েছেলের গান কী সাজে? একজন মন্তব্য করতে মোসলেম আলী থামল। কিন্তু একদিকে তর্ক বেধে গেল জোর। বেড়ীর চইলত ক্যামনে? দুই দল হোয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। একদল বললে, বেড়ী পুঁজি ভান্কাইয়া খাইত। অন্যরা মন্তব্য করলে, মহাজন না, হে বেড়ী গতর খাডায় আমাগো লাহান, পুঁজি থাইকব ক্যামনে? ফয়সালা হয় না। হল্লা অত বেড়ে যায়, এখনই না পুলিশ এসে পড়ে। ভাটিখানার কর্মচারী, মালিক এখানে কমই আসে, অভয় দিলে, কেউ আসবে না। কিন্তু মওজের স্রোত একদম একখাতে নয়, বহু খাতে বইতে লাগল। কেউ তবলা বাজায় আর একজনের পিঠে, কেউ ধেইধেই নাচে। সাবাস, সাবাস, হাঃ বেডি, ছন্দরক্ষী করতালি— শব্দেও মওজ ওঠে। চতুরের দুই ভাগ। মাঝখানে ফুট চার আন্দাজ ফাঁক, যাতায়াতের পথ। একদিকে দেওয়াল জুড়ে দোকানদারের রঙ্গমঞ্চ এবং সামান অর্থাৎ তাড়ির কলস-বৃন্দ। আজ রঙ্গমঞ্চে রং চড়েছিল। কর্মচারী একবার চেখে দেখেছে বৈকি নিজেদের মাল। ঢেউ যখন ওঠে, নৌকার গলুই না ভিজে পারে কী? কিন্তু এই সময় এক নতুন খরিদার আসাতে সবাই তাকে অভিনন্দন দিলে, এসো-এসো রবে। একজন দ্রুত করেই বললে, ‘আ যা মেরী বালামওয়া’। আগন্তুক গরীব খাঁ। হাজারা না বালাকোটের অধিবাসী, আল্লাকে মালুম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কী করে, হয়ত খুন বা আর কিছু করে, এই বাঙলা মল্লকে ছিটকে পড়েছিল। নানা জীবিকায় মজেছে। দরোয়ানী, কাশড়-ফেরি, বাবুচিগিরি, মুটেগিরি— এমন ধারা পেশায় কিছু বাদ দেয়নি। শেষে ফেসে গেল যশোর শহরে এক কুলীর মেয়ের সঙ্গে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর কেটে গেছে। গরীব খাঁর পাঠানতু ঘুঁচে গেছে। কালো হোয়ে গেছে রোদ-বৃষ্টি আর বিবির পয়জারে। যারা ওর বৌকে দেখেছে তারা বলে পাংলা এক-হারা চেহুরার বেডি। কিন্তু পাঠান তার কাছে একদম কেঁচো। যাদু-টোনা না মহক্বে— খোদা, খোদা তুমিই সব জানো। কিন্তু গরীব খাঁ নামে যা সামাজিক মর্যাদায়ও তা-ই থেকে গেছে। অনেক পঞ্জা লড়েছে সে নসীবের সঙ্গে। সে নড়েছে, নসীব নড়েনি। এই কালীটোলার এলাকায় তাকে দেখবে। বাচ্চাগুলো কিছুটা বাপের আদল পেয়েছে। কিন্তু খাবার ত পায় না। গরীব খাঁ পর্যন্ত মুল্লকী সহবতে এই তাড়িখানার সাগরেদ। একটু টান আলাদা। নচেৎ চমৎকার বাঙলা বলে। আর চেহরা পুড়ে গেছে রোদে, ক্ষুধায়। তাই ওকে আর দশ জন থেকে এই জমায়েতে আলাদা করা যায় না। তার ঢ্যাঙা তালগাছ চেহরা অবশ্যই চোখে জানান দেয়। গরীব খাঁ চুকেই স্তব্ধ। জোর মওজ জমেছে। কিন্তু সে প্রায়-হাঁক মেরে বললে, ‘এই মাগীর ভাই... লোগ।’ যশোরের জামাই। সেই সুবাদে সে ইয়ারদের সঙ্গে এই রসিকতা প্রায়ই করে। মোসলেম আলি তখন খাঁ সাহেবকে তর্জনী প্রথমে বাড়িয়ে পরে বড়শীর কাঁটার মত করে অভ্যর্থনা জানায়। এসো, এসো। আ যা মেরি সেইয়া... মোসলেম মোল্লার ঘাড়ে গানের ভূত চেপেছে। গরীব খাঁ তার কাছে যাওয়া মাত্র সে

নিজের ট্যাক থেকে পয়সা বের করে এক ভাঁড় তাড়ি নিয়ে এলো না শুধু, সবাইকে ডাক দিলে, ‘ভাইসব, নিজের গ্লাস ভাঁড় সব উঁচু করেন।’ কী ব্যাপার? একদম স্তব্ধ এতক্ষণের জমাট হলো। ভাইসব...। ব্যাপার কী? মোসলেম এক কালে বাবুর্চি ছিল, সাহেবদের অনেক খাইয়েছে পিলিয়েছে অর্থাৎ পান করিয়েছে, আজ ইয়াদ পড়ে গেল। মোসলেম আলি আর সে চাকরী পায়নি। কারণ তার হাতে শ্বেত ধবল। আজ মনে পড়ে গেল, চীৎকার: ভাইসব আমি ‘চিরিস্’ ‘চিরিস্’ বলব তারপর এক সঙ্গে যে-যার ভাঁড়ে মুখ দেবেন। সাহেবরা ‘চীয়ার্স’ বলে, দেশী এবং বিলাতী সাহেবরা। মোসলেম আলি দেশী করে নিয়েছে ভাষা। গরীব ঝাঁ এক ঢোকেই নিজেকে ফিরে পেলে। এমন ঢালাও খাতির আর সে কোনদিন পায়নি। গ্লাস নামল, ভাঁড় নামল জমিনে। প্রথমে গরীব ঝাঁ-ই মুখ খোলে। সেত এই শাদীর মহফিলে ‘দুলা’। চেনা-শোনা সবাই তাকে খাতির করতে এক-পা বাড়িয়ে আছে। ঠোঁট জিত দিয়ে মুহুতে মুহুতে সে গমগমে গলায় একটু হাঁকা আওয়াজেই বললে, “তারপর বিবির ভাইলোগ...” সবাই হেসে উঠল। কিন্তু মোসলেম আলিকে আর রোখা যাবে না। তাকে সং. সংগীত দুই ধরেছে। সে সুর ভেঁজে উঠল :

আমি মাগীর ভাই

গোটা রাজ্য চালাই...

কোরাস ধরে নিলে কয়েক জন সঙ্গে সঙ্গে। ধেই ধেই নাচও শুরু হয়ে গেছে। কয়েকজন কোমর জড়া জড়ি, নাচছে। ওদের হুঁশ আর বেশী নেই। গরীব ঝাঁ পর্যন্ত কোরাসে যোগ দিয়েছে আর মাঝে মাঝে হাসছে। না, যেটা মওকা-মাফিক আ গয়া। মনে মনে গরীব ঝাঁর আন্দোলন ওঠে। কাল্লুর নেশা জ্বলছে। কিন্তু আর বেশী দূর তার পক্ষে তখন অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ভাঁড়ে চুমুক দিয়েছে সে কিন্তু কোরাস থেকে কেটে পড়েছে। গানের কী জোর। সবাই না গাইলেও ঠোঁট নাড়ছে। নচেৎ বুকের ভেতর ত কিছু আন্দোলন তুলছেই। ...‘গোটা রাজ্য চালাই...’ রনন থামতে চায় না। কিন্তু কাল্লু দু-তিন বার খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলে, নেশা আর না মগজে ঢোকে। সর্বনাশ হয়েছে যাবে। বাড়ী ফিরতে কিছু হাঁটতে হয় রিক্সা গ্যারেজে রাখার পর। তখন যদি মাথা পা টলে-টলে, পুলিশ পাঁচ-আইনে দিতে পারে। অন্যথায়, রাস্তায় হয়ত সারা দিনের কামাই রেখে যেতে হবে। যেখানে রোজগারের গোড়া সেখানেই শেষ। কিন্তু মোসলেম আলি গৃহিণীর ভ্রাতাদের আশ্রয় এত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তার মধ্যে ডুব দিতে মন হাসফাঁস করে। আর না। ঢের হয়েছে, এবার উঠে পড়া উচিত। সেই সময় গরীব ঝাঁ আবার এক লম্বা-চওড়া হাঁক মারলে “এই মাগীর ভাইলোগ্ আওর এক ভাঙ্... ফিন্ জলদি।” কাল্লুর পায়ে কিছু তলানি পড়ে ছিল, সে এগিয়ে দিলে। আর নেশা না। বরং পাঠানের উপর দিয়ে যাক। বিবির পয়জার সব চেয়ে মিষ্টি। এমন ধাঁধার কথা বলে একদিন সে মজলিস মাতিয়েছিল। আজ কাল্লু কথাগুলো স্মরণের চেষ্টা করলে বেশ মাথা চুলকে চুলকে। কিন্তু কিনারা করতে পারে না। আবার দু’ দম নিঃশ্বাস টানলে সে জোরে। মাথা একটু ঝিমঝিম করছে। নেশা না পেয়ে বসে। ফেরার সময় কি যেন কিনে নিয়ে যেতে হবে গিন্নী বলে দিয়েছিল। চুলোয় যাক সংসার। মাথা মুগু এত হিসেব করে দুনিয়ার বাস চলে? সকালে উঠলেই যত বায়নাক্কা। তখন রোজগার আর খরচে মেলাতে হয়। কাল্লু ফলে বেশ চাঙ্গা হয়েছে উঠেছিল। যেন

কিছুই যায়নি। হারাম তাড়ি না গিলেও উপায় নেই। নচেৎ শরীর কিম্বিকিম করে। আবার নেশায়ও মাথা কিম্বিকিম। হাঁয়েও যা, না-হয়েও তা। শালার দিগ্দারী যে দুনিয়ায় কত রকম, লেখাজোখা কঠিন। আসর ভয়ানক গর্মে উঠেছে গরীব ঝাঁ-কে কেন্দ্র করে। কিন্তু কালু আর এই জনতার মধ্যে নেই। পরিষ্কার মাথায় সে চারিদিকে তাকায়। আর একজন লোক তার মত নির্বিকার বসে আছে চাতালের বাম-কোণায়। শ্রৌট বয়স। খুৎনীর উপর মাত্র এক গোছা সাদা খাটো দাড়ি। মাঝামাঝি দোহার চোহর। মুখে বেশ কিছুটা কাঠিন্যের ছাপ, তার কালো শরীরের ফ্রেমে আরো প্রকট। লোকটা কিন্তু বার বার তার দিকে তাকাচ্ছে। অনেক সময় অপলক নয়ন। চোখাচোখি হোতে কালু লজ্জা পায়। সে ত আর ঘেটুর দলের পোলা নয়। আরো কয়েক দিন ওকে দেখেছে এখানে, আর ওই একই জায়গায়। আলাপ হয়নি। লোকটার গতিবিধি অসোয়াস্তিকর ঠেকে কালুর। হঠাৎ সমস্ত পরিবেশ তার কাছে মনে হয় তেতো, তেতো। ওয়াক, থুঃ। লোকটা আবার বেহায়ার মত তার দিকে চোখ ফেলেছে। অন্য সময় একটা খোঁজ নেওয়া যেত কাছে গিয়ে আলাপ মারফৎ। কিন্তু আর এখানে এতটুকু মন টিকছে না। রিস্তা রাস্তায় ফেলে এসেছিল। মাত্র এক টোক গিলে ফেরার কথা। দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল। তবে আজ রোজগার পুষিয়ে গেছে। খানকীর পুৎ মহাজনকে টাকা দিয়ে গাড়ী গ্যারেজে রেখে ঘরে ফিরতে পারলেই সব ঠিক থাকে। বসে থাকতে ইচ্ছে হয় খুব। কিন্তু আর না। শ্রৌট লোকটার হোল কী? না, আলুর দোষ ছিল, এখন নেশায় পেয়ে বসেছে। গরীব ঝাঁ তখন মালাকাসী গ্রাম্য সঙ্গীত পরিবেশন করেছে ধেই ধেই নৃত্য সহ। থুঃ। সত্যি এক পাশে একদল পুথু ফেললে। কালু এখনও চাইছে নাকি? হঠাৎ পেছন ফিরে দেখতে গিয়ে কালু ধরা পড়ে গেল। ধারণা ঠিক। আলুয় পেয়েছে নাকি হারাম-জাদাকে?...

পরদিন আবার নেশার কিছু হল্লা বয়ে গেল। সেই লোকটা তখনও এসে পৌছায়নি। তার বরান্দ জায়গা খালি পড়ে আছে। কালুর অসোয়াস্তি লাগে। লোকটার হৃদিস নিতে মন চায়। অথচ আজ গায়েব। যাক, চুলোয় যাক। কত স্যাঙাৎ আসে যায়। বুড়ি-গন্ধার মত কত মড়া ভেসে আসছে আর যাচ্ছে। এত ভেবে কী লাভ? ভাঁড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে সৈঁধোয় সেদিন কালু। চুমুক জোরে মারে না। গোলাপি আসতেও সময় গেল। নেশার ধর্ম আছে। বেখেয়াল করাই তার ধর্ম। সুতরাং নেশা আসেও বেখেয়াল। কোন ঠিক নেই, কখন ভর করবে। কোণার ফাঁকা জায়গাটায় কিন্তু কালুর বার বার চোখ ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে আছে সে। হঠাৎ ঝুপ করে স্ত্রামালেকুম শব্দে তার পাশে একজন লোক বসে পড়ল। সেই লোকটা! আজ সে স্বাভাবিক মানুষ। পেটে পানি পড়েনি। এক নিমেষে কালু তাকে তলিয়ে দেখে নিলে। অসীম ধূর্ততা তার চোখে। চোখের ঝিলিক অসহ্য। যেন কাউকে বিধতে পারে সে কেবল দৃষ্টির সাহায্যে। তবে ঠোঁটে হরদম এক রকমের মাখন হাসি লেপ্টে রয়েছে। এখানে অভ্যর্থনাই বড় কথা। ঝুপো গোঁফ নয়। ছোট ছোট করে কাটা। তাই হাসি সহজে বেরিয়ে আসে। নিমেষেই এসব ঘটছে। সালামের জবাব দিয়েছিল কালু। তার পর ভ্যাবাচ্যাকা। আর কী বলবে বা আবার জিজ্ঞাসায় কী জবাব দেবে তা হৃদিস করতে পারেনি। কিন্তু লোকটা চট করে এক ভাঁড় নিয়ে তার পাশে

এসে বসে পড়ল। কাল্লুর তখন হুঁশ হয়। লোকটা দু'টো বিড়ি বের করে একটা এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, “কিছু মনে করো না।” বয়স বেশী। সুতরাং তুমি সম্বোধনে রাগ হয়নি কাল্লুর। অবিশ্যি কত খানকীর পুং ত তার বয়সের ইজ্জত রাখে না, পেশা রিক্সাওয়ালা ব'লে। দশ বছরের ছেলে পর্যন্ত ডেকে বসে, এই ভাড়া যাবে? আর সাহেব খানকীয় পুংরা ত ‘ভাড়া যাবি’ আকসার বলে, যদিও বয়স তাদের বেশী হবে না। বেশী হোলেই বা কী? জানাশোনা নেই অথচ এমন ডাক দিতে ও-শালারা যেমন অভ্যস্ত, আমি হালাও শুনতে অভ্যস্ত। ইষ্টেমালা ভালই করেছে। কিন্তু শ্রৌড়জনের গলার সঙ্গে বুকের যোগ আছে। গাল দিলেও গোঁসা বেরোবে না। সুতরাং আলাপ হোতে আর কতক্ষণ লাগে? এখানে সবাই আসে হারানো একটা কিছু যেন পেতে। হাল্লাক অনেকক্ষণ গাড়ী টেনে টেনে, মনের হৃদিস পাওয়া যাচ্ছে না। চলো, এক কেতা মাল টেনে আসি। আর সংসারের দিগ্দারীতে অস্থির, চারিদিক ছেঁড়াছেঁড়া। চলো, ভাটির ঘাটে। একদফা নিম-গোসল হোয়ে যাক। হায় ফুর্তি, লে ফুর্তি। কাল্লু যেন লোকটার ভেতরের গন্ধ পায়। অবিশ্যি তার আগে জহরী জহরৎ চিনে ফেলেছে। ইতিমধ্যে চুমুকে চুমুকে দুজনেই অজ্ঞাতসারে কতদূর এগিয়েছে খেয়াল করতে পারেনি। নামে ত দু'জনকে কবেই চিনে ফেলেছে। শ্রৌড়জনের নাম বেচু সর্দার। সে কিন্তু কাল্লুর আসল পরিচয়ে আদৌ আগ্রহী নয়। আগে ভূমিকা পেতে নিয়েছিল সর্দার :

‘তোমাকে মাষ্টর বলব।’ মাষ্টারের অপভ্রংশ। কাল্লু সেদিন দিল-খোলা হাসি হেসেছিল। জীবনে যে কখনও মকতবের উঠান মাড়ায়নি, তার ঝাম মাষ্টর। কিন্তু অপর দিকে তখন সাফাই গাইতে কসুর করে না, “মানিক কি জানে সে মানিক?”

“তা ক্যামনে জাইনব?”

“তুমি মানিক। আমি বলব : মাষ্টর।”

কাল্লু সেদিন অবাক না হোয়ে পারেনি। কি পেয়েছে লোকটা তার মধ্যে? আজ তেমন নেশা করেনি যে হঠাৎ আলুর বদনাম দেওয়া যায়।

হাম-পেয়ালা ভাব জলদি জমে উঠল। সর্দার জিজ্ঞেস করেছিল, “মাষ্টর, তুমি কী করো?”

“রিক্সা টানি।”

“রিক্সা?”— তারপর মুখ কুঁচকে এমন জ্রকুটি করেছিল সর্দার, আজও প্রায়ই তা চোখের উপর জানান দিয়ে যায়। হেসেছিল এই সময় বেচু মিয়া। জোরে নয়। অবিশ্বাস, ব্যঙ্গ, ঘৃণা সব মিলে যেন সেই শব্দের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করছিল। আবার তার জিজ্ঞাসা—

“তুমি রিক্সা টানো? পাহালওয়ান দিয়ে ধাইয়ের কাজ?”

কথাটা বুঝে উঠতে পারেনি কাল্লু। কেন সে কি হাইকোর্টের জজ হবে নাকি? বিদ্যা নেই। বুদ্ধি থাকলেই বা কী? এবার সর্দার চুপ। মিটিমিটি হাসছিল তার মুখের দিকে চেয়ে। কাল্লু আরো অবাক। নেশা ত পায়ের তলায় আছে। খুব জোর হাঁটুতক্ উঠেছে। আক্কেল গুম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তাকে গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরোচ্ছে বা ডুবাচ্ছে। তারপরই বেচু মিয়া তাকে ডাঙা দেখায়।

“আমার কথা হচ্ছে। তোমার শরীর ত নয়, ইস্পাহ। তুমি ত ফুলাদ, মাষ্টর। তুমি রিক্সা টানবে কেন?”

“একটা কিছু করন ত লাগে”।

লাগে। হাঁচা কথা। কিন্তু যেখানে ভেড়া লাগে সেখানে ঘোড়া জুড়বে নাকি?”

“তয়—”, আমতা-আমতা করেছিল সেদিন কালু। আরো জেঁকে বসল সর্দার, “তুমি গাধা নও যে ধোপার ঘাটে খাটবে। তুমি জঙ্গের ঘোড়া, ময়দানে লড়বে।”

আবার বিস্ময়ের পানীতে ঠাণ্ডা কালু। সাপের চোখে পাখীর চোখ পড়েছে। চুপ করে যেতে হয়। সর্দারের মুখের দিকে চাওয়া ছাড়া কোন কাজ থাকে না। সামনে তাড়ির ভাঁড় আল্লা-আল্লা করে।

কিন্তু লোকটার পাল্টাতে দেরী হয় না। এবার মৃদু হাসি ছিটোয় সে। তারপর এত মোলায়েম কণ্ঠ মৃদু অথচ খোলতাই করে, “মাষ্টর, তুমি রিক্সা টানবে। তার নতিজা কী?

“নতিজা?”

“আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তার নতিজা, খালি পেট মেরে মেরে নানা রোগ জুটবে। বউ-বাচ্চা উপোস করবে, নিজেও একদিন তাড়িখানা থেকে কাবর-খানায়।”

শিউরে ওঠেনি সেদিন কালু। হয়ত গায়ে জোর আছে ব’লেই পাল্টা দিয়েছিল সোজাসুজি, “হালাল রুজি হালাল কামাই করি। আল্লা দেখবেন।”

সর্দার থুথু ফেলেছিল উঠানে এক গাদা। এবং ঠোট দুটো যথাসম্ভব বাড়িয়ে হুঁ-শব্দ তুলেছিল নাক দিয়ে। আবার কণ্ঠ সতেজ, “হালাল কামাই? হালাল রুজিতে এই মুল্লুকে কোন হারামজাদার দিন চলে? হালাল... হালালের আর...” সব কথা কালুর মগজে সঁধেয়ানি। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। কারণ, সর্দারের মুখ আবার চালু, “মাষ্টর, তুমি নিজেকে চেনো না। আমার চুল রোদে পাকেনি। জীবনে কত কী দেখলাম। তুমি ত সেদিনের পোলা।”

নিজের আক্কেলের উপর আস্থা থাকলেও কালু আর মুখ খুলতে পারেনি। বারেক সর্দার এক ভাঁড় তাড়ি এগিয়ে দিয়েছিল। তাই মুখ আবার ফাঁক হয়।

মানুষে মানুষে ফাঁক কিন্তু আর বেশী দিন রইল না। সর্দার তার জীবন বদলে দিলে। তার দেওয়া মাষ্টর নাম সার্থক। যদিও ইলেম সর্দারই দান করেছিল তা-কে।

হাতে খড়ি হোলো। ছিচকে চুরি দিয়ে আরম্ভ। হাত পাকাতে হয় নাকি প্রথমে এই ভাবে। ধীরে ধীরে তরক্কী। সর্দারের মতে প্রথমেই গাছের মগ্ডালে উঠতে গেলে নির্ঘাৎ ঠ্যাং ভাঙবে। সেই জন্যে রঙে রঙে। কিন্তু চেলা গুরু-হত্যা করে বসল। দেখা গেল, সে কয়েক মাসে গুস্তাদের বাঁয়ে ত যায়ই না, বরং সমান সমান। ছোট চুরি বন্ধ হয়েছে গেল। গন্ধমুখিক মেরে হাত নাকি শরীফ লোক দুর্গন্ধ করে না। যাদের আক্কেল কম, পায়তারা কম বোঝে, তারা কি করে থাকে? আল্লা জান দিয়েছে সবার। বেচু সর্দার তাই ছিচকে চুরির দিকে আর শিষ্যকে যেতে দিল না। এদিকে রোজগার বেশ বেড়েছে। অন্ততঃ রিক্সা ঠেলার চেয়ে এত বেশী যে, খোয়াব মনে হোতে পারে। আর যখন নসীব খোলে তখন কত দিকেই না তার দরজা বের হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগল ইউরোপে। তার ডেউ দিকে দিকে লাগতে বাধ্য। সুতরাং এদেশেও লাগতে বাধ্য। ইউরোপের বুটের নীচে গোটা এশিয়া। এক দাঁউ এলো। নানা রকমের চুরি হঠাৎ গজিয়ে উঠল। এবার দু’ হাতে কামাও। অবিশ্যি তখনও ডাকাতির খেয়াল কারো হয়নি। চুরি করো, তবে বড় চুরি। কমসে কম

এক থাবায় যেন পাঁচ হাজার গুঠে। আর এমন পেশায় বাঁচতে পেলো কিছু গুণাগিরি করতে হয়। সেখানেও কাল্পনিক গুণীদের চেয়ে টেকা মারলে। দু'জনের সুবাদ তখনই চিড় খেতে লাগল। এক বিছানায় দু-সতীন কী করে শোয়? কোন কিছু বলা-কওয়া। নেই বেচু সর্দার একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কাল্পনিক জানার কথা নয়, ডাক্তার জানে পুরাতন সিফিলিস রোগ সর্দারের মাথায় তখন নানা রকমের পোকাকার বাসা বানিয়ে ছিল। তার পূর্বে গুরু হালচাল দেখে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছিল কাল্পনিক। সর্দারের বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছে।

একদিন সে বললে, “মাষ্টর, চুরি করে আমাদের ত পেট ভরছে, কিন্তু বহু লোক তো ভুখা থাকছে। লাভ কী চুরি করে?”

“সকলকে খাওয়ানোর ভার আল্লার, আপনি আমি কী করব?” কাল্পনিক উত্তর।

“কিন্তু ভুখা মরবে। কবে আল্লা খাওয়াবে, তার জন্য বসে থাকব?” কেমন নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল সর্দার।

এসব মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ। অথবা বেশী বয়স বিধায় বোধ হয়, বৈরাগ্য দেখা দিয়েছিল। বুড়ো কালে নাকি এমন হয়। কসবী তসবী টেপে তখন। আরো আলামত, সর্দার তাড়ি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিল অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে, ধরলে হুইস্কি। এবার হুইস্কি পর্যন্ত ত্যাগ করলে। তার কয়েক দিন পরে একদম উধাও। মুষড়ে পড়েছিল। গুরুর কথা কানে বাজত, “মাষ্টর, মনে শান্তি পাইনি। পেটের জন্যে গেরস্থর সর্বনাশ করি, নেশায় নেশায় একটা কিছু হয়েছে যায়, কিন্তু মন বসে না কেন? ... চুরি করে নিজে না হয় বাঁচলাম, কিন্তু দুনিয়ায় ত আরো মানুষ আছে। সবাই চোর বললে কী বোঝা হান্ধা হবে? লোম ছিঁড়লে মড়া হান্ধা হয়?...” এমন সব মারফতী কথা বেচু সর্দারের মুখে। কাল্পনিক প্রথমে মনে মনে হাসত। কিন্তু সত্যি নিরুদ্দেশ হওয়ার পর মাঝে মাঝে কত দিন না সে বিমিয়ে পড়েছে। ছেড়ে দিলে কী হয় এই সব রাহাজানি, খুনখারাবী? কিন্তু খাব কী? কিন্তু এমন প্রশ্ন সাময়িক কাল্পনিক কাছে। তার তাজা রক্তে হরদম কত বন্যা ডাকে, তখন ওসব বুজরুকী থৈ পায় না। গুরু বিদায়ের পর কাল্পনিক ব্যবসায় আরো মন দিলে। সকলে তাকে ভয়-শ্রদ্ধায় বা যাই হোক, আদরেই ধরা যাক না, মাষ্টর ডাকে। গুরু গেছে, তার দেওয়া খেতাব মেটেনি। বরং সার্থকতা আরো ফলতে শুরু করল। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে জার্মান, ইংরেজ, রুশ, আমেরিকা, তামাম পৃথিবী। কত কী ওলট-পালট শুরু হয়েছে গেল। কাল্পনিক তা হাড়ে হাড়ে টের পেলে। গুণ্ডা নাম তার শুধু নিজের মহল্লায় আটকে ছিল না। লোকে ভয় করত বৈকি। কিন্তু মনে মনে যে ছোট-লোক ভাবে, দূর ছিঃ করে? একটা খটকা। ‘বেঁচে লাভ কী’ যদি মানুষের ভালবাসা না পাই? গুণ্ডাদের শেষ দিক-কার কথা মনে পড়ে যেত। কিন্তু খটকা মুছে গেল একদিন, সে গুণ্ডা হোক আর যা-ই হোক, সে সম্মানে কারো ছোট নয়। সমাজে যারা ইজ্জতের চিল্কোঠায় বসবাস করে, তারাও তাকে কম সম্মিহ করে না। ব্যাপারটা এই ভাবে ঘটে যায় :

পুরাতন শহরে মাত্র তিন কামরায় আরো পুরাতন বাড়ীতে তখন কাল্পনিক বউ আর মেয়ে নিয়ে থাকত। রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্যি চুনকাম মারফত পুরান জীর্ণতা হটিয়ে দিয়েছে

সে। আশেপাশে সব বস্তী। দু'একজন অবস্থাপন্ন লোক আছে। তারা ছোটখাট ব্যবসাদার, ধনী কসাই বা ঐ কিসিমে পড়ে। জোরেসোরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লেগেছে। দেশময় জিনিসের টানাটানি। কাপড়, চাল, ধান, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের টানাটানি। তার ফল, জান্ নিয়ে টানাটানি। ইজ্ঞে নিয়ে টানাটানি। এই সোজা কথা লোকে কিছুটা বুঝতে শিখেছিল। তাই স্থানীয় এক কাপড়ের কলে ধর্মঘট চলতে থাকে। কাল্লুর কাছে এসব খবর কোনদিন আসেনি। তার নিকট সংবাদ এলো। কিন্তু সূত্র আলাদা। একদিন তার বাড়ীর সামনে এক ঢাউস গাড়ী এসে ব্রেক কষল। দু'জন লোক নামলেন। পরণে শার্ট কামিজ। একজনের হাতের আঙ্গিনা গুটানো। রূপালি চেন-বাঁধা দামী সোনালি রঙের ঘড়ি চকচক করছে। উভয়েই তন্দুরন্ত শরীর। জেল্লা ফেটে বেরুচ্ছে। কড়া নাড়ার পর দরজা খুলে দিয়েছিল কাল্লু। রাস্তায় গাড়ী আর অচেনা দুই ব্যক্তি দেখে সে ঘাবড়ে যায়। তার দুষ্কর্মে কিছু হদিস পেয়ে এনুকোয়ারীতে এসেছে নাকি এরা? পাপ চাপা থাকে না। কথাটা ফলছে নাকি এই কলিকালে? একটু উদ্বিগ্ন চোখে আর মনে মনে হিসেব-নিকেশের দ্রুত মেশিন চালিয়ে যেতে কাল্লু জিজ্ঞেস করেছিল, “কা'কে চান?”

“আপনি কি, কাল্লু সাহেব?”

মিয়া থেকে এক লাফে সাহেবে উত্তরণ তার জীবনে সেই প্রথম। আরো উত্তরণ ঘটেছিল পরে আদেশা সহজে মুছে যায়। কাল্লু স্বাভাবিক গলায় জবাব দিয়েছিল, “জী”।

“আপনাকে দরকার আছে একটু”।

“আসুন”। ব'লে ফেলেও কাল্লু মনে মনে বেশ সন্মোদিত হয়। এই সাহেবদের বসতে দেওয়ার মত ত তার জায়গা নেই। ধনী প্লেক্সের বাড়ী সে বহু দেখেছে নৈশচর জীবনে। কোচ, সোফা, কার্পেট তার অজানা কিছু নয়। একবার ত উঁচু পায়াওয়ালা সোফায় তার নসীব খুলে দিয়েছিল। এক বাচ্চা ছেলে তার মধ্যে ঢুকে বসে থাকে। রাত্রে ভেতর থেকে শিকল খুলে দেয়। তারপর বেশ দাঁড়িয়ে চুরি করতে পেরেছিল তারা। চারটে চেয়ার অবিশ্যি তার বসার ঘরে আছে। ময়লা পালিশচটা। যাহোক, আসুক। মেহমান মানুষ।

চা খেতে চায়নি তারা। তবু কাল্লুর জিদের কাছে তাদের হার মানতে হয়। তাদের বিনয় এবং কাচুমাচু ভাব সেদিন কাল্লুকে হয়রান করে তুলেছিল। এই শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। অবশ্যই আছে। দা এবং কুমড়ার রেষ্টা। এখন ত হরি এবং হর যেন দুই পক্ষ। বেশীক্ষণ অন্ধকারে বুলতে হয়নি কাল্লুকে। চা-পানের সময় ধীরে ধীরে তারা এই গলিগন্তব্যের উদ্দেশ্য খোলাসা করল। কাপড়ের কলে এক মাস ষ্টাইক চলছে। তারা মালিক এবং ম্যানেজার। উভয়ে কাল্লুর দ্বারস্থ। এমন ব্যবসার সঙ্গে কাল্লুর কোন পরিচয় ছিল না। সে-রীতিমত হকচকিয়ে যায়। সে কী করতে পারে? কিন্তু পরে আলাপ-আলোচনায় জেনেছিল, তার খ্যাতি বহু দূর বিস্তৃত। তার সঙ্গোপসঙ্গদের নিয়ে সে তাদের নানা-ভাবে ধর্মঘট ভাঙার হাতিয়ার হোতে পারে। নতুন জগৎ এবং রোজগারের জগৎ কাল্লুর সম্মুখে। সে তবু কিছু হদিস করতে পারে না। সব যেন ভানুমতীর বাজি। এই শরীফ মানুষদের কাছে তার খ্যাতির এত! স্বর্ণময় সিগারেট-কেস থেকে আধেয় বের করে তাকে উপহার দিতে মালিক নিজে এতটুকু ইতঃস্তত করলে না। এত ইজ্ঞে আল্লা তার জন্য গোপনে জমিয়ে রেখেছিলেন? সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা! ম্যানেজার নগদ

দু'হাজার টাকা তার সামনে রেখে বলেছিল, “আপনি রেখে দেন, আপনার যোগাড় যন্তে দরকার হবে।” মানুষের মর্যাদা নেই? টাকাই সব? এই মাত্র খাতিরা লোকের কাছ থেকে টাকা নেওয়া কালু মনের সঙ্গে মেলাতে পারেনি। অপর পক্ষে ভাবলে, দর কষাকষি করছি। আরো দু'হাজার রাখলেন মালিক নিজে। ধাঁধায় ঘোরে কালু। এদের কী করে বুঝাবে, সে গুণা, চোর, বদমাস— সব কিছু। কিন্তু টাকার সঙ্গে তার এমন সম্পর্ক কোনদিন আজো ঘটেনি। হার মেনেছিল কালু। টাকা নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। রোজগারের অনেক দরজা। সেই সান্ত্বনা। ষ্ট্রাইক ত ভেঙে গেলই। কালু মালিকদের সংস্পর্শে আরো ঘনিষ্ঠ। তাদের ড্রয়িংরুম ডিনার-টেবিলে সেও আমন্ত্রিত। ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত তাকে সমীহ করে। হঠাৎ-হঠাৎ টাকার প্রতি নেশা থাকে না আর কালুর। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে হৃদিস পায়। সব ব্যবসার নিষ্ফল উপর। তার ক্ষমতা আছে, তাই তার খাতির। লোকে বলে গুণামি ঘৃণ্য। কিন্তু শরীফ লোকই যখন গুণা পোষে তখন এখানে অবজ্ঞার কী থাকতে পারে? আর এক সমাজের স্তরে তার জায়গা আছে কয়েক মাসে কালু বেশ উপলব্ধি করেছিল। আগে হুগ্গায় হুগ্গায় প্রায় থানার বড় বারুকে সালাম দিতে হতো। এখন তিনিই তার হাত তোলার আগে হাত তুলে বসেন। চেয়ার থেকে উঠে বলে, ‘বসো, কালু মিয়া।’ এখানে এখনও মিয়া পদবী মৌরসী আছে। তবে খোদার ইচ্ছা। এখানে কলের সাহেবদের সম্বোধন একদিন শোনা যাবে বৈকি। পুরাতন শহরেই সে বাড়ী বদলাল। আরো একটা কামরা বেশী। বাতাস বেশী। তবে পরিবেশ পূর্বের মত। ভদ্রলোকদের সঙ্গে তার মহৎ গড়ে উঠেছে। কিন্তু পাশাপাশি থাকায় তার পোষাবে না। সে ত মূর্খ। এই খোঁচানির থেকে রেহাই পেতে কালু সত্যি একটা মাষ্টার রেখে দিলে। লুকিয়ে লুকিয়ে সে পড়ে আর হাতের লেখা লেখে। বেশী তৈরি চায় না। নাম-সই করতে পারলেই যথেষ্ট। মোটামুটি বাংলা খবরের কাগজ পড়ার ইংরেজীতে নামসই রপ্ত করতে তার বেশী দিন যায়নি। তবু ভদ্রপাড়ায় গিয়ে থাকার কথা কালু ভাবতে পারে না। মনের কোণে কোথায় যেন বাধা। তার লুঙ্গি, পাজামা খসে খসে পাংলুনে পৌছানো প্রায় গুয়োপোকার প্রজাপতি হওয়ার কথা। সবই পালানুক্রমে। সবই কিছু রোজগার আর কিছু মনের তাগিদ, সংসর্গের তাগিদ। শরীফদের সঙ্গে উঠাবসা করতে হয়, তখন লেবাস বদলাবে বৈকি। কিন্তু তার শিকড় ত আরোও নীচতলার লোকের সঙ্গে। তাই চটচট কিছু করেনি কালু। সঙ্গীদের চোখ না টাটায়। ওরা পাছে না ভেবে বসে, মাষ্টার আর তাদের নিজের লোক মনে করে না। এমন ধারণা জন্মালে একদিন ঘাড় মটকে চলে যাবে। ভূতের দলে থাকতে গেলে শিব হোতে হয়। সব জানো অথচ কিছু জানো না। ভান আর ভাং দুই দরকার। ভাং ভুলে থাকার জন্যে। ভান নিজের ভেতর ঢাকার জন্যে। এমন দো-টানায় পড়ে বহুবার কালু ভেবে ছিল, তার চেয়ে রিক্সা টানাই ভাল ছিল। এত ঝঙ্কি পোয়াতে হোত না। কিন্তু রাস্তা এতদূর অতিক্রম করে এসেছে যে, আর ফেরার প্রশ্ন অসম্ভব কল্পনা মাত্র। সুতরাং ভূত নাচাতেই হবে সারা জীবন। সাহেবরা তাকে নিয়ে এমন নাচের মহড়া দিচ্ছে না? এমন কথাও মনে উঠেছে মাঝে মাঝে। কিন্তু তা ভেবে লাভ নেই। খাও, দাও, কামাও। ফুটি করো। মেয়ে মানুষের নেশা কেন যে কালুকে পেয়ে বসেনি সে কোনদিন বলতে পারবে না। তাই সময় কাটে কম। লেখাপড়া শিখে একটা উপকারও হয়েছে গোয়েন্দা কাহিনী

সে খুব পড়ে। মাষ্টারি রাখতে গেলে এসব জানা দরকার। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে আক্কেল লাগে। অবিশ্যি রূপার পাতের কাছে সব মিয়া বশ। কিন্তু বই পড়তে ভালবাসত কালু। খবরের কাগজ সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। আর তাকে রণক্ষেত্রে যেতে হয় না। সেনাপতি লড়াইয়ের ময়দান থেকে বহু দূরে থাকে। কৌশল, পায়তারা যোগানোই তার কাজ। যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষ লাগল। তখন ক'দিন কাগজ পড়ে আরাম পাওয়া যেত না। খালি মৃত্যু, মৃত্যু। কিন্তু রোজগার বেশ বেড়ে গিয়েছিল তার। দেশে চুরি-ডাকাতি এত বেড়ে গেল, শহরে এত রাহাজানি হোতে লাগল যে ইংরেজ, বিদেশী সরকার তারও টনক নড়ল। একদিন খবরের কাগজ দেখে কালু বেশ অস্থির হোয়ে পড়েছিল। এই জন্যে তার ধারণা, লেখাপড়া না শেখাই ভাল। মনের উপর চাপ পড়ে, ঝঞ্ঝাট বাড়ে। দেশে নাকি নতুন আর একটা আইন হচ্ছে। গুপ্ত-আইন আগেও ছিল। এবার তার সঙ্গে নতুন খেই জুড়ছে কর্তৃপক্ষ। এলাকার সৎ, গণ্যমান্য লোকদের ইশারায় শুধু সন্দেহের বশেই যে-কোন লোককে গুপ্ত ব'লে গ্রেপ্তার করা যাবে। শুধু সন্দেহের বশে? বেশ কথা ত? লাগিয়ে দিতে কতক্ষণ? যে কেউ যে কারো নামে উল্লেখ দিতে পারে। তার জন্যে এমন বিচার ব্যবস্থা? অবিশ্যি আইন-সভায় আইন পাশ হোলে তারপর বলবৎ করার প্রশ্ন। ভাবনা চিন্তার পানী সূতরাং বেশী দূর গড়িয়ে লাভ নেই। কালুর সঙ্গীরা পর্যন্ত শুনে হয়রান। রুজি রোজগার যাবে না শুধু, বাল-বাচ্চা পর্যন্ত মরবে। মাষ্টার মুরুবি। চিন্তিৎ, কিন্তু সর্দারি রাখতে অভয় দিয়েছিল, ঘাবড়ে যেয়ে না।

দুনিয়ার মানুষকে সব ফেরেশতা বানানোর চেষ্টা এখনও কেউ করেনি। কালুর মাথায় তখন খেলছিল কাপড়ের কলের সেই মালিকের কথা। তিনি ত আইন-সভার সদস্য। আর বিশিষ্ট মেম্বর। তাকে ছাড়া আইন পাশ হবে নাকি? দেখা যাক। দেখতেই গিয়েছিল সে। খাতির তার কমেনি, যদিও তার ডাক ঘন ঘন আর পড়ে না। কর্তা নিজেই ড্রিনিং-রুমের ভেতর আর এক ছোট কামরায় তাকে চা খাইয়েছিল। তারপর আসল কথা। কর্তা প্রথমে বিশ্বাস করেনি। শেষে হেসেছিল। আইন পাশ করতে হয় বৈকি। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা নচেৎ থাকে কী করে? কিন্তু তার ত ভোট আছে, দব্দবা আছে। কালু আঙ্গুল দিয়েছিল ওইখানে। সেদিন কর্তার জবাব শুনে থ' বনে গিয়েছিল। এই ব্যক্তিও অসহায় হোতে পারে নাকি? এত ধন-সম্পদ, রব্দব প্রতিপত্তি। সেও অসহায়? কানে কথাটা বাজে।

“মিয়া, আমি সরকার পক্ষীয় লোক, কথা ঠিক। কিন্তু সরকার যদি কিছু করতে চায়, আমি বাধা দিতে পারব না।”

“কেন, সাহেব।”

“আমারও ত দশজনকে নিয়ে কারবার? ওদের কথা না শুনলে মার কথা ওরা শুনবে কেন?”

“আপনার আবার কার কথা শোনা লাগে?”

“লাগে। আমাকেও ব্যবসা-বাণিজ্য করে খেতে হয়। যুদ্ধের সময়, দেখছ পদে পদে আইন। চালের কন্ট্রোল আগে কোন বাপের জমানায় শুনেছিলে?”

“তা শুনিনি।”

“এখন শুনছ। এখন গভর্নমেন্টের কথা আমি না শুনলে ওরা আমার কথা রাখবে

কেন?” কালু সেদিন সব হৃদিস করতে পারেনি। তবে বুঝেছিল, দুনিয়াটা আরো জটিল। কত গাছের শিকড়, কতো রকমে, কত দিক দিয়ে জড়াজড়ি করে চলেছে। তা অত সহজে চোখে পড়ে না।

“তাহোলে আমরা মরব?”

“মরবে কেন?”

“একটু শক (সন্দেহ) হবে, আর ধরে নিয়ে গারদে পুরবে।”

“মগের মুল্লুক নাকি?”

“তাছাড়া কি? বিচার হওয়ার আগেই গারদ। মগের মুল্লুক না?”

“কিন্তু তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন?” কলের মালিক বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিল।”

আরো কী বলত, কিন্তু কালু মাঝখানে বেড়া তোলে, “সাহেব, আমাদের আর আপনাদের দরকার নেই।”

“কে বললে নেই?”

“তাই ত মনে হয়। আচ্ছা, না হয় আপনাদের নেই দরকার থাক। কিন্তু আপনাদের কোন উপকারে কি লাগিনি। সেবার শবগঞ্জের মিটিংটা যে ভেঙে দিলাম, শুধু আপনার কথার উপর। আপনাদের বিরুদ্ধে পার্টি একটা কথা আর বলতে পারলে না। উন্টে ওদের মাইকটা পর্যন্ত উধাও হয়েছে। বলুন, আমরা না থাকলে, আপনাদের পার্টি এতদিন টিকত?”

কালুর চ্যালেঞ্জ-রঞ্জিত স্বর সেদিন ছোট্ট কামরার মধ্যে আটক থাকেনি। ম্যানেজার পর্যন্ত ড্রয়িং-রুম থেকে ছুটে এসেছিল। আগে থেকেই কিছু আঁচ করতে পেরেছিল বোধ হয়। তাছাড়া, কর্তা একদম জ্যান্ত পিস্কুর সাপের সঙ্গে মুখোমুখি। কখন কী করে বসে কে জানে। ছোট লোক ত। ম্যানেজার কালুর আরো অভিযোগ কান পেতে শুনেছিল প্রথমে। সোজা কথা, “স্যার, এক মাঘে শীত পালায় না, আমাদের দরকার পড়বে একদিন না একদিন।”

কিন্তু ম্যানেজার বিলেত ফেরৎ। সে আবার হেসে উঠেছিল, কালুর কাঁধে হাত রেখে। তখন মালিক কী বলতে গেলে, তাকে থামিয়ে দিয়েছিল ম্যানেজার, “স্যার, আমি ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, কালু সাহেব, আইন ত দেশে কতই আছে।”

“তা আছে।”

“সব আইন মত কাজ হয়?”

“তা হয় না।”

“তবে আর ঘাবড়াচ্ছেন কেন। তাছাড়া আপনাকে ধরছে কে? কার ঘাড়ের ক’টা মাথা আছে?”

“কিন্তু জনাব, আমার দলবল নিয়ে আমি। তারা ছাড়া আমি কে?”

“তাদের ব্যবস্থা আপনি করবেন। আপনার ব্যবস্থা যেমন আমরা সব সময় করতে প্রস্তুত আছি। এই রকম দুনিয়ার ধারা। শিকলের আংটার মত। আমি আপনাকে ধরে আছি, আপনি আমাকে ধরে আছেন, আর একজন আর একজনকে ধরে আছে। এই ভাবে

চলছে দুনিয়া।”

“কিন্তু স্যার, আইন করবেন আপনারা আবার আইন ভাঙবেনও আপনারা। তবে ওটা করার দরকার কী?”

মালিক তখন এগিয়ে আসে দার্শনিক হাওয়ায়, “কালু, সাহেব, এই হচ্ছে দুনিয়া। কোথা দিয়ে যে কী হয়, কেউ জানে না। জানেন তিনি—,” তারপর চোখ বুজে তর্জনী উর্ধ্বে তুলে উচ্চারণ করলে, “সব তাঁর ইচ্ছে। তুমি আমি কি? কিছু না। পুতুল। তিনি সুতো নাড়েন, আমরা নড়ি।” সত্যি এই কথা, লাখ কথার মধ্যে এক কথা। অনেক অশ্বোয়াস্তি ছিল, কিন্তু কালু, সেদিন আর তেমন উদ্বেগের মুখে পড়েনি। তার নিরাপত্তা যখন আছে, দলের মাথার উপর ছাড়া আছে। সত্যিই ত সে বিরাট বটগাছ ছাড়া আর কী? তলায় কতজন আশ্রিত। বটগাছেই যখন ঝড় লাগছে না, তখন ওদের আর কী ভয়? আর মাসে মাসে তাকে কিছু নরবলি দিতে হয়। অবিশ্যি মুণ্ড-কাটা বলি নয়। এই ধরন আলাদা। কালুর সেকথা মনে উঠলে বেশ হাসি পায়। কাছে লোকজন থাকলে সেই হাসি গোঁপের আড়ালে খেলে যায়। থানার এক বড় বাবু ছিলেন। চুরি বেশী বেড়ে গেলে, তিনি ডেকে বলতেন, “কালু মিয়া, এলাকাটা যে তোমাদের একদম রাজত্ব বানিয়ে নিলে।” কথার মাত্রা মাত্র। ইঙ্গিত বুঝে নিতে কালুর বিলম্ব ঘটত না। মানীর মান মানী জনেই রাখে। ওদের প্রয়োজন হয় উপরঅলার কাছে মুখ রক্ষা। দেখা গেল, দলের দু’জন ধরা পড়ে গেছে। শাস্তি হোয়ে যেত এক বছর, দু’বছর জেল। তখন তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে হোত যদিই না বেরিয়ে আবার ভীরা রোজগার করে। বালবাচ্চা সবায়ের সমান। কেউ কোন দিন বলতে পারবে না, কালুর পরিবারের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছে। গুণ্ডা-আইন পাশ হোলে ধরে নেওয়া যাক, খরচ কিছু বাড়বে। ঝুঁকির ব্যবসায় গাঁয়ে আঁচ লাগতে দেবে না, এমন হয় না। সেদিন ওঠার পর ম্যানেজার নিজের গাড়ী ড্রাইভ করে’ যে জায়গায় কালু নামতে চায় তাকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিলে। রাস্তায় আর বেশী কথা হয়নি। তার মত জাহেল লোক দুনিয়ার কত রূপ না দেখতে পেল। আজ পেটের ভাতের অভাব নেই। আল্লার কাছে শোকর! দুনিয়ার কত মার, কত প্যাঁচ। রিস্তা টানলে এসব ত সে দেখতে পেত না। নিজের রাশভারী ব্যক্তিত্ব সেদিন যেন নতুন ধরা পরেছিল কালুর কাছে। বাড়ী পর্যন্ত আসেনি সে। পথে এক জায়গায় নেমে পড়েছিল। সামনে পার্ক। দুপুরে ঝিলমিল গাছের ছায়া, নানা রকমের সবুজ লতার বেষ্টনী, শাপলা ভরা ঝিলের হাওয়ার স্পর্শ লাগুক তার গায়ে। যত এগোও, তত ঝঞ্ঝাট। এখানে এখন লোকজন কম। এমন নির্জনতার মধ্যে কালু সারা সকাল তলিয়ে দেখলে। কিন্তু তল পেল না। কিন্তু একটা অতি-চাপা খুশীর ভাব তাকে বেশ উদাস করে রেখেছিল। আজ ট্যান্ড্রি না এনে সে ভালই করেছে। খুব জোর স্পীডে চালাত গাড়ী। জোর, জোর, জোর। এ্যাকসিডেন্ট করে বসত হয়ত। তখনও তার নিজের গাড়ী হয়নি। হব-হব করছে। কিংবা সামর্থ্য থাকলেও কিনতে ভয় পেত। আশপাশের লোক কি বলবে? পাড়ায় থাকলে কানাঘুসা, চোখ-টানাটানির প্রতি সম্মান রাখা উচিত। অবিশ্যি যখন পাড়ায় থেকেও তুমি অনেক উপরে-উপরে ওড়ার কুণ্ড পাবে, তখন কিছু যথেষ্টাচারী হোতে পারো। তাই এক ট্যান্ড্রিওয়ালা ছিল তার তাঁবে। চোরাই মালপত্র সরাতেও গতির সাহায্য চাই। নচেৎ

বেগতিকে পড়বে। তাই চারচাকাবাহী ইঞ্জিন দরকার। অনেক কিছু দরকার। সবই পেশার চরিত্র অনুযায়ী। অন্ততঃ একজন স্যাকরা ত লাগে। সোনা আর গহনার ফারাক কাল্প কাজে নেমে বুঝতে শিখেছিল। সোনা আল্লার নিয়ামৎ, আল্লার দান। তার মালিক স্বয়ং খোদা। কিন্তু গহনার মালিক তিনি নন। গহনা শহরে কোন বাসিন্দার। নর, নারী যাই হোক। এই পার্থক্য না-বোঝার ফলে একবার বহুৎ গচ্ছা, বহুৎ দাঁড় (দণ্ড) দিতে হোলো। মুছুরী, পেশ্কার, নাজির, উকীল সব খেয়ে ফেললে, প্রায় এক শ' ভরি সোনা। সেই প্রথম প্রথম ব্যবসা। এত গলির হৃদিস সে জানে না। তখনই সে বুঝেছিল, চডুই পাখী, ছাতার পাখী, কাক-চিল, বাজপাখীর তফাৎ। তার মত চডুইরা এক দানা ক্ষুদ্র পেলে খুশী। কিন্তু যত পাখীর শ্রেণী বাড়ে, আহাৰ্যের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পায়। এক শ' ভরি সোনা খেয়ে ফেললে মাত্র কয়েক জনে। তার রোজগারে কত ঝুঁকি ছিল। হাতে এলে এক বছর নিশ্চিন্তে বসে খেত। কিন্তু হাতে এসেও ফস্কে গেল। কানাঘুষায় সে গুনেছিল, উকীল সাহেবকেও উপরে ভাগ দিতে হয়। অর্থাৎ, দুনিয়ার ময়দানে বহু তীর্থ, বহু মাজার। সিন্ধি দিয়ে যাও, দিয়ে যাও। শেষ পর্যন্ত তোমার কিছু নাও থাকতে পারে। কিন্তু উপরে ঝুঁকি ক্রমশঃ কমে আসে। কাল্প জানে, ধরা পড়লে নির্ধাৎ তিন বছর শ্রীঘরে ঢুকিয়ে দিত। হাতেনাতে ধরা পড়েনি। তাই রক্ষা। কিন্তু ভাসা-ভাসা অপরাধের জন্য তার এক তাল সোনা চলে গেল। অথচ যারা আসলে খেলে, তারা কোন কসুর করলে না। সেই ধাঁধায় এখনও কাল্প ঢুকে আছে। কোন কৌতূহল নেই বেরোanোর। কিন্তু একদিন, টাটকা সেদিন শুধু প্রশ্নটা সামনে ঝাড়া হয়েছিল। অবিশ্যি সে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু অপরাধের প্রশ্ন-দান ত অপরাধ। তবে? তবে?....কিন্তু সেদিন প্রশ্ন পার্ক কাল্পের মূৰ্ত্ততার উপর কোন আলোকপাত করতে পারেনি। কারণ, সকালের রহস্য-ঘোর তার চেয়ে অনেক বেশী অন্ধকার-লিণ্ড। আশপাশের বৃক্ষরাজির সঙ্গে একাত্ম কাল্প নিজের জৈবিক তাগিদে সিগারেট ফুঁকেছিল এক, দুই, তিন— হয়ত আরো। তখন অবসরের মাত্রাও খুব কম নয়। কাল্প, তাই ভাবতে পারত। ছেলেবেলা থেকে তার এমন অভ্যেস। গ্রামজীবনের ক্রোড় থেকে নানা দুর্বিপাকে বিছিন্ন, শহরতলীর পার্কে এসে কাল্প যেন সৃষ্টির রহস্য বুঝতে চায়। ভেতরের চাপা খুশী এক একবার উপরে ঘাই তুলে সটান ভেসে থাকার পক্ষপাতী। কিন্তু সব ঘুলিয়ে যায় কাল্পের চোখে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু দেখতে তার মন বিমুখ। আমগাছগুলোতে একটা বড় ঝিঁ ঝিঁ পোকা হঠাৎ-হঠাৎ ডাকতে গিয়ে কিড়িড়িড়ি কী রকম একটা বিকট শব্দ তোলে। কাল্পের তন্ময়তা চিড় খায় না সহজে। তখন ভুরু কুঁচকে সে জোর দুই দমকা নিঃশ্বাস নিল। একদা নেশা ঝেড়ে ফেলার জন্যে প্রয়োজিত অস্ত্র। কাজ হোলো খুব সহজে। হোটেলে গিয়ে এক টোক বীয়ার পানের পর শিষ্যদের সঙ্গে কাজকর্মের খতিয়ান গুরু করলেই এই জাতীয় অশ্বোয়াস্তি পালাতে রাস্তা পাবে না। হাই তুলে উঠেছিল কাল্প, পার্কের বেঞ্চি ছেড়ে। আবার চাপা খুশীর পোঁচ দুনিয়ার দেওয়ালে। নিকটস্থ একটা রিস্ত্রায় চেপে হুকুম দিয়েছিল কাল্প, 'হোটেল মমতাজে যাও।' অর্ডার হাঁকার পর তার চোখে পড়ে, রিস্ত্রাচালক বুড়ো। পঞ্চাশের কম নয়। তখনই আবার হুকুম, 'থামান, মিয়া সাহেব।' নেমে পড়েছিল কাল্প। তারপর চালকের হাতে এক টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিল, 'মিয়া সাহেব, আপনার

কামের ক্ষতি করলাম। আমি অহন যামু না।” রিক্সাচালক ত থ’। খামাখা সে টাকা নেবে কেন? সে জবাব দেয়, “টাকা দ্যান ক্যা?”

‘মিয়া লন, রিক্সায় উডছি ত।’

‘এক টাকা নিমু, ক্যা?’

‘কত লিতা চান?’

‘এক পয়সাও না।’ চড়তেন হে আলাদা কথা ছিল।

‘চড়ছি ত।’

‘সাব, আমার গায়ে মানুষের চাম নাই? ভুলে চড়ছেন, দুই গজ যায় নাই। ভাড়া নিমু, কি কন? আপনার টাকা আপনে লন।’ টাকা এগিয়ে দিয়েছিল রিক্সাওয়ালা। কিন্তু কাল্লুর জিদ ধরে গিয়েছিল। বললে, রিক্সা যখন সে চড়েছে ভাড়া দেবে বৈকি।

‘এরে রিক্সা চড়ন কয়?’

‘তয় কি কয়?’

‘সাব, আমার সময় যায়। অত হুঙ্কুর করার সময় নাই। লন আপনার টাকা। ভিক্ষা দিয়া অপমান করবেন না।’

কাল্লু কিন্তু টাকা না নিয়েই আবার পার্কের দিকে এগোয়।

রিক্সাওয়ালা তখন হেঁকে বলে, “সাব আপনার নোট এই রাস্তার উপর রইল। আমি ছুঁতে পারুম না।”

সত্যিই সে কাগজের নোটখানা পীচ-ঢালা রাস্তার উপর রেখে দিয়েছিল। মৃদু বাতাসে তা কাল্লুর দিকে উড়ে উড়ে এগোতে থাকে কেন। কাল্লু তখন পেছনে না তাকিয়ে পারে নি। সত্যি নোটখানা রাস্তায় পড়েছে, একটু একটু উড়ে যাচ্ছে। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠছিল কাল্লুর। সে রাস্তা থেকে দৌঁট তুলে নিয়ে আবার রিক্সাওয়ালায় সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বেশ চড়া গলায় তখন বলে, “ভাড়া নেবেনা কেন?”

“ভাড়া ত হয় নাই।”

“রিক্সায় চড়েছি না?”

“হে ত চড়ছেন।”

“তয় ভাড়া লন।”

“এক টাকা নিতে পারি না।”

“কত লিতা চান?”

“চার আনা লিতা পারি। যা ভাড়া অয়।”

“তাই লন।”

রিক্সাওয়ালা টাকা নিয়ে বারো আনা, একটা সিকি, একটা আধুলি কাল্লুর হাতে দিলে। পকেটে ফেলে কাল্লু এগোয় আবার পার্কের দিকে। রিক্সাওয়ালা চেয়ে থাকে। হয়ত ভাবে, লোকটা বোধ হয় পাগল অথবা পাগল হওনের পথে। কাল্লু নিজের মেজাজের জন্য কোন লজ্জাবোধ করে না কিন্তু তার মনে হয়, পার্কে কিছুক্ষণ বসে থাকলে তার মাথার মধ্যে আরো জট ধরে যেতে বাধ্য। এই সময় একটা ঘোড়ার গাড়ী দেখা গেল

পার্কের উত্তর কোণে, সীট ছেড়ে সেই দিকে ছুটে গিয়েছির কালু। পার্কের ভেতর দিয়ে রাস্তা। এখানে বিজন ছায়ায় বসে বসে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলে, একটা সুখ ছিল। তার বাল্য জীবনের উপর অনেক পলিমাটি পড়ে গেছে। পলিমাটি, পাক। একটা ফাটল ধরল যেন সেইখানে হঠাৎ এই তাতা দুপুরের রোদে। পাশে ঝিলটা আয়নার মত সূর্যের আলো প্রত্যাখ্যান করছে চতুর্দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে একবার কালু। কিন্তু তার সময় নেই। একটা হাঁক দিয়ে ফিটন থামাতে হয়। নচেৎ হঠাৎ যানবাহনের জন্য আরো না হেঁটে উপায় নেই। কিন্তু কালু হাঁক দিতে গিয়ে বুঝতে পারে তার কণ্ঠের তাগদ সে যেন কোথাও ফেলে দিয়ে এসেছে। তার গম্গমে গলার আওয়াজ সম্পর্কে সে অতি আস্থাবান। তার ধমকে কারো পিলে চমকাবে না, বিশ্বাস করা কঠিন। কত গৃহিনী সূড়সূড় চাবি খুলে দিয়েছে, তাকে আর হাত দিতে হয়নি পর-স্ত্রীর গায়ে। প্রায় একটা ক্ষুদ্র দৌড় মেরে দিলে কালু। পরিচিত রাস্তা ছেড়ে সে কেয়ারীর অলিগলি দিয়ে হাঁটতে লাগল। হাঁটা নয়, ছোট দৌড়। কারণ, ফিটনখানা নিজের মনে এগিয়ে চলেছে। কু-পথ, কিন্তু কাটা-খোঁচা থাকার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এক দিকে হাওয়া-সেবীরা ঝোপের আড়ালে মুতে যায় স্বচ্ছন্দে। তেমনই জায়গায় এসে পড়ল কালু। এখানে মাছি ভ্যানভ্যান করছিল। নাকে বিশ্রী গন্ধ যায়। ঠোট কুঁচকে রেহাই নেই। একটা মাছি জেট-প্লেনের মত ডাইভ মেরে গেল একদম কানের গোড়া ঘেঁষে।

থুঃ থুঃ...

মাস্টর...!

কে তাকে ডাকে?...!

মাস্টর...!

কে?

হঠাৎ চোখ কচ্লাতে কচ্লাতে কালু খাড়া হোয়ে বসে। জানুর দিকে তার হাত স্বতস্ফুর্তভাবে চলে যায়। জীনের সাদা পাংলুনের জমিন বুঝতে দেয়ী হয় না। হাই তুললে কয়েক বার কালু। তারপর থুৎনী তুলে প্রশ্ন-কর্তাকে দেখে সে। একটু বিড় বিড় শব্দেই বলে, “সদু।”

জী, মাস্টর।

কালু, দেখলে, সহকর্মী দাঁড়িয়ে আছে। সদু বেশ খর্বকায়। কিন্তু এমন সুগঠিত দেহ, যেন ছোট কাঠের একটা যুগুর। এই শরীরে আবার সেও পরে খাকী পাংলুন। ফলে, দেখতে আরও নাটা মনে হয় তাকে। সদুর গায়ে সাদা হাফশার্ট, দুদিকে বুক পকেট। কালু তার দিকে বার বার চোখ ফেললেও তার যেন খোঁয়ারি কাটছিল না।

সদু নাড়া দিলে, “মাস্টর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন না কি? আপনার বোতলে বীয়ার পড়ে আছে। গ্লাসেও খানিক। আইয়া দেহি দুই চোখ বুঁইজ্যা আছেন।”

“হ্যাঁ।” কালু, এবার সটান বসে গ্লাসে এক চুমুক দিলে। হাই তুললে দু-তিন বার, দুই দিকের বাজু আন্দোলিত করে। আবার কথার খেই ধরলে সে, “হ্যাঁ, একটু নিম-খোঁয়ারি খোঁয়ারী লেগেছিল। বসো, তোমার খবর কী?”

সদু আদেশ পালন করলে। সামনে এক চেয়ারে বসে পড়ল।

কালু অবসাদ মুখে ফেলতে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞেস করলে, “তোমার খবর কী? কিছু সন্ধান করতে পেরেছ?” দেশলা’য়ের কাঠিখানা জ্বলছিল। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে কালু সদুর দিকে তাকালে।

“হ, খোঁজ পাইছি, কিন্তু আপনার নিশ্চয় খাওয়া হয় নাই। চলেন পরে সব কইমু, বড্ড দেরী করে ফেললাম।”

“সেই ভালো। চলো, উঠে পড়া যাক। তুমি কিছু বীয়ার খাবে নাকি?”

“না, মাষ্টর। একটা গ্লাস আনতা কই। ওটুকুতেই হৈব।”

সদু নিজেই হাঁক দিলে, বয়।

গ্লাস এলো।

তারপর ঘট ঘট পানের পালা। হোটেল ছাড়লেই যেন দু’জনে বাঁচে। ব্যস্ততায় তারই নমুনা।

বয় বিল নিয়ে এলো। কালু ইশারা করলে, এখন যাও। পুরাতন খরিদার। এক সময় মিটিয়ে দিয়ে গেলেই হয়। উঠল দু’জনে।

একটা জোলা পাল্লার দরজা আছে হোটেলের প্রবেশ-পথে। সদু তা খুলে ধরতেই কালু গট্ গট্ এগিয়ে গেল।

একটি পত্র :

প্রিয় আমদানী,

...আমার নিজের ওকালতি আমি নিজেই শুরু করছি। তোমার সাদামাটা পত্রে আমি অবাক হইনি, যেমন আমার আগেকার চিঠিতে তোমার অবাক হওয়ার কিছু নেই। যোগাযোগ মিসুরীর সূতোর মত জিনিস। খুব সুন্দর। চোখে দেখা যায় না। কিন্তু সব মিষ্টির বাঁধনের গোড়া ওইখানে। আমার হাসি পায়, তোমার পত্রের কথায়। চল্লিশের উর্ধ্বে গেলেও আমার নাকি আকর্ষণ এখনও কমেনি। তোমার চোখকে সালাম। তোমার চিঠি পাওয়ার পর একছুটে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। আমার দশ বছরের ছোট ছেলেটা পেছনে এসে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, ‘মা কী করছো?’ ঘুরে পড়ে ওকে কয়েকটা চুমু দিতে দেরী করিনি। মনের আনন্দের প্রকাশ এইভাবে হয়। তুমি কাছে থাকলে কী করতাম, খোদাকে মালুম। কিন্তু তোমার কথায় সব সময় যেমন থাকে, বেশ বাড়বাড়ি ছিল। বয়সের ছাপ আমার চোখের কোণায়। মুটিয়ে গেছি স্বামীর গোয়াল-ঘরে টুকে। জাব্বা প্রচুর পরিমাণে পাই। আজ আমাকে তুমি খুব গদ্য-গদ্য পাবে। কারণ কী জানো? কলিশন বা সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। তোমার সুরে তার আভাস। এই স্বীকারোক্তির পেছনে তুমিই সাহস যুগিয়েছ। আর হাসি লাগে কেন জানো? দু-জনেই গিয়েছিলাম ইব্রাহিমের পঞ্চদশ বিবাহ বার্ষিকীর পার্টিতে। অথচ সেইখানে দু-জনে পরস্পরকে আবার মনে মনে বিয়ে করে বসলাম। উল্টো আনন্দের ব্যাপার। তোমাকে ব্যাপারটা বলে রাখা ভাল। ইব্রাহিম পার্টি দিয়েছিল রাধিকার প্রেমে নয়, তার চোখ ছিল অর্জুনের উপর। ব্যবসা ত তার ক্রমশঃ চন্দ্রকলার মত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পদে পদে মুরুব্বী ছাড়া চলে না। নতুন এক মুরুব্বী দরকার। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, গ্রে-ফ্যানেলের

পাংলুন আর চেক টুই'ডের কোট পরেছিল এক ভদ্রলোক, চোখে রীমলেস সোনালি চশমা, দাঁত-গুলো উঁচু-উঁচু গোলগাল মুখ, চাপা খুশী দেখলে মনে হয়, পৃথিবীর চাচাতো ভাই, তাকে পাক্‌ড়াউ করাই ছিল ইব্রাহিমের আসল মন্তব্য। দেখলে না, বার বার হুইস্কির গেলাস-ভরে দিচ্ছিল। চিংড়ি-ভাজা অবিশ্যি টুথপিকে গাঁথা, তবুও নিজে সামনে প্লেট না ধরে, নিজের হাতে তুলে ধরছিল। ইব্রাহিমের বৌর কাছে শুনেছি ওই অর্জুনের এক অবিবাহিত বোন আছে, কলেজে পড়ে, ইব্রাহিম চায় তার এক খালাতো ভায়ের সঙ্গে জোড়া বেঁধে দেয়। অনেক রকম ব্যাপার আছে। উপরের, তলার, মধ্যের। সে-কথা যেতে দাও। আমি কিন্তু ইব্রাহিমের যত দোষ থাকে (সে বলে, সব মিয়াকে হাত করা যায়, কায়দা জানা চাই— কে কিসে পটে। কেউ রূপে মজে, কেউ রূপেয়ায়) তার কাছে আমরা ঋণী, বিশেষ ভাবে ঋণী। তোমাকে কোথায় পেতাম। জীবনের একটা পর্যায় এসেছিল। হাঁপিয়ে পড়তাম। সব আছে, অথচ কিছু নেই। এই ফাঁকা-ফাঁকা ভারের দৌরাণ্ড্য তুমি কিছুটা বুঝেছ। আমি ত মেজাজ ঠিক রাখতে পারতাম না। কখনও বাড়ীর হুজুরের সঙ্গে এক দফা লড়ে গেলাম। কখন চাকর-চাকরানীদের ধমকালাম। আর গত এক মাস জানাশোনা বেশ কয়েকজনের সঙ্গে, মন-কষাকষিই হোয়ে গেল। একটা ছুতো পেলেই ঝগড়া। সময় কাটে না। সময় কাটাতে সন্ধ্যায় কারো ড্রয়িং-রুমে হানা দাও। তারপর কথায় কথায় কিছু বেধে গেল। একটা নমুনা দিলে বুঝবে। নাম বলতে পারব না, ধরে নাও পদি-পিসী। আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল সারা ইন্সকুল জীবন। এখন হাজ্‌ব্যন্ড ভালই পেয়েছে। আমরা দু-জনে একদম গলাগলি ভাব সেদিন ঝগড়া বাধল, ক্ষি নিয়ে জানো? একটা ফিল্মের এ্যাকটিং নিয়ে। সে যা বলে আমি বাগড়া দিই। শেষে ঝগড়াই করে বসলাম। অথচ কোন কারণ নেই। ফিল্ম দেখি এই মাত্র। তার ও বা কী বোঝে, আমি বা কী বুঝি? বেশ চড়াচড়া ব্যক্তিগত অক্টিমণ পর্যন্ত হোয়ে গেল। বারেক কারো কর্তা কাছে ছিল না। সেই থেকে আর তার ঝড়ি যাইনি। এখন ভাবছি, একদিন গিয়ে মাফ চেয়ে আসব। মন ভরা থাকলে, ভরা ঝিলের মত, ঝিরিঝিরি বাতাস, সময় সর্বদা ধরা পড়ে, দেখায় সুন্দর। কিছু মনে করো না, অনেক লম্বা লম্বা চিঠি লিখছি আজকাল। তোমার সময় যাচ্ছে অনেক। কিন্তু আমাকে একটু খামখেয়ালী হোতে দিলে কী তোমার কোন ক্ষতি হবে? তা-হোলে জানিয়ে দিও। কিন্তু জানো, আমার মুখ থেমে গেছে। আজকাল আর তোড়ে কথা বলি না। জরুরী দু-একটা। কিন্তু তোমাকে লিখতে বসলে, হাজার হাজার বাক্যি কোথা থেকে এসে জুটে ভেবে পাই নে। তোমার সঙ্গে বসে দু'দশ ঘণ্টা আলাপ করব, তারও যো নেই। সবুর,...হতভাগী...সবুর।

হ্যাঁ, তোমাকে একটা অনুরোধ। আমাদের প্রেম পরিণত বয়সের। এ ত আর ছোকরা বয়সের মর্জায়েংগা-মর্জায়েংগা ভাব নয়। খবরদার কোন উচ্ছাস দেখিও না কোন সময়। আমার স্বামী আছে, যেমন তোমার বউ আছে। তার উপর ছেলেমেয়ে। বড় ছেলেই কলেজে পড়ে। সুতরাং বহু দিক রক্ষা করে চলতে হবে। ভাঙা নৌকা, পঙ্কা কাঠ, বাতাস বেশী, কিনারায় বাঘ। কত দিক তাল সামলে চলা। দোহাই, উচ্ছাস দেখিও না। অনেক লোকের ভিড়ে কাজের ভিড়ে হঠাৎ আড়চোখে একবার দেখে নেব: তুমি আছো— হয়ত দৃষ্টি বিনিময় হবে বা হবে না— কিন্তু সেই পরম সুখ। গোটা দুনিয়া তখন ভেসে বেড়াচ্ছে

সুরের হিল্লোলে ।

আর তুমি এমন হাসাতে পারো । আমাকে একদম গোস্কুর সাপ বানিয়ে দিয়েছ । এবার সত্যি দংশন দ্বারা তোমার কিছু মাংস তুলে নেব । তখন বুঝবে নাম নিয়ে খেলার মজা । আমি কুব্রা...Cobra কেব্রা নই ।

জলদি জবাব দিও ।

ইতি
তোমার
কোব্রা

পুন :— চিঠিপত্র সাবধানে রেখো । এখন ব্ল্যাকমেল করতে পারলে অনেক বেকারের কিছু সুরাহা হয় । শহরের যদি বাইরে যাও, আগে জানিও । তুমি বাড়ীতে নেই, অথচ চিঠি যাবে, তা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ।

কুব্রা

উক্ত পত্রের উত্তর :

আমার কোব্রা

...ফঁস্ফঁস... তোমার পত্র । তারিখ দাওনি । ঠিক করেছ । অনন্ত কালের কোন এক বিন্দু থেকে যেন লিখছ । তোমার কথা পাঠাচ্ছি ।...স্বীকার করতে আপত্তি নেই, ইদানীং আমার মনে প্রশ্ন উঠেছিল । লেখাপড়া শিখে চাকরী করতে পারতাম । গেলাম আন্তর্জাতিক ব্যবসায় । আমদানীকারক, ইম্পোর্টার । জানোত, নসীব আমার খুলে গেল । অনেক কিছু পেলাম । কত বন্ধু, সম্পদ, আয়েস-আরাম । কিন্তু কিছু দিন থেকে আমারও মনে হচ্ছিল, জীবনে আর কিছু কী নেই, যা আমি পাইনি? অনেক জড়-দ্রব্য আমারও নেই । তার জন্যে আফসোস ছিল না । তোমার মত মনের কোণায় শূন্যতা জন্মে উঠত । তখন মন কি যেন ঝুঁজছিল । আমার ত অবাক লাগে । প্রেমে-পড়ার একটা প্যাটার্ন আছে । কাঁচা বয়স, অনেক স্বপ্ন, বাসনা কামনার জড়াছড়ি, কল্পনার ছড়াছড়ি । আমি ব্যবসাদার মানুষ । টাকা আনা পাই গণি । সেখানে ওসব জমায়েৎ হয় না । ইব্রাহিমের কিছু খুঁৎ আমার মধ্যেও পাবে । বহু অফিসারের বৌকে ভাবী ডেকেছি, বাজার-সরকারী করেছি প্রথম পত্তনের যুগে । আজ আর আমার সে সব দরকার হয়না । কিন্তু খালিখালি ভাব জেঁকে বসল । আমি খুশী, তুমি মদের রেওয়াজে আঁতকে ওঠো না । টাকা-পয়সা একটু বেশী হোলে এসব আসবেই । সাফল্যের মধ্যে কিছু গঁজে-ওঠা উপাদান আছে । এই গাঁজানির ফেনা চট করে মিলিয়ে যায় না । পেটের মধ্যে মাথার মধ্যে 'ফুট' তোলে, ঠিক ফলুই মাছের মত । তখন তা থামাতে হয় । অনেক ভেবেচিন্তে বিশেষজ্ঞরা শরাবের কেব্রা বানিয়েছিলেন । 'কেতাবুল আশরাবা' বা পানী সম্বন্ধীয় কেতাব আরব দেশে প্রথম লেখা হয় । নিশ্চয় তারা, না করে পারেন নি । মোদ্দা কথা, তুমি শরাব পানকারীকে শূকর মনে করো না । দেশী রমণী হোলেও তুমি কলেজ পড়েছ । তোমার অনুভূতি চতুর বেশ প্রশস্ত । নচেৎ আমাকে এত নিকটে জায়গা দিতে না । অবিশ্যি উচ্ছ্বাস আমাকে ঘায়েল করেছিল, এখন স্বীকার করছি । তুমি বলবে, জয়ের পর পরাজয় স্বীকার । না, না । রমণী-বিজয়ে অনেকে মাতে,

নিজের পৌরুষের প্রতি শ্রদ্ধায় নয়, নিতান্ত খেয়ালে। সে-খেয়াল ঠিক বীরের নয়, কাপুরুষের। কাপুরুষ নিজের শক্তি সম্পর্কে আন্তাহীন। কাজেই জুজুৎসুর প্যাঁচ কষে, কি আরো কোনো কৌশলে সে জিতের পথ প্রশস্ত করে। বীরের ধর্ম তা নয়। সেদিন পার্টিতে একদম লনের কোণায় যে হাসি উঠছিল, তার মূল কেন্দ্র বহু নারী-জয়ী এক সাহেবের পরাজয়ের কথা। পকেট, সব কাপড় চোপড় পর্যন্ত মেরে নিয়ে গিয়েছিল। শেষে হোটেলের চাদর জড়িয়ে তাকে পালাতে হয় চুপিচুপি ম্যানেজারের কাছে দাস্থৎ রেখে। তুমি শুনলে হয়ত হাসতে। কারণ, তুমি সারল্যে বিশ্বাসী। অকপট হওয়ার মত দুনিয়ায় নাকি আর সুখ নেই। কিন্তু আমি ত পারছি না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমি তোমার স্বামীর দাবীদাওয়া কী করে মেটাও? কত অকপট হোতে পারো? যাক সেকথা। তোমার দর্শন-চিন্তা মাঝে মাঝে উৎকট ভাবে পেয়ে বসে। ছোট শহরে যাওয়া যায় বা কোথা? তবু তুমিই একমাত্র শরণ। সেদিনের মত সিনেমার টিকেট করে পাশের সীটের নম্বর আমাকে জানিয়ে দিও, আমি কিনে নেব। সঙ্গে ছোট বাচ্চাকে নিতে ভুলো না। ছোট শহর। কয়েকবার পাশাপাশি দেখলেই কানাঘুষা শুরু হবে। আমি অনেক সাবধান। সভ্য যুগে শালীমতা প্রচুর বাড়ে, কিন্তু আদিমতা কমে যায় না। আসরের চাটনী হিসেবে নর-নারীর সম্পর্ক যেন এদেশেই সব চেয়ে উপাদেয়। বুড়োগুলো পর্যন্ত ওই এক জায়গায় জিভ-ঠোঁট আলতো ভাবে রেখে পুরাতন দিনের মজা লোটে। তোমাকে চিঠি লিখতে বসে একটা অস্থিরতার হাতছানি অনুভব করি। তাই কথার খেঁই রাখা দায় হয়। দেখছ না, কোথা থেকে কোথা এসে পড়লাম। আসল কথা, শূন্যতা। অথচ আজ আমার ফাঁকা-ফাঁকা ভাব নেই মনের কোথাও, এতটুকু। দু'জনের এই মিল বজায় থাকলেই আমরা নিজেদের খুঁজে পাব। সম্মতি আমার ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে। বিদেশ থেকে মাল আনাই। গভর্ণমেন্ট অনেকগুলো আইটেম কেটে দিয়েছে। আমার পকেটে বেশ ঘা লাগবে। অন্য সময় হোলে আমার ঘুম হোত না। কত ছুটাছুটি করতাম এই অশ্বোয়াস্তি নিয়ে। কা'কে ধরব এই ঘাটতি-পূরণে। কে লাইসেন্স বেচবে। অথবা হঠাৎ রাতারাতি কোন ভাবীর দেবর সেজে, সব যে তার অফিসার স্বামী বা চক্রীয় লোককে বলে দেবে, আমাকে উদ্ধার করতে। এমন শত ঝঙ্কি। তখন রাস্তায় সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়লেও আমার কোন প্রতিক্রিয়া হোত না। একেই বলে আত্মিক মৃত্যু। পৃথিবীর রূপরস গন্ধ থেকে বঞ্চিত। মনে করো না, সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আমি হেদিয়ে পড়ব। তা না। পথচারী হিসেবে তুমি রূপের প্রশংসা করবে ত। আগেকার যুগে এটা পাপের সামিল হোত। না, আমি তা পাপ মনে করি না। একটা ভাল পেন্টিং দেখে যতটুকু প্রতিক্রিয়া হয়, একটা জীবন্ত মানুষকে দেখে যদি তোমার তা না হয়, তুমি মানুষকে অপমান করছ। এসব আমি ইদানীং বুঝতে পারছি, তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর। হ্যাঁ, উঃ, বড় রাস্তা-ছুট খানা-খোন্দলের দিকে ধাইছি। আমার ব্যবসার বেশ ক্ষতি যাচ্ছে। কিন্তু কী মনে হয়, জানো? আমার সব চলে যাক। আমি দেউলিয়া হোয়ে যাই, আমার কোন দুঃখ নেই। তোমার একটু সান্নিধ্যই সব। সম্পদে তার দাম যাচাই হয় না। তুমি ভাবছ, আমাকে কবিত্বে ধরেছে। ভুল করবে। কাল একটা 'ডীলে' বেশ কামিয়ে নিলাম। এক জনের এ্যাডভান্স লাইসেন্স আমি কেনার কথা বলে রেখেছিলাম। কিনিনি। আর এক খরিদার পেলাম। শতকরা বিশ বিশ মুনাফা দিতে চায়। সময় নিলাম দু'দিন।

কারণ, আসল জিনিস ত তখনও বায়নার সিকেতে বুলছে। এই সময়ের জন্য কিছু বাহানা ধরতে হয় তা ধরলাম। আমাদের জগতে ফেরেশতা ঢোকে না, নিশ্চয় বুঝছ। এসব ধড়িবাড়ি যদি রপ্ত না করো, লাল বাতি জ্বালাতে হবে ফার্মে। মজা শোনো। আমি গেলাম, আমার বায়না-দেওয়া পার্টির কাছে। সবাই গন্ধ পায় এই জগতে। সে একটু লেগে খেললে। হঠাৎ আজই ‘ডীল’ ক্লোজ-করার কি দরকার? মনে রেখো, এই সব নাটকে, ভদ্রতার ত্রিশূল চূড়ায় সব সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সার্কাসে সেই দড়ির খেলা। টেনশান বা বিততি আসল ধর্নি। একটু এদিক ওদিক হোতে পারো না। তুমি যেন এক ফেরেশতা। তোমার মত ভদ্রলোক পৃথিবীতে বিরল, জন্মায় তার চেয়ে কম। হাসি-হাসি মিষ্টি মুখ, বিনয়, সিগারেট-খয়রাৎ, সারল্যের পানীতে সর্বদা চোখ রসের হাঁড়ির মধ্যে দুই রসগোল্লার মত ভাসা। এসব করেও সেদিন কুল পাচ্ছিলাম না। কারণ কি জানো? সবাই এ জগতে শেয়ান। আইস্বার্গের মত অল্প ভেসে, ডুবে থাকে প্রায় সব। দেখা হোলে বলব, শেষে মক্কেল কি ভাবে টোপ গিল্লে। তবে থ্রি, তিন পার্সেন্ট আরো বেরিয়ে গেল। অথচ বায়না ছিল মুখে মুখে। সুতরাং আমাকে কবিত্বে পেয়ে বসেনি। তুমি নারী জয়ের কথা লিখেছ। সে অনেক সহজ আমাদের জগতে প্রচুর গোলকধাঁধা, বহুৎ অন্ধকার গলি, বহুৎ মেহনৎ। মোটামুটি ভাল স্বাস্থ্য আর কিছু, নিরাপত্তা থাকলে, একটা মেয়ের জন্য কি এত কাঠখড় পোয়াতে হয়? যন্ত্রণা? যন্ত্রণার হয়ত ভেদ আছে। কিন্তু তফাৎ বেশী না। জুরে পড়ে ছটফট, আর ছোকরা প্রেমিকের বিরহীলা। ছটফটমিতে ফারাক কষা যায়, কিন্তু তা কৃত্রিম। কাষ্টমে একটা মালের সুন্ধ অনেক বেশী শিঁয়েছে। তখন দৌড়াদৌড়ি করে কমাতে যে ছটফটানি, তা হৃদয়জ যন্ত্রণার চেয়ে কী ক্রম? কারণ, সব যাতনার গোড়া ত হৃদয়। ...তোমার মতই আমার অবস্থা। তোমাকে লিখতে বসলে কথা সব ছুটে-ছুটে আসে। কোথা থাকে এরা? কোথা ছিল এতদিন? আমার আনন্দ কোথায়, জানো? আমি নিজেকে দেখতে শিখছি। আগে ত নিজের দিকে তাকাতাম না। দৈনন্দিন যা কাজ, কেবল তার তোড়ে ভেসে যাওয়া। আমার সময় ছিল না, অভ্যাস ছিল না নিজের প্রতিমূর্তি নিয়ে খেলা করার। এই জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার কাছে আমার অশেষ ঋণ। আত্মদর্শনের প্রয়োজন আছে, বুঝতে শিখছি। নচেৎ বেঁচে মজা পাওয়া যায় না। ওই ভাবে নিজেকে নিজে মানুষ গড়ে তুলতে পারে। নচেৎ জবড়জং তুমি একটা কিছু হোতে পারো। মানুষ না। শিল্পী যেমন রঙের পোঁচে পোঁচে তার মানস-জগৎ গড়ে তোলে, মানুষের ক্ষেত্রেও তা-ই হওয়া উচিত। ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর ত কখনও এ সব চিন্তা মাথায় ঢোকেনি। এই আবার তুমি সুযোগ দিলে।...

দোহাই, আমাকে আর রিক্ত, পাথেয়-শূন্য করে চলে যেয়ো না তুমি...

আশ্চর্য, সংসারে আমি এখন ভয়ানক খাপ খেয়ে গেছি। অবিশ্যি, তোমাকে মিথ্যে বলব না, স্ত্রী আর আমাকে জাগায় না। কিন্তু হঠাৎ—হঠাৎ মেজাজ খারাপ করে বসতাম, তার গোড়া বন্ধ করে দিয়েছি, অক্লেশে। এই হচ্ছে মনের শক্তি। আশ্চর্য, তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আমার এসব ক্ষমতা ছিল না। মেজাজ ঘরে টগবগিয়ে উঠত। অথচ জানেভা, ব্যবসার জগতে মেজাজ অবান্তর। একদম ঠাণ্ডা মাপজোক আরো ঠাণ্ডা ভাবে করার জন্যে তুমি উত্তর-মেরুর অতি জমাট পাহাড় হও। এই দোটাণায় টানাটানি আমি

ঘরে কিন্তু বইতে পারতাম না। অনেক সময় বিকালে চা না খেয়েই ক্লাবে চলে যেতাম। যতক্ষণ কাটে। আমি কিন্তু এখন লনে বসে থাকি। ছেলেপুলেদের হুন্ডায় যোগ দিই। কতো রকমের জীবন-উপাদান তুমি এত সহজে বিলিয়ে দিতে পারো। আমার গোটা পরিবারের তার জন্যে তোমার কাছে কতো ঋণী এক দিন এটা ওদের জানিয়ে আসা উচিত। কিন্তু তা আর হবে না। বাধা কোথায় তুমি জানো। তাই আমিই তোমাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এখন ভাবি, তোমার সঙ্গে সুদূর অতীত কৈশোরে কেন দেখা হোল না? অনুতাপ নতুন, কিন্তু ঘা পুরাতন।

চিঠি দিও। সাক্ষাতের ব্যবধান কিঞ্চিৎ আরো সংকীর্ণ করতে পারো না?

ইতি—

তোমার

সয়ীদ

কালুর বৈঠকখানার দুই ভাগ। পাশাপাশি দুই কামরা। সামনের দিক বলা চলে ড্রয়িং রুম। খুব দামী নয়, মাঝামাঝি কেতার সোফা আছে, চেয়ার আছে, মায় সাইড-টেবিল সহ। একটা গোলাকার টেবিলে ফুলদানি রাখা থাকে কখনও তাজা, কখনও কাগজের ফুলসজ্জিত। কিন্তু পাশেই আবার যে কামরা তাও দহলিজ বা বৈঠকখানা। একদম সোজা ফরাসপাতা। দুটো তাকিয়া আছে পাশে। কালু এইখানে বসেই সব চেয়ে আরাম পায়। অবিশ্যি অনেক সাহেব-সুবো তার কাছে আসে, কেউ উমেদার, কেউ স্রেফ বায়নাদাতা। তাদের সঙ্গে সে বাইরের ড্রয়িং রুমে বসে। গোলাকার সিগারেট-কেস থেকে সিগারেট এগিয়ে দেয়। অন্দরমহল থেকে চা আসে। আদর-আপ্যায়নের এই এক ছবি। আর ভেতরের দহলিজে তার পুরাতন লোকজন। নতুনও কিছু জুটেছে। কারণ, তিরিশ বছরে সে নানা খেল দেখেছে দুনিয়ার। এখনও পুরাতন সঙ্গী কিছু রয়ে গেছে। একদিক থেকে তারাই যেন কালুর নতুন খোলস ছাড়ার পথে বাধা। গুণ্ডা আইন পাশ হয়েছিল সত্যি। তারপর আর ইংরেজ আমল রইল না। পুরাতন লীলাক্ষেত্র শহর ছাড়তে হলো। কিন্তু নতুন শহরেও তার ব্যবসা ঘাটতি পড়ার কথা নয়। কারণ, স্বাধীনতার গন্ধে কি মানুষ তাড়াতাড়ি ফেরেস্তা বনে যাবে? কালু, সেই সুযোগে সং কিছু জীবিকার রাস্তা বানিয়ে নিয়েছিল। একটা বাড়ী কিনে ফেলেছিল পুরাতন পুঁজি দিয়ে। পরে একটা বানিয়ে নিয়েছিল। কয়েকটা ছোট খাটো দোকান হাতে এসেছিল, ভাড়া দেওয়া চলে। এই সব সাত-পাঁচ রকমের রোজগার। কালু তার সাবেক উৎপত্তি-স্থল একদম পুরোপুরি মুছে দিতে পারত। কিন্তু কাল করলে সঙ্গীরা। এ যেন বাঘের পিঠে চড়া। নামার উপায় নেই, উদরস্থ হওয়ার ভয়। কিন্তু কালু অত কাঁচা ছেলে নয়। পুরাতন দু'এক জনকে একদম রাস্তা থেকে সরানোর জন্যে মামলায় ফেলে ফন্দী জুটিয়েছিল অতি উত্তম। কিন্তু তার ঝামেলা এত বেশী, কালু, আর সাহস করেনি। তার চেয়ে বেশ আছে ত সে। তার প্রাচুর্যে সঙ্গীদের চোখ টাটায়নি, এমন নয়। কিন্তু তাদের সংস্থান ত নেই। সুতরাং উভয় পক্ষের গরজ বিপরীতগামী হোলেও, তার মধ্যে একটা মিল ছিল— অন্য আবহাওয়া যেন কারো ধাতে সয় না। কালুর দু-কেতার

বসার ঘর, তার বিশিষ্ট প্রমাণ। যেখানেই যাও আবহাওয়ার মধ্যে যদি তুমি নিজেকে উপভোগ করতে না পারো, সে জায়গা ছাড়তে তুমি বাধ্য। কাল্লুর হয়ত এই জীবনের সংস্পর্শে থাকার আরো কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের আন্দাজ একেবারে ভুল কেউ বলতে পারবে না। অথচ সে সংসারে নিতান্ত নির্ব্বাণ্ট। স্ত্রী এক মেয়ে বিইয়েই খালাস। স্বাভাবিক পরিবার-পরিকল্পনা। আর গৃহিনী কৃচ্ছ্যতার শেষ মার্গ থেকে, প্রাচুর্যের আর এক শিখরে উঠেছে। সে স্বামীর সাতেপাঁচে নেই। মেয়ে আর এক চাকর ও চাকরানী নিয়ে দিন কাটায় নিজের মত করে। গল্পের বায় চাপলে চাকরানীর সঙ্গেই গল্প করে, মেয়ে যোগান দেয়। বৈঠকখানায় চা-নাস্তা পাঠানো ছাড়া স্বামীর গতিবিধি নিয়ে কাল্লু মাথা ঘামায় না। মেয়েকে সে স্কুলে পাঠায়নি, কারণ হাল-আমলের চালচলন সম্পর্কে তার তেমন আস্থা নেই। স্থানীয় স্কুলের এক সাধারণ শিক্ষিকার কাছেই সুরঞ্জানের ইলেম মকশ চলে। কিছু বাংলা লেখা আর পড়া। খরচ-তেরিজ শেখা। মেয়েছেলে যেন সংসারের হিসেবটা রাখতে পারে। তাছাড়া নারী-ইলেম আর কতই বা কাজে লাগতে পারে? সুরঞ্জান বরং মাঝে মাঝে জিদ ধরেছে স্কুলে ভর্তি হবে। বাপের কাছে পাত্তা পায়নি। অবিশ্যি কাল্লুর ইরাদা আছে, লেখাপড়া জানা ছেলেই সে জামাই করবে। যদি কোন ঘর-জামাই পাওয়া যায়, সব চেয়ে ভাল হয়। এখন খোদার মেহেরবানী। আশ্চর্য, ছেলের অভাব আবার কাল্লু অনুভব করে না, যদিও স্ত্রীর হা-পিত্যশ এদিকে চরম। স্বামী তাই একবার বলেছিল, আর একটা বউ নিয়ে এসে দেখতে হয়। গিন্নী পেছ পা নয়। কিন্তু আর একটা কেবল কাল্লু না-পছন্দ নয় শুধু, রীতিমত ঘেন্না করে। সংসারে অশান্তি। দুই বিবি ঘরে রাখা আর সিথানে দু'টো গোকুর সাপ নিয়ে শোয়া একই কথা। কাল্লুর ভাই ধারণা। একটু আরাম আয়েসের দিকে তার বেশ নজর আছে। নরম বিছানা, পুষ্টি, সুপাক ব্যঞ্জন। কিন্তু মেয়ে-মানুষে কখনও রুচি জাগেনি। বিয়ের আগে বার দুই সে বেশ্যা ঘেঁটেছিল। মনে করলে, এখনও তার বমি পায়। তার দলের দু' একজন ময়ূর উড়ায়, জানে কাল্লু। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। দলে নানা কিসিমের চিড়িয়া ত থাকবেই। এত মাথা ঘামালে তস্বী টেপার আখড়া বানাতে হয়।

হালফিল কাল্লুর ডান-হাত বাম-হাত ছিল দুই জন। সদু এবং আফজল। শেখোক্ত ব্যক্তি, খুব পুরাতন সঙ্গী নয়। সদুর বিপরীত। সদু খুব সাহসী। তার আনুগত্য যোল-আনা। মাষ্টরের জন্য জান দিয়ে দেবে। কিন্তু মাথা মোটা। আর আফজাল চেহরায়ও সদুর উল্টো। সে ঢ্যাঙা সুপারি গাছ, তেমনই চিকন। কাকাভুয়া নাসা। গলার কণ্ঠা বেচপ উঠে আছে। বেশীর ভাগ পাজামা শার্ট পরনে থাকে বলে, তাকে আরো কৃশ দেখায়। আফজাল কিন্তু হিকমত জানে। কোন কাজে ঝাঁপ দেওয়ার আগে, সলা-পরামর্শ যথেষ্ট হয়। কিন্তু মাষ্টর একমাত্র আফজলের রায়ে সায় দেয় বা বোঝাপড়া করে। পাংলা শরীরে বুপো গোঁপে তা দিতে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে কাল্লুর দিকে সে তাকায়, তখন শজ্জাচুড় সাপের কথা মনে আসতে পারে। এক কালে চণ্ড খেত প্রচুর। যদিও বর্তমানে মাষ্টরের সঙ্গে বীয়ার ছাড়া আর কিছু পান করে না, তবু প্রাচীন ধাক্কা গলায় এখনও লেগে আছে। আফজাল যখন হাসে বা দ্রুত কথা বলে, তখন ক্যাঁ ক্যাঁ এক রকমের আওয়াজ তার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে চিকিরী তারের আওয়াজের মত। অবিশ্যি কাল্লুর ঘাঁটি আছে কয়েক

জায়গায়। অবসর কাটাতে সে এই সব এলাকায় টহল মারে।

সেদিন নিজের বৈঠকখানায় তারা তিন জন জমায়েৎ হয়েছিল কোন খোশগল্পে নয়। নেহায়েৎ এক কাজে। আজ কয়েক মাস থেকে পায়তারা চলছে, বড়শী-শিকারীর চারা পাতার মত। কিন্তু এখনও খেঁচ-মারার সময় হয়নি। ফাত্নার দিকে সবাই তাকাচ্ছে বার বার।

কালু জিজ্ঞেস করলে, “খোঁজ নিয়েছ ঠিকমত?”

আফজল গোঁপে তা দিচ্ছিল। আঙুলে ধৃত-গল্ফ সহ জবাব দিলে, “এই বান্দা কাঁচা কাজ করে না।”

“টাকা ঘরে আছে। ঘরে রাখে?”

“আলবৎ।”

“কি ভাবে জানলে?”

“উকীল সাহেব, তুখোড় ব্যক্তি। কত জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দহরম মহরম। ‘কেস’ কী আর সাথে আসে। আর ফুরোনে বা চুক্তিতে কামায়। ফীয়ের ধার ধারে না। বাড়ীতে টাকা রাখে। অথবা গহনা বানায়। গহনা আছে। এক দাউয়ে ছ-মাসের রোজগার।”

“এত খবর তুমি জানো?”

বৈঠকখানার কোণায় একটা ষ্টোভ রাখা ছিল মাথায় ডেগ্‌চী। সেদিকে চোখ রেখে আফজল বললে, “প্রমাণ দিচ্ছি।” তারপর সে উঠে ফোল ষ্টোভের কাছে। পকেট হাতড়ায় আফজল। তখন সদুকে সম্বোধন করলে, “এই তোমার ম্যাচিস্টা দে।”

সদু এগিয়ে গেল।

কালু একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে। বেশী দেখী হয় না। নীল-শিখা তারপর লাল-শীষে ষ্টোভ হিস্‌হিস্‌ করে উঠল।

কালু সিগারেট ধরিয়ে একটু দূরী হেলিয়ে সব দৃশ্য উপভোগ করে।

পাঁচ সাত মিনিট যায়। হঠাৎ ডেগ্‌চী থেকে বাষ্পের ধাক্কায় ঢাকনি উঠি-উঠি রব ছড়ালো, আফজল বললে, “সদু, একদিকে রুমাল দিয়ে চেপে ধর।”

সঙ্গীর সহযোগিতার সঙ্গে তাল রেখে আফজল একটা খাম বের করে ভাপের উপর ধরলে। কয়েক সেকেন্ড। তারপর সদুকে ষ্টোভ নিভানোর আদেশ দিয়ে সে ফিরে এল কালুর কাছে। তার সামনে বসে বসে খামের আল্‌গা মুখ চিরে একটা চিঠি বের করলে।

কালুর সিগারেটের মুখে তখন বহুৎ ছাই জমা হয়েছে। বেশ কৌতূহলী সে।

আফজল এবার সদর্প, বেশ বাগিয়ে বসে সম্বোধন করে, “মাষ্টর, আমি চিঠিটা আগেই পড়েছিলাম ডাকে আবার ফেলে দেব বলে। কিন্তু আপনার খটকা থাকতে পারে।”

“কার চিঠি?”

“সবই বলছি। পড়ছি শুনুন।”

কালুর চেয়ে আফজলের পড়াশোনা বেশী। এখানে সে-ই প্রধান। কালু কোন আপত্তি তোলে না।

“হ্যাঁ, মাষ্টর”, রস জমাতেই যেন সে একটু থামলে তারপর বললে, “মাষ্টর...সব শুনে আপনার কাজ নেই...বেশ লম্বা চিঠি। আসল ঠিকানায় আপনাকে আগে পৌছে

দিই... ‘সংসারে কত কী পাই। প্রতি মাসেই কত গহনা উকীল সাহেব তৈরী করেন। কিন্তু অলঙ্কার দিয়ে আমার কী হবে? আর ত বয়স নেই যে দেহ সাজাব। এখন আমার দরকার শুধু মনের সজ্জা। তা-ই যখন মেলে না, গহনা বাস্তবন্দী আর নাড়াচাড়া ছাড়া আর কোন মাতনে মাতব? তুমি আমার যন্ত্রণা ধরতে পেরেছো যেমন আমি তোমাকে ধরতে পেরেছি। কেন এমন হয়? চিরাচরিত মানসিকতা... মাষ্টর?” পাঠ থামিয়ে আফজল আবার খেই ধরলে, “মাষ্টর, আর শুনে কাজ নেই অনেক লম্বা লম্বা বাৎ। আপনি হয়ত বুঝতে পারেন, আমি মাথা মুগু সাপ-ব্যাণ্ড কিছুই ধরতে পারিনি।”

মুখ তোলে আফজল। তখন কালু উৎসাহিত গলায় বলে, “পড়ো না ছাই।”

“তবে শুনুন... চিরাচরিত মানসিকতায় আমাদের গতিবিধির কি পরিমাপ হোতে পারে? শ্রীলতার এক নিবোধ মানদণ্ড— তাও কায়-সর্বস্ব— যার ভিত্তি পুরুষ প্রধান সমাজে...”

“থামাও, থামাও। এসব খটরমটর শুনে লাভ নেই,” রবে কালু থামিয়ে দিলে সঙ্গীকে।

“আমিও ছাই বুঝিনি। তবে দরকারী খবরটা পাওয়া গেছে আরো পাওয়া যাবে।”

আবহাওয়া সামাল দিতে উচ্চারণ করলে সদু তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে।

“উকীলের বৌ কাকে লেখে?”

“আর এক ব্যবসাদারকে। আশ্‌নাই। ওরা বলে লভ্।”

গঙ্গীর একটা হাসির রেশ ঠোঁটে ছিটিয়ে কালু বললে, “উকীল জানে?”

“তা কী করে জানবে?”

“আচ্ছা—।” হেলান দিয়ে বসেছিল কালু উঠে বসল। বেশ স্বাদ পেয়েছে বোঝা গেল।

“বেটীকে দেখেছো, বয়স কত?”

“বয়স চল্লিশ পার।”

“তৌবা, তৌবা।”

“মাষ্টর সেখানেই আমাদের তুরূপ।”

“কিসের তুরূপ?”

“কার্য উদ্ধার এসব থেকেই হবে।”

কালু আবার সিগারেট নিজে ধরালে এবং ওদের বিতরণ করলে। আবার ভারিকি হাসি তার ঠোঁটে।

“হাসছেন কেন?”

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে কালু বললে, আমি ভাবি ওদের দুঃখ কিসের? খাওয়া আছে, পরা আছে, তবু ওদের কিসের যন্ত্রণা?

‘মাষ্টর, আমি কি ভাবি জানেন? গতরে চর্বি জমলেই মাথায় তখন ওইসব খেয়াল জাগে। বসে বসে খায়। আর ত কোন কাজ থাকে না। দুনিয়ার আর কোন মানুষ, কি মানুষের কি হচ্ছে সে সব নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। চর্বি জমলেই— ব্যস।”

চিৎ তালু দ্রুত উপরে তুলে তা আবার উপুর করলে আফজল শেষ কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে।

খেই ধরলে কালু “ব্যাস, কী?”

“ওই সব খটরপটর। এদিক-ওদিক। মানে ছুটে বেড়াও। চর্বি হজম করো।”

“চোখের নেশা আছে, আফজল।”

“মাষ্টর সেটা জোয়ান বয়সে হয়। এই বয়সে আমি বলি, চর্বির পয়দা বিয়ারী।”

কালু সন্দেহ প্রকাশ করলে না তেমন। কথার মোড় ফিরালে, “তুমি চিঠি পেলে কোথা?”

“আগে যেভাবে যোগাড় করতাম।”

“বেগ পেতে হয়নি?”

আফজল হি হি হেসে উঠল। কিন্তু গলায় সিগারেটের ধোঁয়া লেগে যাওয়াতে ঝিক্‌ঝিক্‌ কাশির মধ্যে জবাব দিল, “মাষ্টর, আপনি খুব আক্কেলমন্দ মানুষ। একটা কথা মনে রাখবেন—।”

“কী?”

“খালি পেটে বিবেক ছাড়া আর সব কিছু ঢোকানো সোজা।”

আফজল যেন একটা ধাঁধা ছাড়লে। তার ধোঁয়ায় কালু দিশা পায় না। সঙ্গীর চোখের দিকে চেয়ে থাকে কয়েক লহমা, তারপর আবার প্রশ্ন করে, “তুমি খোলাসা কথা বলো না। চলো, ‘বারে’ এক বোতল বীয়ার খাইয়ে দেব।”

“আহা, লোভ দেখালেন আপনি। আপনার সঙ্গে সম্পর্ক কী তা-ই?”

“তা হবে কেন?”

বেশ খুশী উছলে পড়ে আফজলের শীর্ণ দুই গায়ে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে জবাব দিলে, “মাষ্টর, চিঠি কী করে যোগাড় করলাম। পিয়নদের ত দেখেছেন। মোটা তাজা পিয়ন এ-পর্যন্ত আমি দেখিনি। রাজগারে পেট ভরে না পেট নিশ্চয় খালি থাকে। এবার বলেন, একটা চিঠি, তাও আবার ফেরৎ দেব, জোর কয়েক ঘণ্টা দেবী। কে দেবে না? খরচ খুব করতে হয় না। আর মাষ্টর—।”

কথা আর শেষ হয় না, আফজল তুমুল হাসিতে ফেটে পড়ে। সদুর কাঁধে এক হাত রেখে তাল সামলাতে পারে না। তখন কালুর মৃদু হাসি বজায় রেখেই একটু ধমকের সুরে বলে উঠে, “আফজল মাথা গরম হোলো নাকি তোমার?”

অতি কষ্টে থামল আফজল। তারপর শান্ত গলায় উচ্চারণ করে “হাসছিলাম কেন জানেন? আমার এক মামার কথা মনে পড়ল।”

“মামার কথায় কি হাসি?”

“আছে। তিনি বলতেন, ব্যাটা কোনদিন ঘরের বৌর পেট খালি রাখিস নে, যদি সুখে সংসার করতে চাস্।”

কালুও এবার হেসে ওঠে। আফজল এই সোয়াব থেকে নিজেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে বলে, “তার ফল কী জানেন, মাষ্টর?”

“কী?”

“মামার ছেলেমেয়ে ষোল কি সতর জন। মামী আঠারো নম্বর বিয়ানোর এক মাস আগে মামা মারা গেলেন। অনেক দিন বাদ হারাম-জাদার কথা মনে পড়ে গেল।”

কালু আবার গৌফের ভেতর দিয়ে কিছু রসিকতার আমেজ চালিয়ে দিলে। এই সময়

হাই উঠল তার দুই তিন বার। বোধ হয় ক্লান্ত।

তাই আবার হাই তোলার রেশের মধ্যেই বললে, “আফজল, খোঁজ খবর নাও। তারপর দেখা যাক। গাছে কাঁঠাল দেখে গৌফে তেল দিয়ে কী লাভ।...হ্যাঁ, আমি আসছি। সবাই খেয়ে যাও।”

কালুর আতিথেয়তার এই এক দিক। দলবল নিয়ে না খেলে তার তৃপ্তি হয় না। অবিশ্যি বড় পার্টি তাকেও হোটেলে দিতে হয়। সে ত গরজের ব্যাপার। সামাজিকতা।

প্রিয় আমদানী... ..

...ওহো, তুমি বড় ভাবপ্রবণ হোয়ে ওঠো। বারণ করি, তবু শোন না। তুমি যতই বলো না কেন ব্যবসাদার হিসেবে তোমার চিন্তা নির্বিকার থাকে, আমার কাছে তা ফাঁকা ঠেকে। তোমার চিঠির পংক্তির ভেতর ভেতর আমি সহজে ঢুকতে পারি, মনে রেখো। তুমি যে বিলের মাছ আমি সেই বিলের বগা, ভুলে যেয়ো না। অবিশ্যি কাছাকাছি এলে যদি হঠাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেলো, আমার কতই সুখ। স্মৃতির ভাঁজ খুলে খুলে এক রকম বাঁচাই এখন বাঁচতে হয়। কারণ, আর ত বয়স নেই। আমার এই আদিখ্যেতার কথা প্রায় শোনো। কিন্তু আমি বলতে ছাড়ব না। দেহকে এখন সাজাতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু ভয় পাই। দশ জনের চোখে কী রকম ঠেকব কে জানে? তুমি ভাবপ্রবণ বলে আক্ষরা দাও। যাক, তোমার কাছে আসন পাওয়াই বড় কথা। সেদিন হোটেলে দু’তিন ঘণ্টা কী ভাবে কাটল, আজও ধরতে গিয়ে হোচট খাই। এই পিচ্ছলতা স্পেনের ছবির মত। একটার সঙ্গে একটা মিশে যায়। অথবা লাফ দিয়ে আর এক খেঁই পাকড়ে ধরে। আমাদের এক অধ্যাপিকা ছিলেন, ইংরেজ মহিলা। আধুনিক কবিতা পড়াতেন। পরীক্ষার জন্যে মুখস্থ করতাম। বোঝাবুঝির অত ধার ধারিনি। মেয়েটি এম, এ পাশ! এখনও মুর্খের দেশে চোখ ছানাবড়া কপালে তোলে অনেকে। ডিগ্রীর জন্যে তখন ওই এক লোভ ছিল। নচেৎ যদি বলো, আমি লেখাপড়া করতাম, ভুল করবে। ভদ্র মহিলা তখন আধুনিক কবিতার কারিগরী সম্বন্ধে খুব বলতেন। অচেতন মনে স্বপ্ন-পটের হৃদিস নাকি কবির ধরতে যায়। তখন সেসব কথা, ছেঁদো বাক্যের মত এক কান দিয়ে ঢুকে আর কান দিয়ে বেরিয়ে যেত। এখন বুঝতে শিখছি, তোমার কাছে গিয়ে। কিন্তু সব ত দেবীতে। এই দেশে দাদীরা কুড়িতে বুড়ি হোয়ে যেত। এখন ত বাইরের বাতাস আর কিছু খেতে পরতে শিখে থাকিয়ে তিরিশ চল্লিশ করেছে। আর একটু ধাক্কা দাও, তখন চল্লিশ বছরে যেন সাবালিকা হই। তারপর কারো গলায় ঝুলে পড়ি। যখন সত্যি ঝুলতে চাইলাম, তখন দড়ি ঠিকই জুটল, (ভেবো না, তোমার খাড়া শরীরের প্রতি কটাক্ষ করছি) কিন্তু ফাঁসির মত তার মেয়াদ মাত্র তিন মিনিট। এখানে অবিশ্যি দড়ি ছিঁড়বে আর আসামীও মরবে। তবে তুমি পুরুষ মানুষ, টাকার জোর আছে, বিকার হোলেও মনের বায়না মিটিয়ে রাখতে পারবে। আমি কি করব? ভবিষ্যৎ ভেবে আগেই মরে যাচ্ছি। কবি ভারত চন্দ্র কোন সহায় নয় এই ক্ষেত্রে। আবার বলছি, রাগ করো না, মরা কোটালে কেন বান ডাকল? মাঝে মাঝে মনে হয়, কিশোরীর মত দুঃসাহস দেখাই। হাঁপানী রোগীর রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়ার খাহেস এসব পক্ষেই মানায়। কাছে এসে আমাকে বেশী প্রলুব্ধ করোনা। খামখা মামলায় জড়িয়ে

দেব। প্রেমে পড়লে নাকি বুদ্ধিনাশ ঘটে? দোহাই, সচেতন বীরের মত তুমি মঞ্চ অধিকার
করো। ঘুমের ঘোরে নয়। দর্শকদের হাততালির লোভ তোমার আমার কারো নেই।
তবে একটা কাজ করো। তোমার কোন বন্ধু নেই, যার জীবন আমাদের মতো? তা-
হোলে একটা এজমালী জায়গা বাড়ে, যেখানে কিছু সময় কাটে। মেয়েরা বৃদ্ধকালে
সখির কাছে যৌবনের অনাচারে খুলে ধরে। কিন্তু যখন বসন্তের মৌসুম, তখন একজনের
কাছেই গুন্‌গুনায়। ঘুণাক্ষরেও অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীকে কিছু বলে না। পুরুষরা এদিকে দরাজ।
বন্ধুর কাছে দুর্বলতা প্রকাশ দ্বারাই তারা সবল হয়েছে ওঠে। কালক্রমে সবই হবে।
আমার দাদী-আম্মা আমাদের দেখে হিংসে করতেন, এখন দেখছি কপালে তা-ই লেখা
আছে। তোমার পত্রের উপর আমার সময় বেশ কাটে। জবাব দিতে হয়, পড়তে হয়।
কিন্তু তুমি বহু, ব্যস্ত মানুষ বিরক্ত হও না ত?

জবাব দিও। যেন বুড়িগঙ্গার অনেক পানী তত দিনে গড়িয়ে যায় না।

আলিং...

তোমার

কোব্রা

মধু সর্পিনী,

.....পানী গড়িয়ে যাক। বুড়িগঙ্গা দ্রিষ্ট আছে। তোমার কাছে কিছু লুকাতে
পারব না, আমি যখন তোমার উল্টে পাল্টে পড়া পুঁথি। একটা ছোট নোংরামিতে জড়িয়ে
পড়েছিলাম। আমার গুদামে চুরি। কতগুলো মাল ছিল, যার আমদানী দু'বছর আগে
নিষিদ্ধ হয়েছে যায়। এমন জিনিসের দাম চুচড় বাড়ে। বেড়েছে অন্ততঃ পঞ্চাশ গুণ। কিন্তু
আরও বাড়বে। এখন খটকা কোথায় শোনো। মাল গেছে যাক। প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার
টাকা গচ্ছা। অসুবিধা, চোরেরা যদি মাল বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে আর ধরা পড়লে তদন্ত
হবে। তখন ত আমিও বাঁধা পড়ব। অবিশ্যি হবে না কিছু। উল্টে আরো পঁচিশ হাজার
বেরিয়ে যাবে। সুতরাং গচ্ছা মোট ধরো, হাজার পঞ্চাশেক। এই ক্ষেত্রে কী করা যায়।
চোরের কাছে আত্মসমর্পণ করাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যুক্তি। কিন্তু চোরদের তুমি পাচ্ছেো কোথায়?
হয়ত জানো, কারা চুরি করে, কিন্তু ধরার ত আইন নেই। দাগী আসামীরা কিছু সাহায্য
করতে পারে। লিষ্টের জন্য পুলিশের কাছে গেলে। কিন্তু পুলিশ তোমাকে কেন খামখা
দেবে? আর চাইবে কোন সূত্রে? এই ক্ষেত্রে আবার থানায় ডায়েরী করা চলে না। যেহেতু
মাল চুরি গেছে স্বীকার করতে হয়। বেশ জটীল সমস্যা। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে সূত্র
ধরতে হোলো। মাল পাওয়া গেল। কিন্তু আমারও বিশ হাজার খসে গেল। আর পথঘাট
এমন করে বাঁধা, এই পত্র হঠাৎ আর কারো হাতে পড়লেও ক্ষতি নেই। কারণ, রক্ষণ আর
ভক্ষণ যখন একত্রে চলে, তখন যেমন ভয়— নির্ভয়ও তেমি। আরো অনেক কেচ্ছা বলার
আছে। তোমার কাছে গিয়ে যদিও মুখ বন্ধ হয়েছে আসে। আলিঙ্গনই মুখের হয়েছে থাকে
রক্তের সর্বগ্রাসী তাণ্ডবে! ... তোমার সঙ্গে কোনদিন রক্তারক্তি কিছু হোলে বিরক্তির কিছু
ঘটবে না। আমিও পত্র লিখতে বসে বড় আরাম পাই। একটা আচ্ছন্ন উদাসীনতা ধীরে
ধীরে পেয়ে বসে। তখন কলম চলে কথার পায়ে পায়ে। আমি যেন নিমিত্ত। শুধু হাত দিয়ে

সাহায্য করি। পূর্বে ওই সব ঝামেলায় আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে যেত। এবার বেশ নির্বিকারভাবে কর্তব্য করছিলাম। তাই মাঝে মাঝে ভাবি, দুনিয়ায় এত ঝামেলা বাড়িয়ে অর্থ-উপার্জনে কী লাভ? তোমার সঙ্গে অকস্মাৎ এই সাক্ষাতের আগে আমি জানতাম না, জগতের মধ্যে আরো জগৎ আছে। বিশ্বাস করো, আমি সব গুটিয়ে আনছি। একটা মধ্যবিস্তৃত লোকের যতটুকু দরকার, তার বেশী আমি আর কিছুই রাখব না। ইব্রাহিমকে দেখবে সে যেভাবে দুন্দাড় এগোচ্ছে, নির্ঘাৎ মরবে। মানসিক প্রশান্তির চেয়ে কাম্য আর কিছু নেই। হাল্ফিল এসব আমি ভাবতে শুরু করেছি। সবই তোমার দৌলতে। দেশে মানুষের আয়েস-আরামের সামান্য যেভাবে চচ্চড় দশ বারো বছরে বেড়ে গেলো, দেশের সম্পদ কী সেই ভাবে বেড়েছে? নকল জীবনযাপনের ধারায় আমরাও নকল মানুষ। অথচ শহর ছাড়াই দেখবে দারিদ্রের কি কুৎসিৎ চেহারা। গ্রাম কেন, শহরেই দ্যাখো। ঈদের মাঠে মুসল্লীর চেয়ে ভিথিরীর সংখ্যা বেশী। তুমি হয়ত ঠাট্টা করবে, ভাবপ্রবণতার জোলাপ খেয়েছি। কিন্তু আমি স্বীকার করছি, এহসব আমার হাল্ফিল বিকার— হ্যাঁ, তুমি বিকারও বলতে পারো। হয়ত তোমার বা প্রেমের সংস্পর্শে এসব তরুণসুলভ ভাবানুভূতির আমদানী। কিন্তু আমি সত্য কথা বলছি আমার একটা প্রাথমিক অতীত ছিল, যখন স্কুলে-কলেজে পড়েছি। আমার প্রাথমিক অতীত— হ্যাঁ অতীতই বলব, যখন কেবল রোজগারের ধান্দা ছাড়া নিজেকে বাড়ানোর আর কোন কিছু আছে, আমি স্বীকার করতাম না। এবার অন্তিম অতীতের পালা। আমি খুব সীরিয়াস চিন্তা করছি। জানি না, নিজেকে গড়ে তুলতে পারব কি না। কিন্তু তোমাকে বলতে দোষ নেই। এখন মনে হয়, আমার সব অতীত যেন মিথ্যে। আমার কোন বন্ধু নেই, যার নৈকট্য তোমার মত মহৎ একটা কিছু আশ্বাদ দিতে পারত। পারে। চল্লিশ উত্তর এতদিন পৃথিবীতে কি করেছে? হয়ত এসব আমার সাময়িক বিভ্রান্তি। পরে নিজের দিকে চেয়ে নিজে হাসব। কিন্তু এই মুহূর্তকে অস্বীকার করার তাগদ আমার নেই। প্রচণ্ড এক মানসিক অস্থিরতার গিরিখাদ-মুখে, তোমার সজীব সবুজ তরুণমূল ধরে আসন্ন মৃত্যু-পতনকে আমি যেন এড়িয়ে যাচ্ছি.....

ইতি
তোমার সয়ীদ

“বেড়ী মরছে।”

সদু প্রায় চীৎকার দিয়ে উঠল। পুনরাবৃত্তি করলে সে “বেড়ী মরছে।”

আফজল একটা চিঠি পড়ছিল। কাবু অন্দরে গেছে।

সদু আবার অনুরোধ করলে, “পড়েন, আফজল ভাই।”

“শোন..... তোমার অবহেলা আমি বুঝতে পারি। পার্টিতে অনেক লোকজন এসেছিল। এটা ঠিক সকলের দিকে নজর দেওয়া যায় না। হুল্লোড়ে এমন হয়। কিন্তু তুমি আমাকে দেখে কেন মিইয়ে গেলে। সহজ-পাওয়া জিনিসের প্রতি এমনি ঘটে। আমি ভাবলাম তুমি আমাকে দেখোনি। তাই লনের দিকে এগিয়ে গেলাম, যেখানে আরো

তিনজন বন্ধুর সঙ্গে বীয়ারে ডুব দিচ্ছিলো। তখনও দেখলাম, তুমি বীয়ারে হলুদ রঙই দেখছ। আমি তোমার সন্ধ্যাষপ্পে ঘা দিতে পারতাম, কিন্তু এত যেচে, গায়ে পড়ে নিজের মান-খোয়ানোর গরজ বোধ করিনি। এই জন্যে ভাবালুতাবিলাসী মানুষদের আমি ভয় পাই। পদে পদে বারণ করেছি না। সহজ হও, সহজ হও। কিন্তু তুমি, তুমি। তাই তোমাদের জমায়েতে আর বেশীক্ষণ থামিনি। পার্টি যখন জমে উঠল, ভিড় বাড়ল, তখন মিসেস হারুনকে, সাধারণ সৌজন্য, বলে আসার দায়-সারা পর্যন্ত সারলাম না। সমস্ত রাতটা নিজের প্রতি দয়া করে কাটল। হয়ত সহজে তোমার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম বলে তুমি প্রতিশোধ নিলে। সম্পর্ক যদি তেতো মনে হয়, তুমি সোজা বলতে পারো, হাঁপিয়ে উঠেছ। পেশাদার যারা প্রেমিক, তাদের এই ধারা হয়...।”

“বেড়ী মরছে,” সদু আবার মন্তব্য করলে।

“শোনো, আরো মজা আছে,” আফজলের উত্তর।

তারপর সে আর একটা পত্র তার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে বের করলে।

“আরো চিঠি আছে নাকি, মিয়া বাই?”

“স্থানীয় চিঠি। একদিন দু’দিন দেবী হোলে কী আসে যায় তাই ওদিকে কী হয়, তার দেখার জন্যে এই কাণ্ড।”

আফজল কথা শেষ করে, খাম থেকে অন্য পত্র পড়ে শোনাতে লাগল।

“.....তুমি ভুল বুঝেছ। কোব্রা নাম সার্থক। হঠাৎ ফৌসফৌস করে ওঠো। সেদিন মিসেস হারুনের পার্টির নিমন্ত্রিতদের চেহারা দেখলাম। কাকৈ দাওয়াত দিয়েছে তা আমার জানার কথা নয়। আবহাওয়া আমার খুব ভাল লাগছিল না। হঠাৎ চলে-আসা শোভন নয়, তুমি যা পারলে। আমার ভবিজ্ঞেশ কানেক্শান আছে। তোমার ওখানে বেশীক্ষণ থাকা আমিও পছন্দ করতাম না। কারণ, ওদের অনেকেই তোমাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে মনে বিবস্ত্র করে দেখত। বহুৎ প্রশংসার জালে জড়িয়ে যেতে। মিসেস হারুন এসব পছন্দ করেন। বহুবার দেখেছি। তিনি হামেশা মধুভাও খুলে রাখেন, মাছি যত পারে ভ্যানভ্যানাক। নচেৎ তিনি ‘গুখ’ পান না। কে কেমন লোক তাও ভদ্রমহিলা জানেন। পার্টি দেওয়ার সময় তাই বাছাবাছা লোকই ডাকেন। আমি সেদিন চাইনি তুমি এই পরিবেশে যাও বা থাকো। তোমার হঠাৎ অন্তর্ধান আমি বুঝি লক্ষ্য করিনি? তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। কিন্তু আমাকে এমন প্রতিহিংসাবৃত্তি পেয়ে বসেছিল, সেদিন ‘সাক্ষন’ পাইপের মতই শরাব টেনেছিলাম, যেন মুখ খুলে যায়, রাখ— চাক— কিছু না আটকায়। চারপাশ থেকে মুতের গন্ধ (বাথরুমে যাওয়ার মত পা কোথায়, সব ত টলোটলো) রজনী গন্ধার সঙ্গে মিশে নাকে লাগছিল। বিপরীত মানসিকতার ছবি তুমি কল্পনা করতে পারো। এমন সব ব্যবহার করলাম যেন পার্টিতে আমাকে কেউ আর না ডাকে। এক মহিলা মুখে অনেকক্ষণ কাপড় গুঁজে বসেছিলেন। তার ব্লাউজের উদোম-পিঠ নিয়ে কিছুক্ষণ গবেষণা চলছিল। তিনি গুনেছিলেন বৈকি। অবিশ্যি আড়িপাতা শোনা। শেষে সিদ্ধান্ত হোলো The whole is known by the parts অংশ দিয়ে সমগ্রের পরিচয় পাওয়া যায়— এই হচ্ছে হেতু। মহিলা কৃষ্ণা। দেখা গেল, নিমেষে রক্তিম বর্ণ। কিছুক্ষণ পরে তিনি পার্টি ছেড়ে গেলেন। তোমাকে এইভাবে তাড়াতে হয়নি, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। তুমি বলবে আমি ঈর্ষান্বিত,

তা কী খুব অস্বাভাবিক? আমার কোন স্বীকারোক্তি জবানিতে কি তোমার বিশ্বাস নেই? তুমি খামখা রেগে ওঠো, আমার কোত্রা কি না...।”

“বেড়ী মরছে,” সদু তার ধূয়া অব্যাহত রাখলে।

“তোমরা কি বেড়ী-ব্যাডা করো,” অন্দর থেকে বেড়িয়ে এসে বৈঠকখানায় ঢুকতে ঢুকতে উচ্চারণ করলে কাল্লু।

সদু-আফজল একটু সচকিত-ভাব কাটিয়ে উঠে প্রায় এক সঙ্গে জবাব দিলে “দুনিয়ার তামাসা দেখি:।”

বসল কাল্লু ফরাসের উপর। চিঠি তখনও আফজলের হাতে ধরা।

কাল্লু মন্তব্য করলে, “এসব পড়ে কী হবে। এখন আসল বিজিনেসের কী খবর?”

মাথা চুলকে সদু জবাব দিলে, “মাষ্টার-বাই, যা-যা কইছেন, করছি।”

“খবর নিয়েছো?”

“হ।”

“উত্তর দিকের একডা বাথরুম আছে, জানালা ভাইংগতে পারলে, বেবস্থা সব অইতে পারে।”

“বেশ। বিবি সাব কোন কামরায় শোয়, সাব কোথায় শোয়, জেনেছো।”

“হ। বিবি সাব ত সাহেবের লগে হর-রাত ঘুমায় না। মাঝে মাঝে সাব আহে বিবির কামরায়।”

“সেটাও খবর নিতে হবে। গহনার বাস্ক্র কৌশল রাখতে তাও জানা দরকার।”

“মোটামুটি জানছি।”

“বেশ। তবে লেগে পড়ো।” বাধা দিলে আফজল, “মাষ্টার, আর কয়েক দিন যাক। কাঁচা কাজ করব না। আর বেশ দাঁড়িয়ে জায়গা যখন।”

“বেশী দেবী ভাল না। তুমি কি চিঠি নিয়ে কিছু করতে চাও?”

“তৌবা। তাতে আমাদের কী নাফা? অনেক সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। শহরে আরো চোর আছে।”

বিরক্তি প্রকাশ করলে কাল্লু, “শহরে চোর থাকবে না ত কী, সব মুসল্লী হয়ে যাবে?”

“আমার বলার তা উদ্দেশ্য নয়। দেখতে হয় আর কারো ওই বাড়ীর উপর নজর পড়ছে কি না।”

“পড়ে পড়ুক। আমরা আমাদের কাজ করে যাব।”

তারপর শুরু হোল দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তি। কে কোথায় কী করছে, কেউ ধরা পড়ল কি না। অনেক সময় যায় তাদের। অনেক সময় জামীনের জন্যে কাল্লুকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। অবিশ্যি এসব কাজ এখন তার কাছে সহজ। বাড়ীতে একটা টেলিফোন থাকলে হয়ত তেমন ছুটাছুটি করতে হোত না। কিন্তু কাল্লু টেলিফোনের প্রতি কেমন অহেতুক ভয় পোষণ করে। কখন কী ঝামেলা বেধে যায়। কী ঝামেলা? তার কোন সুষ্ঠু ছবি নেই কাল্লুর কাছে। শুধু মানসিক আশঙ্কা। নিছক অহেতুক।

সেদিন রাত্রে তিন জনেই বেরিয়ে পড়ল এক সঙ্গে।

জীপের সামনে বসল সে। ষ্টয়ারিং হুইল সদুর হাতে। পেছনে আফজল। সব সময়

ঘরে মন বসে না। কাল্লুর এই এক বাতিক আছে। শুধু শুধু জীপ হাঁকিয়ে ঘোরা। কখনও সঙ্গে কেউ থাকে, কখনও একদম একা।

সদুর রিপোর্টে কোন অতিশয়োক্তি ছিল না। সে হুকুম-বরদার। এই কাজে তার আন্তরিকতা পুরোপুরি ভরাট।

কাল্লু তাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। বিশেষতঃ গত তিন চার মাস তার দল ত বেকার। গোটা দুই সভাপণ্ড ঠিকাদারী পেয়েছিল মাত্র। সেখানে টাকা আর কত পাওয়া যায়। তারপর সাহেব সুবোদের ব্যাপারে পরে হয়ত আর কিছু দিয়ে পুষিয়ে যাবে, কিন্তু নগদে তার মূল্য শূন্য। রোজগার ভাল ছিল আগে। সবাই বেশী বেশী ভাগ পেয়েছে। চালচলন পকেটের অনুপাতে বেড়ে যায়। যে বিড়ি খেত এখন সিগারেট ধরেছে। আহালাদির ধারা নিশ্চয় তেমনই উপরে উঠে। হঠাৎ অভ্যেস ত বন্ধ করা যায় না। মাস মাস দলের লোকদের মাসহারা টানতে হয়। অবিশ্যি দাঁউ একবার না একবার মিলে যাবেই। কিন্তু ততদিন সবুর করতে গিয়ে ফতুর হোতে হবে না ত? তবে তার বাড়ী ভাড়া, দোকানপশরা আছে চালিয়ে নিতে পারবে। কখন-কখন সব ঠিকঠাক পরিকল্পনাও ভেঙে যায়। রাত্রির অন্ধকারে কারবার। ভয় কিছু আছেই। সুতরাং বিচারে ভুলত্রুটি দেখা দেয়। কিন্তু এবার নিজে সে ছক কেটে দিয়েছিল ভুল হওয়ার কোন কথা নয়। তবু দাঁউ ফস্কে গেল।

সদু বললে, “উকীলের বাড়ীর চারপাশ আমাদেবু জানা। বাথরুমের জানালা ভেঙে চুকেছি। ছিটকিনিও খুলে ফেললে মাজেদ, (দলের অন্যতম সদস্য) কিন্তু তারপর—।”

“তারপর কী?”

“হঠাৎ হুইসেল বাজল। বুঝলাম বৈধিতিক। সকলকে চম্পট দিতে হোলো।”

“সংকেত দেওয়ার জন্যে হুইসেল দেওয়ার কথা ছিল?”

“না। আমরা একদম আপনার কথামত চলেছি।”

“হুইসেল, একবার বা দু’বার বাজল?”

“দু’বার। প্রথম বারের জবাব দিলে দোসরা হুইসেল। তখন ক’ন কি সাহসে আর থাছি। পুলিশ ত হুইসেল বাজায়।”

“ঘাবড়ে তুললি তোরা—”, কাল্লু, কপালের রগ কঁচকে কিছুক্ষণ চূপ করে রইল।

“অন্য কোন লোক আছে আশেপাশে মনে হোলো?”

“তা হৈছে। কিন্তু মাস্টর, আমাগো মানুষও হৈতা পারে।”

“বোঝা দায়। আচ্ছা, ঘাবড়াস নে। দেখতে হবে কী ব্যাপার।”

কাল্লুর চিন্তার অশেষ কারণ ছিল। কারণ, নিশ্চিত কয়েক হাজার টাকার গুনা ত আত্মসাৎ হোত। সুতরাং কয়েক মাস খাতিরজমা। তাছাড়া এত চমৎকার পরিকল্পনা কী করে ভেঙে যায়? জানালা ভাঙার সময় কেউ টের পায়নি। আসল সমস্যা ছিল সেখানেই। ছিটকিনি খোলা ত ছেলেখেলা ব্যাপার। অথচ তখনই গুণগোল বাধল।

এমন সময় সদর-দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। উঠে গেল সদু। ফিরে এলো, সঙ্গে আফজল। সে রীতিমত উৎসাহে টগ্‌বগ ফুটছিল। তার দীপ্তিমান মুখ দেখে কাল্লুর বিরক্তি ধরে। আজ তাকে বসতেও বলল না। অবিশ্যি সম্পর্ক এত পুরাতন, লৌকিকতার বলাই

কবে উঠে গেছে। কাজেই সে কিছু মনে করবে না।

বসে পড়ল আফজল। মাষ্টরের চোখের দিকে চেয়ে সে নিভে যায়। এই মানুষ তার আজকের চেনা নয়। ভেতরে ভেতরে বেশ তেতে আছে অথবা কিছু নিয়ে এমন মাথা ঘামাচ্ছে যে এখন হাজার সুসংবাদ তার কানে ঢুকবে না।

আসর একদম স্তব্ধ। এই অস্বোয়াস্তি আফজলের পক্ষেই সব চেয়ে দুর্বিসহ। সে সুযোগ খুঁজতে লাগল। কালুর মুখের দিকে বার বার চায়। তার মোটা ঠোঁট অর্ধ-উন্মোচিত, ঘাড় একটু কাৎ, চোখ আড়চোখে উর্ধ্বগামী। কি ভাবছে কালু?

কিন্তু হাওয়া পাংলা হোয়ে গেল এক মিনিট পর। কালু, মুখ খুললে, “কি খবর আফজল?”

—মাষ্টর—, মুখের কথা শেষ করে না আফজল। যদিও সে মাষ্টরের বিশেষ সহকর্মী, কিন্তু ভয় তার কম নয়। মানিক পর্যায়ে পড়ে এই ব্যক্তি।

“দিন কাল খারাপ,” এইটুকু উচ্চারণ করে কালু, আবার কপাল কুঁচকায়।

সদু জবাব দিলে, “জী।”

আফজল চুপ করে রইল।

কালুও খুব স্বোয়াস্তি বোধ করে না। পকেট হাতড়ালে সে। সিগারেট নেই। অন্দর থেকে আনতে হয়। কালু বাড়ীতে পুরুষ চাকর রাখে নী। নানা গোপন কাজকর্মের হদিস ফাঁস হোয়ে যেতে পারে। সকলের বাজার-হাট সদু বা আর কেউ করে দেয়। সুতরাং সিগারেট আমার জন্যে তাকে উঠতে হোয়ো। যাওয়ার আগে বললে, “আমি কিছুক্ষণ গোসলখানায় আছি। আসছি। তোমরা গল্প করো।”

কালু অদৃশ্য হওয়া মাত্র আফজল জিজ্ঞেস করে, “মাষ্টর আজ খুব গম্গীন, ব্যাপার কী?”

“আপনি বোঝেন না? ব্যবসা মন্দা।”

“আরে মন্দা কী?” আফজলের উৎসাহ আবার ফিরে এসেছে, তা বজায় রেখেই সে বলে যায়, “এ্যাসা দিন নেই রহেগা। ব্যবস্থা আরো পাকা করতে হবে।”

“কি রকম?”

আফজল খুশীতে ডগমগ পকেট থেকে একটা চিঠি বের করলে।

সদু হতাশ। কাচুমাচু মস্তব্য করতে থাকে, “মিয়াবাই আপনার চিঠি থোন।”

সদু তখন উৎসাহিত হোয়ে ওঠে দ্বিগুণ বেগে, দ্রুত বলে, “পড়েন, পড়েন।”

“শোনো..... ‘তুমি লিখেছ হোটেলে মড়ার মত তোমার অপেক্ষায় শুয়ে রইলাম। সময়ের পাথর মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পড়তে লাগল। নিঃশ্বাস বন্ধ হোয়ে গেলে বরং মঙ্গল ছিল। স্বপ্নও এমন অর্থহ্য হোতে পারে, তা আগে জানতাম না। কিন্তু তোমার আসার সময় বয়ে গেল। বুঝলাম, তুমি আটকে পড়েছ কোন কাজে অথবা এই ভাবে আমার শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিক করেছ যেন মৃত্যুকে আমি বার বার চেখে চেখে দেখি অথবা মৃত্যু আমার দেহ লেহন করে যায়... ইত্যাদি তুমি লিখতেও পারো এত সুন্দর। তুমি যে ব্যবসা জগতের লোক কেউ বলবে না। ইঠাৎ উচ্চার মত বোধ হয় ছিটকে পড়েছিলে।

যাক, সেকথা। শোনো, আর মন দিয়ে শোনো। রাগ করো না। আমি কোন কাজে আটকা পড়িনি। তোমাকে মৃত্যুর গারদে ঠেলে দেওয়ার দুরভিসন্ধি যদি জাগে, আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হয়। কসম খোদার। তোমাকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নিরুপায়। আমি তোমার কাছে গেলে আরো বেশী কষ্ট পেতে অথবা উভয়কে ভয়ানক এক যন্ত্রণার মুখোমুখি বুঝতে হতো...বুঝেছো? না, বুঝতে পারো নি...।

সদু খিক্খিক্ হেসে উঠল। সে হাসি ক্রমশঃ উচ্চমার্গী। আফজল তখন ধমক দেয়, “এই হাসস ক্যা?”

হাসির চোটে সদু ফরাসে একটা ডিগবাজি দিয়ে নিলে। কাল্লু নেই। কাজেই স্বাধীনতার মওকা।

“এই হাসিস ক্যা?”

“মিয়াবাই,” সদুর মুখে কথা আর বেরোয় না, কারণ হাসি সব চাপা দিয়ে ফেলে।

শেষে আফজল কড়া ধমক দিতে থামলে উঠে সদু বলে, “কেন হাসি জানেন?”

“ক্যান?”

“বেড়ীর রিতু অইছিল।”

“দূর শুয়ার—।”

আফজল সদুর পিঠে এক কিল বসিয়ে নিজেও বেহুশ হাতির তোড়ে পলকে পা ফেলে যায়। তারপর দুই জনেই হাসে। তার রেশ হয়ত বুদ্ধিগণ চলত যদি না কাল্লুর কাশির শব্দ শোনা যেত। সে অন্দর থেকে ফিরে আসছে।

আফজলের হাতে চিঠি দেখে কাল্লু ঘুম জুড়ে উঠল, “আফজল, তোমার চিঠি থোও।”

কিন্তু এখন তুরূপ তাস আফজলের হাতে সে বাঁয়ে বইবে কেন? পাল্টা জবাব দিলে, “মাষ্টর, গোস্বা হবেন না। হদিস পেয়েছি।”

“কিসের হদিস?”

“সেদিন কেন ফেল?”

কাল্লু ধীরে ধীরে শান্ত। সিগারেট বাড়িয়ে দিলে দুজনকে। নিজে বসে ত পড়লই।

এবার মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করে, “কী ব্যাপার আফজল?”

“আপনি ত চিঠি দেখতেই পারেন না।”

“মানে— কোন কাজ হচ্ছে না, তা-ই।” সিগারেট ধরাতে একটু সময় যায়। তারপর আফজল শুরু করে, “শোনেন...অন্দিয়া শুধু তোমার হয় না, আমাকেও চেপে ধরে। তবে তুমি নানাভাবে আমার সাহায্যকারী। কল্পনা করতে পারবে না। হ্যাঁ, বাজি। কিন্তু তোমার অদৃশ্য সাহায্য নানা পথে কাজ করে। সত্যি। তুমি আমাকে দিলে অন্দিয়া। তার ফলে, আমি একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেলাম...”

কাল্লু বাধা দেয়, “কি সব ঘ্যানর ঘ্যানর...”

ধমক গায়ে না মেখেই আফজল পড়ে যায়, “আমার বাড়ীতে নির্ধাৎ চুরি হতো। কিন্তু আমি জেগে উঠলাম। অবিশ্যি চোরই হবে। কারণ বাড়ীর চারিদিকে লোকের পাতালি। গভীর রাত্রে নিশ্চয় তুমি আমার জন্যে হন্যে বেরিয়ে পড়োনি বা বাগানে পায়চারী

করো নি। এমন করলে ত তোমার সঙ্গে আমার বনত না, এতটুকুও না। শোনো, পুরো ঘুমে ছিলাম না। একটা শব্দে জেগে উঠলাম। চোর আসবে ভাবিনি। কিন্তু আমাদের বাড়ীর পূর্বদিকে যে কলা-বাগান আছে তার ভেতর দুদাড় লোক-পালানোর শব্দ শুনে ভাবলাম, নিশ্চয় চোর। উঠে টর্চ ফেললাম, কিছু দেখা গেল না। কিন্তু আর কি খাতিরজমা শোয়া চলে? ঘরদোর দেখতে হয়। নীচে বাথরুমের জানালা ভাঙা। চোর এসেছিল আর কী সন্দেহ থাকবে? তাই বলছিলাম, তুমি আমার ছায়ার মত আলোয় অন্ধকারে... অন্ধকারের ছায়া আছে বহু মূর্খ জানে না। তুমি আছো আমাকে ঘিরে...।”

আফজল হঠাৎ থেমে বলে, “আপনার আর কথা শুনে কাজ নেই। কারণ কাজের কথা পেয়ে গেছি।”

কী ভাবে? জিজ্ঞাসু নেত্র কালু।

কথাটা মাস্টর, খুব মন দিয়ে শোনেন, আফজল সোজাসুজি কালুর দিকে তাকায় এবং বলে পূর্বদিকে কলা বাগানে আমাদের কোনো লোক ছিল না। লোক এলো কোথা থেকে?

সদু সায় দিয়ে উঠল, হাঁচা কথা, মাস্টর বাই, আমাগো কোন লোক রাখি নাই।

“কারণ রাখার অসুবিধা ছিল। ওদিকে পাঁচিল বেশ উচু। বেগতিক দেখলে লাফিয়ে পালানো সহজ নয়। ঠ্যাং ভাঙতে পারে। তাই—, সদুর কথার খেই ধরে বলতে লাগল আফজল।

কালু তখন সোজা উবু হয়ে বসে আর দুই সখীর মুখের দিকে যথাক্রমে তাকায়। একবার এদিক, একবার ওদিক। বিস্ময়ের ধাক্কায় সেও জখম, স্পষ্ট।

আচ্ছা—, শব্দ তুলে সে একটা তাকিয়ায় আবার ঠেস দিয়ে বসলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুললে, দলের সবাইকে জিজ্ঞেস করছে?

মাস্টর, দল আবার কী? এ ত মিটিং পও করা নয় যে অন্ততঃ দশ বারো জন লাগবে। মাত্র ছ’জন ছিলাম। সবাই উত্তর আর পশ্চিম ঘিরে। অন্য দিকে ঢের অসুবিধা। ওদিক থেকে কেউ চুরি করতে আসতে পারে না। আফজল বেশ দ্রুততার সঙ্গে মুখ থেকে কথাগুলো বের করলে।

“ওদিকে কেউ ছিল না; ঠিক জানো?” কালু আবার প্রশ্ন তোলে।

আফজল তালুচোকা কণ্ঠ স্বরে জবাব দিতে দেয়ী করলে না,

“আমুলে গোণা যায়। কটাই বা লোক? তারপর আবার সন্দেহ?”

“আমার মনে হয়—”, আফজলের আমতা আমতা ভাব। আগে কালু তাকে পাস্তা দিতে চায়নি। সুতরাং নিজের মন্তব্য চট করে বলে না।

তাগিদ দিলে কালু, “কী মনে হয়?”

“আমার মনে হয় আরো একদল চোর চুরি করতে এসেছিল। শেষের দিকে আফজল নিজের প্রতি বেশ সবল আস্থা ফিরে পায়। কণ্ঠে তার জানানু পরিষ্কার।

“আরো এক দল চোর?!” কালু, গৌফে তা দিতে লাগল।

সদু দুই পণ্ডিতের কথা-কাটাকাটি দেখছিল, মুখ খুলতে সাহস পায়নি। এবার সেও ফুট, কাটলে, নিচ্চয়, “আর এক হালাগো দল।

“চিঠি তার প্রমাণ। আফজল প্রমাণ যেন হাতে নাতে দিতে চায়।

“আরো এক দল—? কালু, বাক্য শেষ করে না, গৌফের মধ্যে যেন সব রহস্য ঢুকে গেছে। তাই সেখানে আঙুর ঘোরাতে থাকে।

তাকে স্তব্ধ থাকতে দেখে আফজল আরো জোর পেলে, “হ্যাঁ, মাষ্টর এতে আর কোন সন্দেহ নেই।”

“পাড়ার ছেলেপুলে হোতে পারে। কলার কাঁদি চুরি করতে ঢুকেছিল,” মন্তব্য করলে কালু।

বেলুন যেন ফুটো হয়ে গেল। আফজল একদম মিইয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে বললে, “এই জন্য আপনেনের মাষ্টর কই। ঠিক বলেছেন।”

“হ। হালা পোলাপানের কাণ্ড হৈতে পারে। আজগুবি কিছু না। ফাংরা পোলাপানরা এসব কইর্যা থাকে। তা ভি ঠিক।” মন্তব্য সদূর।

কালু বললে, “ভেবে দেখি। আর তোমরা খোঁজ নাও, কলা-বাগানে পাকা কি কাঁচা কাঁদি ছিল কি না।

“বাইসাব, যদি বেয়াদবী মনে না করেন, আমার আর এক কথা মনে লয়,” অভয় প্রার্থনা করলে সদূ।

“কও না, মিয়া। আল্লা হগ্গলের আক্কেল দিছে,” সদূকে সাহস দিতে কালু, ভাষা, স্বর পর্যন্ত বদল করে ফেললে।

“মাষ্টর বাইসাব, কলা বন। নিশুত রাইত। হালুয়া ফুর্তি করার ভি হওয়ার পারে।”

মাথা নেড়ে সায় দেয় আফজল।

কয়েক মিনিট চুপচাপ যায়।

শেষে কালুই বেশ চিন্তাবিত কণ্ঠে বলে, “সব খোঁজ নাও। তারপর দেখা যাবে। দুই দল চোর, বিশ্বাস হয় আবার হয় না। আচ্ছা দেখি। আজ ওঠা যাক।”

আসর ভাঙার আগে এক দফা সিগারেট বিলি করে, যদি খাওয়ার বন্দোবস্ত না থাকে আজ কালু, তা ভুলে গেল। বোঝা যায় সে-ও চিন্তিত।

অমৃতময়ী কোব্রা,.....

.....দু'বছর গড়িয়ে গেল। কিন্তু মনের রগড়ানি অনেক অনেক দ্রুত চলে, তখন সাধারণ চেতনা দিয়ে আর তার পরিমাপ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বরং স্বপ্ন দেখাই তখন যুক্তিযুক্ত। কালিদাসের মায়া না মতিভ্রম, প্রশ্নের জবাব এই উত্তর চল্লিশে এসে ধরতে পারলাম, অথচ ছাত্রজীবনে কত আউড়েছি। তখন সুড়সুড়ির বেশী কীই বা পেয়েছি? এখন মনে হয় মহাকাবিদের পাঠ পরিণত বয়সেই শুরু হওয়া উচিত। আমি ত ওপাট চুকিয়ে বসেছিলাম। ঢুকেছিলাম আর এক জগতে সেখানে রাণী এলিজাবেথকে শাদী করার আগে পর্যন্ত আর সম্পদ তৃষ্ণার শেষ ছিল না। ছোটো, দৌড়াও, আছাড় খাও, সর্বাস্থে চোট লাগুক, মাথার খুলি এক দিক উধাও হোক, কেবল ধাও, ধাও। ওই ছুটছে মায়ামৃগ সর্ব সুখের আধার, সর্ব আয়েসের উপাদান, সর্বেশ্বর তোমার পাপ-পুণ্যের সুখের দুঃখের— কখনও রৌপ্য-চক্র, কখনও বিল-অফ-লেডিং বা এক্সচেঞ্জ, কখনও বীমার পাট্টা, বাট্টা, কমিশন-অমিশন, কানটোকা, সাস্পেন্স এ্যাকাউন্ট, ডিভিডেন্ড লভ্যাংশ, নাম-

ধাম-কাম মেমোরাণ্ডাম, হারানী বন্দর, সার্ভে, তুখোড় ইয়ার, আর-আর R.R রেলওয়ে রসীদ, আলকাত্তার ড্রাম, টার্বাইন, তেলের গন্ধ, চীফ গেষ্ট, চাঁদা, মাদার্চৌদ রাজপুরুষ, ঘুষ, কোচ, উৎকোচ, বীয়ার সেশান, I.O.U. গুপ্তির পিণ্ডি.....

আমি পঞ্চবটী বনে ক্লান্ত এক লক্ষণ। তোমার সৌরভ অকস্মাৎ কোন কোন বাতাসের সঙ্গে এমন গাঁঠছড়া বাঁধলে? বেশ ত ছিলাম। বাঁচার জন্যে কোমলের সাধনার দরকার আছে, আমার অগোচরে ছিল। থাকত। ক্ষতি কী? কত জনই ত আছে, মুহূর্ত যাদের কাছে অনন্ত। যাদের কাছে দস্তের সুযোগ মানবতার পরাকাষ্ঠা, পরম কাম্য। যেহেতু সম্মুখে জিজ্ঞাসা নেই। (আমারও এতদিন ছিল না) নিজের গণ্ডীর বাইরে আরো মানুষ বর্তমান—যাদের সংস্পর্শ ছাড়া তোমার মনুষ্যত্ব বিকাশ অসম্ভব—তারা জানে না, বোঝে না, জন্মাবধি সম্মুখে সহজ আরামদায়ক কয়েকটা ধরতাই বুলি বা চিন্তা পায়, ঠিক যেন গরুর সামনে জাবনার ডাবা—এই ডাবায় তারা জাবনা খায় আর জাবর কাটে, আরামেই ঘুরায়, জন্তুর প্রয়োজন যদূর। আমার আরাম হারাম করে দিলে তুমি। ব্যবধানের সাঁকো হয়ত চিরদিন ভাঙাই থাকবে। সাঁত্রে-পার হোতে হবে সকল যন্ত্রণা-সমুদ্র। মনে হয়, তোমাকে ছিনিয়ে আনতে পারতাম, চাঁদ নও জানি। কিন্তু শশীরূপে আমার আকাশে তোমার উদয় ঘটলে হয়ত সহজ হোত তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করা। কিন্তু তুমি মানবী। প্রকৃতি তোমাকে দেবীরূপে অবতীর্ণ করলে, হয়ত পাথরের মূর্তি, কোথাও বিরাজ করতে। ভক্তের কোন অসুবিধা ঘটত না। পাথরে মাথাকোটোও আনন্দদায়ক। কিন্তু ওই মানবী আকার বিচ্ছিন্নতার মশাল কোনদিন নিভতে দেবে না। আকস্মিক আমি যেন ব্যাধিগ্রস্ত।।.....

রক্তের মূর্ছনায় তোমার দম্ব হাসির রূপন, দক্ষমান জতুগৃহের অভ্যন্তরে ভিখারিণী ও তার পঞ্চপুত্রের নিঃশঙ্ক ঘুমের সহচরী.....
.....এসো

ইতি—
তোমার সয়ীদ।

গলির মুখে একটা ল্যাম্পপোস্ট ছিল। অন্ধকার রাত্রে তবু রাস্তা আর দু'চার ঘর দেখা যেত। আফজলের পরামর্শে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গোটা পাড়া ঘুটঘুটে অন্ধকারে লেপা। এই সুযোগে মাজেদ একটা পাইপ বেয়ে উঠছিল। নীচে সদু দাঁড়িয়ে। অন্যান্য সঙ্গীরা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত। এই বাড়ীর হরন-পায়তারা আজ কয়েক মাস থেকে চলছে। আজ সুযোগ।

সদু মাজেদকে বলেছিল, বেগতিক দেখলে সে নীচে লোহার পাইপে ইট ঠুঁকে তিন বার আওয়াজ দেবে। তখন সে যেন সরসর নীচে নেমে আসে। উদ্দেশ্য ছিল ছাদে উঠে চিল্কোঠার দরজা খুলে নীচে নামবে। আর এক দরজা খুলে দেবে অন্য এক সঙ্গী। চোরা-চাবি নিয়েছিল সে। যদি কোন দরজা তালা দেওয়া থাকে খুলতে কোন অসুবিধা থাকবে না। আজ কেউ জীপ আনেনি সঙ্গে।

সদু নীচে অপেক্ষা করে। তার পকেটে টর্চ আছে। মাঝে মাঝে জ্বালবার লোভ হয়।

কিন্তু এমন বোকামি তাকে পেয়ে বসে না। অঙ্ককার ঘরে টর্চ ফেলে ফেলে দেখাই নিয়ম। কেউ জেগে আছে কিনা। তাই টর্চে কম্জোর ব্যাটারী দেওয়া থাকে। আলো প্রথর হোলে ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। তখন সব কাজ পণ্ড।

ফন্দী মাফিক কাজ ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট গেল। মাজেদ নিশ্চয় ছাদে উঠে গেছে। গাছ-চড়ায় তার সঙ্গে বানর লাগে কোথা। একটা খুট শব্দ পর্যন্ত হোলো। সদু সন্তর্পিত কান খাড়া করে। উপরে দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দই হবে। আর কোন শব্দ নেই কোথাও। বাতাসে কোথাও কোথাও গাছের পাতা নড়ছে। কিন্তু তার শব্দ মৃদু, কান খাড়া না করলে টের পাওয়া যায়। সদু তাই নিশ্চিত। কাজ ভেতরে ঠিক এগোচ্ছে। তার কাজ পাহারা ও সঙ্গীদের সংকেত-প্রদান। কখনও সে ভুল করে না কত আসন্ন বিপদ এই সতর্কতার জোরে কেটে গেছে। আর যদি ঘাড়ে পড়ে যায় মসিবত, তার মোকাবিলার জন্যেও সে প্রস্তুত থাকে। দু'চার জন তার থাপড়ে কলাগাছের মত শুয়ে যাবে না? ছুরি একটা আছে হাফ-প্যান্টের পকেটে। কখনও ব্যবহার করতে হয়নি। দরকার হোলে এস্তেমাতে শান দেওয়া লাগবে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী ধারালো হোয়ে উঠবে। এই সব সাত পাঁচ ভাবছে সদু। সিগারেট খাওয়ার নেশা চেপে আসে এই সময়। বেকার কিনা। কিন্তু কালুর কথা তখন মনে পড়ে: সব 'আমলের' (সাধনা) ব্যাপার। ঘটনার পর ঘটনা ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অনেক সময় জোরে নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত বিপদ আহবান— এসব সাধনা ছাড়া আর কী?

দশ মিনিট কেটে গেল। কারো কোন সাড়া নেই। কী ব্যাপার। সব গুম হোয়ে গেল নাকি? না, দলের কোন নিমকহারাম বেঙ্গমারী করেছে? এমন অলঙ্কুণে কথা মনে আনতে নেই। কালু বলে, সাহস কমে যায়। সাহস গলে আর এই সব কাজ করা চলে না। এই সব কেন, কোন বিপদেরই মোকাবিলা অসম্ভব।

সদু কেবল বার বার উপরের দিকে তাকায়। তার পকেটে এক ফালি ইট রয়েছে। আঙুল দিয়ে দেখে সে আর চোখ তেড়ে তেড়ে অঙ্ককারের ভেতর দিকে দেখার চেষ্টা পায়। উপরে আকাশ আর ছাদের কার্নিসের ঝাল্লা রেখা ছাড়া কিছু চোখে পড়েনা।

আরো তিন মিনিট পরে সদু অনুভব করে পাইপের উপরে যেন ঘস্ঘস শব্দ হচ্ছে। শঙ্কিত, সন্তর্পিত সে উর্ধে চোখ মেলে। একটা গোল নিরেট ছায়া ক্রমশঃ নেমে আসছে। মাজেদ নিশ্চয়। কিন্তু নেমে আসছে কেন? অন্য এক খোলা দরজা দিয়েই তাদের পালিয়ে যাওয়ার কথা। তবে কী কোন বাগড়া বাধল। ক'মাস থেকে রুজির রাস্তায় এম্মি এক এক করে কাঁটা পড়ছে। মাষ্টর ত রেগেই থাকে। তার পকেট থেকে সকলের মাসহারা যাচ্ছে। মেজাজ একটু গর্মে ওঠে যদি, কারো কিছু বলার থাকে না। মাজেদ নামছে কেন?

সদু পকেটস্থ ছুরির বাঁটে হাত রেখে পাইপ থেকে একটু দূরে সরে মোতামেন হোয়ে রইল। বলা যায় না, নসীব খারাপ চলছে। যদি আর কেউ হয়। হয়ত এখানে নিঃশব্দে কিছু করতে হবে। এক হাতে সে বড় ক্রমালখানা পর্যন্ত বাগিয়ে রাখলে। অচেনা হোলে আগে ত শালার মুখের ছিট্রি বন্ধ করতে হবে। তারপর অন্য মোকাবিলা।

কিন্তু সদুর এত ধানাই-পানাই অমূলক। বুপ শব্দে নামল লোকটা। তারপর সে ফিস্ফিস বলে, “সদুবাই, ওদিকে কেউ যায় নাই। ছিটকিনি খুলছিলাম এক ঘরের। তিন

জন ঘুমায়। উডলে একা সামাল দেওয়া যাইব না।”

“কেউ আছে নাই?”

“না।”

“ত গেল কুই হালারা।”

“কুয়ায় পড়ছে না ত? পুরাতন বাড়ী। উঠানে একটা কুঁয়া আছে। হালাদের পয়পয় কইয়া দিছি।”

না। গেল কুই?

সদু অধৈর্য হোয়ে পড়ে। আশঙ্কায় তার মুখ রাত্রির কালো আরো বাড়িয়ে দেয় নিশ্চয়।

শেষে সে বলে, অহন কী করতাম?

আবার উডি। দেইখ্যা আসি।

“না, আর যাইও না। গতিক ভাল না।” দু-জনে কর্তব্যের পথ খোঁজে। অতি আশঙ্কিত। কিন্তু কুলকিনারা পায় না।

এমন সময় একটা ঢেলা তাদের সামনে ঠক্ শব্দে পড়ল। দু’জনে চমকে ওঠে।

কী ব্যাপার?

সদুর ত গায়ে ঘাম ছুটে যাওয়ার অবস্থা। মাজেদ তার কাছাকাছি, সকল অর্থেই।

এত রাতে এমন গোল ঢেলা কারা মারে? টর্চ জ্বালিয়ে দেখার চেষ্টা পায় সদু। কিন্তু ঢেলা ঠিকরে একদিক চলে গেছে।

আরো দু’মিনিট গেল।

আবার একটা ঢেলা। এবার প্রায় সদুর গায়ে পড়ে। সামনে পাঁচিলের ওদিক থেকে আসছে, না বাড়ীর লোক অন্ধকারে ছায়ামূর্তি দেখে আন্দাজে ছুঁড়ছে। হয়ত এরা টর্চ রাখে না।

আর শব্দ করা উচিত নয়। এখন উদ্ধারের রাস্তার কথাই ভেবে রাখা প্রথম কর্তব্য। কিন্তু অন্যান্য সঙ্গীরা যে উপরে বা ঘরের মধ্যে থেকে গেল। তাদের দশা কী হবে? সদু ভাবলে, বেঙ্গমানীর চেয়ে গোনা (পাপ) আর নেই। বিপদ না দেখে সে সঙ্গীদের খামখা ফেলে পালিয়ে যেতে পারবে না। যা-হয় তা-ই হোক। চোরের শাস্তি জেল। বেশ, তার জন্য সে প্রস্তুত। এখন দেখা উচিত ঢেলা কোথা থেকে আসছে। সদু চোখ কান মন সর্ব ইন্দ্রিয় খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। ঢেলার আগম-দিক নির্ণয়ই এখন প্রকৃত বিপদ এড়ানোর উপায়।

আবার ঢেলা পড়ল।

সদু দিক ভুল করে নি।

দু’জনে অন্ধকারে এই বাড়ীর পাঁচিলের গা বেয়ে পশ্চিম দিকে এক সরু মুখে এসে পড়ল। ঢেলা এই পাশ থেকেই গেছে। এদিক বেশ অন্ধকার। পুলিশের টহল কালেভদ্রে পড়ে। সেদিক থেকে নিরাপদ।

কিছু এগিয়ে সদু দেখে একটা রোয়াকের উপর চারজন শুয়ে আছে। অবিশ্যি দূর থেকে সদুর চোখে পড়েছিল, একজন মাথা তুলে তুলে দেখছে আবার মেঝের উপর মাথা রাখছে, ঘুমোনের কায়দায়। কিন্তু কাছে আসতে ওই মাথা তোলাতুলি বন্ধ হোয়ে গেল।

সদূর সন্দিগ্ধ চোখ তাই এখানে এসে জরীপ শুরু করলে। পকেট থেকে টর্চ বের করলে কয়েক বার, বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে দেখার পর।

টর্চ জ্বলেই সে উচ্চারণ করলে, অবিশ্যি ফিস্‌ফিসানির সামান্য চড়া সংস্করণে, “এই হালারা এখানে করতাত্ত কী?”

চারজনেই উঠে পড়ল।

উদ্বেগ, আশঙ্কা, বিপদ মুক্তির আনন্দ সব একত্রে ঘোরালো জট পাকিয়ে ওঠে সদূর ভেতর।

হঠাৎ মুখ খুলতে পারে না সে।

তাকে ওই চারসঙ্গী আর মুখ খুলতেও দিলে না।

নেপথ্যে এক জন বলে উঠল, “এখানে আর না। যে-যার রাস্তা ধরো। একত্রে এত লোক দেখলে, পুলিশ এই রাত্রে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরছ মনে করবে না। যে-যার রাস্তা ধরো। আশপাশের লোক উঠে পড়লে আরো বিপদ। এক এক জন সরে পড়ো আলাদা আলাদা রাস্তায়।”

বক্তা আফজল।

প্রিয় সয়ীদ,.....

..... তুমি ক্রমশঃ ফিলজফার হয়ে উঠছ। আর বৈরাগী। আমি বৈরাগিনী হোলে তুমি কি খুশী হবে? তখন আমিও ত সব ব্যাপারে নিঃস্পৃহ হয়ে উঠব। জীবন কি তাতে জমবে? তুমি যদি এত ভাড়াভাড়ি আস্মানে ওঠো, আমি জমিন থেকে কী করে নাগাল পাব? তোমার শরীর খারাপ হচ্ছে না ত? অবিশ্যি আমার কাছে তোমার দৈহিক কোন ঝুঁৎ ধরা পড়ে না। প্রেম অন্ধ। কিন্তু তুমি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হও। অনেক সময় বৈরাগ্য আসে স্রেফ দেহের কারণে। আমার ত ভয় হয়, আর প্রথম থেকে এই ভয় পাচ্ছি, তুমি বড় বেশী আবেগের চাকায় নিজেকে ছেড়ে দাও। বোঝা গেল, ব্যবসায় তোমার ঠিক মন পুরোপুরি বসেনি, হয়ত তুমি নিজের অজানিতে সব কিছু করে যেতে। ব্যক্তিত্বের অনেক টুকরো থাকে। সব ফালি এক রকম রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে না। আমার কথাগুলো তোমার কাছে খুব গদ্য-গদ্য (সেই পুরাতন চিঠি দ্রষ্টব্য) ঠেকতে পারে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে তাল মিলাতে কিছু ছন্দ-পতন রাখতে হয়, নচেৎ আর দশজনের সঙ্গে হাঁটা যায় না। গুটিয়ে নেওয়ার বয়স থাকে। সে এত জলুদি কেন? তোমার একখানা মটোর বাদ, সব নাকি বেচে দিয়েছ শুনলাম। আহা, আমাকে যদি বিয়ে করো, তোমার গৃহিনীর জন্য মটোর লাগলে, আমার জন্য লাগবে না? পূর্বে দাদার আমলে যারা দুই বিবি করত, তারা প্রত্যেক স্ত্রীকেই বোঝাত, ‘তোমরা দু’জনে যেন আমার দুই চোখ। উভয়ের সাহায্যেই দুনিয়া আমার কাছে ধরা দেয়। এক চোখ ভাড়াভাড়ি অন্ধ হোয়ে যায়, কারণ দৃষ্টিশক্তির বহুল খরচে। সুতরাং ইত্যাদি ইত্যাদি...’। তুমি তেমন দু’চোখ করলেই পারো। অবিশ্যি তখন আমরা তোমাকে চার চোখ দেখাব (আঁখ দেখায়েগা), তা আগে থেকে বলে রাখা যেতে পারে। একটু মাটিতে নামো। হঠাৎ-হঠাৎ-জাগা খেয়াল, বলো, এই বয়সে পোষা মানায় না।...পাটিতে আমাকে মিসেস আতহার আলি বা আতহার উকীল বলেই ডেকো,

যদি প্রয়োজন হয়। হঠাৎ তোমার দেওয়া জৈব-নামে ডেকে, বসো না। তোমাদের মত আবেগ সর্বস্বদের দিয়ে বড় মুশকিল। আমাদের দেখাশোনাটা একটু কমিয়ে দেওয়া যাক। বলছি না তোমার আবেগের নদীতে বাঁধ দাও। তবে ভাদ্রের কোটাল আসতে দিও না। দু'কুল ছাপিয়ে গেলে গেরস্থর দুর্দশা হয় অশেষ। ভূমি বুঝি গ্রামে থাকোনি কখনও? সময় মত কুঞ্জে আসব বৈকি। আমার সৈনিক উপগুপ্ত প্রতীক্ষা জানে না।

ইতি—

কোব্রা

সুগঃ— সামনে সপ্তাহ। একটা মজা এবং অনেক চুমু তোমার প্রতীক্ষায়।

“মাষ্টর বিশ্বাসই করবে না।” আফজল বললে।

তারা পাঁচজনে জমেছিল এক গোপন আস্তানায় মাজেদের বস্তীর বাড়ীতে। এখানে কালেভদ্রে দরকারে কাল্লুও এসে জোটে অবিশ্যি বিশেষ জরুরী অবস্থায়। নচেৎ কোন গুপ্ত পরামর্শের জন্য কাল্লুর বাড়ীই তোফা আশ্রয়।

সদু জবাব দিলে, “তা ঠিক। আজকাল আমি ভাবি, নসীব। চার পাঁচ বার দাঁউ গেলগ্যা। কারণ কী?”

আফজল আর হেতু-আবিষ্কারের মনোযোগী নয়। সে বললে, “তোমরা শোনো তা হোলে বুঝতে পারবে।”

“কন,” সদুর সংক্ষিপ্ত জবাব।

“সব ঠিক-ঠিক চলছিল। মাজেদ চিলেছাদ দিয়ে উঠে এলো। তা দেখিনি। তবে ছিটকিনি খোলার আওয়াজ বুঝতে পেরেছিলাম। আমার কান রাতে আর অন্ধকারে অনেক বেশী খাড়া থাকে। কিন্তু শুনলাম ত পালানোর সময়। আর কেন নীচে নেমে দৌড় দিতে হোলো, তাও শোনো। চোরাচাষি দিয়ে বার-বারান্দার দরজা খুলে আমরা শোয়ার কামরায় পৌছলাম। গরমের দিনে এই ব্যবস্থা ওই বাড়ীর। এবার কামরায় ঢুকব। তখন দেখি না টর্চ বাতি জ্বলে উঠল। ভাবলাম সেরেছে। টের পেয়ে গেছে বাড়ীর লোক। কিন্তু তা না। দেখলাম সবাই ঘুমোচ্ছে। আর দু'টো লোক টর্চ ফেলে দেখছে। এত আজব ব্যাপার। তখন চট করে আমরা কামরা থেকে বেরিয়ে একটা থামের আড়াল হলাম। দেখা যাক কী হচ্ছে। কিন্তু আজব ব্যাপার। ওই লোক দু'টো হয়ত আমাদের গায়ের গন্ধ কি, কিছু টের পেয়েছে, তারা কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। আমাদের উপর টর্চ ফেললে পর্য্যন্ত। আমরা ক'জন তখন একে অপরের গায়ের উপর ঘেঁষাঘেঁষি নিঃশ্বাস বন্ধ করে তামাসা দেখছি। ওদের একজন আমাদের দেখলোও। কিন্তু ভান করলে যেন দেখেও দেখলে না। রহস্যময় ব্যাপার। তারপর দু'জন দুন্দাড় সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। নীচে দৌড়াদৌড়ির শব্দ। দরজা খোলা হাঁ-হাঁ করছে। আমরাও ঢুকতে পারি। কিন্তু আবার ঢুকব কোন সাহসে? নীচে ওসব কিসের শব্দ?”

সামান্য দম নিলে আফজল। সদু তাকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলে। মাজেদ ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল। সেও একটা সিগারেট নিলে এবং সকলের মুখে আগুন

সরবরাহ করলে।

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে আফজল বলতে লাগল, “এমন ব্যাপার ত কখনও ঘটেনি। মনে রেখো, মনের মধ্যে হিসেব চলছে একদম ঢাকা-মেলের মত। ওরা কারা? ওরা ত আমাদের লোক নয়। এই বাড়ীর মিস্ত্রী-কামীন হোতে পারে। কিন্তু এত রাত্রে এখানে টর্চ হাতে আসবে কেন। সব ধাঁধা। আমাদের ওরা দেখেছে নির্ঘাৎ। কিন্তু কিছু বলল না কেন? আমার ইচ্ছা করছিল, ঘরে ঢুকে দেখা যাক। কিন্তু—।”

আফজল সিগারেট এক টান দিয়ে নিলে, গৌফ সরিয়ে। ঝুপো ডালপালা খালি ঠোঁটের উপর এসে পড়ে কিনা।

“হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ঘরে ঢুকব। কিন্তু শোয়া একজন হঠাৎ ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলে আর বিড়বিড় কী যেন বললে। হয়ত ঘুমের ঘোরে কথা। কিন্তু আমি তা তখন ভাবতে পারলেও, খামখা দুঃসাহস দেখাতে পারি নে। তা-ও দেখাতাম, যদি না একজন বলে উঠত ‘এই সরে শো’। তোর ঠ্যাং এদিকে এসে গেছে। ঘরে ক’জন লোক আছে তা বোঝার উপায় নেই। কারণ আমরা আমাদের টর্চ বাতি আর জ্বালিনি। কোন ফ্যাসাদ জোটে কে জানে। কিন্তু নীচে তখন বেশ পা-তালির শব্দ। আমাদের ধরার ষড়যন্ত্র করছে না ত। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হয়। এই অবস্থায় আর দেয়ী করা চলে না। তখন পালাতে হোলো। দুয়ার খোলা ছিল নীচে। আমরা পাঁচিল টপকে পিঠটান দিলাম।”

সবাই চুপ। সদু কি যেন জিজ্ঞাসার জন্যে মুখ খুলবে, তার আগেই আফজল আবার খেই ধরলে, “নিজেরা ত পালিয়ে এলাম। এখন তোমাদের কী দশা হবে? সেই তরাসে ত আবার জান যায়। কী করে তোমাদের খবর দিই। তোমরা ত বাড়ীর পেছনে। শেষে এদিকে এসে ওই ফন্দী জুড়লাম। ঢেল, আরো। সংকেত ত ছিল না। হঠাৎ ঢেলার চোটে যদি তোমাদের আক্কেল ফেরে।”

“আচ্ছা।” সদুর যেন বহু দিনের নিরুদ্দেশ ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল।

আফজল আরো যোগ করে, “তারপর কাছাকাছি কোথাও থাকতে হয়। যাক, এক জনের রোয়াক পাওয়া গেল। যেন মুসাফির, যাওয়ার জায়গা নেই, হঠাৎ শুয়ে পড়েছি। সেখান থেকে ক’টা ঢেলা মারলাম।”

“আপনি কি আমাদের দেখে দেখে তাক করছিলেন?” সদু প্রশ্ন তুললে।

“একদম আন্দাজে। তবে একটা আঁচ আছে ত।” জবাব দিলে আফজল, যেন এই মাত্র সে বিপদের মুখ থেকে ফিরে এসেছে।

মাজেদ তখন শব্দ করলে, “কিন্তু—।”

“কিন্তু কী?”

“মাষ্টর ত রেগে বোম হোয়ে যাবে।” গৌফে তা দিলে আফজল এবং মাউঃ বাণী ছাড়লে, “সে আমি তাকে বুঝিয়ে দেব। এ ত আর তোমাদের মত কাঁচা লোকের কারবার না। আমি সঙ্গে ছিলাম।”

সদু কথাটা যেন বুঝে উঠতে পারেনি আনমনা বলে চলে, “নসীব... হালা নসীব।”

মাজেদ রীতিমত চিন্তাশ্রিত। বহুদিন বেকার। কারণ, কাজে ফল দর্শে না। সে সমস্যার তলায় যেতে চায়। তাই বললে, “কিন্তু হোয়েছিল কী?”

ঠোঁটের উপর ঠোঁট অনেকটা নিরাসক্তির ভঙ্গীতে উত্তর দিলে আফজল, “খোদাকে মালুম।” তবে আমার কী মনে হয় জানো?”

“কী?”

“আরো একদল চোর ওই বাসায় ঢুকেছিল।”

সদু মাথা নেড়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোর দিয়ে, যা তার ধাতের ব্যাপার নয়, বললে, “আপনি প্রতিবার ওই এক কথায় বলেন, মাস্টার বিশ্বাস করবে না।”

“বিশ্বাস না করলে, আমি কি করতে পারি? কিন্তু নিশ্চয় আর এক দল চোর ঘরে ঢুকেছিল। যারা ঢুকেছিল তারা চোর।”

“চোর ত আপনাদের দেখে কিছু বলল না কেন?”

“তাদের বুঝি জানের ডর নেই?”

“কিন্তু—।”

“কিন্তু কী?”

সদু আফজলের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করলে খুব সহজে, “না হয় দু-দল চোর আছে। কিন্তু একই দিনে, একই বাড়ীতে একই সময়ে?”

“তা হোতে পারে। দুনিয়ায় এমন কোন ঘটনা নেই হোতে পারে না। হয়ত আছে। গাধা মানুষ হয় না। কিন্তু এরকম ব্যাপার ত হোতে পারে। একই দিনে একই সময়ে একই বাড়ীতে—।”

সদু আরো আপত্তি তুলতে গেল। কিন্তু আফজল বয়সে বড়, মুরুব্বীর চালেই বললে, “জাতি কথায় ফায়দা নেই। এখন মাস্টারকে তুলো যাক। সে যদি কিছু করতে পারে। দিন কাল খারাপ, বড় খারাপ।” শেষে কণ্ঠস্বর অতি হতাশামণ্ডিত।

ওঠার আগে সবাই চা খেলে এবং আরো এক দফা সিগারেট ওড়ালে।

প্রিয় কোব্রা,..... মাফ করো আমার অকারণ বাচালতা। যত দিন যাচ্ছে আমি নিজের কাছে নিজে অপরিচিত হোয়ে উঠছি। কারো সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যেন আমার পক্ষে কষ্টকর। শুধু তোমার সান্নিধ্যে এলে আমার সব খেসারৎ মুনাফায় পরিণত হয়। সকল অপচয় যেন সঞ্চয়ের কড়ি রূপে আমার চিত্ত হিল্লোলিত করে যায়। এক কালে গৃহে সকলের সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারতাম। যার যা প্রাপ্য, দাও। কিন্তু এখন এক বিষণ্ণতায় আমাকে পেয়ে বসে। তখন তোমার সাহচর্য্য-স্মৃতি অবলম্বন করে আবার মনের জোর ফিরে পাই। যেন বাঁচার মন্ত্র তুমি। ক্লাব পার্টি আমার আর ভাল লাগে না। হঠাৎ-হঠাৎ পুরাতন অভ্যাসের বশে মজ্জুর জায়গায় হাজির হই। কিন্তু বিরক্তির যেন ওৎ পেতে থাকে। একটু পরেই দলে দলে জোটে। তখন পদচারী, কিছু গুলতানির আসরে অমনোযোগী শ্রোতা বা ওই জাতীয় আনমনার হাই তুলে সরে পড়তে হয়, আমার বরাদ্দ সময়েই বহু আগে। বিকার, বিকলতা স্বৈর্য্যাবাব— নানা বিশেষণ তুমি জুড়তে পারো। কিন্তু আমি আত্ম-অস্থিষ্ট। ধীরে ধীরে মনে হচ্ছে, আমার যন্ত্রণার শেষ কোথায়, আমার কাছে চিরদিন অজ্ঞাত থেকে যাবে। অথচ তোমার সংস্পর্শ একদম গুমোট দিনের পর বৃষ্টিঝড়ের মত। অনেক সময় আমাদের কোন কথা হয় না তুমি জানো। বসে থাকা ছাড়া যেন আর সব কিছু

অপ্রয়োজনের পর্যায়ে পড়ে। অথচ ভরাট মনে হয় সন্ধ্যা, দুপুর— সিঁদেল চোরের মত যদিও একটু অলক্ষ্য ফাঁক-রচনার জন্যে আমরা দায়ী বা তৃষিত থাকি। আমার বাচালতা যত বাড়ছে তোমার পত্র তত সংক্ষিপ্ত। তুমি কি হিসেব-নিকেশ ছাড়া চলো না? ওসব কাজ ত আমি বহু বছর করে আসছি জীবিকার তাগিদে। কিন্তু এখন কোন হিসেবই আমাকে তায় না, স্রেফ মেরু-তুষার করে ফেলে। কিন্তু তুমি যেন ধীরে ধীরে আমার জায়গা নিচ্ছ। আমি অভিযোগ করছি না। তোমার তা মনে হতে পারে। কোন ক্ষেত্রে গুটিয়ে গেলে অন্য কোথাও তার বিস্তার ঘটবেই। ছাত্রকালে কিছুদিন আমার বুদ্ধিজীবী হওয়ার সখ চেপেছিল। বহু জ্ঞানীশূনীর আসরে যেতাম কব্বে পাওয়ার আশায়। অথচ এই খেয়াল কেন আজীবন পেয়ে বসল না? নানা পাকে বর্তমান পাকে জড়লাম, সাফল্যের চাঁদ হাতে পেলাম, আজ আবার অতীত ঝলক দিয়ে যায়। তোমার হাতে রাখী বাঁধতেই যেন আমার সর্বভূমিস্তর ওলট-পালট হচ্ছে। সুখ যন্ত্রণার কাছাকাছি। আমার যন্ত্রণা সুখের যমজ-ভগ্নী আগে ত বুঝিনি। তাই অনুরোধ, নিপীড়কের ভয়াবহতা নিয়ে যদি কখনও অবতীর্ণ হও, অনুরোধ— মানবীর বেশে এসো না। সাক্ষাতের ব্যবধান যদিও সংকীর্ণ করতে বলব.....

ইতি
কেবল সয়ীদ

ঐ চিঠির জবাব

হে সয়ীদ আমার অতি সংক্ষিপ্ত পত্র। তুমি এমন জটিল হয়ে উঠছ, একটু সহজ হও। তোমাকে তাহোলে ধরা খুব সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু তুমি আসমানে আমি জমিনে— এমন হোলে সঙ্গমস্থল কোথায় রচনা করবে? তুমি না প্রেমের ত্রিবেণী গড়তে চাও? তার জন্যে অত জোরে ছুটলে স্রোত কি করে নদীর মোহনায় ঢুকবে। হঠাৎ স্কুল-পলাতক বালক হয়ে উঠছ। তোমার উদ্দামতা এখনও যায়নি কেন? যথাস্থানে যথা কথা!

ইতি,
তোমার ফোঁস

ত জীপ চালিয়ে যাচ্ছিল কালু।

নিশীথ নগরী।

শহরের সড়ক সটান পড়ে আছে। এত গভীর রাতে কোন পথচারী নেই। আওয়ারা দু' একটা কুকুর হঠাৎ রাস্তা মাড়ায়। কোথাও কোথাও তারা দল বেঁধে চীৎকার দেয় ধাবমান জীপ দেখে। জোৎস্না থাকলেও মেঘ আকাশে। তাই আবছা চতুর্দিক। সব রাস্তায় এখনও আলোর ব্যবস্থা নেই এই শহরে।

ষ্টয়ারিং এক হাতে ধরে অন্য হাতে একটা সিগারেট জালিয়ে নিয়েছে কখন কালু। স্পিডোমিটারের দিকে খেয়াল নেই তার। কত মাইল? বিশ-তিরিশ ঘাট-সত্তর যাই হোক, তার কিছু আসে যায় না। আড্ডায় প্রচুর নেশার সামান্য মজুদ ছিল। সে আছে কিন্তু

মাঝামাঝি স্তরে। তবু সে স্তির নয়। মাথা দপদপ করছিল। মটোরের অন্তরাআর স্পন্দনের সঙ্গে তার যেন কোথায় যোগ আছে। ষ্টীয়ারিঙে হাত দিয়ে সে আত্মস্থ হচ্ছে। এই নিদ্রিত নগরী চোখে কোন যাদু জাগায় না। তার চোখে হয়ত রাস্তা দেখে। আর বেশী কিছু দেখার ইচ্ছা নেই তার। এ্যাক্সিডেন্ট এক আধটা হোতে পারে। কিন্তু মানুষ মরবে না। মরবে সে। সে ত মানুষ নয়।

অসাফল্যের পর অসাফল্য। দলের দাবীর কাছে হয়রানি। মাথা ঠিক থাকবে কেন? এসব চুকিয়ে-বুকিয়ে সে ত সাধারণ নাগরিক হওয়ার প্রার্থী। কিন্তু সুযোগ দেবে কে? গুস্তাদের কথা মনে পড়ল, “ব্যাটা যে সাপ পোষে, সাপুড়ে, সর্পঘাতেই তার মৃত্যু হয়, অপমৃত্যু।” এত দিন সে গুস্তা পুষেছে। আজ গুস্তার মুখেই সে শুনেছে অকাট্য চরম কথা। তার কথাগুলো কানের পটে গুগুনে কাঠ-কয়লার মত ছাঁকা দিচ্ছে : ‘মাষ্টর, দোষ আমাদের নয়, রোজগার হচ্ছে না। বৌ-বেটীকে ত খাওয়াতে হয়। অথচ আপনি হাত ভারী করেছেন। আমরা মানুষ, না কি? আপনার হুকুমে কি কাজ করিনি? আমাকে নিয়ে আপনি যা কিছু করতে পারেন। পুলিশে দিতে পারেন। আপনাকে আর পুলিশ স্পর্শ করবে না, আপনার মর্যাদা অনেক উপরে উঠে গেছে। আমাকে মারতে পারেন, কাটতে পারেন। সব পারেন। তবু বলব, আপনি আর মানুষ নেই। আমার বৌ-বেটী নেই? সেকথা ভাবলেন না। দেশে কলকারখানা হচ্ছে, আপনার ব্যবসা কে ঠেকায়? আমরা মরব। বেশ...।’

এই ধারা হাজার ধারার ধারালো লাভ। ব্যাটিকে সে খুন করতে পারত। তার জন্যে নিজের হাত ওঠানোর কোন দরকার নেই। ইস্তারাই যথেষ্ট। কিন্তু না, আর নরহত্যা নয়। বেটা আখেরী দোহাই মেরেছে, তার স্বীকৃতি আছে। যাক, মাফ করে দেওয়া যাক। দলে আসতে চায়, আসবে। না আসে, না আসুক। পিঁপড়ে। ক্ষতি কি করবে? কার কাছে নালিশ করবে? সেও জানে, কত বেচারী সে।

কিন্তু কী কথাগুলো বললে। অসহ্য, অসহ্য। দিনের বেলা হোলে এইটুকু জীপ চালাতে সে এ্যাক্সিডেন্ট না করে পারত না। ভাগ্যিস রাত্রি। মাত্রার বোঝা নামবে কী? এই সব ফেলে দিয়ে একদম সাধারণ গেরস্থর জীবনযাপনই ভাল। একটা ব্যবস্থা তার করতেই হবে। কিন্তু এই শহরে সম্ভব নয়। হয়ত এই দেশেই সম্ভব নয়। আর কোথাও। সুরঞ্জানের বিয়ে দেবে সে। কোন সৎ শিক্ষিত দুলা। চাকরী করা লাগবে না। দেখে-শুনে খেতে পারলেই হোলো। আর বৌ যদি তার সঙ্গে থাকে থাক। নচেৎ সে একাই চলে যাবে মক্কা শরীফ। আর ফিরবে না। শুধু নামে চলছে। গায়ে আর ত আগের জোর নেই। আর রক্ত-গরম কাজে জড়াবে না সে। কিন্তু বাঁচতে গেলে রক্ত গর্মাতে হয়। কেঁচোর মত বাঁচতে চেয়েছিল সে। কেউ বাঁচতে দেয় নি। পায়ের তলায় ফেলে রগড়েছে। আট বছরের বালক পর্যন্ত ‘এই রিকশাওয়ালা যাবি’ তুই-তোকারি দিয়ে ডাকতে দ্বিধা দেখায়নি। আজ সে আপনি। কারণ, সাপ। ছোবল দিতে পারে, ফৌস করতে পারে। আর কেবল গর্জন নয়। প্রয়োজন-মত রক্ত বর্ষণ। তাই সে সম্মানিত আপনি। হঠাৎ অষ্টহাস্য করে ওঠার প্রবৃত্তি চাগান দিয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে, সব ভেঙে-চুরে ফেলার সখ জাগে কালুর। অথচ কতদিন কত প্রচণ্ড নেশার মুখে সে নিজেকে বলি দিয়েছে। এমন অশ্বাভাবিক কিছু মনে জাগেনি।

দ্রুত একটা মোড় ঘোরাতে হোলো। এত জোরে সে গাড়ী ঘোরায় একটা ল্যাম্পপোস্টে লাগতে পারত। লাগুক। কালু ত মানুষ নয়। বেটার আশ্পর্ক, মুখের উপর এমন কথা বললে।

শহরের ভেতরে এই জায়গাটা নির্জন। অনেক দিন থেকে ফাঁকা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে এখানে অস্থায়ী বাসিন্দার যাতায়াত ছিল। কিন্তু গত তিন বছর ধাঙড় পল্লী-রূপে এলাকা বিখ্যাত হোয়ে, উঠেছে। সুন্দর সড়ক। কিন্তু তার পাশে নর্দমা, কাদা, শুয়োরের পাল, হাড়-জিরজিরে বাচ্চা, হাড়গিলা অকালবার্দ্ধক্যের শীকার মেয়ে-মরদ— সব তুমি দেখতে পাবে।

মটোরের সাঁ-সাঁ-রব ছাড়িয়ে কালুর কানে যায় তুমুল হট্টগোল চলছে নিকটে কোথাও। তুমুল অট্টহাস্য, উল্লাস, চাঁচামেচি বা ঐ জাতীয় কোন হট্টরোল। স্পীড একটু কমিয়ে ফেললে কালু। এক-দম দশ মাইলের নীচে। তারপর কান খাড়া করে সে। বুঝতে একটু দেরী হয় না : ধাঙড় পল্লীতে পচুই কি হাড়িয়া খেয়ে জোছনা রাতে সবাই ফুর্তিতে মেতেছে। ব্রেক কমলে কালু। আবার সজাগ কান। এবার সবই স্পষ্ট শুনতে পায় সে। মেথর ধাঙড়রা ডুগুগুগি বাজিয়ে সমবেত কণ্ঠে গান করছে। মাঝে মাঝে ধুয়ার কায়দায় এহুহে, এহুহে-রব অথবা চীৎকার, নিদ্রিত নগরীর শুদ্ধতার বৃকে ঝিলিক মেরে উঠছে, তার দপাদপি-রত মাথার রংগের মত। সামনে একটা দেওয়ালের আড়াল ছিল। তাই কালু কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু জমাট আওয়াজের ধাক্কা বিচিত্র ঐক্যতানের মত তার কাছে হঠাৎ এসে আবার রেশ রেখে-রেখে সরে যুক্তি। বেহালার তারে কে যেন ঘষে ঘষে ছড় টানছে। ককিয়ে কালুর মত এই শব্দ হঠাৎ গর্বিনীর সদম্ব চরণ-নিষ্ক্ষেপের মধ্যে সঁধিয়ে যায়। আবার যাত্রা শুরু হয়। যখন-সমুদ্রে, প্রপাত জোয়ার-স্ফীত নদীর মোহনা— সব একত্রে বাতাসে গোঙানির রূপ ধারণ করে। কালু শুদ্ধ, জীপের মত। একটা সুখের স্পর্শ, অবসাদ-মুক্ত বিশ্রামের সুড়সুড়ি তার সারা দেহে। তার ইচ্ছা হয় ওইখানে ছুটে যায় ওই আসরের শরীক, জীবন যেখানে লুটপাট হচ্ছে। এই পল্লীর চেহারা সে জানে। নোংরা এবং দীন। তারই ভেতর প্রাণোল্লাসের এই জাগরী উঠছে। খেতে দোষ কী। সে ত মানুষ নয়। ছেঁড়া-ছেঁড়া অনুভূতির আঘাত তাকে আরো লোভাতুর করে তোলে। সেই মুহূর্ত তাকে ঠেলে নিয়ে যায় নানা খামখেয়ালীর আস্তাকুঁড়ে। এমন ধাঙড় হোলে ক্ষতি কি ছিল? গোলাপি নেশার আমেজের ভেতর যৌথ উদ্দাম সঙ্গীত, ঢোলের রব, হট্টরোল মিশে যায়। কালুকে কে যেন আকর্ষণ করে। এইখানে জীপের উপর সে নিঃসঙ্গ। নির্জনতার পাহারায় আবদ্ধ। মুক্তি-প্রার্থনার সকল উৎকোচ তাকে হিড়হিড় টানতে থাকে। বসে-বসে পায় এক রকমের বৃন্দ শান্তির স্পর্শ, ওই আসরে ঢুকে-পড়ার সুখদ আলিঙ্গন। একটা ট্রেন হইশেল বাজিয়ে কোন দিকে যেন চলে গেল। অগোচর হাত উঠে আসে তার মাথায় ষ্টীয়ারিং হুইল থেকে। ট্রেন তার মাথার ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে ডা-ডা-ডি-ডি-কো-টা ডি-ডি-কো-টা করতে করতে। কানের পাশ থেকে এক ঝাঁক শালিখ পাখি কিচির মিচির উড়ে গেল। এইখানে বসে থাকলে সে হার্টফেল করবে। ধাঙড়-পল্লী মওজে ডুবে যাচ্ছে। বিরাট শিশু গাছের একটা কয়েক কাঠা-জোড়া ছায়া পুলিশের মত হেলে-দুলে খৈনী টিপে টিপে

এগিয়ে আসছে। ছায়া অথবা পুলিশ।

কালু জীপ থেকে নামল না। একটা সুকীর রাস্তা আছে ধাঙড় পল্লীর ভেতর ঢুকতে। প্রায় নিঃশব্দে স্টার্ট দিয়ে হেডলাইট না জ্বালিয়ে সে আরো এগিয়ে গেল। দেওয়াল আর তার বরদাস্ত নয়। সব দেওয়াল ভেঙে যাক। পচুই খাওয়াই তোফা। একটু গন্ধ লাগবে। কিন্তু কী আরাম, কী আরাম। কালীটোলার সেই তাড়িখানা কি আছে? সেই শহরে একবার গিয়ে দেখে এলে হয়। গরীব খাঁ কি বেঁচে আছে? সাবেক উত্তাপ যেন সব ওইখানে অপেক্ষা করছে। হল্লা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। জীপ থামিয়ে এবার কালু দেখতে পায় : আসর। পাশেই কালো কালো এত রঙ। একটা নর্দমার মধ্যে ক'টা শুয়োর চরছে। কালুর গা ঘিনঘিন করে না। চরছে চরুক। শুয়োরগুলো বুঝি তার মত রাত্রে কম ঘুমোয়? ওদিকে আসর ভরপুর। দশবারো জন মেয়ে-মরদ ভাঁড় থেকে হাড়িয়া খাচ্ছে আর কোরাসে গান ধরছে। যার মুখ পানে রত, সে গলা দিচ্ছে না। কিন্তু ভিড়ে দু' এক জন বাদ গেলে ক্ষতি কি? দুটো মেয়ে ধেই ধেই নাচছে কোমরে হাত দিয়ে। একটা বোঁটকা গন্ধ এলো। রাস্তার পাশে একটা পাঁটা ব-ব-ব ডেকে উঠল, তারপর ফ্রুফ্রু ফ্রু নিঃশ্বাস ছাড়ে। আসরের পাশেই প্রায় বিশ বর্গ হাত জুড়ে শুয়োর-চষা কর্দমাক্ত জায়গা চাঁদের আলোয় চকচক করছে। গায়ক ও নর্তকদের কোন খেয়াল নেই। বেইশ সবাই। এক যুবক উঠে মেয়েদের কোমর ধরে নাচতে লাগল। কালু ভাবলে জীপ কোন রকমে আরো কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। আসরে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কিন্তু এখানে এলো যদি আর এগোতে দোষ কী? জীপে বসে বসে নিজের মধ্যে সে বিচরণ করে। যেদিকে চায় শুধু ছায়া, তরুলতা, ফুল, পাখির ডাক। এই মাত্র পৃথিবীর জন্য হোলো। সূর্য উঠছে। কালু দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীকে দেখছে। ওহার মত মেটে ঘরগুলো এত নীচ। মানুষ সৈন্যের কী করে, ওর ভেতর? বুপড়ি বুপড়ি কত সারি। চাঁদের আলোয় সব গ্রাসি মুচে গেছে। কোন শিল্পীর আঁকা ছবি যেন বিক্রীর জন্যে সারি সারি সাজানো। একটা কুকুর পর্যন্ত লেজ নেড়ে নেড়ে পাড়ার আনন্দের শরিক। আসরের পাশে শুয়ে আছে। গন্ধ আসে। বিকট গন্ধ। পচুয়ের গন্ধের কাছে কিছুই এগোতে পারে না। নাচ এবার উদ্দাম পর্যায়ে। তেমনই ঢোলকের শব্দ। গায়করা বেহুশ। তা বোঝা গেল, গানের মধ্যেই এক পাশে যখন এক যুবক আর যুবতীর মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হোলো। অবিশ্যি নাচের মধ্যেই। তার পর যুবতী জোর করে যুবকের কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিলে যুবক তার কটী-বন্ধন ছাড়তে চায় না কিন্তু সবল মেয়ে এক ঝঁকা মেরে নিজেকে সরিয়ে নিলে সহজে। কথা কারো থামে না। কালুর কান খাড়া। দেবতার মত সে পার্শ্বব লীলা দেখছে। শুনতে পায় সে সবই।

যুবতী : কিরে, তুই কহে হামার মুহে গন্ধ।

যুবক : সাচ।

যুবতী : হাসপাতালের ডাগ্দের বাবু কইত হামার মুহে গোলাপ ফুল রহে।

যুবক : চুপ, রাজমোতিয়া।

যুবতী : চুপ করেকা কাহে? ডাগ্দের বাবু হামার বদন দাবা কর দেখা। কহে ফুল।
তুই মেহতর কহে, আমার সুরং নাহি। আরে....

যুবক : চুপ কর, রাজমোতিয়া...

যুবতী : ডাগ্‌দর বাবু, শরীফ আদমী। কিমৎ জানে হে।
 যুবক : আয় আয় নাচ কর, রাজমোতিয়া...
 যুবতী : তুহার সংগে নাচেগা? থুঃ। হাসপাতালের দাগ্‌দর বাবু হামার কিমৎ জানতা।
 যুবক : এই শালী, চুপ কর।
 যুবতী : বেঈমান ডাগ্‌দর বাবু বদলী লে নিয়ে ভাগল্‌বা। হামার... তু হামার সুরৎকা বদনামী করে...

মেয়েটা একদম মাতাল হোয়ে গেছে। আসর থেকে ছিটকে পড়ে। যুবক তাকে ধরে রাখতে চায়। সে রাস্তার দিকে এগোয় আর বলতে থাকে, “হামার সুরতের বদনামী... দেখ অক্কা, দেখ অক্কা।” তারপর সে বুকের কাপড় খসিয়ে ফেললে। চাঁদের আলোয় আবছা সব বোঝা যায়। মেয়েটা যুবককে টেনে হিঁচড়ে এগোতে থাকে, সমস্ত আসরে একটা ছন্দ পতন ঘটল সহজে। কেউ কেউ গানে তখনও মত্ত। কিন্তু অধিকাংশ উঠে পড়েছে। মেয়েটার পেছন পেছন তামাসা দেখে। ঢুলি কেবল তার বাদ্য ছাড়ে না। ডুগ্‌ ডুগ্‌ শব্দ বেজেই চলে।

কালু নির্বিকার। সে যেন শিশু, চেয়ে আছে। সকলে এই রাস্তার দিকে মুখ নিয়েছে। মেয়েটা চীৎকার করছে, “আরে হামার ডাগ্‌দর বাবু।...” তারপর সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

হেড লাইট জালিয়ে ফেলেছে হঠাৎ কালু নিজের অজানিতে। চাঁদের আলো হিঁচকে চোরের মত সটকে পালায়। তীব্র আলোয় কালুর চোখে পড়ে, চারিদিকে কি কুৎসিত আবর্জনা। রাস্তার ধারেই কত জন মুতে রাখে। মাটি ক্ষয়ে গেছে, কিন্তু গন্ধ ত অত সহজে যায় না। তিন চারটে গুয়ার বাচ্চা গঁৎ গঁৎ করছে একটা ঝুপড়ীর পাশে। ন্যাকাড়া ঝুলছে কতগুলো বাখারীর তৈরী জানালার উপর। কাঁচা গোবরের গাদি কয়েক হাত দূরে। গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে।

হেড-লাইটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একদল মেয়ে মরদ। হঠাৎ সব স্তব্ধ। যেন মৃত্যুর মুখোমুখি।

একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, “কোন আপ?”

“পুলিশ” কালুর মুখ দিয়ে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে যায়।

কয়েক জনের হাত জোড় হোয়ে যায় ওই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে।

আর কোন শব্দ নেই।

এতক্ষণ প্রাণোদ্ধামতার নায়িকা-নৃত্য চলছিল, সব বরফের প্রান্তর। মেয়েটা শুধু দপাদপি করছে। কিন্তু বন্ধ মুখ। সেই প্রথম চীৎকার দিয়ে উঠল, “এই বাবু সাব...।”

চুপ, চুপ, সম্মিলিত বারণ ধ্বনি।

“এই বাবু সাব, হামার সঙ্গে সাঙা করবে, এই সাব... গোড় পড়ে...”

“চুপ, চুপ।”

এক জন মেয়েটার মুখ চেপে ধরেছে। তবু বিকৃত শব্দ বেরিয়ে আসে ফাঁকে ফাঁকে, “সাঙা... গোড়... পড়ে...”

কালুর ইচ্ছা করে, এখনই জীপ চালিয়ে দিতে পারত সে সব মানুষগুলোর উপর। আর তারপর এক শ’ মাইল স্পীডে সে ধাক্কা খেত পুরাতন শাহি আমলের ওই দেওয়ালের

সঙ্গে। সব শেষ তারপর। তার নেশা যেন এতক্ষণে জমে উঠেছে। সেই প্রকৃত মানুষ। উল্লুক তাকে সন্ধ্যায় গাল দিয়ে গেছে। সে ধান্ডর পল্লীতে আসেনি। সেই একমাত্র মানুষ। কিন্তু এরা কি? ওই যে দাঁড়িয়ে আছে বোবা শিশুর মত জোড়া জোড়া চোখ! ওরা কী?

স্বল্পতা চিরে ধরলে কালু। প্রায় চীৎকার দিয়ে জিজ্ঞেস করে সে, “তোরা চুরি করতে পারিস না?”

“চুরি?” এই কথা জবাব নয়। কালুই আবার প্রশ্ন সজীব রাখতে উচ্চারণ করে, “চুরি?”

কিন্তু অপর পক্ষ নীরব। হেড-লাইটের আলোয় দেখা যায়, বিস্ময়ের তীরন্দাজ কাউকে ঘায়েল না করে যায়নি।

তেতে ওঠে কালু। তার মাথা আবার দপ্ দপ করছে। এখনই জীপ চালিয়ে সব শেষ করে ফেলবে সে, এম্ফুনি। কর্কশ গলায় সে পুনরায় বোমা ফাটায়, “চুরি করিস না কেন তোরা? এই জানোয়ারের মত থাকিস।”

“জবাব দে।” আবার কালুর বাক্যের জের।

এইবার একজন মাত্র ঠোট দিয়ে উচ্চারণ করে “চুরি”।

আবার স্বল্পতা।

হাকিমের মত কালু সাক্ষীদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

চুরি!!!

এক বুড়ো ধাঙড় এগিয়ে এলো। বোধ হয় প্যাড়ার মোড়াল। মাথার চুল ঘাড়ের দিকে এক-দুইঞ্চি জায়গায় আছে, নচেৎ নেড়া। প্যাড়ার চামড়া এত টিলা, ছাগলে খেতে পারে। কোপিন বস্ত্রমাত্র পরিধানে। সে গোটা প্যাড়ার মুখপাত্র। অন্ততঃ এই মুহূর্তে তার কোটর গত চোখে কি ছিল, বোঝা দায়। পিটিপিট চাউনীটা ঠিক আছে।

সে বললে, “চুরি?”

“হ্যা, হ্যা, চুরি?”

বুড়ো একটু দম নিলে।

একটু ঘাড় কাৎ করে বললে, “চুরি? চুরি করব? হাতে ভগবান কুঠ (কুঠ) দেগা নেই? ভগবান হয়।”

তারপর উর্ধ্বনত্র বুড়ো চন্দ্রিকা-খচিত বিরাট-নীল আকাশের দিকে চাইলে। বিড়বিড় কি বললে সেই জানে।

এক সেকেন্ড যায় না। একটু ব্যাক করে কালু জীপ সাঁ সাঁ চালিয়ে দিলে। মাতাল, উদ্যম মেয়েটা পেছনে এবার গলা ফাটিয়ে চীৎকার দিতে থাকে, “বাবু হামার সঙ্গে সাঙা করেগা....?”

আলিস-ভাঙা নিদ্রিত মহানগরী পাশ ফিরছে আবার ঘুমের জন্য।

জীপের চাকার তলায় পীচের রাস্তা থেকে থেকে কাঁপতে লাগল।

পরদিন সন্ধ্যায় আফজল ও সদু গিয়েছিল খোঁজ-খবর দিতে। কালু গোসলখানায়। তারা অপেক্ষা করে।

আফজল আসর জমিয়ে তোলে সহজে । সেও মুষড়ে পড়েছে ।

সদু হতাশকণ্ঠে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আবার প্রশ্ন নিজের দিকে টেনে আনে, “তাই ত—।”

আফজল তার দিকে চেয়েও দেখলে না, বারবার কালুর আগম পথের দিকে তার দৃষ্টি ।

সময় সকলের কাছে ভারী । তা বুঝতে দেরী হয় না । আফজল অবিশ্যি আরো হৃদিস পেয়েছে । আজ কালুর সামনেই খোলাসা করবে । তার পকেটে একটা চিঠি কাঁটার মত খ্খ্খ্খ্খ বিধছে । এখন কালুর উপর সব নির্ভর ।

সদু গুমোট কাটাতেই অহেতুক অকারণ মুখ খোলে, “আফজল ভাই, কিছু বোঝার পারি নে । যেহানে হাত দিই সেহানেই হালা গোক্ষুর সাপ ।”

“নসীব, মিয়া,” উচ্চারণ করেই আফজল চটাস্ শব্দে তার কপাল থাপড়ালে ।

“আপনেও তা-ই কন ।”

“হ্যাঁ । এত আক্কেল খরচ । নাফা শূন্য । কপাল থাপড়াব না ত কী করব?”

“আমাদের মরণ ।”

“তবে মাষ্টর একটা কিছু উপায় বাংলাতে পারে । কাবেল লোক । উভয়েই তারপর চূপ হয়ে যায় । পকেট হাতড়ে আফজল দেখলে সিগারেট পর্যন্ত নেই । তার মেজাজ আরো খচে যায় ।

কিন্তু কালু আসামাত্র সে সপ্রতিভ হয়ে উঠল

সদু অবিশ্যি পূর্বেও মিতভাষী ছিল, আজ তার রদবদল দেখা গেল না ।

কালু বৈঠকখানায় ঢুকেই জিজ্ঞেস করলো, “চা খাবে ত?”

“তা আর খামু না ।” সদু যেন জবাবটা মুখ থেকে দ্রুত ছুঁড়ে দিলে ।

যাক, মাষ্টরের মেজাজ ভালই আছে । আজ একটা সুরাহা করতে হবে । নচেৎ মান ইজ্জৎ কিছুই বাঁচেনা । কাল যে একটা অশ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে গেল অতি-পুরাতন এক দলীয় লোকের সঙ্গে তার কারণ, আর কিছু না, এই অসাফল্য । রোজগার যখন বন্ধ, তখন মায়ামহব্বতের ঘরেও তালা-চাবি পড়ে ।

কথাবার্তার ফাঁকে কালু নিজেই এক সময় চা বয়ে নিয়ে এলো । পুরুষ চাকর ত নেই । এদিকে কালুর ভদ্রতায় দলের সকলে মুগ্ধ ।

আফজল হাওয়া অনুকূল দেখে পার তুলতে গেল ।

‘মাষ্টর, আর একটা সুলুকের জবাব পাইছি ।’ সে বললে ।

“কি?”

“ওই আতহার উকীল আর এক মাইয়ার লগে ফাঁসছে ।”

“তুমি ঠিক জানো?”

“হ্যাঁ । এই দেখেন—।”

উচ্চারণের পর আফজল পকেট থেকে পত্র বের করতে গেল । কিছুটা ভেতরে, কিছুটা হাতে । এই অবস্থায় কালু বাধা দিলে, “থোও মিয়া, চিঠি । মুখে বলো ।”

একটু অপ্রতিভ আফজল তবু তাল সহজে সামলে নিয়ে বলে, “উকীলের বউ প্রেম করে ইম্পোটারের সঙ্গে । আর উকীল মজেছে এক বিধবার সঙ্গে, যার বহু সম্পত্তি ।”

হাত নেড়ে কালু এক তাক্সিলের ভঙ্গী করলো টোট সংকুচন-সহ। সেই সঙ্গে বললে, “মিয়া ওসব কথা আর গুনিয়ে না। আমাদের লাভ কী? আমাদের দেখতে হবে কিসে দাঁউ বাগানো যায়।”

“কখন কী কাজে লাগে কে জানে।”

“আমাদের কী কাজে লাগবে। আর প্রেমট্রেম ওই সমাজে পানাপুকুরে ঢেলা- ফেলার মত। ফাঁক, তার পর যেই-কে সেই, যেমন আগে তেমি পরে। শামুকের মুখ-খোলার মত। খুলতেও দেরী নেই, বুঁজতেও দেরী হয় না।

সদুর টোট মুচ্কি হাসি খেলে যায়। মনে মনে ভাবে, সাথে কি আর মষ্টির বলে সবাই।

ভক্তের প্রার্থনার মতই সদু আউড়ে যায়, “মষ্টির-বাই, আমাগো ত মরণ। কিছু হাদিস করার পারি না।”

“কিছু ভাবতে হবে না”, অভয় মুদ্রা রচনা করলে কালু করতালু আর অঙ্গুলী সংযোগে। আবার সোচ্চার, “কিছু ভাবতে হবে না। এবার আমি যাব সঙ্গে।”

আফজল ত যেন লাফিয়ে ওঠে খুশীর চোটে। সে বলে, “আপনি যাবেন?”

“হ্যাঁ।”

“তা-হোলে আর কথা কী।”

“দেখছি আমি না গেলে আর চলছে না।”

আফজল একটা সিগারেট প্রার্থনা করলে। তার নেশা লেগে গেছে। তার আক্কেল কিছু কম নয়। কিন্তু বার বার ফেল্ মেরে সে হতাশ হয়ে পড়েছিল। এবার তার বিদ্যে কম নয়, তা-ও যাচাই হয়েছে যাবে এই ফাঁকে। আফজলের উৎসাহের গোড়া নানাদিকে।

“কিন্তু—”, কালুর খটকা।

“কি কিন্তু?” আফজল কথাটা বুঝে নেয়, যেন আছার খেতে গিয়ে সামনে যা পায় ধরেছে।

“তোমাদের একটা কাজ করতে হবে।”

“একটা কেন শত কন, বান্দা পেছ-পাও অইত ন’।” সদুর উৎসাহ এইভাবে দীপ্ত হয়ে উঠল।

“একটা কাজ। অবিশ্যি পরে তোমাদের সব বাৎলে দেব।” কালুর মুখের দিকে সদু ও আফজল এমন অপলক চেয়ে থাকে। মুখ থেকে কখন কী বেরোয় যেন তাদের দৃষ্টি না এড়ায়।

“চুরি করব কোথায় জানো?”

“কোথায়?” সদু ও আফজলের জবাব এক সঙ্গে ঠোকাঠুকি খায়।

“এই আতহার উকীলের বাড়ীতে।”

“আচ্ছা।”

আফজল সন্দেহের দোলায় চেপে বসে।

“সত্যি?” সদুর প্রশ্ন।

“হ্যাঁ।”

“কিন্তু। এক জায়গায় দুইবার।”

“ক্ষতি কি। মাল ঠিক জায়গায় আছে। তা ত আর বিবি নয় ঘোরা ফেরা করবে এদিক ওদিক।”

কালুর জবাবে দুই সঙ্গী হেসে ওঠে। পরে তার অনুসরণ করে।

“এখন আমাদের কাজ কী?” দুই জোড়া জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে কালু শান্ত গলায় বলে, “খুব ভেবে-চিন্তে পা ফেলেফেলে এগোত হবে। তবে আপাততঃ একটা কাজ তোমরা করবে।”

“বলুন।”

“বাড়ীর পাশের গলিতে আমার জীপটা এই রাত দশটা নাগাদ নিয়ে যাবে। তারপর ভান করবে, খারাপ হয়েছে গেছে। বনেট খুলে পানী খাওয়াবে। কলকজা একটু নাড়াচাড়া করবে। শেষে আশে পাশের লোক জানবে, গাড়ীটা খারাপ। একজন পাহারা দেবে। বলবে, মালিক এসে নিয়ে যাবে আর একটা গাড়ীর পেছনে বেঁধে।”

“বেশ।”

“পরে আমি গিয়ে ওই গাড়ীতে বসব। নম্বর পাল্টে দিও। তোমরা বাড়ীতে ঢুকবে। আমার হাতে হুইশেল থাকবে। একটা পিঁ সিটি দেব। সেটা পালিয়ে গাড়ীতে আসার ইশারা। বুঝেছো?”

“জী।”

“মাজেদ ত আছেই। সাহসী ছেলে। চাবী খাচ্ছে খবর দিও। আচ্ছা নাম দিয়েছ তোমরা। চাবী খাঁ। আয়রন সেফের চাবী গুলো খুঁজে খুলে ফেলে। ওকে দরকার। ব্যাটা পাকা জহুরী।”

আফজল যেন ‘ওহি’ শুনছে। এমন অনুপ্রাণিত সে এবার নাটকীয় স্বরে বলে উঠল “আচ্ছা, উকীলের বিবি, এবার দেখিয়ে দেব, স্বামীকে ফাঁকি দিতে পারো, আর আমাদের পারবে না।”

নোক্তা দিলে কালু, “এখন থেকেই এত উৎসাহ দেখিও না। যে ভাবে দিনকাল চলছে, তড়পানো ভালো নয়, আফজল মিয়া। ধীরে।”

সদুর নানীর কথা মনে পড়ল। অলক্ষুণে কথা বলা নিষেধ। কিন্তু মাষ্টরকে ত সে বারণ করতে পারে না।

তার উৎসাহের তলায় তাই একটা সন্দেহ লেণ্টে রইল। মুরুব্বীদের কথা কি জানি কী হয়?

এই অভিযানের উপর তাদের সকল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আতহার আলি উকীলের বাড়ীর আকার সেকেলে। কিন্তু ভেতর হালফিলের কাছাকাছি যায়। কারণ আছে। বাড়ীটা তিনি তৈরী করেননি। কিনেছিলেন। কেনারও ইতিহাস আছে। সাবেক মালিকরা বিপদে পড়ে পানীর দামে বেচে দেয়, মাত্র বিশ হাজারে। আতহার আলী নগদ পনের হাজার টাকা আর পাঁচ হাজার টাকার চেক দিয়েছিলেন। এই চেক আর ক্যাশ হয়নি। সাবেক মালিকদের অনেক শরীক ছিল। মামলা করতে গেলে নানা ফ্যাক্টা এসে জোটে। সুতরাং তারা আর মামলা করতে সাহস পায়নি। উকীলের বিরুদ্ধে কেস, কুমীরের বিরুদ্ধে জলে লড়াই? বর্তমানে লক্ষাধিক দামের বাড়ীর মর্যাদা দিতে কিন্তু আহাতার আলী

কসুর করেনি। অনেক অদলবদল ঘটল বাড়ীর ভেতরে, কিছু-কিছু বাইরে। পূর্বে মেথর-সারফ পায়খানা ছিল। উকীল তার জায়গায় ‘সুয়ারেজ’ যোগ করলে। কোন কামরার সঙ্গে বাথরুম ছিল না। এখন প্রায় প্রতি কামরার সঙ্গে যুক্ত বাথরুম। এমন নানা পরিবর্তন। কোন কোন জায়গার জানালা পর্যন্ত বদলে গেছে। মোটামুটি আন্দাজ করা যায়, আধুনিকতার নানা উপসর্গ এসে জুটেছে।

দোতলা বাড়ী। উপরে চারখানা কামরা। নীচে পাঁচখানা। উকীলের চেম্বার বৈঠকখানা ছাড়া আরো তিনখানা কামরা। দুটো বেডরুম, একটা খাওয়ার ঘর। রান্নাঘর আছে আলাদা উঠানের এক কোণে। আতহার আলী কিন্তু এই সরঞ্জাম পছন্দ করে। নচেৎ একবার তার মনে হয়েছিল, পাকের ঘর দূরে হোলে বর্ষাকালে অসুবিধা। কিন্তু কী ভেবে সে আর ও-মুখ হয়নি। খরচও আছে নৈচা-খোল বদলাতে।

উকীলের শোয়ার ঘর উপরে। গৃহিনী বেশ আয়েশী। সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয়। তাই নীচেই তার কামরা। এই কামরা বাড়ীর মধ্যে আবার সবচেয়ে বড়। বেশ এলিয়ে-মেলিয়ে থাকা যায়। খাট আলনা, আয়রন সেফ, ড্রেসিং টেবিল পাতার পরও জায়গা খোলতাই। পূর্বদিকে একটা ছোট জানালা ছিল আরো বড় জানালার পাশে। উকীলগৃহিনী কুব্রা তা চওড়া করে নিয়েছিলেন।

বাড়ীর আর একটি হদিস আপনাদের সহ্য করতে হবে। কারণ পরে বুঝতে পারবেন। বাড়ীর পশ্চিম দিকে বারো-চৌদ্দ ফুট চওড়া গলি আছে। অবিশ্যি গলির শাখা-উপশাখা অনেক। এদিকে একটা ছোট ফটক আছে। অসিল বড় গেট উত্তর দিকে। পূর্বে লন, কলাগাছের বন এবং উঁচু পাঁচিল। দক্ষিণে একটা পুকুর আছে। অবিশ্যি শরীক অন্য। জায়গার দাম বেশী। তারা এখন পুকুর ভাঙতে করেছে। এক কোনে মাটি পড়েছে অনেক। খোলামেলা এই কামরায় উকীলের বসন্ত সাধারণতঃ ঘুমোয়। উপরে যায় না, তা নয়। উকীল সাহেব ও গৃহিনীর মজির উপর নির্ভর করে। ছোট ছেলেমেয়ে তার পাশে থাকত। কিন্তু এখন ন্যাটাপ্যাটা কেউ নেই, তারা উপরে থাকে।

সেদিন উকীল-পত্নীর ঘুম ধরতে বেশ সময় গেল। অনেক কিছু ভাবতে হয়। সংসারের চিন্তা যাদের থাকে না তাদের অন্য চিন্তা থাকে। মনের উপর কেবল মহাপুরুষেরা চোখ রাঙাতে পারে। নচেৎ পাহাড়ে ধ্বস নামার মত ভাবনা যখন শুরু হয়, কার সাধ্যি রোখে। সেই জন্যে বিছানা আরামের জায়গা মনে করা উচিত নয়। কাঁটা না থাকলেও গজাতে পারে, পাশ ফিরে শুয়ে দ্যাখো। ব্যবহার জীবির বউকে সেদিন অনেক সওয়াল জওয়াবের ফেরে পড়তে হয়, স্বামীর যা আদালতে ঘটে। তাই ঘুম হটে গেল। ঘুমকে খাটে ফিরিয়ে আনতে কি করতে হয়েছিল মিসেস কুব্রা আলির মনে নেই।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙল, তখন আঁচকে উঠেই সেই চুপ করে গেল। তার পর নিশ্চিন্তের মত সে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কামরায় সে আর একা নয়। তার সামনে এক ব্যক্তি। হাতে বাড়িয়ে আছে আর চাপা স্বরে বলছে, “গোলমাল করো না, যদি ভাল চাও।”

কামরায় অতি ক্ষীণ পাঁচ পাওয়ারের বালবের আলো আর কতদূর এগোবে।

মিসেস আলির বুঝতে দেৱী হয়নি, কি ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে। তার দরজা হাঁ-হাঁ করছে। কে কখন খুলল, খোদা জানে।

মিসেস আলি বয়স্কা গৃহিনী। প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠেন, যদিও আততায়ীর দিকে তাকিয়ে মাথা সামান্য কাঁপে। বাইরে তুমুল অন্ধকার। তাই ঘরের ক্ষীণ আলো সবল। চোখের পক্ষে বেশ সাহায্যকারী।

আততায়ী মুখ খুললে, “চাবি দাও। গহনা আয়রন সেফে আছে না আর কোথাও রেখেছো?”

নির্বাক মিসেস আলী। চাপাস্বর হিংস্র জন্তুর দন্ত-কিড়মিড় গোস্বার কাছাকাছি।

ফিস্ফিস্ শব্দে বলে, “জবাব দাও।”

তবু কুব্বা আলি চূপ।

“আর বেশি দেবী করতে পারব না। যদি মুখ না খোল তোমাকে তদ্বাসী করে ছাড়ব। গায়ে হাত দিলে কি ভাল হবে? আর যদি চেষ্টাতে যাও, আমার হাতের রুমালে সব আটকে দেব। গলা টেপার দরকার হোলে তা-ও করব। এখন ভালয় ভালয়,” আততায়ী হাত বাড়ালে আবার বললে, “চাবি দাও।”

মিসেস আলিকে নীরব থাকতে দেখে ছায়ামূর্তি আবার উচ্চারণ করলে, “সিধে আঙুলে ঘি না উঠলে আমরা আঙুল বাঁকাতে জানি।”

অন্য দিকে কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না দেখে ছায়ামূর্তি মিসেস আলির হাত ধরে হেঁচকা-টান দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের হাত বাড়ালে। সে সামান্য পিছিয়ে আঁৎকানো অব্যাহত রেখে জবাব দিলে, “না, না।”

আততায়ী বললে, “এই ত মুখ খুলছে। তড়িতাড়ি করো, না হোলে আমি তোমার কাপড় খুলে ছাড়ব। চাবি দাও।”

“না, না।” সাবেক পুনরাবৃত্তি।

“আমি এ বাড়ির জামাই না, দুইচার দিন থাকব। শিগ্গীর করো।”

ঝাপসা আলো। আততায়ী টেপের আলো ফেলে নিলে একবার চারিদিকে।

হঠাৎ মিসেস আলির চোখে পড়ে, তার বাথরুমের দরজা সামান্য খোলা। সেদিক থেকে একটা লোক কামরায় সম্ভর্পণে ঢুকল। সে কিন্তু এগিয়ে এলো না, ঘুপ্টি মেরে দাঁড়িয়ে রইল, বোধ হয় দলের লোক। লোকটা ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে রইল। মিসেস আলি আরো হক্চকিয়ে যায়।

আবার দাবী ওঠে, “চাবি দাও। বেশ সময় যাচ্ছে।”

ছায়ামূর্তি তাই শেষ সতর্কতা ছাড়লে, “আমি বাধ্য হব, তোমার ইজ্জৎ ধরে একটু টানাটানি করতে।”

“চাবি আমার কাছে নেই,” হঠাৎ মিসেস আলির মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

“ঝুট বলছ না ত?”

“না।”

মিথ্যে বলো না। পরে পস্তাবে।”

“আমার কাছে নেই।”

“কার কাছে, বলো শিগ্গীর।”

কিন্তু তখন মিসেস আলি মাথা নীচু করে কাঁপতে থাকে। অবিশ্যি খুব ভয় পেয়েছে

সে ব'লে মনে হয় না।

“আমি এক দুই তিন গুণব। তার মধ্যে যদি চাবি না দাও, আমার যা দাওয়াই আমি লাগাব। আখেরে পস্তু মরবে।” আততায়ী উচ্চারণের পর একটু থেমে শুরু করলে,
“এক— — দুই— — তিন।”

যেন তব্লায় শমের চাঁটি পড়ল। মিসেস আলি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, “আমার কাছে চাবি নেই। চাবি আমার কর্তার কাছে।”

“কর্তা কোথায়?”

“ওই যে, আঙুল বাড়িয়ে মিসেস ঘুপটি-মারা লোকটাকে দেখায়। এতক্ষণ তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। লোকটার পেছনে নজর যাওয়ার কথা নয়। সে চট করে ঘোরা মাত্র লোকটার আবছা মূর্তি দেখতে পায়। আর কোন সময় নষ্ট করে না আততায়ী। সে ধাঁ ছুটে গিয়ে লোকটার মুখে এক ঘুষি চালিয়ে বলে, “মজা দেখছিলে?”

অপ্রত্যাশিত আঘাত। ঘুপটি-মারা লোকটা প্রস্তত ছিল না। সে এক ঘা খাওয়ার পর কিন্তু পাল্টা দিলে উল্টো ঘুষি। তারপর শুরু হলো ঘুষাঘুষি। উভয়ে পকেটে হাত দিতে যায়, বোধ হয় পিস্তল কি ছুরি আছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর ঠেলায় সুযোগ আর কারোর আসে না। সুতরাং শুরু হয় এলোপাতাড়ি ঘুষো চড়াপড়, লাথি-ল্যাং। উভয়ের হাতের টর্চ ঠক্ঠক্ শব্দে মেঝের উপর পড়ে গেল। দুই জংলী মোষ যেন জঙ্গল তোলপাড় শুরু করেছে।

ঠাণ্ডর করতে পারে না মিসেস আলি, ঘটনায় কীষ্টটছে। কিন্তু দুই কুস্তিগীরের প্যাঁচ কষাকষি দেখতে দেখতে তারও মগজের কোষ ক্রমশঃ খোলতাই হোতে থাকে। সেখানেও প্যাঁচ শুরু হয়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী লড়ছে। রীতিমতো ফাইট।

এই সুযোগ।

মিসেস আলি খোলা দরজা দিয়ে এক দৌড়ে বেরিয়ে, পাশেই সিড়ি পথে উপরে উঠতে উঠতে চীৎকার করতে থাকে, “চোর, চোর!”

দু’ মিনিটের মধ্যে গোটা বাড়ী জেগে উঠল। উপরে শোনা যায় আতহার আলী উকীলের বাজখাই গলা, “বন্দুক, বন্দুক।”

চীৎকার, দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি, ক্রমশঃ একের পর এক বাতির আবির্ভাব? উকীল চীৎকার দিতে লাগল। আশপাশ পর্যন্ত ক্রমশঃ জেগে উঠে।

লোকজন জমা হয়ে যায় দশ মিনিটের মধ্যে।

বন্দুক হাতে উকীল নীচে নেমে এসে দেখল, বেডরুমে দুটো টর্চ পড়ে আছে। এবারও বাথরুমের জানালা ভাঙা।

সরু গলির ওপাশ থেকে কয়েকটা সাহসী কলেজের ছেলে ছুটে এসেছিল।

তারা বললে, গোলমালের মধ্যে, লোক বোঝাই দু’টো জীপ সাঁ সাঁ গলি থেকে বড় রাস্তার দিকে বেরিয়ে যেতে ওরা দেখেছে। হয়ত চোরের দল।

তাদের আন্দাজ মিথ্যে নয়।

একটা জীপের পেছনে আর একটা ছুটল। পেছনের জীপে হয়ত পুলিশের দল। কাজেই অদৃশ্য হোয়ে যেতে হবে নিমিষে। নচেৎ এত লোকজন নিয়ে ধরা পড়ার চেয়ে

মৃত্যু ভাল। সুতরাং ছোটো, ছোটো। স্পীডের শেষ প্রান্তে থেকে চালাও, চালাও। শহর ছাড়িয়ে গ্রাম পথে বিশ মাইল যাওয়ার পর চৌরাস্তা মিলবে। তখন কোন এক দিকে গেলে পুলিশে কিছু করতে পারবে না।

আর পেছনের জীপ ভাবছে, ওদের ধরতেই হবে। কেন পালাচ্ছে? কোথাও কিছু করে এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু বেরুল ত প্রায় একই পাড়ার বিভিন্ন গলি থেকে।

কখন শহর পার হয়েছে গেছে তারা। অন্ধকার রাত্রি। মাঝে মাঝে হেড লাইট জ্বালাতে দুই জীপই বাধ্য। ফলে অন্ধকার আরো বাড়ি। তারি মধ্যে দেখা যায় নিদ্রিত কৃষকপত্নী, নানা, ডোবা, বাথানে বিচুলি উপভোগ-রত গরু, গাছপালা। নচেৎ সবই ঝাপসা। গাছপালার অস্তিত্ব দেওয়ালের মত। বাতাসে কেবল এই গুমোট ভাব দূর হয়।

ভোর হতে হয়ত আধ ঘণ্টা দেবী। অনেক দূর এক জীপ আর এক জীপকে অনুসরণ করে এসেছে। দুই জীপে দেখা যায় দুই ড্রাইভার কিন্তু মুখোশ পরা। কারণ কী? দুই দলই চুপচাপ।

কিন্তু ভোরের মতো দেখা গেল, সামনের জীপ যেন গতি শ্লথ করছে। খুব জোর পঁচিশ তিরিশ মাইল। ফলে পিছের জীপ ক্রমশঃ তাদের কাছাকাছি এগিয়ে এলো। কিন্তু এক শ' গজের ব্যবধান সামনের জীপ অব্যাহত রাখে কমতে দেয় না। তখন সামনের জীপে কথা বলাবলি শুরু হয়েছে।

পেছনের জীপকে স্পীড কমাতে হয় কথা শোনার জন্যে।

খোলা জীপে দাঁড়িয়ে একজন মুখ দুই তালুর মধ্যে রেখে হাঁক দিচ্ছে, “তোমরা এই গলিতে কী করতে গিয়েছিলে?”

পেছন থেকে কথাটা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। তখন পেছনের একজন আরোহী দাঁড়িয়ে চীৎকার দেয়, “তোমরা ওই গলিতে কি করতে গিয়েছিলে?”

এবার এইভাবে মুখ-মা কে জবাব আদান-প্রদান শুরু হয়। দুই গাড়ীর স্পীড কমে এসেছে।

সনুখের জীপ : তোমরা আগে জবাব দাও—

পেছনের জীপ : না, তোমরা আগে জবাব দাও।

সনুখের জীপ : আমরা নিশ্চয় তস্বী তেলাওয়াৎ করতে যাই নি।

পেছনের জীপ : আমরা কি সিন্ধি দিতে গিয়েছিলাম?

সনুখের জীপ : তবে কি করতে গিয়েছিলে?

পেছনের জীপ : চুরি। আর তোমরা?

সনুখের জীপ : হেই কর্ম।

দুই জীপে তখন তুমুল হাস্যধ্বনি ওঠে।

সনুখের জীপ : তবে আর হয়রান হয়েছে লাভ কী?

পেছনের জীপ : এতক্ষণ আমরা কেনই বা হয়রান হোলাম?

সনুখের জীপ : সকাল হয়েছে আমরা গাড়ী থামাচ্ছি। তোমরা ব্রেক কষো।

পেছনের জীপ : বহৎ আচ্ছা।

দুই জীপ খেমে গেল বেবহা মাঠের মাঝখানে। কয়েকটা ঝাঁকড়া গাছে জায়গাটা

অন্ধকার। ভোর রাতে চাঁদ উঠেছিল। স্কীণ চাঁদ। তবু মুখ দেখার জন্যে যথেষ্ট।

দুই জীপ থেকে নামল দুই ড্রাইভার। তারাই মুখোস পরেছিল। আর সকলে মুখোসহীন।

দুই দলের নেতৃত্ব যে ওই দুজনের, তা বুঝতে দেরী হবে না। কারণ, অন্যান্যরা তাদের পেছন পেছন থাকছে।

সন্ধ্যা ও পশ্চাত জীপের ড্রাইভার-দ্বয় মুখোমুখি হওয়া মাত্র আসসালামু আলায়কুম উচ্চারণের পর তারা মুখোস খুলে ফেললে। একজনের মাথায় কিস্তি টুপি। অপর জন শূন্য শির, গলায় টাই। একজন পরেছে পাজামা পাজাবী। অন্যজন পাংলুন এবং কামিজ।

করমর্দন করতে করতে টুপিধারী বললে, “আমাকে হয়ত চেনেন না। আমি কালু। লোকে বলে কালু গুণ্ডা।”

“আপনি। কালু ভাই? আমি গফুর। লোকে বলে গফুর বদমাস।”

“আশ্চর্য।”

“তাজ্জব, তাজ্জব।”

“কি কাণ্ড?”

“কি মসিবৎ?”

গফুর বয়সে কিছু ছোট। এখনও তার মুখে পৌঁড়তের ছাপ পড়ে নি। সে প্রাথমিক বিদ্যালয় কাটিয়ে উঠে বললে, “ভাই কালু ভাই, আর রাত বেশী নেই। এখানে কোন কথা হোতে পারে না। সব শহরে গিয়ে। সমস্যা বুঝেছেন?”

“বুঝেছি না?”

“এখন আলাদা আলাদা রাস্তায় কাণ্ড-চোপড় বদলে যে যার আস্তানায় ফিরে যাই। তিন দিন পরে।”

“তিন দিন পরে কেন?”

“হ্যা, আমি তিন দিন বড় ব্যস্ত থাকব। তিন দিন পরে রাত্রি সাড়ে আটটায় কাবেরী হোটেলে, আপনাদের দাওয়াৎ থাকল, সেখানেই সব ফয়সালা হবে। তাই ভাবি কেন এত মার খাচ্ছি। আর কথা বাড়াব না।”

“আমিও তাই ভাবি।”

বাধা দিলে গফুর, “ভাই-সাহেব, সব কথা তিন দিন পরে। আর সময় নেই।”

অবিশ্যি ষ্টায়ারিং হুইলে হাত রেখে স্টার্টের পর আবার এন্ডেলা দিয়েছিল গফুর, “ভাই সাহেব ভুলবেন না। রাত্রি সাড়ে আটটা হোটেল কাবেরী।”

“ভুলব? মোটেই না।”

কালুর জবাব সব গফুরের কানে যায়নি। তার আগেই সে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল।

দুই জীপ ধূলো উড়িয়ে আবছা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

প্রিয় সয়ীদ,

তোমাকে চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজন হোয়ে পড়ল। ছোট পত্রে তোমার মন ভরত না। এবার পত্র বড়। কারণ, কথা অনেক। আর তোমাকে অনেক কথা কি ভাবে বলব,

এক সমস্যা। মুখোমুখি একটা ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু আমার মুখ তুমি হয়ত আর দেখতে চাইবে না। তাই পড়েই কয়েকটা কথা খসড়ার মত টেনে যাব। তুমি নিজের বুদ্ধিযোগে সব বুঝে নিও। হয়ত তোমার কিছু অসুবিধা ঘটবে। কিন্তু নাচার। আমার কোন ক্ষেদ নেই, তুমি মনে করো না। জীবনের ধারা এমনই। এক রাস্তায় যেতে চাই। কিন্তু এগিয়ে গেলে এত চৌ-মাথা, মোড় পড়ে, তখন ঠিক করা কঠিন কোন দিকে যাব? কারণ, তোমাকে রাস্তা আর আকর্ষণ নাও করতে পারে। এই রকম ক্ষেত্রে কেউ কেউ দিশেহারা, হয়ত আর কোন দিকে পা বাড়ায় না। কিন্তু সময় ত ধাক্কা দেবে। তখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও চোখ অস্থির হয়েছে ওঠে। আর এক রকমের চলা তখন শুরু হয়। তার বাহন চরণ নয়। কিন্তু এই চলার ধাক্কা আরো কঠিন। আমি তাই নিজেকে আর মনের কাছে সোপর্নদ করতে নারাজ। বরং আর দশ জনের কাছে নিজেকে সঁপে উদ্ধার পাওয়ার মধ্যে মঙ্গলের আভাষ পাই।

সব কথা তোমার কাছে হেঁয়ালি ঠেকতে পারে। কিন্তু কোন অঙ্ককার আমি রাখব না। সরাইখানায় এক রাত্রির হঠাৎ-জাগা খেয়াল যেমন বহুকাল পরে তোমাকে লজ্জা বা আনন্দ দিতে পারে গুণাগুণ অনুযায়ী, আমার মনে হয় দুনিয়াকে এমন সরাইখানা ধরে নিলে, নিশ্চয় কোন গোলমাল থাকে না কোথাও। কিন্তু দুনিয়ার মোহ কম চিত্তাকর্ষক নয়। তখন এক মুহূর্ত যদি আনন্দের পথ খুলে দেয় আর অনন্তের পথ বন্ধ হয়েছে যায়, তবু মানুষ ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। মার্লো যখন একটি মাত্র চমকনে অমরত্বের দাবী জানিয়েছিল, তার মধ্যে এই রকম একটা গৌজামিল ছিল। তুমি মনে করো না আমার ভীমরতি ধরেছে আর তাই তোমার সমীপে নানা সমস্যা তুলছি। একপটে স্বীকার করতে হয়, আমাদের এখন ভীমরতি নয়, হিম-রতির বয়স। তাই হিসাব-নিকাশের দিকে মন স্বতঃই ধায়। তোমার উডু উডু ভাবালুতা পরিণত বয়সের ফসল নয়। বরং ঠাণ্ডা রক্তের কর্ম।

আমার জীবনের উপর দিয়ে তিন চার দিনের মধ্যে কয়েকটা ঝড় চলে গেল। তাই তোমার কাছে কিছু কথা বলার জন্য একটা ভনিভা করলাম। মন দিয়ে শুনবে, আর সেই মত সুশীল সুবোধ বালক হয়েছে উঠবে। উদ্দামতা শয়তানের বিধি, মানুষের নয়।

আমার বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল। কেবল উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেছি। সে এক হাসির ব্যাপার। তুমি অপরের মুখে শুনে বেশ কিছু গর্ববোধ করবে। কিন্তু সত্যি বলছি, আমার আক্কেলের জোর অত নয়। তবে ধাক্কার মুখে পড়লে বোধ হয়, আক্কেলের উৎস খুলে যায় ওই ভাবে। একটা ফাঁড়া কেটে গেছে। অবিশ্যি গহনার প্রতি লোভ আমার খুব কম। মেয়ে আছে, ভাল-মত বিদায়ের জন্য কিছু সঞ্চয় আগে থেকে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। যে গহনা উপহার দেয়, আমি তার গহনার বেশী কিছু না। অবিশ্যি পুরুষেরা অলঙ্কার পরে না। অপরকে সাজায়। অনুভূতির হেরফের। আমি তার শীকার হইনি কোনদিন। তুমি কথায় কথায় উপহারের কথা তুলেছিলে, তোমাকে ধমকে দিয়েছিলাম। মনে আছে? সুতরাং চোরের উৎপাতে আমার কিছু আসে যায় না।

আর এক কাজ কে করল, আমার জানা নেই। বোঝা যায়, আমাদের গতিবিধি তাদের কাছে স্পষ্ট। খরগোসের মত চোখ বুঁজলে অদৃশ্য হওয়া যায় না। আমরা অদৃশ্য শত্রুর কাছে বাঁধা পড়লাম। গোপনীয়তা মূল্যহীন। অথচ চোখ ঠেরে সব সময় আমরা

এগিয়ে যাই। সভ্যতার মাপকাঠি মেনে চলার সার্থকতা কি? এই রকম বয়সে ভাবনা আমাকে বেশ উৎপীড়িত করত, তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের পর। কিন্তু হাজার বেড়াও শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। নসীবের ফের। তুমি হয়ত বুঝতে পারছ না, আমি কি বলতে চাই। তোমার চিঠি আমার উকীল সাহেবের হাতে গিয়ে পড়েছে। আমার চিঠি খুলবে, তেমন অসভ্য সে নয়। তার নামে সোজা গেছে। অর্থাৎ তোমার চিঠি খুলে শুধু মিসেস শব্দটা ঠিকানা থেকে তুলে দিয়েছে। বিভ্রাট সোজা। তারপর, ঘটনা সব তোমার কাছে লিখছি।

কোর্ট থেকে উকীল ফিরল। বিকালে এসে চা খায়। দেখলাম মুখ থম্‌থম। চাকরের সামান্য ক্রটি দেখে কড়া চীৎকারে এক ধমক দিলে, যা তার অভ্যাস নয়। বুঝলাম, একটা কিছু হয়েছে এমন আশঙ্কার পূর্বাভাস অনেক সময় এম্মি আসে। অবিশ্যি আমি তার জন্যে বেশী মাথা ঘামাই নে। সন্ধ্যায় এক বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এসে নিজের কামরায় বই পড়ছিলাম। সামনে টেবিল-ল্যাম্প, হঠাৎ পায়ের আওয়াজ। অতি পরিচিত শব্দ। কাজেই পিছন ফিরে ভদ্রতা রক্ষা করলাম, “কি খবর?”

উকীল কোন জবাব দিলে না। সুটসুট এসে আমার সামনে তোমার লেখা চিঠিটা মেলে ধরলে, তখনকার অবস্থা তোমাকে আর না লেখাই ভাল। আমার চোখে আর কিছু দৃষ্টিশক্তি ছিল, সন্দেহের ব্যাপার। উভয় পক্ষ চূপ্‌চাপ। যেকোন দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। অবিশ্যি আশেপাশে ছেলেমেয়েরা আছে, কাজেই নাটক যাই হোক, গলার আওয়াজ খাটো থাকবে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। উভয় পক্ষ নীরব। কারো মুখ দেখছি না। জবাবের জন্য সবাই প্রস্তুত।

মুখ খুললে উকীল, “তোমার মন্তব্য কী?”

চট করে জবাব দিতে পারলাম না। আবার ওই প্রশ্ন। ভাবলাম, জবাব দিতে হয়। কিন্তু গলায় বাধতে লাগল। কি জবাব দেব? হ্যাঁ, আমার রাখা-ঢাকা কিছু নেই। তোমার পক্ষে আমার সাবেক কথা আছে, আমার চিঠির নানা প্রসঙ্গ-উল্লেখ। সুতরাং সাফায়ের সব পথ বন্ধ।

আবার প্রশ্ন, “তোমার মন্তব্য কী?” একদা ঝানু পাবলিক প্রসিকিউটরের সওয়াল অনুত্তরিত যাচ্ছে, আদালত হোলে ত ছাদ ভেঙে পড়ত।

আমি টেবিলের সমতলে আধবোঁজা চোখের দৃষ্টি ফেলে পাথর হওয়ার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। ফরিয়াদের মুখের দিকে চেয়ে দেখার তখন একটা উৎকট সখ চেপেছিল। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। আবার সেই প্রশ্ন, “তোমার মন্তব্য কী?”

আমি নীরব দেখে কর্তা মেঝেয় পায়চারী করলেন কয়েক মিনিট। বুঝলাম, মগজে গুল্লাছুট খেলা চলছে। আমি তখন মনে মনে কর্তব্য স্থির করছিলাম। শক্-থিরাপির কথা মনে হোলো। পাগল সারানোর একটা বিশেষ দাওয়াই। কিন্তু আমি নিজেই তড়িৎ-আহত। হাত নাড়তে পারছিলাম না। একবার আড়চোখে চেয়ে নিলাম। উকীলকে ত তুমি দেখেছ। লম্বা চওড়া সুগঠিত দেহ। বয়সের মাপে পাকা চুল একটু বেমানান। কিন্তু সেদিন চুল উস্কাখুস্কা, বেশ উদ্ভাস্ত ঠেকছিল, কখন চিঠি পেয়েছে কে জানে? কিন্তু এ্যাকশন যেন কত কালের। ওই অবস্থায় আবার এলো ঠিক আমার পেছনে। আমি টের পাচ্ছি। নিজে চোখ বুঁজে বসে আছি তখন। ডাঙা পেটা করবে না ত? বাপ চাচাদের আমলে নাক কেটে

নিত অসতী স্ত্রীর। তা-ই করবে? এমন অবস্থায় সভ্য-অসভ্যে ফারাক থাকে না। গুলি করে মারবে না ত? আমি ত ভয়ে কাঠ। তবু হুঁশ হারিয়ে ফেলিনি, অবস্থার মোকাবিলা ঠিক করতে পারব।

আবার প্রশ্ন, “তোমার মন্তব্য কী?”

আমি চুপ করে রইলাম। সে পেছনে খাড়া। আততায়ীর এমন অবস্থা আরো বেশী বিপজ্জনক। মুখোমুখি দেখতে পাওয়া যায়, কি ঘটছে বা ঘটবে। তখন অত ভয় থাকে না। এখানে তোমার চোখ থেকেও নেই।

আমি তখন ধীরে ধীরে টেবিলের ড্রয়ার খুলতে লাগলাম। একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতে হলো। কারণ, বেশ কিছু নীচে অন্য একটা খাতার মধ্যে রেখেছিলাম। একটু উপুড় হয়ে পড়েছি। এই সময় যদি ঘাড়ে এক লাথি মেরে দেয়। তাই হঠাৎ বাম হাত ঘাড়ের উপর রাখলাম। তোমাকে সব কথা খুঁটিয়ে লিখছি। তুমি সব জানো। নিজেই বিচার করতে পারবে।

এবার প্রশ্নের ধারা বদলে গেল। শুরু হলো স্বগতোক্তি, “এই বয়সে এই তোমার কাণ্ড। লজ্জা করল না? ছেলে-পুলে সমাজে মুখ দেখাবে কী করে? তোমার সেই সরম নেই। তাই ব’লে সবাই বে-আবু ন্যাংটা নয়। ... তোমাকে বিন্দু মাত্র আমি কোন দিন অবিশ্বাস করিনি। অথচ তুমি বিশ্বাসঘাতকতায় পাকা। আমি একটা ভোদাই। লোক আমাকে যা বলে বলুক। বৌ ত একটা চালুনি, তোমার অনেক ছিদ্র...”।

এই সময় আমার গোস্বা উঠে গিয়েছিল। আমি একটা পত্র হাতে চট করে ঘুরে, অবিশ্যি চেয়ারে বসে বসেই, চীৎকার দিয়ে উঠলাম, “ছোট লোকের মত মুখ ছুটিয়া না।”

“আরে আমার ভদ্রলোকের ভদ্র স্ত্রী, সস্তা মহিলা—,” অপর পক্ষ পাল্টা দিয়ে উঠেছে।

“গলা বাড়িও না। ছেলেরা ঘুরে আছে।” উকীল তখন ব্যঙ্গস্বরে খেঁকিয়ে উঠল “সরম লাগে, বিবি সাব? সরম। কাঁপড় তুলতে সরম ছিল কোথায়?”

একদম পেরেকের মাথায় হাতুড়ির পেটা পড়েছে। আমি নিমেষের জন্য থ’ বনে গিয়েছিলাম। কিন্তু মরদ বাপে আমাকেও জন্ম দিয়েছিল। আমি তিড়িং লাফে চেয়ার থেকে উঠে তার মুখোমুখি দাঁড়লাম। দুইজনের চোখে আগুন সমান। উকীল ঠোট কামড়ালো গোস্বা বুথতে। তখন আমি হামলা শুরু করলাম।

আবার টেবিলের দিকে ফিরে উকীলের উপপত্নীকে লেখা চিঠিটা মেলে ধরে গলায় যথারীতি ঝাল মাখিয়ে বললাম, “এই চিঠি কার? কোন সত্য পুরুষের?”

জোকের মুখে লবণ পড়ল। কিন্তু তখনই সর্প দেহ ধরে তা এগিয়ে এসে টেবিলের উপর হুমুড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর নিজের মাছি-বসা লেজে যেমন কামড় দিতে যায় কুকুর, ঠিক সেই মত ভংগীতে মোচড় মেরে উকীল হাঁকলে, “এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?”

“আমার চিঠি তুমি কোথায় পেলে?” পাল্টা দিতে আমার দেবী হয় না।

“আমি আমি...,” উকীল হোচট খায়।

আমি কোপ মারলাম, “জী— জী— জী—।”

গলায় লঙ্কা ঢোকানো ছিল বলা বাহুল্য। তারপর মঞ্চ খালি হোতে থাকে।

আমার চোর আততায়ীর মত এই আততায়ীও দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তার

গমন-পথে আমার চোখ জ্বলতে থাকে। কুমীরের চোখে বুলেট বেঁধার তৃপ্তি তখন আমার শিকারী মুখে।

ভাবলাম, নাটকের আরো অঙ্ক আছে যবনিকা-পাতের আগে। কিন্তু সেদিন রাত্রেই নাটক ফুরিয়ে গেল। গর্ভাঙ্কের ছায়াও দেখা গেল না।

পেছন থেকে আমার ঘাড়ের হাত রেখে, উকীল এসে বললে, Forgive and forget, ক্ষমা করো, ভুলে যাও। ইংরেজী বাংলা এক সঙ্গে।

থাপে ঢুকে গেলাম। তলওয়ারের খিলিক বাইরে কেউ দেখার আর থাকলো না, —থাকবে না—

তাই ত তোমাকে পত্র।.....
..... তুমি নিজেই বিচার করো। লেবু আরো নিঙড়ালে আরো তেতো বেরুবে। বয়সের দোহাই তোমাকে আর দেব না। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকার একটা আনন্দ আছে। কিন্তু বিততি বা টেনশন সব সময় মন বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষেমময় কেউ বলবে না। আর নিভৃতি একবার চুরমার হয়ে গেল, ভাঙার রনন কী দিয়ে ঢাকবে? আমি অনেক ভেবেছি। নতুন করে জীবন গড়া যায়, তার জন্য উদ্যম প্রয়োজন। আমি সত্যি ক্লান্ত। তুমি অনুপ্রাণিত ব্যক্তি, তোমার কথা আলাদা। পুরাতন সংসারই আমার স্বর্গ এখন থেকে।

আমি জানি, তোমার কষ্ট হবে। আমার জন্যে কারো শিরঃ পীড়া থাকবে, এই অসোয়াস্তি খুব সুখের নয়। তুমি সংসারে একদা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের পর যেমন সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছিলে তা-ই আবার খুঁজে পাবো, খুঁজে নাও, আরো গভীর ভাবে। আমার শুভেচ্ছা রইল।

বাইরের জীবন আমি এবার একদম গুটিয়ে ফেলব। তোমার কাছে আমার শেষ পত্র।

ইতি—

আর কোব্রা নয়

মাঝারি গোছের হোটেল কাবেরী। সামান্য অজায়গা গলি ঘুঁজি পার হয়েছে ঢুকতে হয়, তাই অভিজাত্যহীন। নচেৎ আরামের উপাদান কম নেই এই হোটеле। আর অঙ্গে 'বার' থাকায় রসিক জন ডুব দিতে আসে। তারা গলির কথা ভাবে না। ডাইনিং রুম আজ বেশ সজ্জিত। বেলুন, রঙীন কাগজের শিকল, কিছু রঙীন বাল্বের সংযোগ ঘটেছে। ফলে, অন্যান্য দিনের তুলনায় হোটেলের যা রং খুলেছে, কোন খরিদ্দার নাক সিটকাতো পারবে না।

মাঝখানে একটা বড় টেবিল রক্ষিত। সাধারণতঃ কোন অর্ডার এলে তখন এই ব্যবস্থা হয়। আজ দেখা গেল, দশ বারো জনের উপযোগী প্লেট ইত্যাদি আগে থেকেই রাখা। ফুলদানি দুটি থেকে মাধবী ও বিভিন্ন ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছিল।

ধীরে ধীরে আরো খানাপিনার সরঞ্জামে টেবিল পূর্ণ হোতে থাকে। বিরিয়ানীর ডিশ এখনও রাখা হয়নি। কিন্তু টিকিয়া, চাটনী মজুদ। পাছে ঠাণ্ডা হোয়ে যায়, তাই কোর্মা, রেজালার ডিশ দেখা যাচ্ছে না। এই হোটেল মোটামুটি খুব জনবহুল নয়। আজও তথৈবচ। তবে খরিদ্দার লেগেই থাকে। আসছে, কেউ যাচ্ছে।

ম্যানেজারকে দেখা গেল খুব শশব্যস্ত। সে সহকর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছে নানা রকম। এই টেবিলের উপর তার কড়া নজর। এক দিকে টেবিল ক্রুথের নীচে একটু সামান্য ভাঁজ ছিল, তা সে নিজেই পরিপাটি করে দিলে। রেকর্ডে এতক্ষণ গান বাজছিল না। ম্যানেজার ভাল ভাল গজল দিতে বললে। যদি গ্রাহকরা প্রার্থনা করে, কাওয়ালী চলতে পারে। সুতরাং কিছু রেকর্ড যেন আগে থেকে মজুদ রাখা হয়। নির্দেশের পর নির্দেশ চলে। কিছু ভাল ভাল দামী গ্রাস পর্যন্ত এসে পৌঁছল। বয়-বৃন্দ অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ একদম টাটকা ধোয়া লেবাসে আচ্ছন্ন।

মেহমান মেজবান, অতিথি বা অতিথি-সৎকারকদের তখনও দেখা নেই। নেপথ্যে এন্তেজামে কিন্তু পাক্কা হচ্ছে।

ঠিক সওয়া আটটার সময় গফুর এসে পৌঁছল। আজ তার পরনে সুট। টাই সমন্বিত। মাথায় সাদা কারাকুলী টুপি। তার সঙ্গিদের দু'একজন পরেছে পাংলুন। অন্যান্যেরা পাজামা পাঞ্জাবি। ধোপ-দুরন্ত বদন সকলের।

গফুর হোটেলে ঢোকামাত্র ম্যানেজার তার কাছে ছুটে গেল। হাত কচলানি সহ অনুরোধ করলে, “গফুর সাহেব, আপনি এন্তেজাম দেখে যান।”

দু'জনে এগিয়ে এলো টেবিলের ধারে। গফুরের হাতের একটা দামী পাথরের আংটি থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। সে ঘুরে ঘুরে দেখে শোনে বললে “বিলাতী বিয়ার পেয়েছেন ত?”

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে বাক্যি খসিয়ে যেন যন্ত্রণামুক্ত হোতে চায়। উচ্চারণ করে, “আপনার কথা আমি ভুলিনি। জানি দেশী জিনিস আপনার কাছে কচুর লতি, খামাখা মুখ কুটোবে। আমি পাঁচ কেস মজুদ রেখেছি।”

“বহুৎ আচ্ছা।” স্নেহের থাপ্পড় গিয়ে পড়ল ম্যানেজারের পিঠে।

সে আরো তুরিয়ানন্দে মুখ খোলে, “শুধু তা-ই? স্যার, ফ্রেঞ্চ ওয়াইন আছে পাঁচ পদ। আর—।”

কথাটা গফুরের ঠোটে সংক্রমিত, “আর—।”

“আরো গোটা স্কটল্যান্ড তখন আমার ষ্টকে। যা চান। মায় ‘ক্চ এল্’ অর্থাৎ ‘গোরা তাড়ি’ পর্যন্ত আছে।”

“আপনি সত্যি কাজের লোক। আমাকে গেটে যেতে হয় আমার মেহমানেরা এবার এসে পড়ে আর কি। আটটা পঁচিশ।” গফুর শাটের আস্তিনের তলায় ঢাকা তার সোনালি রঙের ব্যান্ড বাঁধা সোনালি ঘড়ির দিকে চাইলে। কুর্গিশের ভঙ্গীতে রাস্তা ছেড়ে দিলে ম্যানেজার।

সময়-জ্ঞান হোয়েছে এদেশে, না বলে উপায় নেই ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটা কালু, সদু, আফজল, চাবী খাঁ ও আরো দুজন এসে উপস্থিত।

অভ্যর্থনা করলে গফুর, “আসুন ভাই আসুন।” করমর্দন চলে বেশ তিন চার মিনিট।

আজ কালু পরেছে পিরহান পাজামা, মাথায় সাদা টুপি। তার গৌফটি বেশ পরিপাটি করে ছাঁটা। বোঝা গেল কালুও মঞ্চ-সচেতন। সদু তার নাটা শরীরে পাংলুন চড়িয়েছে। আর সকলে পাজামা পাঞ্জাবী।

গফুর ত ঢলে পড়েছে, এমনই বিনয়-গদগদ। সামনে প্রসারিত করতালু অভ্যর্থনার দিকশূল বানিয়ে সে কাল্লুকে টেবিলে পর্য্যন্ত এগিয়ে দিল। সদু আফজলের কানে কানে ফিসফিস করলে, “আচ্ছা শরিফ লোক।” এই সব হোটেলের সদুর একটু বেশী পালা পড়ে, কারণ সে মাষ্টারের লোক। অপরে কক্ষে পায় বছরে একবার দুবার। তাদের এই পরিবেশ ধাতস্থ হোতে কিছু সময় যায়। কিন্তু আফজল চালাক মানুষ। সে হচ্চকিয়ে যায় না চাবী খাঁর মত।

পাশাপাশি বসল গফুর এবং কাল্লু। আর সকলে যে যার জায়গায়। ম্যানেজার গফুরের কানে কানে এই সময় ফিসফিস কি যেন বললে। গফুরের হাত-নাড়া দেখে বোঝা গেল, তার সম্মতি আছে।

এবার দুই বয় এলো একটা ট্রের মধ্যে দু'বোতল শরাব সাজিয়ে। এক কোণে রাখলে। টেবিলের কোণে নয়, দেওয়ালের পাশে রক্ষিত একটা ছোট টেবিলের উপর। সেখান থেকেই পরিবেশন চলবে।

এই সময় গফুর জিজ্ঞেস করে, “কাল্লু ভাই, আপনার পানি না বরফ?”

“পানি দিয়ে খায় তরল লোক। আমি কড়া মানুষ, আমার বরফ লাগে।” হাসতে হাসতে জবাব দিলে কাল্লু।

তখন গফুর হাঁকে, “বয়, বরফ লাও।”

“জী” রবে ছুটে এলো ম্যানেজার, এতক্ষণ সে ক্যাউন্টারে হিসাব না কি দেখছিল।

গফুর বললে, “আপনাকে না। ভাই সাহেবের বরফ এস্তেমাল। বরফ আছে ত?”

ম্যানেজার একটু মাথা ঝুঁকিয়ে জবাব দিলে, “স্যার, আপনি যদি হুকুম দেন, গোটা হিমালয় আপনার পায়ের তলায় রেখে দিই।”

হেসে গফুর উত্তর দিলে, “অত দুরকার নেই। সামান্য বরফের বন্দোবস্ত করো।”

ম্যানেজার চলে যেতে গফুর আবার কাল্লুকে সম্বোধন করে, “ভাইসাব, ম্যানেজার বেশ কাবেল। তবে বাড়িয়ে বলা ওর এক মুদ্রাদোষ।”

কাল্লু কিন্তু বললে, “আমি বীয়ার কম খাই। হুইস্কি দিয়ে শুরু করব না আজ। ওদের সঙ্গে একটু বীয়ার খাওয়া যাক।” কাল্লুর সঙ্গীদের দিকে তর্জনী বাড়ায়। অবিশ্যি কথাটা সে বলে খুব মৃদু কণ্ঠে।

ম্যানেজার আবার গফুরের কাছে এসে বলে, “স্যার, আমাকে এই হোটেলের মালিক মনে করবেন না। মনে করবেন, আপনার নফর। যখন যা' দরকার আমাকে ডাক দেবেন।”

“আচ্ছা, আচ্ছা”, বিব্রত গফুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ম্যানেজার চলে গেলে আবার কাল্লুর প্রতি সম্বোধন, “ভাইসাব, কিছু মনে করবেন না। এই ম্যানেজার আরো বহুবার আসবে। ওই এক দোষ বাড়িয়ে বলা। অথচ কাবেল আদমী। এম.এ. পাশ। এই হোটেল ওর জন্যে দাঁড়িয়ে গেল।”

খানা পরে।

তার আগে পিনা শুরু হলো।

ডাচ্ বিয়ারের খোশবুরতে ভরে উঠল টেবিল। এই গন্ধের জন্য নাকের ট্রেনিং লাগে। কাল্লু সামান্য বাহাদুরি নিতে এক টোকে এক গ্লাস পার করে দিলে। সেদিক থেকে গফুর

মিতাচারী। সে ছোট চুমুক মারলে মাত্র।

দুই রাউন্ড গ্লাস পূর্ণ হোতে মুখ একটু একটু খুলতে লাগল। এই সময় কালু জিজ্ঞেস করে, “আপনার কোন লোকের সঙ্গে আমার লোকের মারামারি হয়? ওই যে উকীলের কামরায়।”

“মল্লিক”, ডেকে উঠল গফুর। গ্লাসে মুখ ডুবিয়ে ছিল এক ব্যক্তি। সে এই শব্দে চমকে উঠল, চুমুক ভুলে গিয়ে গফুরের দিকে তাকায়।

আত্মহানকারী তখন বলে, “ভাই সাহেব তোমাকে দেখতে চায়।” লোকটা বিস্মৃত চোখ।

তখন কালু বলে, “ভাই মল্লিক, তুমি ওই (অঙ্গুলি-নির্দেশ) মাজেদের পাশে গিয়ে বসো। দ্যাখো ত চিনতে পারো না কি?”

পুরাতন কথা উঠতে টেবিলে হাসির মৃদু হররা বয়ে গেল।

মল্লিক মাজেদ পাশাপাশি বসে। একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপর তারা যে ভাবে বীয়ার টানতে লাগল, দেখার মত। দু’জনেই শক্তিদর। পাংলা কাপড় অনেক ভাঁজে ভাঁজে রাখলে তখন শক্ত হয়। ওরা বীয়ারের তরলকে সেই ভাবে রাখতে লাগল।

ঘণ্টা দুই গেল পিনার পর্য্যায়। টেবিল গরম হোয়ে উঠেছে। কেউ তেমন উচ্চ-রব নয়। কিন্তু কথা চলছে নানা পর্য্যয়ে। হাম্পেয়ালা ইয়ারী আবহাওয়া কোন ফাঁক অন্ততঃ আর নেই।

সাড়ে দশটার সময় গফুর হাঁকলে, “খানা লাগাও।”

অবিশ্যি কাজু-বাদাম, পঁপের ভাজা, আলুটীপ, বেশ এক প্রস্থ উদরস্থ হোয়ে গেছে। এত জলদি খানা না দিলেও চলত। কিন্তু খেতে ত হবে। আর আসল কথা তখনও বাকী।

ম্যানেজার ছুটে এলো এবং বলল, “কথা শোনা আর তামিলের মধ্যে আমি কোন ফারাক দেখি না।”

“বেশ। এখন খাবার দিন্।” মৃদু হাসলে গফুর।

বিরিয়ানীর ডিশ থেকে ভাপ আর গন্ধ সমান তালে বেরোয়। গফুর বিসমিল্লা করতে অনুরোধ জানায়, হৃদ্যতার সৌরভ সঙ্গে এসে মেশে। চাট্‌নী ছিল সাত পদ। কিন্তু সবাই লুক্‌মা তুলেছে কি তুলেনি এমন সময় আর এক ডিশ এলো। তখন গফুর উঠে দাঁড়ায়। নিজের হাতে সেই ডিশ টেবিলের উপর রাখলে, বয়-কে আর এগোতে দিলে না। সামনে দুটো টার্কি রোস্ট।

গফুর বসে পড়ে কালুকে সম্বোধন করে, “ভাই সাহেব, শুধু আপনার জন্যে।”

কালু ভাবে এত কী খাওয়া যায়। সে মুখ খুলতে গেল, গফুরের কথায় অন্যেরা অপরাধ নিতে পারে, ভাই বোধ হয় কথা চাপা দিতে চায় কালু। কিন্তু গফুর তাকে এগোতে দিলে না।

মৃদু হেসে বললে, “ভাই সাহেব আমরা সবাই খেয়ে দেখব, কেমন হোয়েছে। কিন্তু এই টার্কি মুগী আমাদের দেশে ত হর-হামেশা পাওয়া যায় না। আপনার সম্মানে এই দুটো টার্কি যোগাড় করেছি। আমার বেশ ঝঞ্ঝাট গেছে এই সামান্য মুগীর জন্যে।”

কালু গফুরের দিকে তাকিয়ে বড় আপ্যায়িত বোধ করে। কি কথা বলবে তার বিনিময়ে,

নিজে ঠিক করতে পারে না। এই ইতস্ততের পর বলে, “এত ঝামেলা করেছেন কেন?”
“ঝামেলা কী? আপনার জন্যে এ ত সামান্য কিছু। টার্কি শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।”
“পেলেন কোথায়?” কালু জিজ্ঞেস করে।

“ভাইসাব, সে-এক ইতিহাস। শেষে খোঁজ পেলাম আমার এক আমেরিকান বন্ধুর বাড়িতে আছে। মুগী পোষার সখ খুব তার, জানি। কিন্তু টার্কি,” গড়গড় মুখ থেকে কথা বের করতে গিয়ে একটু হোচট খায় গফুর এবং আবার খেই পাকড়ে বলে, “একটা কী আপনার সামনে ধরা যায়? যাক, ভদ্রলোক বটে মার্কিনগুলো। দুটোই দিয়ে দিলে।”

খাওয়া কিন্তু দ্রুত চলে। গফুর অবিশ্যি কালুর দিকে বিশেষ নজর। নিজের হাতে রোস্ট কেটে ছিঁড়ে তুলে দিতে লাগল। আর কয়েক মিনিট পরপর, “ভাই সাব, এই আর থোড়া পোলাও, আর একটা থোড়া টিকিয়া কাবাব, একটু চাটনী...”, ইত্যাদি শোনা যায়।

শরাবের মৌতাতে আহার একটু বেশী হয়। সদু এখানে চ্যাম্পিয়ন। সে নাকি শুধু তিরিশটা টিকিয়া কাবাব উদরস্থ করেছে। অনুপাত অন্যান্য দিকেও সমান। চাবী খাঁর মাঝে মাঝে পেট ব্যথা করে। সে আজ অসুখের কথা ভুলে গিয়েছিল। কালু আজ খেতে পারে নি বেশী। প্রথমতঃ আতিথেয়তার ধাক্কা আর দ্বিতীয়তঃ পিনার দিকে সে বেশী দৃষ্টি দিয়েছিল।

সিগারেটের ধোঁয়ায় টকটকে লাল কাগজের জিঞ্জিরগুলো পর্যন্ত গোলাপি দেখায়। যথারীতি দেশী রেওয়াজ অনুযায়ী পঁচিশ মিনিটে আহার খতম। যেন ভাগাড়ে একটা গরু আর হাজার শকুন। সুতরাং যত শিগগীর পারো পেটে ঢোকাও। দেশের বাইরে ত নয় হোটেল কাবেরী। মেহমান মেজবান সবাই দেশী লোক। সুতরাং পাট ষট্‌বট চুকে গেল।

বয়েরা টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল। সবাই ছাদের দিকে চেয়ে সিগারেট ধরায়। ভরা পেট উর্ধ লোকে নিয়ে যায়। বক্ষ্য যদিও উর্ধগতি, অধগতি দুই হাতে পারে।

গফুর স্তব্ধতা ভাঙলে, ভাই সাহেব, এবার কি খাবেন? কফি না আর এক দফা হুইস্কি?”

“রাতের খাওয়ার পর আমি আর ড্রিঙ্ক করি না,” কালু জবাব দিলে। জায়গা-মাফিক কথা বলা সে বহু আগেই রপ্ত করেছে। ইংরেজি শব্দটা নতুন নয় তার কাছে।

সদু কিন্তু মাষ্টরের মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হোলো। আরো এক দফা সাঁতার কাটতে পেলেন ক্ষতি কি ছিল?

গফুর এবার বলে, “ভাই সাহেব এবার আমাদের কথা শুন করতে হয়।”

“নিশ্চয়।” মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে জবাব দিলে কালু।

“ভাইসব, আমরা এখানে সবাই হাজির হয়েছি বিশেষ কাজে। আপনারা সবাই মন দিয়ে শুনবেন।”

সকলে উৎকর্ষ। কেবল চাবী খাঁ চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে রইল। তার ঘুম এসে গেছে। কিন্তু নাক ডাকছে না। মাজেদ তার পাজরায় একটা আঙুলের খোঁচা দিলে। সে চমকে চোখ খুললে। কিন্তু বুঁজতে বিলম্ব করলে না।

গফুর এবার কিন্তু টাই-পিনের উপর হাত রেখে অধৈর্য্য গলায় বললে, ‘ভাইসাহেব’ আমাদের আসল কথা শেষ করে নিতে হয়।”

কালু তার দিকে ঈষৎ মুখ ঘুরিয়ে ফিসফিস জবাব দিলে, “এখানে কথা বলব? আরো খরিদদার আছে—।”

তখন গফুর জোরে হেসে উঠল। বেশ হাসলে সে। তারপর ধেমে মুখ খুললে, “ভাই সাহেব, আপনি চীৎকার করে কথা বলুন।”

“কাছে যদি পুলিশ থাকে।”

“কিছু ঘাবড়াবেন না। এ আমাদের এলাকা। জজ থাকলেও ভয় নেই। যা খুশী বলুন। খরিদদার দেখছেন। থাক না ওখানে পুলিশ কি আর কেউ। সবাই এই বান্দাকে জানে।”

তর্জনী যোগে নিজের বুকের প্রতি ইশারা জানায় গফুর।

কালু তখন শুরু করলে, “আমাদের সমস্যা খুব সহজ। তার ফয়সালা আরো সহজ।”

“আপনি অভিজ্ঞ মুরুব্বী। আপনিই সব বলুন।”

“না, না, গফুর ভাই। আমার ভুল হতে পারে। আমি জাহেল লোক, বুঝি কি?”

“না, আপনিই বলুন।” কালু আর বসে থাকে না। সে উৎসাহিত, দাড়িয়ে উচ্চারণ করে, “গত দুবছর থেকে দেখছি, যেখানে কিছু দাঁউ আছে অর্থাৎ নাফা বেশী হবে, সেখানে হাত দিলেই হাতে ছোবল পেতে হয়। ভাই না?”

মাথা নাড়লে অন্যান্যেরা, কেবল সরল সায় দিলে গফুর “ভাইসাব, সাথে কি আপনাকে মুরুব্বি বলছি। আমার মনের কথা টেনে বলেছেন।” উত্তেজনার চোটে গফুরও খাড়া হোয়ে যায়।

কালু বলতে থাকে, “ছোবলের চোটে জান যায়। বুজিরোজগার আল্লার মেহেরবানী। আল্লার এই মেহেরবানী থেকে খরিজ হোলো আর দুনিয়ায় বাঁচা যায় না।”

“নিশ্চয় নিশ্চয়, আলবৎ খাঁটি কথা, কথার এক কথা” ইত্যাদি ধূয়া উঠল।

কালুর নিজের কথায় মোতায়েন। তখন বড় হয়রান পেরেমান হোলাম। এতদিনে বুঝতে পারলাম। যেখানে আমরা হাত দিই সেখানে আরো আরো কেউ হাত রাখে। হয়ত না জেনেই রাখে।”

“সকলের মনের কথা টেনে বলছেন, বাহবা বাহবা,” গফুর চীৎকার দিয়ে উঠল।

“এখন বোঝা যায়, সেখানে এক হাত আমার, আর এক হাত আমার সহোদর ভায়ের।”

“আহ, কি কথা। মধু, মধু!”

কালু সামান্য থামে। সকলের দিকে তাকিয়ে নেয়। তখন কথা গুছিয়ে বলার আরো প্রেরণা পায় সে, “সুতরাং কাইজ্যা ভায়ে ভায়ে। এক ভায়ের নাম গফুর, আর এক ভাই, যার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে।”

অনেকে টেবিল থাপড়ে তারিফ প্রকাশ করে। বেশ একটু শব্দ ওঠে।

গফুর কালুর হাত টেনে নেয় নিজের করতালুর মধ্যে এবং বলতে থাকে মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত শ্রোতাদের সামনে তুলে, “এই সেই দুই হাত।”

আবার হাত-তালি এবং টেবিল-তব্লার বোল ওঠে।

কালু আর হাত সরায় না, বলতে থাকে, “এই সমস্যার ফয়সালা আগেই বলেছি খুব সোজা। আমার ভাই বাতিয়ে দেবে।”

“না, বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের মুখ খোলা নিষেধ।” গফুর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ

করলে।

“তবে শুনুন,” গফুরের করতালু আরো শক্ত করে ধরার পর কাল্লু সরব হয়, “আমি জাহেল আদমী। ঠিক হয়ত বলতে পারব না, গোনা খাতা (অপরাধ) মাফ করবেন। আমি বলব, ভায়ে ভায়ে বিবাদ মানে বরবাদ।”

আবার হাত-তালি।

“হ্যাঁ, এই বিবাদ মানে বরবাদ। তা হওয়া উচিত নয়। আমরা বহু বরবাদ হোয়েছি। আর না। আমি বলব, আসুন আমরা শহরটা ভাগ করে নিই। পূর্ব দিক যদি আপনারা নেন, আমরা পশ্চিম দিক নেব। আর আপনারা পশ্চিম দিক নিলে আমরা পূর্বদিক। এই ভাবে শহর ভাগ হোলেই সব গণ্ডগোল চুকে যায়। তখন ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের হাত ঠেকবে মহৎ, ভালবাসায়। এক জনের মুখের ভাত কেড়ে নিতে নয়।”

টেবিল বেজে ওঠে।

কাল্লু কারো দিকে না চেয়ে উর্ধ্বনেত্র প্রেরণাদীপ্ত কণ্ঠ বিস্তার করে, “সুতরাং, হ্যাঁ আমি জোর দিয়ে বলব, শহর ভাগ হোক। খোলা কথা, তোমরা একদিকে চুরি করো, আর আমরা এক দিকে চুরি করি। ফ্যাসাদ থাকবে না।”

গফুর যেন লাফিয়ে ওঠে। তারপর কাল্লুকে বুকে টেনে নেয় গভীর আলিঙ্গনে বাঁধতে।

কাল্লু ঈষৎ বিব্রত বোধ করে এবং বলে, “এবার গরীবের কথাটা আপনারা ভেবে দেখুন। আমার কথা শেষ কথা মনে করবেন না।”

গফুর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় সম্বোধন করে, “আর কোন কথা নেই। আপনি কোন কথা বলেছেন।” উপস্থিত শ্রোতাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে আবার শুধায়, “তোমরা কি বলো?”

“শেষ কথা, চমৎকার ফয়সালা।”

উভয় ভ্রাতা এবার আলিঙ্গন মজ্জা

গফুর বললে, “ভাইসাব, আজ্ঞা সব কথা শেষ করুন। এখন সীমানা ঠিক হোক।”

কাল্লু জিজ্ঞাসুনেত্র, শুধায় “আমি বলব?”

“নিশ্চয়।”

“না, আপনি বলুন।”

“না, না।”

“আপনাকেই বলতে হবে। বড় ভাই থাকতে ছোট ভাই মুখ খোলে না।”

“তবে গরীবের কথা, শুনুন।”

“না, শুনব না। গরীবের কথা শুনব না। আমার মিয়া ভাইয়ের কথা শুনব।” গফুরের কণ্ঠস্বর।

কাল্লু ঈষৎ হাসে। গফুরের আন্তরিকতা তাকে স্পর্শ করেছে। সে বলে, “বেশ। আমি বলছি, কলন্দর পট্টির সোজাসুজি যে রাস্তা গেছে একদম রেল-লাইন পার হোয়ে, ওই সেখানে ভাঙা মন্দিরটা পড়ে আছে, চেনো ত?”

“চিনি, চিনি। কইয়া যান।” সম্মিলিত রব।

“ওই রাস্তাটা, একটু বেকেছে পূর্ব দিকে, সেখানে কি বলে— হ্যাঁ, হাওয়া বাজার— এই হাওয়া বাজার ছাড়িয়ে নদীর ধার পর্য্যন্ত সীমানা রেখা মনে রাখেন, আপনাদের

সীমানা। ওদিকে মন্দির আর এদিকে একটা মসজিদ আছে পুরাতন। তার পূর্বদিক আমাদের, আর পশ্চিম আপনাদের।

“কিয়া বাৎ, কিয়া বাৎ রবে” চীৎকার দিয়ে উঠল গফুর। সে আজানিতে বসে পড়েছিল। আবার দাঁড়ায়। মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্শিভঙ্গী বলে, “আমরা বড় ভায়ের এই আদেশ মেনে নিলাম।”

“বহুৎ খুব, বহুৎ খুব” রব হোটেলময় ধ্বনিত হয়।

অনেক রাত্রে এই আসর ভাঙল।

বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় অস্থির আনিলা রাত্রি।

কাল্লুকে তার জীপে যেতে দিলে না গফুর। সদু ওই গাড়ী চালিয়ে যাক আর সকলকে নিয়ে।

গফুরের লাল ‘বুইক’ গাড়ী অপেক্ষা করছিল হোটেলের সামনে।

দরজা খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে সে বললে, “আসুন, ভাই সাব। আজ আমি আপনাকে পৌছে দেব। আমি আপনার ড্রাইভার আজ থেকে। আমাকে শুধু মনে রাখবেন।”

“চলো।” গফুরের পিঠে হাত রেখে স্নেহান্বিত কণ্ঠে জবাব দিলে কাল্লু।

আফজল আজ বেদম শরাব পান করেছিল। মাজেদ তাকে ধীরে ধীরে জীপে তোলে। নেশার ঝোঁকেই সে হেঁকে উঠল। “সোব্‌হান আল্লা, সোব্‌হান আল্লা।”

মসজিদ আমাদের— সীমানা। সীমানা ঠিক থাকলে আর ঠোকাঠুকি লাগবে না।

শওকত ওসমান

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ২ জানুয়ারি, ১৯১৭। পাড়া : মেহেদী মহল্লা। গ্রাম : সবলসিংহপুর। থানা : খানাকুল। মহকুমা : আরামবাগ। জেলা : হুগলী। রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ। রাষ্ট্র : ভারতবর্ষ।

পিতা ২ শেখ মহম্মদ এহিয়া। মাতা : গুলেজান বেগম।

শওকত ওসমান সাহিত্য ক্ষেত্রের ছদ্মনাম। আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান।

শিক্ষা ২ প্রথমে মন্ডব, সবলসিংহপুর জুনিয়ার মাদ্রাসা এবং পরে ১৯২৯-এ কলকাতা মাদ্রাসা-এ আলিয়ায় ভর্তি হন সপ্তম শ্রেণীতে। নবম শ্রেণীতে এ্যাংলো-পার্সিয়ান শাখায় স্থানান্তর। ১৯৩৩-এ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৩৪-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি এবং ১৯৩৬ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ.পাস। ভর্তি হন অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স ক্লাসে। ১৯৩৯ সালে বি.এ.পাস। ১৯৪১-এ দ্বিতীয় শ্রেণীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ.।

পেশা ২ ১৯৪১-এ কলকাতায় গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজে প্রভাষকের পদে যোগদান। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের সময় অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের মত করেই পূর্ববঙ্গে অপশন দিয়ে চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজে যোগদান। ১৯৫৯ সালে ঢাকা কলেজে বদলি হন। ১৯৭০ সনে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৭২ সালে ১লা এপ্রিল চাকরি শেষ হবার আগেই অবসর নেন, যাতে পূর্ণকালীন সাহিত্য-চর্চা করতে পারেন। চট্টগ্রামে বসবাস করতেন ৩৪ বি চন্দনপুরায় এবং ঢাকায় নিজ বাসগৃহে ৭ এ মোমেনবাগ, ঢাকা ১২১৭ ঠিকানায়।

পরিবার ২ পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামের জনাব শেখ কওসর আলী ও গোলাপজান বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা সালেহা খাতুনেন সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন ১৯৩৮ সালের ৬ই মে। জ্যেষ্ঠপুত্র বুলবন ওসমান, দ্বিতীয় পুত্র আসফাক ওসমান, তৃতীয় পুত্র ইয়াফেস ওসমান, চতুর্থ পুত্র মরহুম তুরহান ওসমান, কন্যা আনফিসা আসগার, কনিষ্ঠ পুত্র জাঁ-নেসার ওসমান, সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা মরহুমা শারমিন ওসমান।

বিদেশ ভ্রমণ ২ পাকিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক, ইরান, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স।

পুরস্কার ২ ১৯৬২ সালে আদমজী, ১৯৬৬ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭ প্রেসিডেন্টের প্রাইড অব পারফরমেন্স পদক, ১৯৮৩ একুশে পদক, ১৯৮৬ নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক, ১৯৮৮ মুক্তদ্বারা পুরস্কার, ১৯৯৬ মাহবুব উল্লাহ ফাউন্ডেশন পদক, ১৯৮৯ ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯১ টেনাশিস পুরস্কার এবং ১৯৯৭ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার।

মৃত্যু : সকাল ৭.৪০ মিনিট, ১৪ই মে ১৯৯৮, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা।

সাহিত্য-কর্ম

উপন্যাস ॥ বনি আদম ১৯৪৬, জননী ১৯৫৮, ক্রীতদাসের হাসি ১৯৬২, চৌরসন্ধি ১৯৬৬, সমাগম ১৯৬৮, রাজা উপাখ্যান ১৯৭০, জাহান্নম হইতে বিদায় ১৯৭১, দুই সৈনিক ১৯৭৩, নেকড়ে অরণ্য ১৯৭৩, জলাংগী ১৯৭৪, রাজসাক্ষী ১৯৮৩, পতঙ্গ পিঞ্জর ১৯৮৩, আর্তনাদ ১৯৮৫, পিতৃপুরুষের কথা ১৯৮৬, নষ্টতান অষ্টভান ১৯৮৬, রাজ পুরুষ ১৯৯২।

ছোট গল্প ॥ পিঁজরাপোল ১৯৫০, জুনা আপা ও অন্যান্য গল্প ১৯৫২, সাবেক কাহিনী ১৯৫৩, প্রস্তর ফলক ১৯৬৪, উভশৃঙ্গ ১৯৬৮, তিন মীর্জা ১৯৮৬, মনিব ও তাহার কুকুর ১৯৮৬, পুরাতন খঞ্জর ১৯৮৭, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯৯০, হস্তান্তর ১৯৯১।

কাব্যগ্রন্থ ॥ নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত ১৯৮২, শেখের সম্বর ১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৯২।

নাটক ॥ তস্কর লস্কর ১৯৪৪, বগদাদের কবি ১৯৫০, আমলার মামলা ১৯৫২, কাঁকরমনি ১৯৫২, জন্ম-জন্মান্তর ১৯৬০, এতিমখানা ১৯৬৪, তিনটি ছোট নাটক ১৯৮৯।

শিশু সাহিত্য ॥ ওটেন সাহেবের বাংলা ১৯৪৪, তারা দুইজন ১৯৫৪, মসকুইটোফোন ১৯৫৭, ডিগবাজী ১৯৬৪, প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প ১৯৬৯, ক্ষুদ্রে স্যুয়ালিস্ট ১৯৭৩, ছোটদের নানা গল্প ১৯৮২, ছোটদের কথা রচনার কথা ১৯৮৩, পঞ্চসঙ্গী ১৯৮৭।

প্রবন্ধ ॥ সমুদ্র নদী সমর্পিত ১৯৭৩, ভাব-ভাষা-ভাবনা ১৯৭৪, ইতিহাসে বিস্তারিত ১৯৮৫, সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই ১৯৮৬, মুসলমান মানসের রূপান্তর ১৯৮৬, পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা ১৯৯০, উপদেশ-কুপদেশ ১৯৯১।

আত্ম-জীবনীমূলক রচনা ॥ স্বজন স্বথাম ১৯৮৬, কালরাত্রি খণ্ডচিত্র ১৯৮৬, মন্তব্য মৃগয়া ১৯৯০, অনেক কথন ১৯৯১, ওডবাই জাস্টিস মাসুদ ১৯৯৩, স্মৃতিখণ্ড : মুজিবনগর ১৯৯৩, উত্তরপর্ব : মুজিবনগর ১৯৯৪, অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ ১৯৯৪, সোদরের খোঁজে স্বদেশের সন্ধানে ১৯৯৫, পোর্ট্রেট গ্যালারি ১৯৯৬, আর এক ধারা ভাষ্য ১৯৯৬।

অন্যান্য রচনা ॥ হুগুম পঞ্চম ১৯৫৪, সম্পাদনা : ফজলুল হকের গল্প-প্রতিভা প্রজ্জ্বলিত নিমেঘে নির্বাসিত ১৯৮৩, সমালোচনা : Eyeless in the urn by Sanjib Datta ১৯৮৩।

অনুবাদ ॥ নিশো (উপন্যাস) ১৯৪৮-৪৯, টাইম মেশিন ১৯৫৯, পাঁচটি কাহিনী (লিও টলস্টয়) ১৯৫৯, স্পেনের ছোটগল্প ১৯৬৫, পাঁচটি নাটক (মলিয়র) ১৯৭৮, ডাক্তার আবদুল্লাহর কারখানা (নাটক) ১৯৭৩, পৃথিবীর রক্তক্ষেত্রে মানুষ ১৯৮৫, সম্ভানের স্বীকারোক্তি (অমৃত পূতম) ১৯৮৫।

ইংরেজীতে অনূদিত ॥ Janani (জননী), State Witness (রাজসাক্ষী), Laughter of Slave (ক্রীতদাসের হাসি), God's Adversary and Other Stories (ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী), Bankajol (জলাংগী)।